গোপাল হালদার রচনাসমগ্র/২

গোপাল হালদার রচনাসমগ্র/২

গোপাল হালদার

এ মুখার্জী এ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড

প্রথম এ মুখার্জী সংস্করণ
বইমেলা, ১৩৬৩

প্রকাশক
রাজীব নিয়োগী
এ মুখার্জী এ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

দিল্লী অফিস
কমিউনিকেশন সেন্টার
এম-৭০ গ্রেটার কৈলাশ ২
কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স
নিউ দিল্লী ১১০ ০৪৮

সম্পাদনা
অমিয় ধর
প্রচ্ছদ
পূর্ণেন্দু পত্রী

মুদ্রক
প্রবর্তক প্রিন্টিং এ্যাণ্ড হাফটোন লিঃ
৫২/৩ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০১২

বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা

প্রথম খণ্ড

প্রাচীন ও মধ্যযুগ

সূচী

———

প্রথম পর্ব

প্রাচীন যুগ

(খ্রীষ্টাব্দ ৯০০—খ্রীষ্টাব্দ ১২০০)

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাঙলা ভাষা ও বাঙালীর সাহিত্য

প্রাচীনতম নিদর্শন ঃ 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙলা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা'—এই নামে 'চর্যাচর্য বিনিশ্চয়', সেই সঙ্গে সরোজ বজ্রের (সরহপাদের) 'দোহাকোষ' ও কাহ্নপাদের 'ডাকার্ণব' এই তিনখানা পুঁথি একত্র সম্পাদিত করে স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের' পক্ষ থেকে বাঙলা ১৩২৩ সালে (ইংরাজী ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে) একখানা কবিতা-সংগ্রহ প্রকাশ করেন। এর মধ্যেকার 'চর্যাচর্য বিনিশ্চয়'ই একমাত্র খাঁটি বাঙলায় লেখা 'পদ' বা গান বলে গ্রাহ্য হয়েছে। সাধারণত 'চর্যাপদ' বলেই বাঙলা সাহিত্যে এর পরিচয়,—যদিও আসল নাম কারও কারও মতে 'চর্যাচর্য বিনিশ্চয়', 'চর্যাশ্চর্য বিনিশ্চয়', ইত্যাদি। অর্থাৎ নামের সম্বন্ধে বিনিশ্চিত হবার উপায় এখন আর নেই; তবে 'চর্যাপদ' নামটিই আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে প্রচলিত। এখনও পর্যন্ত এই চর্যাপদই বাঙলা সাহিত্যের আদিগ্রন্থ, আর তার অন্তর্ভুক্ত পদগুলিই প্রাচীনতম বাঙলা সাহিত্যের নিদর্শন। এই পদগুলোর বয়স প্রায় এক হাজার বৎসর বা তার কাছাকাছি।

অবশ্য চর্যাপদের এই পদগুলি ছাড়াও প্রাচীন বাঙলা ভাষার আরও কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়; কিন্তু তা ভাষারই নমুনা, সাহিত্য নামের যোগ্য নয়। এ সবের মধ্যে গণনা করা হয়—পুরালিপি বা পুঁথিপত্রে প্রাপ্ত প্রাচীন বাঙলার পল্লী ও স্থানের কিছু কিছু নাম; অমরকোষের ভাষ্য সর্বানন্দের 'টীকা-সর্বস্ব'তে (১১৫৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষদিকে এ টীকা সংকলিত হয়) উল্লিখিত প্রায় ৩০০ বাঙলা শব্দ; 'প্রাকৃত পৈঙ্গলে'র (১৪শ শতাব্দীর শেষদিককার প্রাকৃত-পদসংগ্রহ) এখানে-ওখানে প্রাপ্ত কয়েকটি বাঙলা পদ ও শ্লোক এবং দু'একটি বাঙলা বাক্যাংশ;—মহারাষ্ট্রের এক চালুক্য রাজার নির্দেশে (খ্রীঃ ১১২৯-৩০) সংকলিত 'অভিলাষ চিন্তামণি' নামে 'বিশ্বকোষ-জাতীয় গ্রন্থের দশাবতার স্তোত্রের অন্তর্ভুক্ত দু'টি বাঙলা শ্লোকের টুকরো। বাংলা ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে এসব হয়তো মূল্যবান, কিন্তু বাঙলা সাহিত্যের পক্ষে এদের কোনো মূল্য নেই।

বাঙালী জীবন ও বাঙ্‌লা সাহিত্যের বিষয়বস্তু হিসাবে এ সবের চেয়ে বরং মূল্যবান—বাঙ্‌লার খনার বচন, ডাকের বচন, রূপকথা, উপাখ্যান, ব্রতকথা, ছড়া, প্রবাদ, প্রবচন প্রভৃতি। এসবের মূল বিষয়বস্তু হয়তো খুবই প্রাচীন। কিন্তু এসব বাঙ্‌লার লোক-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। কোনো কোনো জিনিস সাহিত্য-গুণযুক্ত; কোনো কোনো জিনিস তা নয়। এসব জিনিস আগে কোনদিন লিখিত রূপ পায় নি। তাই লোকের মুখে মুখে ভাষায়, এবং কতকটা ভাবেও, তার এত অদল-বদল হয়েছে যে, তার বর্তমানকালীন রূপকে আর প্রাচীন সাহিত্যের নমুনা বলে গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

পিশেল সাহেবের মতো কোনো কোনো পণ্ডিত বলেছেন যে, জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' প্রথমত মাত্রাবৃত্ত ছন্দে অপভ্রংশে বা বাঙ্‌লায় রচিত হয়ে থাক্‌বে; পরে কবি তা সংস্কৃতে ঢালাই করেছেন। কিন্তু একথা অধিকাংশ পণ্ডিতই গ্রহণ করেন নি। বরং ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস যাঁরা আলোচনা করেছেন তাঁরাই জানেন যে, মুখের ভাষা দেশে দেশে কালে কালে যতই পরিবর্তিত হোক্, খ্রীষ্টীয় অব্দের প্রথম দিক থেকেই সংস্কৃত প্রায় বরাবরই ছিল সমস্ত ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক জীবনের ভাষা। 'পালি' বৌদ্ধদের কাছে ও 'অর্ধমাগধী' জৈনদের কাছে কিছুকাল তাদের নিজ নিজ ধর্মগত আলোচনা ও সংস্কৃতির বাহন ছিল। পরে, খ্রীষ্টীয় প্রায় ৮০০ থেকে ১,০০০ শতকের মধ্যে 'শৌরসেনী' প্রাকৃতের সন্তান শৌরসেনী অপভ্রংশ বা 'অবহট্‌ঠ'ও রাজপুত রাজাদের প্রভাবের সঙ্গে সঙ্গে তৎকালীন উত্তর-ভারতের প্রায় রাষ্ট্রভাষা হয়ে উঠেছিল। সেই প্রাচীন বাঙ্‌লার যুগে বাঙালী পণ্ডিতেরাও তাই বাঙ্‌লায় কবিতা লিখুন আর না লিখুন, পারলে কাব্যচর্চা করতেন সংস্কৃতে। 'অবহট্‌ঠে' কবিতা রচনায়ও তাঁদের উৎসাহ ছিল, তা দেখ্‌তে পাই। কারণ, বাঙ্‌লার উচ্চবর্গের সুধী-সজ্জনের চক্ষে তখন পর্যন্ত বাঙ্‌লা ভাষা ছিল শৌরসেনী-অপভ্রংশেরও তুলনায় শাদা-মেটে গ্রাম্য জিনিস।

যাই হোক্, মোটামুটি ধরা যায় যে প্রায় হাজার খানেক বৎসর আগেই বাঙ্‌লা ভাষা জন্মগ্রহণ করে। ভারতের অন্যান্য প্রধান প্রধান আধুনিক ভাষাগুলিও খ্রীষ্টীয় ১০ম থেকে ১২শ শতকের মধ্যেই উদ্ভূত হয়। অবশ্য সে-সব কোনো কোনো ভাষার নিদর্শন মেলে একটু আগে, কোনো ভাষার বা একটু পরে! তা ছাড়া সব ভাষাতেই যে তখন-তখনি সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছিল, তা-ও নয়। তবে ভারতের 'হিন্দ-আর্য ভাষা' (পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা ভারতের

যে-ভাষার নামকরণ করেছেন 'ইন্দো-এরিয়ান্' বলে, আমরা তাকে এ নামে অভিহিত করতে চাই), তখন 'প্রাচীন স্তর' ও 'মধ্য স্তর' উত্তীর্ণ হয়ে উত্তর ভারতে 'আধুনিক স্তরে' এসে পৌছয়। এই হিন্দ্-আর্য ভাষারই প্রাচ্য শাখার এক প্রধান প্রতিনিধি বাঙ্‌লা (বা 'বঙ্গ ভাষা')। ভাষা হিসাবে বাঙ্‌লা ভাষা কিন্তু কুলীন নয়। 'হিন্দ্-আর্য ভাষা'র প্রাচ্য শাখা আদৌ কুলীন বলে গণ্য হত না; তার কারণ, বাঙালী জাতটাও আসলে বড় বেশী কুলীন জাত নয়।

বাঙ্‌লা দেশ ও বাঙালী জাতি

কারা বাঙ্‌লা দেশের প্রাচীনতম অধিবাসী, আর বাঙালীর রক্তে কোন্ রক্ত কতটা আছে, এ-বিচার নৃ-বিজ্ঞানের। তবে এ কথা মনে রাখতে হবে— যাঁরা বাঙ্‌লা দেশের আদিবাসী তাঁরা এই বাঙ্‌লা ভাষা বলতেন না, মূলত তাঁরা 'হিন্দ্-আর্য'-ভাষী ছিলেন না। নৃ-বিজ্ঞানের মতে বাঙ্‌লার প্রাচীনতম অধিবাসীরা সম্ভবত ছিলেন অস্ট্রিক গোষ্ঠীর অস্ট্রো-এশিয়াটিক্ জাতির মানুষ; তাঁরা ব্রহ্মদেশ ও শ্যামদেশের মোন্ এবং কম্বোজের (উত্তর ইন্দো-চীনেব) খ্মের শাখার মানুষদের আত্মীয়। এ জাতীয় মানুষকেই বোধহয় বলা হত 'নিষাদ', কিম্বা 'নাগ'; আর পরবর্তী কালে 'কোল্ল', 'ভিল্ল', ইত্যাদি। তা হলে অনুমান করা যেতে পারে, তাঁদের ভাষাও ছিল অস্ট্রিক গোষ্ঠীর মোন্-খ্মের-শাখার ভাষার মতোই। অনেকটা এরূপ ভাষাই এখনো বলেন বাঙ্‌লা দেশের পশ্চিমে কোল, মুণ্ডা, সাঁওতাল প্রভৃতি আদিবাসীরা, আর পূর্ব বাঙ্‌লার (এখন আসাম রাজ্যের) খাশিয়া পাহাড়ের খাশিয়ারা। অস্ট্রিক গোষ্ঠী ছাড়াও বাঙ্‌লা দেশে বাস করতেন দ্রাবিড় গোষ্ঠীর বিভিন্ন শাখার লোকেরা। তাঁরা ছিলেন সুসভ্য জাতের মানুষ। তাঁদের প্রধান বাসভূমি এখন দাক্ষিণাত্য; তাঁদের প্রধান ভাষা এখন তামিল, তেলুগু, মালয়ালাম ও কন্নড়ী। কিন্তু এক সময়ে তাঁরা সম্ভবত পশ্চিম বাঙ্‌লায় ও মধ্য বাঙ্‌লায়ও ছড়িয়ে পড়েছিলেন। এখনো ছোটনাগপুরের (বিহার রাজ্যে) ওরাওঁ প্রভৃতি জাতেরা দ্রাবিড় গোষ্ঠীরই একটা ভাঙা ভাষা বলেন। অস্ট্রো-এশিয়াটিক ও দ্রাবিড় ভাষীরা ছাড়াও পূর্ব ও উত্তর বাঙ্‌লায় বহু পূর্বকাল থেকে নানা সময়ে এসেছিলেন মঙ্গোলীয় বা ভোট-চীনা গোষ্ঠীর নানা জাতি-উপজাতি—যেমন গারো, বড়ো, কোচ, মেছ, কাছারি, টিপ্‌রাই, চাক্‌মা প্রভৃতি। সম্ভবত এঁদেরই বলা হত 'কিরাত' জাতি। এঁরা ভোট-চীনা গোষ্ঠীর নানা ভাষা-উপভাষা বলতেন।

অতএব, শুধু নানা ভাষাই যে এই বাঙ্‌লা দেশে প্রাচীনতম কালে চলত তা নয়, দেশটাও ছিল নানা জাতি-উপজাতির বাসভূমি ;—'বাঙালী' বলে একটা গোটা জাতও তাই তখনও পর্যন্ত জন্মায় নি। 'রাঢ়', 'সুহ্ম', 'পুণ্ড্র', 'বঙ্গ' প্রভৃতি প্রাচীন শব্দগুলি প্রথম দিকে বোঝাত বিশেষ বিশেষ জাতি বা উপজাতিকে ; তারপরে তাদের বাসস্থল হিসাবে এক একটা বিশেষ বিশেষ অঞ্চলকে। যেমন, 'রাঢ়' বলতে এখনো বোঝায় মধ্য-পশ্চিম বঙ্গ, 'সুহ্ম' বোঝাত দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গ ; 'পুণ্ড্র বর্ধনভুক্তি' বোঝাত মোটের উপর উত্তর-বঙ্গকে। অবশ্য, এছাড়াও এক একটা অঞ্চলের অন্য নাম ছিল। যেমন, উত্তর-বঙ্গকে পূর্বেও বলত, এখনো বলে, 'বরেন্দ্র', 'বরেন্দ্রী' ; 'বঙ্গ' বলতে বিশেষ করে বোঝায় পূর্ব-বঙ্গ (বাংলাদেশ)। আবার 'সমতট', 'হরিকেল' প্রভৃতি ছিল সেই পূর্ব-বঙ্গেরই দক্ষিণাঞ্চলের এক একটা ভাগের নাম। এসব নামের মধ্যে 'গৌড়' ও 'বঙ্গ' এই শব্দ দু'টি সুপ্রাচীন, পাণিনিতেও তার উল্লেখ আছে। 'বঙ্গ মগধের' উল্লেখ আছে ঐতরেয় আরণ্যকেও। কিন্তু সমস্ত বাঙ্‌লা দেশের সাধারণ নাম 'বাঙ্‌লা' মুসলমান তুর্ক বিজেতারাই দেন। তার পূর্বে 'গৌড়' বলতে প্রধানত বোঝাত বরেন্দ্রভূমি ; তারপর বাঙ্‌লার অনেকটা অংশ। পরে পাল রাজাদের গৌড় সাম্রাজ্য যতই বিস্তার লাভ করতে থাকে ততই 'পঞ্চগৌড়', 'সপ্তগৌড়' বলে উত্তর ভারতের অনেক দূর পর্যন্ত গৌড়ের অন্তর্ভুক্ত করবার চেষ্টা হয়।

কিন্তু এসব অঞ্চলের মানুষের সাধারণ ভাষা বাঙ্‌লা নয় ; তাই এসব অঞ্চলকে বাঙ্‌লা বলা কখনো সম্ভব নয়। অর্থাৎ বাঙ্‌লা যাঁর আশৈশব নিজস্ব ভাষা তিনিই বাঙালী ; আর যেখানকার সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে কৃষক-শ্রেণী, সাধারণ ভাবে বাঙ্‌লা কথা বলেন সে-দেশই বাঙ্‌লা দেশ,—রাষ্ট্র হিসাবে সে-স্থান ভারত বা পাকিস্তান, কিংবা বিহার 'রাজ্য', আসাম 'রাজ্য' বা অন্য যে-কোনো 'রাজ্যে'র অন্তর্ভুক্তই হোক, তাতে যায় আসে না। তাই জাতি ও দেশের প্রধান এক পরিচয়—ভাষা ; কারণ ভাষা একটা মৌলিক সামাজিক বন্ধন, সংস্কৃতির এক প্রধানতম বাহন, জাতির মানসিক রূপেরও পরিচায়ক।

বাঙ্‌লা ভাষা

বাঙ্‌লা ভাষা কিন্তু অস্ট্রিক গোষ্ঠীর ভাষাও নয়, দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষাও নয় ; আর ভোট-চীনা গোষ্ঠীর ভাষার চিহ্ন তো এ ভাষায় প্রায় নেই- ই বলা

চলে। বাঙ্লা ভাষা ভারতীয় 'হিন্দ্-আর্য' গোষ্ঠীর ভাষারই বংশধর। তার কারণ, বাঙ্লার প্রাচীনতম অধিবাসী অস্ট্রিক-দ্রাবিড়-ভোটচীনা প্রভৃতি জাতি-উপজাতিদেরহটিয়েদিয়েবাঙ্লার মাটিতে উপনিবেশ স্থাপন করে ক্রমে ক্রমে আধিপত্য বিস্তার করে উত্তর ভারতের আর্য-ভাষী হিন্দ্-আর্য সভ্যতার ধারক নানা জাতের লোকেরা। তারা সকলে রক্ত হিসাবে বা জাতি হিসাবে 'আর্য' ছিল না। 'আর্য' কথাটাই সম্ভবত মূলত একটা সাংস্কৃতিক নাম। যারা পশ্চিম থেকে বাঙ্লা দেশেআসত তারা এই ভাষায় ও সংস্কৃতিতেই ছিল এক গোষ্ঠীর। খ্রীষ্টপূর্ব ১,০০০ থেকে খ্রীঃ ৫০০ অব্দের মধ্যেই তারা সম্ভবত প্রথমে এসেছিল বিদেহে, মগধে; পরে আসে অঙ্গে, আর তারও পরে বঙ্গে, কলিঙ্গে। যারা এসব দেশে প্রথম আসত, বসবাস করত এখানকার স্থানীয় 'অন্-আর্য' অধিবাসীদের সঙ্গে, স্বভাবতই তারা আর্য-সংস্কৃতির আচার-বিচার বিশুদ্ধ রাখতে পারত না। তাই উত্তর-ভারতে বা আর্যাবর্তে ফিরে গেলে তাদের জন্য প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা হত। এ থেকে বুঝতে পারি, কেন বৈদিক যুগে 'প্রাচ্য'দেরও অসম্মানের চোখেই দেখা হত, আর বঙ্গ জাতিকে বলা হয়েছে 'বয়াংসি', কি না পক্ষিজাতীয়।

খ্রীঃ পূর্ব ৫০০ অব্দের পূর্বেই কিন্তু আর্য-ভাষীদের মধ্যে মগধ রাজ্য প্রাধান্য অর্জন করতে থাকে। তারপরে মৌর্য সাম্রাজ্যের কেন্দ্র হল মগধ। এই মৌর্য যুগ (খ্রীঃ পূঃ ৩।২ শতক) থেকেই বাঙ্লা দেশে আর্য-ভাষীদের উপনিবেশ স্থাপিত হতে থাকে। অবশ্য বাঙ্লা দেশে অশোকের কোনো অনুশাসন আবিষ্কৃত হয় নি। কিন্তু বগুড়ার মহাস্থান-গড়ের 'সংবঙ্গীয়'দের প্রতি নির্দেশটি রচিত হয়েছে আর্যভাষার 'পূর্বী প্রাকৃতে' এবং উৎকীর্ণ হয়েছে মৌর্যযুগের ব্রাহ্মী লিপিতে। তা থেকে বোঝা যায়, আর্য-ভাষীরা মৌর্যযুগে উত্তর-বঙ্গে এসেছে। নিম্নবঙ্গেও তমলুক, বেড়াচাঁপা প্রভৃতি স্থানে শুঙ্গ, কুশান প্রভৃতি যুগের নানা নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। গুপ্তযুগে (খ্রীষ্টীয় ৪র্থ শতক থেকে ৭ম শতকে) দেখি এই আর্য-ভাষীদের বসতি পশ্চিম বাঙ্লার সর্বত্র প্রসারিত হয়েছে। বাঁকুড়ার পোখরণায় (পুষ্করণ) চন্দ্রবর্মার পুরালিপিটি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত; তার অক্ষর গুপ্তযুগের প্রথম দিক্‌কার ব্রাহ্মী লিপির নিদর্শন। সংস্কৃত তখন দেশের রাজভাষা; কিন্তু রাজপুরুষেরা মুখে পূর্বী প্রাকৃতেরই কোনো রূপ বলতেন। বাঙ্লার ভূমিজ অন্ত্যজেরাও খ্রীষ্টীয় ৮ম শতকের কাছাকাছি এই হিন্দ্-আর্য গোষ্ঠীর কথিত ভাষা হিসাবে এই প্রাচ্য প্রাকৃতকে গ্রহণ

করতে·আরম্ভ করেছিল, তা অনুমান করা যায়। তারপর গৌড় সাম্রাজ্যের পত্তন হল পাল রাজত্বে (খ্রীঃ ৭৪০ থেকে খ্রীঃ ১,১০০) ; আর গৌড়ভূমি (উত্তর-বঙ্গ) তখন আর্য-সংস্কৃতির এক প্রধান ক্ষেত্র হয়ে ওঠে। কি 'গৌড়ী রীতি'তে সংস্কৃত রচনায়, কি ভাস্কর্যকলায়, কি বিদ্যাচর্চায়—গৌড় তখন উত্তর ভারতে অগ্রগণ্য। শৌরসেনী প্রাকৃত থেকে 'শৌরসেনী অপভ্রংশ' আগেই জন্মগ্রহণ করেছিল। এই যুগে হিন্দ্‌-আর্য ভাষার প্রাচ্য প্রাকৃতের শাখাগুলির মধ্যেও নূতন বৈশিষ্ট্য ক্রমশ পরিস্ফুট হয়ে উঠতে থাকে। যেমন, 'মাগধী প্রাকৃতে'র মধ্যে পশ্চিম মাগধী ('ভোজপুরিয়া' যার বংশধর), মধ্য মাগধী (মগহী, মৈথিলী প্রভৃতিতে যার পরিণতি) ও পূর্ব মাগধী (বাঙ্‌লা, ওড়িয়া, অসমিয়া যার সন্তান), এরূপ প্রকার-ভেদ তখন লক্ষ্য করা যেত। এর কিছু পরেই দেখা গেল পূর্ব মাগধীর বংশধর বাঙ্‌লা ভাষা একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। কিন্তু তখনো বাঙ্‌লা দেশের উচ্চবর্গের মানুষেরা কাব্যচর্চা করতেন সংস্কৃতে, না হয় অবহট্‌ঠতে (শৌরসেনী অপভ্রংশের চলিত নাম)। তার কারণ বোঝাও প্রয়োজন।

সংস্কৃত কোনো কালে কথ্যভাষা ছিল কি না সন্দেহ। কিন্তু সংস্কৃত মধ্য-যুগেও অনেক দিন পর্যন্ত ছিল ভারতের উচ্চ-কোটির সংস্কৃতির বাহন। এখনো সে-সম্মান সে সম্পূর্ণ হারায় নি। প্রাচীন ভারতে বৈদিক যুগের পরে লোকে মুখে যে হিন্দ্‌-আর্য ভাষা বলত তার নাম ছিল 'প্রাকৃত',অর্থাৎ প্রাকৃত জনের ভাষা। কিন্তু কথিত ভাষা দ্রুত পরিবর্তিত হয়,—কালভেদেও হয়, দেশভেদেও হয়। বিশেষত, আর্য-ভাষীরা যতই অন্যভাষীদের দেশে বিস্তার লাভ করতে থাকে, ততই সেই সব দেশের লোকের ভাষার প্রভাবও আর্য-ভাষীদের নিজেদের কথাবার্তায় আর্য-ভাষার উপর অল্পাধিক পড়তে থাকে। প্রাকৃতেরও তাই প্রথম যুগেই (খ্রীঃ পূঃ ১,০০০ থেকে খ্রীঃ পূঃ ৫০০র মধ্যে) দুই রূপ দেখা দেয় :—'প্রাচ্য' ও 'উদীচ্য'। এর পরে সেই 'প্রাচ্য' প্রাকৃতেরও দুটি শাখা জন্মায়—একটি 'মাগধী', বিশেষ করে মগধ তার জন্মক্ষেত্র ; আর একটি 'অর্ধ-মাগধী'—কোশল ছিল তার কেন্দ্র। অন্যদিকে পশ্চিমের 'মধ্যদেশে' (গঙ্গা-যমুনার অন্তর্বেদীতে ও শূরসেনদের রাজ্যে উদ্ভূত হয় 'শৌরসেনী প্রাকৃত'। মৌর্য যুগে, মগধের মতোই মাগধী প্রাকৃতেরও মর্যাদা ছিল। কিন্তু তারপর থেকে উত্তর ভারতের প্রাণকেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায় সেই অন্তর্বেদী শৌরসেনী অঞ্চল। তখন থেকে শৌরসেনী প্রাকৃতই উত্তর ভারতে প্রাধান্য অর্জন করে,

মাগধী প্রাকৃত তুচ্ছ বলে গণ্য হয়। খ্রীষ্টীয় ৫ম শতকে বররুচি তাঁর 'প্রাকৃত-প্রকাশ' ব্যাকরণে কাব্য-সাহিত্য প্রাকৃতের প্রয়োগ সম্পর্কে কতকগুলি ধরাবাঁধা নিয়মের উল্লেখ করেছেন। অবশ্য তারও আগে ভরতের নাট্যশাস্ত্রে নাটকের বিভিন্ন পাত্রপাত্রীর মুখে প্রাকৃতের বিভিন্ন রূপের প্রয়োগের নিদর্শন পাওয়া যায়। যেমন, আমরা দেখি—সংস্কৃত নাটকে সংস্কৃত ভাষা বলে বীর নায়কেরা; 'শৌরসেনী প্রাকৃতে' কথা বলে রানী, রাজসখী প্রভৃতি অভিজাত মহিলারা; তারা গান গায় আবার 'মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে' (তা সুললিত ছিল বলে কি?); আর শকুন্তলার ধীবরদের মতো (সাধারণ শ্রমজীবী) মানুষেরা কথা বলে 'মাগধী প্রাকৃতে'; দস্যু ও ঘাতকেরা বলত 'পৈশাচী প্রাকৃত'—সম্ভবত তা ছিল কাশ্মীর ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের প্রাচীন কথ্য ভাষা। এই সাহিত্যিক ব্যবস্থাটা হয়তো তখনকার বাস্তব অবস্থা দেখেই স্থির হয়েছিল—অর্থাৎ মাগধী প্রাকৃত প্রাকৃত-জনের ভাষা, শৌরসেনী প্রাকৃতের মর্যাদা অতুলনীয়। কিন্তু এ রকমের পাকা-পোক্ত ব্যবস্থা থেকেই বোঝা যায়—সাহিত্যে এই সব রীতি ও ব্যবস্থা যখন নেওয়া হচ্ছিল, বিবিধ অঞ্চলে লোকের মুখে ভাষা তখন আরও পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। সাহিত্যের প্রাকৃতগুলি তাই লোক-মুখের প্রাকৃতের ঘষামাজা রূপ; আর তাও আবার অনেকটা ধরাবাঁধা কৃত্রিম রূপ। এদিকে খ্রীঃ ৬০০ থেকে খ্রীঃ ১,০০০-এর মধ্যে লোকের মুখের ভাষা এভাবে পরিবর্তিত হতে হতে প্রাকৃতের যে-রূপ দাঁড়ায় তাকে আর তখনকার মানুষেরা প্রাকৃত বলত না; বলত 'অপভ্রংশ', চল্‌তি কথায় 'অবহট্‌ঠ' ('অপভ্রষ্ট')। এই অপভ্রংশ রূপই আবার ভেঙে-চুরে খ্রীঃ ১,০০০-এর দিকে নানা অঞ্চলে ভারতীয় নানা আধুনিক ভাষা রূপে জন্ম নিতে থাকে—যেমন, বাঙ্‌লা, মৈথিলী, ভোজপুরিয়া, অবধী (অযোধ্যার), ব্রজভাষা ইত্যাদি। কিন্তু একটা কথা জানা দরকার:—আমরা 'শৌরসেনী অপভ্রংশে'রই লিখিত নিদর্শন পাই; অন্যান্য প্রাকৃতের 'অপভ্রংশ দশা'র প্রমাণ পাই না। এইজন্যই 'অবহট্‌ঠ' বলতেই বোঝায় 'শৌরসেনী অপভ্রংশ', অন্য অপভ্রংশগুলি ছিল অবজ্ঞেয়। আর পূর্বেই বলেছি রাজপুত রাজাদের প্রভাবে শৌরসেনী অবহট্‌ঠ খ্রীঃ ৮ম শতকের পর থেকে উত্তর-ভারতের প্রায় রাষ্ট্রভাষা হয়ে ওঠে। এই শৌরসেনী অবহট্‌ঠেরই বংশধর ব্রজভাষা, খাড়িবোলী; আর এ ভাষাই মুসলমানী প্রভাবে পরিণত হয় হিন্দোস্তানীতে। আধুনিক 'হিন্দী' এই হিন্দোস্তানীরই উপর গঠিত

সংস্কৃতশব্দবহুল লিখিত ভাষা। উর্দু সেই হিন্দোস্তানীরই উপর গঠিত পারসীশব্দবহুল লিখিত ভাষা; তাই হিন্দী ও উর্দু কুলীন ভাষা। কিন্তু কথা এই—৮ম থেকে ১০ম শতকে উচ্চবর্গের মানুষ সংস্কৃত ছাড়া অন্য কোনও ভাষায় সাহিত্য রচনা করতে হলে তা রচনা করত 'অবহট্‌ঠ'তে। বাঙালী কবিও তাই তখন সংস্কৃতে আর অবহট্‌ঠতে কাব্য রচনা করতেন স্বচ্ছন্দে;—কারণ, বাঙলার বিদ্বজ্জনেরা এ-সব রচনারই সমাদর করতেন, বাঙলা রচনার নয়।

প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যের পরিবেশ

সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার: বাঙালী যখন বাঙলা ভাষায় সাহিত্য রচনা করতে আরম্ভ করে তখন সে হাজার দেড়েক বৎসরের (খ্রীঃ পূঃ ৫০০ থেকে খ্রীষ্টীয় ১,০০০ অব্দের মধ্যে) ভারতের হিন্দ্-আর্য সংস্কৃতির ও হিন্দ্-আর্য ভাষার উত্তরাধিকারী। অবশ্য ততদিনে ভারতের আর্য-সংস্কৃতি বা বৈদিক সংস্কৃতি কতকটা কালক্রমে সামাজিক নিয়মে, আর অনেকটা এই দেশের প্রাচীনতর নানা অধিবাসীদের জীবনযাত্রা ও ধ্যানধারণার সঙ্গে সংমিশ্রণের ফলে, এক নিজস্ব ভারতীয় সংস্কৃতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। সাধারণভাবে ভারতের এই সংস্কৃতিকে বলা চলে 'প্রাচীন হিন্দু-সংস্কৃতি'—যদিও তারও অনেক স্তর আছে; দেশভেদে, সম্প্রদায়ভেদে তার অনেক প্রকার-ভেদও ছিল। তথাপি তার তিনটি প্রধান লক্ষণ সমস্ত ভারতে এই সেদিন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল—যথা, এই হিন্দু-সংস্কৃতির বাস্তব জীবনযাত্রা ছিল পল্লী-সভ্যতার উপযোগী বাহুল্যহীন; সমাজ ছিল জাতি-ভেদে বিভক্ত, এবং আধ্যাত্মিক চিন্তায় শুধু পরজন্মে নয়, 'প্রাক্তন' বা কর্মফলেও বিশ্বাস ছিল সুগভীর। এগুলোকে তাই বলতে পারি 'সর্ব-ভারতীয়' জিনিস। অবশ্য প্রাচ্য ভারতের এই পূর্ব-প্রান্তে সেই প্রাচীন হিন্দু-সংস্কৃতিও এখানকার নৈসর্গিক পরিবেশে ও এই বহুমিশ্রিত বাঙালী জাতির সামাজিক পরিবেশে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ও ঐশ্বর্যলাভ করেছিল, তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু তবু স্মরণীয় এই যে, এই বৈশিষ্ট্যও ছিল গৌণ। যাঁরা সংস্কৃতিমান্ ও উচ্চকোটির চিন্তার পক্ষপাতী, বাঙলা দেশেও তাঁদের চেষ্টা ছিল এই হিন্দ্-আর্য সংস্কৃতিকে বা ভারতের হিন্দু-সংস্কৃতির মূল ধারাকে যথাসম্ভব মান্য করা। তাই এই সংস্কৃতি ছিল বাঙালী সাহিত্যিকের একটি উত্তরাধিকার। রামায়ণ,

মহাভারত, ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণ থেকে তা বাঙ্‌লাকে একদিকে যুগিয়েছে বিষয়বস্তু (যাকে শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন Matter of Sanskrit) এবং অন্যদিকে অনেকাংশে দান করেছে বাঙালীর কাব্যাদর্শ। প্রাচীন বাঙালী সাহিত্যিকের সাহিত্যিক ঐতিহ্যও ছিল সর্বভারতীয় কাব্য, অলঙ্কার, দর্শন ও ধর্মের।

কিন্তু যারা বাঙ্‌লার প্রাকৃত জন তারা জাতি হিসাবে মূলত সেই হিন্দ্‌-আর্য গোষ্ঠীর নয়। অবশ্য হিন্দ্‌-আর্য ভাষা তারা গ্রহণ করে, কিন্তু সেই সংস্কৃতির উচ্চকোটির চিন্তায় বা আচার-নিয়মে তাদের অধিকারও ছিল না। বাহ্যত অবশ্য সেই হিন্দ্‌-আর্য সংস্কৃতিকে তারাও গ্রহণ করেছিল; কিন্তু বাঙ্‌লার এই জন-শ্রেণী জীবন-যাত্রায়, আচারে-নিয়মে, ভাবনায়-কল্পনায় নিজেদের প্রাচীনতর ও নিজস্ব বৈশিষ্ট্যও যথেষ্টই বহন করে চলেছিল। এমন কি, পরবর্তী কালের লোক-সংস্কৃতির মধ্যেও সে-সব জীবিত ছিল—যেমন, রূপকথায়, ব্রতকথায়, ছড়ায়, প্রবাদ-বচনে। এই লৌকিক ধারা, এটি বাঙালীর দ্বিতীয় উত্তরাধিকার। বাঙালী সাহিত্যিকের পক্ষেও কালক্রমে এই লৌকিক উত্তরাধিকার—কাহিনী ও চিন্তাধারা—লাভ করবার কথা। তা তাঁরা করেও ছিলেন,—এইটিই অন্‌-আর্য-বাঙালীর নিজস্ব বস্তু, বাঙ্‌লার খাঁটি জিনিস (যাকে বলা হয় Matter of Bengal)। মঙ্গল-কাব্যগুলির উপাখ্যানে, রাধাকৃষ্ণ কাহিনীর নানা অংশে তা স্পষ্ট। কিন্তু সেই প্রাচীন বাঙ্‌লা সাহিত্যের যুগে এই লৌকিক উত্তরাধিকার সাহিত্যে সমুন্নীত হয় নি—লোক-গীতি, লোক-কাহিনী হিসাবে তা ছিল বাঙালী জনগণের মুখেই নিবদ্ধ। উচ্চকোটির শিক্ষিতরা তা লিপিবদ্ধ করেন নি।

সামাজিক বনিয়াদ

এই সব ছিল প্রাচীন বাঙ্‌লা সাহিত্যের ভাববস্তু বা বিষয়বস্তু। বাঙ্‌লার যে সামাজিক অবস্থায় প্রাচীন ও মধ্য যুগের বাঙ্‌লা সাহিত্য উদ্ভূত হয়, দুর্ভাগ্যক্রমে সে-অবস্থার প্রামাণিক তথ্য বিশেষ পাওয়া যায় না। এই সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে কয়েকটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন। প্রথমত, যা প্রাচীন ভারতীয় সমাজের প্রধান সত্য তা বাঙ্‌লার ক্ষেত্রেও ছিল সত্য—এ সমাজ ছিল মোটের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আত্মনির্ভর পল্লীসমাজে (Village Communities) বিভক্ত। গ্রামের উৎপাদনেই মোটের উপর

গ্রামবাসীর জীবন-যাত্রা নির্বাহ হত; বাইরের সামান্য জিনিসই আনা-নেওয়া চলত। পল্লীর উৎপাদন পল্লীর নিজ প্রয়োজন মতো হলেই হল, উৎপাদন-বৃদ্ধির তাগিদ ছিল সামান্যই। দ্বিতীয়ত, ভারতের অন্যত্র যেমন বাঙ্‌লা দেশেও তেমনি এই পল্লীসমাজ ছিল কৃষি-প্রধান সমাজ; আর কৃষির যন্ত্র-পাতি ও কৃষি-পদ্ধতি ছিল গতানুগতিক; এখনো প্রায় তা-ই আছে। তাই পল্লীর প্রয়োজনাতিরিক্ত উৎপাদন নিয়ে বড় রকমের সমস্যা বেশি হত না। অবশ্য ভারতবর্ষের অন্যত্রের মতো বাঙ্‌লায়ও এই উৎপাদনের প্রধান অংশ যেত গ্রামের উচ্চবর্গের সেবায় (যেমন, রাজপুরুষ, রাজসেবক, ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ ও জৈন গুরু, করণ প্রভৃতি), সামন্ত গোষ্ঠীর নানা স্তরের ভূস্বামীর হাতে। সাধারণ ক্ষুদ্র ভূস্বামী ও কৃষক অবশ্যই দেশে সংখ্যায় বেশি ছিল। কিন্তু শূদ্র পর্যায়ের ভূমিহীন সেবক-জাতীয় কৃষিজীবী ও কারু-জীবীরা (হালিক, জালিক, ডোম, বাগ্‌দী, শবর প্রভৃতি; তারা কেউ কেউ ভূমিজ অন্ত্যজ,—প্রাচীনতম উপজাতির বংশধর) ছিল অনাচরণীয়, গ্রামান্তেবাসী (এখনকার মতোই), এবং নিতান্ত হীনাবস্থ;—অবশ্য তারাই ছিল উৎপাদনের প্রধান বাহন। বলাই বাহুল্য, মাঝে-মাঝে এই বৈষম্য নানা ধরণের বিরোধেও রূপ লাভ করত। কিন্তু আরও একটা কথা আছে—প্রাচীন বাঙালী সমাজেব তা একটা উল্লেখযোগ্য লক্ষণ। বাঙ্‌লার মঙ্গল-কাব্য ও ব্রতকথাগুলিতে দেখি, বেনেরা (মধ্যযুগের বাঙ্‌লায় তাদের নাম হল 'সওদাগর') ছিল সমাজে যথেষ্ট প্রতিপত্তিশালী। ইতিহাসের সাক্ষ্য বলে, তাম্রলিপ্ত ছিল প্রাচীন ভারতে প্রধানতম এক বন্দর—এখান থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় উপনিবেশিকেরা (হয়তো গুপ্ত যুগ থেকে পাল যুগ পর্যন্ত) গিয়েছে; আর যবদ্বীপ, সিংহল, সুবর্ণদ্বীপের সঙ্গে বাণিজ্য-সম্পর্কেও সে সময়ে তারা সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে, তাতে সন্দেহ নেই। তা হলে শুধু কৃষক নয়, এই শেষের দিকে (খ্রীঃ ৪০০—খ্রীঃ ১,০০০-এর মধ্যে?) বাঙ্‌লায় বণিক শ্রেণীও উদ্ভূত হচ্ছিল, ছোট ছোট নগর-বন্দরও ছিল। অর্থাৎ কৃষি ও পণ্য উৎপাদন খানিকটা বৃদ্ধি পেয়েছে; এমন নয় যে, কৃষি নেই, বণিকই বাংলা দেশে প্রথম পত্তন স্থাপন করেছে। সহজেই বোঝা যায়, এরূপ স্বয়ংসম্পূর্ণ পল্লীসমাজে বণিক-শক্তির বিকাশের সুযোগ আসলে বেশি ছিল না। তদুপরি, জাতিভেদের বাধায় সমুদ্রযাত্রাও ক্রমে নিষিদ্ধ হয়ে পড়ে। ক্রমে ৮ম থেকে ১২শ শতকে বহিঃসমুদ্রে মুসলমান আরবরা রাজ্যে ও বাণিজ্যে অধিকার স্থাপন করে, ভারতীয় বণিকদের বাণিজ্যযাত্রা বিপজ্জনক

হয়ে পড়ে। এবং সর্বশেষে হয়তো রাজশক্তি বণিকশক্তিকে খর্ব করে;—হিন্দু সেন-রাজারা বেনেদের (বৌদ্ধ বলে?) সমাজে অপাঙ্‌ক্তেয় করে দেয়—'বল্লালচরিত'-এর এ-কথা সেই সত্যেরই প্রমাণ। সম্ভবত এসব কারণে এই বাঙালী বণিকশ্রেণী উৎপাদকশক্তিরূপে আর বেশি বিকাশ লাভ করে নি। পালদেব (?) পরে তারা বহির্বাণিজ্য খুইয়ে অন্তর্বাণিজ্যেই নিবদ্ধ হয়ে থাকে। তাই বেনেদের প্রভাব-বৈভবের কথা তারপরে বেঁচে থাকে বাঙালীর ব্রতকথায় উপাখ্যানে, আর সেই সূত্রে বাঙালীর সাহিত্যে।

সাংস্কৃতিক পরিচয়

মোটের উপর বিচ্ছিন্ন গণ্ডিবদ্ধ পল্লীসমাজের পরিবেশেই বাঙ্‌লা সাহিত্যের জন্ম; এই সাহিত্যের বায়ুমণ্ডল সীমাবদ্ধ। এই সীমাবদ্ধ জীবনের মধ্যে প্রাচীন বাঙ্‌লা সাহিত্যের বড় অবলম্বন ছিল তাব সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার—বিশেষ করে হিন্দু-আর্য সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার। দু'রকমের রচনায় আমরা তার পরিচয় পাই—যথা, এক, বাঙালী-রচিত সংস্কৃত সাহিত্য; আর-এক, বাঙালী-রচিত অবহট্‌ঠ খণ্ড-কবিতা। এই দুই সাহিত্যের ভাব, রীতি, অলংকার প্রভৃতি খেকে বুঝতে পারি প্রাচীন বাঙালীর মানস-লোক কিরূপ ছিল এবং তাদের সাহিত্যাদর্শ ছিল কি ধরনের। বুঝি যে বাঙালী কবি যখন এর পর সত্যসত্যই বাঙ্‌লায় সাহিত্য রচনায় যত্নপর হবেন, তখন স্বভাবতই এই ঐতিহ্য, এই মনোজগৎ ও এই সাহিত্যাদর্শের ছাপ এসে যাবে বাঙ্‌লা লেখায়ও। বাঙ্‌লা সাহিত্যের পক্ষে তাই বাঙালী লেখকের এই সংস্কৃতে রচিত ও অবহট্‌ঠে রচিত সাহিত্যের মূল রূপটিও লক্ষণীয়।

বাঙালীর সংস্কৃত সাহিত্য: বাঙালী বিদ্বৎসমাজের সাহিত্য-সৃষ্টির প্রাথমিক নিদর্শন পাওয়া যায় বাঙ্‌লাদেশে প্রাপ্ত সংস্কৃত তাম্রশাসনে। সেগুলি সংস্কৃত কাব্য ও অলংকার শাস্ত্রের বিচারে তুচ্ছ নয়। যেমন, কামরূপাধিপতি ভাস্করবর্মার নিধনপুরের অনুশাসন। অনুশাসনটি সমাস-সমৃদ্ধ, অলংকার-ঐশ্বর্যে চমকপ্রদ। সংস্কৃত-সাহিত্যে যাকে 'গৌড়ী রীতি' বলে তা গৌড় দেশের কবিদেরই দান; ভাস্করবর্মার অনুশাসনটিও তারই একটি প্রথম দিককার নমুনা। পাল যুগেই (খ্রীঃ ৭০০—১,১০০ অব্দ) এই 'গৌড়ী রীতি' বিশেষভাবে সংস্কৃত সাহিত্যিকদের নিকট খ্যাতিলাভ করে। পাল সম্রাটরা ছিলেন বৌদ্ধ; তাই তাঁদের প্রশস্তিতে লোকনাথ, তারা প্রভৃতি বৌদ্ধ

দেব-দেবী ও বৌদ্ধ ধর্ম-সংঘের বন্দনা রয়েছে। তারপরে আসে সেন-যুগ (খ্রীঃ ১,১০০-১,২০০)। সেনেরা ছিলেন হিন্দু, মূলত 'কর্ণাট ক্ষত্রিয়'। তাঁদের সময়ে নারায়ণ, গোপীনাথ, কৃষ্ণ, শিব, উমা, লক্ষ্মী প্রভৃতি হিন্দু দেব-দেবীর বন্দনাই বেশি। বাঙালী হিন্দু সমাজের নূতন পত্তন হয় সেনরাজদের নির্দেশ-মতো (বৌদ্ধ বাঙালীর অবনয়নও সম্ভবত তাঁরাই সাধিত করেন)। তখন তাই সংস্কৃত কাব্য-রচনার ও কাব্য-চর্চার আরও বেশি সমাদর বাড়ে। উমাপতিধর, গোবর্ধন আচার্য, জয়দেব মিশ্র, শরণ ও ধোয়ী (বা ধোয়িক) প্রভৃতি বাঙালী কবিদের নাম সুপ্রসিদ্ধ। 'কলিকালবাল্মীকি' সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' থেকে জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' পর্যন্ত বাঙালী পণ্ডিত কবিদের সংস্কৃত রচনা সাহিত্যের মানদণ্ডে সমুত্তীর্ণ। এই সব কবি-কীর্তি ছাড়াও তখনকার দিনে অসংখ্য খণ্ড শ্লোক রচিত হয়। শ্রীধর দাসের 'সদুক্তি-কর্ণামৃতে' (১১২৭ শকাব্দে—খ্রীঃ ১২০৬তে রচিত) এরূপ ৪৮৫জন কবির লেখা প্রায় ২,৩৭০টি থেকে সংকলিত হয়েছে। নেপালে পাওয়া 'কবীন্দ্র-বচন-সমুচ্চয়'ও এই ধরনের আর-একখানি সংকলন-গ্রন্থ—তাতে ১১৩-জন কবিব ৫২৫টি শ্লোক পাওয়া যায়। তার লিপি-কালও ১,২০০ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তী নয়। বৌদ্ধদের লেখা কবিতা তাতে প্রচুর; এই সব প্রকীর্ণ কবিতার কবিরাও যে অনেকেই বাঙালী ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই (দ্রঃ— Dr. S. K. De—Sanskrit Literature; History of Bengal, Vol I, Dac. Univ.; এবং ডাঃ সুকুমার সেন—'বাঙ্‌লা সাহিত্যের ইতিহাস' ও 'প্রাচীন বাঙ্‌লা ও বাঙালী')। এর অনেক কবিতাই কাব্যগুণে ও বর্ণনাগুণে চমৎকার। দৃষ্টান্ত হিসাবে 'বঙ্গাল' নামের কবির শ্লোকটিই এখানে প্রথমে নেওয়া যাক। কারণ, কবি তাতে বঙ্গবাণীর জয়ঘোষণা করেছেন:

ঘনরসময়ী গভীরা বক্রিমসুভগোপজীবিতা কবিভিঃ।
অবগাঢ়া চ পুনীতে গঙ্গা বঙ্গালবাণী চ।

গঙ্গায় এবং ঘনরসময়ী, গভীর, বক্রোক্তির জন্য সুন্দর, কবিদের দ্বারা আস্বাদিত বঙ্গাল-বাণীতে নিমজ্জন লোককে পবিত্র করে।

'গঙ্গা' ও 'বঙ্গালবাণী'র জন্য গর্ব-বোধ যখন কবির মনে জন্মেছে, এবং কবিরা বাঙ্‌লায় কবিতা না লিখলেও বঙ্গ-বাণীর রসাস্বাদন করেছেন, তখন বাঙালীর মনে বাঙ্‌লায় কাব্য-রচনার সাধও জেগেছে নিশ্চয়ই। সত্যই যে

তা জেগেছিল, তার প্রমাণও পাই। তথাপি জ্ঞানী, গুণী ও মানীদের সমাজে সংস্কৃত শাস্ত্র ও সাহিত্যের আদর বরাবর অক্ষুণ্ণ ছিল। খ্রীঃ ১৬শ শতকের প্রথমার্ধে শ্রীচৈতন্যের পরম ভক্ত রূপ ও সনাতন প্রভৃতি গোস্বামীরা বাঙালীর সংস্কৃত কাব্য-রচনায় নূতন করে প্রাণসঞ্চার করেন। অবশ্য, বাঙ্লা সাহিত্যে এই সংস্কৃত কবিদের যথার্থ পক্ষে কোন স্থান নেই—এমন কি জয়দেবেরও নেই। কিন্তু এই বাঙালী কবিদের দান ও এঁদের ঐতিহ্য রয়েছে বাঙ্লা-সাহিত্যের সৃষ্টিতে। এই সব সংস্কৃত-লেখক কবিদের গদ্য-রচনায় আমরা প্রধানত দেখি বাণভট্টের প্রভাব, আর পদ্যে কালিদাসের। সংস্কৃত সাহিত্যের সেই ভাবলোক ও সাহিত্যাদর্শ এই সব সংস্কৃত রচনার মধ্য দিয়ে বাঙ্লা দেশে সুপ্রসারিত হয়েছে। আবার এঁদের প্রকৃতি-বর্ণনা ও বিষয়-বস্তু থেকে বাঙালী কবিদের নিজস্বতাও কতকটা বুঝতে পারা যায়। কবিত্ব করে অনেকে বাঙ্লা দেশের পল্লীশ্রীর কথা বর্ণনা করেছেন, পল্লী-বিলাসিনী বঙ্গবধূ, এমন কি বঙ্গ-বারাঙ্গনাদের নিয়েও কাব্য করেছেন কোনো কোনো কবি। কেউ-কেউ কৃষি-নির্ভর পল্লীর সমৃদ্ধির কথাও বলেছেন। কিন্তু সাধারণ বাঙালীর জীবন-মান তখনও নিশ্চয়ই ছিল প্রায় এখনকার মতই নিরাভরণ, অসচ্ছল—তাতে সন্দেহ নেই।

যেমন, সদুক্তিকর্ণামৃতের একটি সংস্কৃত শ্লোকে একজন কবি বলেছেন :— "কাঠের খুঁটি নড়বড় করছে, মাটির দেয়াল ধ্বসে পড়ছে, চালের খড় উজাড়, আমার জীর্ণ গৃহে কেঁচোর সন্ধানে এখন ব্যাঙও ঘুরে বেড়াচ্ছে।" (দ্রঃ—সেন, বাঃ সাঃ ইঃ, ১।২।৬)

পরবর্তী বাঙ্লা সাহিত্যেও দেখি দারিদ্র্যবর্ণনার অভাব ঘটে নি।

দু-একটি শ্লোকে এরূপ দু-একজন কবি সাধারণ মানুষের আরও কঠিন জীবন-যাত্রার ছবিও রেখে গিয়েছেন (দ্রঃ—সেন, প্রাঃ বাঃ ও বাঃ)।

যেমন, দরিদ্র মায়ের ছবি :—নিজে দারিদ্র্যে শীর্ণ; ক্ষুধায় ছেলেমেয়েদের পেট আর চোখ বসে গিয়েছে, চোখের জলে গাল ভাসিয়ে মা প্রার্থনা করছে এক মুঠো চালে যেন তাদের এক মাস চলে।

কিংবা কবির এই আক্ষেপ : শিশুরা ক্ষুধায় শীর্ণ, বন্ধুরা বিমুখ, ঘড়ার জলও নেই; তাতেও দুঃখ ছিল না। কিন্তু দুঃখ রাখি কোথায় যখন দেখি—ছেঁড়া কাপড় সেলাই করবার জন্যে ছুঁচ চাইতে গিয়ে গৃহিণী পেলেন প্রতিবেশীদের কাছে গঞ্জনা।

অথবা, প্রাচীন বাঙলার শ্রমজীবিনী মেয়েদের কথা নিয়ে লেখা করি শরণের এই শ্লোকটি—'পসারিণীদের' নিয়ে বৈষ্ণব কবিতায় যে রস-মাধুর্য সৃষ্টি করা হয়েছে তার নামগন্ধও নেই কিন্তু এই শ্লোকে ঃ—

এতস্তা দিবসান্তভাস্করদৃশো ধাবন্তি পৌরাঙ্গনাঃ।
স্কন্ধ-প্রস্খলদংশুকাঞ্চলধৃতিব্যাসঙ্গবদ্ধাদরা॥
প্রাতর্যাতকৃষীবলাগমভিয়া প্রোতপ্লুতাবর্ত্মচ্ছিদো।
হট্টক্রয্য পদার্থ-মূল্য-কলন-ব্যগ্রাঙ্গুলিগ্রন্থয়ঃ॥

অর্থাৎ দিনশেষের সন্ধ্যাসূর্যের মতো রাঙা চোখে ধেয়ে চলেছে মেয়েরা, দ্রুতগমনে খসে পড়ছে তাদের মাথার অঁাচল, অবশ্য বারে বারে তা মাথায় তুলে দেবার প্রয়াসের তাদের অন্ত নেই।—চাষী সকালবেলা বেরিয়ে গিয়েছে মাঠে; তাদের আসবার সময় হয়েছে, এই ভেবে এই কৃষক মেয়েরা লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটছে—যেন পথ তাতে সংক্ষেপ হবে! সঙ্গে সঙ্গে হাটের কেনা-বেচার হিসেব করতেও ব্যস্ত রয়েছে তাদের হাতের আঙুল!

এই হল প্রাচীন বাঙ্‌লার জন-জীবনের চিত্র—সার্থক চিত্র; আর বস্তুবাদী সাহিত্যেরও একটি প্রাথমিক প্রয়াস। সে ঐতিহ্যও বাঙ্‌লা সাহিত্য পেয়েছিল।

বাঙালীর অবহট্‌ঠ-রচনা ঃ কিন্তু সংস্কৃত কবিরা মোটের উপর ছিলেন উচ্চবর্গের লোক, বিদগ্ধ, সুরসিক; অনেকেই হয়তো ছিলেন রাজা-রাজড়ার পারিষদ বা বৃত্তিভোগী। তাঁদের কবিতায় তাই ইন্দ্র-চন্দ্রের ঘটা ও বিলাস-বর্ণনায় মণিমাণিক্যের ছটাই বেশি। সংস্কৃত ছাড়া অবহট্‌ঠতে যাঁরা শ্লোক রচনা করছিলেন তাঁরাও প্রধানত ছিলেন জ্ঞানী ও গুণী, আর রচনাও করতেন গুণী ও মানীদেরই উপভোগের জন্য। শৌরসেনী অপভ্রংশ অবশ্য প্রাচীন হিন্দীতে রূপান্তরিত হতে থাকে ১০ম শতাব্দীর কাছাকাছি থেকে। কিন্তু ১৪শ শতাব্দী পর্যন্ত এই অবহট্‌ঠে কাব্য-রচনা ছিল পণ্ডিত-সমাজে প্রশস্ত। মিথিলাতে পঞ্চদশ শতাব্দীতেও বিদ্যাপতি সংস্কৃতে দেবদেবীর স্তবগান লেখেন; মৈথিলিতে তিনি লেখেন তখন ব্রজলীলার গীত, আর অবহট্‌ঠতেও লেখেন কাব্য ('কীর্তিলতা')। বাঙ্‌লা দেশে তখন বিদ্যাপতির মতো প্রসিদ্ধ কবির নাম পাই না। কিন্তু 'প্রাকৃত পৈঙ্গলে' বাঙালী অবহট্‌ঠ কবির কবিতা পাওয়া যায়। স্বভাবতই এ কবিতায় বাঙ্‌লা ভাষার ও বাঙ্‌লা রীতিনীতির ছোঁয়াচ লেগেছে, গবেষকেরা তা দেখতে পান। দু-একটি দৃষ্টান্ত এখানে নিচ্ছি (দ্রঃ—সেন, বাঃ সাঃ ইঃ);

কারণ, ভাষা হিসাবে এ সব বাঙ্‌লা কবিতা নয়, হিন্দীর মাতৃস্থানীয়া সেই অবহট্‌ঠ ভাষারই নমুনা।

সো মহ কন্তা [=সেই মোর কান্ত]
দূর দিগন্তা। [=দূর দিগন্তে (এখন)।]
পাউস আএ [=প্রাবৃট্ আসে]
চেউ চলা এ ॥ [=চিত্ত বিচলিত ॥]

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চীনা কবিতার মতোই এ কবিতা সুন্দর ও ব্যঞ্জনাময়।

তরুণ তরণি তবই ধরণি পবণ বহ খরা
লগ ণহি জল বড় মরুথল জন-জীবন হরা।
দিসই বলই হিঅঅ ডুলই হমি একলি বহূ
ঘর ণহি পিঅ সুণ হি পহিঅ মণ ইছই কহূ।

অনুবাদ : তরুণ সূর্য তাপিত করে ধরণীকে, পবন বহিতেছে খরবেগে; নিকটে জল নাই, বড় মরুস্থল জন-জীবন-হর। দিগ্‌বলয়ে হৃদয় দুলিতেছে (ছুটিয়াছে ?), আমি একাকিনী বধূ; প্রিয় ঘরে নাই, হে পথিক ! শোন, মনের ইচ্ছা কহি।

এইরূপ বহু কবিতা আছে। বীররসের কবিতাও প্রচুর। মোটের উপর সংস্কৃত খণ্ডকাব্যের ভাবলোকই এই অবহট্‌ঠ কাব্যেরও ভাবলোক। তথাপি এর সুরে একটি আকৃতি আছে; আর ছন্দে ও মিলে এ যে প্রাচীন বৌদ্ধ 'গাথা'-কাব্যের ধারা অনুসরণ করে হিন্দী ও বাঙ্‌লা কবিতার দিকে এগিয়ে এসেছে, তাতে ভুল নেই। অবহট্‌ঠ কবিতাও এই জন্যই মূল্যবান;—তার ভাবগত ও রূপগত দুই ঐতিহ্যই প্রাচীন বাঙ্‌লা কবিতা লাভ করেছে। এমন কি,—বৈষ্ণবদের 'ব্রজবুলী' পদের প্রধান আদর্শ ছিল বিদ্যাপতির মৈথিলী পদ,—কিন্তু সেই 'ব্রজবুলী'র ভাষার বনিয়াদ সম্ভবত অবহট্‌ঠ (ডঃ সুকুমার সেনের এ অনুমান যথার্থ বলেই মনে হয়), পুরনো মৈথিলী নয়।

অবহট্‌ঠ কবিতাতেও কদাচিৎ বাঙালীর বাস্তব জীবনযাত্রার এক-আধটুকু সংবাদ পাওয়া যায়। যেমন,

ওগ্‌গর ভত্তা, রম্ভঅ পত্তা, গাইক ঘিত্তা, দুদ্ধ সজুত্তা।
মোইলি (?) মচ্ছা, নালিচা গচ্ছা,
দিজ্জই কন্তা খা (ই) পুণবন্তা ॥

অনুবাদ : ওগরা ভাত, কলার পাতা, গাওয়া ঘি, দুগ্ধ সংযুক্ত, মৌলি (মদন?) মাছ, নালতা শাক ;—কান্তা দিচ্ছে, পুণ্যবান খাচ্ছে ॥

এ খাঁটি বাঙালী 'পুণ্যবানে'র চিত্র। আহার্যের কথা বলবার সুযোগ পেলে বাঙালী আর ছাড়ে না। বাঙ্‌লা মধ্যযুগের মঙ্গল-কাব্যে কবিকঙ্কণের মতো কবিরাও সে সুযোগ সানন্দে গ্রহণ করেছেন। সম্ভবত ভারতবর্ষে এখনো বাঙালী জাতিই প্রধান রসনা-রসিক। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও সরস রঙ্গ-কবিতায় তার প্রমাণ রেখে গিয়েছেন :

গদ্য জাতীয় ভোজ্য কিছুটা দিয়ো,
পদ্যে তাদের মিল খুঁজে পাওয়া দায়,
তাহোক, তবুও তারা লেখকের প্রিয়,
জেনো, বাসনার সেরা বাসা রসনায়। (বীথিকা)

সিদ্ধাচার্যগণের ভাব-ঐতিহ্য : কিন্তু অবহট্‌ঠে এক নূতন ঐতিহ্যও সৃষ্টি করেছিলেন একটি বিশিষ্টমণ্ডলীর বাঙালী রচয়িতারা। তাঁরা হচ্ছেন বৌদ্ধ-তান্ত্রিক সহজপন্থী এবং শৈবযোগী নাথপন্থী সিদ্ধাচার্য। আর্য-সংস্কৃতির ভাবলোক থেকে তাঁদের ভাবলোক অনেক পৃথক ; আর সংস্কৃত সাহিত্যের রূপকলা, ঠাট, রীতিনীতিও তাঁদের রচিত অবহট্‌ঠ পদে নেই। তাঁরা কঠিন কথাও বলেছেন সরল ছাঁদে। কারণ, তাঁরা রাজা-রাজড়া বা পণ্ডিত-সমাজের জন্য লেখেন নি ; বরং ঐশ্বর্য ও পাণ্ডিত্য, দু-এরই প্রতি ছিল তাঁদের অবিশ্বাস। 'দোহাকোষে'র একটি পদ এখানে উদ্ধৃত করছি (দ্রঃ সেন—বাঃ সাঃ ইতিহাস, পৃঃ ৩৪) :—

কিং তো দীবেঁ কিং তো নিবিজ্জেঁ
কিং তো কিজ্জই মন্তহ সেব্বেঁ
কিং তো তিত্থ তপোবন জাই
মোক্‌খ কি লব্‌ভই পাণী হ্বাই ॥

অনুবাদ : কি হবে তোর দীপে? কি হবে তোর নৈবেদ্যে? কি হবে তোর মন্ত্র ও সেবায়? তীর্থে-তপোবনে যেয়েই বা তোর হবে কি? মোক্ষ কি লাভ হয় জলে স্নান করে?

এই ভাব, এই সুর ভারতের বহু সাধক-মণ্ডলীর সুর। অবশ্য ভারত-সংস্কৃতির ঐতিহাসিকরা এই ধারাতেই আর্য-পূর্ব ভারতীয় সংস্কৃতির আভাসও লক্ষ্য করতে পাবেন। মোহেন-জো-দড়োয় যে যোগ-সাধনার চিত্রাদি দেখা

যায় আর্য-সংস্কৃতির বিজয় ও বিস্তৃতি সত্বেও সেইসব ধারণা ও প্রাচীনতম ক্রিয়া-প্রক্রিয়া-সমূহ দেশের জনসাধারণের জীবন থেকে কোনোকালে ধুয়ে মুছে যায় নি। উচ্চবর্গের ব্রাহ্মণ-পুরোহিতেরা অবজ্ঞাভরে পাশে ঠেলে রাখলেও পরবর্তী হিন্দু-সংস্কৃতি সেই সব ভাবনা ও সাধনার পদ্ধতি কখনো শোধন করে, কখনো না-জেনে, ক্রমাগত আপনার অঙ্গীভূত করে নিয়েছিল। তবু এই সব ভাবনার ও সাধনার অনেকটাই থেকে গিয়েছিল উচ্চ শিক্ষিতের নিকট অবজ্ঞাত ও অজ্ঞাত। কারণ, তা ছিল মণ্ডলীগত সম্পদ, প্রচ্ছন্ন ও গুহ্য সাধনার ব্যাপার। সিদ্ধাচার্যদের এই ধারা কিন্তু পূর্বাপর অব্যাহত রয়েছে বাঙলা দেশে। এই ঐতিহ্যই নানাভাবে এসে পৌঁচেছে একালের সহজিয়া সাধনায়, বাউল গানে পর্যন্ত। এ সাধনা অবশ্য জনসাধারণের জীবনযাত্রার উপরে সম্পূর্ণ গঠিত নয়; গুহ্য মণ্ডলীগত তন্ত্র। কিন্তু তবু এসব সাধক ছিলেন সাধারণ মানুষের নিকটতর, আর এঁদের পদগুলি আসলে সেই সাধনারই প্রচ্ছন্ন নির্দেশ। এই সিদ্ধ ও নাথ গুরুরা তাই অবহট্‌ঠে নিজেদের কথা বলেই ক্ষান্ত হয় নি। দেশের সাধারণ মানুষের ভাষাতেও তাঁরা পদ-রচনা করে গেছেন। সেই রকম পদই পাওয়া গিয়েছে 'চর্যাপদে'।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

চর্যাপদ

চর্যাপদ ও দোহাকোষ: চর্যাপদের ভাব ও ভাষা দুইই বাঙালীর। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'দোহাকোষ' ও 'ডাকার্ণব'কেও 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষা' বলে মনে করেছিলেন। পরবর্তী কালে অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি ভাষাতত্ত্ববিদ্‌রা দেখলেন—দোহাকোষের ভাষা আসলে অবহট্‌ঠ; দোহাগুলির উপরে তাই হিন্দীরই বরং দাবী বেশী খাটে। কিন্তু চর্যাপদের প্রায় সমস্ত পদই প্রাচীন বাঙলা, এমন কি পশ্চিম বাঙলারই প্রাচীনতম কথ্য ভাষার নমুনা;—এ বিষয়ে অধ্যাপক সুনীতিকুমার, ডঃ শহীদুল্লাহ্‌, ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চী, ডঃ সুকুমার সেন প্রভৃতি ভাষাতাত্ত্বিকেরা সকলেই একমত। অবশ্য স্বভাবতই সে ভাষায় অবহট্‌ঠেরও এক-আধটুকু ছোঁয়াচ লেগেছে। আর, সে সময় পর্যন্ত বাঙলা, মৈথিলী, মগহী, ভোজপুরিয়া, এসব ভাষা পরস্পরের খুবই সন্নিকট ছিল।

ওড়িয়া ভাষা তখনো বাঙ্‌লা থেকে স্বতন্ত্র হতে আরম্ভ করে নি ; প্রাচীন অসমিয়া ও উত্তর বঙ্গের বাঙ্‌লা ভাষা তো মাত্র খ্রীঃ ১৩০০র পরে বাঙ্‌লা থেকে পৃথক হতে থাকে। অতএব, চর্যাপদের ভাষায় এসব ভাষারও কোনো কোনো লক্ষণ দেখলে বিস্মিত হবার কারণ নেই। বরং, চর্যাপদের পুঁথি নেপালে সংরক্ষিত ছিল, সেখানেই অনুলিখিত হয়েছিল, তাই চর্যাগুলিতে মৈথিলী ও নেওয়াড়ীর চিহ্ন আরও বেশি থাকাও সম্ভব ছিল। কিন্তু ভাষাতত্ত্বের বিচারে চর্যার ভাষা বাঙ্‌লা ভাষা, এমন কি পশ্চিম বঙ্গের বাঙ্‌লা ভাষা বলেই গ্রাহ্য হয়েছে।*

'চর্যাপদ' ও 'দোহাকোষ' দু'খানি পাওয়া গিয়েছিল নেপালের রাজ-দরবারের গ্রন্থশালায়। প্রাচীন অনেক বাঙ্‌লা ও সংস্কৃত পুঁথি এই ভাণ্ডার থেকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ও আচার্য সিলভ্যাঁ লেভি প্রভৃতি পণ্ডিতেরা উদ্ধার করেন। তার কারণ, খ্রীষ্টীয় ১২০০ অব্দের পরে যখন একে-একে মগধ ও নদীয়া (পশ্চিম বাঙ্‌লা) তুর্ক আক্রমণে পরাজিত ও অধিকৃত হয় তখন থেকে বাঙ্‌লা, মিথিলা প্রভৃতি দেশের পণ্ডিতগণ তাঁদের পুঁথিপত্র, পট, দেবমূর্তি প্রভৃতি নিয়ে দেশত্যাগ করেন। তাঁরা কেউ কেউ পূর্ববঙ্গে আশ্রয় নিয়েছিলেন,—পূর্ববঙ্গ অনেকদিন স্বাধীন ছিল। কিন্তু অনেকেই শরণার্থী হন এই হিমালয়ের পাদস্থিত হিন্দুরাজ্য নেপালে। তখনো অবশ্য নেপাল ছিল বৌদ্ধ নেওয়াড়ীদের দেশ ; হিন্দু গোর্খা রাজপুতরা তা অধিকার করে রাজ্যস্থাপন করে মাত্র ১৮শ শতকে। কিন্তু নেপালে মুসলমান বিজেতারা প্রবেশ লাভ করতে পারে নি, তাই এখানে অনেক দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন উপাদান সুরক্ষিত হয়। নেপালে বাঙ্‌লা ও মিথিলার শিল্পকলা ও শাস্ত্রচর্চা নূতন রূপ গ্রহণ করে ; সেখান থেকে তা তিব্বতে, চীনেও যায়। বিশেষ করে নেপালে ও তিব্বতেই তাই এখনো অনুসন্ধান করতে হয় তুর্ক-বিজয়ের পূর্বমুহূর্তের মগধ, মিথিলা ও গৌড়ের বৌদ্ধ ও হিন্দু তান্ত্রিক ধর্মের চিহ্ন। অনেকদিন পর্যন্ত সেই ধর্ম ও সেই সংস্কৃতির নিরাপদ চর্চা নেপালে চলে।

---

* সম্প্রতি অসমিয়া ভাষার ও ওড়িয়া ভাষার লেখকেরা 'চর্যাপদ'কে নিজেদের বলে পৃথক পৃথক দাবী করেছেন। হিন্দীবাদী লেখকেরা অবশ্য আরও বেপরোয়া, তাঁরা ভোজপুরিয়াকেই এখন হিন্দীর উপভাষা বলেন, 'চর্যাপদ'কে-ও নিজেদের বলেন, 'দোহাকোষ'কেও নিজেদের বলেন—সবই যেন এক ভাষা! ভাষাতাত্ত্বিকেরা এসব দাবী মানতে পারেন না। 'চর্যাপদে'র ভাষা সম্বন্ধে প্রামাণিক বিচার করেছেন অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (দ্রষ্টব্য—ইংরেজিতে লেখা 'বাঙ্‌লা ভাষার উদ্ভব ও অভ্যুদয়', ODBL, 59 ff)। ভাষার কথা এক্ষেত্রে আমাদের আলোচ্য নয়।

'চর্যাপদ' (ও 'দোহাকোষ') সে সময়ে ওদেশে যথেষ্ট শ্রদ্ধার বস্তু ছিল, তা বুঝতে পারা যায়। কারণ, মূল চর্যাগুলি পরবর্তী সময়ে অনুলিখিত হয়েছিল ; সংস্কৃত ভাষায় পর্যন্ত তাদের টীকা রচিত হয়েছিল, এবং তিব্বতী ভাষায়ও তাদের অনুবাদ হয়েছিল। অবশ্য মূল শ্লোকগুলি যে গূঢ় সাধন-রহস্যের কথা, তা না জানলে এই টীকা পড়েও লাভ হয় না। তবু এইসব অবলম্বন করেই শাস্ত্রী মহাশয় এবং পরবর্তী কালে ডাক্তার প্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চী চর্যাপদের ভাব ও ভাষার অনুশীলন করেছেন। অধ্যাপক শশিভূষণ দাশগুপ্তও তার সাধনতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন বসু (১৯৫৬) ও ডঃ সুকুমার সেন চর্যাগুলি ব্যাখ্যা করে সম্পাদিত করেছেন। ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে অবশ্য সর্বাগ্রে অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং পরে ডাক্তার মহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ চর্যাপদকে বিচার করে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। এ বিষয়ে আচার্য সুনীতিকুমারের কৃতিত্ব অবিস্মরণীয়।

চর্যাপদের কাল ঃ 'চর্যাপদে'র মূল পুঁথিখানি ১৪ শতকের। পুঁথিখানি তত পুরাতন না হলেও এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে চর্যাগুলি বেশ প্রাচীন জিনিস। সঠিক কাল অবশ্য প্রায় কোনো প্রাচীন বা মধ্যযুগের বাঙ্‌লা কাব্যেরই বলা যায় না ; চর্যার রচনা-কালও সেরূপ সুনিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয়। ডাক্তার শহীদুল্লাহ্‌ মনে করেন তা খ্রীষ্টীয় ৭ম শতকের লেখা। কিন্তু অধিকাংশ পণ্ডিতই মনে করেন—চর্যাগুলি অত প্রাচীন নয়, রচনা-কাল সম্ভবত খ্রীষ্টীয় ৯৫০ হতে ১,২০০ অব্দের মধ্যে (দ্রঃ—সুনীতিকুমার চট্টোঃ ইংরেজি History of Bengal, Vol. I, Chap. XII)।

চর্যাপদের পদগুলি রচনা করেন সিদ্ধাচার্যগণ। কিন্তু এই সিদ্ধাচার্যদের কাল নিয়েও তর্ক অনেক। তিব্বতী ও ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসারে তাঁরা সংখ্যায় ৮৪ জন ; সকলেই ঐতিহাসিক ব্যক্তি কিনা তার ঠিক নেই। অনেকের সম্বন্ধে কিছু কিছু সংবাদ তিব্বতী নানা পুঁথিপত্র ও ঐতিহ্য থেকেও জানা যায়। মোটামুটি খ্রীষ্টীয় ৯ম থেকে ১২শ শতকের মধ্যেই সিদ্ধাচার্যরা আবির্ভূত হয়েছিলেন—পণ্ডিতেরা এরূপই অনুমান করেন। মহাযান বৌদ্ধধর্মের বজ্রযান শাখার অন্তর্গত সহজ-পন্থার সাধক তাঁরা। আবার, শৈব নাথপন্থী বা যোগীরাও সিদ্ধাদিগকে আপনাদের গুরু বলে দাবী করেন। সহজ-যানের সাধন-তত্ত্বের কথা নাথ-গুরুরা সাধারণের জন্য চর্যাগীতিতে বলেছেন। কিন্তু গুরুর নিকট থেকে না জানলে যে কেউ এসব পদের অর্থ বুঝবে না, তাও তাঁদের কথায় স্পষ্ট।

চর্যার ভাষা হচ্ছে সঙ্কেতের ভাষা। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেছেন—এ জন্যই তার নাম 'সন্ধ্যা ভাষা', সন্ধ্যার মত আব্‌ছায়া তার কথা, রহস্যময়। কিন্তু কথাটা আসলে সন্ধ্যা নয়, 'সন্ধা',—তা অভিসন্ধি, অভিপ্রায় বোঝাত; অনেক পণ্ডিতই (এজার্‌টন ও সুশীলকুমার দে—History of Bengal Vol. I, Chapter XI, pp. 329-30) এইরকম মনে করেন। পদগুলির বাইরের অর্থ যদি বা বোঝা যায়, আসল নিগূঢ় অভিপ্রায় তথাপি বোঝা যাবে না। এমন কি, বাইরের নানা যৌন-কথাও হয়তো অধ্যাত্ম তত্ত্বেরই রূপকমাত্র। তত্ত্ব ও সাধন-পদ্ধতির সে সব সাংকেতিক উপদেশ গুরুই শিষ্যকে বুঝিয়ে দিতে পারেন। সহজ-পন্থা গুরুর মুখেই শুনতে হয়।

চর্যাপদে ৪৭টি চর্যা পাওয়া গিয়েছে। তার মধ্যে একটি অবশ্য খণ্ডিত। তিব্বতী অনুবাদ দেখে মনে হয় এ ছাড়াও আরও চর্যা ছিল; কিন্তু তা হারিয়ে গিয়েছে।

পদকর্তা-পরিচয়ঃ প্রত্যেকটি চর্যার শেষ শ্লোকে ভণিতা আছে, তাতে পদকর্তার নাম পাওয়া যায়। ৪৬।৪৭টি চর্যা থেকে আমরা ২৪জন পদকর্তার নাম পাই—হয়তো কোনো কোনো নাম ছদ্মনাম, শুধু পরিচয়-সূচক, কোনো নাম হয়তো বা আসলে রচয়িতার নিজের নয়, তাঁর গুরুর। কাহ্ন বা কাহ্নপাদের লেখাই পাওয়া যায় বেশি, মোট ১২টি। ভুসুকুর আছে ৬টি চর্যা; সরহের (তাঁর দোহাকোষও পাওয়া গিয়েছে) গীত আছে ৪টি। কুক্কুরীপাদের আছে ৩টি; আর লূইপাদ, শান্তি, শবর, এঁদের প্রত্যেকের ২টি করে চর্যা আছে। ১টি করে চর্যা পাওয়া গিয়েছে বিরুআ, গুণ্ডরী, চাটিল, কামলী, ডোম্বী, মহিণ্ডা, বীণা, আজদেব, ঢেণ্ডণ, ভাদে, তাড়ক, কঙ্কণ, জয়নন্দী ও ধামের। এ সব পদকর্তাদের অনেকেই পণ্ডিত ছিলেন, অন্য গ্রন্থাদিও তাঁরা লিখেছেন। এঁদের কারও কারও পরিচয় ভারতের ও তিব্বতের নানা গ্রন্থ থেকে সহজেই লাভ করা যায়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁর 'মুখবন্ধে' সে সব পরিচয় উল্লেখ করেছেন, পরবর্তী পণ্ডিতেরাও তা নিয়ে আলোচনা করেছেন। অবশ্য তবু তর্ক থেকে যায়। যেমন, লূইপাদই আদিসিদ্ধা মীননাথ (বা মৎস্যেন্দ্রনাথ) বলে সুপরিচিত, মৎস্যেন্দ্রনাথ বাঙলা গোপীচন্দ্র প্রভৃতির গানে উল্লেখিত হয়েছেন। সিদ্ধাচার্যদের মধ্যে লূইপাদের 'আদিসিদ্ধা' বলে প্রসিদ্ধি। কিন্তু বৌদ্ধ সহজিয়াদের কাছে মনে হয় লূইপাদ ও মীননাথ-মৎস্যেন্দ্রনাথ ছিলেন স্বতন্ত্র লোক; চর্যাপদের টীকাকারও মীননাথের দোহা

যে ভাবে উদ্ধৃত করেছেন তাতে এরূপই মনে হয়। কাহ্নুপাদ ও কৃষ্ণাচার্য এক হলেও, কৃষ্ণাচার্য যে ক'জন ছিলেন বলা শক্ত। বহু গুরুকে মিলিয়ে মিশিয়ে এক করে নেওয়াও ছিল নিয়ম। তাই এ তর্কে না গিয়ে আমরা বরং তাঁদের চর্যাগুলিরই পরিচয় গ্রহণ করি, সেই সূত্রেই যতটুকু সম্ভব গ্রহণ করব পদকর্তাদেরও পরিচয়।

সাধারণ ভাব ও রূপ : সাধারণ ভাবে চর্যাগুলির ভাব ও বিষয় যে এক, তা আমরা জানি। কারণ, সবগুলিই সহজিয়া মতবাদ ও সাধন-পদ্ধতির কথা। সে মতবাদের বিশেষ আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। বৌদ্ধ ও শৈব তন্ত্রের থেকে আরম্ভ করে এই সাধনাই বৈষ্ণব সহজিয়া 'রাগাত্মিকাপদে'র মধ্য দিয়ে একালের আউল-বাউলদের দেহতত্ত্বের গানে এসে পৌঁচেছে। উত্তর ভারতের 'গোরখপন্থী', 'কবীরপন্থী' প্রভৃতি নানা মরমিয়া সাধক-মণ্ডলীকেও যে তা প্রভাবিত করেছে, তা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। আমরা দু-একটি চর্যা হাতে নিলেই দেখতে পাব—এঁদের সাধনতত্ত্ব যত দুর্বোধ্যই হোক এঁরা মানতেন না সনাতন ধর্ম, তার ষড়্-দর্শন (ব্রহ্ম, ঈশ্বর, অর্হৎ, বৌদ্ধ, লোকায়ত, সাংখ্য), কিংবা জাতিভেদ; গুরু-পরম্পরায় এঁদের যোগ-পদ্ধতি উপদিষ্ট হত, তাই গুরুর উপর এঁদের পরম ভক্তি।

চর্যার সাধারণ রূপ

এক-আধটি চর্যা একবার দেখলেই বোঝা যায় তাদের রূপ : মাত্রাবৃত্ত ছন্দে পদগুলি লেখা; পয়ারের মত অন্ত্য অনুপ্রাস বা মিল আছে। দুই দুই চরণের এক একটি শ্লোক, আর চরণের মধ্যে আছে যতি। প্রত্যেকটি চর্যার উপরে 'রাগে'র উল্লেখ আছে, যেমন, 'রাগ পটমঞ্জরী', 'রাগ গবড়া', 'রাগ অরু', 'রাগ গুঞ্জরী', 'রাগ ভৈরবী' ইত্যাদি। এসব 'রাগ' যে সেকালে সত্যই কি রকম ছিল তা জানবার উপায় নেই, কিন্তু চর্যাগুলি যে তাল-মান-যুক্ত গীতি তা নিঃসংশয়ে বোঝা যায়। পরবর্তী কালের বাঙালী রচয়িতারা এরূপ গীতি-কবিতাকেই বলতেন 'পদ'। বাঙালী প্রাণের সহজ প্রকাশ হয় পদে অর্থাৎ গীতি-কবিতায়, চর্যাপদ প্রথম থেকেই যেন তার সংকেত দিচ্ছে।

চর্যার একটি বৈশিষ্ট্য : খণ্ড-কবিতা অবশ্য সংস্কৃত ও অপভ্রংশেও যথেষ্ট রয়েছে। কিন্তু আধুনিক কালের 'লিরিক' বা খণ্ড-কবিতার সঙ্গে তার মিল হচ্ছে রূপের মিল, ভাবের দিক থেকে এ মিল তত বড় নয়। কারণ, আধুনিক যুগের খণ্ড-কবিতা বিশেষ করে ব্যক্তিগত বেদনা অনুভূতিরই প্রকাশক।

কথাটা এই—ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের যুগ যে সমাজে যখন দেখা দেয়, সেখানে ব্যক্তি যতই আপনার সত্তা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠতে থাকে, সাহিত্যেও ততই ব্যক্তি-মানুষের ভাবনা-অনুভূতির কথা,- তাদের জীবন-যাত্রার ও চরিত্রের কথা একটু একটু করে প্রাধান্য লাভ করতে থাকে। তখন ক্রমে পদ্যে প্রাধান্য লাভ করে 'লিরিক' বা খণ্ড-কবিতা, গদ্যে প্রাধান্য লাভ করে চরিত্র-চিত্র অর্থাৎ উপন্যাস বা কথাসাহিত্য। 'চর্যাপদ' যখন রচিত হচ্ছিল তখন ভারতীয় সমাজে বা বাঙালী সমাজে সামন্ততন্ত্র ও মধ্যযুগের ভাবই প্রবল। প্রকৃতপক্ষে বাঙ্‌লা দেশে ও ভারতবর্ষে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের যুগ আসতে থাকে ১৯শ শতকে। তাই ১৯শ শতকেই এ দেশের সাহিত্যে সত্যকারের আধুনিক 'লিরিক' ও আধুনিক কথা-সাহিত্যের জন্মলাভ সম্ভব হয়। কাজেই চর্যার মত প্রাচীন খণ্ড-কবিতায় আমরা দেখি বাঙালীর গীতি-প্রবণতা। প্রধানত দেখি—চর্যাগুলি একটা মণ্ডলীগত সাধনার ও ভাবধারার কথা, ব্যক্তির কথা নয়। চর্যা যারই রচনা হোক তার বিষয়বস্তু একই ধরণের। কিন্তু বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, সে রচনার মধ্য দিয়ে বিশেষ রচয়িতার এক-আধটুকু ছাপও প্রতিফলিত হয়েছে—ডঃ সুকুমার সেনের এ বিশ্লেষণ একেবারে মিথ্যা নয়। এরকমটা হয়েছে মোটের উপর খণ্ড-কবিতার স্বভাব-গুণে। তা ছাড়া ব্যক্তি-মানুষ কোনো যুগেই যে না ছিল তাও নয়, সে ছিল শুধু চাপা পড়ে। একটু করে ফাঁকে ফাঁকে তথাপি সেই ব্যক্তি-সত্তার খোঁজও পাওয়া যেত সেই প্রাচীন ও মধ্য যুগেরও শিল্পে কাব্যে। চর্যাতেও আমরা তা পাই কিছু কিছু। দু-একটি চর্যা উদ্ধৃত করলেই চর্যার সাধারণ ভাব ও রূপ স্পষ্ট হবে। আর তাদের বিশিষ্টতা কি ধরণের, কি ধরণের ব্যক্তিগত গুণাগুণের ছাপ গৌণ ভাবে হলেও কার রচনায় পড়েছে, তা সেই সঙ্গে লক্ষ্য করা যাবে।

চর্যার জগৎ : লুইপাদের দুটি চর্যার মধ্যে একটির রূপ (চর্যা নং ২৯) :

রাগ—পটমঞ্জরী

ভাব ণ হোই অভাব ণ জাই
আইস সংবোহেঁ কো পতিআই ॥ ধ্রু ॥
লুই ভণই বট দুলকৃখ বিণাণা।
তিঅ ধাএ বিলসই উহ লাগে ণা ॥ ধ্রু ॥ [উহ সন্তানা ?]
জাহের বাণচিহ্ন রূব ণ জানী
সো কইসে আগম বেএঁ বখাণী ॥ ধ্রু ॥

কাহেরে কিষভণি মই দিবি পিরিচ্ছা
উদক চান্দ জিম সাচ ন মিচ্ছা ॥ ধ্রু ॥
লুই ভণই ভাবই কীষ্
জা লই অচ্ছমতা হের উহ ণ দিস্ ॥ ধ্রু ॥

ডঃ সুকুমার সেনের অনুবাদ : ভাব হয় না, অভাব যায় না ;—এরূপ সংবোধ কে প্রত্যয় করে? লুই বলে, বেটা, বিজ্ঞান দুর্লক্ষ্য : ত্রিধাতুতে বিলাস করে, আকার ঠাহর হয় না। যাহার বর্ণ চিহ্ন জানা নাই তাহাকে কেমন করিয়া আগম বেদে ব্যাখ্যা করা যায়? কাহাকে কি বলিয়া আমি পাতি দিব? জলে প্রতিবিম্বিত চাঁদের মত সে সত্য নয়, মিথ্যাও নয়। লুই বলে, আমি ভাবি কিসে? যাহা লইয়া আছি তাহার আভাসও দেখি না যে।

যা নিগূঢ় সাধন-তত্ত্বের বিষয় তা দুর্বোধ্য। কিন্তু ভারতবাসীর নিকট তবু এইসব কথা একেবারে অদ্ভুত কিছু শুনায় না। অনেক শব্দ, অনেক উৎপ্রেক্ষা আমাদের সুপরিচিত হয়ে গিয়েছে। আমরা বুঝতে পারি এ হচ্ছে যোগ-সাধনার কথা, পরতত্ত্বের ব্যাখ্যা। আর. সিদ্ধাচার্য লুইপাদ তা বলছেন সরল ভাষায়, আন্তরিকতার সঙ্গে ; ভাষার অস্পষ্টতা নেই, ভাবেও কোনো স্থূলতা নেই। একটি চরণে কাব্যরসও জমাট বাঁধা : 'জলে প্রতিবিম্বিত চাঁদের মত সে (পরতত্ত্ব) সত্যও নয়, মিথ্যাও নয়'—'উদক চান্দ জিম সাচ ন মিচ্ছা'।

কুক্কুরীপাদের নামে যে দুটি পদ পাওয়া যায় তার সঙ্গে লুইপাদের পদের তুলনা করলে দেখা যায় কুক্কুরীপাদের ভাষা গ্রাম্য, ভাব ইতর, মনে হয় নারীর রচনা (সু. কু. সে.—'ইতিহাস'), সম্ভবত কুক্কুরীপাদের কোনো শিষ্যার। গুহ্য অর্থ যাই থাক, জীবন-চিত্র হিসাবে তবু এ কয়টি শ্লোক উদ্ধৃত করছি : (২নং)

আঙ্গন ঘরপণ সুন ভো বিআতী।
কানেট চৌরি নিল অধরাতী ॥ ধ্রু ॥
সুসুরা নিদ গেল বহুড়ী জাগঅ।
কানেট চোরে নিল কা গই মাগঅ ॥ ধ্রু ॥
দিবসই বহুড়ী কাড়ই ডরে ভাঅ।
রাতি ভইলে কামরু জাঅ ॥ ধ্রু ॥

অনুবাদ : অঙ্গন ঘরের কোণেই, হে বিত্তাবতী, শোন, অর্ধরাত্রে কানেট চোরে নিলে। শ্বশুর নিদ্রাগত, বউ জেগেই আছে ; চোরে কানেট নিলে, কোথায় গিয়ে সে তা মাগবে ? দিনের বেলায় বউ কাকের ডরেই চীৎকার করে ওঠে, কিন্তু রাত্রি হলে চলে কামরূপে বিহারে।

শবরাচার্যের একটি (২৮ নং) চর্যাগীতি শবর-জীবনযাত্রার বর্ণনায় ও কাব্য-গুণের জন্য প্রায়ই উদ্ধৃত হয়। নিশ্চয়ই চর্যাটির অন্য গূঢ় অর্থও ছিল, কিন্তু সেই ভাব-জগতের অপেক্ষা এই সাধারণবোধ্য বাস্তব রূপটিই কি কম আদরণীয় ?

রাগ—বলাড্ডি

উঁচা উঁচা পাবত তঁহি বসই সবরী বালী
মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিণ সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী ॥ ধ্রু ॥
উমত সবরো পাগল সবরো মা কর গুলী গুহাড়া তোহৌরি
ণিঅ ঘরিণী ণামে সহজ সুন্দারী ॥ ধ্রু ॥
ণাণা তরুবর মৌলিলরে গঅণত লাগেলী ডালী
একেলী সবরী এ বণ হিণ্ডই কর্ণকুণ্ডলবজ্রধারী ॥ ধ্রু ॥
তিঅ ধাউ খাট পড়িলা সবরো মহাসুখে সেজি ছাইলী
সবরো ভুজঙ্গ ণইরামণি দারী পেহ্ম রাতি পোহাইলী ॥ ধ্রু ॥
হিঅ তাঁবোলো মহাসুহে কাপুর খাই
সুন নিরামণি কণ্ঠে লইআ মহাসুহে রাতি পোহাই ॥ ধ্রু ॥
গুরুবাক পুঞ্চআ বিন্ধ ণিঅ মণে বাণেঁ
একে শরসন্ধানে বিন্ধহ বিন্ধহ পরম নিবাণেঁ ॥ ধ্রু ॥
উমত সবরো গরুআ রোষে
গিরিবর সহর সন্ধি পইসন্তে সবরো লোড়িব কইসে ॥ ধ্রু ॥

অনুবাদ : উঁচু উঁচু পর্বত, তথায় বাস করে শবরী-বালিকা ; ময়ূরপুচ্ছ-পরিহিতা সেই শবরী, গলায় তার গুঞ্জার মালা। উন্মত্ত শবর, পাগল শবর, গোল করিওনা—তোমার গোহারি, তোমার নিজ গৃহিণী, নামে সহজ সুন্দরী। নানা তরুবর মুকুলিত হইল রে, গগনে লাগিল তাহার ডাল, কর্ণ-কুণ্ডল-ধারিণী শবরী একা এই বনে ঢুঁড়িতেছে। ত্রৈধাতুক খাট পাতিল শবর, মহাসুখে শয্যা বিছাইল ; ভুজঙ্গ (প্রেমিক ?) শবর, প্রেয়সী নৈরামণি, প্রেমে রাত

পোহাইল। হিয়াতাম্বুলে কপূর দিয়া মহাসুখে খাইল; শূন্য নৈরামণি কণ্ঠে লইয়া মহাসুখে রাত্রি পোহাইল। গুরুবাক্য-ছিলায় নিজ মন-বাণ দিয়া বিদ্ধ কর। এক শর-সন্ধানে বিদ্ধ কর, বিদ্ধ কর পরম নির্বাণকে। গুরুরোষে শবর উন্মত্ত গিরিবর-শিখরের সন্ধিতে পশিলে শবর ফিরিবে কিসে?

এ অবশ্য সাধারণ বাঙালীর জীবন-চিত্র নয়, পাহাড়ীয়া শবর জাতিদের (সাঁওতাল? না, গাড়ো-খাসিয়ার?—শবরীপাদ পূর্ব বাঙ্‌লার লোক বলে অনুমিত হয়েছেন) জীবন-চিত্রের আধারে বজ্রযানের সাধন-মার্গের কথা।

উদ্ধৃতি না বাড়িয়ে দু-একটি বৈশিষ্ট্যসূচক কথা উল্লেখ করাই শ্রেয়ঃ। বীণপাদের নামে যে চর্যাটি (১৭নং) আছে তাতে পাই সেকালের নাট্য ও নৃত্য গীতের উল্লেখ, যদিও সেখানে তা গৃহীত হয়েছে রূপক হিসাবে। কারণ, এ হচ্ছে "হেরুকবীণা", আর:

সুজ লাউ সসি লাগলী তান্তী
অনহা দাণ্ডি চাকি কি অত অবধুতী।

সূর্য লাউ, শশী লাগিল তন্ত্রী, অনাহতদাণ্ডি অবধুতী হইল চাকি।

আর, এ নৃত্য হচ্ছে 'বুদ্ধ নাটকের নৃত্য'। অন্তত জানতে পারছি—সেকালে বীণা কিরূপ হত, আর কি নাটক ছিল।

সরহপাদ প্রসিদ্ধ আচার্য। তাঁর চর্যাও তেমনি গভীর আধ্যাত্মিক সুরের, অথচ সরল। একটি (চর্যা নং ৩৯) চরণে শুনি:—

বঙ্গে জায়া নিলেসি পরে ভাগেল তোহার বিণাণা।

বঙ্গে জায়া নিলি, পরে তোর বিজ্ঞান ভেঙে গেল।

পূর্ববঙ্গে বিবাহ বোধহয় তখনো খুব প্রশস্ত ছিল না। ভুসুকুকেও বলা হয়েছে (চর্যা নং ৪৯), তিনি 'বাঙাল' হলেন,—সে কি চণ্ডালী বিয়ে করে? না, বাঙাল মেয়ে বিয়ে করে?

আরেকটি চর্যায় শবর-জীবনযাত্রার চিত্র আরও সুস্পষ্ট। উদ্ধৃতি ছেড়ে শুধু তার অনুবাদ দিচ্ছি: পাহাড়ের উপরে প্রায় আকাশের গায়ে শবরদের বাড়ি। বাড়ির চারিদিকে কার্পাস গাছের ফুল ফুটেছে। চীনা ধান পেকেছে, শবর শবরী উৎসবে মেতেছে। দিনের পর দিন শবরের আর কোনোও খেয়াল নেই, মহাসুখে ভুলে থাকে। ক্ষেতের চারপাশ বাঁশের চাঁচারি দিয়ে সে ঘিরেছে, তাতেই শকুন শেয়াল কাঁদছে।

বলা বাহুল্য, এসব সাধন-মার্গের কথা। তবে এসব কথার আড়ালে আমরা শবর-জীবনযাত্রার সংবাদও পাই। বুঝি, এ সাধনা তাদের মধ্যেও চলে।

কিন্তু ভুসুকুর সেই চর্যাটি (নং ৪৯) উল্লেখযোগ্য, পদ্মাতীরে নৌসৈন্য বা জলদস্যুর উল্লেখের জন্য : "রাজ-নৌকা পাড়ি দিয়ে রইল পদ্মার খালে। নির্দয়-ভাবে বাঙাল দেশ লুঠ করল।" যদিও এ নৌকা বজ্রনৌকা ; অনেক সময়েই কায়ানৌকা, মন তার দাঁড় (সরহের ভাষায়)। অবশ্য নদনদী আর তার জীবনযাত্রার কথা চর্যাপদে প্রায়ই পাওয়া যায়। বোঝা যাচ্ছে, এসব চর্যার রচনাকারীরা বাঙ্‌লাদেশের সঙ্গে, হয়ত বা পূর্ব ও নিম্ন বঙ্গের সঙ্গে সুপরিচিত। ভুসুকুর অন্য দুটি চর্যায় মৃগয়ার রূপকে বলা হয়েছে সাধন-মার্গের কথা। অবশ্য, হরিণ-হরিণীর কথা চর্যার সমকালীন সাহিত্যে আরও পাওয়া যায়। তবু ভুসুকুর একটি চর্যা (চর্যা ৬) অনুবাদযোগ্য : কি নিয়ে আর কি ছেড়ে, আমি কি আছি ? চারিদিকে শিকারীর ডাক পড়েছে। হরিণ আপনার মাংসের জন্যই আপনার শত্রু, (শিকারী) ভুসুক তাকে এক মুহূর্তও ছাড়ে না। হরিণ (ভয়ে) তৃণ ছোঁয় না, জল পান করে না ; অথবা হরিণ-হরিণীর ঠিকানা জানা নেই। হরিণী বলে—হরিণ, তুমি কি শুনছ ? এ বন ছেড়ে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে যাও। তীরগতিতে ধাবমান হরিণের খুর দেখা যায় না। ভুসুকু বলেন, মূঢ়ের হৃদয়ে একথা প্রবেশ করে না।

তা না করুক, কিন্তু এ যে শিকারী মানুষদের কথা, সেদিনের হরিণ-মাংস-প্রিয় বাঙালীদের কথা,—তা এখনো তারা বুঝতে পারে। তেমনি বুঝতে পারে কাহ্নপাদের চর্যা থেকে বাঙালীর জাল ফেলে মাছ ধরবার কথা, বাঙালীর মৎস্যপ্রিয়তাও করতে পারে অনুমান।

কিন্তু কাহ্নাচার্যের পদগুলি অন্য কারণেও উল্লেখযোগ্য। কাহ্নপাদ প্রসিদ্ধ পণ্ডিত, দোহাকারও। পঞ্চাশখানার উপর সংস্কৃতে লেখা বজ্রযানের উপর গ্রন্থ আছে কাহ্নপাদের নামে। চর্যাপদেও তাঁরই পদ পাওয়া যায় বেশি—মোট ১২টি। হয়তো শেষদিককার চর্যাকার তিনি, তাই। প্রায় কবিতাতেই অধ্যাত্ম-সত্য সুস্পষ্ট ও গভীর। তবু একটি চর্যা (চর্যা নং ১৮) প্রেমলীলার আধারের উপর রচিত। অবশ্য, সহজিয়া প্রেমলীলায় যে শাস্ত্রাভিমান ও শাস্ত্র-নির্দেশের কোনো পরোয়া নেই, তা বলাই বাহুল্য। সে প্রেমলীলায় ডোমনী চণ্ডালিনীরা শুধু গ্রাহ্য নয়, মনে হয় তন্ত্রের নিম্নজাতীয়া শক্তিদের মতো তারাই প্রশস্ত।

রাগ—গউড়া

তিণি ভুঅণ মই বাহিঅ হেলে॑।
হাউ সুতেলি মহাসুখ লীড়ে ॥
কইসণি হালো ডোম্বী তোহোরি ভাভরি আলি।
অন্তে কুলিণজণ মাঝেঁ কাবালী ॥
তঁইলো ডোম্বী সঅল বিটলিউ।
কাজণ কারণ সসহর টালিউ ॥
কেহে কেহো তেহোরে বিরুআ বোলই।
বিদুজণ লোঅ তোরে॑ কণ্ঠ ন মেলঈ ॥
কাহ্নে গাইতু কামচণ্ডালী।
ডোম্বি তআগলি নাহি চ্ছিনালী ॥

অনুবাদঃ তিন ভুবন আমার দ্বারা হেলায় বাহিত হল। আমি মহাসুখ-লীলায় শুলাম। ওলো ডোমনী, কি রকম তোর ছলা কলা? একপাশে কুলীন জন আর মধ্যস্থলে তোর কাপালিক। ওলো ডোমনী, তুই সকল নষ্ট করলি। কাজ নেই, কারণ নেই, শশধর টলালি। কেউ কেউ তোকে বিরূপ বলে; কিন্তু বিদ্বজ্জন তোর কণ্ঠ ছাড়ে না। কাহ্ন গায়—তুই কামচণ্ডালী, তোর বাড়া ছিনাল আর নেই।

এসব উদ্ধৃতি ও অনুবাদের সাহায্যে আমরা চর্যাকারদের তত্ত্বকথা না বুঝলেও তাদের ভাব-জগৎ কতকটা বুঝতে পারি। তারও অপেক্ষা আমরা বুঝতে যা সহজেই পারি তা হচ্ছে, অতি সামান্য ভাবে হলেও সেদিনের বাঙালী জীবনযাত্রার কথা এবং সিদ্ধাচার্যদের রীতিনীতি আচার বা ক্রিয়া-পদ্ধতির কথা,—উচ্চবর্গের শাস্ত্রে এসবের উল্লেখও থাকে না। কিন্তু চর্যাপদে আমরা দেখি—সরহ ও কাহ্নের মত সিদ্ধা ও পণ্ডিতেরা নিম্নবর্ণের ঘৃণিত ডোম-চণ্ডালের কাছ থেকে এই শাস্ত্র-বহির্ভূত "সহজ জ্ঞান" আহরণ করতেন। হাড়ি-পা'র মত কোনো কোনো সিদ্ধারা সত্যই হয়ত ছিলেন নিম্নবর্ণের,—তান্ত্রিক আচারে জাতবর্ণের কোনো গুরুত্ব নেই। এমন কি, বিবাহ ও যৌন-বন্ধনও একটু শিথিল,—সিদ্ধাচার্যদের চর্যাগুলিতেও তার আভাস আছে। একথা কি মনে হয় না—শাস্ত্রকাররা যতই গুরুগম্ভীর শাস্ত্র-নিয়ম করুন, বাঙলার প্রাকৃত-জনের জীবন ও নীতিবোধ এরূপ সহজ বা স্বাভাবিক ও

শিথিল ধরণেরই ছিল, এবং বাঙ্‌লা সাহিত্য পণ্ডিতদের ঘরে জন্মায় নি, জন্মেছে লোক-গুরুদের হাতে লোক-জীবনের বুকে ?

কাব্যগুণঃ এ কথা বলাও বাহুল্য, সিদ্ধাচার্যরা কাব্যচর্চা করবার জন্য চর্যাপদ লেখেন নি ; কাজেই, কাব্যরস চর্যাপদে মুখ্যবস্তু নয়। অতএব, বিশুদ্ধ সাহিত্য যাঁরা চান, চর্যাপদ তাঁদের বিচারে শুষ্ক। কিন্তু বাস্তব জীবনের নানা চিত্রের ক্ষণিক উদ্ভাসে এবং মানুষের মনের ও প্রাণের আকস্মিক এক-আধটু আত্মপ্রকাশে এক-একটি চর্যায় মাঝে-মাঝে সত্যই রসসৃষ্টি হয়েছে। তা ছাড়া শব্দ, উপমা, উৎপ্রেক্ষা এবং কথার আশ্চর্য সংযম চর্যাগুলিকে একটি সংহত রূপ দান করেছে। বাঙালীর বাগ্‌বাহুল্য-ভরা কাব্যে পরবর্তী কালে এ গুণ দুষ্প্রাপ্য হয়ে ওঠে।

প্রাচীন বাঙ্‌লা সাহিত্যের রূপঃ 'পদ' ও 'মঙ্গলকাব্য'ঃ চর্যাগীতি বাঙ্‌লা 'পদে'র বা পদাবলী সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙ্‌লা সাহিত্যের মোটের উপর ছিল দু'টি প্রধান কাব্যরূপ—'পদ' (বা খণ্ড কবিতা) যাকে বলা যায় 'লিরিক'; ও 'মঙ্গল' কাব্য (বা 'বিজয়' কাব্য) যাকে বলা যায় 'ন্যারেটিভ' বা আখ্যান-মূলক কবিতা। পদ-সাহিত্য হল গাইবার মতো গীতি-কবিতা, ভাব ও অনুভূতির কথা ; মঙ্গলকাব্য সুর করে শোনাবার বা গাইবার মতো কথাকবিতা। মনে রাখা প্রয়োজন—সেদিন সব কবিতাই সুর করে পড়া হত, এখনো হিন্দীতে তার চল রয়েছে। কিন্তু মাইকেল মধুসূদন দত্তের (১৮২৪-১৮৭৫) পর থেকে বাঙ্‌লায় আর কবিতা সুর করে পড়া হয় না। প্রাচীন 'পদ' কিন্তু তালমান দিয়ে গীত হত। আর মঙ্গলকাব্য প্রভৃতি আখ্যানও 'পাঁচালী'র মতো গান করা হত। পাঁচালী ছিল আখ্যান-বিবৃতির সাধারণ পদ্ধতি। 'পাঁচালী' গানে একজন থাকত প্রধান গায়েন, আর অন্তত একজন তার দোহার। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে বাজনার ব্যবস্থাও থাকত। মাঝে মাঝে নৃত্যও থাকত। সেদিন অবশ্য নাটকও ছিল তা দেখেছি ;—কিন্তু সে নাটক ছিল গীত-প্রধান ও নৃত্য-প্রধান। নাট্যাভিনয়ে এইরকম গীত গান করে বা সুর করেই কথার আদানপ্রদান চলত প্রধানত একই কালে দুজনের মধ্যে ;—নাটকেও মোট তিনজনের বেশি অভিনয় করত না।

কিন্তু যা লক্ষণীয় তা এই যে, প্রথমাবধিই দেখি বাঙালী মনের ঝোঁক ছিল এই পদ-সাহিত্য বা গীতি-কবিতার দিকে। চর্যাপদ তারই প্রমাণ। প্রাচীন

বাঙ্‌লায় চর্যাপদ ছাড়াও হিন্দু, শৈব ও বৈষ্ণব পদও নিশ্চয়ই ছিল,—জয়দেব ও অন্যান্য সংস্কৃত বা অবহট্‌ঠ কাব্য-রচয়িতাদের রচনা থেকে তা অনুমান করা যায়। কিন্তু সেসব পদ আমরা পাই নি। তেমনি একথাও অনুমান করা চলে যে পরবর্তী মঙ্গল-কাব্যের যা কথাবস্তু—যেমন ধর্ম-মঙ্গলের লাউসেনের কথা, চণ্ডী-মঙ্গলের কালকেতুর কথা, মনসা-মঙ্গলের লখিন্দর-বেহুলার কথা—এ সময়ে লোক-সমাজে নিশ্চয়ই পাঁচালী করে তা গাওয়া হত। এসব কথা ও আখ্যানবস্তু তখনো একেবারে পূর্ণাঙ্গ হয়ে না উঠলেও সাধারণ লোকের মধ্যে যে প্রচলিত ছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মঙ্গলকাব্যের সেই সব কথা ও কাহিনীই হল বাঙলা সাহিত্য বাঙালীর নিজস্ব বাঙ্‌লা বিষয়—হিন্দ্‌-আর্য সভ্যতা থেকে ধার করা বিষয় নয়। কিন্তু প্রাচীন যুগের বাঙ্‌লা সাহিত্যে সেই বাঙ্‌লা বিষয়ের কোনো দৃষ্টান্ত আমরা পাই নি; অত পুরাতন 'মঙ্গল কাব্য', 'বিজয় কাব্য' বা 'পাঁচালী' পাওয়া যায় না।

'ডাক', 'খনার বচন'ঃ 'চর্যাপদ' ছাড়া প্রাচীন যুগের বাঙ্‌লা সাহিত্যের কোনো নিদর্শনই আর নেই। এ জন্যই মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর এই পুঁথি আবিষ্কার ও প্রকাশ বাঙ্‌লা সাহিত্যের ইতিহাসে একটা মহৎ ঘটনা—তাতে একটা যুগ আবিষ্কৃত হয়ে পড়ল। 'খনার বচন' ও কিছু কিছু 'প্রবাদ-প্রবচন' অবশ্য বিষয়বস্তু হিসাবে পুরাতন; কিন্তু মঙ্গলকাব্যের মতই তাদেরও প্রাচীন নমুনা আমাদের হাতে বেশি নেই।

প্রবাদ, ছড়াঃ চর্যাপদে অন্তত ছয়টি প্রবাদ-বাক্য পাওয়া যায়, যেমন, 'আপনা মাসেঁ হরিণা বৈরী' (ভুসুকু); 'বর শুণ গোহালী কি সো দুঠ্‌ঠু বলন্দে' (সরহ), 'দুহিল দুধু নাহি বেণ্টে সামাঅ'। ডাক্তার সুশীলকুমার দে 'বাঙ্‌লা প্রবাদে'র বিস্তৃত বিচারে পরবর্তী বাঙ্‌লা সাহিত্য থেকেও বহু প্রবাদের দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করেছেন। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়:—"যেমন গানে, উপাখ্যানে, মঙ্গলকাব্যে, তেমনই প্রবাদের মধ্যেও বাঙালীর বাঙালীয়ানা নানা রূপে নানা ভঙ্গীতে ফুটিয়া উঠিয়াছে;···ইহার রসপ্রেরণা আসিয়াছে দেশের আলো জল বায়ু হইতে, জাতির জীবিত চেতনা হইতে। উচ্চ ভাবুকতা ও কল্পনা ব্যতিরেকেও এগুলি রসসম্পৃক্ত হইয়া উঠে" (বাঙ্‌লা প্রবাদ, ২য় সং)। এ সব প্রবাদকে তাই সাহিত্য না বললেও সাহিত্য-গোত্রীয় বলা চলে। অবশ্য প্রবাদের অপেক্ষাও ছড়া সাহিত্যের নিকটতর আত্মীয়। তারও প্রাচীনতম নিদর্শন আমরা পাই নি। অবশ্য বাঙ্‌লা ছড়ার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের গভীর ও সরস

বিচারের পরে বাঙলা ছড়াকে আর সাহিত্য-ক্ষেত্রে কারও অপাঙ্‌ক্তেয় করার সাধ্য নেই। ছড়ার জগৎ জগতের টুক্‌রো বা টুক্‌রোর জগৎ। প্রবাদের জগৎও তাই। তাতে করে বাঙালী মনের আর একটা বিশেষ দিকের পরিচয় আমরা পাই—চর্যাপদে যার চিহ্নও নেই: "যাহা অস্ফুট ও অতীন্দ্রিয় তাহা নহে, যাহা প্রাকৃত ও প্রত্যক্ষ, বাঙালীর সেই রস-জীবনই এগুলিতে (প্রবাদে) রূপান্তরিত হইয়াছে" (ডঃ দে—বাঙলা প্রবাদ)। চর্যাপদ একটা মণ্ডলীগত সাধন-রহস্যের গান। তাতে বস্তুবাদী, রসিকতাপ্রিয়, বাঙালীর পরিচয়, তার জীবনের বাস্তব চিত্র তাই আসবে কোথা থেকে? কিন্তু এই বস্তুনিষ্ঠাও যে বাঙালীর স্বভাববিরোধী নয় তা বাঙালীর লেখা সংস্কৃত ও অবহট্‌ঠ কবিতা থেকে, পরবর্তী মঙ্গলকাব্য থেকেও নানা ছড়া-প্রবাদ থেকে প্রমাণিত হয়। তবে এই বুদ্ধিবাদী, রসিকতাপ্রিয়, বাস্তব-নিষ্ঠ বাঙালী মনের পরিচয় পাব,—এমন প্রাচীন সাহিত্য টিকে নেই।

প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যের এত কম নিদর্শন যে আমরা পাচ্ছি তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। মনে রাখা উচিত—আধুনিক ইউরোপের অনেক ভাষারই এতদিনকার পুরাতন সাহিত্য-নিদর্শন নেই। তা ছাড়া বাঙলা ভাষা তখনো উচ্চবর্গের বাঙালীদের নিকট খুব আদরণীয় ভাষা হয়ে ওঠে নি। খাঁটি বাঙলা বিষয়বস্তু তাঁদের নিকট সম্ভবত তুচ্ছই ঠেকত। ক্রমে অবশ্য এই পণ্ডিত ও উচ্চবর্গের লোকেরা বাঙলায়ও সাহিত্য রচনায় উদ্যোগী হলেন। কিন্তু তার পূর্বে বাঙলা দেশের বুকের উপর দিয়ে তুর্ক-বিজয়ের প্লাবন বয়ে গিয়েছে—সেই হিন্দু উচ্চবর্গ তখন নিজেদের শাসক-মর্যাদা হারিয়ে নিজেরাই অনেকখানি শাসিতের পর্যায়ে নেমে যেতে বাধ্য হয়েছেন। এই অধিকার-লোপের পূর্বে বাঙলা ভাষা ছিল লোক-সাধারণের সাহিত্যের ভাষা,—সে সাহিত্য মুখে মুখে চলত, জনতার সাহিত্য হিসাবে।

দ্বিতীয় পর্ব

মধ্যযুগ : প্রাক্-চৈতন্য পর্ব

(খ্রীষ্টাব্দ ১২০০—খ্রীষ্টাব্দ ১৫০০)

প্রথম পরিচ্ছেদ

তুর্ক-বিজয়

তুর্ক-বিজয়ের স্বরূপ—খ্রীষ্টীয় ১২০০ অব্দ শেষ হতে না হতেই বাঙলার ওপরে তুর্কী আক্রমণের ঝড় বয়ে গেল। সম্ভবত তখন খ্রীঃ ১২০২ অব্দ।* দিল্লীতে তখন তুর্ক-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত। মগধ জয় ও বিধ্বস্ত করে পশ্চিমবঙ্গ অধিকার করতে তুর্কদের বিলম্ব হল না। রাজা লক্ষ্মণ সেন অবশ্য পূর্ববঙ্গে পলায়ন করেন; বহু রাজপুরুষ ও বিদ্বজ্জনও তাঁর সহগামী হন। আরও অনেকে হিন্দু ও বৌদ্ধ পণ্ডিত নেপালে আশ্রয় গ্রহণ করেন। উত্তরবঙ্গ থেকেও অনেকে চলে যান 'উদ্বাস্তু' হয়ে কামতা-কামরূপ অঞ্চলে। এ সব অঞ্চলে তাই প্রাচীন বাঙলার শিল্প ও সংস্কৃতির ধারা কতকাংশে রক্ষা পেয়েছিল। এমন কি, নেপাল থেকে বাঙলার সেই ধারা হিমালয় পার হয়ে তিব্বতে এবং চীনেও পৌঁছেছিল। পূর্ববঙ্গে নদীনালার পরিবেষ্টনে সেন, বর্মন প্রভৃতি ছোটবড় স্থানীয় রাজারাও আরও একশত বৎসর তুর্ক আক্রমণ ঠেকিয়ে রাখতে পেরেছিল। সেখান থেকেও আরাকানের পথে উত্তর বর্মার সঙ্গে বাঙলার সংস্কৃতির আদান-প্রদান চলত।

---

* মধ্যযুগ বলতে ভারতের ইতিহাসে সাধারণ ভাবে বোঝায় 'মুসলমান রাজত্বকাল' (খ্রীঃ ১২০৬ থেকে খ্রীঃ ১৭৬৫ পর্যন্ত; বা স্থূলভাবে খ্রীঃ ১২০০ থেকে খ্রীঃ ১৮০০)। মধ্যযুগ এক হিসাবে হর্ষবর্ধনের পরেই (খ্রীঃ ৬৪৭) আরম্ভ হয়। তখন থেকে খ্রীঃ ১১৯২ পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ কালকে প্রাচীন ও মধ্যযুগের 'যুগসন্ধিকাল' বলাই উচিত। ইতিহাসের বিচারে বাঙলায় মধ্যযুগও অনুরূপ, কিন্তু বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের হিসাবে খ্রীঃ ১২০০ থেকে 'মধ্যযুগে'র সূচনা,—তার ভেতরে খ্রীঃ ১২০০ থেকে খ্রীঃ ১৩৫০ এই দুর্যোগের কালকে বলা চলে 'যুগসন্ধিকাল'।

একটা কথা: সচরাচর 'মধ্যযুগ' বলতেই 'সামন্ত সমাজে'র কাল বোঝায়। কিন্তু ভারতে সামন্ত যুগের সূচনা হয়েছিল সম্ভবত কুশান রাজত্বে (খ্রীঃ ৩০০—খ্রীঃ ৫০০), তার প্রসার রাজপুত রাজাদের রাজত্বে (মোটের উপর খ্রীঃ ৭০০—খ্রীঃ ১২০০); এবং তুর্ক বিজয়ে (খ্রীঃ ১২০০) তা নবায়িত হয়। এর প্রথমার্ধ শেষ হলে (খ্রীঃ ১৫২৬), মোগল রাজত্বের শেষ দিকে খ্রীঃ ১৭০০ থেকে) সামন্তবাদী সমাজের ক্ষয় প্রকট হয়ে ওঠে। তবু তা চলে আরও একশত বৎসর (খ্রীঃ ১৮০০)। তারপরেও ব্রিটিশ শাসনে সামন্ততন্ত্র একেবারে শেষ হয় নি; একটা 'ঔপনিবেশিক' সমাজ-ব্যবস্থা চলতে থাকে। এখন (১৯৪৭-এর পরে) তা পরিবর্তিত হচ্ছে।

কিন্তু তুর্ক আক্রমণের ফলে বিহারে ও মধ্যপশ্চিম বাঙ্‌লায় চল্‌ল ধ্বংসের তাণ্ডব লীলা। তুর্করা নিজেরা ছিল দুর্ধর্ষ, ভয়ঙ্কর জাতি : ইস্‌লাম গ্রহণ করায় তাদের নৃশংসতা ও ধ্বংস-প্রবৃত্তি নতুন ধর্মোম্মাদনার বশে আরও উগ্র হয়ে উঠেছিল। যা মুসলমান ধর্মে নেই তাই তাদের চক্ষে ছিল ভ্রান্ত। হিন্দু ও বৌদ্ধদের দেবদেবী, শাস্ত্র, শিল্পকলা, সংস্কৃতি সবই তাদের বিচারে ছিল 'কুফেরি'। কাজেই প্রথম দিকে যেখানেই তারা বিজয়ী হয়েছিল সেখানেই তারা রক্তে ও আগুনে প্রাচীন সংস্কৃতির চিহ্ন বিলুপ্ত করতে দ্বিধাবোধ করে নি। তাই বিহার বিধ্বস্ত করার বিবরণ তাদের ঐতিহাসিকরাও সগর্বেই উল্লেখ করে গিয়েছেন। হয়তো তাতে অনেক অতিশয়োক্তি আছে, কিন্তু মোটের ওপর তুর্ক আক্রমণের তা'ই ছিল সাধারণ রূপ।

মধ্যযুগের ধর্ম-প্রাধান্য—দু'একটি কথা প্রসঙ্গত তবু মনে রাখা উচিত :—শুধু তুর্ক, বা সাধারণ ভাবে মুসলমান বিজেতারাই নয়, মধ্যযুগ পর্যন্ত প্রায় সকল দেশের সকল বিজেতারাই এরূপ 'ধর্মোম্মাদ' ছিল। সেকালে ধর্মই ছিল জীবনযাত্রার প্রধানতম পরিচায়ক। ধর্মের সঙ্গেই জড়িয়ে থাকত অর্থনীতি, রাজনীতি, প্রভৃতি অন্যান্য কর্ম ও তত্ত্ব,—সাহিত্য শিল্প প্রভৃতির তো কথাই নেই। আর সামন্ত-যুগ পর্যন্ত রাজার ধর্মই ছিল প্রজাসাধারণের ধর্ম ;—সাধারণ মানুষের না ছিল ভূমিতে নিজস্ব অধিকার, না ছিল স্বতন্ত্র ধর্মাধিকার। মধ্যযুগের শেষেও খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী বিজয়ী স্পেনীয়রা পেরুতে মেক্‌সিকোতে, ওলন্দাজরা (বুয়র) আফ্রিকায় মধ্যযুগের মুসলমান বিজেতাদের চেয়ে কম নৃশংসতার বা কম বর্বরতার পরিচয় দেয় নি। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে বরং বিজয়ী মুসলমানরা সামরিক ও রাজনৈতিক জয়লাভই করেছে, সামাজিক ও ধর্মগত জয় সম্পূর্ণ করতে পারে নি। কিন্তু অন্যত্র দেখতে পাই—বিজয়ী মুসলমান যে দেশেই রাজত্ব করেছে সেখানকার অধিবাসীরাই অনতিবিলম্বে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছে। অথচ পাঁচশত বৎসর ভারতবর্ষে মুসলমান সম্রাট্‌ ও রাজারা রাজত্ব করলেন ; তথাপি হিন্দুজাতি ও হিন্দুধর্ম নিশ্চিহ্ন হওয়া তো দূরের কথা, ভারতভূমিতে শতকরা ত্রিশটি মানুষও মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করল না ;—ইতিহাসে এ একটা আশ্চর্য ব্যতিক্রম।

ভারতে মুসলমান-প্রাধান্য ও মুসল্‌মান ধর্ম—এ ব্যতিক্রমের প্রধান কারণ এই যে, ভারতবর্ষ প্রথমত জন-বহুল, দ্বিতীয়ত প্রায় একটা মহাদেশ। মধ্যযুগের যোগাযোগ ব্যবস্থায় এই শতসহস্র পল্লীকে প্রদক্ষিণ করতেই

দীর্ঘকাল লাগত ; তা ধ্বংস করা তো ছিল প্রায় অসম্ভব। তৃতীয়ত, শুধু সহর বা রাজার পরাজয়ে ভারতের বিচ্ছিন্ন, স্ব-সম্পূর্ণ পল্লীসমাজ ও পল্লী-সভ্যতা সম্পূর্ণ পরাহত হত না। চতুর্থত, ভারতবর্ষ একটা সহন-পটু ও গ্রহণ-পটু বিচিত্র সভ্যতার দেশ। পরাজয় স্বীকার করেও ভারতবাসী তার 'বেতসী-বৃত্তি'র গুণে যেমন টিকে থাকত, তেমনি রাজনৈতিক পরাধীনতা সত্ত্বেও আপন সভ্যতার ও সংস্কৃতির একটা প্রতিরোধ রচনা করতে সক্ষম হত। আর শেষ কথা, এসব কারণে বিধর্মী, বিজাতীয় বিজেতারা এ জাতিকে ধর্মান্তরিত করবার এবং এ-দেশের ধর্ম ও সংস্কৃতিকে নিশ্চিহ্ন করবার আগেই এদেশে বসবাস করতে আরম্ভ করল ; সেই সূত্রে তারা এ দেশবাসীর সঙ্গে নানা সম্পর্কে জড়িত হল ; এদেশেই বিবাহাদি করল, সামাজিক আদান-প্রদান চলল ক্রমে তারা এ দেশের মানুষ বনে গেল। বিজেতা ও বিজিত ক্রমেই পরস্পরের জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতিকেও তাই স্বীকার করে নিল। প্রভেদ অবশ্য রইল, কিন্তু সংস্কৃতির বিরোধ আর তেমন উগ্র রইল না। সমন্বয় ঘটে নি, কিন্তু সংমিশ্রণ ঘটেছে নানা দিকে। বিভেদ বরাবর ছিল, কিন্তু বিরোধ কোথাও বরাবর ছিল না।

সংঘাত, প্রতিরোধ, সংযোগ—তুর্ক বিজয়ের এই সাধারণ হিসাব যেমন ভারতের ক্ষেত্রে তেমনি বাঙলার ক্ষেত্রেও যথাযথ পাওয়া যায়। মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যেও আমরা এই সংঘাত, প্রতিরোধ ও সংযোগের সংকেত আবিষ্কার করতে পারি। কারণ, 'সাহিত্য' লিখব বলে তখন কেউ সাহিত্য রচনা করত না, তা রচনা করত সামাজিক কোনো উদ্দেশ্য বা প্রয়োজনের তাগিদে। আর একথাও আবার স্মরণীয়—তখন পর্যন্ত ধর্মই ছিল সমাজের প্রধানতম পরিচয়। ধর্মের সেই প্রধান গুরুত্ব কিছুমাত্র খর্ব না করেও বোঝা দরকার যে, ধর্মের নানা কথা ও কাহিনীর আকারে ও আবরণে প্রকাশ লাভ করেছে সেদিনের মানুষের ধ্যান-ধারণা, বেদনা-আনন্দ ; আর তারও অন্তর্নিহিত সামাজিক ঘাত-প্রতিঘাত, বর্গ-বৈষম্য, বর্গ-বিরোধ এবং বর্গে বর্গে আপোষ-রক্ষা।

রাজনৈতিক পটভূমি (খ্রীঃ ১২০০ থেকে খ্রীঃ ১৫০০)

তুর্কী-বিজয়ের প্রথম পর্বটা ছিল ধ্বংসের পর্ব। মোটামুটি খ্রীঃ ১২০০ থেকে খ্রীঃ ১৩৫০—এই দেড়শ বৎসরের বাঙলা দেশের কোনো সাংস্কৃতিক বা

সামাজিক চিত্র আমরা পাই না, সার্ধ শতাব্দী জোড়া এই নিস্তব্ধতাই তুর্ক-বিজয়ের ভয়াবহতার একটা প্রমাণ। বাঙলা দেশে এই খ্রীঃ ১২০০—খ্রীঃ ১৩৫০এর মধ্যে খিলজী, তুঘলুক (খ্রীঃ ১২২৭ থেকে খ্রীঃ ১২৮৭) ও বল্‌বনী শাসক বংশের (খ্রীঃ ১২৮৬ থেকে খ্রীঃ ১৩২৮) উত্থান-পতন ঘটল ;—তুর্ক রাজত্ব বল্‌বনী বংশের আমলে লক্ষ্মণাবতী (উত্তরবঙ্গ), সপ্তগ্রাম (মধ্যপশ্চিমবঙ্গ), সোনারগাঁও (মধ্যপূর্ববঙ্গ) ও চট্টগ্রামকে (পূর্ববঙ্গ) কেন্দ্র করে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। সুফী ফকির দরবেশ ও গাজীরা তখন থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে এসে নববিজিত ভূমিতে ইস্‌লাম বিস্তারের চেষ্টা করতে লাগল। লুণ্ঠন ও ধ্বংস অপেক্ষা ধর্মপ্রচার ও আধ্যাত্মিক বিচারই হতে থাকে রাজ্যবিস্তারের প্রধান অঙ্গ। কিন্তু তুর্ক অধিকার তখনো সর্বত্র পরিব্যাপ্ত নয়, আর লক্ষ্মণাবতী সোনারগাঁ প্রভৃতি কেন্দ্রের তুর্ক শাসকদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ, পরস্পর-পরস্পরে হানাহানি লেগেই থাকে। এ অবস্থার অবসান ঘটে সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ্-এর রাজ্যলাভে (খ্রীঃ ১৩৪২—খ্রীঃ ১৩৫৭)। তিনি বাঙলা দেশে স্বাধীন রাজত্ব স্থাপন করেন। ধ্বংসের যুগ কেটে তখন আসতে থাকে স্বস্তির যুগ। নিঃশ্বাস ফেলবার অবকাশ পায় দেশ। দুর্ভাগ্যবশতঃ ইলিয়াস শাহী বংশও ক্রমে বিলাসে, আয়েসে ও আরামে ঝিমুতে থাকে। সম্ভবত তাতে হিন্দু সমাজ আপনাকে নূতন করে সংগঠন করবার সুযোগলাভ করে। এমন কি, একজন হিন্দু রাজাও (খ্রীঃ ১৪১৮) রাজ্যলাভ করলেন—মুসলমান ঐতিহাসিকেরা তাঁকে উল্লেখ করেছেন 'কন্‌স্' বলে। তা থেকে ঐতিহাসিকরা স্থির করেন এ নাম 'গণেশ' ; তিনিই 'দনুজমর্দনদেব'। অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অভিমত এই যে, হয়ত আসলে 'কন্‌স্' শব্দটি হচ্ছে 'কোঁচ' ; সম্ভবত কোঁচ পাইকদের জোরেই এই কোঁচ-নেতা ক্ষমতা লাভ করেছিলেন। বরেন্দ্রীয় কৈবর্ত অভ্যুদয়ের মতোই এও একটি উপজাতির অভ্যুদয়ের সংকেত। কবি কৃত্তিবাসের প্রসঙ্গে হিন্দুরাজার অনুসন্ধান করতে হয় বলে, রাজা 'গণেশে'র কথা বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে আলোচ্য হয়ে ওঠে। যাই হোক, এই রাজার পুত্র 'যদু' আবার মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে জালালুদ্দীন নামে রাজত্ব করেন (আনুমানিক খ্রীঃ ১৪১৮—১৪৩১)। ভারতের প্রায় সর্বত্র শাসকবর্গের ধর্ম তখন ইস্‌লাম। তাই ক্ষমতাসম্পন্ন মুসলমান সামন্ত-বর্গকে এভাবে স্বপক্ষে না পেলে গণেশের বা যদুর পক্ষে রাজ্যরক্ষাও হয়তো সম্ভবপর হত

না। হিন্দুসমাজে যদু চাইলেও পুনঃপ্রবেশ করতে পারেন নি। সম্ভবত. জালালুদ্দীনের গোঁড়ামিও কম ছিল না—ধর্মত্যাগীদের তাও একটা বৈশিষ্ট্য। কিন্তু তবু এ হল বাঙালী মুসলমানের রাজত্ব। তাই বৃহস্পতি মহিত্তার মত কবি ও পণ্ডিতদের তিনি যথেষ্ট সমাদর করতেন। অবশ্য এ রাজবংশ বেশি দিন টেকে নি। আবার (খ্রীঃ ১৪৪২—১৪৮৭ পর্যন্ত) ইলিয়াস শাহী বংশই রাজত্ব করে। তারাও পুরুষানুক্রমে 'বাঙালীরই রাজা' হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এর পরে এল হাব্সী পাইকদের অরাজকতার কাল।* খ্রীঃ ১৪৮৭—১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত গৌড়ের সিংহাসন নিয়ে এদের জুয়াখেলা চলে। আর তা শেষ হয় ১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দে হুসেন শাহ্-এর রাজ্যাধিকারে।

মধ্যযুগের বাঙ্লায় হুসেন শাহ্ (খ্রীঃ ১৪৯৩—১৫১৯) ও তাঁর পুত্র নুসরৎ শাহের (খ্রীঃ ১৫১৯—১৫৩২) তুলনা নেই। সম্ভবতঃ হুসেন শাহ্ ছিলেন আরব, মক্কার শরীফ্-বংশ-সম্ভূত। হিন্দুদের প্রতিও প্রথম দিকে তিনি হয়তো বিরূপই ছিলেন। কিন্তু মধ্যযুগের বাঙ্লা সাহিত্য তাঁর ও তাঁর পুত্রের প্রশংসায় মুখর। বাঙালী সমাজ ও সংস্কৃতি তার পূর্বেই (আনুমানিক খ্রীঃ ১৩৫০—১৪৫০-এর মধ্যে) আপনাকে অনেকটা সংহত করে নিয়েছিল; হুসেনশাহী রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় এবার তাই বাঙ্লা সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়ে উঠ্ল। তাই পরে আফ্‌ঘানী সুলতান (খ্রীঃ ১৫৫৩—১৫৭৫) বা মুঘল বাদশাহদের (খ্রীঃ ১৫৭৫—১৭৫৭) কালেও তার গতি অব্যাহত রইল।

যুগসন্ধিকাল ঃ কিন্তু খ্রীঃ ১২০০ থেকে খ্রীঃ ১৩৫০ কেন, খ্রীঃ ১৪৫০ অব্দ পর্যন্ত বাঙ্লার জীবন ও সংস্কৃতি তুর্ক আঘাতে ও সংঘাতে, ধ্বংসে ও অরাজকতায় মূর্ছিত অবসন্ন হয়ে ছিল। খুব সম্ভব, সে সময়ে কেউ কিছু সৃষ্টি করবার মত প্রেরণাই পায় নি। অন্তত বাঙ্লা ভাষায় যদি তখন কিছু লেখা হয়েও থাকে তার একটি ছত্রও আমাদেব হাতে এসে পৌঁছয় নি। বাঙ্লা ছাড়া অন্য ভাষায় লেখা যা হয়েছে, তাও সামান্য। এই সন্ধিযুগের বাঙ্লা সাহিত্যের ইতিহাস হচ্ছে তাই সাহিত্য-শূন্যতার ইতিহাস। এমন কি, তুর্ক ধ্বংসলীলার যে চিত্র আমরা বাঙ্লা সাহিত্যে পাই তাও অপ্রচুর; এবং যা পাই তাও পরবর্তী কালের রচিত, স্মৃতি থেকে সংগৃহীত।

---

* হাবসী পাইকরা 'দাস' ছিল। কিন্তু এদের এই বিদ্রোহকে রোমের ইতিহাসের 'দাস বিদ্রোহের' সঙ্গে তুলনা করা ঠিক নয়। তুলনা করতে হলে করতে হয় রোম-সাম্রাজ্যের প্রিটোরিয়ান গার্ডসদের রাজা-রাজ্য নিয়ে জুয়াখেলার সঙ্গে।

ধ্বংস-চিত্র ঃ তুর্কী আক্রমণের ধ্বংস-চিত্র হিসাবে বাঙ্‌লা ভাষায় একটি নমুনা প্রায়ই উল্লেখিত হয় ; সেটি 'শূন্যপুরাণে'র অন্তর্গত 'নিরঞ্জনের রুষ্মা' নামক একটি কবিতা-অংশ : সে অংশটুকু বেশ কৌতুককর। অনুমান করা হয়, এ হচ্ছে চতুর্দশ শতকে ওড়িষ্যার কোণারক নগর ধ্বংসের কথা। বৌদ্ধদের প্রতি ব্রাহ্মণেরা অত্যাচার করাতে নিরঞ্জন রুষ্ট হয়ে ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে দেবতাদের যুদ্ধে নিয়োজিত করলেন,—দেবতারা এলেন মুসলমান-রূপে,—এই৷ হল সেই অংশের বক্তব্য।

বেদ করি উচ্চারণ বেরায় অগ্নি ঘনে ঘন
দেখিয়া সভাই কম্পমান।
মনেতে পাইয়া মর্ম সভে বোলে রাখ ধর্ম
তোমা বিনে কে করে পরিত্রাণ।
এইরূপে দ্বিজগণ করে সৃষ্টি সংহরণ
এ বড় হইল অবিচার।

এইখান থেকে বর্ণনাটি উপভোগ্য :

অন্তরে জানিয়া মর্ম বৈকুণ্ঠে থাকিয়া ধর্ম
মায়ারূপী হইল খোন্দ্‌কার।
হইয়া যবন রূপী শিরে পরে কাল টুপি
হাতে শোভে ত্রিকচ কামান।
চাপিয়া উত্তম হয় ত্রিভুবনে লাগে ভয়
খোদায় বলিয়া একনাম।
নিরঞ্জন নিরাকার হইল ভেস্ত অবতার
মুখেতে বলয়ে দম্বদার।
যতেক দেবতাগণ সভে হয়্যা একমন
আনন্দেতে পরিল ইজার।
ব্রহ্মা হইল মহামদ বিষ্ণু হইলা পেগাম্বর
আদম হইল শূলপাণি।
গণেশ হইল কাজী কার্ত্তিক হইল গাজী
ফকির হইল যত মুনি।

তেজিয়া আপন ভেক নারদ হইল শেখ
পুরন্দর হইল মৌলানা।
চন্দ্র সূর্য আদি দেবে পদাতিক হয়্যা সেবে
সভে মেলি বাজায় বাজনা।
দেখিয়ে চণ্ডিকা দেবী তিহ হৈল হায়া বিবি
পদ্মাবতী হৈল বিবি নুর।
যতেক দেবতাগণ করিল দারুণ পণ
প্রবেশ করিল জাজপুর।
দেউল দোহারা ভাঙ্গে কাড়্যা কিড়্যা খায় রঙ্গে
পাখড় পাখড় বলে বোল।
ধরিয়া ধর্মের পায় পণ্ডিত রামাঞি গায়
এ বড় বিষম গণ্ডগোল।

'গণ্ডগোল'টা কিরূপ তা পরে ('শূন্যপুরাণে') উল্লেখিত হয়েছে—মূলত তা ফিরূজ শাহ্ তুঘ্লকের কোণারক ধ্বংসের কথা (ডাঃ সেন—বাঃ সাঃ ইতিহাস),—'শূন্যপুরাণ' কিন্তু অত পুরানো নয়, মাত্র ১৭ শতকের রচনা।

ব্রাহ্মণের জাতিধ্বংস হেতু নিরঞ্জন
সাম্বাইল জাজপুরে হইয়া যবন।
দেউল দোহারা ভাঙ্গে গো-হাড়ের ঘায়
হাতে পুঁথি কর‍্যা যত দেয়াসী পালায়।
ভালের তিলক যত পুঁছিয়া ফেলিল
ধর্মের গাজনে ভাই যবন আইল।
দেউল দোহারা যত ছিল ঠাঁই ঠাঁই
ভগ্ন করি পাড়ে তারে না মানে দোহাই।

'শূন্যপুরাণে'র অন্তর্গত ধর্মের গাজনের এই শেষ দিনকার কাহিনী 'ঘর-ভাঙ্গার পালা', একে বলে 'বড় জালালি'। এটা তুর্ক বিজয়ীদের ধ্বংসলীলারই কথা,—এ কথা প্রায় সর্ব-স্বীকৃত।

এরূপ চিত্রই মিথিলার কবি বিদ্যাপতির 'কীর্তিলতা'য়ও আমরা লাভ করি। বিদ্যাপতি অবশ্য মিথিলার মানুষ, তবে মিথিলা ও বাঙ্লায় তখন মনের দূরত্ব সামান্য;—কৃষ্ণলীলার বিদ্যাপতি তো বাঙ্লারও কবি বলে

পূজো পেয়েছেন। কিন্তু 'কীর্তিলতা' অবহট্‌ঠতে লেখা; তার রচনাকাল খ্রীঃ ১৪০০—খ্রীঃ ১৪৫০; 'কীর্তিলতা'ও সত্যকারের কবির রচনা। তা থেকে আমরা জানি সেই ১৫ শতকেও, হিন্দুর পাশাপাশি দুই বা আড়াই শত বৎসর বাস করেও, হিন্দুর প্রতি তুর্করা কিরূপ অত্যাচারী ছিল—পথে যেতে যেতে হিন্দুকে তুর্ক বেগার ধরে; ব্রাহ্মণের ছেলেকে দিয়ে গোমাংস বহন করায়; তার পৈতে ছিঁড়ে দেয়, তিলক মুছে ফেলে; রোয়া ধানে মদ চোলাই করে সে খায়, মন্দির ভেঙে মস্‌জিদ বানায়; হাটে তোলা তুলে ফেরে; নীচ বর্গের তুর্কও উচ্চ বর্গের হিন্দুকে যথেচ্ছ অপমান করে; ইত্যাদি।

ধর্ম দিয়েই যে-কালে জাতিরও পরিচয় সেকালে রাজার ধর্ম ও প্রজার ধর্ম যদি এক না হয় তা হলে 'রাজার জাতি' যে 'প্রজার জাতি'র উপর নানা অজুহাতে অত্যাচার করবে, তা জানা কথা। তাই মধ্যযুগের বাঙ্‌লা সাহিত্যে —চৈতন্যদেবের জীবনীতে (বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবতে'), বিজয় গুপ্তের মনসা মঙ্গলে, এমন কি ১৬ শতাব্দীর শেষদিককার রচনা মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গলে' পর্যন্ত,—মুসলমান শাসক-গোষ্ঠীর এরকম নানা অত্যাচারের উল্লেখ পাওয়া যাবে। মধ্যযুগের বাঙ্‌লা সাহিত্যই একটা ব্যাপক অর্থে হচ্ছে এই শাসক-ধর্ম ও শাসক-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে শাসিত-ধর্মের ও শাসিত-সংস্কৃতির প্রতিরোধের সাহিত্য। আমরা পরে তার স্বরূপ বুঝব। কারণ, এই প্রতিরোধেরও তলায়-তলায় ও ভেতরে-ভেতরে আবার জড়িত হয়ে আছে সমাজের নিম্নবর্গের সঙ্গে উচ্চবর্গের সংঘর্ষ, তাদের বিরোধ ও পরস্পরের বোঝাপড়া; আবার, অন্যদিকে লোক-সমাজে ও লোক-সাহিত্যে হিন্দু ও মুসলমান দুই ধর্মাবলম্বী সাধারণ মানুষের মিলন-মিশ্রণ।

'নিরঞ্জনের রুষ্মার' দেবতাদের রূপান্তরের কাহিনীটিও এই হিসাবে প্রণিধানযোগ্য। 'শূন্যপুরাণে'র কবি বৌদ্ধ (?)। তাঁর কথা থেকে বুঝি, তুর্ক আক্রমণের কালে বৌদ্ধরা হিন্দুদের দ্বারা নিপীড়িত হত,—হিন্দুরাই যে তখন রাজার জাত। তাই বিজয়ী তুর্ক যখন হিন্দুর দেব-দেউল ভাঙছে তখন এই বৌদ্ধ লেখক মোটের ওপর তাতে ক্ষুব্ধ হচ্ছেন না, বরং ন্যায়েরই বিধান দেখছেন। এমন কি, তা বৌদ্ধ আদিদেবেরই নির্দেশানুযায়ী ঘটছে বলে লেখক আপনার ধর্মেরই জয় দেখছেন। অবশ্য সম্প্রতি ডঃ সুকুমার সেন এই মত প্রকাশ করেছেন যে, আসলে নিরঞ্জনের রুষ্মার অর্থ তা নয়।

এ হচ্ছে বিজিত মানুষের সাধারণ অদৃষ্টবাদ। ইংরেজ আমলে ইংরেজ বিজেতাদেরও এভাবে দেবতাদের প্রতিরূপ কল্পনা করে স্তুতি করা হত। কিন্তু সমাজের মধ্যে ব্রাহ্মণ্যবাদী ও বৌদ্ধদের দ্বন্দ্ব যে তুর্ক আক্রমণের পূর্বক্ষণে তীব্র ছিল, তা একটা সামাজিক সত্য বলে স্বীকৃত। তার ছায়া কি এই পদ্যাংশে নেই ?

সামাজিক আবর্তন ও বিবর্তন

এই দুর্যোগের যুগটা সাহিত্যে অন্ধকারের যুগ, সমাজে আবর্তনের যুগ। এই আবর্তন অবশ্য শেষ হল প্রায় দেড়শ' বৎসরে ; তার পরেকার দেড়শ' বৎসর ধরে চলল বাঙালী সমাজের বিবর্তন। কারণ, তুর্ক-বিজয়েও ভারতীয় পল্লীসমাজ ভগ্ন হল না, অব্যাহতই রইল। ভারতীয় বর্ণভেদও অক্ষুণ্ণ রইল, জন্মান্তর ও কর্মফলের আধ্যাত্মিক ধারণা বরং দৃঢ় হল। সামাজিক পরিবর্তনের এই মোট রূপটি মনে রাখলে আমরা দেখব মধ্যযুগের সাহিত্য সেই যুগের সামাজিক জীবন ও অধ্যাত্ম-চেতনারই বাহন।

তুর্ক আক্রমণের ফলে প্রধানত যে সামাজিক পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে পড়ল তা সংক্ষেপে এই :

(১) উচ্চ ও নিম্ন বর্গের হিন্দুদের সংযোগ নিকটতর হল।

(২) পরাজিত হিন্দু-সমাজ এক সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ রচনা করে আত্মরক্ষা করতে সচেষ্ট হল ; এবং

(৩) প্রথমে হিন্দু-মুসলমান সাধারণ মানুষের ঐক্যও ক্রমে হিন্দু-মুসলমান উচ্চবর্গের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হলে পর মুসলমান বিজেতারা বাঙালী হয়ে উঠলেন, আর বিদেশীয় রইলেন না।

বর্গ-সংযোগ : তুর্ক-বিজয়ের কাল পর্যন্তও যারা ছিল শাসক, আজ তারা নেমে গেল শাসিতের পর্যায়ে। উল্লেখযোগ্য এই যে, শাসকরা এতদিন পর্যন্ত ছিল ব্রাহ্মণ্যবাদী উচ্চবর্গের। তারা অনেকেই লৌকিকভাবে হিন্দু, কেউ লৌকিকভাবে বৌদ্ধ। কিন্তু আর্যেতর লৌকিক ধর্ম দেব-দেবী, নানা লৌকিক আখ্যান পরিবর্তিত হতে হতেও দেশের জন-সমাজে তখনো চলে আসছে। লখিন্দর-বেহুলা, কালকেতু-ফুল্লরা, ধনপতি-খুল্লনা, লাউসেন-রঞ্জাবতীর উপাখ্যান এবং কৃষ্ণ ও শিবের নামে প্রচলিত বাঙলা দেশের নানা কাহিনীর মূল ছিল লোক-সমাজের এই সব ধর্ম ও কথায়। এতদিন এসব

দেব-দেবী ও তাদের কাহিনী নিম্নবর্গের বিষয় বলে ব্রাহ্মণ্যবাদী উচ্চবর্গের দৃষ্টিতে অবজ্ঞেয় ছিল; তাঁদের চক্ষে শ্রদ্ধেয় ছিল সংস্কৃত শাস্ত্র, পুরাণ, কাব্য প্রভৃতি। কিন্তু তুর্ক আক্রমণে যখন উচ্চবর্গ ক্ষমতাচ্যুত হয়ে এসে গেল নিম্নবর্গের কাছাকাছি, তখন উপরতলার হিন্দুদের মধ্যে ক্রমে নিচের তলার মানুষদের এই মনসা, বনচণ্ডী, চাষীদেবতা শিব ও প্রণয়বিলাসী দেবতা শ্রীকৃষ্ণ এবং তাদের মাহাত্ম্যকেও স্বীকার করে নেবার প্রয়োজন হল। অন্যদিকে নিচের তলার মানুষদের পক্ষেও তখন সুযোগ হল ব্রাহ্মণ্যধর্মকে নিজেদের মধ্যে গ্রহণ করবার—অবশ্য নিজেদের মতো করে, নিজেদের শক্তি অনুযায়ী।

এই বর্গ-সংযোগেরই একটা পরোক্ষ ফল হল এই যে পশ্চিম বাঙলায় বৌদ্ধধর্ম লোপ পেল। তখনো যারা বৌদ্ধ ছিল, তারা ক্রমে হিন্দু সমাজের মধ্যে মিশে গেল। ১৬ শতকে নিত্যানন্দ অবশিষ্ট নেড়া-নেড়ীদেরও বৈষ্ণব মতে দীক্ষিত করে নিলেন। কিন্তু পূর্ববঙ্গে বৌদ্ধরা অপেক্ষাকৃত প্রবল ছিল, তাই তারা তখনো লোপ পায় নি। মুসলমান পীর ফকিরদের প্রচারে ও প্ররোচনায় এখানকার বৌদ্ধভাবাপন্ন সাধারণ লোক ইস্‌লাম গ্রহণ করে পূর্ববঙ্গে মুসলমানের সংখ্যা বর্ধিত করল।

সাহিত্যিক ফল: উচ্চবর্গের ও নিম্নবর্গের এই সংযোগের ও সামাজিক আপোষ-রফার ফলে বাঙলা সাহিত্য দুইভাবে ঐশ্বর্য লাভ করল: একদিকে বাঙালীর নিজস্ব লৌকিক ধর্ম ও আখ্যায়িকাগুলি (Matter of Bengal) 'মঙ্গলকাব্য' রূপে বিকাশ লাভ করল; অন্যদিকে সর্বভারতীয় সংস্কৃতির ভাগবত, মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতির অমর আখ্যায়িকাও (Matter of Sanskrit) বাঙলায় অনূদিত ও রচিত হতে লাগল। বর্মা-আরাকানের প্রভাবে চট্টগ্রামে কিছু বৌদ্ধ থেকে গেল।

সমাজ-সংরক্ষণ: রাজশক্তি হারিয়ে হিন্দু সমাজ প্রাণপণ প্রয়াসে আপনার ধর্ম ও সংস্কৃতিকে আঁকড়ে ধরল; তার সহায়তায় আপনার সমাজকে সংরক্ষণ করতে চাইল। এই ভাব গ্রহণ করলেন স্বভাবতই হিন্দু উচ্চবর্ণ, বিশেষ করে স্মার্ত পণ্ডিতেরা। তাঁরা হিন্দুর জাতিভেদ ও আচারধর্মের গণ্ডির মধ্যে হিন্দু সমাজকে আরও সংকীর্ণ, আরও অনমনীয়, আরও রক্ষণশীল ও বর্জনশীল করে সংগঠিত করলেন। প্রত্যেক বর্ণের সঙ্গে প্রত্যেক বর্ণের ব্যবধান তখন থেকে আরও দুস্তর হয়ে গেল; আচারে বিচারে কোনো উদারতা আর রইল না;—ম্লেচ্ছ-সংযোগ রাজা যত্নর মত যার যেভাবেই ঘটুক তাকেই

বর্জন করা হল নিয়ম। বলা বাহুল্য, এ পদ্ধতির সামাজিক প্রতিরোধ আসলে প্রগতিমূলক নয়, দুদিন. পরেই তা পরিণত হয় প্রতিক্রিয়ায়। অবশ্য এরূপ বজ্রবন্ধনে সমাজকে না বাঁধলে সেদিন হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসমাজ ইস্‌লামের প্লাবনে তলিয়ে যেত। কারণ, তখন বিপদ আসছিল দুদিক থেকেই—একদিকে রাজধর্ম হিসাবে ইস্‌লামের অসীম প্রতিপত্তি, অন্যদিকে সুফী, পীর, ফকির, দরবেশদের প্রচারে ইস্‌লামের সহজ লোকপ্রিয়তা।

সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবন ঃ সামাজিক পুনর্গঠনের সঙ্গে সঙ্গে তাই প্রয়োজন হয়ে পড়ল সাংস্কৃতিক প্রতিরোধেরও। হিন্দু ব্রাহ্মণেরা সংস্কৃত চর্চা পুনরুজ্জীবিত করলেন—টোলে, চতুষ্পাঠীতে শাস্ত্রাধ্যায়ন, দর্শন ও স্মৃতির অনুশীলন হতে লাগল। চৈতন্যদেবের জন্মের পূর্বেই তাই দেখি—নবদ্বীপ নব্যন্যায়ের তীর্থক্ষেত্র; এমন কি মুসলমান সুলতানদের নিযুক্ত হিন্দু কর্মচারীরাও সংস্কৃতে সুপণ্ডিত—যেমন, রায় রাজ্যধর, বৃহস্পতি মিশ্র, রামচন্দ্র খাঁ, দামোদর 'যশোরাজ খাঁ', কুলধর 'শুভরাজ খাঁ', মালাধর বসু 'গুণরাজ খাঁ' প্রভৃতি। এই সাংস্কৃতিক প্রয়াসেরই অন্য অঙ্গ ছিল বাঙলা ভাষায় ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতির পরিবেশন। শাস্ত্রের শিক্ষা দীক্ষা সদাচার ও দেবদ্বিজে ভক্তি সমাজের সকল স্তরের মানুষের মধ্যে পরিব্যাপ্ত না হলে নিম্নবর্ণের হেয় আচার-নিয়মের মধ্যে উচ্চবর্ণেরাও তলিয়ে যেতেন।

বিজেতার স্বাজাত্য স্বীকার ঃ শাসিত হিন্দুদের এই আত্মরক্ষার ও সামাজিক প্রতিরোধের প্রয়াসেই মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্য পুনর্জন্ম লাভ করল, এ কথা সত্য। কিন্তু এই তিনশত বৎসরের শেষে দেখা গেল বিজয়ী মুসলমান শাসকবর্গের মধ্যেও অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়ে গিয়েছে। এক কথায় এই পরিবর্তনকে বলতে পারি—বিজেতার স্বাজাত্য স্বীকার।

প্রথমাবধিই তুর্ক বিজেতারা এদেশ থেকে পত্নী সংগ্রহ করছিলেন। কয়েক পুরুষ পরে তাঁদের সন্তান-সন্ততি প্রায় রক্তে ও জীবনযাত্রায় বারো আনা বাঙালী ও চার আনা তুর্ক হয়ে গেল। তারা একমাত্র দরবারে ফারসীর চর্চা করত, ধর্ম বিষয়ে আরবীর শরণ নিত। কিন্তু সাধারণ দশজনের সঙ্গে প্রথমে তারা আদান-প্রদান চালাতে অভ্যস্ত হল বাঙলায়; তারপরে শুনতে অভ্যস্ত হল বাঙালীর জীবনযাত্রার কাহিনী, বেহুলা-লখিন্দরের কথা, কিংবা গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাসের কথা; আর ক্রমে আগ্রহান্বিত হয়ে উঠল রামায়ণ-মহাভারতের অমর কাহিনীর রসাস্বাদনে। ইলিয়াস শাহী সুলতানরা ফারসীর

রসজ্ঞ ছিলেন,—মহাকবি হাফেজকে তাঁরা এদেশে আসবার জন্য নিমন্ত্রণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা যে বাঙ্‌লার বাঙালী সুলতান বনে যাচ্ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। হুসেন শাহের (১৪৯৩) আমলে পৌছে দেখি, যদিও হুসেন শাহ্‌ নিজে মক্কার আরব-সন্তান, তথাপি তিনি ও তাঁর পুত্র বাঙ্‌লা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ; এমন কি, তাঁদের সামন্ত সেনাপতি পরাগল খাঁ-ও সে দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত।

অবশ্য এই হিন্দু ও মুসলমানদের মিলিত জীবনযাত্রায় বাধা আসত দুই দলের থেকেই। ইরাণ-তুরাণ থেকে নানা ভাগ্যান্বেষী যোদ্ধা এসে এদেশে আপনাদের বাহুবলে অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতেন, আর তাঁরা প্রায়ই প্রথম যুগের তুর্ক বিজেতাদের মতই ধর্মোন্মাদ হতেন। তা ছাড়া নানা পীর ফকির বাইরে থেকে এদেশে এসে গাজী হয়ে হিন্দু ধর্ম ও হিন্দুদের বিরুদ্ধে বিরোধকে জীইয়ে তুলতেন। অন্যদিকে হিন্দু সমাজও প্রতিরোধ ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখতে কিছুমাত্র শিথিলতা দেখায় নি। সর্ব রকমে মুসলমান ধর্ম ও আচারের স্পর্শ বাঁচিয়ে চলেছে। তবে মুসলমান রাজশক্তিকে প্রতিরোধ করতে তারা তত উদ্যোগী বা সাহসী হয় নি। তাই সে রাজশক্তি হিন্দুদের এই সাংস্কৃতিক আত্মরক্ষার চেষ্টায়ও বিশেষ বাধা দেয়নি।

যাই হোক, ষোড়শ শতক থেকে বলা যায় এক দেশে বসবাস করে, একই রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় জীবন যাপন করে, একই ভাষা বলে, একই সাহিত্য ও সংস্কৃতি সৃষ্টিতে যোগদান করে সাধারণ হিন্দু ও সাধারণ মুসলমান তো নিশ্চয়ই, উচ্চবর্গের মুসলমান ও উচ্চবর্গের হিন্দুও বাঙালী বনে গিয়েছিল। বলতে গেলে 'বাঙালী'র একটা রাষ্ট্র জাতি বা নেশন হয়ে ওঠার মত অনুকূল অবস্থা তখনি দেখা দিয়েছিল। তখন থেকে বাঙ্‌লা সাহিত্য হচ্ছে অনেকাংশে হিন্দু ও মুসলমান বাঙালীর সমবেত সৃষ্টি, যদিও তার বনিয়াদ হিন্দু ভাষা, কথা ও ভাব।

সে তুলনায় সে সাহিত্যে তখনো (১৬শ শতক পর্যন্ত) মুসলমান বিষয়-বস্তু, দৃষ্টিভঙ্গি বা রচনা-শৈলীর ছাপ পড়ে নি। যাকে বাঙ্‌লা সাহিত্যে বলা হয় আরব-পারস্যের বিষয় (Matter of Persia and Arabia), তা বাঙ্‌লা সাহিত্যে প্রবেশ লাভ করে অষ্টাদশ শতকে—মধ্যযুগের শেষ পর্বে। প্রাক্‌-চৈতন্য যুগের ও চৈতন্য-যুগের বাঙ্‌লা সাহিত্যের মূল প্রেরণা ছিল হিন্দু সমাজের ও হিন্দু সংস্কৃতির আত্মরক্ষার প্রেরণা, প্রতিরোধের সাহিত্য।

তার একটি দিক প্রগতির দিক—যেখানে সে লোক-জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত ; কিন্তু আর একটা দিক প্রতিক্রিয়ার—যেখানে সে রক্ষণশীল, বিশেষ করে মুসলমান জীবন ও বিষয়ের প্রতি বিমুখ বা উদাসীন।

মধ্যযুগের পর্ব-বিভাগ ঃ মধ্যযুগের বাঙ্‌লা সাহিত্যের তাই যুগবিভাগ বা পর্ব-নির্দেশ করা যায় এইভাবে—

প্রথম পর্ব : যুগসন্ধিকাল, খ্রীঃ ১২০০—খ্রীঃ ১৩৫০ ;

দ্বিতীয় পর্ব : প্রাক্‌চৈতন্য যুগ, খ্রীঃ ১৩৫০—খ্রীঃ ১৫০০ ;

তৃতীয় পর্ব : চৈতন্যযুগ, খ্রীঃ ১৫০০—খ্রীঃ ১৭০০ ;

চতুর্থ পর্ব : নবাবী আমল, খ্রীঃ ১৭০০—খ্রীঃ ১৮০০।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রাক্‌-চৈতন্য বাঙ্‌লা সাহিত্য

লোক-সাহিত্যের বাহন ঃ শুধু সন্ধিকাল (খ্রীঃ ১২০২—খ্রীঃ ১৩৫০) নয়, তারপরে আরও প্রায় একশ' বৎসর কালের (খ্রীঃ ১৪৫০ পর্যন্ত) বাঙ্‌লা সাহিত্যেরও কোনো নিদর্শন আমাদের মেলে নি। অবশ্য, বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত' থেকে আমরা জানি যে, চৈতন্যদেবের জন্মের সময় রাত জেগে লোকে মনসার গান শুনত, চণ্ডী বাশুলীর গান গাইত, শিবের গান গেয়ে ভিক্ষে করত। যোগীপাল, ভোগীপাল ও মহীপালের গীতও তখন লুপ্ত হয় নি। আর কৃষ্ণলীলার গান যে তখনো জনপ্রিয় ছিল তাতে সন্দেহ নেই। এই আড়াই শ' বছর এই সব কথা আর গান লোকের মুখে মুখে বিকাশ লাভ করছিল। তা ছাড়া, ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারতের কাহিনীও কিছু কিছু তখন রচিত হয়ে থাকবে। কিন্তু তখন পর্যন্ত এই সাহিত্য প্রধানত ছিল লোক-সাহিত্য ; তার প্রধান রূপ ছিল গীত ও পাঁচালী।

বিষয়বস্তু হিসাবে পাঁচালী কখনো হত লৌকিক দেব-দেবীর মাহাত্ম্য-সূচক,—তার নাম হত 'মঙ্গলকাব্য' বা 'বিজয়-কাব্য' ; কখনো সংস্কৃত পৌরাণিক আখ্যায়িকাও পাঁচালীতে রচিত হত ; যেমন, রামায়ণ-মহাভারতের

কথা। কখনো বা সাধারণ নায়ক-নায়িকার কথাও গ্রথিত হত 'পাঁচালী'তে। 'পাঁচালী' ছিল এক ধরণের গান ও আবৃত্তির নাম—কখনো তা মৃদঙ্গ, মন্দিরা, চামর সহযোগে গীত হত। একজন মাত্র 'গায়েন' কখনো গাইত, কখনো দ্রুত আবৃত্তি করত, মাঝে-মাঝে নাচতও; অন্যেরা দোহার হিসেবে হত তার সহযোগী। অবশ্য নৃত্য-গীত-সম্বলিত উত্তর-প্রত্যুত্তরে কৃষ্ণলীলাও অভিনীত হত—তার নাম ছিল নাট্য-গীত। স্বয়ং চৈতন্যদেবও যে 'রুক্মিণীহরণ' নামের এমনি এক নাট্যে রুক্মিণীর ভূমিকা অভিনয় করেছিলেন, ত আমরা জানি।

প্রাক্‌-চৈতন্য বাঙ্‌লা সাহিত্য

চৈতন্যদেবের আবির্ভাব (খ্রীঃ ১৪৮৬—খ্রীঃ ১৫৩৩) আকস্মিক নয়। তার পূর্বেই বাঙালী সমাজ ও সংস্কৃতি পুনর্গঠিত হতে আরম্ভ করেছে, এবং বাঙ্‌লা সাহিত্যেও নূতন সূচনা দেখা দিয়েছে,—পদ ও পাঁচালীতে, মঙ্গল-কাব্য ও পৌরাণিক অনুবাদে। প্রাক্‌-চৈতন্য যুগের এই বাঙ্‌লা সাহিত্যের কোন্‌টি আগে কোন্‌টি পরে তা সঠিক নির্ণয় করা এখন দুঃসাধ্য। কিন্তু তার মধ্যে প্রধান উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, কৃত্তিবাসের রামায়ণ, মালাধর বসু গুণরাজ খাঁর শ্রীকৃষ্ণবিজয়, এবং বিজয়গুপ্ত ও বিপ্রদাস পিপলাইয়ের মনসামঙ্গল।

চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

এক সময়ে বাঙ্‌লা সাহিত্যের ইতিহাস আরম্ভ হত কৃত্তিবাসের রামায়ণ থেকে। মাঝখানে 'বৌদ্ধযুগ' ও 'শূন্যপুরাণ' থেকে সে ইতিহাস কল্পনা করা হত। কিন্তু দেখা গেল 'বৌদ্ধযুগ' কথাটা অর্থহীন; আর যা 'শূন্যপুরাণ' বলে কথিত হয় আসলে তা সপ্তদশ বা অষ্টাদশ শতকের রচনা মাত্র। তারপর 'চর্যাপদ' আবিষ্কারে লাভ করা গেল বাঙ্‌লার প্রথম গ্রন্থ। ঠিক সেই সময়েই (বাঙ্‌লা ১৩২৩, ইংরেজি ১৯১৬তে) আর একখানা প্রাচীন পুঁথি স্বর্গীয় বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভের সম্পাদনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত হয়; তিনিই এই পুঁথিখানার নামকরণ করেন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। কারণ, এ পুঁথির নাম ও লিপিকাল পাওয়া যায় নি, প্রথম ও শেষ পৃষ্ঠা খণ্ডিত, মাঝেও দু এক পৃষ্ঠা নেই। পুঁথিখানা পাওয়া গিয়েছিল বাঁকুড়ার এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে।

পুঁথিতে ভণিতা পাওয়া যায় প্রধানত বাশুলীভক্ত বড়ু চণ্ডীদাসের। তাই বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'কেই তখন থেকে ধরা হয় বাঙ্‌লার দ্বিতীয় গ্রন্থ বলে। পণ্ডিতেরা কেউ কেউ স্থির করেছিলেন—এ গ্রন্থ হয়তো চতুর্দশ শতকেরই রচনা। সম্প্রতি এ গ্রন্থের প্রাচীনত্ব নিয়ে আবার উল্টো সন্দেহ উঠেছে। তার ফলে কেউ-কেউ কৃত্তিবাসকেই এখন ইতিহাসে দ্বিতীয় স্থান দিচ্ছেন, এবং বড়ু চণ্ডীদাসের এই 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'কে পিছিয়ে দিচ্ছেন চৈতন্য-জন্মেরও পরে। কিন্তু আমরা জানি, চৈতন্যদেব নীলাচলে অন্তরঙ্গদের সঙ্গে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদের রসাস্বাদন করতেন; তাই চণ্ডীদাসের পদ তাঁর পূর্বেই দেশে সুপ্রচলিত হয়েছে, মানতে হবে। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র পদগুলি ভাবে চৈতন্য-পূর্ববর্তী হবার সম্ভাবনা। তার ভাষাও যথেষ্ট প্রাচীন, তার লিপির ছাঁদও বেশ পুরনো। সম্ভবত সত্যই এ সব পদ রচিত হয়ে থাকবে খ্রীঃ ১৪৫০ থেকে খ্রীঃ ১৫০০-এর মধ্যে। অন্তত ভাষার দিক থেকে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' বাঙ্‌লার দ্বিতীয় গ্রন্থ; কালের দিক থেকেও 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'কে দ্বিতীয় গ্রন্থ বলে গ্রহণ করলে অযৌক্তিক হবে না। আর পুঁথি হিসেবে বাঙ্‌লা ভাষার এমন প্রাচীন পুঁথি আর আছে কিনা সন্দেহ।

চণ্ডীদাস-সমস্যা: মধ্যযুগের বাঙালীর প্রাণ যে কাব্য-মার্গে আপনাকে উৎসারিত করে দিয়েছে তা হল বৈষ্ণব পদাবলী। সেই পদাবলীর পদকারদের মধ্যে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি প্রাচীনতম ও প্রধানতম বলে পূজিত। এঁদের মধ্যে নানা কারণেই বলা যেতে পারে চণ্ডীদাস ছিলেন শ্রেষ্ঠ। তাঁর নামে প্রায় বারো শ' পদ প্রচলিত; আর সে সব পদের মধ্যে কয়েকটি পদ আছে, যা বাঙালী চিত্তের পরম প্রকাশ, বিশ্ব-সাহিত্যেও পাঙ্‌ক্তেয়। কিন্তু এমন অনেক পদও আছে যা নিতান্তই মামুলী; কোনো শ্রেষ্ঠ কবির লেখনীর অযোগ্য। তা ছাড়া, চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত কোনো কোনো পদের ভণিতায় অন্য পদকর্তারও নাম পাওয়া যায়। আর চণ্ডীদাসেরও ভণিতা পাওয়া যায় 'আদি চণ্ডীদাস', 'কবি চণ্ডীদাস', 'দ্বিজ চণ্ডীদাস', 'দীন চণ্ডীদাস' প্রভৃতি নানা নামে। স্পষ্টই সন্দেহ হয়—একাধিক পদকর্তা চণ্ডীদাস নামে আপনাকে পরিচিত করে গিয়েছেন। এই হল 'চণ্ডীদাস-সমস্যা'। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' আবিষ্কারে এই প্রশ্ন আরও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। কারণ এ কবির ভণিতা আরও নতুন; তিনি বাশুলী-ভক্ত 'বড়ু চণ্ডীদাস'। আর, বৈষ্ণব পদাবলীর বারো শ' পদের মধ্যে মাত্র দুটি,

বা ঐরূপ আরও দু'একটি পদ আছে যার মূল শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কোনো রূপে খুঁজে পাওয়া যায়। নইলে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র পদ-সমূহের সঙ্গে পদাবলীর চণ্ডীদাসের পদ-সমূহের সম্পর্কের চিহ্নমাত্র নেই। অথচ সনাতন গোস্বামীর একটি সংস্কৃত টীকা থেকে আমরা জানি যে—চণ্ডীদাস 'দানখণ্ড' 'নৌকাখণ্ড' প্রভৃতি রচনা করেছিলেন; আর 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' 'দানখণ্ড' ও 'নৌকাখণ্ড' দু'টি প্রধান 'খণ্ড' বা অধ্যায়। তাই স্বভাবতই মনে হয়, চৈতন্যদেব যে চণ্ডীদাসের পদ-সংগীতে পরম আনন্দ-লাভ করতেন, আর সনাতন গোস্বামী যে চণ্ডীদাসের কথা উল্লেখ করেছেন, আসলে তিনি আর কেউ নন, তিনি 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র কবি বড়ু চণ্ডীদাস, আর সম্ভবত তিনিই আদি চণ্ডীদাস। তিনি চৈতন্যদেবের পূর্ববর্তী; অন্তত চৈতন্যদেবের সময়ে জয়দেব-বিদ্যাপতির মতো তাঁর রচিত পদও দেশে বিস্তৃত হয়ে গিয়েছে, কৃষ্ণভক্তদের নিকটে সমাদরও লাভ করেছে। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র পদসমূহ তেমন অধ্যাত্মরাগরঞ্জিত নয়, বিদ্যাপতি বা জয়দেবের পদও তা নয়। তথাপি তা যে এত সমাদর লাভ করল তার কারণ সম্ভবত এই যে, 'দানখণ্ড' 'নৌকাখণ্ড' প্রভৃতি খণ্ডের এসব পদ যখন গীত হত, কিংবা নৃত্যসহযোগে অভিনীতও হত,—তখন সেদিনের মানুষ তাতে মেতে উঠত;—মেতে ওঠবার মতো রস-সম্পদ তখনো পল্লীসভ্যতায় মানুষ বাঙালীর আর বেশি ছিল না।

এ প্রসঙ্গেই তাই 'চণ্ডীদাস সমস্যা'র আলোচনাও শেষ করা যেতে পারে। পণ্ডিতেরা অবশ্য কোনো মীমাংসায় একমত নন, আর তথ্যের অভাবে একমত হওয়া সম্ভবও নয়। তথাপি বলা যেতে পারে—অন্তত দু'জন বা তিনজন পদকর্তা চণ্ডীদাস নামে পদ রচনা করে থাকবেন। তাঁদের মধ্যে প্রাচীনতম হলেন 'কৃষ্ণকীর্তনে'র বড়ু চণ্ডীদাস, তিনিই সম্ভবত 'আদি চণ্ডীদাস'; তিনি প্রাক্-চৈতন্য যুগের কবি, বাশুলীর (শক্তির এক রূপ) ভক্ত, বৈষ্ণব নন। দ্বিতীয় জন দ্বিজ চণ্ডীদাস;—তিনি চৈতন্যের হয় সমসাময়িক, না হয় অল্প পরবর্তী। পদাবলীর অধিকাংশ উৎকৃষ্ট পদই তাঁর রচনা। তৃতীয় জন 'দীন চণ্ডীদাস'—যিনি খ্রীঃ ১৭৫০-এর দিককার লেখক। তাঁর পদসংখ্যাই বেশি, আর তাতে কাব্যগুণের প্রায় নামগন্ধও নেই। ততদিনে (খ্রীঃ ১৭৫০-এ) বৈষ্ণব পদাবলীর একটা ছাঁচ সুলভ হয়ে গিয়েছে। সেই ছাঁচে ঢেলে এই লেখকও তৈরী করেছেন পদের পর পদ।

অবশ্য এঁদের কারও নামে নিশ্চিন্ত করে চালাবার উপায় নেই,

চণ্ডীদাসের ভণিতায় এমন কিছু কিছু পদ তবুও থেকে যায়। সে সব পদের মধ্যে আছে কিছু মামুলী বৈষ্ণব পদ, তার কয়েকটি ভালো। আর আছে চণ্ডীদাস ভণিতায় কিছু সহজিয়া রাগাত্মিকা পদাবলী,—কয়েকটি তার অপূর্ব। যেমন, বহুবিশ্রুত সেই পদটি :

শুনহ মানুষ ভাই,
সবার উপরে মানুষ সত্য,
তাহার উপরে নাই॥

এ জাতীয় পদ কার রচনা, তা বলবার উপায় নেই। 'বড়ু চণ্ডীদাস', 'দ্বিজ চণ্ডীদাস', 'দীন চণ্ডীদাস', এদের কারও না হবারই সম্ভাবনা। 'তরুণী-রমণ চণ্ডীদাস' প্রভৃতি কোনো কোনো সহজিয়া সাধক কবিদেরই হবে।

চণ্ডীদাসের কথা : 'চণ্ডীদাস' পরবর্তী বৈষ্ণব সমাজে ভক্তশ্রেষ্ঠ ও কবিশ্রেষ্ঠ বলে পদকর্তাদের মুখপাত্র হয়ে ওঠেন। আর তাই তিনি নানা কাহিনীর বিষয়ও হয়ে পড়েন। যে সব কাহিনী তাঁর নামে প্রচলিত তা সত্য বা মিথ্যা কিছুই বলবার উপায় নেই। বীরভূমের অন্তর্গত নান্নুর চণ্ডীদাসের গ্রাম, এই হল পসিদ্ধি। কিন্তু বাঁকুড়ার অন্তর্গত ছাতনাও এখন এ গৌরব দাবী করে। যুক্তি সে পক্ষেও আছে। চণ্ডীদাস যদি একাধিক হন, তা হলে একাধিক গ্রামও হবে চণ্ডীদাসের জন্মভূমি। দ্বিতীয় এক প্রসিদ্ধি এই—চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি গঙ্গাতীরে পরস্পর মিলিত হয়েছিলেন। সত্য হলে এ বিদ্যাপতি আসলে মিথিলার বিদ্যাপতি নন, বাঙালী কবিরঞ্জন বিদ্যাপতি, আর এ চণ্ডীদাসও তাহলে 'দীন চণ্ডীদাস'। চণ্ডীদাসের নামে তৃতীয় কাহিনী এই যে, নান্নুরে তাঁর পদ-গান শুনে গৌড়ের নবাবের বেগম আত্মহারা হন। নবাব তাই ক্ষুব্ধ হলেন। তারপরে আরও দুইরূপ কাহিনীও প্রচলিত রয়েছে :—এক হল, একদা কবি যখন স্বগৃহে পদগানে মত্ত, তখন নবাব তাঁর গৃহ আক্রমণ করলেন, কবির গৃহ ভগ্ন ও ভস্মীভূত হল, কবিও তাতেই নিহত হলেন। অন্য মতে, ক্রুদ্ধ নবাব কবিকে বন্দী করে আনলেন, হস্তিপৃষ্ঠে বেঁধে তাঁকে কশাঘাতে কশাঘাতে নিহত করলেন। যাই হোক, এ হল মামুলী হিন্দু ভক্তের মাহাত্ম্য-কাহিনী। কিন্তু আরও একটি কাহিনী আছে :—কবির প্রেম ছিল এক রজকিনীর সঙ্গে, তার নাম রামী বা তারা বা রামতারা। আর এ প্রেম হচ্ছে সহজিয়া প্রেম, 'নিকষিত হেম, কামগন্ধ নাহি তায়'। সমাজের ভ্রুকুটিকে তুচ্ছ করে আপনার মহিমায় তা আপনি

প্রতিষ্ঠিত। রামীর নামেও আছে তেমনি সহজিয়া পদ, আর চণ্ডীদাসের নামেও আছে রামীর ধ্যান, পিরীতের জয়গান। বলা বাহুল্য, এ হচ্ছে সহজিয়াদের সৃষ্টি। চণ্ডীদাস যখন সমস্ত বাঙালী সমাজের সম্পত্তি হয়ে উঠেছেন, তখন সহজিয়ারাই বা কেন তাঁর ওপরে দাবী ছেড়ে দেবেন? চণ্ডীদাস আর বিশেষ মানুষ নেই, তিনি সমস্ত বাঙালী সমাজের প্রিয়তম-আত্মীয়, প্রেমমাধুর্যময় পদাবলীর মুখপাত্র।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কাব্যবস্তু

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে তেরটি খণ্ড আছে, এক একটি খণ্ডের এক একটি বিষয়বস্তু। যেমন 'জন্মখণ্ড', 'তাম্বূলখণ্ড', 'দানখণ্ড', 'নৌকাখণ্ড' ইত্যাদি। 'ভাগবতে', 'হরিবংশে', 'বিষ্ণুপুরাণে', 'মহাভারতে' আমরা শ্রীকৃষ্ণের যে সব লীলার কথা পাই, তা থেকে এ গ্রন্থে মাত্র শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের জন্মকথা ও গোকুলে আগমন এবং কালীয়দমন, এই দুটি বিষয় গৃহীত হয়েছে। অবশ্য বৃন্দাবন-লীলাও মূল ভাগবতের দশম স্কন্ধেই রয়েছে। সেই গোপবধু-প্রণয়ীর লীলা-কাহিনী দ্বাদশ শতকে কী বিশেষ রূপ লাভ করছিল, তা জয়দেবের 'গীত-গোবিন্দে' আমরা দেখতে পাই। মিথিলায় বিদ্যাপতি ও বাঙ্‌লায় চণ্ডীদাস যখন পঞ্চদশ শতকে সে বিষয়ে পদ রচনা করছেন, তখন বুঝতে পারি সমস্ত পূর্ব-ভারতেই তখন 'কানু বিনা গীত নাই' একথা সত্য হতে চলেছে। কিন্তু 'দানখণ্ড', 'নৌকাখণ্ড' প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের যে বিশেষ কাহিনীগুলি 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' স্থান লাভ করেছে, তা ভাগবতে পুরাণে নেই, তা হচ্ছে বাঙ্‌লা দেশের নিজস্ব সৃষ্টি। বিশেষ করে তা বাঙালী প্রাকৃত-জীবনের দান। আর এ সব কাহিনী এখনো যে স্তরে রয়েছে তাতে বুঝতে পারি চৈতন্যদেবের অধ্যাত্মরাগের স্পর্শ না লাগাতে তার রূপ ছিল কী। এ কাহিনী তখনো পর্যন্ত ছিল স্থূল প্রণয়-লীলার কাহিনী।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের' এক একটি খণ্ডে যে ভাবে এক একটি আখ্যান বর্ণিত হয়েছে, তাতে মনে হয় যেন তা পাঁচালী কাব্যের এক একটি পালা; এবং সমগ্র শ্রীকৃষ্ণকীর্তন যেন একটি মঙ্গলকাব্য বা বিজয় কাব্য। ধূর্ত প্রণয়ী শ্রীকৃষ্ণ ছলে বলে কৌশলে কিশোরী অনভিজ্ঞা গোপবধূ রাধার প্রথমে দেহ, পরে মনও বিজয় করে নিচ্ছেন; 'তাম্বূলখণ্ডে' আইহন-পত্নী রাধা শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়-নিবেদন সদর্পে প্রত্যাখ্যান করেন। 'দানখণ্ডে' মহাদানী বেশে নিরুপায় রাধাকে প্রায় বলপূর্বক শ্রীকৃষ্ণ প্রথম জয় করলেন। তথাপি

'নৌকাখণ্ডে' দেখি রাধা আপনার মান-মর্যাদা রক্ষায় সচেষ্ট। কিন্তু 'ছত্রখণ্ডে' পৌঁছতে পৌঁছতে বুঝি এ প্রণয়-খেলায় সেই অনভিজ্ঞা গোপবধূ নিজেও এবার ধরা দিয়েছেন। তখন আরম্ভ হল নব নব লীলা দু' জনে—'বৃন্দাবন খণ্ড', 'বস্ত্রহরণ ও হারখণ্ড', এবং 'বংশীখণ্ডে' :—

কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী-নই কূলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ-গোকুলে ॥
আকুল শরীর মোর রে আকুল মন।
বাঁশীর শবদেঁ মো আউলাই লেঁা রান্ধন ॥ ১ ॥
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে কোন্ জনা।
দাসী হয়ঁ্যা তার পাএ নিশিবোঁ আপনা ॥ ধ্রু ॥...
আবার ঝরএ বড়ায়ি নয়নের পানী।
বাঁশীর শবদেঁ বড়ায়ি মো হারায়িলোঁ পরানী ॥ ২ ॥...
পাখী নহোঁ তার ঠাঁই উড়ী পড়ি জাঁও।
মেদিনী বিদায় দেউ পসিআঁ লুকাওঁ ॥ ৩ ॥
পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জাণী।
মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পণী ॥ (পৃঃ ২৯৪)

বুঝতে পারি, এসেছে এখন প্রণয়-পরিতৃপ্ত শ্রীকৃষ্ণের দূরাপসরণের পালা; আজ এই প্রণয়-ব্যাকুলা, বিরহ-বিধুরা নারীর বুক-ফাটা ক্রন্দনের দিন :

মুছিআঁ পেলায়িবোঁ বড়ায়ি শিষের সিঁদুর।
বাহুর বলয়া মো করিবোঁ শঙ্খচুর ॥
কাহ্ন বিণা সবখন পোড়এ পরাণী।
বিষাইল কাণ্ডের ঘাএ যেহেন হরিণী ॥
পুনমন্তী সব গোআলিনী আছে সুখে।
কোণ দোষে বিধি মোক দিল এত দুখে ॥
অহোনিশি কাহ্নাঞিঁর গুণ সোঁঅরিআঁ।
বজরে গঢ়িল বুক না জা-এ ফুটিআঁ ॥ (পৃঃ ৩৯২)

সমস্ত কাহিনীটি এই বুক-ফাটা ক্রন্দনের মধ্যে এসে যখন ঠেকল তখন বুঝতে পারি কবির কাব্য-লক্ষ্মীর চক্ষুদুটিও আর্দ্র হয়ে উঠেছে। এই ব্যাকুলতা, বিরহ-পালার এই আকুলি-বিকুলি পরবর্তী বাঙ্‌লা পদাবলীতে প্রেমোন্মাদ চৈতন্যের দিব্যোন্মাদনার স্মৃতিতে অজস্র ধারায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে।

কিন্তু এই বিচ্ছেদের বেদনার, এই বিরহের গানের উৎস শুধু নর-নারীর এই ব্যর্থ প্রণয়ের কথাটুকু নয়, শুধু মানব-আত্মার সেই মহাবিরহের বেদনাও নয়—এর উৎসস্থল পরাজিত, যুগ-যুগ-নির্জিত বাঙালী সমাজের জাতীয় জীবনের অন্তর্নিহিত ব্যর্থতা। তাই বিরহের কাব্যে বাঙালী কবি অনবদ্য। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের স্থূল কাব্যাংশও তাতে সজল-বিধুর। এ কাহিনী যখন গাওয়া হত তখন শ্রোতারা নিশ্চয়ই ব্যাকুল হয়ে উঠতেন। আর এ কাহিনী যে গাওয়া হত তাতেও সন্দেহ মাত্র নেই। কারণ, প্রত্যেকটি পদের প্রারম্ভেই কবি তার রাগ ও তাল নির্দেশ করেছেন। কিন্তু 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র প্রত্যেকটি খণ্ড আবার গ্রথিত হয়েছে সংলাপ-সূত্রে; প্রধানত শ্রীকৃষ্ণ, রাধা ও বড়ায়ির পরস্পর উত্তর-প্রত্যুত্তরেই এক-একটি কাহিনী উদ্‌ঘাটিত ও প্রকাশিত হয়েছে। তা থেকে মনে হয় এ শুধু পাঁচালী করে না গেয়ে 'নাট-গীত' হিসাবে নৃত্য ও অভিনয়ের সঙ্গে গাওয়া চলত। তাই 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'কে 'ঝুমুর' জাতীয় লৌকিক 'নাট-গীতে'র প্রাচীনতম নিদর্শন বলেও কেউ কেউ নির্দেশ করেছেন।

উত্তর-প্রত্যুত্তর রচনায় চণ্ডীদাসের কৃতিত্ব আছে। অন্তত চতুর প্রণয়ী শ্রীকৃষ্ণ বাক্যের যুদ্ধে শ্রীরাধাকে পরাস্ত করতে পারেন নি। রাধা মুখরা, কিন্তু বাক্য-কুশলা। এ কাব্যের কবিত্ব সামান্য নয়,—চণ্ডীদাস যে সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন তা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের এখানে-ওখানে বিক্ষিপ্ত দেড়শত সংস্কৃত শ্লোক থেকে সুস্পষ্ট। তথাপি সত্য কথা এই যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আবেগ উচ্ছ্বাস অধিক নয়, কাব্যোচিত অলঙ্কার-প্রিয়তা নেই, রুচি ও ভাবের দিক থেকে তো অনেক পদ স্থূল ও গ্রাম্য। সুখশ্রাব্য যদি বা সেদিনে হয়ে থাকে, এখন সুখপাঠ্য নয়। কিন্তু বড়ু চণ্ডীদাসের আসল কৃতিত্ব 'পদকার' হিসাবে নয়, চরিত্রকার ও কাহিনীকার হিসাবে। যেভাবে একটু-একটু করে তিনি অনভিজ্ঞা মুখরা বালিকা রাধাকে একটির পর একটি ঘটনার মধ্য দিয়ে গঠিত বিকশিত করে তুলে শেষ পর্যন্ত অন্তরের প্রেম-পরিপুষ্টা প্রেম-মথিতা নারীরূপে আমাদের সম্মুখে প্রকাশিত করেছেন, সে যুগের পক্ষে তা একটা অপ্রত্যাশিত সৃষ্টি-কৌশল। বড়ু চণ্ডীদাসের বড়ায়ি অবশ্য কুট্টনী ধরণের ধরা-বাঁধা মামুলী চরিত্র (টাইপ)। কিন্তু তাঁর শ্রীকৃষ্ণ যতই আপনার দেবত্বের বড়াই করুক সে ধূর্ত এক গ্রাম্য-লম্পট ছাড়া আর কিছুই নয়। চৈতন্যদেবের পরে আর কৃষ্ণ-চরিত্র এভাবে অঙ্কন সম্ভব নয়—সহস্র কপটতার মধ্যেও তিনি পরম

প্রেমিক, মধুর-লীলা-বিলাসী শ্যামরায়। আসলে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র অন্যতম প্রধান সার্থকতা এই যে, শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বড়ু চণ্ডীদাসের গান নয়। কি রাধা, কি কৃষ্ণ, কেউ এখানে আধ্যাত্মিক বিগ্রহ মাত্র নন; একটু স্থূল হলেও তাঁরা রক্তে মাংসে গড়া মানুষেরই প্রতিনিধি। জীবাত্মা-পরমাত্মার রূপক নয়, বরং সেদিনের প্রাকৃত জীবনে যে শত শত লম্পটের প্রণয়-জাল-বিস্তার ও প্রণয়-বিলাস কবি প্রত্যক্ষ করে থাকবেন, আর যেমন দেখে থাকবেন বহু বহু সবলা গ্রাম্যবধুর প্রণয়-প্রবঞ্চিত জীবনের দুর্দশা ও বেদনা, অতি সহজ ভাবে বড়ু চণ্ডীদাস তাই চিত্রিত করেছেন। আর তাতে এ কাব্য দেবলীলার কাব্য না হয়ে মানবলীলার কাব্য হয়ে উঠেছে। হোক্ তা গ্রাম্যতাদুষ্ট, কিন্তু গ্রাম্যতাদুষ্ট মানুষও মানবতা-বর্জিত সূক্ষ্ম ভাবের ফানুস অপেক্ষা সাহিত্যে—এবং জীবনে—বেশি আদরণীয়।

শ্রীকৃষ্ণবিজয়ঃ মালাধর বসু 'গুণরাজখাঁ'র 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কৃষ্ণলীলার প্রথম কাব্য। এ গ্রন্থের অন্য নাম 'গোবিন্দবিজয়' বা 'গোবিন্দ-মঙ্গল'। অর্থাৎ আসলে এটিও 'মঙ্গল' বা 'বিজয়' জাতীয় 'পাঁচালী' বা আখ্যান-কাব্য। ভাগবতকে পয়ার ছন্দে বেঁধে এ পাঁচালী তিনি রচনা করেছেন। অর্থাৎ এ কাব্য বাঙলার পৌরাণিক প্রচার-প্রয়াসের বা 'অনুবাদ-শাখার'ও একটি প্রাচীনতম নিদর্শন।

মালাধর বসুর নাম সুপ্রসিদ্ধ। শ্রীচৈতন্য তাঁর শ্লোকও আবৃত্তি করেছেন, তা আমরা জানি। কবির পরিচয় তাঁর কাব্য মধ্যেও রয়েছে। খ্রীঃ ১৪৭৩-এ পরিণত বার্ধক্যে তিনি ভাগবতকে পয়ার ছন্দে বেঁধে পাঁচালী রচনা করতে আরম্ভ করেন। "গৌড়েশ্বর দিলা নাম গুণরাজখান"। ১৪৭৩-এ গৌড়েশ্বর ছিলেন রুকন্ উদ্দীন বারবাক্ শাহ (১৪৫৯-১৪৭৩)। বাঙলার সুলতানেরা তখন হিন্দু শাসকগোষ্ঠীকে আপনাদের রাজ্যশাসনে সহযোগী করে নিচ্ছেন। মালাধর বসুও দরবারী মানুষ, জাতিতে তিনি কায়স্থ, বর্ধমানের কুলীনগ্রাম-নিবাসী। তিনি 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' লিখলেন লোক-নিস্তারের জন্য—গৌড়েশ্বরের কৃপালাভ ঘটলেও হিন্দু উচ্চবর্গ ধর্মগত ও সংস্কৃতিগত সত্তা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হতে পারছে না, এ প্রয়াস তারও প্রমাণ। বাঙলার সুলতানরা তাঁদের অনুগত হিন্দুর এই সাংস্কৃতিক আত্মরক্ষার প্রয়াসকে সন্দেহের চক্ষে দেখতেন না তাও বোঝা যায়।

'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' ভাগবতের অনুসরণে লেখা পাঁচালী গান বলেই রাগ-

রাগিণীর উল্লেখ আছে। 'দানখণ্ড' 'নৌকাখণ্ডে'র মতো যা ভাগবতে বা পুরাণে নেই তারও অনেক কিছু এ পুঁথিতে পাওয়া যায়। ভাগবতের অন্যান্য লীলার চেয়ে ব্রজ-লীলা বা রাধা-কৃষ্ণ-প্রেমকাহিনী তিনিও বেশি বিশদ করেছেন। কাব্যকলা অবশ্য এ গ্রন্থে বেশি নেই। মোটামুটি সরল ভাষায় কাহিনীটি বলাই ছিল কবির লক্ষ্য। তখনকার শ্রোতারাও তাই মনে করত যথেষ্ট।

কৃত্তিবাসের রামায়ণ

কৃত্তিবাস ওঝার রামায়ণ বা 'শ্রীরাম-পাঁচালী' ছিল এক সময়ে বাঙ্‌লার প্রথম ও প্রধান গ্রন্থ বলে স্বীকৃত। প্রথম না হোক, কৃত্তিবাস চৈতন্য-পূর্ব যুগেরই কবি, তাঁর শ্রীরাম বাঙালী, বাঙ্‌লা সাহিত্যের এক প্রধান সম্পদ।

যে কালের কবিরা ভণিতায় পর্যন্ত আপনার নাম সুস্পষ্ট করে উল্লেখ করতেন না, সেকালে কৃত্তিবাস আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে কিছুই বাদ দিয়ে যান নি। বুঝতে পারি ব্যক্তিত্ববান্ কবিপ্রকৃতি আপনার সত্তা সম্বন্ধে সচেতন হচ্ছে, শুধু পিতৃঋণ ও কুলগরিমা কীর্তন করেই ক্ষান্ত হতে পারছে না। কৃত্তিবাসের এ আত্মপরিচয় নানা কারণেই উল্লেখযোগ্য; তা থেকে তাঁর পিতা মাতা ভ্রাতা ভগ্নী প্রভৃতির পরিচয় অবিসংবাদিতরূপে জানা যায়। গঙ্গাতীরে ফুলিয়া গ্রামে (নদীয়া জেলায়) মুখুটি বংশে তাঁর জন্ম। সেদিনটি আদিত্যবার পঞ্চমী পূর্ণ (পুণ্য ?) মাঘ মাস :—কাল সঠিক স্থির করতে পারলে হয় তা হবে খ্রীঃ ১৩৯৮, নয় খ্রীঃ ১৪০৩। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বংশে কৃত্তিবাস জন্মেন। বড় গঙ্গা (পদ্মা) পার হয়ে তিনি উত্তরে বরেন্দ্রভূমিতে গেলেন বিদ্যালাভের জন্য; পাঠ সাঙ্গ হলে গেলেন গৌড়েশ্বরের কাছে। সে বিবরণ থেকে অনুমান হয় এ গৌড়েশ্বর কোনো হিন্দু রাজা। রাজা তখন দরবারে বসে। ক্রমে দরবার ভাঙল। ফুলিয়ার পণ্ডিত কৃত্তিবাসের তখন ডাক পড়ল রাজার সকাশে। অনেক দেউড়ি পার হয়ে গিয়ে কবি দেখলেন, রাজা রাজ-পরিষদে বসে মাঘ মাসের রোদ পোহাচ্ছেন। তাঁর ডাইনে পাত্র জগদানন্দ, পার্শ্বে ব্রাহ্মণ সনন্দ; বামে কেদার খাঁ, ডাইনে নারায়ণ; সুন্দর ও শ্রীবৎস ধর্মাধিকরণী; রাজার পণ্ডিত মুকুন্দ; ইত্যাদি। কৃত্তিবাস সাতশ্লোকে রাজ-সম্ভাষণ করলেন। গৌড়েশ্বর আনন্দিত হয়ে তাঁকে প্যাটের পাছড়া উপহার দিলেন। কেদার খাঁ তাঁর মাথায় চন্দনজল ছিটিয়ে

দিল। কবি যা চাইবেন রাজা তদনুরূপই পুরস্কার দেবেন। কিন্তু, কবি জানালেন

কার কিছু নাহি লই করি পরিহার।
যথা যাই তথায় গৌরব মাত্র সার॥

'গৌরব মাত্র সার'—বাঙালী সাহিত্যিকের এই তো ঐতিহ্য। বাঙ্‌লার প্রথম এই কবি যেন পরবর্তী বাঙালী সাহিত্যিকের জন্য তাঁদের প্রেরণার প্রধান উৎসটি এই তিনটি শব্দেই নির্দেশ করে দিয়ে গিয়েছেন। আজ 'কাঞ্চন-মূল্যের' দিনেও কথাটা মনে রাখার মত। অন্তত মিথ্যা হয়নি কবির নিজের আশা :

প্রসাদ পাইয়া বাহির হইনু রাজার দুয়ারে,
অপূর্ব জ্ঞানে লোকে ধায় আমা দেখিবারে॥
চন্দন ভূষিত আমি লোকে আনন্দিত।
সবে বলে ধন্য ধন্য ফুলিয়া পণ্ডিত॥
মুনিমধ্যে বাখানি বাল্মীকি মহামুনি।
পণ্ডিতের মধ্যে বাখানি কৃত্তিবাস গুণী॥

মনে পড়ে না কি রবীন্দ্রনাথের সত্তর বৎসরের জয়ন্তী উৎসবের কথা? শুধু গৌড়েশ্বর নয়, গৌড়জনও জানে কবির সম্মান। তাইতো কেঁদুলাতে জয়দেবের মেলা পৃথিবীর প্রাচীনতম মেলা—জনতার কবিপূজা, জয়ন্তী উৎসব।

কবি কৃত্তিবাস তারপরে লিখলেন রামায়ণ—হয়তো রাজার নির্দেশে, আর স্বভাবতই বাল্মীকির কৃপায়। এ রাজা কে, তা জানলে কৃত্তিবাসের কাল সুনিশ্চিত হয়। সম্ভবত 'গণেশ' (খ্রী: ১৪০৯-১৪১৪) বা দনুজমর্দন-দেবই এই 'গৌড়েশ্বর'। তাহলে কৃত্তিবাসের জন্মকাল খ্রী: ১৪০০ এর পূর্বে। কিন্তু খ্রী: ১৪৭৫-এর পূর্বে কৃত্তিবাসকে পিছিয়ে দিতে কেউ বেশি ভরসা পান না। তাই কৃত্তিবাসের কাল নিয়ে তর্ক রয়েছে। আরও বেশী তর্ক থাকবে তাঁর রচনা কোন্‌টি, কোনটি নয়, তা নিয়ে। যা নিয়ে তর্ক নেই তা এই যে, তিনিই বাঙ্‌লা ভাষায় প্রথম রামায়ণ রচনা করেন। এই কাব্যকে অনুবাদ না বলে 'রচনা' বলাই শ্রেয়ঃ। সে রামায়ণ পূর্বাপর জনপ্রিয় ছিল—অন্তত পশ্চিমবঙ্গে। সর্বশ্রেণীর বাঙালী আর কোনো গ্রন্থকে এমন আপনার করে নেয়নি—যেমন নিয়েছিল কৃত্তিবাসী রামায়ণকে। তার ফলে যুগের

পর যুগ গায়েনের মুখে মুখে কৃত্তিবাসের পাঁচালী কীর্তিত ও পরিবর্তিত হয়েছে। তাছাড়া লিপিকাররাও নকল করার সময় যা কৃত্তিবাসে ছিল না অন্য কবির এমন অনেক লেখা এই রামায়ণে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। এক কথায় লোক-জীবনের সঙ্গে কৃত্তিবাসী রামায়ণের এমন একটা স্বচ্ছন্দ বন্ধন গড়ে উঠেছে যে, এক অর্থে এ রামায়ণকে সত্যই লোককাব্য বলা চলে। বাঙালী সাধারণ মানুষের জীবন এ রামায়ণ অনেকাংশে গঠন করেছে। আর সাধারণ জীবনের সম্পর্কে এসে এ রামায়ণেরও পূর্বাপর অনেক ভাঙাগড়া হয়েছে। সবচেয়ে কৌতূহলজনক কৃত্তিবাসী রামায়ণের শেষ ভাঙাগড়া। বাঙ্‌লা মুদ্রণ যখন সম্ভবপর হল তখন শ্রীরামপুরের পাদ্রীরা খ্রীঃ ১৮০২-১৮০৩-এ সে অঞ্চলের প্রধান লোকপ্রিয় গ্রন্থ হিসাবে কৃত্তিবাসের রামায়ণ মুদ্রিত করেন। সঙ্গে সঙ্গে সেই মুদ্রিত কৃত্তিবাসী রামায়ণ সমস্ত বাঙ্‌লায় পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ল। তখন থেকেই লোকে মনে করলে, বাল্মীকি যেমন সংস্কৃতের 'আদিকবি' কৃত্তিবাসও তেমনি বাঙলার 'আদিকবি'। বিশেষ করে পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার খ্রীঃ ১৮৩০-৩৪-এর সংস্করণে কৃত্তিবাসের পুরাতন ভাষাকে মেজে ঘষে একেবারে নূতন করে দিলেন,—লোকে তা পরম আনন্দে পাঠ করতে লাগল। কৃত্তিবাসী রামায়ণ বলতে এই তর্কালঙ্কারী ভাষাই এখন বাজারে চলছে। কৃত্তিবাসের মূলোদ্ধার এখন দুঃসাধ্য। যেসব জনপ্রিয় আখ্যান কৃত্তিবাসের বলে চলিত, তার অনেকগুলি কৃত্তিবাসের নয়, যেমন কবিচন্দ্র-এর (?) রচিত 'অঙ্গদ রায়বার' ও এমনি আরো কোনো কোনো উপাখ্যান। তাই কী কৃত্তিবাসের রচনা, কী তাঁর রচনা নয়—তা নিয়ে তর্ক চলবে চিরদিন।

কৃত্তিবাস 'কীর্তিবাস তুমি'—উনবিংশ শতাব্দীতে মাইকেল তাঁর অপূর্ব সনেটে এই বলে কবিকে প্রণাম নিবেদন করেছেন। সত্য সত্যই যথেষ্ট কাব্য-শক্তি কৃত্তিবাসের ছিল। প্রাঞ্জল পরিচ্ছন্ন রূপে তিনি রামায়ণের কাহিনী পরিবেশন করতে পেরেছেন,—বাঙ্‌লার ঘরে ঘরে তা যুগ যুগ ধরে পরিচিত হয়েছে। কিন্তু তিনি বাল্মীকির রামায়ণের অনুবাদ করেন নি। পরবর্তী রামায়ণকার বা মহাভারতের বাঙালী লেখকেরাও কেউই মূলকে যথার্থ অনুবাদ করবার চেষ্টা করেন নি,—তাঁরা মূল রামায়ণ-মহাভারতের অনুসরণে লিখেছেন বাঙ্‌লা রামায়ণ ও মহাভারত; ইচ্ছামতো সংযোগ করেছেন তাতে বাঙ্‌লার লোকজীবনের কথা ও কাহিনী; ইচ্ছামতো বর্জন করেছেন মূলের

কোনো কোনো উপাখ্যান। কৃত্তিবাসও রচনা করেছেন বাঙালীর মন নিয়ে বাঙালীর মতো করে তাঁর বাঙ্‌লা রামায়ণ। 'শ্রীরাম-পাঁচালী' মহাকাব্য নয়—বাল্মীকির মহাকাব্যের সেই সংযত, গম্ভীর করুণা পাঁচালীর গ্রাম্য গানে, বাঙ্‌লা পয়ারের ছন্দে পরিণত হয়েছে বাঙালীর ভাবাপ্লুত ভক্তিরসে। রূপেও এ রামায়ণ ভারতীয় মহাকাব্য নয়, রসেও তা ভারতীয় কাব্য নয়,—রূপে-রসে এ বাঙালীর কাব্য। তার চরিত্রাদর্শে ও চরিত্র-চিত্রণেও তাই আর সেই মহাকাব্যের ভাস্কর্য-বলিষ্ঠতা নেই, আছে বাঙালী পটুয়ার নিপুণ স্বচ্ছন্দ রেখার মাধুর্য। রাম, সীতা, লক্ষ্মণ, দশরথ, কিংবা রাবণ, মন্দোদরী, বিভীষণ —বাল্মীকির এসব প্রত্যেকটি চরিত্র মহাকাব্যিক আদর্শে পরিকল্পিত। সেই বিরাট পরিকল্পনাকে ভাঙবার উপায় নেই; কিন্তু কৃত্তিবাসের হাতে এই মহান্ চরিত্রগুলোই আবার পরিণত হয়েছে বাঙালীর ঘরোয়া আদর্শের চরিত্রে—রাম বীর হলেও বাঙালী বীর; স্নেহে, মমতায়, কোমলতায় সজল। তিনি বাঙালী ঘরের আদর্শ পুত্র, আদর্শ ভ্রাতা, আদর্শ স্বামী। তেমনি সীতা, লক্ষ্মণ, দশরথ, কৈকেয়ী থেকে মন্থরা, শূর্পনখা পর্যন্ত প্রত্যেকটি মানুষ বাঙালী আদর্শের প্রলেপে পুনর্গঠিত। আর ভক্ত প্রধান হনুমান কর্মী, জীবন্ত চরিত্র। কৃত্তিবাসের সময়ে সম্ভবত রামচন্দ্র বিষ্ণুর অবতার রূপে ভক্ত-সমাজের ভক্তি-আরাধনার বিগ্রহ হয়ে উঠেছেন, রামায়ণও ভক্তিকাব্য হতে আরম্ভ করেছে। তথাপি তখনো গার্হস্থ্য ও সামাজিক আদর্শের চিত্র রূপেই রামায়ণ রচিত হয়ে থাকবে। পরবর্তী কালে যখন চৈতন্যদেবের ভক্তিপ্লাবনে বাঙ্‌লা দেশ ভেসে গেল, তখন এই গার্হস্থ্য চেতনা অপেক্ষা ভক্তির আবেগই হয়ে উঠল রামায়ণের এবং মধ্যযুগের বাঙ্‌লা কাব্যের মুখ্যভাব। তাই, এখনকার কৃত্তিবাসী রামায়ণেও আমরা এই ভক্তিরসের সুরটিকেই প্রধান সুররূপে দেখতে পাই—অবশ্য রামায়ণের এই কাহিনীতে তেমন ব্যাকুল উচ্ছ্বাসবহুল হয়ে উঠতে পারে নি সেই ভক্তিরস। কিন্তু সত্য কথা বললে, তাতে তুলসীদাসের 'রামচরিতমানসে'র মতো অনাবিলতা ও কবিত্বও নেই। তুলসীদাস অবশ্য একশতাব্দী পরেকার কবি।

মনসামঙ্গলের প্রাচীন কাব্য

রাধাকৃষ্ণ কাহিনী বা রামায়ণ কাহিনী দুই-ই মূলত 'সংস্কৃতের বস্তু'। 'বাঙলার জিনিস' নিয়ে সে যুগে যা রচিত হয়েছিল তার মধ্যে আমরা পাই মনসামঙ্গলের কয়েকখানা প্রাচীন পুঁথি। চণ্ডীমঙ্গল ও ধর্মমঙ্গলের প্রথম

দিককার কবিদের নাম পাওয়া গেলেও তাঁদের কারও পুঁথি পাওয়া যায় নি, কালও স্থির করা যায় নি। ময়নামতী-গোপীচন্দ্রের সম্বন্ধেও সেই একই কথা। মনসামঙ্গলেরও প্রথম দিককার যেসব রচয়িতাদের আমরা চৈতন্যপ্রভাব-মুক্ত বলে চৈতন্য-পূর্বাকালের বা তাঁর সমকালের বলে গ্রহণ করছি, তাঁদের পুঁথি ও পুঁথির ভাষা তত পুরানো নয়। তথাপি আমরা এ-কথা জানি, বিষহরির পুজো সে যুগে সুপ্রচলিত ছিল। কাজেই, মনসামঙ্গলের এই অপেক্ষাকৃত পুরনো কাব্যগুলির মধ্যে চৈতন্যপূর্ব যুগের বাঙ্‌লার কাহিনী ও ভাব, হয়তো বা কতকটা রচনাও, যে টিকে রয়েছে, তা অনুমান করা যেতে পারে।

মনসামঙ্গলও পাঁচালী পালা। এর কবিও আছেন শতাধিক, মুদ্রিতও হয়েছে অনেক পুঁথি। গান করে রাতের পর রাত তা গাওয়া হত। এখন (১৯৪৭-এর পরে) তা আর পূর্ব বাঙ্‌লায় ও উত্তর বাঙ্‌লায় গাওয়া হয় কি না জানি না; কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথম বিশ-ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত মুসলমানপ্রধান ঐসব অঞ্চলের মুসলমানরাই ছিল শ্রোতা হিসাবে অধিক উৎসাহী—'গায়েন'রাও অনেক ক্ষেত্রেই ছিলেন মুসলমান। তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। সেই ঝোপঝাড়, বনবাদাড়ের দেশের সাধারণ মানুষকে জীবিকার ধান্দায় রাত-বেরাতে ঘুরতে হয়; তারা সাপের দেবীকে অবজ্ঞা করবে কি করে? বেদ-পুরাণ, কোরাণ-হাদিস তো সর্পাঘাত থেকে তাদের রক্ষা করতে পারে না। আর তাছাড়া, বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনী শোনবার আগ্রহও তাদের কম নয়;—বহু-বহু পুরুষ ধরে এই সাধারণ মানুষের মধ্যেই যে বাঙ্‌লার এই কথাবস্তু তাদেরই গানে গানে গড়ে উঠেছে।

বেহুলার ভাসান: মনসা অবশ্য অনেক পুরনো দেবী,—পদ্মা, বিষহরি প্রভৃতি তাঁর আরও নাম আছে। নাগপূজা বহু আদিম ও সভ্য জাতির মধ্যেই সুপ্রচলিত ছিল; মোহেন-জো-দড়োতেও তার চিহ্ন রয়েছে। 'মনসা' নামটি বেদেও পাওয়া যায়। কিন্তু বাঙ্‌লা মনসামঙ্গলের প্রাণবস্তু বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনী। চম্পকনগরের রাজা চাঁদ বেনে, তিনি মনসার পুজো না দিলে পৃথিবীতে মনসার পুজো প্রচলিত হবে না। কিন্তু চাঁদ শিবের ভক্ত; 'কানি চ্যাং মুড়ি'কে পুজো দেবেন কেন? মনসা ক্রুদ্ধ হয়ে ছলে-বলে-কৌশলে চাঁদ বেনের সর্বনাশ করলেন; তাঁর 'মহাজ্ঞান' নামে শক্তি

অপহরণ করলেন ; তাঁর ছয় ছেলে একে একে নিহত হল। চাঁদের ঘর ভরে গেল রাণী সনকা ও বিধবা পুত্রবধূদের কান্নায়। চাঁদ তখন বাণিজ্য-যাত্রা করলেন। অমনি তাঁর 'সপ্তডিঙা মধুকর' ডুবিয়ে দিলেন মনসা। তারপর বিদেশে রাজরোষে ফেলে চাঁদের লাঞ্ছনার একশেষ করলেন। কিন্তু চাঁদ বেনে ভাঙেন না। ইন্দ্রের শাপে তখন মনসার পুজো প্রচলনের জন্য চম্পকনগরে চাঁদের ঘরে জন্ম নিলেন অনিরুদ্ধ ; আর উজানীতে জন্ম নিলেন চাঁদ বেনেদের পাল্‌টা ঘরে তাঁর স্ত্রী উষা। সে ছেলের নাম হল লখিন্দর, আর সে মেয়ের নাম হল বেহুলা। বাল্য ছাড়িয়ে তাদের কৈশোর উত্তীর্ণ হয়ে গেল। সনকা এবার ছেলের বিয়ে দেবেন। কিন্তু জানতেন বিয়ের রাত্রেই মনসার কোপে সর্পদংশনে লখিন্দরের মৃত্যু লেখা আছে। তেমন বউ কে যে স্বামীর এ মৃত্যু খণ্ডাতে পারে? অনেক খুঁজে অনেক পরীক্ষা করে পাওয়া গেল বেহুলাকে। আর এদিকে চাঁদ লৌহ-মন্দির নির্মাণ করলেন পুত্রের বিবাহরাত্রের বাসরশয্যার জন্য, হাতে হিন্তালের লাঠি নিয়ে নিজে পাহারা দিতে লাগলেন সেই মন্দির। কিন্তু জানবেন কি করে যে মনসার ভয়ে স্থপতি বিশ্বকর্মা সেই মন্দিরের গায়ে এক তিল পরিমাণ ছিদ্র রেখে দিয়েছিলেন? সেই অদৃশ্য ছিদ্রপথে সূত্রের মতো ঢুকল কালনাগ, আর বিবাহ-রাত্রেই দংশন করল লখিন্দরকে। বেহুলাও পরাজয় মানবেন না, স্বামীর মৃতদেহ ভেলায় নিয়ে তিনি চললেন ভেসে,—যমপুরে যাবেন, লখিন্দরের জীবন ভিক্ষা করে উদ্ধার করবেন। ভেলা চলল, কত দেশ-বিদেশ দিয়ে :—ভুগোলের দেশ আর উপকথার দেশে একাকার। জীবে মানুষে মিলে কত ছলনা আর কত বিভীষিকা উৎপাদন করছে সতী বেহুলার চারিদিকে। ত্রিবেণীর ঘাটে এসে লাগল ভেলা। বেহুলাকে উপায় নির্দেশ করবার জন্য সেখানে তখন এল নেতা ধোবানী—মনসার সে অনুচরী। বেহুলা দেখলেন—আশ্চর্য কাণ্ড! সকালে এসে নেতা ছেলেকে মারে, কাপড় কাচে, আবার সন্ধ্যায় সেই ছেলেকে জীইয়ে তুলে মা আর ছেলে ফিরে যায় বাড়ীতে। বেহুলা বুঝলেন—এখানেই তো আছে মৃতের সঞ্জীবনী। নেতাকে তখন ধরলেন বেহুলা। নেতাও তাঁকে নিয়ে চলল স্বর্গে। কিন্তু প্রাণ কি সহজে ফিরে পাওয়া যায়? বেহুলা নাচে গানে দেবতাদের তুষ্ট করে উদ্ধার করলেন লখিন্দরের প্রাণ, চাঁদের অন্য ছয় পুত্রেরও প্রাণ ; কিন্তু চাঁদ বেনেকে দিয়ে মনসার পুজো দেওয়াবেন, এই হল এই প্রাণপণের শর্ত। বেহুলা-

লখিন্দর তখন ফিরে এলেন উজানীতে। অন্য ছয় পুত্রও বেঁচে উঠেছে, সব ফিরিয়ে দিচ্ছেন মনসা। কিন্তু চাঁদ বেনে কি তাই বলে পুজো দেবেন 'কানি চ্যাং মুড়ি'কে? বেহুলার লক্ষ্মী বউ, তাঁর মুখ চেয়েই শেষ পর্যন্ত রাজী হলেন চাঁদ বেনে মনসার পুজো দিতে—চাঁদ বাম হস্তে মনসার পূজো, দিলেন, মনসার পুজো পৃথিবীতে প্রচলিত হল।

এই উপাখ্যানের চারদিকে অসম্ভবের রাজ্য :—বণিকের রাজ্য, সমুদ্র-যাত্রা, বেহুলার গুণের পরীক্ষা, লৌহমন্দির নির্মাণ, বেহুলার নদীপথে যমপুরে যাত্রা—এ সবে লোককল্পনা ও পরিকল্পনা পক্ষবিস্তার করে উড্ডীন হতে পারে, এমন কি অসম্ভবের আতিশয্যে শূন্যে আপনাকে হারিয়েও ফেলে। তবুও এ কাহিনীর পাদপীঠটি একটি স্থির পৃথিবীর জীবনযাত্রার সঙ্গে জড়িত। উজানী নগরের বণিকবধূ সনকার সোনার সংসারেও আসে সর্বনাশ,—এ ভাগ্য-বিপর্যয় বুঝি সেদিনের সমাজে ছিল সুপরিচিত ঘটনা। চাঁদ ও বেহুলার মত ভাগ্য-তাড়িত মানুষেরও বুঝি সে যুগে অভাব ছিল না। দেবতার রোষ, অদৃষ্টের বিধান, ও জন্ম-জন্মান্তরের কর্মফল বলে এই দুর্ভাগ্যকে মেনে নেবার শিক্ষা সাধারণ ভাবেই তাই আসত। কিন্তু এ কাহিনীতে তা এল যে দুটি চরিত্র অবলম্বন করে তার একটি গরিমামণ্ডিত, অন্যটি মাধুর্যের প্রতীক। ট্রাজেডির নায়কের চরিত্রের মতো দৃঢ়তা আর মহিমা আছে এই চাঁদ বেনের চরিত্রে। আর ট্র্যাজিক নায়িকার মতোই সাহস ও সহজাত সৌন্দর্য আছে বেহুলার চরিত্রে। তাদের পাশে অন্যেরা ম্লান হয়ে যায়। এ কাহিনীকে মনসার বিজয়ও ততটা বলা যায় না, এখানে আসলে বিজয় বেহুলারই। কারণ, ক্রুর আক্রোশময়ী মনসা দেবী সে দিনের অত্যাচারী, স্বৈরতন্ত্রী রাজশক্তির মতো শেষ প ন্ত যথেচ্ছ শক্তির দ্বারাই উদ্দেশ্য সিদ্ধি করেন; ভক্তি বা শ্রদ্ধামিশ্রিত বিস্ময় তিনি উদ্রেক করতে পারেন না। অবশ্য, মনসাও দেবতার সমাজে বড় নির্যাতিতা, স্বর্গের উচ্চবর্গের চক্ষে অপাঙ্‌ক্তেয়া। আপনার শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি তাঁকে আদায় করতে হয় অক্লান্ত সংগ্রাম করে, অন্য পথ নেই। অনেক সংগ্রাম-সংঘর্ষের ফলে তবেই হিন্দু সমাজের নিম্নবর্গের অধিকারহীন সাধারণ মানুষ স্বীকৃতি আদায় করে কায়েমি স্বার্থের ও কায়েমি হিন্দু চিন্তার অধিকারী উচ্চবর্গের কাছ থেকে। তাদের দেবতাও না হলে থাকেন উচ্চবর্গের পূজিত দেবসমাজে অস্বীকৃত। আর এই স্বীকৃতি যেখানে সমাজে উচ্চ-নীচের

আপোষ-রক্ষার ফলে ঘটে, সেখানে উচ্চবর্গের কবিদের পরিকল্পনায় উচ্চবর্গের ভাগ্যতাড়িত পুরুষই হয়ে ওঠেন চাঁদের মত মহৎ গুণগ্রামের আধার।

মনসামঙ্গলের প্রথম কবি : কাণা হরিদত্ত মনসার গীত প্রথম রচনা করেন বলে কথিত হয়। বিজয়গুপ্তের "পদ্মপুরাণে" বা মনসামঙ্গলেও তাঁর নামের উল্লেখ আছে। আর তাতে বলা হয়েছে "হরিদত্তের গীত যত লোপ পাইল কালে"। যা লোপ পায় নি, তার মধ্যে প্রথম মনসামঙ্গলের লেখক বিপ্রদাস পিপলাই ও বিজয়গুপ্ত।

বিজয়গুপ্ত : বিজয়গুপ্তের 'পদ্মপুরাণ'ই এতদিন প্রাচীনতম গ্রন্থ বলে গৃহীত হত। কিন্তু এখন সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ জন্মেছে। কারণ সমগ্র পুঁথি কোথাও পাওয়া যায় নি। খণ্ড খণ্ড ভাবে বিজয়গুপ্তের রচনা পাওয়া গিয়েছে—নানা পুঁথিতে; নানা লোকের রচনা মিশে গিয়েছে গায়েনদের মুখে। যাই হোক, বিজয়গুপ্ত আত্মপরিচয় রেখে গিয়েছেন। তিনি ফুল্লশ্রী গ্রামের সনাতন গুপ্তের পুত্র। ফুল্লশ্রী বরিশাল জেলার বৈদ্যপ্রধান গৈলা গ্রামের কাছে ছিল বলে অনুমান করা হয়। এই মনসামঙ্গল গ্রন্থ বাঙ্‌লা সাহিত্যের বহু-স্বীকৃত বস্তু। বহুরূপে নবায়িত, কিন্তু এখনো পড়া চলে। গ্রন্থ রচিত হয় ১৪৯৪তে, যখন 'সুলতান হুসেন শাহ নৃপতিতিলক' ছিলেন বাংলার সিংহাসনে। কাজীর অত্যাচার প্রভৃতি এক আধটুকু সাময়িক অবস্থার উল্লেখও আছে, চৈতন্যজীবনীতেও যা পাওয়া যায়।

বিপ্রদাস : হুসেন শাহের উল্লেখ আছে বিপ্রদাস পিপলাইয়ের 'মনসা-বিজয়ে'ও। তিনিও আত্মপরিচয় রেখে গিয়েছেন। নাড়ুড়্যা বটগ্রাম (২৪ পরগণা) তাঁর বাড়ী। ব্রাহ্মণ বংশে তাঁর জন্ম। (ডঃ সুকুমার সেনের সম্পাদনায় এ, এস, বি থেকে সম্প্রতি এ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে) রচনার দিক থেকে এ গ্রন্থের প্রথমার্ধে ধর্মঠাকুর, মনসা ও চণ্ডীর কলহ নিয়ে এত উৎকট গল্প আছে যাতে পাঠক হাঁপিয়ে ওঠে; শেষার্ধে এসে লখিন্দর বেহুলার কাহিনী পাওয়া যায়; তখন পাঠকও উদ্ধার পায়। গ্রন্থের রচনা কাল খ্রীঃ ১৪৯৫।৯৬।

মঙ্গল-কাব্যের সাধারণ কাব্যগুণ : এসব সুদীর্ঘ কাব্য আজকের দিনের পাঠকের পক্ষে পড়া কষ্টসাধ্য; একমাত্র বেহুলা-লখিন্দরের মানবীয় কাহিনীই তার আকর্ষণ। নইলে মনসামঙ্গল অলৌকিক উপাখ্যানের দুর্ভেদ্য অরণ্য। কল্পনায় শ্রী নেই, কবিত্বও সামান্য; আর যেটুকু বা আছে, সংস্কৃত কাব্যরীতির বাঁধনে সে কবিত্বও আড়ষ্ট। শুধু মনসামঙ্গল নয়, দু'একখানা

মঙ্গল-কাব্য ছাড়া অধিকাংশ মঙ্গল-কাব্যেরই এই অবস্থা। চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, প্রভৃতি সমস্ত মঙ্গল-কাব্যই একই মূল কাহিনীর পুনরাবৃত্তি, কোনো একটি ভক্তের পরীক্ষার নামে বিশেষ কোনো দেবদেবীর জয় ঘোষণা। অবশ্য তাঁরা মনসাদেবীর মতো অত ক্রূর অমন আক্রোশপরায়ণ নন, তবু তাঁরাও জোর করেই পূজো আদায় করেন। স্বেচ্ছাচারিতার যুগে দেবতারা স্বেচ্ছাচারিতারই বিগ্রহ, মানুষ যেন তাদের ক্রীড়া-পুত্তলিকা। প্রধানত কাহিনীর জন্যই সংস্কৃতিসন্ধানীরা এসবকে মূল্য দেন। বিশেষজ্ঞরাও গবেষণার জন্য ছাড়া প্রায়ই এসব কাব্য পড়ে দেখেন না। এরূপ কাব্যের লেখকও কম নয়—একই কাহিনী তাদের বিষয়বস্তু। তাই রচনার প্রাচীনতা, আখ্যানের কোনো একটি বিশিষ্ট বর্ণনা-ভঙ্গী, সমসাময়িক কোনো ঘটনার আভাস কিম্বা সত্যকার সাহিত্যগুণ—এর কোনো একটি বৈশিষ্ট্য না থাকলে এসব কাব্যের উল্লেখও এখন নিরর্থক।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চৈতন্য-সাহিত্য

(খ্রীঃ ১৫০০—খ্রীঃ ১৭০০)

"প্রেম পৃথিবীতে একবার মাত্র রূপ গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা বাঙ্গলাদেশে"—বাঙ্‌লা সাহিত্যের সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক পরলোকগত সাহিত্যিক দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের এ কথাটি অনেকেরই কানে অত্যুক্তি বলে মনে হবে। কিন্তু কথাটি তাঁর একার নয়, কথাটি সাধারণ বাঙালী হিন্দু নর-নারীর অধিকাংশের। চৈতন্যদেব তাঁদের অনেকেরই কাছে প্রেমের অবতার; আরও অনেকেরই কাছে মহাভাবের জীবন্ত বিগ্রহ। এই প্রেমোন্মাদ সন্ন্যাসী বাঙালীর জীবনে ও ইতিহাসে যে অপূর্ব প্রেরণা দান করে যান, বাঙ্‌লা সাহিত্যের ইতিহাসের দিক থেকে তা বিচার করলে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবকে বাঙালীর ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ ঘটনা বলে মানতেই হবে। সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেউ বাঙ্‌লা সাহিত্যকে এমন সৃষ্টি প্রেরণায় প্রাণবন্ত করে তুলতে পারেন নি। তাই একটি পঙ্‌ক্তি না লিখলেও শ্রীচৈতন্য ইংরেজ-পূর্বযুগের বাঙ্‌লা সাহিত্যের ইতিহাসের প্রধান পুরুষ।

শ্রীচৈতন্য ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে (১৪০৭ শকাব্দে) নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন, ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে (১৪৫৫ শকাব্দে) পুরীতে তাঁর দেহাবসান হয়। তাঁর পিতা ছিলেন নবদ্বীপ-প্রবাসী শ্রীহট্টের পণ্ডিত জগন্নাথ মিশ্র, মাতা শচীদেবী। তাঁর এক অগ্রজ বিশ্বরূপ অল্প বয়সেই গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। শ্রীচৈতন্যের নাম ছিল বিশ্বম্ভর, ডাকনাম ছিল নিমাই। তাঁর গায়ের রঙ ছিল গৌরবর্ণ, তাই তাঁর নাম গৌরাঙ্গ (গোরা)। অসাধারণ মেধাবী নিমাই কিন্তু বাল্যে ছিলেন অত্যন্ত চঞ্চলপ্রকৃতি-বিশিষ্ট ; নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের ও টোলের পড়ুয়াদের ক্ষ্যাপাতে, জ্বালাতন করতে ওস্তাদ। সেদিনের নবদ্বীপ ছিল নব্যন্যায়ের পীঠস্থান। এই দুষ্টু ছেলেই যৌবনে সেখানকার সর্বাগ্রগণ্য পণ্ডিত হয়ে উঠলেন। অধ্যাপক রূপে টোলও তিনি খুললেন। নবদ্বীপে তখন বৈষ্ণব ধর্মেরও জাগরণ আরম্ভ হয়েছিল, তার ইতিহাস আছে ; আর তা চৈতন্যদেবের সহচরদের দেখেও বোঝা যায়। নিমাই পণ্ডিতের জীবনেও ধর্মের ও আধ্যাত্মিকতার ঢেউ নিশ্চয়ই আগেই লেগেছিল ; কিন্তু পিতৃকৃত্য করতে গয়া গিয়ে তিনি যখন ঈশ্বরপুরীর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করলেন, তারপর থেকেই তাঁর জীবনে এক নূতন পর্বের সূচনা হল।

ভগবৎপ্রেমে পাগল হয়ে বিশ্বম্ভর তখন নবদ্বীপে মস্তাগবত পাঠ, হরিসংকীর্তন প্রভৃতি নিয়ে মেতে উঠলেন। তাঁর ভাবের বন্যায় নবদ্বীপ তখন টলমল করতে লাগল। তাঁর প্রধান সঙ্গী তখন নিত্যানন্দ ও যবন হরিদাস। কিন্তু তখনো চৈতন্যদেবের ভক্তি-জীবনের মাত্র প্রথম পর্ব। তিনি তখনো সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নি। এর পরে ২৪ বৎসর বয়সে কাটোয়ায় কেশব ভারতীর কাছে সন্ন্যাস গ্রহণ করে নিমাই হলেন 'শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য', সাধারণ কথায় 'শ্রীচৈতন্য'। তাঁর নবদ্বীপ-লীলার সহচরেরা তাঁকেই আরাধ্য এবং অবতার রূপে সাধনার লক্ষ্য বলে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। তাঁরা অনেকেই চৈতন্যের পরবর্তী জীবন-লীলা, তাঁর রাধাভাবের সাধনা, কৃষ্ণপ্রেমের উজ্জ্বল উল্লাস স্বচক্ষে দেখেন নি, সেই লীলার বিশেষ উল্লেখও করেন নি। তাঁদের নিকট গৌরলীলাই প্রধান কথা।

সন্ন্যাস গ্রহণ করে চৈতন্যদেব পুরীতে যান। বলতে গেলে তখন থেকে পুরীতে নীলাচলই হয়ে ওঠে তাঁর প্রধান আসন। অবশ্য প্রথম দিকে তা ছেড়ে অন্তত তিন-চারবার তীর্থ পর্যটনেও তিনি বেরিয়েছিলেন, তাতে

ছ বছর কেটে যায়। প্রথমবার তিনি দাক্ষিণাত্য, মহারাষ্ট্র ও গুজরাট ভ্রমণ করেন। দ্বিতীয়বারে তাঁর লক্ষ্য ছিল বৃন্দাবন। কিন্তু শান্তিপুর, গৌড় ও রামকেলি হয়ে তিনি ফিরে আসেন। এই রামকেলিতেই তখন তাঁর সংস্পর্শে আসেন সুলতান হুসেন শাহের মন্ত্রী 'দবীর খাস্' সনাতন ও 'সাকর মল্লিক' রূপ। এই দুই ভাই বৈষ্ণব ইতিহাসের দুই অপরাজেয় ভক্ত পণ্ডিত, বৃন্দাবনের গোস্বামীদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় দুই গোস্বামী। শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে সাক্ষাতের পর তাঁরাও সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। এর পরে শ্রীচৈতন্য যখন তীর্থযাত্রা করলেন তখন ঝাড়খণ্ড (ছোটনাগপুর) হয়ে অরণ্যময় পথে গেলেন। কাশী, মথুরা প্রভৃতি বড় বড় তীর্থ তাঁর পথে পড়ল; সাধু, সন্ন্যাসী, পণ্ডিত, দার্শনিক সকলের সঙ্গে পথে পথে তাঁর প্রেমধর্ম নিয়ে বহু বিচার হল। প্রয়াগে তাঁর সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ হয় রূপের; আর প্রত্যাবর্তনের পথে কাশীতে সনাতন তাঁর সঙ্গে মিলিত হন।

এই তীর্থপর্যটনের ফলে ভারতবর্ষের বিরাট জীবনের সঙ্গে শুধু শ্রীচৈতন্য-দেবেরই যে পরিচয় ঘটল, তা নয়। তাঁর জীবন ও প্রেমধর্ম যখন সমস্ত সম-সাময়িক বাঙালী জীবনকে প্রেরণা দান করল তখন সাধারণ ভাবে সেই বাঙালীও ভারতের প্রাণকেন্দ্রের সঙ্গে আপনার যোগ স্থাপন করল, বাঙালীর দৃষ্টি প্রাদেশিকতার গণ্ডী ছাড়িয়ে গেল। এ ব্যাপারে চৈতন্যদেবের জীবনই হল তাদের প্রথম যোগসূত্র, আর তাঁর পরে সে সূত্র অবিচ্ছিন্ন রাখলেন বৃন্দাবনের গোস্বামীরা। তাঁরাই হয়ে ওঠেন গৌড়ীয় ভক্তিধর্মের প্রধান প্রণেতা ও পরিচালক।

কিন্তু শ্রীচৈতন্যের তীর্থপর্যটনের পর্ব শেষ হয়ে এসেছিল। এর পরে জীবনের শেষ আঠার বছর শ্রীচৈতন্য আর পুরী ছেড়ে কোথাও যান নি। রথযাত্রার সময় তাঁর বাঙালী ভক্ত ও অনুচরবৃন্দ অনেকে পুরীতেই আসতেন। সমস্ত সময়টা অতিবাহিত হত শ্রীকৃষ্ণলীলার কীর্তনে, গানে, প্রবল প্রেম-উচ্ছ্বাসে। দিনের পর দিন তাঁর জীবন কৃষ্ণ-প্রীতিতে উদ্বেল হয়ে উঠত। শেষের কয়েক বৎসর তাঁর প্রায়ই বাহ্যজ্ঞানও থাকত না, ক্ষণে ক্ষণে তিনি শ্রীকৃষ্ণের মিলন-বিরহ কল্পনায় বিহ্বল বিবশ হয়ে পড়তেন। এই দিব্যোন্মাদ অবস্থাই তাঁর অন্ত্যলীলা, এ সময়ে 'গম্ভীরা'য় সময় কাটত তাঁর। স্বাভাবিক মনুষ্য-দেহ ও মনুষ্য-প্রাণ এই প্রবল স্নায়বিক উত্তেজনায় ক্ষয় হয়ে যাবার কথা, সম্ভবত তা যাচ্ছিলও। কিন্তু একথা বললে ভুল হবে না

যে, সত্যই প্রেম সেদিন রূপ গ্রহণ করেছিল, আর তা এই বাঙালী সন্ন্যাসীরই মধ্যে।

৪৮ বৎসর বয়সে পুরীতে শ্রীচৈতন্যের তিরোভাব ঘটে। কিন্তু কোথায় এবং কিভাবে এই মহাপ্রেমিকের দেহাবসান হল, তার সঠিক উল্লেখ পাওয়া যায় না। পুরীতে কৃষ্ণভ্রমে সমুদ্রের নীলজলে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েন, এই হল সুপ্রচলিত কাহিনী। রথযাত্রার সময় নৃত্যকালে পায়ে তিনি আঘাত পান, আর তাতেই তাঁর দেহাবসান হয়, এ হল আর একটি ক্ষুদ্র বিবৃতি। আসল কথা, বহু পূর্বেই 'মহাপ্রভু' অবতার বলে ভক্ত-সমাজে গৃহীত হয়েছেন। সেকালে কেন, এখনও যে এদেশ অবতারের দেশ। কাজেই তাঁর মৃত্যুর কথা আর ভক্ত-সমাজ আলোচনাই করেন না, তা তাঁর দেব-লীলার চূড়ান্ত রহস্য।

সামাজিক পরিবেশ ঃ এই হল চৈতন্যদেবের জীবনীর রূপ-রেখা ; আর খ্রীষ্টীয় ১৪৮৬ থেকে খ্রীষ্টীয় ১৫৩৩ এই হল চৈতন্যদেবের জীবন-কাল। চৈতন্যের বাল্যকালেই খ্রীঃ ১৪৯৩-এ হুসেন শাহ্ গৌড়ের সুলতান হন, তাঁর পুত্র নুসরৎ শাহ্ রাজত্ব করেন খ্রীঃ ১৫১৯ থেকে ১৫৩২ অব্দ পর্যন্ত। মধ্যযুগের বাঙলার ইতিহাসে এটি সর্বাপেক্ষা গৌরবের কাল। বাঙ্লা সাহিত্যের ভাগ্যাকাশে হুসেন শাহ্ ও নুসরৎ শাহ্ দুই উজ্জ্বল নক্ষত্র। রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তার পূর্বেই নৈশান্ধকার লঘু হয়ে আসছিল। অর্থাৎ এখানে সেখানে মুসলমান শাসকগণ হিন্দুর উপরে অত্যাচার করলেও বিজেতার সেই ধর্মগত উগ্রতা তখন আর নেই। অন্তত সুলতান ও শাসকবর্গ পুরাতন হিন্দু শাসকবর্গকে সমাদর করতে প্রস্তুত। হিন্দু কারিগর, কর্মচারী প্রভৃতি সাধারণ লোকদেরও তাঁরা উৎপীড়ন করতে ব্যস্ত নন। মালাধর বসুর মতো সনাতন রূপ প্রভৃতি অভিজাতেরা স্বচ্ছন্দেই রাজদরবারে উচ্চপদে আরূঢ়। এক কথায়, উপরতলার হিন্দু সমাজ ও উপরতলার মুসলিম সমাজও অনেকটা পরস্পরের সন্নিকট হতে চলেছে। তার ফলে, পরাগল খাঁর মতো উচ্চবর্গের মুসলমানরাও যেমন রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতির পাঁচালী গান শুনছিলেন, উচ্চবর্গের হিন্দুরাও তার চেয়ে বেশি ফারসী, আরবী প্রভৃতি পড়ে রাজদরবারের ম্লেচ্ছ-আচার কিছু-না-কিছু গ্রহণ করছিলেন। অথচ হিন্দুর সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ তখনই আবার শাস্ত্রচর্চা করে, নূতন দর্শন, স্মৃতি প্রভৃতি প্রণয়ন করে হিন্দু উচ্চবর্ণকে আত্ম-মর্যাদায় আস্থাশীল করে তুলছে।

মালাধর বসু-ও রাজ-প্রসাদে অস্বস্তি বোধ করেন; সনাতন ও রূপের ত কথাই নেই। মনে হয়, হিন্দুর সাংস্কৃতিক জাগরণ চৈতন্যদেবের পূর্বেই সেই শাসকবর্গের সন্নিকটস্থ হিন্দু অভিজাতবর্গকে পর্যন্ত আপনার স্বপক্ষে লাভ করেছিল। অবশ্য এ জাগরণ নিতান্তই সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক নয়; তাই সুলতানদেরও আপত্তি হয় নি। এই ছিল শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব-কালে বাঙালী সমাজের অবস্থা। মিলিত বাঙালী হিন্দু-মুসলমান স্তরের নয়, বরং সেই নব-জাগ্রত আত্মরক্ষাকামী সংস্কৃতির প্রাণ-পুরুষ হয়ে উঠলেন শ্রীচৈতন্য-দেব আর তাঁর বৈষ্ণব-মণ্ডলী।

অন্যদিকে একটা কথা স্মরণীয়—চৈতন্যদেবের তিরোধানের (১৫৩৩ খ্রীঃ) সময়ে পাঠান রাজত্ব দুর্বল হয়ে পড়েছিল। পূর্বের তুর্কী ঔদ্ধত্য আর ছিল না, কিন্তু ছিল দুর্বল রাজত্বে ডিহিদার, ইজারাদার প্রভৃতি সামন্ত প্রভুদের অত্যাচার—খাজনা আদায়ের পীড়াপীড়ি, দুর্বলের প্রতি প্রবলের পীড়ন। মুসলমান সামন্তরা স্বভাবতই সে উৎপীড়ন চালাত ধর্মের নামে; বিজয়ী বলে আর নয়; সামন্ত-প্রভু বলেই। কিন্তু ১৫৭৫-৭৬ খ্রীষ্টাব্দে মোগলেরা বাঙ্‌লা দেশ অধিকার করে;—অবশ্য বাঙ্‌লা দেশকে সম্পূর্ণ সেই কেন্দ্রীয় শাসনের তলায় আনতে আনতে আকবরের রাজত্ব প্রায় শেষ হয়—অর্থাৎ সপ্তদশ শতকের প্রারম্ভ থেকে মোটের উপর বাঙ্‌লা দেশে সামন্ত শক্তির উপদ্রব হ্রাস পায়। ততদিনে, একেবারে উত্তরাপথ থেকে শাসকবর্গের যে-সমস্ত মুসলমান কর্মচারী আসতেন তাঁরা ছাড়া অন্যান্য মুসলমান ছোট বড় সকলেই বাঙ্‌লা-ভাষী বাঙালীই হয়ে গিয়েছেন। বিজিত-বিজয়ীর যে বিরোধকে আশ্রয় করে শাসিত হিন্দুর প্রতিরোধ (১৩শ-১৫শ শতকে) সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ রূপে মূর্ত হয়েছিল, তা যখন সার্থক হল (১৬শ ও ১৭শ শতকে), তার পূর্বেই সেই বিজেতা-বিজিত বিরোধ হ্রাস পাচ্ছিল, এখন (১৭শ শতকে) তা বিলুপ্ত হল। সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ সার্থক হতেই এ সময়ে এখন বিরোধ মন্দীভূত, অনেকটা নিরর্থক হয়ে উঠল। কারণ শাসকশক্তি তখন শাসিতের সাংস্কৃতিক পথ মুক্ত করে দিয়েছে। অষ্টাদশ শতকে এসে তাই মোগল শাসনও তার দরবারী কায়দা-কানুন বিস্তারের প্রশস্ততর পথ পেল। বাঙ্‌লা সাহিত্যের চৈতন্য যুগ (খ্রীঃ ১৫০০-খ্রীঃ ১৭০০) অপেক্ষাকৃত নিরুপদ্রব সাংস্কৃতিক বিকাশের যুগ—যদিও বৈষ্ণব প্রেরণা ছিল প্রতিরোধের প্রেরণা, সে প্রতি-রোধ রাজনৈতিক নয়, আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক।

মধ্যযুগে উত্তর ভারতে, পারস্যে, ইউরোপে ও অনেক দেশে এরূপ আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন সাধক সম্প্রদায় ও তাঁদের ধর্মগুরুদের আবির্ভাব দেখা যায়, এটা আকস্মিক নয়। কারণ, তখন সমাজ সামন্ত যুগের কঠিন নিগড়ে বাঁধা ছিল। সেই বন্ধনের জ্বালা তারই মধ্যে কখন কখন অতি-সংবেদনশীল চিত্তে অসহ্য হয়ে উঠত। তাঁরা সেদিনের শ্রেষ্ঠ মানুষ, অচেতন বিদ্রোহী। তাঁদের সেই বিদ্রোহ তখনকার দিনে স্বাভাবিক ভাবেই রূপ গ্রহণ করত ধর্মগত কোন আবরণের আড়ালে—তাতে অনেক সময়ে বাস্তব রাজশক্তি ও সমাজশক্তির কঠোর শাসন এড়িয়ে যাওয়া যেত, অনেক সময়ে শাসকশক্তির অত্যাচার সইতেও হত না। অবশ্য বিদ্রোহটা বাস্তব ক্ষেত্রেও যে একেবারে প্রভাব বিস্তার করত না তা নয়। যখন সামন্ত যুগে সমস্ত সমাজই ছিল থাক-থাক করে ভেদের নীতিতে সংগঠিত—তখন এই আধ্যাত্মিক সাম্য ও মরমিয়া প্রেমভক্তিবাদ মানুষে মানুষে ভেদ-রেখা টানত না। এই আধ্যাত্মিক অভেদবাদ বাস্তব জীবনেও মানুষে মানুষে ভেদের রেখাটাকে মুছে ফেলতে চাইত। তাঁদের অনুচররা প্রায়ই আসত জনসাধারণ থেকে। আর তার জন্যই প্রায় দেশেই এই ধর্মগুরু ও তাঁদের মণ্ডলী রাজশক্তির হাতে নির্যাতিত হয়েছেন। একথা বিশেষ করে সত্য পারস্যের সুফী সাধকদের সম্বন্ধে ও ভারতের নানক-শিষ্য শিখদের সম্বন্ধে।

চৈতন্যদেবের দান: মধ্যযুগের সাধকদের যে কথা সত্য, তা শ্রীচৈতন্যদেবের সম্বন্ধেও সত্য—প্রেমধর্ম সম্বন্ধে তাঁর যে মতবাদ তা হল সামন্তযুগের মতাদর্শের বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদ, কিন্তু সামন্তযুগের মতাদর্শ থেকে সম্পূর্ণ মুক্তও নয়। তা সামন্ত সমাজ-ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ স্বীকার করে না, অথচ সে ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ উল্টে দিতেও প্রস্তুত নয়। চৈতন্যদেব মুসলমান-শাসিত হিন্দু সমাজের সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের প্রবক্তা হিসাবে সদাচারী, হিন্দু সমাজধর্মের পক্ষপাতী; জাতিভেদের বিরুদ্ধেও তিনি প্রত্যক্ষত দণ্ডায়মান হন নি। কিন্তু সামন্তযুগের অনুদার মতাদর্শকে অস্বীকার করেই তিনি প্রচার করলেন—জীবে দয়া, ঈশ্বরে ভক্তি, বিশেষ করে নাম-ধর্ম, নাম-সংকীর্তন। এই অধিকারভেদের দেশে কৃষ্ণ নামে আব্রাহ্মণ-চণ্ডাল সকলেরই অধিকার, এই একক সাধনার দেশে সকলের সমবেত সংকীর্তন নবদ্বীপের পথে পথে, পুরীর রথাগ্রেও সকল জাতের মানুষ নিয়ে প্রেমের পরমোৎসব—সেখানে যবন হরিদাস পর্যন্ত তাঁর পরম অনুগ্রহভাজন সহচর,—এসব চৈতন্য-

দেবের মহৎ সংস্কার-প্রয়াসেরই প্রমাণ। এদেশে, এ সমাজে—সে যুগের তুলনায়,—নিশ্চয়ই এই সাধনাদর্শ ও সাধন-প্রয়াসকে আমরা আজকের প্রচলিত ভাষায় 'গণতান্ত্রিক' বলতে পারি—যদিও তা রাষ্ট্রশক্তির সম্বন্ধে নিরপেক্ষ,—নবদ্বীপের কাজীর মত অত্যাচারী রাজপুরুষকে প্রতিরোধ করা তাঁর প্রয়োজন, কিন্তু সাধারণ ভাবে রাজা ও রাজশক্তিকে তা মেনে নেয়। সমাজশক্তিকেও তা অস্বীকার করতে ব্যস্ত নয়। কৃষ্ণনামে সকলের অধিকার স্থাপনেই তা সন্তুষ্ট, বর্ণভেদ, উচ্চনীচ ভেদ তুলে দিয়ে সামাজিক সংহতি স্থাপনের কথা মুসলমান সমাজকে দেখেও প্রয়োজন মনে করে নি। এ হিসাবে বুদ্ধদেবের সঙ্গেই চৈতন্যদেব তুলনীয়, দু'জনেই সমাজের মহৎ সংস্কারক, তবে বিপ্লবী নন, বিদ্রোহীও পুরোপুরি নন। সে ভাবে তাঁদের চিত্রিত করলে বা পরিমাপ করতে গেলে সেকালের উপর আমরা একালের আদর্শ চাপাবো।

মধ্যযুগের সাধারণ অন্যান্য সাধকগুরুর মতো শ্রীচেতন্যদেবেরও ভূমিকা ছিল প্রধানত সংস্কারকের, ভাববাদী বিদ্রোহীর। কিন্তু বাঙালী সমাজে তাঁর নিজস্ব একটি ভূমিকা ছিল, তাও আমরা এখানে দেখতে পাই। বাঙালী শাসিত শ্রেণীর সাংস্কৃতিক প্রতিরোধকে তিনি সার্থক রূপ দান করেন—একদিকে অভিজাতদের মধ্যে ম্লেচ্ছাচার রোধ করে, অন্যদিকে জনসাধারণকে সংকীর্তন ও নামধর্মের সাহায্যে প্রেমধর্মে সমান অধিকার দান করে। আর তৃতীয়ত এইভাবে হিন্দু সমাজের উচ্চ ও নিম্ন বর্গকে এক-ধর্মাচরণে ও ভাবাদর্শে পরস্পরের সন্নিকট করে শ্রীচৈতন্যদেব এক আত্মীয়-ভাবাপন্ন হিন্দু সমাজ গড়ে তুলতে সহায়তা করেন;—এবং সেই সমাজের মন থেকে আগেকার অনুষ্ঠান-বাহুল্য কতকটা বিদূরিত করেন, সাধারণ ভাবে সেই মনে জাগিয়ে তোলেন সমকালের প্রতি একটা মমতা (তাই চৈতন্য-ভক্তের কথা হল, 'প্রণমহ কলিযুগ সর্বযুগ সার'), মানুষের একটা মূল্যবোধ (তুচ্ছতম মানুষও 'মুচি হয়ে শুচি হয় যদি কৃষ্ণ ভজে')। নর মানুষেরও একটা ঐশী মহিমা ('কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্বোত্তম নরলীলা, নরবপু তাহার স্বরূপ')। এই সাংস্কৃতিক-সামাজিক জাগরণে বাঙালীর চেতনা সাহিত্যে, সঙ্গীতে, দর্শনে নানাদিকে অপূর্ব ভাবৈশ্বর্যে মূর্ত হয়ে উঠল। কিন্তু বাঙালীর এই জাগরণ সম্পূর্ণ জাগরণ নয়, কারণ বাস্তব জীবন ও বৈষয়িক উদ্যোগ-প্রয়াস এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্র থেকে দূরে সীমাবদ্ধ কয়েকটি ক্ষেত্রেই এই জাগরণ

আবদ্ধ ছিল। তবু এই জাগরণ এক পরম মহোৎসব, আর সাহিত্যে মুখ্যত তা শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁর ভক্ত বৈষ্ণব-মণ্ডলীর দান।

বৈষ্ণব-মহাজনমণ্ডলী

এই বৈষ্ণব-মণ্ডলী চৈতন্যদেবের জীবিত কাল থেকে আরম্ভ করে প্রায় একশত বৎসর বাঙালী সমাজকে প্রাণরস যুগিয়েছেন। তার পরেও তাঁদের ধারা অব্যাহত থাকে। আজও বাঙালী বৈষ্ণব-সমাজে পণ্ডিত, মনস্বী ও ভাবুকের অভাব নেই। কিন্তু কালের নিয়মে তাঁদের ধারা ক্রমে গতানুগতিক হয়ে পড়ে। জীবন্ত কাল এগিয়ে গিয়েছে, তাতে তাঁদের বাণী আপনার দান যুগিয়ে সার্থক হয়েছে, কিন্তু ক্রমে নিঃশেষিতও হয়ে গিয়েছে। অন্তত সাহিত্য হিসাবে ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দের পরে বৈষ্ণব প্রেরণা আর তত সৃষ্টিশালিনী রইল না। রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশও তখন পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে।

শ্রীচৈতন্যের নিজ পারিষদ্‌দের মধ্যে এমন অনেক পণ্ডিত ও মনীষী ছিলেন যাঁরা যে-কোনো যুগে তাঁদের অধ্যাত্ম-প্রতিভার জন্য বা পাণ্ডিত্যের জন্য নমস্য হতেন। বাঙ্‌লার সাংস্কৃতিক জাগরণ তাঁর সমকালে যে কোন্ স্তরে পৌঁছেছে, শ্রীচৈতন্যের মতোই এঁদের আবির্ভাবও তার প্রমাণ। এই মহা-প্রতিভাশালী ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে অনেকে তাঁদের কাব্য, দর্শন ও ভক্তিবাদের অলঙ্কার-শাস্ত্র প্রণয়ন করেছেন সংস্কৃত ভাষায়; বৈষ্ণব ধর্মের অনেক মূল গ্রন্থই সংস্কৃতে রচিত। কারণ, প্রেমধর্মটা ভারতীয় পণ্ডিত সমাজের নিকট প্রতিষ্ঠা না করলে চলে না, আর এই পণ্ডিত সমাজের সাংস্কৃতিক ভাষা সংস্কৃত। এসব সংস্কৃতে-রচিত সাহিত্য বাঙ্‌লা সাহিত্যের ইতিহাসে আলোচ্য নয়। কিন্তু এ সবের মধ্যে কোনো কোনো মূল গ্রন্থ সংস্কৃত থেকে বাঙ্‌লায় অনূদিত হয়েছে। তা ছাড়াও বাঙ্‌লায় রচিত বৈষ্ণব সাহিত্যও এই সব মূল শাস্ত্রের দ্বারা প্রভাবিত, সে হিসাবে এরকম কোনো কোনো মূল গ্রন্থের উল্লেখ না করলেই নয়। আর, যে মহাজনরা এসব গ্রন্থের রচয়িতা ও বৈষ্ণব-মণ্ডলীর পরিচালক, তাঁদেরও কিছুটা পরিচয় এই কারণে বাঙ্‌লা সাহিত্যের পাঠক-দেরও গ্রহণ করতে হয়।

শ্রীচৈতন্যদেবের নিজ পারিষদ্‌দের মধ্যে প্রধান ছিলেন অদ্বৈত আচার্য আর নিত্যানন্দ ও যবন হরিদাস। চৈতন্যের জন্মকালের পূর্বেই অদ্বৈত আচার্য পঞ্চাশ বৎসর উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছেন, মহাপ্রভুর তিরোধানের পরেও তিনি জীবিত ছিলেন। তিনিও শ্রীহট্টের এক পণ্ডিতের পুত্র। তাঁর দুই

পত্নী—শ্রীদেবী ও সীতাদেবী। আচার্য ও সীতাদেবীর জীবন-কথা বাঙলা সাহিত্যেও স্থান পেয়েছে। নিত্যানন্দের স্থান বাঙলার বৈষ্ণব সমাজে মহাপ্রভুর পরেই। তিনি ছিলেন বয়োজ্যেষ্ঠ, তিনি সন্ন্যাসও গ্রহণ করেছিলেন শ্রীচৈতন্যের পূর্বেই, জীবিতও ছিলেন মহাপ্রভুর তিরোধানের পরে। কিন্তু চৈতন্যদেবের নির্দেশমতো সন্ন্যাস ত্যাগ করে তিনি দেশে এসে দারপরিগ্রহ করেন, প্রেমধর্ম প্রচারে ব্রতী হন। তাঁর দুই পত্নী—বসুধা দেবী ও জাহ্নবী দেবী—দুই ভগ্নী। নিত্যানন্দের পুত্র বীরচন্দ্র নিত্যানন্দের পরে বাঙলার বৈষ্ণব সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। এঁদের শিষ্যবর্গের মধ্যে পড়েন তিনজন শ্রেষ্ঠ কবি—বলরামদাস, বৃন্দাবনদাস, জ্ঞানদাস। বাঙলা সাহিত্যে তাই নিত্যানন্দ-শিষ্যদের প্রেরণা প্রচুর ফলদায়িনী হয়েছে।

ভক্ত হিসাবে হরিদাসের তুলনা নেই। তিনি জন্মেছিলেন মুসলমানের ঘরে, কিন্তু শুধু এক মুসলমানী জন্ম ছাড়া কোরাণ-হাদিস-সম্মত আচরণের কোনো চিহ্ন তাঁর ছিল না। তাঁকে নিয়েই নবদ্বীপের মুসলমান-সমাজের সঙ্গে চৈতন্য-মণ্ডলীর কলহ দেখা দেয়; নীলাচলে তিনি ছিলেন মহাপ্রভুর সঙ্গী।

এই তিন প্রধান পারিষদ্ ছাড়া নবদ্বীপ-লীলায় শ্রীচৈতন্যের অন্য প্রধান অনুচর ছিলেন শ্রীবাস পণ্ডিত, মুরারি গুপ্ত (সংস্কৃতে লেখা চৈতন্যচরিতম্-এর লেখক), মুকুন্দ দত্ত, বাসুদেব দত্ত, নয়নানন্দ মিশ্র, জগদানন্দ পণ্ডিত, বাসুদেব ঘোষ (পদকর্তা) ও তাঁর দু'ভাই প্রভৃতি। এই সঙ্গেই উল্লেখ-যোগ্য শ্রীখণ্ডের বৈষ্ণব-মণ্ডলীর কথা,—যেমন, নরহরি সরকার (পদকর্তা) ও তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুনন্দন। এঁরা শ্রীচৈতন্য-পূজারও প্রধান প্রবর্তক। এঁদের শাখায় উদ্ভূত হন লোচন দাস, কবিরঞ্জন, 'কবিশেখর রায়' (দেবকী-নন্দন সিংহ) প্রভৃতি প্রধান কবিরা।

পুরীতে মহাপ্রভুর অনুচরদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্বরূপ দামোদর (অধুনালুপ্ত সংস্কৃত শ্লোক বা কড়চা রচনা করেন), রায় রামানন্দ, গদাধর পণ্ডিত, সার্বভৌম ভট্টাচার্য, রঘুনাথ দাস প্রভৃতি। রঘুনাথ দাস সপ্তগ্রামের এক ধনী গোস্বামীর পুত্র, আবাল্য ভক্তি-পিপাসায় উদ্‌গ্রীব। গৃহত্যাগ করে পুরীতে এসে তিনি চৈতন্যদেবের শরণ নেন। মহাপ্রভুর তিরোধানের পরে তিনি বৃন্দাবনবাসী হলেন, সেখানে তিনি 'ষড়্‌গোস্বামীর' অন্যতম রূপে গণ্য হন।

বৈষ্ণব আন্দোলন

চৈতন্যদেব কোনো সম্প্রদায় গঠন করে যান নি, কিন্তু তাঁর জীবিত-কালেই তাঁকে কেন্দ্র করে একাধিক বৈষ্ণব মতবাদ ও বৈষ্ণব-মণ্ডলী গঠিত হয়ে উঠেছিল। শাস্ত্রবিহিত ভক্তিবাদ বা 'বৈধী ভক্তির' পরিবর্তে চৈতন্য-ভক্তরা 'রাগানুগা ভক্তিকেই' শ্রেষ্ঠ সাধনা বলে গ্রহণ করেন। নবদ্বীপের বৈষ্ণবদের নিকট চৈতন্যই হন স্বয়ং ভগবান্। শ্রীখণ্ডে বৈষ্ণবদের নিকট যেমন শ্রীকৃষ্ণ ও গোপিনীরা তেমনি চৈতন্যই আবার 'পরম নাগর' আর ভক্তরা 'নাগরী'। শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের পরে অদ্বৈত আচার্যকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠে এক বৈষ্ণব শাখা; গদাধরের নেতৃত্বে গড়ে ওঠে 'গৌর পারম্যবাদ' বা গৌরাঙ্গ পূজার সম্প্রদায়; এবং নিত্যানন্দের নেতৃত্বে যারা গঠিত হল তাদের মধ্যে ষোল শত নেড়ানেড়ীও ছিল—যারা ছিল বিলুপ্ত-প্রায় বৌদ্ধ (সহজিয়া) তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের মানুষ। (দ্রষ্টব্য—ডাঃ বিমানবিহারী মজুমদার প্রণীত 'চৈতন্যচরিতের উপাদান'।) বোঝা যায়, সহজিয়া তান্ত্রিক মণ্ডলী-গুলির পক্ষে চৈতন্য সম্প্রদায়ের দ্বার প্রথম থেকেই উন্মুক্ত ছিল। শ্রীখণ্ডের বৈষ্ণব মতবাদেও সহজিয়া প্রভাব দেখা যায়, আর নিত্যানন্দের নামে তো সহজিয়ারাই বৈষ্ণবদের এক বৃহত্তম সম্প্রদায় (বৈরাগী) হয়ে ওঠেন। বৈষ্ণব সমাজের মতবাদের মধ্যে তাই 'প্রকৃতি-সাধনা', 'পরকীয়াতত্ত্ব' প্রভৃতি সহজেই অঙ্গীকৃত হয়।

এই সব নানা শাখা লুপ্ত হয় নি। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রতিষ্ঠা করলেন বৃন্দাবনের ষড়্‌গোস্বামীরা। ভক্তিশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, বৈরাগ্য-বাদী পরম ভক্ত এই গোস্বামীরা বাঙলার এই সব শাখা থেকে দূরে ছিলেন। বৃন্দাবনে বসে রামানুজ ও মাধ্ব সম্প্রদায় প্রভৃতি অন্যান্য ভক্তমণ্ডলীর পরিবেশে তাঁরা নিজেদের মত, তত্ত্ব ও সাধন-পদ্ধতি প্রণীত করলেন (এবিষয়ে দ্রষ্টব্য ডঃ সুশীলকুমার দে'র Early History of the Vaishnava Faith and Movement in Bengal); শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ, বিশেষ করে ভাগবত ও ভক্তিশাস্ত্রের উপরে তা প্রতিষ্ঠিত হল। সেই মতেও শ্রীচৈতন্যদেব রাধাকৃষ্ণের যুগ্মাবতার; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ও বৃন্দাবনের ব্রজলীলাই হল তাঁদের নিজেদের তত্ত্ব, দর্শন, কাব্য, নাটকের প্রধান প্রতিপাদ্য। 'রাগানুগা ভক্তিই' অবশ্য এই সাধনারও প্রধান পথ; কিন্তু আচারে-নিয়মে শাস্ত্রোক্ত সদাচার, এবং (শক্তি ও তান্ত্রিক আচারের বিরোধী) শুদ্ধাচারই গোস্বামীরা প্রতিষ্ঠা

করলেন—বাঙালী বৈষ্ণব সমাজ ক্রমে প্রধানত এই গোস্বামীদেরই প্রণীত ও প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্মেই সংগঠিত হয়। অবশ্য 'রাগানুগা ভক্তি'ই তাঁদের সৃষ্টি-প্রয়াসকে কাব্যশ্রীতে মণ্ডিত করে তোলে—চৈতন্যদেবের নাম সমস্ত যুগের উপর অঙ্কিত করে দেয়।

বৃন্দাবনের ষড়্‌গোস্বামী

বৃন্দাবনের এই ষড়্‌গোস্বামীর মধ্যে সনাতন ও রূপ দুই ভাই; বৈষ্ণব-ধর্ম প্রচারে তাঁরা জীবন উৎসর্গ করেন, বৈষ্ণবশাস্ত্র রচনাই হয়ে ওঠে তাঁদের জীবনের মহাব্রত। এঁদের পাণ্ডিত্য ও প্রতিভায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম বৃন্দাবন থেকে রাজপুতানায়, পাঞ্জাবে, সিন্ধুদেশেও বিস্তার লাভ করে। ভারতবর্ষের সঙ্গে বাঙালীর মানসিক যোগও এঁরা সুদৃঢ় করেন। অবশ্য মোগল রাজত্ব বাঙ্‌লা দেশে স্থাপিত হলে পর (খ্রীঃ ১৫৭৫-৭৬) এই যোগের পথ আরও অবাধ হয়। রূপ ও সনাতন বহু সংস্কৃত গ্রন্থের রচয়িতা। সনাতন 'হরিভক্তিবিলাসে'র লেখক, অসামান্য পণ্ডিত, নিরভিমান ভক্ত। রূপ গোস্বামীর 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' ও 'উজ্জ্বলনীলমণি' বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের প্রধান গ্রন্থ। এঁদের ভ্রাতুষ্পুত্র জীব বৃন্দাবনের তৃতীয় গোস্বামী, তিনি সংস্কৃতে বহু দার্শনিক গ্রন্থের প্রণেতা। তাঁর প্রধান কীর্তি 'ষট্‌সন্দর্ভ'। অন্য তিন-জন গোস্বামী গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ ভট্ট ও রঘুনাথ দাস। এই তিন জন বৃন্দাবন পুনরাবিষ্কার করেন, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের প্রতিষ্ঠা সেখানে অপ্রতিহত করে তোলেন, আর গোস্বামীদের রচিত বৈষ্ণব শাস্ত্রও বাঙ্‌লা দেশে প্রচারের ব্যবস্থা করেন। বাঙালী বৈষ্ণব-সমাজের কৃষ্ণলীলার দর্শন ও তত্ত্ব যোগান এই বৃন্দাবনের গোস্বামীরা;—সেই তুলনায় নবদ্বীপের ও শ্রীখণ্ডের চৈতন্য-পূজারী ভক্তরা বাঙ্‌লা দেশে ততটা প্রভাব বিস্তার করতে পারেন নি।

দ্বিতীয় পর্যায়ঃ শ্রীনিবাস-নরোত্তম-শ্যামানন্দ

ষড়্‌গোস্বামীর উত্তরাধিকার লাভ করেন, শ্রীনিবাস-নরোত্তম-শ্যামানন্দ প্রমুখ মহাজনেরা। এঁদের জীবনকাল ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণ, অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের প্রায় একশত বৎসরের মধ্যে,—মোগল সাম্রাজ্য তখন স্থাপিত হচ্ছে। এঁদের প্রচারিত বৈষ্ণব-ধর্মে বাঙ্‌লা দেশ আবার নতুন করে ভেসে গেল; হরিনাম সংকীর্তনে আর বৈষ্ণবদের মহোৎসবে দেশ গেল ছেয়ে।

এই তিন জনের মধ্যে প্রধান স্থান লাভ করেছেন অবশ্য শ্রীনিবাস আচার্য। বৈষ্ণব সমাজে তিনি শ্রীচৈতন্যের দ্বিতীয় অবতার বলে কল্পিত হয়েছেন; অপর দু'জনে গণ্য হয়েছেন অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ বলে—অবতারের পুনরাবৃত্তি-কল্পনা এ দেশের ভক্ত সমাজের এরূপই একটা দুরারোগ্য ব্যাধি। সাহিত্যে শ্রীনিবাস দুই একটি পদ ভিন্ন বিশেষ কিছু দান করেন নি। কিন্তু পাণ্ডিত্যে, আধ্যাত্মিকতায় ও ব্যক্তিত্বে অগ্রগণ্য বলে তাঁর খ্যাতি ছিল—তা যাচাই করবার উপায় এখন আর নেই। বৃন্দাবনের গোস্বামীদের নিকট তিনি শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন, তাঁদের কাছে বৈষ্ণবতত্ত্ব সম্বন্ধে শিক্ষাও গ্রহণ করেন। সেইখানেই নরোত্তম ও শ্যামানন্দের সঙ্গেও তাঁর মিলন হয়। কথিত আছে, শ্রীনিবাসই বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বীরকে বৈষ্ণব-ধর্মে দীক্ষিত করেন। এ বিষয়েও একটা কাহিনী আছে। বৃন্দাবন থেকে তিনি বাঙলায় ফিরছিলেন এক সিন্দুক বৈষ্ণব শাস্ত্রগ্রন্থ নিয়ে। জীব গোস্বামী সে সব প্রচারের ভার তাঁর উপর অর্পণ করেছিলেন। কিন্তু পথে বিষ্ণুপুরের নিকট জঙ্গলে রাজার অনুচর দস্যুরা সেই সিন্দুক লুণ্ঠন করে। তারই মধ্যে ছিল কৃষ্ণদাস কবিরাজের অমূল্য মহাগ্রন্থ 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে'র পাণ্ডুলিপি। বলা হয়, বৃদ্ধ লেখক কবিরাজ গোস্বামী এই পুঁথি অপহরণের সংবাদ শুনে ভগ্নহৃদয়ে বৃন্দাবনে প্রাণত্যাগ করেন। কিন্তু শাস্ত্রগ্রন্থগুলি উদ্ধার না করে শ্রীনিবাসও ছাড়বেন না। এই সূত্রেই তাঁর সঙ্গে রাজা হাম্বীরের পরিচয় হল; আর হাম্বীর শেষে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। বিষ্ণুপুর বাঙলায় বৈষ্ণব-ধর্মের এক প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে। এই সব কাহিনী কতটা সত্য তা বলা যায় না, তবে কালক্রমে শ্রীনিবাসের ও তাঁর কন্যা হেমলতা দেবীর শিষ্য-প্রশিষ্যরা ছড়িয়ে পড়েন সমস্ত পশ্চিম বাঙলায়। আর শিষ্য বলে নিশ্চয়ই গুরুর মহিমাও পরিব্যাপ্ত হয়েছে—যদিও গোস্বামীরা তাঁকে 'স্খলৎপাদ' বলেছিলেন।

নরোত্তম দাস ঠাকুর ভক্ত হিসাবে অদ্বিতীয়। নরোত্তম ছিলেন পদ্মা-তীরের খেতরি গ্রামের কায়স্থ জমিদারের পুত্র। সাহিত্যেও তাঁর দান অসাধারণ; তাঁর অপূর্ব চরিত্রমাধুর্য তাঁর প্রার্থনা-বিষয়ক রচনাকে সুন্দর শ্রী দান করেছে। বৃন্দাবন থেকে দেশে ফিরে খেতরিতে তিনি যে মহোৎসবের ব্যবস্থা করেন, বৈষ্ণব ইতিহাসে তা নানা দিক থেকেই একটা মহৎ ঘটনা। তখন থেকেই রসকীর্তনের সূচনা হয়, 'গৌরচন্দ্রিকা' গানের রীতি প্রচলিত

হয়। নরোত্তম দাস ছিলেন উত্তর বঙ্গের বৈষ্ণব-ধর্মের প্রধান উৎস, কিন্তু সমস্ত বাঙালী বৈষ্ণব সমাজ ও বাঙ্‌লা সাহিত্যের রসিক 'প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা'র লেখক এই পরম ভক্তের আন্তরিকতায় ও সরলতায় এখনো বিমুগ্ধ হন।

শ্যামানন্দ দাস (মৃত্যু আনুমানিক খ্রীঃ ১৬৩০) জাতিতে ছিলেন সদ্‌গোপ। তিনি মেদিনীপুর জেলার লোক, বৃন্দাবন থেকে সেখানেই ফিরে আবার ভক্তিধর্ম প্রচারে উদ্যোগী হন। এই প্রচারে তাঁর ধনী শিষ্য রসিকানন্দ তাঁর প্রধান সহকারী হন। শ্যামানন্দের প্রভাবে মেদিনীপুর-ওড়িষ্যার সীমা-ভাগে বৈষ্ণব-ধর্ম প্রসার লাভ করে। শ্যামানন্দ নিজেও কয়েকটি পদ ও স্তবের রচয়িতা।

এই দ্বিতীয় পর্যায়ের মহাজনদের পরেও বৈষ্ণব মহাজনদের অভাব হয় নি। পদ-রচনায়, জীবনী-রচনায়, ভক্তিধর্ম-প্রচারে তাঁরা বৈষ্ণব-সমাজ ও বাঙালী জাতিকে সমুজ্জ্বল করেছেন; পাণ্ডিত্যে, সাহিত্য-সৃষ্টিতে, সাধনায় তাঁরা অনেকেই ছিলেন শ্রদ্ধাস্পদ মানুষ। বাঙ্‌লা সাহিত্যের ইতিহাসেও তাঁদের কীর্তি আমাদের স্বীকার করতে হবে। কিন্তু বাঙালীর জীবন-ইতিহাসে কিংবা পরবর্তী জীবন-প্রকাশে তাঁদের দানকে মুখ্য বলে আর গণ্য করা চলে না।

রাজনৈতিক পটভূমিকা : মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও বৈভব

চৈতন্যদেবের বাল্যকালেই হুসেন শাহ্ গৌড়ের সুলতান হন; চৈতন্যদেবের মৃত্যুর (খ্রীঃ ১৫৩৪) সময়ে সে রাজবংশ প্রায় অবসান লাভ করছে—মোগল সাম্রাজ্য ও শের শাহের বিরোধিতা তখন সমাসন্ন। বড় একটা পরিবর্তন সংঘটিত হল মোগলরাজ্যের প্রতিষ্ঠায়—রাজনৈতিক গণনায় চৈতন্য-পর্ব জুড়ে আছে এই মোগল সাম্রাজ্যের কাল।

বাঙ্‌লা দেশের রাজশক্তির সঙ্গে বাঙ্‌লা সাহিত্যের একটা সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল হুসেন শাহ্ (খ্রীঃ ১৪৯৮-১৫১৯) ও নুসরৎ শাহের (খ্রীঃ ১৫১৯-১৫৩২) আমলে। সেই রাজশক্তি ছিল অনেকাংশে বাঙালী ভাবাপন্ন, আর দেশেও তাঁরা শান্তিস্থাপন করেছিলেন। তাই তাঁদের সহানুভূতিতে তখন বাঙ্‌লা সাহিত্যও যথেষ্ট বৃদ্ধি লাভ করে। কিন্তু বাঙ্‌লা সাহিত্য মোটের উপর দরবারে লালিত হয় নি—পল্লী সমাজেই তা পালিত হয়। বাঙালী লেখকদের রাজনৈতিক ঔদাসীন্যও তাই কিছুতেই ঘোচে নি। হুসেন

শাহ্-এর রাজত্বকালেই লোদি সম্রাটদের হাতে জৌনপুরের শর্কি সুলতান হুসেন শাহ্ পরাজিত হন (খ্রীঃ ১৪৯৪) ; অযোধ্যার এই সুফী-প্রভাবিত শর্কি-গোষ্ঠী আমীর অনুচর নিয়ে এসে তখন প্রথম বিহারে, পরে বাঙ্‌লার হুসেন শাহের আশ্রয় গ্রহণ করেন। গৌড় দরবারের এই ষোড়শ শতাব্দীর শরণার্থী আমীর-ওমরাহ অনুচরেরা ক্রমে উত্তরবঙ্গ ও পূর্ব বাঙ্‌লার শ্রীহট্ট-চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে গিয়ে স্থানীয় সামন্তদের মধ্যে অধ্যুষিত হন ; আর তাঁদের সঙ্গে-সঙ্গে ওসব অঞ্চলে নূতন সাহিত্যের, বিশেষ করে সূফী-প্রভাবের কেন্দ্র গড়ে ওঠে,—সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আরাকানে বাঙ্‌লা সাহিত্যের কেন্দ্রে তা নূতন ভাবে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু সমসাময়িক কালে (ষোড়শ শতকে) সাহিত্যে কোথাও এই ঘটনার উল্লেখ নেই। হুসেন শাহ্-এর কামতা অভিযান, আসাম অভিযানের কথা 'আসাম বুরঞ্জী'তে পেলেও বাঙ্‌লা সাহিত্যে পাই না, জাজপুর-ওড়িষ্যা অভিযানের (খ্রীষ্টাব্দ ১৫০৪-৫—১৫০৯, না, ১৫১৩ ?) আভাস মাত্র সংগ্রহ করা যায় 'চৈতন্যভাগবত' থেকে (দ্রঃ—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-প্রকাশিত ইংরেজিতে লেখা বাঙ্‌লার ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৪৮)। 'পরাগলী মহাভারতে' লস্কর পরাগল খাঁর ও নুসরৎ শাহ্-এর ত্রিপুরা-চট্টগ্রাম জয়ের উল্লেখ অবশ্য স্পষ্ট। কিন্তু রাজনীতি সম্বন্ধে বাঙ্‌লা সাহিত্য উদাসীন।

নুসরৎ শাহের সময়েই দেশে বিশেষ রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটে। বাবর দিল্লীতে মোগল সাম্রাজ্য পত্তন করলেন (খ্রীঃ ১৫২৬) ; নুসরৎ শাহ্ ও তাঁর আনুগত্য স্বীকার না করে পারলেন না (খ্রীঃ ১৫২৯) ; আহোম আক্রমণেও নুসরৎ শাহ্ অপদস্থ হলেন। তবে বাঙ্‌লার শান্তি অক্ষুণ্ণ ছিল। নুসরৎ শাহের মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র আলাউদ্দীন ফিরুজ শাহ্ এক বৎসর রাজত্ব করলেন, (খ্রীঃ ১৫৩১-৩২)। তিনিও ছিলেন বাঙ্‌লা সাহিত্যের পরিপোষক, শ্রীধরের 'বিদ্যাসুন্দর' তাঁর অনুরোধেই লিখিত হয়। তারপরে গিয়াসুদ্দীন মাহমুদ (১৫৩৩-৩৮) সুলতান হলেন ; কিন্তু উদীয়মান পাঠান-সম্রাট শের শাহ্ শূরের হাতে তাঁর বারবার পরাজয় ঘটল। বাঙ্‌লা শের শাহের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল, আর বাঙ্‌লার স্বাধীন সুলতানদের এই বিলুপ্তিতে বাঙ্‌লা সাহিত্যের সঙ্গে বাঙ্‌লার রাজশক্তির সম্পর্কও তখনই ছিন্ন হয়ে গেল।

হয়তো তখন আর বাঙ্‌লা সাহিত্যের পক্ষে রাজানুকূল্যের প্রয়োজন ছিল

না। বাঙালী পণ্ডিত সমাজের সাংস্কৃতিক জাগরণ ও সাংস্কৃতিক প্রয়াস তৎপূর্বেই সুদৃঢ় হয়ে উঠেছে; চৈতন্যভক্তদের, বিশেষত শ্রীনিবাস নরোত্তম প্রভৃতির ভক্তিপ্লাবনে তা আরও সুস্নিগ্ধ ও নবায়িত হচ্ছে; আবার রাজ-নৈতিক আবর্তন-বিবর্তনে বাঙালী সমাজ ভক্তি ও বৈরাগ্যের বশে রাজনীতিক বিষয়ে আরও উদাসীন হয়ে পড়েছে। বৈষ্ণব ভাবালুতা, 'প্রকৃতি-সাধনা' ও 'পরকীয়াবাদ' মানুষকে নির্বীর্য করে, সুস্থ পুরুষকারের উদ্বোধন করে না। অন্যদিকে শের শাহ্-এর রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনায় বাঙলার কেন্দ্রীয় রাজশক্তির গড়ে ওঠার সম্ভাবনাও সুদূর হয়ে উঠল। শের শাহ্ বাঙলা দেশকে খণ্ড খণ্ড করে ফেললেন ছোট ছোট জায়গীরে বিভক্ত করে। পরবর্তী মোগল আমলে শের শাহ্-এর এই জায়গীর-বিভাগকে ভিত্তি করেই বাঙলা রাজ্যের পুনর্ব্যবস্থা হয়েছিল। অতএব শূরবংশের পর থেকে বাঙলা সাহিত্যের ছোট বড় পরিপোষক হতে থাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লী-প্রধানরা,—রাজা-রাজড়ারা নয়। ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের বাঙলা কাব্যে এই পল্লীর (যেমন, মুকুন্দরাম, সীতারাম দাস, প্রভৃতি) পৃষ্ঠপোষকদেরই উল্লেখ পাই। তাছাড়া বাঙলা সাহিত্যের পরিপোষকতা করেছিলেন স্বাধীন আরাকান-রাজরা, কামতা-কামরূপ, ত্রিপুরা, মল্লভূমি প্রভৃতি সীমান্ত অঞ্চলের অর্ধ-স্বাধীন সামন্ত রাজারা।

শূর রাজবংশ বাঙলায় রাজত্ব করলেন (খ্রীঃ ১৫০০ থেকে খ্রীঃ ১৫৬৪ পর্যন্ত), কররানি বংশ তারপর বাঙলা দখল করে রাখতে চাইল (১৫৬৪-১৫৭৫);—ওড়িষ্যার হিন্দুরাজ্য তাদের পদানত হয় তখনই,—কিন্তু শূর বা কররানিরা কেউ বাঙালী নন, বাঙালী হবার মতো সুযোগও লাভ করেন নি। এঁদের দিন শেষ হয়ে এল ভারতে মোগল-সূর্য আকবর শাহের উদয়ে (খ্রীঃ ১৫২৬-খ্রীঃ ১৬০৫)। কিন্তু বাঙলা দেশে নানা আফ্গান সর্দার ও প্রায়-স্বাধীন হিন্দু-মুসলমান 'বার ভূঞাদের' দমন করে মোগল শাসন সুসংগঠিত করতে করতে আকবরের জীবন প্রায় শেষ হয়ে যায়। ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে দাউদ কররানি মুনিন খাঁর হাতে পরাজিত হন; কিন্তু দাউদ, উসমান প্রভৃতি রাজ্যাভিলাষী পাঠান রাজারা ছাড়াও খিজরপুরের দুর্ধর্ষ ভূঞা ঈশা খাঁ ও তৎপুত্র মুশা খাঁ, বীরভূমের বীর হামীর, পাছেটের শাম্‌স খাঁ, হিজলির সলিম খাঁ, ভূষণার রাজা শত্রুজিৎ, যশোহরের প্রতাপাদিত্য, বাক্‌লার রাজা রামচন্দ্র, ভুলুয়ার লক্ষ্মণ মাণিক্য, শ্রীপুরের চাঁদরায়-কেদার-

রায়, ভাওয়ালের বাহাদুর গাজী, সুষং-এর রঘুনাথ প্রভৃতি ক্ষমতাসম্পন্ন ভূঞারা তখনো প্রায় স্বাধীন ছিলেন। মানসিংহের (খ্রীঃ ১৫৯৪-১৬০৪) পরে বাঙলার ভূঞাদের দমন করেন (খ্রীঃ ১৬১১-১৬১২) ইস্‌লাম খাঁ—তখন জাহাঙ্গীরের (খ্রীঃ ১৬০৫-২৭) রাজত্ব আরম্ভ হয়েছে।

বার ভূঞাদের আমরা অবশ্য আধুনিক-কালে বাঙালী স্বাধীনতার নেতা হিসাবে কল্পনা করতে অভ্যস্ত হয়েছি। কিন্তু মূলত তাঁরা ছিলেন সামন্ত যুগের সামন্ত-ভাগ্যান্বেষী। রাষ্ট্রজাতির ধারণা (ন্যাশনালিজম্) তখনো জন্মাবার কথা নয়, জন্মায়ও নি; এমন কি যথার্থ স্বাদেশিকতাও (পেট্রিয়-টিজম্) তাঁদের কতটা ছিল, সন্দেহ। তাঁরা বুঝতেন নিজেদের সামন্ত রাজ্য, নিজেদের সামন্ত স্বার্থ, কেন্দ্রীয় রাজশক্তির দৌর্বল্যের দিনে ছলে বলে কৌশলে নিজ নিজ ক্ষমতা-বিস্তার। অবশ্য এটা সব দেশের সামন্তশক্তিরই সাধারণ লক্ষণ। কিন্তু বাঙলার এই বিদ্রোহী বারভূঞা ও জমিদাররা আসলে যুদ্ধ-বিগ্রহ কম করেন নি; স্থানীয় ভৌগোলিক অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে তাঁরা আকবর শাহ্-এর ইতিহাস-বিশ্রুত সেনাপতিদের দীর্ঘদিন (অন্তত খ্রীঃ ১৫৭৫ থেকে খ্রীঃ ১৬০৪, অথবা প্রায় ১৬১১-১২ পর্যন্ত) ব্যতিব্যস্ত করে রেখেছিলেন। এজাতীয় যোদ্ধাদের নিয়েই অন্যদেশে বীরগাথা রচিত হয়। রাজপুত-বীরদের নিয়ে মুখর হয়েছিল তাঁদের কবিরা। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, বাঙলা সাহিত্যে বাঙালী বীরদের প্রায় উল্লেখও নেই; বীরত্ব কাহিনী বলতে আছে কালকেতু ও লাউসেনের সেই গ্রাম্য যুদ্ধের বর্ণনা। মানসিংহের খ্যাতি অবশ্য বাঙলায় স্থাপিত হয় খ্রীঃ ১৬০১-এ; মুকুন্দরাম তাঁর উল্লেখ করেছেন। মোগল সাম্রাজ্যের দৃঢ়-প্রতিষ্ঠার সঙ্গে তা ক্রমে লোকশ্রুতির মত হয়ে (অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে) ভারতচন্দ্রের হাতেও গিয়ে পৌছায়। ষোড়শ-সপ্তদশ শতক বাঙলা সাহিত্যের গীতিমুখর যুগ; কিন্তু যোদ্ধা, যুদ্ধ-বিগ্রহ, প্রভৃতি উপাদান থাকলেও কোনো বীরগাথা, জাতীয় বীরের কাহিনী সে সময়ে রচিত হয় নি। তুর্ক-বিজয়ের পর থেকে শাসিত সমাজে রাজনীতিক আগ্রহ আর বর্ধিত হয় নি, সাংস্কৃতিক আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রকাশই বাঙালী সমাজের লক্ষ্য হয়ে থাকে। তাছাড়া, পল্লী-জীবনের বিচ্ছিন্নতা এসব রাজনৈতিক পরিবর্তনে বিদূরিত হয় নি, মূলত বাঙলা সাহিত্যের পরিবেশও তাই তখন পরিবর্তিত হয় নি। সাধারণ ভাবে তাতে উল্লেখিত হয়েছে এই অরাজকতার ও অনিশ্চয়তার কালে গ্রাম্য

ডিহিদার, সামন্তশক্তির নানা অনুচর, সিপাহী-পাইকের অত্যাচার, ধনজন-মান-সম্বন্ধে একটা অনিশ্চয়তা-বোধ (শ্রীযুক্ত তপনকুমার রায় চৌধুরীর ইংরেজিতে লেখা, সম্প্রতি প্রকাশিত—Bengal under Akbar and Jehangir নামক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। তাতে একালের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থাও সম্যক্ আলোচিত হয়েছে)।

বৈষ্ণব আন্দোলন বাঙালীর সাহিত্যে পৌরুষ ও পুরুষকারকে আরও খর্ব করেছে।

বৈষ্ণব সাহিত্য

বৈষ্ণব সাহিত্য মোটের উপর তিন জাতীয়:—জীবনী কাব্য, বৈষ্ণব-শাস্ত্র ও 'পদাবলী'। সাহিত্যের দিক থেকে আমরা বৈষ্ণব পদাবলীকেই মনে করি অমর সম্পদ; জীবনী-কাব্যকে এ দেশের সাহিত্য-ধারায় অপূর্ব বলে না মেনে পারি না। কিন্তু বৈষ্ণব-শাস্ত্র, বিশেষ করে বৈষ্ণব রস-শাস্ত্রের নিয়ম-নীতি মেনেই বৈষ্ণব কবিরা কাব্য সৃষ্টি করেছেন। তাই সে-সব শাস্ত্রেরও গুরুত্ব যথারীতি স্বীকার করতে হয়। তা ছাড়া অন্যান্য মঙ্গল-কাব্যের অনুকরণে কৃষ্ণমঙ্গল-জাতীয় কাব্যও রয়েছে; তাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ-যোগ্য। কারণ, চৈতন্যদেবের প্রেরণা ও ধর্ম কৃষ্ণ-কাহিনীমালাকে নূতন প্রাণ দান করে। অবশ্য চৈতন্য-পরবর্তী সমস্ত মঙ্গলকাব্যের মধ্যেই, এবং রামায়ণ-মহাভারতেও, সর্বত্র যে ভক্তিধর্মের প্রচার দেখা যায়, তারও উৎস শ্রীচৈতন্য ও বৈষ্ণব ভক্তিবাদ।

জীবনী-কাব্য

ভারতবর্ষের সাহিত্যে বৈষ্ণব জীবনী-কাব্যসমূহ এক নূতন জিনিস। দেবদেবীর মাহাত্ম্য কীর্তনই ছিল এতদিন সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য। অবশ্য অবতার-বাদের দেশে দেবতারাও আকৃতিতে ও প্রকৃতিতে অনেকটা মানুষেরই অপরূপ। তবু তাঁদের ক্রিয়াকর্ম হল দেবতার লীলা-খেলা। বৈষ্ণব জীবন-চরিতসমূহ যে এই প্রভাব থেকে মুক্ত, তা নয়। কারণ চৈতন্যদেবের জীবদ্দশাতেই তিনি অবতার বলে গণ্য হয়েছিলেন। বৈষ্ণবজীবনী তাই সর্বাংশে জীবনী নয়, ভক্তি-কাব্য, আর তাই ধর্মের প্রভাবমুক্তও নয়। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, সাহিত্য যতক্ষণ সত্য সত্যই মানুষের কথা না হয়ে ওঠে, এবং ধর্ম ও অলৌকিকতার প্রভাব কাটিয়ে উঠতে না পারে, ততক্ষণ পর্যন্ত সাহিত্য হিসাবে তা স্বপ্রতিষ্ঠ হতে পারে না, তার নাবালকত্ব ঘোচে

না, তার বিকাশ স্বচ্ছন্দ হয় না। বৈষ্ণব-জীবনীসমূহও মধ্যযুগের ধার্মিকতার দ্বারাই উদ্বুদ্ধ, তা সম্পূর্ণরূপে মানব-জীবনের চিত্র নয়। কিন্তু চৈতন্যদেব, অদ্বৈত আচার্য ও অন্যান্য ভক্ত মহাজনরা ছিলেন জীবন্ত মানুষ, লোকে তাঁদের রক্তমাংসের দেহে বরাবর দেখেছে। ভক্তি-মাহাত্ম্যেও অবতার বা গুরু বলে সেই রক্তমাংসের মানুষকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া তাই সম্ভব হয় নি। বৈষ্ণব জীবনী-কাব্যও এদিক থেকে সত্যকারের সাহিত্যের পথে এগিয়ে গিয়েছে—মানুষকে আশ্রয় করেছে।

শুধু তাই নয়। এসব জীবনীতে সেই মানুষের জীবন-কথা এসেছে, তার গৃহ, পরিবার, সমাজ এবং সমসাময়িক পরিবেশের কথাও এসেছে। এমন কি, চৈতন্যদেব যেমন প্রাদেশিক সীমা ছাড়িয়ে ভারত পর্যটন করেছেন, তাঁর জীবনীতেও তেমনি ভারতের নানা অংশের তথ্যও কিছু-না-কিছু স্থান পেয়েছে। এই সব তথ্যের গুরুত্বও কেউ অস্বীকার করতে পারে না। ঐতিহাসিকের চক্ষে তারও কিছু মূল্য আছে।

অবশ্য একথা ঠিক যে, লেখকদের আসল উদ্দেশ্য ছিল ধর্ম প্রচার ও সেইসঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের গৌরব প্রতিষ্ঠা করা। সাহিত্যরচনার ধারণা তাঁদের ছিল না; সাহিত্যরসের দিকেও তাঁদের মনোযোগ থাকত না; জীবন-চরিতের জীবনী-অংশ বা চরিত্র-চিত্রণেও তাঁদের আগ্রহ দেখা যেত না। নানা অদ্ভুত কথা, অলৌকিকতা, অতি-প্রাকৃতের বাহুল্যে এসব জীবনী ভারাক্রান্ত, রচনা অনেক সময় নীরস, আর ঘটনার বিবরণ বা আখ্যান বহু স্থলে স্বাদ-গন্ধহীন। অবতার বা মহাজনদের অনেক অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ বা লীলা-মাহাত্ম্যের কথা ভক্ত বৈষ্ণবদের কাছে নিশ্চয়ই মূল্যবান; কিন্তু একালের সাহিত্য-রসিক পাঠকদের নিকট সেসব তেমনি হাস্যকর—স্থূল অধ্যাত্ম চেতনার না হোক, শিশু-সুলভ অপরিপক্ব বুদ্ধির পরিচায়ক। আমরা মানব-চরিত্রই চাই, দেব-চরিত্রের কথা শুনতে চাই না। বৈষ্ণব-জীবনী সে হিসাবে সম্পূর্ণ জীবন-চরিত নয়; দেব-চরিত ও ভক্ত-চরিত। মানুষের পরিচয় সেখানে সীমাবদ্ধ।

চৈতন্য-জীবনী

চৈতন্যদেবের তিরোধানের পরেই তাঁর যে-সব জীবনী লিখিত হয় তা লিখিত হয়েছিল সংস্কৃতে, তার মধ্যে মুরারি গুপ্তের ও পরমানন্দ সেন 'কবি-

কর্ণপুরে'র লেখা জীবনী-কাব্য দুটি ও নাটকখানি সুপ্রসিদ্ধ। বাঙ্‌লায় চৈতন্যদেবের প্রথম জীবনী হল বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্য-ভাগবত'।

চৈতন্য-ভাগবত—'চৈতন্য-ভাগবত' নানাদিক দিয়েই মহামূল্যবান গ্রন্থ। চৈতন্যদেবের তিরোধানের (খ্রীঃ ১৫৩৩) পনের বৎসরের মধ্যেই তা রচিত হয়ে থাকবে। বৃন্দাবনদাস এ কাব্য লিখেছিলেন নিত্যানন্দ প্রভুর উৎসাহে। তখনো চৈতন্যের অনেক অনুচর-পরিকর: জীবিত ছিলেন; তাঁদের মুখেই তিনি অনেক বৃত্তান্ত শুনেছিলেন, উদ্ভাবনা প্রায়ই কিছু করেন নি। কিন্তু তাঁর দৃষ্টিতে ভাগবত-বর্ণিত কৃষ্ণলীলারই নূতন সংস্করণ চৈতন্য-লীলা, শ্রীচৈতন্য শ্রীকৃষ্ণের অবতার। তাই ভক্ত-সমাজে চৈতন্যদেব সম্পর্কে যে-সব অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত ছিল তা তিনি অকুণ্ঠিতচিত্তে গ্রহণ করেছেন। তাঁর উদ্দেশ্য হল মহাপ্রভুর লীলাপ্রচার। আর সেই সঙ্গে প্রধান গৌরব তিনি দান ক রছেন নিজের গুরু নিত্যানন্দকে।

শ্রীবাস আচার্যের ভ্রাতুষ্পুত্রী ছিলেন নারায়ণী। বৃন্দাবনদাস নারায়ণীর পুত্র। নিত্যানন্দের বিপক্ষীয়দের প্রতি তিনি যেমন রুষ্ট, নানা অপবাদকারীর উপর তাঁর তেমনি উগ্র ক্রোধ। বৈষ্ণব কবি হলেও তাঁর কথায় স্পষ্টতা ও তীক্ষ্ণতা যথেষ্ট। যেমন,

উদর ভরণ লাগি পাপিষ্ঠ সকলে।
রঘুনাথ করি আপনারে বলে॥
কোনো পাপিগণ ছাড়ি কৃষ্ণ-সংকীর্তন।
আপনাকে গাওয়ায় করিয়া নারায়ণ॥
দেখিতেছি দিনে তিন অবস্থা যাহার।
কোন্ লাজে আপনারে গাওয়ায় সে ছার॥
রাঢ়ে আর এক মহা ব্রহ্মদৈত্য আছে।
অন্তরে রাক্ষস বিপ্র-কাছ মাত্র কাছে॥
সে পাপিষ্ঠ আপনারে বোলায় গোপাল॥
অতএব তারে সবে বলেন শৃগাল।

আবার

উদর ভরণ লাগি এবে পাপী সব।
লওয়ায় ঈশ্বর আমি মূল জরদ্গব॥

বৃন্দাবনদাসের আপত্তি—লোকে অবতার মানে বলে নয়, শ্রীচৈতন্য ছাড়া অন্য কাউকে অবতার মানে বলে।

চৈতন্য-ভাগবত প্রকাণ্ড গ্রন্থ, কিন্তু মোটের উপর সুপাঠ্য গ্রন্থ। বিশেষ করে চৈতন্যদেবের বাল্য-জীবনী সম্বন্ধে যে সব তথ্য বৃন্দাবনদাস পরিবেশন করেছেন তা যেমন স্বাভাবিক, তেমনি উপাদেয়। দুরন্ত ছেলে নিমাইকে আমাদের কারও চিনতে দেরী হয় না। এছাড়া 'চৈতন্য-ভাগবতে' সমসাময়িক সামাজিক অবস্থারও আমরা বহু সংবাদ পাই। মধ্যযুগের বাঙালী সমাজ যে কি পূজা ও 'মঙ্গল' গান নিয়ে মেতে থাকত, টোলে কি ভাবে পড়ুয়ারা পড়াশোনা করত, মুসলমান ধর্ম ও সমাজের প্রভাব হিন্দু সমাজে কিরূপ ছড়িয়ে পড়েছিল,—এসব বিষয়ে আমাদের জ্ঞানের প্রধান উৎস এই 'চৈতন্য-ভাগবত'। তাছাড়া, চৈতন্যদেবের নানান্ সহজ স্বাভাবিক জীবন-কথা 'চৈতন্য-ভাগবত' থেকে আমরা শুনতে পাই। মোটের উপর, একালে যাকে আমরা বলি human interest, মানব-রস, 'চৈতন্য-ভাগবতে' তার অভাব নেই। এখানেই এ কাব্যের শ্রেষ্ঠত্ব। তাছাড়া বৃন্দাবনদাসের পয়ারও স্বচ্ছ, প্রাঞ্জল।

চৈতন্য-মঙ্গল—লোচনদাসের 'চৈতন্য-মঙ্গল কালানুক্রমে দেখলে চৈতন্য-জীবনীর মধ্যে দ্বিতীয় গ্রন্থ। 'চৈতন্য-মঙ্গল' নামে আর একখানা জীবনীও আছে, তা জয়ানন্দের রচনা। সে গ্রন্থ পরবর্তী কালের রচনা (খ্রীঃ ১৫৫০-এর পরে)। লোচনদাসের 'চৈতন্য-মঙ্গলে'রই সুখ্যাতি সমধিক। এ গ্রন্থ পূর্বাপর সমাদর লাভ করেছে, এখনো তা পাঁচালীর মতো গাওয়া হয়। এ জীবনীকাব্য বৃন্দাবনদাস-রচিত জীবনীর তুলনায় আকারে ক্ষুদ্র। তাছাড়া লোচন শ্রীখণ্ডের ও নবদ্বীপের চৈতন্যপন্থীদের অনুবর্তী; তিনি ছিলেন শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকারের শিষ্য; এই নরহরিদাস সরকার 'গৌরনাগর' শাখার প্রবর্তক। লোচনও সেই দৃষ্টিতেই চৈতন্যকে দেখেছেন। তাঁর গ্রন্থও মুরারিগুপ্তের সংস্কৃতে লেখা চৈতন্য-চরিতের প্রায় অনুবাদ। কিন্তু কাব্য হিসাবে লোচনের কাব্য উপাদেয় ও সমাদৃত।

চৈতন্য-চরিতামৃত—গুরুত্বের দিক দিয়ে দেখতে গেলে চৈতন্য-জীবনীর মধ্যে অদ্বিতীয় গ্রন্থ হল কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্য-চরিতামৃত'। এ কথা বললে অন্যায় হবে না যে, মূলত কাব্যরসে তার পরিচয় নয়। সমস্ত মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে যদি কোনো বিশেষ গ্রন্থকে মহৎ বলতে হয়,

তা হলে তা বলতে হবে কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্য-চরিতামৃত'কে ;—হয়তো বা তার সঙ্গে আর নাম করতে হবে মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের। কিন্তু বাঙলার অন্য কোনো কাব্য বিষয়-মাহাত্ম্যে, অকৃত্রিমতায়, তথ্য-নিষ্ঠায়, সরল প্রাঞ্জল বাক্য-গুণে—দর্শন, ইতিহাস ও কাব্যের অপরূপ সমন্বয়ে—এমন গৌরব অর্জন করতে পারে নি।

চৈতন্য-চরিতামৃত বৈষ্ণবের পক্ষে প্রামাণিক গ্রন্থ। কিন্তু সেই নরদেহধারী প্রেমাবতারের মানবীয় প্রকৃতি মাঝে মাঝে তাতে সুপ্রকাশিতও হয়েছে। কঠোর সংযমী সন্ন্যাসী ছিলেন শ্রীচৈতন্য। কারণ,

আপনি আচরি ধর্ম সবারে শিখায়।
আপনি না কৈলে ধর্ম শিখান না যায়॥

মানব-সমাজের এই সমাজ-নীতি তিনি বিস্মৃত হন নি একবারও। আবার, এই সন্ন্যাসীরই হৃদয়ে মায়ের সম্বন্ধে কী মধুর বেদনা :

তোমার সেবা ছাড়ি আমি করিল সন্ন্যাস।
বাউল হইয়া আমি কৈল সর্বনাশ॥
এই অপরাধ তুমি না লইহ আমার।
তোমার অধীন আমি পুত্র যে তোমার॥

এই রক্তমাংসে তৈয়ারী মানুষের স্পর্শটিও কবিরাজ গোস্বামীর কাব্যে ক্ষণে ক্ষণে লাভ করা যায়।

'চৈতন্য-চরিতামৃত' বৈষ্ণবের চক্ষে মহামূল্য গ্রন্থ হলেও চৈতন্যের জীবন-চরিত তার মুখ্য প্রতিপাদ্য নয়। তার মুখ্য প্রতিপাদ্য সেই চরিতামৃত, প্রেম ও ভক্তিরসের যে বিগ্রহরূপে চৈতন্যদেব আরাধ্য সেই প্রেম ও ভক্তিবাদের ব্যাখ্যান। চৈতন্যের জীবনী অপেক্ষা যুক্তিতর্ক দিয়ে বৈষ্ণব দর্শনের প্রতিষ্ঠাই ছিল কৃষ্ণদাস কবিরাজের লক্ষ্য। এই দুরূহ তত্ত্ব তিনি ব্যাখ্যা করেছেন দার্শনিকের মতো বা বৈজ্ঞানিকের মতো সূত্রাকারে। সহজ নিরলঙ্কার সুস্পষ্ট সেই ভাষা। কোথাও কোথাও বিষয়ের কাঠিন্যের জন্যই তা দুরূহ, এমন কি প্রায় নীরস। দীর্ঘদিন বৃন্দাবন-বাসের জন্য তাঁর বাক্যে এখানে ওখানে পশ্চিমী হিন্দীর শব্দও দেখা যায়। কিন্তু মোটের উপর এই দার্শনিক বিশ্লেষণ বাঙলা ভাষার আশ্চর্য শক্তিরও পরিচায়ক। আজিকার চিন্তাশীল বাঙালীরাও এ গ্রন্থ থেকে ভরসা পেতে পারেন—বাঙলা ভাষার শক্তি সম্পর্কে।

এই বৈষ্ণব-তত্ত্ব চৈতন্যের জীবন ও উপদেশকে আশ্রয় করেই বিকশিত। আর কৃষ্ণদাস কবিরাজ সেই জীবন-বর্ণনায় অদ্ভুত রকমের সত্যনিষ্ঠ। মহাপ্রভুর জন্মের প্রায় একশত বৎসর পরে তাঁর এই গ্রন্থ লিখিত হয়। কিন্তু মহাপ্রভুর জীবনলীলার সম্বন্ধে তিনি যে সব তথ্যের অবতারণা করেছেন, তার প্রত্যেকটিরই প্রমাণ-স্বরূপ, কার থেকে তিনি তা জেনেছেন, তাও উল্লেখ করেছেন। এক একটি সুন্দর উপমার মধ্য দিয়ে কঠিন তত্ত্ব এক এক সময়ে উদ্ভাসিত করে তুলেছেন কবিরাজ গোস্বামী :

অনন্ত স্ফটিকে যৈছে এক সূর্য ভাসে।
তৈছে জীব গোবিন্দের অংশ পরকাশে॥

অবিচ্ছেদ্য রাধাকৃষ্ণ তত্ত্বের ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন :

মৃগমদ তার গন্ধে যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি জ্বালাতে যৈছে নাহি কভু ভেদ॥
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ।
রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ॥

তারপরে সেই প্রসিদ্ধ পার্থক্য বিশ্লেষণ—কাম ও প্রেমের :

কাম প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপ বিলক্ষণ॥
আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা—তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা—ধরে প্রেমনাম॥

এবং—

কৃষ্ণ প্রেম সুনির্মল যেন শুদ্ধ গঙ্গাজল
সেই প্রেম অমৃতের সিন্ধু।
নির্মল সে অনুরাগে না লুকায় অন্য দাগে
শুক্লবস্ত্রে যৈছে মসীবিন্দু॥

অথচ—

সেই প্রেমার আস্বাদন তপ্ত ইক্ষু চর্বণ
মুখ জ্বলে না যায় ত্যজন।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৃন্দাবনের রঘুনাথদাসের শিষ্য ও সেবক ছিলেন। বর্ধমানে কাটোয়ার নিকটে তাঁর জন্ম ; পরিণত বয়সে তিনি বৃন্দাবনবাসী

হন। সেখানে আধ্যাত্মিক তত্ত্বের শিক্ষা তিনি নিয়েছিলেন রূপ ও সনাতন গোস্বামীদের কাছ থেকে। তাঁর পাণ্ডিত্যও ছিল অগাধ, সংস্কৃত 'গোবিন্দ-লীলামৃত' নামে একখানা মহাকাব্যও কৃষ্ণদাস প্রণয়ন করেন। বৃন্দাবনের গোস্বামীরা তাঁকে যখন চৈতন্য-চরিতামৃত রচনা করতে নির্দেশ দেন তখন কৃষ্ণদাস খুবই বৃদ্ধ। তাঁর ভয় ছিল, হয়তো তিনি গ্রন্থ সমাপ্ত করে যেতে পারবেন না। কবে তাঁর গ্রন্থ সমাপ্ত হয় তা নিয়ে এখনো মতভেদ আছে। তবে মনে হয় তখন সপ্তদশ শতাব্দীর সূচনা হয়েছে; খ্রীঃ ১৬১৫তে তা সমাপ্ত হয়ে থাকবে। কবি সম্ভবত তখন অশীতিপর, হয়তো বা অশীতি-উত্তীর্ণ। এই সুবৃহৎ গ্রন্থের 'আদিলীলা'য় নবদ্বীপলীলার বর্ণনা তিনি খুব সংক্ষেপে শেষ করেছেন—ভক্তিনম্রচিত্তে অনুসরণ করেছেন বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্য-ভাগবতে'র কাহিনী। কারণ,

'নবদ্বীপলীলার ব্যাস বৃন্দাবনদাস।'

'মধ্যলীলা'ও তত বিরাট নয়। এ সকল বিষয়ে কবিরাজ গ্রহণ করেছেন বৃন্দাবনদাসের, মুরারিগুপ্তের ও কবিকর্ণপুরের সংস্কৃত গ্রন্থের সহায়তা ও স্বরূপ-দামোদরের সাক্ষ্য। আসলে 'অন্ত্যলীলা'য় চৈতন্যদেবের নীলাচলের শেষ সতের-আঠার বৎসরের লীলা-বর্ণনাই ছিল তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য। কারণ, সে সময়কার কথা বৃন্দাবনদাসের চৈতন্য-ভাগবতে স্থান পায় নি। এ সময়ে মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ অবস্থা। যে পুলক-রোমাঞ্চে, আর্তি ও আকুলতায় সমস্ত বৈষ্ণব গীতিকাব্য শিহরিত, আলোড়িত, বিহ্বল—সেই মহাভাবেরই আভাস পাই এই দার্শনিক-শ্রেষ্ঠ কবিরাজ গোস্বামীর মুখে:

কাঁহা কাঁহা যাঙ কাঁহা গেলে তোমা পাঙ
তাহা মোরে কহও আপনি।

সুগভীর রহস্যময় সেই অন্ত্যলীলা বর্ণনা করা ও ব্যাখ্যা করা অভাবনীয় ভক্তি ও শক্তি সাপেক্ষ। এই লীলার সাক্ষী রঘুনাথ দাস, স্বরূপ-দামোদর, প্রভৃতি; কৃষ্ণদাস গুরুমুখে সে-সব কথা শুনেছিলেন। এই লীলা-বর্ণনায়—কি তত্ত্ব-বিশ্লেষণে, কি তথ্য-নিষ্ঠায়, কি আপনার ভাব-মাহাত্ম্যে কৃষ্ণদাস কবিরাজ অভাবনীয় সার্থকতা লাভ করেছেন।

গ্রন্থশেষে কবি আপনার যে পরিচয় দিয়েছেন তাও এই মহৎ কাব্য ও মহৎ বৈষ্ণবেরই উপযোগী:

আমি অতি ক্ষুদ্র জীব পক্ষী রাঙাটুনী।
সে যৈছে তৃষ্ণায় পিয়ে সমুদ্রের পানী॥
তৈছে এক কণ আমি ছুঁইল লীলার।
এই দৃষ্টান্ত জানিহ প্রভুর লীলার বিস্তার॥
আমি লিখি এহ মিথ্যা করি অভিমান।
আমার শরীর কাষ্ঠপুতলী সমান॥
বৃদ্ধ জরাতুর আমি অন্ধ ও বধির।
হস্ত হালে মনোবুদ্ধি নহে মোর স্থির॥ ইত্যাদি।

সে কাহিনী যদি সত্য হয় যে এহেন অপূর্ব গ্রন্থ বীর হাম্বীরের দস্যুদল লুণ্ঠন করে নিয়ে গিয়েছিল, তাহলে মানতে হয়—সত্যই এরূপ গ্রন্থ-লোপের ভয়ে সেই বৃদ্ধ কবির প্রাণবিয়োগ ঘটতে পারে। কিন্তু ভাগ্যক্রমে সে গ্রন্থ বিলুপ্ত হয় নি, কবির নামও তাই অমর হয়ে আছে; চৈতন্যলীলাও তাই তার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ-সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয় নি; সর্বোপরি বাঙলার মধ্যযুগের সাহিত্য সমুজ্জ্বল হয়ে আছে কবিরাজ গোস্বামীর সুমহৎ কীর্তিতে।

জয়ানন্দের 'চৈতন্য-মঙ্গল': জয়ানন্দের 'চৈতন্য-মঙ্গল'ও প্রচলিত গ্রন্থ। এটি সাধারণ মানুষের জন্য লেখা, ১৫৭০ খ্রী: ১৬০০ খ্রী:-র মধ্যেই তা রচিত হয়ে থাকবে। তাতে চৈতন্য যোগ-রহস্য-ব্যাখ্যাতা, গোপিনীভাবে নবদ্বীপের নারীরা তাঁর সন্দর্শন-প্রার্থিনী, গোপন আরাধিকা। চৈতন্যের তিবোধানের সম্বন্ধেও একটি নূতন কাহিনী আছে, কিন্তু তা প্রামাণিক বলে গৃহীত হয় নি। জয়ানন্দের কাব্যও পাঁচালী করে গাওয়া হত; মন্দারন, মল্লভূমি অঞ্চলে তার চল ছিল। জয়ানন্দ নিজেও ছিলেন সে অঞ্চলের লোক। কিন্তু এ গ্রন্থের কাব্যগুণ বেশি নয়।

'গোবিন্দদাসের কড়চা': 'গোবিন্দদাসের কড়চা' নিয়ে বাঙলা সাহিত্যে ও বাঙলা বৈষ্ণব-সমাজে বিষম মতভেদ আছে। মাত্র ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে হঠাৎ এই বই প্রকাশিত হয়। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন প্রমুখ পণ্ডিতেরা এই বিবরণকে সত্য সত্যই চৈতন্যের ভৃত্য ও সেবক গোবিন্দদাস কর্মকারের লিখিত বিবরণ বলে গ্রহণ করেন। বাঙলার বৈষ্ণবমণ্ডলী তেমনি একে জাল বলে প্রতিবাদ করেন। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, এই বিবরণীর ভাষা আধুনিক। বিবরণেও একালের মানুষের হাত পড়েছে;—চৈতন্য চরিতামৃতের সঙ্গে তাল রেখে তা রচিত। কিন্তু তথাপি মনে হয়—এর

গোড়ায় হয়তো কিছু সত্য ছিল। অন্তত মহাপ্রভুর তিরোধান ও তাঁর দক্ষিণে ও পশ্চিমে ভ্রমণকালীন বৎসর দু'একের কথা এ 'কড়চা'য় যেরূপ ভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে, তা বৈষ্ণবদের গ্রাহ্য না হলেও সাধারণ পাঠকদের পক্ষে অবিশ্বাস্য নয়। 'কড়চা'য় প্রচার-প্রবৃত্তি ও লীলা-বর্ণনার বাড়াবাড়ি নেই। আধুনিক মানুষের হাত যদি পড়ে থাকে, তা হলেও বলতে হবে—এই আধুনিক মানুষ লোভ সামলিয়েছেন খুব। (দ্রঃ—ডঃ সুকুমার সেন)

আশ্চর্য কথা এই যে, সপ্তদশ শতাব্দীতে আর কেউ চৈতন্য-জীবনী লিখলেন না; অন্যান্য বৈষ্ণব মহাজনদের জীবনীই সেই সময়ে লেখা চলল। আরও একশত বৎসর পরে অষ্টাদশ শতাব্দীতে কবিকর্ণপুরের সংস্কৃত নাটক 'চৈতন্য-চন্দ্রোদয়' অবলম্বন করে প্রেমদাস রচনা করেন 'চৈতন্য-চন্দ্রোদয়-কৌমুদী'। তাঁর আসল নাম ছিল পুরুষোত্তম মিশ্র সিদ্ধান্তবাগীশ। আর তিনি 'বংশীশিক্ষা' নামে আর একখানি জীবনীকাব্যও রচনা করেন; তখন বৈষ্ণব গুরুদের জীবনী-বিবরণ লেখা বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে সুপ্রচলিত হয়ে পড়েছে।

অন্যান্য ভক্ত-জীবনী

চৈতন্যের জীবনীর মধ্যেই তাঁর প্রধান পারিষদ্ অদ্বৈত, নিত্যানন্দ ও হরিদাসের কথা বৈষ্ণব সমাজে সমাদৃত। এর মধ্যে স্বতন্ত্র ভাবে লিখিত হয়েছে অদ্বৈত আচার্যের আর তাঁর পত্নী সীতাদেবীর জীবনী।

অদ্বৈত-জীবনী: শ্রীহট্ট লাউড়ের রাজা দিব্যসিংহ পরিণত বয়সে অদ্বৈত আচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে সংসারত্যাগ করেন। তাঁর নাম হয় কৃষ্ণদাস। তিনি ১৪০৯ শকাব্দে (খ্রীঃ ১৪৮৭) সংস্কৃত ভাষায় অদ্বৈতের বাল্যলীলা বর্ণনা করেন 'বাল্যলীলাসূত্রে'। পরবর্তী কালে শ্যামানন্দ এ গ্রন্থ অনুবাদ করেন 'অদ্বৈততত্ত্ব' বলে। বাঙলায় ঈশান নাগরের 'অদ্বৈতপ্রকাশ' লাউড়ে লিখিত হয় খ্রীঃ ১৫৬৮-৬৯এর দিকে। ঈশান নাগর বাল্যে আচার্যের গৃহেই পালিত হন। তিনি আচার্যের পুত্রের সমবয়স্ক ছিলেন বলে প্রকাশ। ঈশান নাগরের গ্রন্থ সুপরিচিত। অবশ্য এই দুটি গ্রন্থই ('বাল্যলীলাসূত্র' ও 'অদ্বৈতপ্রকাশ') জাল বলেও অনুমিত হয়। না হলে মানতে হবে, 'অদ্বৈতপ্রকাশ' ক্ষুদ্র হলেও বেশ উপাদেয় কাব্য। তাতে চৈতন্যদেবের জীবনেরও অনেক কথা পাওয়া যায়। হরিচরণ দাসের 'অদ্বৈতমঙ্গলে'

চৈতন্যদেবের কথাও প্রচুর। সে কাব্য বেশ বড়। চৈতন্য-জীবনীর মধ্যে তিনি শুধু কবিকর্ণপুরের লেখার কথা উল্লেখ করেছেন; তা থেকে অনুমান করা চলে অন্যান্য জীবনী তখনো লিখিত হয় নি। একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এই যে, শান্তিপুরে শ্রীচৈতন্য রাধা-রূপে, অদ্বৈত কৃষ্ণ-রূপে এবং নিত্যানন্দ বড়ায়ি-রূপে দানলীলার অভিনয় করেছিলেন, কিন্তু সে শান্তিপুরে নয়, নবদ্বীপে, চন্দ্রশেখর আচার্যের গৃহে; আর ভাবাবেশে চৈতন্য সে অভিনয় শেষ করতে পারেন নি। আর একখানি 'অদ্বৈতমঙ্গল' ছিল শ্যামাদাসের লেখা, তা পাওয়া যায় নি। নরহরিদাসের (চক্রবর্তী) 'অদ্বৈতবিলাস' অষ্টাদশ শতকের রচনা।

অদ্বৈত-পত্নী সীতাদেবীর ক্ষুদ্র দুখানি জীবনী আছে—বিষ্ণুদাস আচার্যের 'সীতাগুণকদম্ব' ও লোকনাথ দাসের 'সীতা-চরিত'। দুইখানিতেই সংশয়ের কিছু কিছু কারণ রয়েছে। সীতাদেবী অবশ্য আচার্য-পত্নী, গুরুও। কিছুদিন পরে শ্রীনিবাসের কন্যা হেমলতা দেবীও বৈষ্ণব সমাজে গুরু রূপে এইরূপ প্রভাব বিস্তার করেন। স্মৃতিশাস্ত্রকার যাই বলুন, শাক্ত বা বৈষ্ণব সাধনায় নারীর স্থান নিচে নয়। কিন্তু সাধারণত বাঙালী সমাজ, বিশেষত উচ্চবর্গ, স্মার্ত পণ্ডিতদের শাসনেই চলেছে—চৈতন্যদেবের সময়েও, তার পরেও। তথাপি এরূপ নারীজীবনী যে এ-দেশের জীবনী-কাব্যেরও বিষয়বস্তু হয়েছে, তা বেশ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। গ্রন্থ দু'খানিতে কৃত্রিমতা থাকলেও এ বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য।

শ্রীচৈতন্যের অন্যতম পারিষদ্ বংশীবদন চট্ট অন্য দিক দিয়ে ভাগ্যবান। সপ্তদশ শতাব্দীতে তাঁর প্রপৌত্র রাজবল্লভ তাঁর জীবনী অবলম্বন করে লেখেন 'বংশীবিলাস' (মুরলী-বিলাস)। বৈষ্ণব সাধনার ইতিহাসে এ গ্রন্থ মূল্যবান। আবার অষ্টাদশ শতকে প্রেমদাসের 'বংশী-শিক্ষা'ও এঁকেই নিয়ে রচিত। দুই গ্রন্থেই চৈতন্যদেবের সম্বন্ধেও নূতন কথা কিছু কিছু আছে।

শ্রীনিবাসাদির জীবনী: ষোড়শ শতকের জীবনী-কাব্যে যেমন চৈতন্য ও অদ্বৈতই বিষয়বস্তু, সপ্তদশ শতকের জীবনী-কাব্যের প্রধান বিষয়বস্তু তেমনি শ্রীনিবাস ও নরোত্তম। এই সব কাব্যের মধ্যে সর্বাধিক পরিচিত অবশ্য নিত্যানন্দদাসের 'প্রেম-বিলাস' (খ্রীঃ ১৬০০-১৬০১)। নিত্যানন্দদাস শ্রীখণ্ডবাসী ছিলেন, আর তাঁর আসল নাম ছিল বলরামদাস; তিনি 'বীরচন্দ্র-চরিত'ও লিখেছিলেন বলে গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। নরহরি চক্রবর্তী

'ভক্তিরত্নাকর' ও 'নরোত্তম-বিলাসে'র কিছু কিছু জিনিস এই গ্রন্থ থেকে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু 'প্রেম-বিলাসে' প্রক্ষিপ্ত যথেষ্ট আছে। তথাপি বৈষ্ণব ধর্মের ইতিহাস আলোচনায় এ গ্রন্থ প্রয়োজনীয়। গুরুচরণদাসের 'প্রেমামৃত' এ গ্রন্থের পরে রচিত হয়—শ্রীনিবাস ও তাঁর পুত্র গতিগোবিন্দের বাল্যজীবনী তাতে বর্ণিত হয়েছে। সপ্তদশ শতকের অন্য দুইখানি বৈষ্ণব জীবনী হল গোপীবল্লভদাসের 'রসিকমঙ্গল' (শ্যামানন্দের প্রধান শিষ্য রসিকানন্দের জীবনী) ও শ্রীনিবাস আচার্যের পুত্র গতিগোবিন্দের 'বীররত্নাবলী' (নিত্যানন্দের পুত্র বীরচন্দ্রের কাহিনী)। তখনকার অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে গুরুচরণদাসের 'প্রেমামৃত' এবং যদুনন্দনদাসের 'কর্ণানন্দ' (খ্রীঃ ১৬০৭-১৬০৮) আর শেষে অষ্টাদশ শতাব্দীর মনোহরদাসের 'অনুরাগ-বল্লরী'রও বিষয় শ্রীনিবাস। যদুনন্দনদাস অবশ্য প্রসিদ্ধ পদকর্তা এবং রূপ গোস্বামীর সংস্কৃত নাটক ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের সংস্কৃত কাব্যের অনুবাদক হিসাবেও বাঙলা সাহিত্যে সুপরিচিত। তিনি শ্রীনিবাস আচার্যের কন্যা হেমলতা দেবীর শিষ্য, তাঁর অনুরোধেই 'কর্ণানন্দ' রচনা করেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর নরহরি চক্রবর্তীর 'ভক্তিরত্নাকর' শুধু শ্রীনিবাসের জীবনী-গ্রন্থ নয়; আরও ব্যাপক তার পরিধি ও বিষয়। নরহরি চক্রবর্তী জীবনীকার হিসাবে আরও খ্যাতিমান। কিন্তু শ্রীনিবাসের জীবনীর মধ্যে 'ভক্তিরত্নাকর'কেও গণ্য করতে হয়। 'ভক্তিরত্নাকরে' নরোত্তম ও শ্যামানন্দের স্থানও গৌণ নয়। তা ছাড়াও নরোত্তমের জীবনী নরহরি চক্রবর্তী লিখেছেন 'নরোত্তম-বিলাসে'। শ্যামানন্দের ছোট দু'খানি স্বতন্ত্র জীবনী আছে আঠার শতকের রচনা। কিন্তু সপ্তদশ শতকের 'রসিকমঙ্গলে'ও তাঁর কথা আছে; 'রসিকমঙ্গল' তাঁর প্রধান শিষ্য রসিকানন্দকে নিয়ে লিখিত, তা পূর্বেই জেনেছি। ওড়িষ্যা অঞ্চলে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের ইতিহাস সে গ্রন্থ থেকে লাভ করা যায়।

সপ্তদশ শতকের শেষে বৈষ্ণব-প্রেরণা অনেক দিকে মন্দীভূত হয়ে আসে সত্য। কিন্তু মহাজনদের জীবনী-রচনা বা মহাজনদের গণাখ্যান, শাখা-নির্ণয় প্রভৃতি সমভাবেই চলে; বৈষ্ণব আন্দোলনের ইতিহাসে সে-সবের মূল্য আছে, কিন্তু সাহিত্য বলে মূল্য বিশেষ নেই। তথাপি প্রেমদাস, মনোহরদাস ও বিশেষ করে নরহরি চক্রবর্তী সেই বৈষ্ণব ইতিহাসের ধারাকে অব্যাহত রাখেন; অষ্টাদশ শতকের মানুষ হলেও এ জন্যেই এ প্রসঙ্গে তাঁদের নাম স্মরণীয়।

পদাবলী

আধুনিক কালের (খ্রীঃ ১৮০০) পূর্বেকার বাঙ্‌লা সাহিত্যের প্রধানতম গৌরব জীবনী-কাব্য নয়, মঙ্গল-কাব্য নয়, নানা পৌরাণিক কাব্যও নয়,—সে গৌরব বৈষ্ণব গীতিকবিতা বা 'পদাবলী' সাহিত্য।

সম্ভবত গীতিকবিতাই বাঙালী প্রতিভার নিজস্ব প্রকাশ-পথ। 'চর্যাপদ' থেকে আধুনিক কালে রবীন্দ্রনাথ বা রবীন্দ্রোত্তর কাল পর্যন্ত বাঙ্‌লা সাহিত্যের প্রধান পরিচয়—বাঙালীর গীতি-কবিতা। বৈষ্ণব-গীতিকবিতার ধারাও সেই জয়দেব-বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস থেকে আরম্ভ করে একেবারে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর অনুজদের কাল পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত। অবশ্য, পদাবলীর প্রধানতম বিকাশের কাল ছিল এই শ্রীচৈতন্য যুগের দুই শতাব্দীতে (খ্রীঃ ১৫০০-খ্রীঃ ১৭০০); তারপরে সে ধারা গতানুগতিকতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। বিশাল এই পদাবলী-সাহিত্যের অনেক পদই ভক্ত ভিন্ন অন্যদের নিকট বিশেষত্ব-বর্জিত, ক্লান্তিকর, বৈষ্ণব রসতত্ত্বের ধরাবাঁধা মামুলী দৃষ্টান্ত মাত্র। কিন্তু সে সব ছাঁটাই করে এমন গুটি পঞ্চাশ পদ আমরা আবিষ্কার করতে পারব, শুধু বাঙ্‌লায় কেন, ভারতের কোনো ভাষার কৃষ্ণ-লীলার কাব্যেই যার তুলনা নেই। আর তারও মধ্যে এমন দশটি পদ আবার আমরা সানন্দে গ্রহণ করতে পারব, বিশ্ব-সাহিত্যের যে কোনো গীতিকবিতার সংকলনে যার স্থান হতে পারে।

'ব্রজবুলি'ঃ কৃষ্ণ-লীলা অবলম্বন করে গীতিকবিতা রচনা চলেছিল অনেক দিন থেকেই, বিশেষত ভারতের এই প্রাচ্যমণ্ডলে—গৌড়ে মিথিলায়। মধ্যযুগের বাঙ্‌লায় সেই গীতিকাব্য কিছু কিছু রচনা হয়েছিল জয়দেবের অনুকরণে—সংস্কৃতে; কিছু খাঁটি বাঙ্‌লায়—চণ্ডীদাসের ধারায়। কিন্তু বেশির ভাগ বৈষ্ণব পদই রচিত হয় একটি মিশ্র ভাষায়, 'ব্রজবুলি'তে। এই ধারার মূল উৎস বলা যায় মিথিলার কবি বিদ্যাপতিকে। ব্রজবুলি যে আসলে ব্রজভূমির ভাষা নয়, মূলত মৈথিল ও বাঙ্‌লা মিশ্রিত ভাষা, আর তার সঙ্গে এখানে ওখানে ব্রজবাসী বৈষ্ণব মহাজনদের প্রভাবে মিশ্রিত হয়েছে এক-আধটি ব্রজভাষার শব্দ,—এই সত্য প্রথম আবিষ্কার করেন অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। এ বিষয়ে সম্পূর্ণ ও বিশদ আলোচনা করেছেন ডঃ সুকুমার সেন।

'ব্রজবুলি'র মতো ভাষার উদ্ভব হল মৈথিল ভাষায় কবি বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণ লীলার গীতিসমূহ থেকে।

বিদ্যাপতি ঃ জয়দেবের পরে পূর্ব ভারতে বিদ্যাপতির মতো কবি আর জন্মান নি। পঞ্চদশ শতকে মিথিলায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন, আর প্রায় একশত বৎসর তিনি জীবিত ছিলেন বলে মনে হয়। সংস্কৃতে তিনি পরম পণ্ডিত ছিলেন। আর অপভ্রংশে তিনি যে 'কীর্তিলতা' প্রভৃতি কাব্য রচনা করেছিলেন তা পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে। নিজের মৈথিল ভাষায় তিনি রচনা করেন রাধাকৃষ্ণ-লীলার এই-সব পদ। সম্ভবত বিদ্যাপতি কৃষ্ণভক্ত ছিলেন না, ছিলেন পঞ্চোপাসক, হর-গৌরীর প্রতি তাঁর ভক্তি ছিল অকৃত্রিম। অন্তত বিদ্যাপতির সময়ে চৈতন্যদেব জন্মান নি ; তাই রাধাকৃষ্ণ-লীলার গানের সেই আধ্যাত্মিক রূপান্তরও বিদ্যাপতির সময়ে হয় নি। বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণ-লীলাও নর-নারীর প্রেম-মিলন-বিরহের গান ; বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণও নর-নারীরই অনুকল্প। দেহ নামক বাস্তব জিনিসটির জন্য সংস্কৃত কবিদের মনে লজ্জা জাগত না ; দেহাতীত প্রেমেও তাঁদের কোনো বিশেষ আস্থা বা আগ্রহ ছিল না। বিদ্যাপতিও এই ভারতীয় ঐতিহ্যের কবি, অপূর্ব কাব্যশক্তির ও সঙ্গীতমাধুর্যের অধিকারী কবি। মিথিলা তখন ন্যায়ের প্রধান পাঠকেন্দ্র। বাঙালী ছাত্ররা সেখানে ন্যায় অধ্যয়ন করতে যেতেন, বিদ্যাপতির পদাবলী শুনতেন, মুগ্ধচিত্তে স্বদেশে তা নিয়ে ফিরতেন। তখনো মৈথিলী ও বাঙ্‌লা ভাষার পার্থক্য দুস্তর নয়। দেখ্‌তে না দেখ্‌তে বিদ্যাপতির পদ তাই বাঙ্‌লায় বিস্তৃত হয়। শ্রীচৈতন্যদেবের সমকালেই দেখি—মিথিলার কবি বিদ্যাপতি বাঙ্‌লার কবি বলেই বাঙালীর নিকট পরিচিত হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর রাধাকৃষ্ণ-প্রেমের মৈথিল পদসমূহ যে মৈথিলীতে রচিত তাও পরে আর কেউ মনে করেন নি। বিদ্যাপতির রচনা-মাধুর্যে আকৃষ্ট হয়ে বিদ্যাপতির অনুকরণে বাঙালী পদকর্তারাও অনুরূপ ভাষায় পদ-রচনায় মেতে উঠলেন,—স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এই ভাষার মাধুর্যে আকৃষ্ট হয়ে ব্রজবুলিতে লেখেন 'ভানুসিংহের পদাবলী'। বাঙালীর লিখিত এই অনুকৃত কাব্যভাষায়ও যে বাঙ্‌লা ভাষার প্রভাব পড়বে তা স্বাভাবিক। কিন্তু তবু এ ভাষা যে খাঁটি বাঙ্‌লা নয়, তা সকলেই বুঝতেন। মৈথিলী ভাষা অপরিচিত বলে সাধারণ লোকে মনে করে নিলেন—এই বিদ্যাপতির পদের ভাষাই ব্রজভূমির ভাষা, রাধা-কৃষ্ণের শ্রীমুখের ভাষা। তাই এর নামকরণ হয় 'ব্রজবুলি' অর্থাৎ বৃন্দাবনের ভাষা। কিন্তু 'ব্রজভাষা'র সঙ্গে যাঁর পরিচয় আছে তিনি সহজেই বুঝবেন এ ধারণা ভুল। 'ব্রজবুলি'

আসলে ব্রজলীলার মৈথিলী-বাঙ্‌লা-মিশানো কাল্পনিক ভাষামাত্র। অবশ্য রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক কবিতা ছাড়া অন্য গীতিকবিতাও এ ভাষায় রচিত হয়েছে, এবং বাঙ্‌লার বাইরে নেপালে কামরূপে ওড়িষ্যাতেও এই ব্রজবুলিতে কাব্য-রচনা চলেছিল। তাই, সে সব ক্ষেত্রে এই মিশ্রিত মৈথিলীর সঙ্গে বাঙ্‌লা ছাড়া প্রাদেশিক অন্য বুলিরও ছাপ এক-আধটুকু পাওয়া যাবে।

পঞ্চদশ শতাব্দীর মিথিলার কবি বিদ্যাপতি ঠক্কুর মৈথিলী কবিতা অপেক্ষাও সংস্কৃত অপভ্রংশে কাব্য রচনা করেছিলেন অনেক বেশি; কিন্তু তিনি বাঙালী বৈষ্ণব-সমাজে বৈষ্ণব-ভক্ত বলেই শুধু গণ্য হন নি, বাঙালী তাঁকে বাঙ্‌লার কবি বলেই জানত। আর যিনি বাঙ্‌লার এত বড় এক কাব্য-ধারার জন্মদাতা তাঁকে বাঙ্‌লা সাহিত্যের আপনার বলা নিশ্চয়ই সমুচিত।

পদাবলীর সাধারণ রূপঃ বিষয় অনুসারে পদাবলীর পদসমূহ সংগৃহীত হয় নি। সে ভাবে ভাগ করলে বৈষ্ণব গীতিকবিতাগুলি চার ভাগে পড়ে (দ্রঃ—ডঃ সুকুমার সেনের বাঃ সাঃ ইতিহাস); যথা (১) **গৌর-পদাবলী**ঃ এ-সব পদে চৈতন্য-লীলা বর্ণিত হয়েছে। ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণ-লীলারই যে তা নূতন রূপ, এ কথাটি এ-সব পদের প্রতিপাদ্য; তত্ত্ব হিসাবে এই যে নবদ্বীপ ও শ্রীখণ্ডের বৈষ্ণব মহাজনদের মতবাদ ছিল, তা পূর্বেই দেখেছি। (২) **ভজন পদাবলী**ঃ এ-সব আসলে বন্দনাগীতি, প্রার্থনা-কাব্য, গুরু ও মহাজনদের উদ্দেশ্যে রচিত। (৩) **রাধাকৃষ্ণ পদাবলী**ঃ পদাবলী বলতে সচরাচর বোঝায় প্রধানত এই ব্রজলীলার কাব্য। এ যে বহুদিনের সুপ্রচলিত একটি ধারা, তা আমরা দেখেছি; কিন্তু তখন এ কাহিনী ছিল আদিরসের বিষয়-বস্তু; চৈতন্যদেবের পর থেকে তা হয়ে উঠল প্রেমভক্তিরসের অপূর্ব আশ্রয়। রাধা আর রাধা নেই, চৈতন্যদেবের তীব্র আকুলতার মধ্য দিয়ে তিনি মানব-আত্মার চিরন্তন বিগ্রহ হয়ে উঠলেন। অবশ্য, গোপীদের মধুর রস ছাড়াও, কৃষ্ণ-যশোদার আশ্রয়ে বাৎসল্য রস আর গোপ-বালকদের আশ্রয়ে সখ্যরসও এই অধ্যাত্ম-রাগরঞ্জিত কাব্যধারায় স্থান লাভ করেছে। (৪) **রাগাত্মিকা পদাবলী**ঃ এর প্রাচীনত্ব হয়তো আরও অধিক; 'চর্যাপদে' আমরা এই ধারারই তখনকার প্রথম নিদর্শন দেখেছি বাঙ্‌লায়। আর এ ধারা এসে একেবারে আধুনিক আউল-বাউলের গানে ঠেকেছে। বৈষ্ণব সহজিয়াদের হাতে এ ধারার এমন কয়েকটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন আমরা পেয়েছি যার তুলনা নেই। অবশ্য সাধারণত গুহ্য সাধন-তত্ত্বের বিষয় বলে অনেক সময়ে এ-সব পদ দুর্বোধ্যও।

কিন্তু বিষয় হিসাবে পদাবলীগুলি সাধারণত ভাগ করা হয় নি। পদকর্তাদের নাম বা কালানুযায়ীও তা গ্রথিত নয়। দু-একজন প্রধান প্রধান পদকর্তার পদের অবশ্য স্বতন্ত্র সংগ্রহ আছে। নাহলে পদাবলীগুলি আমরা পাই কিছু কিছু বৈষ্ণব অলঙ্কার-নিবন্ধ থেকে ; এবং প্রধানত পাই পরবর্তী বৈষ্ণব মহাজনদের সংগ্রহ-গ্রন্থ থেকে। সেই সব সংগ্রহ-গ্রন্থ প্রায়ই অষ্টাদশ শতকে সংকলিত। অথচ অষ্টাদশ শতকেই বৈষ্ণব পদাবলী অনেকাংশে একটা ছাঁচে-ঢালা ভক্তিরীতি ও কাব্যরীতি হয়েছে। পদাবলীর শ্রেষ্ঠ যুগ গিয়েছে ষোড়শ শতাব্দীতে, তখনো চৈতন্যের প্রেমোন্মাদনায় তা মঞ্জরিত। সপ্তদশ শতাব্দীতেই সে প্রেরণা আর ততটা প্রাণোচ্ছল নেই। তবু তখনো সৌন্দর্য, স্বচ্ছতা, অকৃত্রিমতা, এবং বিশেষ করে, কাব্য-কৌশল সবই তাতে সুপ্রচুর।

পদাবলীর সংগ্রহ-গ্রন্থসমূহে রাধাকৃষ্ণের প্রেম-কাহিনীর কবিতাগুলি সাজান হয়েছে বৈষ্ণব রস-তত্ত্বের নিয়মানুযায়ী বয়ঃসন্ধি, পূর্বরাগ, দৌত্য, অভিসার, সম্ভোগ, মানবিরহ, প্রেমবৈচিত্ত্য, ভাবসম্মেলন ইত্যাদি অনুক্রমে এবং নায়িকা-বিভাগের নিয়মে বাঁধা নানা পার্থক্য অনুযায়ী—যথা, মানিনী, খণ্ডিতা, বিপ্রলব্ধা, ইত্যাদি। অবশ্য অনেক সময়েই গৌরলীলার পদ দিয়ে তা আরম্ভ। এসব রস-বিশ্লেষণের মূল হচ্ছে রূপ গোস্বামীর সংস্কৃতে লেখা 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু', 'উজ্জ্বল-নীলমণি', এবং নরহরি চক্রবর্তীর 'ভক্তিরত্নাকর'। পদসংগ্রহকারীরাও সেই বিশ্লেষণ অনুযায়ীই পদ সাজিয়েছেন। আসলে পদকর্তারা কেউ কেউ হয়তো খণ্ড কবিতা বা খণ্ডগীত রচনা করেছেন। অনেকে হয়তো ধারাবাহিক রাধাকৃষ্ণের প্রেম-লীলাও বর্ণনা করতে চেয়েছেন। আরও অনেকে চেয়েছেন পদাবলীতে রাধাকৃষ্ণের চব্বিশ প্রহরের অষ্টকালিক লীলা যথাক্রমে বর্ণনা করতে। কিন্তু শেষদিকে অনেকে যেন একেবারে রসশাস্ত্রের বিশ্লেষণ সম্মুখে রেখেই বসেছিলেন তার দৃষ্টান্ত হিসাবে পদ-প্রণয়ন করতে, এ বিষয়েও সন্দেহ নেই। ভক্তি অকৃত্রিম হলেও এরূপ রচনায় প্রেরণার স্বচ্ছতা কমে আসবেই ; আর, রচনাতেও ক্রমশই দেখা দেবে কৃত্রিমতা। পদাবলীর অজস্র প্রাচুর্যের মধ্যেও তাই সৃষ্টি-লক্ষণ এত চোখে পড়ে।

সমস্ত বৈষ্ণব পদাবলী অবশ্য আজও সংগৃহীত হয় নি ;—এখনো তার সংগ্রহ চলেছে। যা সংগৃহীত হয়েছে তার সংখ্যা তথাপি সাত আট হাজার। অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বেই দেখি তিন হাজারের উপর পদ সংগৃহীত হয়েছে। পদকর্তার সংখ্যাও তখনি ১৫০এর উপর ; অন্তত ৩ জন তার মধ্যে নারী

কবি, ১১ জন মুসলমান। মধ্যযুগের বাঙালী প্রতিভা যে আপনার প্রকাশপথ চিনে নিয়েছে, তার প্রমাণ একদিকে পদাবলীর এই অজস্রতা; অন্যদিকে উৎকৃষ্ট পদ-সমূহের অমোঘ আবেদন।

চৈতন্য-পর্বের পদকর্তা

রাধাকৃষ্ণ-লীলার পদ ও চৈতন্য-লীলার পদ ভাবে ভাষায় ক্রমেই এত প্রথাগত ও গতানুগতিক হয়ে উঠেছে যে, এই সব পদের অধিকাংশেরই বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যায় না। অনেক পদ থেকে পদকর্তাকে আবিষ্কার করাও তাই দুঃসাধ্য;—অনেক ক্ষেত্রে তা অসাধ্য। কারণ, একই পদে হয়তো বিভিন্ন পুঁথিতে বিভিন্ন ভণিতা পাওয়া যায়; একই পদে দুই-এক সময়ে দুই কবির ভণিতা একই সঙ্গে পাওয়া যায় (যেমন, বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের); একই নামের পদকর্তাও আছেন একাধিক (যেমন, গোবিন্দদাস কবিরাজ ও গোবিন্দদাস চক্রবর্তী); আবার কখনো বা কোন্‌টা নাম কোন্‌টা উপাধি তাও অনিশ্চিত (যেমন, কবিশেখর, রায়শেখর, কবিরঞ্জন,—সবই কি দৈবকীনন্দন সিংহের উপাধি? কবিরঞ্জন ও কবিশেখর—কি একই লোক?—'ছোট বিদ্যাপতি'?); এবং একই নামে (যেমন, 'বিদ্যাপতি', 'চণ্ডীদাস') যে কত জন লিখেছেন তাও বলা কঠিন,—নূতন পদ বা পদ্যাংশকে কোনো পূর্ববর্তী মহাজনদের পদ বলে চালিয়ে দেবার বা তাঁদের প্রচলিত পদের মধ্যে ঢুকিয়ে দেবার ঝোঁকও পূর্বাপরই ছিল। অতএব, বিশেষ প্রসিদ্ধ পদ ও বিশেষ প্রসিদ্ধ পদকর্তা ভিন্ন অন্য পদ ও পদকর্তাদের পরিচয় গ্রহণ সাহিত্য-পাঠকের পক্ষে নিষ্প্রয়োজন। (ডঃ দীনেশ সেন পদকর্তাদের একটি তালিকা দিয়েছেন 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'। বলাই বাহুল্য, তাও অসম্পূর্ণ। ব্রজবুলি ও ব্রজবুলি-পদকর্তাদের বিশদ বিবরণ দিয়েছেন ডঃ সুকুমার সেন ইংরেজিতে লিখিত ব্রজবুলি সাহিত্যের ইতিহাসে।) একটা জিনিস তবু এই সব পদ থেকে বোঝা যায়—পদের বিশেষ গুণাগুণ থেকে অনুমান করা চলে তা কোন্‌ শতাব্দীর রচনা (অবশ্য লিপিকাররা তার উপরও ছাপ দিয়ে যান নিজেদের হাতের ও কালের); হয়তো 'পদকর্তা'র পরিচয় থেকেও তা আবার স্থির করা সম্ভব। বিভিন্ন শতাব্দীর এই প্রধান পদকর্তাদের কয়েকটি নামই শুধু জ্ঞাতব্য, অরণ্যে প্রবেশ করে লাভ নেই।

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি অবশ্য প্রাক্-চৈতন্য যুগের কবি। তাঁরা দু'জনে দুটি বিশিষ্ট ধারার স্রষ্টা—ভাষায় ও ভাবে। এঁদের পদে চৈতন্যদেবের উল্লেখ থাক্‌বে না, এবং চৈতন্য-প্রভাবেরও ছাপ থাকবার কথা নয়। চৈতন্যদেবের সময় (ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধ) থেকে তাই গণনা করলে প্রথমত আমরা পাই চৈতন্য-সমকালীন মহাজনদের,—যেমন, মুরারি গুপ্ত, যিনি চৈতন্যের প্রথম জীবনীকার (সংস্কৃত ভাষায়); সাত আটটি পদের তিনি রচয়িতা। তিনি গাইলেন 'পিরীতির' জয়!

পিরীতি আগুনি জ্বালি সকলি পোড়াইয়াছি
জাতি কুল শীল অভিমান।

এবং

স্রোত-বিথার জলে এই তনু ভাসাইয়াছি
কি করিবে কুলের কুকুরে

শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার ও বাসুদেব ঘোষ চৈতন্য-লীলার প্রথম দিককার পদকার ও প্রসিদ্ধ ভক্ত। 'নরোত্তমবিলাস' ও 'ভক্তিরত্নাকরে'র রচয়িতা নরহরি চক্রবর্তীর পদের সঙ্গে নরহরি সরকারের পদ মিশে গিয়ে থাকতে পারে, তাছাড়া নরহরির নামে সহজিয়া পদও রয়েছে, হয়তো শ্রীখণ্ডের বৈষ্ণব-সহজিয়াদের তা কীর্ত। বাসুদেব ঘোষ লেখেন প্রায় আশীটি পদ, আর তার অকৃত্রিমতা সবজন-স্বীকৃত। বিশেষ করে বাৎসল্যরসের সৃষ্টিতে তিনি কৃতী। বংশীবদন (চট্ট) ছিলেন আর এক সমসাময়িক পদকর্তা। তাঁর পদ ও শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য বংশীদাসের পদ মিশে গিয়েছে। এর পরেই উল্লেখযোগ্য ষোড়শ শতাব্দীর অন্যান্য পদকর্তাদের মধ্যে শ্রীখণ্ডের নরহরিদাসের শিষ্য, 'চৈতন্যমঙ্গলের' রচয়িতা লোচনদাস,—যাঁর দু'একটি পদ চণ্ডীদাসের নামেও চলে, লাচাড়ি ছন্দের পরে যাঁর দক্ষ হাতের স্বাক্ষর কেউ ভুল করতে পারে না;

ব্রজপুরে রূপ নগরে রসের নদী বয়।
তীর বহিয়া ঢেউ আসিয়া লাগিল গোরা গায়।
রূপ-ভাবনা গলায় সোনা ঘুচিবে মনের ধাঁধা।
রূপের ধারা বাউল পারা বহিছে জগত-আঁধা॥
রূপ-রসে জগত ভাসে এ চৌদ্দ ভুবনে।
খাইলে মজে দেখিলে মজে কহিলে কেবা জানে॥

এই সঙ্গেই উল্লেখযোগ্য বলরাম দাসের নাম। যদিও এ নামেও একাধিক পদকর্তা ছিলেন, তবু তাঁদের মধ্যে যিনি স্মরণীয় তিনি হয়তো এ সময়কারই কবি, আর বাৎসল্যরসের বর্ণনায় এই বলরাম দাস প্রায় অতুলনীয়।

শ্রীদাম সুদাম দাম শুন ওরে বলরাম
মিনতি করিয়ে তো সভারে।
বন কত অতিদূরে নব-তৃণ-কুশাঙ্কুরে
গোপাল লৈয়া না যাইহ দূরে॥
সখাগণ আছে পাছে গোপাল করিয়া মাঝে
ধীরে ধীরে করিহ গমন।
নব-তৃণাঙ্কুর আগে রাঙ্গা পায় জানি লাগে
প্রবোধ না মানে মোর মন॥

কারণ, তা মায়ের মন, এবং বাঙালী মায়ের মন,—কাঁটা যদি ফোটে তবে যারা আগে পাছে যাবে সেই শ্রীদাম সুদামের পায়েই ফুটুক, আমার গোপালের পায়ে যেন না ফোটে।

পদাবলীর অমর কবি জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস। জ্ঞানদাস এই ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধের কবি, নিত্যানন্দ শাখার ভাবনায় ভাবিত। তাঁর বাড়ী ছিল বর্ধমানে কাঁদড়ায়। গোবিন্দদাস কবিরাজ ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে জন্মেন, শ্রীনিবাসের শিষ্য, নরোত্তম দাসের সুহৃদ্ রামচন্দ্র কবিরাজের অনুজ ভ্রাতা; শ্রীখণ্ড থেকে তাঁরা তেলিয়া বুধরি গ্রামে গিয়ে বসবাস করেন।

বাঙ্‌লা পদকর্তাদের মধ্যে জ্ঞানদাসের স্থান চণ্ডীদাসের সঙ্গে, ব্রজবুলির কবিদের মধ্যে যেমন গোবিন্দদাসের স্থান বিদ্যাপতির সঙ্গে। চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত পদাবলীতে ও বিদ্যাপতির নামে প্রচলিত পদাবলীতে অবশ্য তাঁদের অনুকারী নানা পদকর্তার পদ এসে মিশে গিয়েছে—এখনকার গবেষকরা তা অনেকটা যুক্তি-বিচার দিয়ে পৃথক করে নিচ্ছেন। সে সত্য গ্রাহ্য করেই আমরা বলতে পারি বাঙ্‌লায় চণ্ডীদাসের নামীয় এই সব পদ (তিনি 'দ্বিজই' হোন আর 'দীনই' হোন) এই ষোড়শ শতকের শেষার্ধ থেকেই রূপ গ্রহণ করেছে, পরে তার সংখ্যা আরও বেড়েছে। বিদ্যাপতির নামীয় পদাবলীও তখন 'ব্রজবুলি'র পদাবলী বলে গ্রাহ্য হয়ে গিয়েছে, পরে তার সংখ্যাও বেড়েছে। কিন্তু এই দুই কবিই তখন বৈষ্ণব পদরীতির আদর্শস্থল বলে গণ্য। আর এঁদের সেই ধারায়, ভাবে ও ভাষায় যাঁরা

বাঙলার শিরোমণি তাঁদের মধ্যে একদিকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানদাস, অন্যদিকে শ্রেষ্ঠ গোবিন্দদাস। যে-সব পদাবলী বাঙালীর গৌরব, তার অধিকাংশই হয় চণ্ডীদাসের বা বিদ্যাপতির ভণিতায়, নয় জ্ঞানদাস বা গোবিন্দদাসের ভণিতায়। জ্ঞানদাস অবশ্য ব্রজবুলিতেও প্রায় একশত পদ রচনা করেছেন, কিন্তু তাঁর উৎকৃষ্ট পদ বাঙ্‌লায়। গোবিন্দদাসের প্রায় সমস্ত পদই ব্রজবুলিতে রচিত। ছন্দ-ঝঙ্কারে, অনুপ্রাসে, অলঙ্কারে, কবিকর্মের অপূর্ব নিপুণতায় গোবিন্দদাস অতুলনীয়। ভাবগৌরব তাঁর কম নয়; কিন্তু গীতিমাধুর্যই তখন যে কবিত্বের লক্ষ্য হয়ে উঠেছে তা বুঝতে পারা যায়।

সপ্তদশ শতকে এই ছন্দ-কৃতিত্ব ক্রমেই বেড়ে চলল, ভাব-সরসতায় তখন ক্রমশঃ ভাঁটা পড়ছে। সপ্তদশ শতকেও তবু উৎকৃষ্ট পদকর্তার অভাব নেই। গোবিন্দদাসকে ছেড়ে দিলে প্রধান উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন হেমলতা দেবীর শিষ্য ছন্দশিল্পী যদুনন্দন দাস। জগদানন্দ ছন্দের কারুকর্মে তাঁকেও ছাড়িয়ে গিয়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পদাবলীতে কাব্যরসও তলিয়ে গিয়েছে। অন্যান্য প্রখ্যাত পদকর্তা হলেন শ্রীনিবাস-শিষ্য রাধাবল্লভ দাস (চক্রবর্তী), গোবিন্দদাসের পৌত্র ঘনশ্যাম, শ্রীখণ্ডের রামগোপাল দাস (গোপাল দাস), এবং সৈয়দ মর্তুজা (জঙ্গীপুর, মুর্শিদাবাদ); ও 'পদ্মাবৎ'এর কবি সৈয়দ আলাওল (আরাকান),—যাঁর কবি-প্রতিভা অন্যদিকেও ছিল অসামান্য।

এই কালের কবিরা ছিলেন শ্রীনিবাস-নরোত্তম-শ্যামানন্দের প্রচারে ও প্রতিভায় উদ্বুদ্ধ। আর সেই সময়েই বাঙ্‌লার বিচিত্র কীর্তন-পদ্ধতির প্রচলন হয়, বিভিন্ন ধারা ক্রমশ বিকশিত হয়ে ওঠে; যথা, গরানহাটী, রেনিটী (রাণীহাটী); মনোহরসাহী, ঝাড়খণ্ডী (বা মান্দারণী)। বিশেষ একেকটি কেন্দ্রের নাম অনুসারে এই সব কীর্তন-পদ্ধতির নামকরণ হয়েছে।

অষ্টাদশ শতকেও অবশ্য কয়েকজন সুপ্রসিদ্ধ পদকর্তা জন্মগ্রহণ করে-ছিলেন। যেমন, চন্দ্রশেখর ও শশিশেখর, রাধামোহন ঠাকুর, নরহরি চক্রবর্তী। ঊনবিংশ শতকেও পদাবলীতে মুগ্ধ হয়ে মাইকেল কি লেখেন নি, 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' আর রবীন্দ্রনাথ 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'? এমন কি, বঙ্কিমও পদ লিখেছেন। কিন্তু তা সত্বেও চৈতন্য যুগই (১৫০০-১৭০০ খ্রীষ্টাব্দ) হল মোটের উপর পদাবলীর শ্রেষ্ঠ যুগ।

পদাবলীর বৈশিষ্ট্য: বৈষ্ণব পদাবলীর মূলকথা ব্রজলীলা, ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও এ লীলা সমাদৃত। পদাবলীর কাব্য-ঐতিহ্য ভারতীয়

(সংস্কৃতানুগত) কাব্যাদর্শ ও কাব্য-ঐতিহ্য ; ভারতের অন্যান্য ভাষারও প্রধান আশ্রয় তাই। অতএব বাঙালী বৈষ্ণবের যা নিজস্ব তাই শুধু দু'কথায় এখানে আমরা স্মরণ করছি। প্রথম কথা হল—রাধাকৃষ্ণ-লীলা ঠিক এমন করে আর কোনো সাহিত্যে অধ্যাত্ম-সাধনার ভাবময় রূপক হয়ে ওঠে নি। মানব-দেহ ও মানব-প্রাণের এই সহজ ধর্মকে অস্বীকার না করেও দেহের পরিধিকে অতিক্রম করে যায় পদাবলীর প্রণয়ী-প্রণয়িনী। শৈব ও সহজিয়া তন্ত্রের পরিবেশেই হয়তো ও বিকাশ সম্ভব। তন্ত্রের প্রকৃতি-পুরুষ অবশ্য স্বতন্ত্র তত্ত্ব। কিন্তু কৃষ্ণ-রাধা এক একটি মহা-মুহূর্তে নিজেদের ভেদাভেদ ঘুইয়ে এই মধুর রসে এক হয়ে ওঠেন। কামনা-বাসনা কোনোটাই এখানেও অস্বীকৃত হয় নি ; বিলুপ্ত হয় শুধু তার বিচ্ছেদ-বেদনা, আর তা বিলুপ্ত হয় এক সর্বব্যাপী নিঃসীম অন্তরাবেগের মধ্যে। অবশ্য মধুর রস ছাড়াও সখ্য, বাৎসল্য, দাস্য রসের পদও আছে। কিন্তু পদকর্তাদের চোখে মধুর রসই শ্রেষ্ঠ রস। ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়ে ইন্দ্রিয়াতীতের এই সন্ধান, ব্যক্তি-কামনার মধ্য দিয়ে বিশ্ব-কামনার মধ্যে এই জাগরণ, মানব-আত্মার এই পরমাত্মার সঙ্গে মিলনের অভিসার—এই রহস্যটিই বৈষ্ণব পদাবলীর আত্মা। মানুষী প্রেমের ভাগবতী ভক্তিতে এই রূপান্তর-রহস্যকে কেন্দ্র করেই তার সমস্ত সাধনা।

দ্বিতীয় কথা এই যে, এ সাধনার পরিণিত হয়তো বৈষ্ণবের পরম বৈরাগ্য, শান্তরস ; কিন্তু সাধনার পদ্ধতি হল আর্তি ও আকুলতা। কান্তরসই হল সব-রসসার। বিশ্বের হ্লাদিনী শক্তির বিকাশে বৈভবে তার যাত্রা, স্বেদ কম্প রোমাঞ্চ থেকে সুরু করে প্রেমোন্মাদনার ভাবৈশ্বর্যে তার পরিণতি। 'বন-বৃন্দাবন', 'মন-বৃন্দাবন' আর শেষে 'নিত্যবৃন্দাবন'—কোনো বৃন্দাবনই তাই এ সাধনায় মিথ্যা নয়। 'শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান' নয়, লক্ষ্য তথাপি বৈকুণ্ঠই। প্রেম-চতুরের বংশী গোপবধূকে ব্যাকুল করে—সমস্ত গৃহকর্মে তার ভুল ঘটে। কিন্তু শুধু দেহটাই বিবশ হয় না, তার প্রাণও ছোটে। আর সেই প্রাণও একা শুধু ছোটে না বংশীবটের দিকে, ছোটে ব্রজের শ্যামলী-ধবলী ; সেই বংশীধ্বনিতে উজান বহে যমুনা, খসে পড়ে গোপবধূর বসন-ভূষণের মতোই সংসারের বন্ধন, সত্তার স্বাতন্ত্র্য-বোধ। তৃতীয় কথা, পদাবলীর ভাষা হল আকুলতার ভাষা। এই আর্তি ও আকুলতার বাহক যে পদসমূহ সেগুলি তাই শব্দপ্রধান কাব্য নয়, সুর-প্রধান সঙ্গীত। বৈষ্ণব পদাবলী তাই পড়বার জিনিস নয় ; সুরে তালে ছন্দে রসকীর্তনে তার

সম্পূর্ণতা। এ কথা মনে না রাখলে আজ পড়তে বসে 'ব্রজবুলি'র অনেক পদকে মনে হবে অলঙ্কার-বাহুল্যে অচল, আর অনেক বাঙলা পদকে মনে হবে হাস্যকর, ভাব-বিলাসিতায় অসম্বৃত, রুচিতে দৈন্যগ্রস্ত। বৈষ্ণব ভক্ত না হলে অবশ্য পদাবলী বা পদকীর্তনের অনেক কিছুই মনে হবে অসহ্য। তবু পদাবলীর তত্ত্ব ও জগতের সঙ্গে এই সাধারণ পরিচয়টুকু রাখলে কাব্যরসিক পাঠকও, ভক্তিতে বিগলিত না হোন, অন্তত তার রসাস্বাদনে যথেষ্ট পরিতৃপ্ত হবেন। বিশেষ করে তাঁকে পরিতৃপ্তি দেবে চণ্ডীদাসের কয়েকটি পদ।

পদাবলীর কাব্যরসঃ বাঙলা সাহিত্যের পাঠক মাত্রেই পদাবলীর এক একটি পদের দু'একটি পঙ্‌ক্তিকে আপনা থেকেই আপনার ভাষা বলে স্বীকার করে নিয়েছেন;—তা আর শুধু বৈষ্ণবের গান নেই, রাধাকৃষ্ণের লীলা-বিষয়ও নেই, তা চিরন্তন মানবলীলার স্বাক্ষর বহন করে হয়ে গিয়েছে বিশ্বমানবের গান, তাদের প্রাণলীলার কথা। যেমন, চণ্ডীদাসের কাব্যে শ্রীকৃষ্ণের 'পূর্বরাগে'র উক্তি (রাধার রূপ):

চলে নীল শাড়ী নিঙাড়ি নিঙাড়ি পরাণ সহিত মোর।

অথবা: জ্ঞানদাসের সেই অপূর্ব দু'টি 'পূর্বরাগে'র পঙ্‌ক্তি:

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥

প্রেমের কবিতা এর চেয়ে সচ্ছন্দ আর সত্য বোধ হয় হতে পারে না। আরও আধ্যাত্মিক হতে পারে তার ভাব, আরও স্পষ্ট প্রাণোজ্জ্বল হতে পারে তার রূপ, কিন্তু এমন সুস্পষ্ট অথচ এমন সরল প্রেম-বেদনার প্রকাশ কবিতায় আর বেশি নেই। এই কামনা অবশ্য মানবীয় কামনা; আধ্যাত্মিক তত্ত্বের মতোই তাও বৈষ্ণব কবিতার তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে অনুরণিত। কোথাও হয়তো কাব্যালঙ্কারে তা একটু আচ্ছাদিত, অধ্যাত্মভাবে আচ্ছন্ন; কিন্তু সমস্ত উজ্জ্বল রসের মধ্যে মানব-কামনার সরাগ জ্বালা কোথাও বিলুপ্ত হয়ে যায় নি, প্রায়ই তা দেখা যাবে। তাই তা সর্বসাধারণের ভাষা হয়েছে। যেমন, চণ্ডীদাসের এই পদটি—

দুহু' কোরে দুহু' কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
আধ তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া॥

কিংবা চণ্ডীদাসের রাধার এই উক্তি :

কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান।
অবলার প্রাণ নিতে নাই তোমা হেন॥
রাতি কৈনু দিবস দিবস কৈনু রাতি।
বুঝিতে নারিনু বঁধু তোমার পীরিতি॥
ঘর কৈনু বাহির—বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু আপন আপন কৈনু পর॥

এবং

সই কেমনে ধরিব হিয়া
আমার বঁধুয়া আন বাড়ি যায় আমার আঙিনা দিয়া।

আর ভাব-সম্মেলনের এই তন্ময়তা :

বঁধু কি আর বলিব আমি।
জীবনে মরণে জনমে জনমে প্রাণনাথ হৈও তুমি॥
তোমার চরণে আমার পরাণে বান্ধিল প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া একমন হৈয়া নিশ্চয় হৈলাম দাসী॥

বিদ্যাপতি অবশ্য অনেক বেশি অলঙ্কার-বিদগ্ধ কবি। কিন্তু তাঁর পদও সাধারণে নিজস্ব করে নিতে বাধা পায় নি। যেমন,

আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়নু
পেখনু পিয়া-মুখ-চন্দা

আর তাই

সোই কোকিল অব লাখ ডাকয়ু লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচ বাণ অব লাখ বাণ হউ মলয় পবন বহু মন্দা॥

আর রাধার সেই প্রসিদ্ধ উক্তি :

গণইতে দোষ গুণলেশ ন পাওবি
যব তুহুঁ করবি বিচার।

আর প্রার্থনামূলক এই পদ :

তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম সুত মিত রমণী সমাজে।

কিংবা ভাবাবেশের এই অপূর্ব পদ—যা সম্ভবত কবিবল্লভের, যদিও বিদ্যাপতির নামে চলে গিয়েছে—

সখি কি পুছসি অনুভব মোয়,
সোই পীরিতি অনুরাগ বখানিতে
তিলে তিলে নৌতুন হোয়।
জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু
নয়ন ন তিরপিত ভেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়া হিয়ে রাখনু
তব হিয়া জুড়ন ন গেল।

দেহকে না ছাড়িয়েও এখানে বিদ্যাপতির (?) প্রেম দেহাতীত হয়ে উঠেছে—চণ্ডীদাসের শ্রেষ্ঠ পদের মতোই।

কিন্তু বিদ্যাপতি অতুলনীয় তাঁর ছন্দ ও সঙ্গীতের জন্যই; ব্রজবুলির কবিদের ছন্দঝংকৃত মধুর পদাবলীও তাই তাঁর বলেই চলে যায়। যেমন, বিদ্যাপতির বলে পরিচিত এই সুপরিচিত পদটি রায়শেখরের:

এ সখি হমরি দুখক নাহিক ওর।
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন মন্দির মোর।
ঝম্পা ঘন গরজন্তি সন্ততি ভুবন ভরি বরখন্তিয়া।
কান্ত পাহুন কাম দারুণ সঘন খরশর হন্তিয়া॥
কুলিশ শত শত পাত মোদিত ময়ুর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী ফাটি যাওত ছাতিয়া॥
তিমির দিগ্ ভরি ঘোর যামিনী অথির বিজুরিক পাঁতিয়া।
ভণয়ে শেখর কৈছে বঞ্চব হরি বিনু ইহ রাতিয়া॥

প্রচলিত পাঠান্তরে ভণিতা পাওয়া যায়—
বিদ্যাপতি কহ কৈসে গোঙায়বি হরি বিনু দিন রাতিয়া॥

বাক্যের এই বিদ্যুচ্ছটা আর ছন্দের এই মেঘগর্জনেই যে সেদিন থেকে বাঙলাদেশে কবিতা বর্ষানুরাগিণী আর প্রিয়-অভিসারিণী বিরহিণী হয়ে গিয়েছে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

পূর্বেই বলেছি এই ধারারই কবি গোবিন্দদাস কবিরাজ—শ্রীজীব গোস্বামী যাঁকে কবীন্দ্র বা কবিরাজ উপাধি দেন। কয়েকটি পদে গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির নামও নিজের ভণিতার সঙ্গে সংযুক্ত করেছেন।

বর্ষা তাঁরও কাব্যে তেমনি কীর্তিত, বিশেষত বর্ষাভিসার। কিন্তু তিনি জানেন—

সুন্দর কৈছে করবি অভিসার।
হরি রহ মানস-সুরধুনী পার॥

গোবিন্দদাস কবিরাজ আরও অগ্রসর হয়ে যান ছন্দে, অলঙ্কারে, উপমায়।

অঞ্জন-গঞ্জন জগজন-রঞ্জন জলদ পুঞ্জ জিনি বরণ ;
তরুণারুণ থলকমলদলারুণ মঞ্জীর রঞ্জিত চরণ॥

কিন্তু শত উৎপ্রেক্ষার মধ্যেও কবিত্বহীন নয় তাঁর পদ :

যো দরপণে পহুঁ নিজমুখ চাহ।
হাম অঙ্গ-জ্যোতি হইয়ে তনু মাহ॥

সন্দেহ মাত্র নেই, গোবিন্দদাস কবিরাজই ব্রজবুলির শ্রেষ্ঠ কবি—আর তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতাও প্রচুর।

প্রসিদ্ধ গৌর-বন্দনা :

চম্পক শোণ কুসুম কণকাচল জিতল গৌরতনু লাবণিয়ে।
উন্নত গীম সীম নহি অনুভব জগমনমোহন ভাঙনিয়ে॥

অবশ্য জ্ঞানদাসের দু'একটি পদ অতুলনীয়, আগেই আমরা তা দেখেছি ('রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর' ইত্যাদি)। অথবা

সুখের লাগিয়া এঘর বান্ধিনু অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয়-সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল॥

এই জন্যই বলরামদাসের গোষ্ঠলীলার পদ কিংবা লোচনদাসের পদও আদরণীয় (বঙ্কিমচন্দ্র 'কমলাকান্তে' যা উদ্ধৃত করেছেন অন্য অর্থে) :

এস এস বঁধু এস আধ আঁচরে বস
আজি নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি।
রন্ধনশালাতে যাই তুয়া বঁধু গুণ গাই
ধূয়ার ছলনা করি কাঁদি।

পরবর্তী বৈষ্ণব পদাবলীর সমস্ত ভাব ও রূপ এসব পদ থেকেই আমরা বুঝতে পারি। কেবল চণ্ডীদাস-রামীর পদ ও 'রাগাত্মিকা পদে'র ভাব ও অর্থ

স্বতন্ত্র। পদাবলীরই অন্ত একটি প্রান্তে এই সব পদ; যে মহাভাবের বশে চণ্ডীদাস গাইতে পারেন:

রজকিনী রূপ কিশোরী স্বরূপ কামগন্ধ নাহি তায়।
না দেখিলে মন করে উচাটন দেখিলে পরাণ জুড়ায়॥
তুমি রজকিনী আমার রমণী তুমি হও পিতৃমাতৃ।
ত্রিসন্ধ্যা সাধন তোমারি ভজন তুমি বেদমাতা গায়ত্রী॥

তা একান্তভাবে বৈষ্ণব জগতের নয়; রূপ বৈষ্ণব জগতের, ভাব স্পষ্ট সহজিয়া সাধনার জগতের। পুরাতন সেই সহজিয়া সাধনাই হয়তো বৈষ্ণব এবং সুফী প্রেরণারও (সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মত ও ডঃ সেনের: বাঃ সাঃ ইতিহাস ৩৭৭।৫ দ্রষ্টব্য)। রসকে অঙ্গীকার করে নিয়েছে।

এ শুধু কবিতা নয়, এ আর এক রহস্ত এবং এখান থেকে আমরা তাই রাগাত্মিকা পদাবলীর প্রদেশে প্রবেশ করেছি:

মরম না জানে ধরম বাখানে এমন আছয়ে যারা।
কাজ নাই সখি তাদের কথায় বাহিরে রহুক তারা॥
আমার বাহির দুয়ারে কপাট লেগেছে ভিতর দুয়ার খোলা।
তোরা নিসাড়া হইয়া আয়রে সজনী আঁধার পেরিয়ে আলা॥

এ জগতের যাত্রাপথে প্রথম একটি কথা পাই 'পিরীতি'। বৈষ্ণব পদাবলীরও কথা তাই;—তারপরে এল 'রসিকে'র ব্যাখ্যা আর শেষে 'সহজে'র। নরহরির (সরকারের?) ভণিতায়ও সহজিয়া পদ আছে (সেন—বাঃ সাঃ ইতিহাস), কিন্তু চণ্ডীদাসের নামেই চলে অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ সহজিয়া পদ।

পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর এ তিন ভুবন সার।
এই মোর মনে হয় রাতি দিনে ইহা বই নাহি আর॥

তারপর—

পিরীতি নগরে বসতি করিব পিরীতে বাঁধিব ঘর।
পিরীতি দেখিয়া পড়শী করিব এ বিনু সকল পর॥

আর—

রসিক রসিক সবাই কহয়ে কেহও রসিক নয়।
ভাবিয়া গণিয়া বুঝিয়া দেখিলে কোটিতে গোটিক হয়॥

অথবা—

গোপন পিরীতি গোপনে রাখিবি সাধিবি মনের কাজ।
সাপের মুখেতে ভেকেরে নাচাবি তবে ত রসিকরাজ॥

• • • • •

কলঙ্ক সাগরে সিনান করিবি এলায়ে মাথার কেশ।
নীরে না ভিজিবি জল না ছুঁইবি সম দুঃখসুখক্লেশ॥

এ সব সহজিয়া পদের কোনো কোনোটি নরোত্তমদাসের রচিত বলেও কথিত হয়; যথা—

'সখি, পিরীতি আখর তিন'।

আর—

সহজ সহজ সবাই কহয়ে সহজ জানিবে কে?
তিমির আঁধার যে হইয়াছে পার সহজ জেনেছে সে।
চন্দের কাছে অবলা আছে সেই সে পিরীতি সার।
বিষে অমৃতেতে মিলন একত্রে কে বুঝিবে মরম তার।

তারপরে এই পরম সুমহৎ ঘোষণা সহজিয়া চণ্ডীদাসের—

শুনহ মানুষ ভাই,
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।—

মধ্যযুগের কোনো সাহিত্যে মানবতার স্বপক্ষে এতবড় বাণী আর নেই। অবশ্য এইসব ক্ষেত্রে আমরা যে ভাবে-রসে পৌঁছেছি তা খাঁটি সহজিয়া বৈষ্ণবের সাধনার রাজ্য—যার সামাজিক মূল সরল লোক-জীবন। লিখন হিসাবে বা কাল হিসাবেও এসব পদের ঠিকানা নেই;—শুধু পদাবলীর ধারায় এসেছে বলেই এখানে এর উল্লেখ করা হল।

সাহিত্য-রসিক মাত্রই তথাপি জানেন—পদাবলীর অধিকাংশ পদ নৈরাশ্যজনক। প্রথম কারণ, কাব্য এখানেও ধর্মতত্ত্ব ও ধর্মপ্রচারের ছায়াতেই বর্ধিত। কাব্য তাই আপন দাবীতে বৈষ্ণব কবিদের নিকটও প্রাপ্য হয় নি—'কবিতার স্বরাজ লাভ' তখনো সুদূর। তাছাড়া কবিরা হয় প্রকাশ করতে চাইছেন বিদ্যাপতির মতো স্বচ্ছন্দানুরাগে প্রেমের দৈহিক সংবেদন-কথা, নয় চণ্ডীদাসের অনুসরণে আর্তি ও আন্তরিক আকুলতার কথা। দুইই কাব্যের উপকরণ; কিন্তু কাব্য হতে হলে দু'এরই চাই

নৈর্ব্যক্তিক রূপান্তর লাভ, নিরাসক্ত কবিচিত্তের রসাভিষেক। তা বৈষ্ণব কবিতায় দুর্লভ, কারণ বৈষ্ণব আর্তির সঙ্গে কবিকর্মের নিরাসক্তি সহজে খাপ খায় না। তাছাড়া, একই রাধা-কৃষ্ণ-কাহিনীর অতি সুচিহ্নিত কয়েকটি ঘটনা ও ভাবকে নিয়েই এই অজস্র পদ রচিত—তাই পদাবলীতে একঘেয়েমী অবশ্যম্ভাবী। সে একঘেয়েমি আরও বেড়ে যায় রসতত্ত্বের নিয়মে-বাঁধা নির্দেশের জন্য, এবং সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রের নিয়মে-বাঁধা কাব্যরীতি ও অলঙ্কার প্রভৃতির আতিশয্যে। সেই চোখ বললেই কমল, অঞ্জন, আর মেঘ বললেই কৃষ্ণ, তমালের ডাল, আর ময়ূর, কদম্ব, যমুনার জল—এসব বাঁধাবুলি, আর তার সঙ্গে প্রেম নিয়ে উৎকট বাড়াবাড়ি ও মাতামাতি—স্বাভাবিক ও সাধারণ মানুষের পক্ষে বড়ই ক্লান্তিকর ও হাস্যকর।

পদাবলীর সংগ্রহ-গ্রন্থ ঃ অবশ্য ধর্মবিষয়ক বলেই বোধহয় পদাবলী সংগৃহীত ও সুরক্ষিত হয়েছে। এই সংগ্রহ-গ্রন্থের জন্যই পদাবলী সহজলভ্যও হয়েছে। পদাবলীর সংকলন-সমূহে রসতত্ত্বের বিভাব অনুযায়ী পদাবলী সাধারণত গ্রথিত হয়েছে। এসব সংকলন অবশ্য পরবর্তী কালের, বিশেষ করে অষ্টাদশ শতাব্দীর। এ প্রসঙ্গেই প্রসিদ্ধ কয়েকখানা সংগ্রহ-গ্রন্থের কথাও তাই স্মরণীয়। এর মধ্যে প্রথম সংগ্রহ বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর (তিনিই কি পদ-কর্তা 'হরিবল্লভ'?)। ৪৬জন কবি ও প্রায় ৩০০ পদ সংগৃহীত হয়েছে বিশ্বনাথের 'ক্ষণদাগীত-চিন্তামণি'তে (খ্রীঃ ১৭০৫এর কিছু পূর্বে)। দ্বিতীয় গ্রন্থ সম্ভবত নরহরি চক্রবর্তীর 'গীতচন্দ্রোদয়', তাতে ৩৪০টি পদ আছে। রাধামোহন ঠাকুরের 'পদামৃতসমুদ্র'ও অষ্টাদশ শতাব্দীর সুপ্রসিদ্ধ সংকলন। কিন্তু সর্বাধিক প্রসিদ্ধ গোকুলানন্দ সেনের (বা 'বৈষ্ণবদাস' স্বাক্ষরের) সংকলন 'পদকল্পতরু'—'পদামৃতসমুদ্রে'র পরেকার এ সংকলন। বৈষ্ণব সাহিত্যের পক্ষে 'পদকল্পতরু' অমূল্য সংগ্রহ। ১৩০ জন কবির মোট ৩ হাজারের উপর পদ এই গ্রন্থে একত্র করা হয়েছে। গৌরসুন্দর দাসের 'সংকীর্তনানন্দে' প্রায় ৬৮১টি পদ রয়েছে। তার পরেও সংগ্রহের অভাব নেই, পদেরও অভাব নেই।

বৈষ্ণব শাস্ত্র ও কৃষ্ণমঙ্গল কাব্য

বৈষ্ণব সাধন-শাস্ত্রের ছোট বড় যে-সব রচনা ষোড়শ শতকে পাওয়া যায় তার মধ্যে পদকর্তা ও চৈতন্যের জীবনীকার লোচনদাসের 'দুর্লভসার'

একখানা। কবিবল্লভের 'রসকদম্ব' (১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দে রচিত) কাব্যহিসাবেও গ্রাহ্য। সহজিয়া বৈষ্ণব মতবাদের প্রভাত 'রসকদম্বে' প্রবল—'প্রকৃতিভজন', শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীদের 'সহজ' অনুরাগ, গুরু-মাহাত্ম্য, যোগক্রিয়া প্রভৃতির উল্লেখ থেকে তা স্পষ্ট (এ সব বিষয়ে ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের ইংরেজিতে লেখা—Obscure Religious Cults, etc., দ্রষ্টব্য)। কবিবল্লভ ছিলেন উত্তরবঙ্গের মহাস্থানের নিকটস্থ অরোড়া গ্রামের লোক। বন্ধু মুকুট রায়ের উৎসাহে ২২টি অধ্যায়ে ২২ রসের বর্ণনা করে তিনি এ গ্রন্থ রচনা করেন। ভক্তিসাধনার জগতে অবশ্য প্রধান গ্রন্থ নরোত্তমদাস ঠাকুরের 'প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা', 'স্বরূপ-কল্পতরু'। নরোত্তমদাস বৈষ্ণব সাহিত্যে এক ভক্তিসিক্ত-মাধুরীর আধার। বৈষ্ণব রসতত্ত্বের গুহ্য-কথাও তিনি আলোচনা করেছেন। তাছাড়া তিনি প্রার্থনা, ভজন ও কিছু রাগাত্মিকা পদেরও কবি। ভক্তিশাস্ত্রের ব্যাখ্যা তখন ক্রমেই সহজিয়া সাধনার দিকে ঝুঁকে পড়েছে। 'স্বরূপকল্পতরু'র নারীমহিমার শ্লোক কয়টি না হলে এত সুলভ হত না (দ্রঃ সেন : বাঃ সাঃ ইতিহাস, ৪।১৬।১)।

নারী বিনে কোথা আছে জুড়াবার স্থান
সর্বভাবে নারী হতে জুড়াই পরাণ।
পতিভাবে পুত্রভাবে ভ্রাতৃ পিতৃভাবে
স্নেহ-মোহ-সমতা-মমতা-ভাবে সেবে॥

সহজিয়া-প্রভাবিত ছোট-খাট নিবন্ধ ও গ্রন্থের অভাব নেই। মনে রাখা প্রয়োজন, জয়দেব-চণ্ডীদাসেও প্রাক্-চৈতন্য সহজিয়া বৈষ্ণব ধারার অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়, পরবর্তী বৈষ্ণব সাধনায় তাই সহজিয়া বৈষ্ণব মতবাদ নানা গুহ্য ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার, যৌনাশ্রিত যৌগিক সাধনার আকর হয়ে উঠল। সাহিত্যে অবশ্য তারই দান 'রাগাত্মিকা পদাবলী'।

কিন্তু বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের প্রধান প্রধান গ্রন্থসমূহ ছিল সংস্কৃতে লেখা। বিশেষ করে রূপ গোস্বামীর 'উজ্জ্বলনীলমণি' ও 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'র তত্ত্ব বাঙলায় অনেকেই সপ্তদশ শতকে পরিবেশন করেন। সে সব অবলম্বন করে বাঙলাতেও ক্রমে গ্রন্থ রচিত হতে থাকে। 'অনুবাদ' বললে এরূপ অনুবাদের অভাব নেই। যেমন, নন্দকিশোর দাসের 'রসপুষ্পকলিকা', রামগোপাল দাসের 'রসকল্পবল্লী' প্রভৃতি। এ সব রসব্যাখ্যা ঠিক কাব্যপদবাচ্য নয়। তবে মধ্যে মধ্যে সময়ে সময়ে এ সব গ্রন্থেও খণ্ডপদের উদ্ধৃতি দেখা যায়।

এসব গ্রন্থ অপেক্ষা কাব্য হিসাবে নরোত্তমের প্রার্থনা-মূলক ভজনসমূহ অনেক বেশি উচ্চাঙ্গের।

কৃষ্ণমঙ্গলের বা ভাগবতের আখ্যান নিয়ে রচিত কৃষ্ণমঙ্গল-কাব্যধারার যে এই যুগে প্রসার ঘটবে তা সহজেই প্রত্যাশা করা যায়। সত্যিই সেরূপ প্রসার ঘটেছিল। 'চৈতন্যমঙ্গল', 'অদ্বৈতমঙ্গল', আর পরে 'গোকুল-মঙ্গল', 'রসিকমঙ্গল' প্রভৃতি কাব্য আসলে যথার্থ মঙ্গল-কাব্য নয়, অনেক সময়েই তা অলৌকিক জীবনীকাব্য মাত্র। এসব কাব্য লৌকিক বা পৌরাণিক দেবতার মাহাত্ম্যসূচক আখ্যান নয়। কৃষ্ণমঙ্গল, গোবিন্দমঙ্গল, রাধিকামঙ্গল প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের লীলা-মাহাত্ম্য মাত্র—বাঙলার কোনো জাতীয় আখ্যানবস্তুর কাব্য নয়; সমসাময়িক মঙ্গল-কাব্যগুলির প্রভাব-বশত এগুলিকেও 'মঙ্গল' নামে অভিহিত করা হয়েছে। তা ছাড়া, এই ষোড়শ শতকের কৃষ্ণমঙ্গল-রচয়িতারা কেউই মালাধর বসুর কীর্তিকে ছাড়িয়ে যেতে পারেন নি। ষোড়শ শতাব্দীর এসব লেখকের মধ্যে ছিলেন মাধবাচার্য ('কৃষ্ণমঙ্গলের' রচয়িতা), দেবকীনন্দন সিংহ ('কবিশেখর' উপাধি-ধারী ; কবিশেখরের 'গোপালবিজয় পাঁচালী' 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে'র অনুরূপ), দুঃখী শ্যামাদাস ('গোবিন্দমঙ্গলের' লেখক)। বাঙলা দেশের নৌকাখণ্ড প্রভৃতি জিনিস এসব কৃষ্ণমঙ্গলেও সমাদরে গৃহীত হয়েছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর লেখকেরা সংখ্যায় আরও অধিক, যেমন, কাশীদাসের জ্যেষ্ঠ 'শ্রীকৃষ্ণদাস' ('শ্রীকৃষ্ণবিলাসে'র কবি), ভবানন্দ বিপ্র পরশুরাম, 'গোবিন্দমঙ্গলে'র যশচন্দ্র, ইত্যাদি। কিন্তু কাব্যপ্রাণ মন্দীভূত হয়ে এসেছিল, বোঝা যায়। ভবানন্দের 'হরিবংশ' শ্রীহট্ট অঞ্চলে সুপ্রচলিত ছিল। আরও খান সাত-আট এমন ধারা গ্রন্থও সেই শতাব্দীতেই রচিত হয়। কাব্য-সম্পদ না থাক, অষ্টাদশ শতাব্দীতেও যথানিয়মে এরূপ কৃষ্ণমঙ্গল-ধারার কাব্য রচিত হয়ে চলে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

চৈতন্য-পর্বের মঙ্গল-কাব্য

মঙ্গল-কাব্যেই বাঙ্‌লার জনসাধারণের নিজস্ব কাহিনী ও জীবন-দর্শন প্রতিফলিত হচ্ছিল ; চৈতন্য-পর্বে এসে তাতেও কিছু নূতন লক্ষণ দেখা দিল— আর তা শুধু চৈতন্যমঙ্গল বা কৃষ্ণমঙ্গল-কাব্যেই সীমাবদ্ধ নয়।

দেব-সংমিশ্রণ : ষোড়শ শতকের পূর্বেই মঙ্গল-কাব্যের প্রধান দুই ধারা একটা মিশ্রিত রূপ লাভ করছিল। এই দুই ধারাকে মোটের উপর বলতে পারি, লৌকিক ধারা ('বাঙ্‌লার বিষয়বস্তু') ও পৌরাণিক ধারা ('সংস্কৃতের বিষয়বস্তু')। লৌকিক ধারাই প্রথম ও প্রধান, এমন কি 'মঙ্গল' কথাটাও হয়তো মূলত অন্‌-আর্য ভাষা থেকে আগত। মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, শিবায়ন বা শিবমঙ্গল, কালিকামঙ্গল, শীতলামঙ্গল, রায়মঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, সারদামঙ্গল, এসব হল তার নানা শাখা,—সেই Matter of Bengal নিয়ে যা গঠিত। পৌরাণিক ধারা হল পৌরাণিক দেবদেবীর মাহাত্ম্যের আখ্যান, অর্থাৎ সেই Matter of Sanskrit World যার অবলম্বন। এ ধারার শাখা হল দুর্গামঙ্গল, ভবানীমঙ্গল, সূর্যমঙ্গল, গৌরীমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, কমলামঙ্গল, গঙ্গামঙ্গল, চণ্ডিকামঙ্গল প্রভৃতি। এ ধারা অপেক্ষাকৃত পরবর্তী ; সংস্কৃত চর্চা ও সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের সূত্রে তার বিস্তার ক্রমেই বাড়ে। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বেই এ সব আখ্যান মিশে দানা বেঁধে উঠছিল ; সমাজের উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গের পরস্পরের যোগাযোগের ফলে লৌকিক ও পৌরাণিক এই দুই ধারার মধ্যে সংযোগ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছিল। দুই বর্গের দেবদেবীর চরিত্র মিলে মিশে গিয়ে শিব, চণ্ডী, প্রভৃতি এক-একটি মঙ্গল-কাব্যের দেবদেবীও মিশ্রিত রূপ লাভ করছিলেন।

প্রসঙ্গক্রমে বলা প্রয়োজন, এই মিশ্রণকে অনেকে সমন্বয় (সিন্থেসিস্) বলে চালাতে চান ; কিন্তু মিশ্রণ মাত্রই সমন্বয় নয়। সমন্বয়ে দুটি পৃথক জিনিস সংঘর্ষের শেষে অখণ্ড হয়ে নূতন আর-একটি জিনিস হয়ে ওঠে। কিন্তু মিশ্রণে দুই জিনিস পাশাপাশিও থাকতে পারে ; কখনো তাদের সামঞ্জস্য ঘটে, কখনো সামঞ্জস্য ঘটে না,—দুই বস্তু একেবারে একত্বলাভ করে না, নূতন-কিছু হয়ে ওঠে না। বাঙালী হিন্দু সমাজেও যা তখন ঘটেছিল তা হচ্ছে বাঁচবার দায়ে এবম্বিধতর বর্গে বর্গে মিশ্রণ, সমন্বয় হলে তখন ঐক্যবদ্ধ জাতীয়শক্তিরই জন্ম

হত। কিন্তু ছোট-বড় উচ্চ-নীচে বিভক্ত হিন্দু সমাজ সে পথে অগ্রসর হতে পায় নি। তাদের সাহিত্য-প্রয়াসেও তাই তখন যা ঘটেছে তা হচ্ছে একটা আপোষ-রক্ষা, মিশ্রণমাত্র—সমন্বয় নয়। তাই লৌকিক শিব চাষী, নেশাখোর, কুচুনি-পাড়ায় ঘুরে বেড়ান; পৌরাণিক দেবাদিদেব শিবের সঙ্গে তাঁকে মিশিয়ে আমরা নিয়েছি। কিন্তু অসামঞ্জস্য কোথাও কোথাও থেকে গিয়েছে বাঙালীর সম্মিলিত দেবতাদের মধ্যেও। অবশ্য এ ক্ষেত্রে পৌরাণিক শিবের আশ্চর্য মহৎ ধারণা ক্রমেই পরিব্যাপ্ত হয়ে লৌকিক চাষী-শিবের কাহিনীটিকে আজ কৌতুক ও কৌতূহলের বস্তু করে দিয়েছে। তেমনি লৌকিক চণ্ডীও পৌরাণিক চণ্ডীর সঙ্গে অভিন্ন হতে গিয়েও একাত্ম হয়ে যেতে পারেন নি। সেক্ষেত্রেও দেখছি কালক্রমে পৌরাণিক চণ্ডীরই প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ পৌরাণিক হিন্দু-কর্তাদের নেতৃত্বই ক্রমে সমাজে ও সাহিত্যে প্রবল হয়েছে—আপোষ-রক্ষার ফলে।

সকল কাব্যের মতোই মঙ্গল-কাব্যও গাওয়া হত। মঙ্গল-কাব্যের 'মঙ্গল' নাম কেন হল, এ সম্বন্ধে সঠিক কিছু বলবার উপায় নেই। কেউ মনে করেন, 'মঙ্গল রাগে' প্রথমে তা গাওয়া হত। 'মঙ্গল-গীতি' শব্দটা জয়দেবেও আছে, কিন্তু মঙ্গল রাগের সম্বন্ধে নিশ্চিত করে কিছু জানা যায় না। কেহ অনুমান করেন, বিবাহাদি অনুষ্ঠানে যেসব গান গাওয়া হত, তাহারই সাধারণ নাম ছিল 'মঙ্গল'। এখনো মালয়ালাম ভাষায় বিবাহ অর্থেই এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়। আর, 'মঙ্গল' শব্দটি আর্যভাষার নয়, এ হল অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অভিমত। মঙ্গল নামক দৈত্যকে চণ্ডী বধ করেন, তাই চণ্ডীমঙ্গল কথার উৎপত্তি,—এ কথা সম্ভবত পরবর্তী উদ্ভাবনা। এক মঙ্গলবার থেকে আর-এক মঙ্গলবার এই আট দিন ধরে গাওয়া হয় বলে 'অষ্টমঙ্গলা' নাম, এটিও হয়তো আর একটি পরবর্তী উদ্ভাবনা। অন্য দিকে, 'জাগরণ' নামে একটি কথাও আছে; চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল ও ধর্মমঙ্গলের পালা-সমূহের মধ্যে এক একটি অংশ আছে যার নাম 'জাগরণ'। সাধারণ ভাবে অনুমান করা চলে যে, সে অংশটি রাত্রি জেগে গাওয়া হত। হয়তো সেই পালাটিরই গুরুত্ব ছিল সর্বাধিক; তাই সমগ্র ভাবেও মঙ্গলকাব্যকে কখনো কখনো 'জাগরণ' বলা হয়।

চৈতন্যদেবের পূর্বে শুধু নয়, তাঁর পরেও মঙ্গল-কাব্যের নিজস্ব ধারা অব্যাহত চলেছে। সাহিত্যে সেই রাধাকৃষ্ণের লীলা-কাহিনী বা মধুর-সখ্য-বাৎসল্য

প্রভৃতি রসের প্লাবন যত তুলুক, পদাবলী ও জীবনী কাব্য বাঙালীকে যত ঐশ্বর্য যোগাক; সুচিরবহমান মঙ্গলকাব্যের ধারাও সমভাবেই চৈতন্য ও চৈতন্যোত্তর যুগেও প্রবাহিত হয়েছে। আজ আমরা যতই চৈতন্যদেবকে বাঙালী রিনায়সেন্সের উৎসক্ষেত্র বলে প্রচার করি না কেন, নবদ্বীপের ও বাঙলার বৃহৎ হিন্দুসমাজের কাছে সেই প্রেমোন্মাদ সন্ন্যাসীর তত্ত্ব ও সাধনা সে যুগে সর্বগ্রাহ্য হয় নি, তারপরেও হয় নি,—ডঃ সুশীলকুমার দে'র এই কথাটি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় (ডঃ দে'র ইংরেজিতে বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস ১৮০০-১৮২৫, পৃঃ ৪৪৮।৪৪৯ ও প্রাক্-চৈতন্য বৈষ্ণব ধর্ম ও আন্দোলন বিষয়ক গ্রন্থ এজন্য দ্রষ্টব্য)। সেই সমাজ চলত স্মার্ত পণ্ডিতদের পরিচালনায় এবং মুসলমান সুলতানদের রাজনৈতিক শাসন মাথা পেতে মেনে নিয়ে, আর তার উচ্চবর্গেরা কেউ কেউ ফার্সি লিখত, সংস্কৃত চর্চা করত, কিন্তু সাধারণভাবে বাঙলা মঙ্গল-কাব্যই ছিল সমাজের উচ্চ-নীচের গ্রাহ্য কাব্য। বাস্তবচিত্রের ঐতিহ্য তাতে তাই কতকটা রক্ষিত হয়েছে।

চৈতন্য-প্রভাবঃ তবে চৈতন্য-পর্বে এসে প্রথমাবধিই মনসা, চণ্ডী প্রভৃতি দেবদেবীর কাব্যেও নূতন লক্ষণ দেখা দিল। এসব কাব্যে ভক্তি পূর্বযুগেও ছিল, কিন্তু সে ছিল আতঙ্কগ্রস্ত ভক্তি, স্বৈরাচারী ভাগ্য-বিধাতার নিকটে মানুষের ভয়-মিশ্রিত ভক্তি। স্বেচ্ছাচারী প্রভুশক্তির মতোই স্বেচ্ছাচারী দেবদেবী, অধিকার-হীন শাসিতের মতোই উপায়-হীন উপাসক,— সহজেই তারা তাই মেনে নেয় 'বাঁচান বাঁচি, মারেন মরি', এবং সামন্ত প্রভুর মতোই দেবতাও তুষ্ট হলে শাসিতের ভাগ্যও খোলে। এই ভাবেই ভয় প্রথমে পরিণত হয় এক জাতীয় সকাম ভক্তিতে। ব্রতকথায় মেয়েরা নানা লৌকিক দেবদেবীর এই সকাম এবং স্বাভাবিক পূজা বরাবরই করতেন। সেই ব্রতকথার সঙ্গে মঙ্গল-কাব্যের একটা সম্পর্কও তাই থেকে গিয়েছে। পূর্বাগত কাহিনীর সেই বিভীষিকাময় স্বেচ্ছাচারের কাঠামো পরেও সম্পূর্ণ পরিবর্তন করা সম্ভব হয় নি। কিন্তু সেই ভয়ভক্তির মধ্যে চৈতন্যদেবের পরবর্তী যুগে দেখা দিল দাস্যরসের একটা স্থির নম্রতা। তাতে আর হীনতাবোধ নেই ; বরং আছে আচার, বিনয়, সহিষ্ণুতা, স্নেহ, প্রীতি, মমতা, সখ্য, প্রভৃতি মানবী গুণগ্রামের একটু নূতন স্পর্শ। এইটিই চৈতন্য-পর্বের বাঙলা সাহিত্যের সাধারণ লক্ষণ, বলতে পারি চৈতন্য-পরবর্তী কালের মূল লক্ষণ ;—রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনীকেও এই ভক্তি-বাহুল্য আচ্ছাদিত

করে। কিন্তু কথা হিসাবে আমরা সেই একই আখ্যায়িকা নিয়ে রচিত মঙ্গল-কাব্য পাই—মূলত সেই বেহুলা-লখাইয়ের কথা, সেই কালকেতু-ফুল্লরার কথা, ইত্যাদি। তাতে বিশেষ নূতন কিছু কেউ যোগ করে না ; যা নূতন জোটে তাও বৈশিষ্ট্য-হীন। কবিত্বের দিক দিয়ে বৈশিষ্ট্য কোথায়? আখ্যায়িকা বৈচিত্র্য-হীন, কবি-কলা গতানুগতিক, এমন কি, বাস্তব গৃহ-চিত্রও বৈশিষ্ট্যহীন।

পুঁথির অবশ্য এ কালে আর তত অভাব নেই। লৌকিক ও পৌরাণিক দুই ধারার মঙ্গল-কাব্যই ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে যথেষ্ট মিলে। প্রথম দিকে মিলে মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল ও গঙ্গামঙ্গল প্রভৃতি ; হয়তো শিবায়নও ছিল। তবে ধর্মমঙ্গল সপ্তদশ শতকে যথেষ্ট রচিত হলেও ধর্মমঙ্গলের প্রধান কবিরা অষ্টাদশ শতকের মানুষ। এসব পুঁথির মধ্যে যেগুলি সত্যকারের সাহিত্য পর্যায়ে উঠেছে সেগুলিরই সঙ্গে শুধু পরিচয় করা প্রয়োজন। ভাগ্যক্রমে, এই পর্বে তেমন কাব্যও আছে। আর মঙ্গল-কাব্যেও সেরূপ একটি প্রতিভার পরিচয় অন্তত এখনও অম্লান, তা আমরা দেখতে পাব।

মনসা-মঙ্গল

একালের মনসামঙ্গলের রচয়িতাদের মধ্যে নানা কারণেই প্রথমে উল্লেখযোগ্য (ষোড়শ শতকের) বংশীবদন (বা বংশীদাস) চক্রবর্তী। ইনি পূর্ববঙ্গের মৈমনসিংহ জেলার অধিবাসী। গ্রন্থ রচনায় তিনি কন্যা চন্দ্রাবতীর সাহায্য পেয়ে থাকবেন। অন্য কোন কারণে না হোক, অন্তত এই মেয়ের নামেই বংশীদাস চিরজীবী। কারণ, চন্দ্রাবতী প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নারী, তাঁর করুণ ও শ্রীময় জীবনের কথা আমরা এখনও পড়তে পারি 'মৈমনসিংহ গীতিকা'য় সংগৃহীত পল্লীকাহিনীতে। বাল্যে তিনি বাগদত্তা হন জয়চন্দ্র নামে প্রতিবেশী এক ব্রাহ্মণ-কুমারের সঙ্গে। বাল্যের সেই সখ্য কৈশোরের অনুরাগে পরিণত হতেই জয়চন্দ্র এক মুসলমান-কন্যার প্রণয়াসক্ত হয়ে মুসলমান হয়ে গেলেন, তাঁকে বিবাহ করলেন। কিন্তু চন্দ্রাবতী রইলেন চিরকুমারী, তাঁর জীবন গেল রামায়ণ ও রূপকথার অনুরূপ গাথা রচনায়। মৈমনসিংহের পল্লীগাথায় চন্দ্রাবতীর এই কাহিনীটি সুপরিচিত। আর চন্দ্রাবতীই বাঙলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা কবি বলে প্রসিদ্ধ।

এ পর্বে মনসামঙ্গল কাব্যেরই আর একজন কবি ছিলেন মৈমনসিংহ অঞ্চলের নারায়ণ দেব। তাঁর গ্রন্থ কিন্তু পশ্চিম বঙ্গেও প্রচলিত। যে কারণেই

হোক, দেখতে পাই—বরাবরই মনসামঙ্গল ও মনসার ভাসান গান পূর্ব ও উত্তর বঙ্গেই অধিক প্রচলিত ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে তাই চট্টগ্রামে, শ্রীহট্টে ও উত্তর বঙ্গেই বেশিসংখ্যক মনসামঙ্গলের কবির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। কিন্তু সপ্তদশ শতকের মনসামঙ্গলের একজন উল্লেখযোগ্য কবি হলেন 'কেতকাদাস'-ক্ষেমানন্দ (কেতকাদাস বলেও তিনি আপনার পরিচয় দিয়েছেন। অধ্যাপক শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দের মনসা-মঙ্গল সযত্নে সম্পাদিত করেছেন, তা দ্রষ্টব্য)। কেতকাদাস সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগের লোক; তাঁর কাব্যই এখন পশ্চিম বঙ্গের সর্বত্র প্রচলিত। দক্ষিণ-রাঢ়ে দামোদর তীরে ছিল ক্ষেমানন্দের বাড়ী। কিন্তু গ্রামে অরাজকতা হলে তাঁকে গ্রামত্যাগ করতে হয়। মধ্য যুগের অনেক কবিরই মুখে এ ধরণের কথা শুনি। যাই হোক, পথে মুচির মেয়ের বেশে কবির সম্মুখে আবির্ভূতা হলেন মনসা দেবী। কবিকে তিনি বললেন মনসামঙ্গল রচনা করতে। স্থানীয় অরাজকতা (অনেক সময়ে মুসলমানের অত্যাচার) আর তারপরে দেব-দেবীর নির্দেশ-মতো তাঁদের মাহাত্ম্য রচনা—এটি প্রায় নানা মঙ্গল-কাব্যের কবিরই একটি সুপরিচিত 'জবান'। হয়তো এসব অত্যাচারের কথা খানিকটা সত্য, এবং খানিকটা একটা প্রথা-মতো মামুলী 'সাফাই'; কিন্তু এসব জবানীর মধ্যে দিয়ে আমরা কবির পরিচয় ও কতকটা তাঁর কালের পরিচয় সমস্ত মামুলী কথার আড়ালেও সময়ে সময়ে পাই। অন্তত ধর্মমঙ্গলের বেলায় দেখতে পাই—ধর্মমঙ্গলের কাহিনীর থেকে অনেক ক্ষেত্রে ধর্মমঙ্গলের কবিদের আত্মকাহিনীই বেশি চিত্তাকর্ষক।

চণ্ডীমঙ্গল

মঙ্গলকাব্যের দিক থেকে দেখলে ষোড়শ শতাব্দী আসলে মনসামঙ্গলের যুগ নয়, চণ্ডীমঙ্গলের যুগ। চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনী একালে সর্বাধিক প্রসার লাভ করেছে, আর সর্বশ্রেষ্ঠ মহিমা লাভ করেছে মুকুন্দরাম চক্রবর্তী 'কবিকঙ্কণে'র শ্রীশ্রীচণ্ডীমঙ্গলকাব্যে'।

'মঙ্গলচণ্ডী' দেবীঠাকুরাণীর জন্মকথা অবশ্য সাহিত্যের আলোচ্য বিষয় নয়, আখ্যানগুলিই আলোচ্য; কিন্তু বাঙলা সংস্কৃতির ইতিহাসে এ দেবীর জন্মকথার গুরুত্ব আছে। এ বিষয়ে ডাক্তার রামকৃষ্ণ গোবিন্দ ভাণ্ডারকর মহাশয় সাধারণ ভাবে শক্তি-দেবতাদের সম্বন্ধে যা বলেছেন তাই প্রযোজ্য: বিভিন্ন ঐতিহাসিক অবস্থায় বিভিন্ন দেবদেবী কল্পিত হয়েছিল, কিন্তু পরবর্তী

কালে হিন্দু মনের সাধারণ রীতি অনুযায়ী সে-সব দেবীকে বিশেষ একজন দেবীর সঙ্গে এক করে ফেলা হয়েছে। কালকেতু-কাহিনীর চণ্ডী হচ্ছেন শিকারী ও পশুদের দেবী। এ দেবী যে র‍াঁচি পাহাড়ের ওরাওঁদের চাণ্ডীটাঁড়ের যুদ্ধ ও শিকারের চাণ্ডীদেবী, অথবা তাঁরই সগোত্রা, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র রায়ের লেখা ওরাওঁদের বিবরণ থেকে তাই মনে হয়। পশ্চিম বঙ্গের ওরাওঁ-গোষ্ঠীর শিকারোপজীবী মানুষেরা আমাদের সঙ্গে মিশে গিয়েছেন, তাঁদের দেবতাকেও আমরা স্বীকার করে নিয়েছি। ধনপতি-শ্রীমন্ত কাহিনীর 'চণ্ডী' প্রথমে ছিলেন এ চণ্ডীর থেকে স্বতন্ত্র; তিনিই হয়তো 'মঙ্গলচণ্ডী'—অমঙ্গলের দেবতাকে বিপরীত নামে অভিহিত করাও হিন্দুদের আর একটা রীতি। মঙ্গল নামে অসুর বধ করার জন্য তাঁর এ নাম, এবং মঙ্গলবারে তাঁর পূজা ও ব্রত হত, ইত্যাদি কাহিনী হয়তো পরবর্তী কালের (ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের) সংযোগ। যাই হোক্, এ মঙ্গলচণ্ডী ইতিহাসের আর এক স্তরের দেবী,—তখন ব্যবসা-বাণিজ্যে বিদেশ-যাত্রা অজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু তার আগে হয়তো তিনিও ছিলেন এক লৌকিক দেবতা—একদিকে লৌকিক বৌদ্ধধর্মে তিনি 'আদ্যা' হয়ে উঠলেন—নিম্নবর্গের মধ্যেও স্ত্রী-সমাজে মন্ত্রতন্ত্রের জন্য ডাকিনীদের প্রতি ভীতিভক্তি কম ছিল না (খুল্লনা তাই নিত্য পূজে ডাকিনী দেবতা); কিন্তু উচ্চস্তরের পুরুষ সমাজে সহজে তিনি শ্রদ্ধালাভ করেন নি (ধনপতি তাই তাঁর ঘট ঠেলে বাম পায়, 'স্ত্রীলিঙ্গ দেবতা আমি পূজা নাহি করি')। অন্য দিকে তান্ত্রিক হিন্দু দেবীরাও, শক্তি-দেবীরাও, এসে সেই চণ্ডীদু'টির সঙ্গে মিলতে লাগলেন। এই দুই কাহিনীর দুই চণ্ডী তবু একেবারে সম্পূর্ণ এক হয়ে যেতে পারেন নি। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, বৃহদ্ধর্মপুরাণ প্রভৃতি নানা কালের পুরাণ উপপুরাণ দুই দেবীকে তৃতীয় দেবী—মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর মহিষমর্দিনী, শিবশক্তি দুর্গার সঙ্গে এক করে দিতে চেষ্টা করে মাত্র দেবীদের একত্র করেছে, তাই দুই লৌকিক চণ্ডী একত্র রয়েছেন; কালকেতু-কাহিনী ও শ্রীমন্তের কাহিনী একসঙ্গে চলেছে। অন্তত শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মের বহু পূর্বেই যে এই প্রক্রিয়া সমাজে সাধিত হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই—বৃন্দাবনদাসের 'শ্রীচৈতন্যভাগবতে'র একাধিক উক্তিই তার প্রমাণ; শ্রীধরকে চৈতন্যদেবও বলছেন:

দেখ এই চণ্ডী বিষহরিরে পূজিয়া।
কে না ঘরে খায় পরে যত নাগরিয়া॥

অনেক পূর্বেই হয়তো চণ্ডী উচ্চবর্গের জগতেও পূজার অধিকার লাভ করেছিলেন। তিথিতত্ত্বে রঘুনন্দন তাই এক মঙ্গলবার থেকে আর এক মঙ্গলবার পর্যন্ত মঙ্গলচণ্ডীর পূজার ব্যবস্থা না দিয়ে পারেন নি (দ্রঃ সুধীভূষণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'দ্বিজ মাধবের মঙ্গলচণ্ডীর গীত', ভূমিকা ১।•)।

দুই কালের দুই স্তরের দুই দেবী ও দেবী-কাহিনী একসঙ্গে মিশে গিয়ে আবার উচ্চতর শ্রেণীর দ্বারা তাদের প্রসিদ্ধা আরাধ্যা পৌরাণিকী দেবী দুর্গা ও চণ্ডীর সঙ্গে যখন একীভূত হল, তখনি 'চণ্ডী' নামে দেবীরা প্রাপ্তা ও ভূষিতা হয়েছেন। অমন মহিষমর্দিনী দুর্গাও যখন বাঙালীর কল্পনায় কন্যা হয়ে গেছেন, তখন এই ভয়ঙ্করীর মধ্যেও শান্তা, কল্যাণী দেবীরা যদি মিলে যায়—লক্ষ্মী ও সরস্বতীও এসে মিশে,—তাতে আর আশ্চর্য কি? (দ্রঃ—সুধীভূষণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'দ্বিজ মাধবের মঙ্গলচণ্ডীর গীত', ভূমিকা।) কিন্তু লৌকিক দেবীদ্বয় পৌরাণিক দেবীর সঙ্গে মিশে এক হয়ে গেলেও কাহিনী দুটি সর্বাংশে এক হয়ে যায় নি;—দুই কাহিনীর ঠিকমতো সঙ্গতি ঘটে নি, এ-কথা পূর্বেই আলোচনা করেছি।

ঘরের ব্রতকথা হিসাবেই বোধহয় প্রথমত চলত 'চণ্ডীমঙ্গলে'র এই লৌকিক দেবী চণ্ডীর আখ্যায়িকা, এখনো 'মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত' সুপ্রচলিত। এই ব্রতের কথাবস্তুই ক্রমে যথেষ্ট গৌরব অর্জন করে;—অবশ্য সে যুগটা ইতিহাসেই অন্ধকার। পালা গানের আকারে তারপর তা দেখা দিল, প্রাচীন পুঁথি-সমূহ লেখা হল। প্রথমত আট রাত্রি ব্যাপী চলত সেই গীত। উত্তর বঙ্গের মালদহে প্রচলিত পাঁচালী গান থেকে এখনও সেই সব পালার কাঠামো কতকটা অনুমান করা যায়।

চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনী

মনসামঙ্গলের কাহিনীর তুলনায় চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনী দীর্ঘ, তাতে বৈচিত্র্য অধিক, আর এ দেবী মনসার মত তেমন ক্রোধ-বিদ্বেষ-বিরোধে দিগ্‌বিদিগ্‌-জ্ঞানহীনা ক্রূরচরিত্রা নন। আসলে চণ্ডী ভয়ঙ্করী না থেকে ক্রমেই ক্ষেমঙ্করী হয়ে উঠেছেন,—ভক্তদের তিনি পরীক্ষা করেন কৌতুকে, কিন্তু রক্ষা করেন আপনার দয়ামায়ার বশে। কাজেই তাঁর ভক্ত সাধারণ মানুষেরও চাঁদ বেণের ও বেহুলার মতো তেমন অনন্যসাধারণ দৃঢ়তা বা ব্যক্তিত্ব নেই। তাঁরা সাধারণ মানুষ—যদিও তাঁদের চারিদিকে দেবী-মাহাত্ম্যের অলৌকিক জগৎ।

কালকেতু ও তার স্ত্রী ফুল্লরা রাজপুত্র-রাজকন্যা নয়—সামান্য ব্যাধ, মাংস বিক্রয় করে তারা খায়। এরা হল দেবীর মাহাত্ম্যের বাহন। দেবীও যে সমাজের কোন্ স্তরের মানুষের আরাধ্যা, তা হয়তো এ থেকেই বোঝা যায়। অবশ্য সমস্ত কাহিনীর মতোই কালকেতু ও ফুল্লরা আবার শাপভ্রষ্ট দেব-দম্পতি বা তাঁদের অনুচর বলে কল্পিত, তা বলাই বাহুল্য। স্বর্ণগোধা রূপে দেবী ধরা দিলেন কালকেতুর নিকটে। কালকেতু চলে গেলে, একা ঘরে তিনি অপরূপা তরুণী হয়ে বসে রইলেন। ফুল্লরা এসে দেখে অবাক। কোথা থেকে এল এ মেয়ে, কার স্ত্রী? দেবী বলেন, ঘরে তাঁর বড় অশান্তি; আর কালকেতু তাঁকে বন থেকে নিজগুণে বেঁধে এনেছে—তিনি এখানেই থাকবেন। বুদ্ধিমতী ও পতিপ্রাণা স্ত্রীর মতোই ফুল্লরা বিষম বিপদ গণলেন। সুন্দরীকে প্রতিনিবৃত্ত করতে চাইলেন; কিন্তু সুন্দরী নড়েন না। এলো তখন কালকেতু—সৎপ্রকৃতির মানুষ; সেও সুন্দরীকে দেখে অবাক। যত সে সুন্দরীকে বলে চলে যেতে, মেয়েটা কিছুতেই নড়ে না। শেষে তাদের সাধুতায় সন্তুষ্ট হয়ে স্বরূপ প্রকাশ করলেন দেবী। একটি মূল্যবান অঙ্গুরী তাদের আশীর্বাদ দিয়ে গেলেন। অঙ্গুরী বিক্রয় করতে কালকেতু হাটে গেল। সহজে কি দাম দেয় বেণেরা! তবু বিক্রয় করে দাম নিয়ে কালকেতু নূতন রাজ্য পত্তন করলে। নানা জাতির লোক এল বসতি করতে সেখানে। এল ধূর্ত কায়স্থ ভাঁড়ু দত্ত। কালকেতুব নিকটে আসর জমিয়ে বসে প্রজাদের উপর সে করে অত্যাচার। কিছুদিন পর কালকেতু তা বুঝতে পেরে ভাঁড়ু দত্তকে নির্বাসিত করলে। ভাঁড়ু তখন তার বিরুদ্ধে প্রতিবেশী রাজাকে উত্তেজিত করে যুদ্ধ বাধাল। কালকেতু যুদ্ধ করে পরাস্ত হয়ে এক স্থানে লুকিয়ে রয়েছে—সে খবর ফুল্লরার কাছ থেকে ছলনা করে সংগ্রহ করে ভাঁড়ু দত্তই কালকেতুকে আবার ধরিয়ে দিলে। শত্রুর কারাগারে কালকেতুর উপর অশেষ নির্যাতন চলল। কালকেতু স্মরণ করলে দেবীকে। দেবীও দেরী করলেন না। রাজাকে স্বপ্ন দিলেন। তারপর সকল বিপদ থেকে মুক্ত ব্যাধরাজ কালকেতুর নিজ রাজ্যে প্রত্যাবর্তন আর শান্তিতে রাজত্ব করা। এই হল প্রথম উপাখ্যান—এর থেকে বাস্তব চিত্রের ও চরিত্র-চিত্রণের উপাদান সংগ্রহ করেছেন কবিরা।

দ্বিতীয় উপাখ্যান এ তুলনায় ছক-কাটা। সেই বেণে, বাণিজ্য-যাত্রা আর সুয়ো-দুয়োর মত সপত্নীব গঞ্জনার কাহিনী। উজানীর বণিক ধনপতির

প্রথমা স্ত্রী লহনা,—লহনা নিঃসন্তানা। পরিণত বয়সে খুল্লনাকে দেখে ধনপতি তাই যখন বিমুগ্ধ হলেন, অমনি বিবাহও করলেন, কারণ তাঁর পুত্র নেই। কিন্তু রাজার আদেশে যেতে হল তাঁকে বাণিজ্য-যাত্রায়। এদিকে সপত্নী লহনা দাসী দুর্বলার পরামর্শে খুল্লনার উপর অত্যাচার আরম্ভ করলে। তাই মাঠে ছাগল চরাতে পাঠাল সে খুল্লনাকে। খুল্লনা সেখানে বনের মধ্যে অন্য মেয়েদের দেখল মঙ্গলচণ্ডীর পূজা করতে। সেও সে পূজা শিখল। এদিকে ধনপতিও ফিরে এলেন। কিন্তু শীঘ্রই আবার যেতে হল তাঁকে সিংহলে বাণিজ্যে। তখন খুল্লনার সন্তান-সম্ভাবনা। ধনপতি সিংহলের পথে দেখলেন 'কমলেকামিনী'—পদ্মের উপর বসে এক ষোড়শী তরুণী একটি আস্ত হাতীকে গ্রাস করছেন আবার উদ্গীরণ করছেন। এ কাহিনী সিংহলের রাজাকে তিনি বললেন। কিন্তু রাজা তা দেখতে চাইলে তিনি আর তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতে পারলেন না। রাজা তাঁকে নিক্ষেপ করলেন সিংহলের কারাগারে। এদিকে খুল্লনার পুত্র হয়েছে; তার নাম শ্রীমন্ত। সে বড় হয়ে উঠল, শিক্ষা দীক্ষা পেয়ে উপযুক্ত হল। সে তখন চলল পিতার সন্ধানে সিংহলে। পথে সেও দেখল সেই 'কমলেকামিনী'। আর সেও আবার রাজাকে দেখাতে নিয়ে গিয়ে প্রত্যক্ষ করাতে পারল না সেই অদ্ভুত দৃশ্য। সবই দেবীর মায়া। শ্রীমন্তও আবার কারারুদ্ধ হল। কিন্তু এবার ভাগ্য-বিবর্তন—উজানীতে খুল্লনা পতিপুত্রের মঙ্গলার্থে দেবীকে স্মরণ করেছেন। অতএব, দেবী চললেন বৃদ্ধাবেশে সিংহলের রাজার নিকটে তাঁদের প্রাণভিক্ষা করতে; তাতে ফল হল না। এদিকে রাজা শ্রীমন্তকে মশানে শূলে চড়াচ্ছেন। তখন দেবী ভূত, প্রেত, পিশাচ নিয়ে আবির্ভূতা হলেন রাজার বিরুদ্ধে। রাজা পরাজিত হলেন, বুঝলেন দেবীর মাহাত্ম্য। তারপরে জানা কথাই—রাজকন্যাকে বিবাহ করে শ্রীমন্ত পিতা ধনপতিকে নিয়ে ফিরল খুল্লনার কাছে উজানীতে। এই হল দ্বিতীয় উপাখ্যান।

কবি-পরিচয়—চণ্ডীমঙ্গলের প্রথম রচয়িতা ছিলেন মাণিক দত্ত;—সম্ভবত মধ্য যুগেরই প্রাক্‌চৈতন্য পর্বের লোক। তার পরেকার কবি হলেন মাধবাচার্য—সপ্তগ্রামের (হুগলী) লোক; ইনি আকবরের সমকালবর্তী, খ্রীঃ ১৫৭০-এর লোক। চণ্ডীমঙ্গল ছাড়াও মাধবাচার্যের নামে 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' এবং 'গঙ্গামঙ্গলও' পাওয়া যায়। কিন্তু চণ্ডীমঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবি হলেন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী।

দ্বিতীয় এক মাণিক দত্তের নামে মাত্র একখানি চণ্ডীমঙ্গলের পুঁথি আছে। উত্তরবঙ্গেই তা পাওয়া যায়। সেই পুঁথিতেই আবার অন্য (প্রথম) মাণিক দত্তেরও উল্লেখ আছে। পুঁথিতে শ্রীচৈতন্যের বন্দনাও আছে; সম্ভবত এ রচনা অনেক পরেকার। এই মাণিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল চণ্ডীমঙ্গলের প্রথম পুঁথি নয়, তবু উল্লেখযোগ্য। এ পুঁথিতে জন-সমাজে প্রচলিত মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতকথার ছাপই বেশি। মাঝে মাঝে ছন্দেও একটা ছড়ার ধরণ দেখা যায়। তা ছাড়া মাণিক দত্তকে দিয়ে দেবী কি করে মর্ত্যে নৃত্যগীতে নিজের পূজা প্রচলিত করলেন মামুলী হলেও সেই কাহিনীও কৌতূহলোদ্দীপক। স্বপ্নে মাণিক-দত্তকে 'পোথা' দিয়ে ব্রতকথা প্রচার করতে দেবী আদেশ দিলেন। মাণিক দত্তের কিন্তু সেই সংস্কৃত পুঁথি পড়ার মত বিদ্যা ছিল না। যাই হোক্, 'তিন শত ষাট নাচাড়ি করিয়া প্রবন্ধ' সে দলবল নিয়ে কলিঙ্গে গেল— 'নাটগীত গায় প্রতি ঘরে ঘরে'। রাজার পাত্রমিত্র সব মেতে গেল। মামুলী গল্পের মতোই তখন কলিঙ্গ-রাজ কুপিত হয়ে মাণিক দত্তকে বন্দী করলেন। দেবীও স্বপ্নে রাজার সম্মুখে উগ্রমূর্তিতে প্রকাশিত হলেন। আর কথা নেই। রাজা উঠে প্রভাতে মাণিক দত্তকে নিয়ে গিয়ে দেবীর পূজা দিলেন। এই হল আসল কাহিনীর ভূমিকাংশ। তারপরে কালকেতু-কাহিনী আরম্ভ হয়— নীলাম্বরের অভিশাপ থেকে। শিব-পার্বতীর দাম্পত্য-কলহ ও দ্বন্দ্বেই সেই কাহিনীরও গোড়াপত্তন। এ পুঁথি হচ্ছে গ্রাম্য জীবনের সাধারণ পালা গান। উত্তরবঙ্গে দুর্গা পূজার সময় চার দিন এইরকম চণ্ডীমঙ্গল গাওয়া হত। ষষ্ঠীতে উদ্বোধন হত—সৃষ্টিতত্ত্ব প্রভৃতি সেদিন গাওয়া হয়ে যেত। সপ্তমীর দিন আরম্ভ হত মূল পালা। নবমীতে শ্রীমন্তের মশান-কাহিনীর গান চলত সারা রাত্রি, এই অংশ 'জাগরণ পালা'; আব দশমীতে 'বহিত' (নৌকা?) তুলে পালার সমাপ্তি। মালদহের এই 'বহিত' তোলার বিবরণ হয়তো বাণিজ্যযাত্রার একটা অস্পষ্ট অনুকৃতি (ডঃ সেনের বাঃ সাঃ ইঃ-এ উদ্ধৃতি দ্রষ্টব্য)। কিন্তু অন্যান্য অঞ্চলে চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনী অন্তত আট রাত্রি ধরেই গাওয়া হয়, তা স্মরণীয়। সাধারণত মঙ্গলবার থেকে মঙ্গলবার।

দ্বিজ মাধব—আসলে চণ্ডীমঙ্গলের প্রাচীনতর পুঁথি হল দ্বিজ মাধবের 'সারদা-চরিত' বা 'সারদা-মঙ্গল'। মুকুন্দরামের পূর্বে যাঁদের কাব্য পাওয়া যায় তাঁদের মধ্যে তিনিই প্রাচীনতম। পুঁথির উল্লেখিত কাল সত্য হলে তা ১৫৭৯-৮০ খ্রীষ্টাব্দের রচনা, তখন আকবর গৌড়ের বাদশাহ—'একাব্বর নামে

রাজা অর্জুন-অবতার।' কবির ভাষায় 'কলিযুগে তাঁর তুল্য রাজা নাহি ক্ষিতি।' কবির পরিচয় যা আছে তাতে জানি তিনি পরাশরের পুত্র, দ্বিজ মাধব; তাঁরা সপ্তগ্রামের অধিবাসী (অথবা নদীয়ার?)। কিন্তু এই পরিচয়ের দ্বিজ মাধবই 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলের'ও রচয়িতা, তিনি বাঙ্‌লার বৈষ্ণব সমাজেও সুপরিচিত;—তাঁর বংশীয়দের পর্যন্ত পরিচয় জানা যায় (দ্রঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য: 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস'); কিন্তু কোথাও কেউ বলে না সেই 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে'র দ্বিজ মাধব বা মাধবাচার্য 'চণ্ডীমঙ্গল' বা 'সারদামঙ্গল'ও লিখেছিলেন। মনে হয়, নাম-সাদৃশ্যেই এই বিভ্রম ঘটেছে, এবং একজনের পরিচয়ই দুই দ্বিজ মাধবের স্কন্ধে চেপে বসেছে বহুকাল যাবৎ। এরূপ অনুমানের একটা কারণ—সারদামঙ্গল বা সারদা-চরিতে এই পরিচয়-অংশে কবি সপ্তগ্রাম, ত্রিবেণী, নদীয়ারই নাম করেছেন, অথচ সারদামঙ্গল বা সারদা-চরিতের একখানা পুঁথিও পশ্চিমবঙ্গে পাওয়া যায় না। দু-একখানি পাওয়া যায় উত্তরবঙ্গে, আর অধিকাংশ পাওয়া যায় চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, ত্রিপুরা অঞ্চলে। বাঙ্‌লার সেই দক্ষিণ-পূর্ব ভূভাগে চণ্ডীমঙ্গলের কবি বলতেই দ্বিজ মাধব; মুকুন্দরামও সেখানে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেন নি। মনে হয় এই দ্বিজ মাধব হয়তো আসলে ঐ অঞ্চলেরই কবি।

'দ্বিজ মাধব' কে, তিনি মাধব আচার্য কিনা, না মাধবানন্দ, আর মাধব আচার্য হলে কি গ্রহবিপ্র বলেই 'আচার্য'—এসব প্রশ্ন উঠেছে; কিন্তু সে-সবের মীমাংসা আপাতত হবে না। একটা জিনিস সত্য—'সারদা-চরিতে'র লেখক দ্বিজ মাধব কবি ছিলেন, এবং পাণ্ডিত্যও তাঁর ছিল। মুকুন্দরামের সঙ্গে তাঁর তুলনা করে লাভ নেই। কিন্তু মুকুন্দরামের কিছু কিছু গুণের আভাস দ্বিজ মাধবেও পাই। যেমন, দ্বিজ মাধবও আখ্যান বলতে গিয়ে চরিত্র সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। তা অস্পষ্ট হলেও স্বতন্ত্র। তাঁর ভাঁড়ু দত্ত অনেকটা ভাঁড়; তাঁর কালকেতু ভীরু নয়, বীরই; খুল্লনা, ফুল্লরাও শুধু ছায়ামাত্র নয়। কিন্তু চরিত্র-সৃষ্টির থেকে দ্বিজ মাধবের সৃষ্টিতে স্পষ্ট বাস্তব বর্ণনা—মামুলী গার্হস্থ্য চিত্র, যেমন, সতীনের প্রতি সতীনের গঞ্জনা, দরিদ্র গৃহবধূর দুঃখ বেদনা—এসব বর্ণনায় দ্বিজ মাধব যথেষ্ট বস্তুনিষ্ঠা জানিয়েছেন—বাঙ্‌লা সাহিত্যে বস্তুনিষ্ঠার ঐতিহ্য সামান্য নয়। আর তাঁর রচনায় এমন একটা সহজ সাবলীলতা আছে যা সেদিন খুব বেশি কবির মধ্যে লাভ করা যায় না।

এ ছাড়াও 'সারদা-চরিতে' এমন কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় যা পরবর্তী কালে মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের প্রভাবে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। যেমন সারদা-চরিত 'চতুর্দশ' পালায় বিভক্ত, মুকুন্দরামে এ পালা গানের চিহ্ন নেই। সারদা-চরিতে প্রথমেই পাওয়া যায় সূর্য বন্দনা (তার থেকেই অনুমান করা হয় লেখক ছিলেন গ্রহাচার্য), 'সারদা-চরিতে' শিবায়ন বা শিব-উমার আখ্যানাবলী নেই, মুকুন্দরামের পর থেকে চণ্ডীমঙ্গলে সেই পৌরাণিক কাহিনীর প্রাধান্য ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। দ্বিজ মাধবের কাব্যে কিন্তু তন্ত্রের আব্‌হাওয়া দেখা যায়। (এ প্রসঙ্গে সুধীভূষণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'দ্বিজ মাধবের মঙ্গলচণ্ডীর গীতে'র ভূমিকাভাগ দ্রষ্টব্য। অবশ্য মঙ্গলচণ্ডীর মধ্যেকার লৌকিক মূলকে খর্ব করে তান্ত্রিক, পৌরাণিক প্রভৃতি প্রভাবের উপর তিনি যেভাবে জোর দিতে চান, তা বিশেষ সুস্থির বা সুদৃঢ় নয়)। তান্ত্রিক প্রভাবের দৃষ্টান্ত, যেমন, কালকেতুর কাহিনীর শেষে শাপমুক্ত কালকেতুকে শিব মৃত্যুঞ্জয়-জ্ঞানশিক্ষার উপদেশ দিচ্ছেন:

সুষুম্না প্রধান নাড়ী শরীর মধ্যে বৈসে।
ইঙ্গলা পিঙ্গলা বৈসে দুই পাশে ॥ ইত্যাদি।

কলিঙ্গ-রাজার পূজা-বিধির উপরেও তান্ত্রিক প্রভাব দেখতে পাই। সর্ব দেবদেবীর পূজা, গুরুপূজা এ সবও তন্ত্র-সম্মত। কিন্তু এ থেকে বোঝা যায়—এসব তান্ত্রিক কথাবার্তা তৎপূর্বেই সমাজে সাধারণ সম্পত্তি হয়ে গিয়েছে। না হলে 'সারদা-চরিতে' সব চেয়ে স্পষ্ট—'বিষ্ণুপদ'গুলিতে বৈষ্ণব প্রভাব, চৈতন্য-লীলার সানন্দ স্বীকৃতি। বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই সবই—এই বৈষ্ণব-ধারণা বা ভাবনাও সাধারণ সম্পত্তি। শ্রীমন্ত মায়ের নিষেধ সত্ত্বেও সিংহল যাত্রা করলে। দুশ্চিন্তাগ্রস্তা মাতা খুল্লনার ব্যাকুলতা কবি ব্যক্ত করেছেন সন্ন্যাসী গৃহত্যাগী চৈতন্যের জন্য শচী মায়ের আকুলতার পদ দিয়ে—'আউলাইয়া মাথার কেশ শচী পাছে ধায়।' দুষ্টু, পাঠশালা-পালানো ছেলে শ্রীমন্ত লুকিয়ে আছে। খুল্লনার ব্যাকুলতা দ্বিজ মাধব ব্যক্ত করেছেন মা যশোদার পদ সংযোজিত করে: 'তোমরা কি কেউ মোর যাদব দেখিয়াছ।'

এ কবি তান্ত্রিকই হউন, বা হউন কৃষ্ণমঙ্গলের দ্বিজ মাধব,—চৈতন্য-লীলা ও কৃষ্ণ-লীলা ষোড়শ শতক শেষ না হতেই এসব কবিকে জয় করেছে।

মুকুন্দরাম 'কবিকঙ্কণ'

কাব্য-প্রারম্ভে মুকুন্দরাম দু'টি পদে আত্মপরিচয় দিয়েছেন। তাতে

পিতামাতা ও পুত্র-পুত্রবধূ সুদ্ধ কবি আপনার জীবনের ও কালের পরিচয় রেখে গিয়েছেন। তা থেকে মনে হয় তিনিও ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিককার লোক, কারণ তিনি মানসিংহের সুবাদারীর (খ্রীঃ ১৫৯৪) উল্লেখ করেছেন। তাঁর কাব্য যখন রচিত হয় (খ্রীঃ ১৫৭৪-১৬০৪) তখন সে শতাব্দী প্রায় শেষ হচ্ছে। দক্ষিণ রাঢ়ের দামুন্যার (বর্ধমান) 'মহামিশ্র' জগন্নাথের তিনি পৌত্র, গুণীরাজ মিশ্রের তিনি পুত্র। 'দামুন্যার লোক যত শিবের চরণে রত', আর তেমনি তাঁর আপন বংশ বিদ্বান, পণ্ডিত। কিন্তু হলে হবে কি ?

"অধর্মী রাজার কালে প্রজার পাপের ফলে
ডিহিদার মামুদ সরিফ্।"

পাঠান-মোগলের দ্বন্দ্ব-কালের অরাজকতায় কবি স্ত্রীপুত্র নিয়ে দেশত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। পথে দুঃখ-দৈন্য-দুর্ভোগের একশেষ হল। কিন্তু প্রত্যেকটি সামান্যতম উপকারও মুকুন্দরাম পরবর্তী কালে উল্লেখ করতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি। তাই ভাল্যায়ার যদুকুণ্ডু 'তেলি' তাঁর কাব্যে স্মরণীয় হয়ে রয়েছে :

'দিয়া আপনার ঘর নিবারণ কৈল ডর
তিন দিবসের দিল ভিক্ষা।'

পথে গোচড়্যায় কবি স্বপ্নে পার্বতীর কৃপা পান। তারপর এগিয়ে গিয়ে আরড়ায় (মেদিনীপুর) বাঁকুড়া রায়ের রাজ্যে পেলেন স্থান। বাঁকুড়া রায় তাঁকে পুত্রের শিক্ষার জন্য গুরুরূপে নিযুক্ত করলেন। অনেককাল পরে যখন রঘুনাথ রায় রাজা, তখন পুত্র-বিয়োগে কবির মনে পড়ল আবার চণ্ডীর আদেশ। আর তিনি চণ্ডীমঙ্গল রচনায় ব্রতী হলেন। রঘুনাথ তাঁকে উৎসাহ দেন, পুরস্কৃত করেন, আর তাঁকে উপাধি দেন 'কবিকঙ্কণ'।

কবিকঙ্কণ ? হাঁ কবিকঙ্কণ নিশ্চয়ই। কিন্তু বাঙ্‌লা সাহিত্যে যে মানবরসের তিনি প্রথম ও একমাত্র স্রষ্টা, মধ্যযুগের বাঙ্‌লা সাহিত্যে তা একটা আকস্মিক বিস্ময়। তার নাম ও স্বরূপ তখনো রস-শাস্ত্র স্থির করে উঠতে পারে নি। না হলে মুকুন্দরামের পরিচয় হত কথা-শিল্পে প্রথম বাঙালী কবি হিসাবে, কথা-শিল্পী বলে, বাঙ্‌লা সাহিত্যের প্রথম ঔপন্যাসিক বলে। কিন্তু উপন্যাস সে সময়ে জন্মে যখন সামন্ত যুগ শেষ হয়—এবং আগেকার যুগের ছাঁচে-গড়া মানুষ বিশিষ্ট-চরিত্রের মানুষ হয়ে উঠতে থাকে। সেই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের যুগ তখনো আসে নি। তথাপি মুকুন্দরামের কবিচিত্ত আপনার অকৃত্রিম সহৃদয়তায় ও সূক্ষ্ম বাস্তবদৃষ্টিতে আবিষ্কার করেছে তার মূল সত্য—

মানুষের চরিত্র, আর মানব-রস। দেবদেবীর মাহাত্ম্য কীর্তন করতে গিয়েও তিনি বুঝেছেন সাহিত্যের আসল কথাই এই—

সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।

আর এ মানুষ সহজিয়া সাধনার 'সহজ মানুষ' নয়, সমাজবন্ধনাতীত পরমাত্মার বিগ্রহ নয়, সমাজের ভাল-মন্দ, সুখদুঃখ-কামনা-বাসনা-মাখা বাস্তব মানুষ। দেবী-মাহাত্ম্য কীর্তন করতে বসেও তাই মুকুন্দরাম মানব-মাহাত্ম্যই কীর্তন করেছেন। বাঙ্‌লা সাহিত্যে তিনি তাই স্ফুটনোন্মুখ মানবতার প্রথম কবি, প্রথম আধুনিক কবি—যখন আধুনিক কাল অনাগত, যখন মানুষ হিসাবে মানুষের মর্যাদা অনাবিষ্কৃত।

আধুনিক কাল তখনো অনেক দূরে, কাব্যও হচ্ছে মঙ্গল-কাব্য, অলৌকিকতার রাজ্য সর্বত্র। মুকুন্দরামেরও সেই অলৌকিক রসে বিরাগ নেই। সিংহলে বাণিজ্য-পথে কল্পনার কত সমুদ্র পেরিয়ে যায় বণিকের ডিঙা। কিন্তু যাত্রা তার অজয় থেকে ভাগীরথী দিয়ে। আদি-গঙ্গার মরা খাতের ধারে দক্ষিণ বাঙ্‌লার আজও যেসব পুরনো বর্ধিষ্ণু গ্রাম ও নগর বাঙ্‌লাদেশের ঝরা স্বপ্নের মতো দাঁড়িয়ে আছে, একটি একটি করে কবিকঙ্কণ তার বর্ণনা করে যাচ্ছেন। উল্লেখ করেছেন তিনি বাঙাল মাঝিদের ঝড়ের ভয়ে খেদ; উল্লেখ করেছেন তিনি পর্তুগীজ 'হার্মাদ্'দের কথা; বাঙালীর চিরপ্রিয় আহার্যাদির কথা। বাস্তব জীবনরসেই তাঁর সত্যকার আনন্দ। কালকেতু ব্যাধ পত্তন করেছে গুজরাতে নূতন রাজ্য ও রাজধানী; কবিকঙ্কণের বিশ্বস্ত বর্ণনায় মনে হয় দেখছি যেন বাঙালীর ইতিহাসের একটি সজীব পাতা। ষোড়শ শতাব্দীর বাঙালীর এমন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস আর নেই। কিছুই কবির চোখ এড়ায় নি; অরাজকতার দিনে জুলুম করে জমির 'পণের কাঠায় কুড়া' মাপা হয়, 'খিল ভূমি করে লাল'; জোতদার 'তঙ্কায় আড়াই আনা কম' দেয়; মহাজনের অত্যাচারের শেষ নেই; কোটাল 'কড়ির কারণে বহু মারে', প্রজা যখন সব বিক্রি করছে 'ধান্য গরু কেহ নাহি কিনে'—টাকার জিনিস তখন আবার দশ আনায় বিকোয়; অথচ গ্রাম ত্যাগ করে পালাবারও পথ সহজে পায় না মানুষ। পথ অবশ্য তবু পায়, তাই বিদ্রোহ করতে বাধ্য হয় না।

এ শুধু তথ্যনিষ্ঠা নয়, ভাবে ও ভাষায় এ কাব্যে আছে একটা অসাধারণ

স্পষ্টতা—যে স্পষ্টতা ভারতীয় কবি বা সাহিত্যিকদের রচনারীতিতে একটা দুর্লভ বস্তু; যাকে বলা যায় ক্লাসিক-ধর্ম, তথ্যনিষ্ঠা, ভাব ও ভাষায় সংযম, আত্মস্থতা।

তথাপি কবিকঙ্কণের প্রধান কীর্তি হল চরিত্রাঙ্কনে। বাস্তবনিষ্ঠা না থাকলে কেউ এ কর্মে সার্থক হতে পারে না, হয়তো হস্তার্পণও করে না। মুকুন্দরামের বেণে মুরারি শীল, মুকুন্দরামের ভাঁড়ুদত্ত, তাঁর দাসী দুর্বলা—বাঙলা সাহিত্যে সুপরিচিত চরিত্র, এমন জীবন্ত চিত্র আর নেই। মূলকাব্য থেকে উদ্ধৃতি না করলে হয়তো তার সম্পূর্ণ উপলব্ধি হয় না—বোঝা যায় না মুরারি শীলের সঙ্গে কেনা-বেচায় কেমন একটি কৌতুক-রসপ্রধান আর নাটকীয় ঘটনা সংস্থাপন করা হয়েছে; ভাঁড়ুদত্ত কতকটা কুচক্রী আর বেহেড্-বেহেয়া; দুর্বলা কেমন একটি পাকা সেয়ানা দাসী; ধনপতির পিতৃ-শ্রাদ্ধের সভায় বেণেরা নিজেদের মধ্যে পরস্পরের মর্যাদা নিয়ে কিরূপ কলহ করছে; কলিঙ্গের সেনাপতি বাক্যবীর কেমন যুদ্ধের ভয়ে মনে মনে কম্পমান; পুরোহিতেরা কেমন মধুলোভী মক্ষিকার মত দক্ষিণার সন্ধানী; গুজরাতের বৈদ্য কবিরাজরা কেমন রোগ না সারলেও রোজগারে ওস্তাদ; খুল্লনাকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক হয়ে ধনপতি কেমন করে বোঝান প্রথম পত্নী লহনাকে যে একা একা গৃহকর্মের ভারে লহনার শ্রী কালি হয়ে যাচ্ছে;—মুকুন্দরাম সত্যিকারের কৌতুকরসিকের চোখ দিয়ে এরূপ প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র জিনিসও দেখছেন,—নিশ্চয়ই দ্রষ্টার মত তাঁর ভাবখানা, কিন্তু চোখে মুখে তাঁর গোপন হাসি। স্বভাবতই এর সঙ্গে তুলনা হয় ইংরেজ কবি চসারের। কিন্তু চসার ইউরোপীয় 'রিনায়সেন্সের' বিদগ্ধ, সুরসিক কবি; আর মুকুন্দরাম মধ্যযুগের কবি, বাঙালীর পল্লী-সভ্যতার কবি। যতটুকু বাস্তব-নিষ্ঠা, মানব-চরিত্র-বোধ, মানবতা ও সাধারণ মানুষের প্রতি সহমর্মিতা তাঁর কাব্যে আমরা পাই, সে যুগের তুলনায় তা একটা অপরিমিত বিস্ময়।

সত্য বটে, মুকুন্দরামও সমসাময়িক কাল ও ভারতীয় পল্লীসমাজের জীবনযাত্রা ও কাব্যদর্শনের দ্বারা চালিত। অরাজকতাকে তিনি মনে করেন প্রজার পাপের ফল; বিনা অপরাধে স্বচ্ছন্দে খুল্লনার অগ্নি-পরীক্ষা করিয়ে ছাড়েন; তার পরে রচনা করেন 'বারমাস্যা', বসন্ত বর্ণনা, 'চৌতিশা' প্রভৃতি ধরাবাঁধা বিষয়। তাতেও কবির শক্তি ও কৃতিত্ব একেবারে আচ্ছন্ন হয় নি, এইটুকু বলাই যথেষ্ট।

অন্যান্য কবি—আশ্চর্য নয় যে, চণ্ডীমঙ্গলের পরবর্তী রচয়িতারা আর কবিকঙ্কণের প্রভাব অতিক্রম করতে পারলেন না। সপ্তদশ শতকে চণ্ডী কাহিনী-রচয়িতার অভাব হয় নি, অভাব ছিল কাব্যশক্তির। জয়নারায়ণ সেন, মুক্তারাম সেন প্রভৃতিও মঙ্গল-কাব্য লিখলেন। কিন্তু তখন মার্কণ্ডেয় পুরাণের চণ্ডী বা দুর্গা বাঙালী কবিদের হৃদয় দখল করেছেন। অবশ্য তার রচয়িতারা,—সপ্তদশ শতকের ভবানীপ্রসাদ রায়, দ্বিজ কমললোচন প্রভৃতি—কবি হিসাবে কেউ তেমন কৃতী নন।

ধর্মমঙ্গল

মঙ্গল-কাব্যের মধ্যে ধর্মমঙ্গলের কাব্যগুলির সাহিত্যিক মূল্য সামান্য, যাঁরা প্রধান রচয়িতা তাঁরাও আবার অষ্টাদশ শতকের, অর্থাৎ 'নবাবী আমলে'র। কিন্তু সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে লেখা ধর্মমঙ্গলের পুঁথি পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, তার অনেক পূর্বেই ধর্মঠাকুরের ছড়া চলিত ছিল। আর ধর্মপূজা ও তার আখ্যান বাঙ্‌লার লোক-সমাজে সর্বাধিক প্রচলিত এক পূজা ও আখ্যান হয়ে উঠেছে নিশ্চয়ই আরও অনেক-অনেক কাল পূর্বে। এক সময়ে হয়তো উত্তরবঙ্গেও ধর্মঠাকুরের প্রতিষ্ঠা ছিল, কিন্তু বর্তমান-কালে ধর্মঠাকুরের পূজা সীমাবদ্ধ হয়েছে প্রধানত পশ্চিমবঙ্গের রাঢ়ে, অজয়-দামোদর নদের মধ্যবর্তী ভূভাগে বীরভূম, বর্ধমান, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, মানভূম প্রভৃতি জেলা নিয়ে একটা বিরাট অঞ্চলে। এখানেই হাখণ্ড নামে গ্রামও ছিল, ধর্ম-পূজার তাই ছিল এক প্রধান পীঠস্থান। কিন্তু সর্বত্রই ধর্মঠাকুর ছিলেন নিম্নবর্গের মানুষদের দেবতা, বিশেষ করে ডোমদেরই ঠাকুর। উচ্চবর্গের মানুষেরা ধর্মপূজা ও ধর্মের গান ঘৃণার চক্ষেই আগে দেখত, অবশ্য সে ঘৃণা কালক্রমে খানিকটা কমেও এসেছিল। তবে ডোমদের দেবতা ধর্মঠাকুর চণ্ডী ও মনসার মতো পুরোপুরি জাতে উঠতে পারেন নি। ধর্মমঙ্গলের অষ্টাদশ শতকের কবি মাণিক গাঙ্গুলী ধর্ম ঠাকুরের আদেশ পেয়েও তাই ভয়ে ভয়ে বলছেন, 'জাতি যায় তবে প্রভু যদি করি গান।' কিন্তু তা সত্ত্বেও যখন ব্রাহ্মণ বংশের কবি সে গান করছেন, তখন বোঝা যায় জাতিও আর যাবে না এর পরে। তাই ধর্মমঙ্গল কাব্যের কবিরাও অধিকাংশই ব্রাহ্মণ, কায়স্থ তিন জন, কৈবর্ত ও শুঁড়ি পাওয়া যায় একজন করে। আসলে নিম্নবর্গের পক্ষে লেখা-পড়া শেখা অসম্ভব ছিল; যদিইবা তাদের গান রচনার শক্তি থাকত, সাধারণত সে গান মুখে মুখে চলে মুখে মুখেই নিঃশেষ হয়ে যেত। পুঁথিতে তা লিখবে কে? তাই তাদের গ্রন্থ নেই।

ধর্মমঙ্গলের কবি ও কাব্য দুয়েরই থেকে অনেক বেশি গুরুত্ব ধর্মপূজার ও ধর্মমঙ্গল-কাহিনীর। কারণ তা হচ্ছে বাঙালীর রহস্যাবৃত জীবনেতিহাসের একটি বিচিত্র উপাদান। এদেশের নৃবিজ্ঞানের ও সংস্কৃতির বৈজ্ঞানিক গবেষকরা এ সমস্যার নানা প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেছেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ই প্রথমত তার সূচনা করেন ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে (১৮৯৪-এর প্রোসিডিংস্ অব্ এসিয়াটিক সোসাইটি অব্ বেঙ্গল-এ), আর বিংশ শতকের এই মধ্যভাগেও সে আলোচনা শেষ হয় নি। এ আলোচনার প্রয়োজন এখনো পুরোপুরিই রয়েছে। কোন্ দেবতার কি ভাবে উদ্ভব হল, কি ভাবে পরে তার বিবর্তন হল, কোথা থেকে কার পূজাপদ্ধতিতে এসে মিশেছে অপর কার পূজার বিধি, এমনিতর নানা জটিল প্রশ্ন অমীমাংসিত রয়েছে। এ সব প্রশ্নকে একেবারে উপেক্ষা করে বাঙালী সংস্কৃতির কোনো হিসাবই নেওয়া যায় না; বাঙ্লা সাহিত্যেরই কি হিসাব নেওয়া সম্ভব হয়? অবশ্য এই সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের তথ্যে বাঙ্লা সাহিত্যের ইতিহাস অযথা ভারাক্রান্ত করলেও সে সব প্রশ্নের মীমাংসা হবে না, এ প্রসঙ্গে তাও বোঝা উচিত। সাধারণভাবে ধর্ম-ঠাকুরের ও ধর্ম-পূজার সমস্যাগুলি জানাই যথেষ্ট।

ধর্ম ঠাকুর কে?—যা সাধারণত এখন দেখা যায় তা হচ্ছে—যেমন শালগ্রাম শিলা, তেমনি ধর্মঠাকুরও হচ্ছেন একখণ্ড পাথর। কোথাও সে পবিত্র পাথরটি কূর্মাকৃতি, কোথাও ডিম্বাকৃতি, বা এই দুইয়ের কাছাকাছি; কখনো আবার লাল কাপড় দিয়ে তা ঢাকা থাকে, আর তার গায়ে থাকে পিতলের পেরেক বসানো চক্ষু—ভক্তদের দান। দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়ে, বা কুষ্ঠরোগের আরোগ্য কামনায় ভক্তরা ঠাকুরের কাছে নানা মানৎ করে। ধর্মঠাকুরের 'থান' (স্থান) নির্জন গাছতলায়, কিম্বা কখনো চালা ঘরের, মাটির বা ইটের মন্দিরে। 'ধর্মরায়' ছাড়াও এক এক স্থানে তাঁর এক-এক নাম—যথা, বুড়া রায়, কালু রায়, যাত্রাসিদ্ধি রায়। অনেক জায়গায় ধর্মঠাকুরের কাছে পাঁঠা, হাঁস, পায়রা, মুরগী এবং শূকরও বলি দেওয়া হয়। সাধারণত যাঁরা পূজা করেন তাঁরা ব্রাহ্মণ নন, ডোম জাতির লোকেরাই হন পূজারী। এই পূজারীরা তাম্র-উপবীত ধারণ করেন। তাঁরা উপাধি নেন 'পণ্ডিত', 'দেবাংশী' নামেও তাঁরা পরিচিত। পূজা হয় কোথাও নিত্যপূজা, কোথাও বাৎসরিক পূজা,—বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে, বারোয়ারি পূজার মতো। আর কোথাও এ পূজানুষ্ঠান মানসিক শোধ করবার জন্য। প্রধান অংশের নাম 'ঘর-ভরা'। সে পূজা বিচিত্র। খুব জাঁকজমক করে পূজা হয়—বারটি

ধর্মশিলা একত্র করা হয়, ঘট স্থাপন করে বারদিন পূজা চলে, একটি ছাগকে ধর্মের নামে ছেড়ে দেওয়া হয়, শিবের গাজনের মতো ধর্মের গাজনে এ পূজা শেষ হয়। এই ধর্মঠাকুরের নামেই গ্রামের লোক ঘট বসিয়ে সংকল্প করত, তার থেকে 'ধর্মঘট' কথাটির উদ্ভব।

এ 'ধর্মরায়' মূলত হিন্দুর ধর্মরাজ বা যমরাজ নন, তা স্পষ্ট। পণ্ডিতবর হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে তিনি হলেন বুদ্ধেরই শেষ পরিণতি—বৌদ্ধধর্মের ত্রিরত্নের (বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘ) মধ্যে ধর্ম এভাবে টিকে আছে। বাঙলার বৌদ্ধধর্মের শেষ স্মৃতি বহন করছেন এই ধর্মঠাকুর, ধর্মপূজা ও তাঁর অব্রাহ্মণ পূজারীরা, এই মত গ্রহণ করে বিলুপ্ত বৌদ্ধধর্মের এই চিহ্নান্বেষণের একটা উৎসাহ জাগে তারপর পণ্ডিত মহলে। তাই ধর্মমঙ্গলের ধর্মপূজা-পদ্ধতির নানা পুঁথির অংশকে 'শূন্যপুরাণ' নাম দিয়ে একেবারে বৌদ্ধযুগের বাঙলা সাহিত্য রূপে পর্যন্ত ঘোষণা করা হয় [বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক ১৩১৪ সালে প্রকাশিত 'শূন্যপুরাণে' এ চেষ্টাই দেখা যায়। তাতেই তখনকার দিনে শূন্যপুরাণকে বলা হত প্রাচীনতম বাঙলা সাহিত্য—১১শ-১২শ শতকের (?)]। অবশ্য তখনই দেখা গিয়েছিল ধর্মঠাকুর কোথাও শিব, কোথাও বিষ্ণু, কোথাও বা দুয়ের সংমিশ্রিত এক দেবতাও হয়ে উঠেছেন। তা আর আশ্চর্যের বিষয় কি? ঐ পরিণাম তো বৌদ্ধ দেবদেবীর পরবর্তী কালে ঘটেই। পরে আরও একটু লক্ষ্য করে দেখা গেল—ধর্ম যেন সূর্যদেবতারও প্রতীক। কিন্তু সূর্যও শুধু হিন্দু বা পারসিকের দেবতা নন। দ্রাবিড়-অস্ট্রিক গোষ্ঠীর নানা আদিবাসীরাও বাঙলার চারদিকে সূর্য দেবতার উপাসনা করছেন—বাঙলার মেয়েদের ব্রতকথায় তো সূর্য মস্ত বড় দেবতা। আদিবাসীদের সূর্য দেবতাকে গ্রহণ করে সূর্য দেবতা ধর্মও তার মধ্যে মিশেছেন, তাতে আর বিস্ময়ের কি? এর পরে দেখা গেল—শুধু তাই নয়, ধর্মরায় রাজাও, ধর্মমঙ্গল গানে শ্বেত-অশ্ব-আরোহী সিপাহীরূপেও এই ধর্মরায়ের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এদিকে 'ঘর-ভরা'র কাহিনীর গাজনের শেষে 'ঘর-ভাঙা' নামে একটি অনুষ্ঠানও আছে, তাতেই 'নিরঞ্জনের রুষ্মা' ও জাজপুর ধ্বংসের কথা পাওয়া যায়। এর নাম জালালি কলমা। তাতে মুসলমান বিজয়ের ও ধ্বংসের কথা দেখা যায়। অর্থাৎ মনে হয় ডোমের মতো দেশীয় যোদ্ধৃজাতির এই যুদ্ধ-দেবতা ধর্ম তুর্ক-বিজয়ের দিনে ভক্তদের চোখে বিজয়ী তুর্ক-সিপাহীও হয়ে উঠেছেন, এবং শ্বেত-অশ্বারূঢ় সূর্যের সঙ্গে এই সিপাহী পরিকল্পনাও এসে মিশেছে। এখানেও

তবু শেষ হয় নি ধর্মঠাকুরের ঠিকুজী। কূর্মাকৃতি প্রস্তরখণ্ড কেন তাঁর প্রতীক হল? অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ পণ্ডিতেরা এবার বৌদ্ধযুগ ও ডোমদের বনদেবতাকে ছাড়িয়ে আরও পিছনে গিয়ে বললেন—আসলে এ হচ্ছে কূর্মদেবতা। এ দেশের আদিম (অষ্ট্রিক?) অধিবাসীদের তা টোটেম কিংবা বিগ্রহ,—যার সঙ্গে হিন্দু কূর্মাবতারেরও সম্পর্ক রয়েছে। আর 'ধর্ম' নামটি আসলে 'ধর্ম' নয়, অষ্ট্রিক 'ধুম্' (=কূর্ম), কচ্ছপ অর্থে ধুন শব্দ পূর্ববাঙলায় সুপ্রচলিত। অবশ্য এই কূর্মবাদের' বিরুদ্ধে তর্ক আছে (শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্যের 'বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস', ২য় সং, পৃ ৪৬৯-৫১০এ সে সব বিশদরূপে আলোচিত হয়েছে)। কিন্তু তর্ক চলুক, ততক্ষণ ডঃ সুকুমার সেনের মতো সাধারণ বুদ্ধিতে আমরাও মেনে নিতে পারি—এ বর্ণনায় দুটি পৃথক সূত্রের সন্ধান পাওয়া যায়: একটি প্রস্তর পূজা ও কূর্ম পূজা, আর দ্বিতীয়টি সূর্য পূজা, যার সঙ্গে মিশেছিল মুসলমান যোদ্ধ-শক্তির পূজা। কিন্তু মৌলিক না হলেও এই মিশ্রিত দেবতার মধ্যে লৌকিক বৌদ্ধধর্মের ও লৌকিক হিন্দুধর্মের (শিবের) ছাপও কি মুসলমান আমলের পূর্বেই পড়তে আরম্ভ করে নি? তা-ও পড়তে আরম্ভ করেছিল। ধর্ম-কাহিনীর সেই শিবটি হচ্ছেন বাঙালী চাষী শিব,—শিবায়নে তিনিই ক্রমে স্বতন্ত্র হয়ে উঠতে থাকেন।

ধর্মঠাকুরের গানে কি আছে?—ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য ও পূজা আশ্রয় করে ধর্মঠাকুরের ছড়া ও গান। ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য বর্ণনা চলে প্রধানত লাউসেনের আখ্যান অবলম্বন করে, সেই অংশকেই বলা চলে খাঁটি ধর্মমঙ্গল। কিন্তু ঠাকুরের পূজা ও শাস্ত্রের সঙ্গে আরও নানা কাহিনী এসে জমেছে। সে সব পূজার সময় গাওয়া হত। এ সবের নাম দেওয়া যায় (ডঃ সুকুমার সেনের মতে) 'ধর্মপুরাণ'। ধর্মের এসব গানে ছড়ায় প্রথম থাকে 'শূন্যশাস্ত্র' বা সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার কথা। এই সৃষ্টি-কাহিনীর মূল অনেক দূরে, হিন্দু পুরাণাদির সৃষ্টিতত্ত্বের অনুরূপ এ নয়। 'শূন্যপুরাণ' বলতে এই সৃষ্টি খণ্ডই বিশেষ করে বোঝায়। তারপরে রয়েছে ধর্মপূজা প্রবর্তনের কথা। এর দুটি অংশ। একটি 'সদা-খণ্ড' সদা ডোমের কাহিনী; অন্যটি 'সংজাত খণ্ড' (সাংঘাত্রিক) —রামাই পণ্ডিতের কাহিনী। এসব ধর্মপুরাণের অন্তর্গত। কিন্তু তৃতীয় একটি ভাগও ধর্মপুরাণের আছে, তা হচ্ছে ধর্মপূজা-পদ্ধতি—এই ভাগে বর্ণিত হয়েছে ধর্মঠাকুরের নিত্যপূজার বিষয় ও 'ঘর-ভাঙা' গাজনের কথা (যাতে 'নিরঞ্জনের রুষ্মা' বা 'জালালি কলমা' প্রভৃতি স্থান পায়), আর সে ভাগও

তাই বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক। যা'ই হোক, যে পুঁথিতে যে বিষয় যতটাই পাওয়া যাক, বলা যেতে পারে একদিকে সৃষ্টি-তত্ত্ব, সদাখণ্ড সাংজাত-খণ্ড, ধর্মপূজা বিধান, 'ঘর-ভাঙ্গা' গাজনের গান, অন্যদিকে লাউসেন-রঞ্জাবতীর উপাখ্যান—এসব মিলিয়ে ধর্মঠাকুরের গান; 'শূন্যপুরাণ', 'ধর্মপূজা-বিধান', 'ধর্মমঙ্গল'—অর্থাৎ ধর্মের 'স্যাগা'। আর এ সবের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম-মঙ্গলে পাওয়া যাবে রামায়ণের বা নাথ-সিদ্ধান্তের প্রচলিত নানা কাহিনীরও ছাপ। যে সম্প্রদায়ের বা জনতার মনে যা ভালো লাগে তাই ঢুকে পড়েছে ধর্মের গানে। তার আখ্যানে লাউসেনকে দেখে রমণীদের মামুলী পতি-নিন্দাও আসে আবার পাতিব্রত্যের চিরদিনকার জয়-ঘোষণাও আসে; নায়কের প্রণয়-প্রার্থিনী করে (গোরখ বিজয়ে যেমন দেখা যায়, তেমনি) দেবী পার্বতীকেও এই আখ্যানে আনতে কবির বাধে না, আবার হনুমানের মতো কর্মপটু বীরকে এসব আখ্যানে না স্থান দিলেও তাঁর নয়। সাধারণে যা শোনে, যা চায়, সবই আসে এক সূত্রে না এক সূত্রে। সকল মঙ্গল-কাব্যেই এ লক্ষণ দেখা যায়; লৌকিক কাব্যের এইরূপ নিয়ম।

সৃষ্টি-প্রক্রিয়া: শূন্যপুরাণের সৃষ্টিতত্ত্বও তাই অনেক মনসামঙ্গলে, চণ্ডীমঙ্গলে পাওয়া যায়। এই সৃষ্টি-কাহিনীও জনসাধারণের নিশ্চয় অপরিচিত ছিল না। সহজিয়া নিবন্ধেও তাই তা লাভ করা যায়। যেমন, সৃষ্টির পূর্বে কিছুই ছিল না, সবই ছিল শূন্য, এ তত্ত্ব সুপরিচিত। তারপর নূতন কাহিনী—এই শূন্যরূপী ধর্মের মনে সৃষ্টির ইচ্ছা জাগল, হলেন তিনি দুই রূপ'অনিল' (পবন) ও নীল (মন)। ফুটল এক বিরাট বিম্ব বা বুদ্বুদ, ধর্ম তাতে আসন নিলেন। তার ভিতরে ধর্ম ভ্রূণ হয়ে বিম্বভেদ করে আকার ধারণ করে বের হলেন। কিন্তু 'আকার হইতে ধর্ম হইল ফাঁফর'। তাঁর নিশ্বাসে জন্ম নিল 'উলুক'—ধর্মের বাহন। তারপরে মুখামৃত থেকে জল, অঙ্গমল থেকে মেদিনী এবং ঘাম থেকে আদ্যাশক্তিকে তিনি সৃষ্টি করলেন, এই আদ্যাকে বিবাহ করলেন। আর বিবাহের পরেই তপস্যা করতে তাঁর ইচ্ছা হল—বিবাহের মজাটা হয়তো টের পেলেন যথেষ্ট। ধর্ম গিয়ে বাল্লুকানদীর তীরে তপস্যায় বসলেন, অমনি তার বাহন উলুকওগিয়েবসল যোগে। এদিকে আদ্যাদেবীর চিত্ত চঞ্চল হল, জন্মালেন কামদেব। ফলে ধর্মের অকালে ধ্যানভঙ্গ হল—যেমন হয়েছিল শিবের। এই ধ্যানভঙ্গে বিষ উদ্ভূত হল। হতাশ আদ্যা সে বিষ পান করেও মরলেন না। তাঁর উদরে জন্মাল ত্রিগুণ—সত্ত্ব, রজ, তম, এই তিন—যথাক্রমে তা আসলে

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। তাঁরা তিন ভাই খুঁজতে চললেন পিতাকে। ধর্ম অমনি নিরাকার হয়ে গেলেন। তখন তাঁরা তপস্যা করতে লাগলেন। বার বৎসর তপস্যা। তখন ধর্মেরও দয়া হল, মড়া হয়ে তিনি ভেসে এলেন। শিব তাঁকে পিতা বলে চিনে ফেললেন। অন্য ভাইরা মানে না—শিবটার চিরদিনই বুদ্ধি কম। কিন্তু উলুক উড়ে এসে সেই মড়াকেই বলল ধর্ম। তখন মড়ার সৎকারের আয়োজন হল—শিবের জানুর উপরে। জেনে আদ্যা ছুটে এসে সহমৃতা হলেন—ইত্যাদি। তিন দেবতার পরীক্ষায় এই সৃষ্টি-কাহিনী সমাপ্ত, যদিও পাঠকের পক্ষে অর্থ বোঝা ভার—কেনই বা কি হল।

সদা-খণ্ড: এর চেয়ে 'সদা-খণ্ড' সহজ-বোধ্য; কারণ সে মানুষের কাহিনী। ঘোর কলিযুগে ধর্মপূজা প্রচার করতে আদিত্য, জন্ম নিলেন রামাই পণ্ডিত রূপে। তার আগে ধর্ম চললেন তাঁর ভক্ত সদা ডোমের কাছে আত্মপ্রকাশ করতে—ছাতা মাথায়, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। ছাতাটি মেরামত করতে হবে সদার। মেরামত শেষ হতেই সদা ডোমের তিনি অতিথি হতে চান। কিন্তু সদার ত 'বেটাবেটী নেই'। ঠাকুর আঁটকুড়োর ঘরে পারণ করেন কি করে? দুঃখে সদা প্রায় আত্মহত্যা করে। ঠাকুর রক্ষা করলেন, আর তাঁরই বরে পুত্রও হল—লুইধর। এ হল সেই পুত্রেষ্টি যজ্ঞের চিরকেলে গল্প। এর পরে যোগ হল হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যান। হরিশ্চন্দ্র রাজা জোয়ান ডোম লুইধরকে বাগানে রক্ষক নিযুক্ত করলেন। আবার ধর্মঠাকুর ব্রাহ্মণ-বেশে গেলেন অতিথি হতে। সদা ডোম ডোমনীর পরামর্শে ঘরের মধ্যে লুকিয়ে থাকতে চায়, ডাক শুনেও সাড়া দেয় না। কেন?

> সন্ন্যাসী মহন্ত যায় এই পথ সোজা।
> ধর্যা নিয়া আমার ঘাড়েতে দেই বোঝা॥

কারণ, সবাই তাকে বেগার খাটায়।

হরিশ্চন্দ্র কাহিনীর মতই পুত্রমাংসে অতিথি সৎকারে আদিষ্ট হয় এর পরে সদা। সদা ডোম বা হরিশ্চন্দ্র রাজা রামাইকে পুরোহিত করে ধর্মপূজা করেন। কাহিনী তো এই। সদা ডোম ও তার স্ত্রীকে মন্দ লাগে না—সাধারণ ডোম জাতীয় সরল মানুষ, ছলনা করতেও ভালো করে জানে না।

সাংজাত খণ্ড: সাংজাত খণ্ডে রামাই পণ্ডিতের কথাও এ গুণে বর্জিত নয়। রামাই (আদিত্য) জন্মেছে বিষ্ণুনাথ বা বিশ্বনাথ মুনির বংশে। বাক্-সিদ্ধা পুরুষ বিশ্বনাথ। তিনি মারা যেতেই মার্কণ্ডেয় মুনির পরামর্শে মুনিরা

'ঘোঁট' করলে—রামাইকে পিতার দেহ-সংকারে তারা কেউ সাহায্য করবে না। রীতিমতো ব্রাহ্মণদের ঘোঁট। রামাইকে একেবারে একঘরে করা ঠিক হল—'মুনির নন্দন রামে শূদ্র করা্যা রাখ।' রামাইয়ের উপনয়নের সময় যায়। কিন্তু কেউ তাকে পৈতে দেবে না। রামাই কাঁদতে কাঁদতে ধর্মকে ডাকতেই তিনি আবির্ভূত হলেন, রামাইকে তাম্রসূত্র ধারণ করিয়ে ধর্মপূজার পদ্ধতি বলে দিলেন। রামাই ধর্মপূজা করে বাক্‌সিদ্ধ হয়। এদিকে মার্কণ্ডেয় তখনো ধর্মের প্রতি গাল-মন্দ করে; বলে, ধর্মপূজা হল নীচ-জাতির পূজা। কিছু-দিন যেতে না যেতেই ধর্মনিন্দার ফলে মার্কণ্ডেয়ের হল ধবল; তখন রামাইয়ের শরণ না নিলে নয়। রামাইয়ের দয়ায় তখন মার্কণ্ডেয়ের রোগ দূর হল, মুনিরা রামাইকে ব্রাহ্মণ বলে মেনে নিলেন, হরিশ্চন্দ্রের ধর্মপূজায় পুরোহিত হলেন রামাই।

অবশ্য ব্রাহ্মণরা রামাইকে স্বীকার করল না; ধর্মও রইলেন এই অবজ্ঞাতদেরই নিজস্ব দেবতা হয়ে। তারপর যা ঘটল তা, বোঝা যায়, তুর্ক-বিজয়। ধর্ম-পূজাপদ্ধতির শেষ অংশে তাই দেখি ভাষার ও ভাবের খিচুড়ি পাকানো একটা অংশ (এর অন্তর্ভুক্ত 'ছোট জালালি', 'নিরঞ্জনের রুষ্মা'র বা 'বড় জালালি'র পরিচয় আগেই আমরা গ্রহণ করেছি; দ্রষ্টব্য—ধর্মপূজা-বিধান, সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত, পৃঃ ২২০-২২৩)। মনে হয় ধর্মঠাকুর এখানে রাজশক্তির প্রতীক—অশ্বারোহী তীর-কামানধারী খোন্দকার; অর্থাৎ ঠাকুরের নিম্ন জাতীয় ভক্তরা গৌড়ের সুলতানকেই তখন ধর্মরায়ের প্রতিনিধি বলে মেনে নিয়েছে (ডাঃ সেন—বাঃ সাঃ ইঃ, ২০১২)।

ধর্মপূজা-পদ্ধতির এই সব আখ্যানে একালে কৌতুক বোধ হয়। সে কৌতুক কাব্যের জন্য নয়, গ্রাম্য-উদ্ভটতা ও সামাজিক আবর্তন-বিবর্তনের জন্য।

ধর্মপূজার এই পুরাণ, গীত ও ছড়াগুলির চেয়ে ধর্মমঙ্গল অংশের কাব্যগত রূপ অনেক বেশি সংহত। একটি কাহিনীকে অবলম্বন করে তা রচিত হয়েছে—লাউসেন-রঞ্জাবতীর কাহিনী।

ধর্মমঙ্গল: 'ধর্মমঙ্গলে'র লাউসেন-রঞ্জাবতীর এই আখ্যানে কাব্যরস কিছুটা আছে, সে আখ্যান বিশেষ গ্রাম্যও নয়। তাই বলে তাও কম উদ্ভট নয়। অলৌকিক ঘটনার উদ্ভাবনা তার পদে পদে।

গৌড়েশ্বরের সামন্ত রাজা ময়নাগড়ের কর্ণ সেন। ঢেকুরগড়ের বিদ্রোহী সামন্ত ইছাই ঘোষের হাতে এই কর্ণ সেনের ছয় পুত্র নিহত হয়; তখন বৃদ্ধ

কর্ণ সেন বিবাহ করেন গৌড়েশ্বরের শ্যালিকা রঞ্জাবতীকে। এই বিবাহে বিরোধী ছিলেন রঞ্জাবতীর ভ্রাতা মন্ত্রী মহামদ। রঞ্জাবতী হলেন ধর্মের শ্রেষ্ঠ উপাসিকা। তার তপস্যাও অদ্ভুত—গৌরীও বুঝি এত পারতেন না। এই তপশ্চর্যার ফলে তিনি পেলেন পুত্র লাউসেনকে—পুত্রলাভ ও পুত্রকামনা ধর্মমঙ্গলের একটি মূল তথ্য। মন্ত্রী মহামদ এই লাউসেনের প্রাণনাশের জন্য মাতুল কংসের মতোই চক্রান্ত করতে লাগলেন। ধর্মের অনুগ্রহে তা সব ব্যর্থ হয়ে যায়, শিশু লাউসেন যৌবন প্রাপ্ত হলেন। লাউসেন তখন গৌড়ে চললেন। পথে তিনি বীরত্বের অনেক পরিচয় দিলেন—বাঘকে দমন করলেন, কুমীরকে পরাজিত করলেন, অসতী নারীর ছলাকলা চরিত্রবলে প্রতিহত করলেন, গণিকা নারীর হাত থেকে রক্ষা পেলেন, ইত্যাদি। গৌড়ে কিছুদিন যাপন করে অনেক পুরস্কার পেয়ে লাউসেন দেশে ফিরলেন; নিজের অনুচর কালু ডোম ও তার পত্নী লখ্যাকে সঙ্গে নিয়ে রাজ্য পত্তন করলেন ময়নাগড়ে। তখনো কিন্তু মহামদের চক্রান্ত ফুরোল না। তাঁর মন্ত্রণায় গৌড়েশ্বর লাউসেনকে পাঠালেন—কামরূপ-রাজকে পরাস্ত করতে। কিন্তু তাতে বিজয়ী হয়ে পত্নীলাভ হল লাউসেনের। তারপর গৌড়েশ্বর হরিপালের রাজকন্যা কানড়াকে বিবাহ করতে চান। কিন্তু কানড়াও একান্তভাবে লাউসেনের অনুরাগিণী, ধর্মরায়ের আশ্রিতা। লোহার গণ্ডার খড়্গে না কাটতে পারলে কেউ তাকে বিবাহ করতে পারবে না। সে পরীক্ষায় জয়ী হলেন লাউসেন। লাউসেনই কানড়াকে তখন পত্নীরূপে প্রাপ্ত হলেন—কানড়ার প্রেম ও সাহসেরই হল জয়। এর পরে আবার লাউসেনের ডাক পড়ল—এবার ইছাই ঘোষকে দমন করতে হবে। মা-বাপের ভয়ের সীমা নেই। কিন্তু অনেক যুদ্ধের পরে ধর্মের কৃপায় লাউসেনই জয়ী হলেন। আরো পরীক্ষা চলল তারপর—এবার মানুষের রাজ্য ছাড়িয়ে অসম্ভবের রাজ্যে পরীক্ষা হল। পূর্বের সূর্য পশ্চিমে তুলতে হবে লাউসেনকে। লাউসেন হাখণ্ডে গিয়ে তখন তপস্যায় বসলেন, ধর্মঠাকুরও তুষ্ট হয়ে পশ্চিমে সূর্যোদয় দেখালেন। এ অসম্ভব কাণ্ডের একমাত্র সাক্ষী রইল লাউসেনের ভক্ত হরিহর বাইতি। এদিকে মহামদ ময়নাগড় আক্রমণ করেছেন; কালু ডোম তা রক্ষা করছে। মহামদের নানা প্রলোভন সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত স্ত্রীর কথায় কালু ডোম রাজ্যরক্ষা করতে পণ করলে। সপুত্রক প্রাণ দিলে কালু ডোম, অন্তঃপুর রক্ষায় প্রাণ দিলে তার বীর-পত্নী। মহামদ রাজ্য অপহরণ করে

গৌড়েও লাউসেনকে বিনষ্ট করবার চেষ্টার ত্রুটি করলেন না। লাউসেনের পশ্চিমে সূর্যোদয় দর্শন তিনি মিথ্যা প্রমাণিত করতে চাইলেন—সাক্ষীকে মিথ্যা করে শূলে দিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুতেই তাঁর ষড়যন্ত্র সফল হল না। লাউসেন পশ্চিমে সূর্য উঠতে দেখেছেন—তা প্রমাণিত হল। এদিকে লাউসেন দেশে ফিরে এসে দেখলেন—রাজ্য বিধ্বস্ত। তিনি তখন ধর্মের স্তব করতে লাগলেন। ধর্মের অনুগ্রহে সবাই আবার বেঁচে উঠল—ধর্মরায়ের কৃপায় ময়নাগড়ের রাজা লাউসেন আবার রাজত্ব করতে লাগলেন।

এই নানা অসম্ভব উপাখ্যানের পিছনে কোনো ঐতিহাসিক সত্য আছে কিনা—গৌড়েশ্বর পাল রাজাদের কোনো সেনবংশীয় সামন্ত সত্যই ইছাই ঘোষ নামে কোনো সামন্তরাজকে দমন করে ময়নাগড়ে রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন কিনা,—এ হল ইতিহাসের দুঃসাধ্য এক সমস্যা। কাব্য হিসাবে এ হচ্ছে প্রধানত এক সামন্ত রাজত্বের কাহিনী। বাঙলা দেশের নিজস্ব রাজা-রাজড়াদের বীরত্ব-শূরত্বের কাহিনী বড় নেই। এ সাহিত্যে 'হিরোইক এজ' কোথায়? 'ধর্মমঙ্গলে'র অন্তর্গত লাউসেনের কাহিনীই হল বাঙালীর বীর রসের কাব্য, অবশ্য তা ভক্তবীরের কথা। নানা কাহিনীর মধ্যে লাউসেনের এই বীরত্ব ও বীর-চরিত্র একটি সূত্রই শুধু যোগায় নি, তাকে অনেকটা একত্রিত ও গ্রথিত করেও তুলেছে। একে 'রাঢ়ের জাতীয় কাব্য' না বলে রাঢ়ের বীরকাব্য বলা যেতে পারে,—জাতি বা নেশন শুধু রাঢ় নিয়ে নয়, গৌড়-বাঙলা নিয়ে, আর সেরূপ 'জাতীয়' সম্পদ এই রাঢ়ীয় কাব্য নয়। তবে লাউসেন অলৌকিকের আশীর্বাদভাজন হলেও ধীর, স্থির, বীর পুরুষ। রামচন্দ্রের ছায়াও তাঁর চরিত্রে ক্ষীণভাবে দেখা যায়। কিন্তু সে রাম অযোধ্যার রাম নয়, রাঢ়ীয় রাম—ভক্তি তাঁর শক্তি। আর অত্যুক্তি থাকলেও, মনে হয় রাজকন্যা কানড়া সত্যই বীরাঙ্গনা। এই সমগ্র কাহিনীর মধ্যে কোন চরিত্রকে যদি প্রতিনিধিস্থানীয় চরিত্র বলতে হয় তা হলে তা বলা উচিত কালু ডোম ও তার পত্নীকে, এবং হরিহর বাইতিকে। এই অসাধারণ সাহসী ডোম চরিত্রের উপর বীরত্বের রঙ্ ফলানো হলেও তা মাত্রাতিরিক্ত হয় নি। তার লোভ আছে, কিন্তু সত্যবোধও আছে। তাই ডোম ও ডোমের স্ত্রী মানুষ এবং সাহসী মানুষ রয়ে গিয়েছে। মঙ্গল-কাব্যের মধ্যে বাঙালী ভাবালুতার পরিবর্তে একটা সহজ লৌকিক বাস্তব-বোধের প্রমাণ দেখতে পাই এই জাতীয় লৌকিক চরিত্রের চিত্রণে। না হলে মধ্যযুগের মঙ্গল-কাব্যের

সব আখ্যানই অলৌকিকের আতিশয্যে আকীর্ণ। লৌকিক দেবকাহিনী সর্বদাই অলৌকিক, বিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত মানুষই কি অলৌকিক ছাড়া ধর্মের কথা ভাবতে পারে? এই অলৌকিকের কল্পনায় মঙ্গল-কাব্যেও যেখানে মানবীয় জীবনের আভাস আসে, মানব-সম্পর্কের ছায়া পড়ে, সেখানেই মানব-রসের প্রসাদে সেই সব আজগুবি উদ্ভট কাহিনী কোনো রূপে কাব্য-গ্রাহ্য হয়ে ওঠে। না হলে সে-সব কাহিনী ইতিহাসের বা সমাজতত্ত্বের গবেষণার বিষয়, বড় জোর শিক্ষিত মানুষের শুধু কৌতূহলের বিষয়, আর তাই সাহিত্য-সন্ধানীর পক্ষে ক্লান্তিকর। ধর্মঠাকুরের গানের মধ্যে এই মানব-রস ভাগ্যক্রমে ভালো করে এসে জুটেছে আরও একটি কারণে—ধর্ম-মঙ্গলের রচয়িতারা প্রত্যেকে নিজেদের কাহিনীও রেখে গিয়েছেন।

হয়তো সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বাঙালী কবির পক্ষে এরূপ দাবি করা একটা মামুলী প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে, তিনি বিশেষ দেবতার আদেশেই তাঁর মাহাত্ম্য গান রচনা করেছেন; এবং সেই উপলক্ষে শুধু বংশ-পরিচয় নয়, ব্যক্তিজীবন, দুর্ভাগ্য ও সৌভাগ্য-লাভের বর্ণনা, এসবও তখন থেকে একটা মামুলী কবি-প্রথায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। কিন্তু যতই তা মামুলী হোক, মানুষের কথা বলতে গেলে কবিকেও কিছু-না-কিছু মানুষই হয়ে যেতে হয়। তাই মঙ্গল-কাব্যের কবি-কাহিনীতেই আমাদেরও মানবীয় আগ্রহ অধিক জাগ্রত হয়, মানব-রসের তৃপ্তি মেলে, এবং সমসাময়িক কালের সমাজ-বিষয়েও কৌতূহল কতকটা নিবৃত্ত হয়। ধর্মমঙ্গলের প্রধানতম সম্পদ তাই বিভিন্ন লেখকের এই আত্মকাহিনী, বাঙ্লার তা 'আত্মজীবনী'-সাহিত্য।

ধর্মমঙ্গলের কবি-পরিচয়ঃ—ধর্মমঙ্গলের কাহিনীর আদিকবি বলে প্রসিদ্ধি ময়ূরভট্টের। তাঁর কাব্য অবশ্য পাওয়া যায় না। কিন্তু তাঁর এ খ্যাতির একটা কারণ উদ্ধার করা যায়। বাণভট্টের ভগ্নীপতি ময়ূরভট্ট সংস্কৃতে 'সূর্য-শতকে'র রচয়িতা; কিংবদন্তী আছে ময়ূরভট্ট সে কাব্য লিখে কুষ্ঠরোগ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন (দ্রঃ—ডঃ সেন, বাঃ সাঃ ইঃ ২১।৪)। এ থেকে অনুমান করা যায়—কি করে 'ধর্মমঙ্গলে'র আদিকবি বলে প্রসিদ্ধি হয়েছিল ময়ূরভট্টের। তারপরেই ধর্মমঙ্গলের প্রাচীন কবি বলে খ্যাতি আছে খেলারাম চক্রবর্তীর। তাঁর কাব্যের নাম 'গৌড়কাব্য'; কিন্তু তাও পাওয়া যায় নি। শ্রীশ্যাম পণ্ডিতের পুঁথির নাম ছিল 'নিরঞ্জন-মঙ্গল'; তা হয়তো পরে রূপরাম চক্রবর্তীর

কাব্যের প্রেরণা যুগিয়েছিল ; কিন্তু তাঁরও পুঁথি অখণ্ড অবস্থায় পাওয়া যায় না।

ধর্মমঙ্গলের কবিদের মধ্যে প্রথম কবি এখন রূপরাম চক্রবর্তী। এই কবি রাজমহলে শাহ্ শুজার নাম করেছেন ; তাঁর কাব্য হয়তো সপ্তদশ শতাব্দীর ঠিক মধ্যভাগে অথবা দ্বিতীয়ার্ধে রচিত (খ্রীঃ ১৬৪৯-৫৯)। রূপরামের পুঁথির অভাব নেই। তা সযত্নে মুদ্রিত ও সম্পাদিত হয়েছে (বর্ধমান সাহিত্য সভা থেকে শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন ও পঞ্চানন মণ্ডলের সম্পাদকতায়), আর রূপরাম এই সম্মান ও সমাদরের যোগ্য। তাঁর কাব্যে সরলতা আছে, বাহুল্য নেই ; তাঁর দৃষ্টিতে মানুষ মুছে গিয়ে শুধু ভক্তই অবশিষ্ট থাকে নি। অবশ্য রূপ-রামের আত্ম-পরিচয়েই এ পরিণতিরও কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। তাতে সহৃদয়তাও আছে, কৌতুকবোধও আছে। এই চরিত্রের জন্যও এই কাব্য পাঠ্য ; রূপরাম নিজেও একটি ছোটখাটো গল্প-উপন্যাসের নায়ক হতে পারতেন।

রূপরাম : বর্ধমানের দক্ষিণ প্রান্তে কাইতি গ্রামের নিকটে শ্রীরামপুরে রূপরামের জন্ম। ভালো ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের বংশে জন্মেছিলেন রূপরাম : পিতা ছিলেন শ্রীরাম চক্রবর্তী (?), মাতা দৈমন্তী (দময়ন্তী) ; জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রত্নেশ্বর, ছোট ভাই রামেশ্বর, 'প্রাণের সমান', ছোট দুই ভগ্নী সোনা ও হীরা। রূপরামের পিতার চতুষ্পাঠীতে বহু ছাত্র ছিল। রূপরামও সেখানে ব্যাকরণ এবং অভিধান পাঠ করেছিলেন। কিন্তু পিতার অবর্তমানে জ্যেষ্ঠ রত্নেশ্বর তাঁর প্রতি বিষম বিরূপও হয়ে ওঠে, কেন তা জানা যায় না। 'খাইতে-শুইতে বলে বাক্য জলন্ত আগুন।' রাগ করে তাই সহৃদয় প্রতিবেশীদের দেওয়া ধুতি আর নিজের খুঙ্গি-পুঁথি নিয়ে কবি বেরিয়ে পড়লেন পথে। ক্রোশ আড়াই দূরে রঘুনাথ ভট্টাচার্যের টোলে গিয়ে তিনি তাঁর ছাত্র হলেন। রূপরাম গুরুগৃহে আছেন, পণ্ডিত অধ্যাপকের ও মেধাবী শিষ্যের মধ্যে একটি মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে,—সুন্দর এ অংশেরও রচনা। কিন্তু শিষ্যের তর্কে শেষে গুরুও ক্রুদ্ধ হলেন। 'সূর্যের সমান গুরু পরম সুন্দর', রাগে তিনি খুব জলে উঠেছেন—এ চিত্রও যেন জীবন্ত (শিষ্যটি একটি হাড়ি মেয়ের প্রেমে মেতে উঠেছিলেন, এরূপও একটা কাহিনী আছে)। যাক্, রূপরাম আবার বেরুলেন নবদ্বীপের উদ্দেশ্যে। পথে হঠাৎ মায়ের মুখ তাঁর মনে পড়ল। রূপরাম বাড়ির দিকে চললেন। পলাশ বনের বিলের

কাছে ঠিক দুপুরে পথশ্রান্ত কবির দৃষ্টিভ্রম হল, দেখলেন দুটি শঙ্খচিল উড়ছে বিষ্ণুপদতলে। অদ্ভুত দৃশ্য দেখে দৌড়ুতে গিয়ে আছাড় খেলেন। পুঁথিপত্র পড়ল ছড়িয়ে। এমন সময়

একে শনিবার তায় দুপুর বেলা।
সম্মুখে দণ্ডাইল ধর্ম গলে চন্দ্রমালা॥

তাঁর গলায় সুবর্ণ উপবীত, ব্রাহ্মণের রূপ। ধর্মঠাকুর (যথা-প্রয়োজন) আদেশ দিলেন—আর পুঁথিপত্রে কাজ নেই, ধর্মের গীত বারমতি গাও, 'বারদিন গাইবে গীত আসর ভিতর।'

যে বোল বলিবে তুমি সে হবে গীত।
সদাই গাহিবে গুণ আমার চরিত॥

রূপরাম কিন্তু ভয়ে গৃহের দিকে ছুটলেন। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় এক পেট জল খেলেন শাখারি-পুকুরে নেমে। তারপরে গৃহদ্বারে উপস্থিত হলেন, আশা—দাদা না দেখতেই 'প্রণাম করিব গিয়া মায়ের চরণে'। ছোট দুই বোন আনন্দ-কোলাহল জুড়ে দিল, 'রূপরাম দাদা আইল খুজি-পুঁথি লয়্যা'। কিন্তু সেই কলরব শুনে রত্নেশ্বর এসে উপস্থিত হল—রূপরামকে দেখে সে আগুন। পড়তে গিয়েও আবার ফিরে এসেছে রূপরাম! রূপরাম তক্ষুনি ভয়ে পালালেন—'জননী সহিত নাগ্রি হল দরশন।' দিন তিন অনাহারে চলে তিনি গিয়ে পৌছলেন শনিঘাটে, ধর্মঠাকুরের মায়ায় কিন্তু ভাজা চিঁড়ে উড়ে গেল। আবার জল পান করেই কবি পেট ভরালেন। তারপর দীঘনগরে তাঁতীদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণের সংবাদ শুনে ক্ষুধায় তৃষ্ণায় সেখানে গেলেন। ফলার করলেন—কিন্তু ধর্মঠাকুর খৈ দিলেন না। ঘুরে ঘুরে শেষে রূপরাম এড়াইল গ্রামে গিয়ে উঠলেন। সেখানকার ভূম্যধিকারী ছিলেন গণেশ। ধর্মঠাকুর ইতিপূর্বে তাঁকেও স্বপ্নে দর্শন দিয়ে কবির বিষয়ে আদেশ দিয়ে রেখেছিলেন। তাই রাজা গণেশ রূপরামকে সংবর্ধনাও করলেন, ধর্মের গান রচনা করবারও অবকাশ কবিকে করে দিলেন।

রূপরামের এই আত্মবিবরণী নিয়ে উচ্ছ্বসিত হবার কারণ নেই, কিন্তু খুশী হতে হয়। কি এই বিবরণীতে, কি লাউসেনের কাহিনীতে, রূপরাম আশ্চর্য রকমের স্বচ্ছন্দ বাস্তবদৃষ্টি নিয়ে মানব-কাহিনী বলেছেন। যে কালে ভক্তির আর ঠাকুরের নামে মানুষকে ভাসিয়ে নেওয়াই নিয়ম, সেকালে রূপ-রাম এই দেবমাহাত্ম্য কীর্তন করতে গিয়েও মানুষকে বিস্মৃত হন নি, রসবোধও

হারান নি। "প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের মধ্যে রূপরামের কাব্য বাস্তবতার জন্ত অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করিতে পারে।" (ডঃ সেন—বাঃ সাঃ কঃ)

রামদাস আদক : রূপরামের পরে ধর্মমঙ্গলের কবি রামদাস আদকের জন্ম হয়ে থাকবে। তাঁর কাব্যের রচনাকাল পাওয়া যায় খ্রীঃ ১৬৬২। তিনিও আত্মপরিচয় লিখছেন, আর সে পরিচয়-কথায় রূপরামের কাহিনীর প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়। অথবা, আত্ম-পরিচয় দান ও কাব্য-রচনার কারণ হিসাবে দেবদেবীর আদেশ বা স্বপ্নাদেশ লাভ করা একটা গতানুগতিক কৌশল বা কৈফিয়ৎ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু আর একটা কথাও এই সঙ্গে বুঝতে পারি—সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগের এই ধর্মমঙ্গলের রচয়িতা জীবনের সহজ কথাগুলি সহজভাবে বলতে কোনোই বাধা দেখছেন না।

রামদাসের এই আত্ম-জীবনীও উল্লেখযোগ্য। রামদাস জাতে কৈবর্ত, পিতার নাম রঘুনন্দন। তাদের বাড়ী ছিল হুগলী জেলার ভুরশুট পরগণার হায়াৎপুর গ্রামে। পৌষের কিস্তি দিতে না পারায় পরগণার জমিদারের কর্মচারী রামদাসকে কয়েদ করে। কোনো রকমে একবার মুক্তি পেয়েই রামদাস গ্রাম ছেড়ে পালালেন মামার বাড়ী। পথে দেখলেন মাথার উপরে শঙ্খচিল; বিনিসুতোয় ফুল মালার আকারে গাঁথা হয়ে গেল; বিস্ময়-বিমূঢ় কবি আবার দেখলেন, ঘোড়ায় চড়ে সিপাহী আসছে সম্মুখে। ভয়ে তাঁর প্রাণ উড়ে যায়,—

> দেশে খাজনার ভয়ে পলাইয়া যাই।
> বিদেশে বেগারী বুঝি ধরিল সিপাই॥

দেশের সাধারণ মানুষের অবস্থাটা এসব কথা থেকে বুঝতে কষ্ট হয় না। রামদাসের অবশ্য সৌভাগ্য। সিপাহী তাঁকে পাকড়াল, মাথায় মোট চাপিয়ে দিল, তম্বি করতে লাগল। তিনি ভয়ে চোখ বুজলেন একবার; চোখ খুলতেই দেখলেন কেউ কোথাও নেই—সিপাহী-বেশী ধর্ম অন্তর্হিত হয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে রামদাসের এল জ্বর। দুঃখে কষ্টে পথের পাশে বসে যখন তিনি কাঁদছেন তখন অবশেষে ধর্ম এসে দেখা দিলেন ব্রাহ্মণের বেশে, আর যথা-নিয়মে তাঁকে আদেশ করলেন ধর্মের গান লিখতে! রামদাস কৈবর্তের ছেলে, সরল ভাবে বলছেন,—

> পাঠ করি নাই প্রভু চঞ্চল হইয়া।
> গোধন চরাই মাঠে রাখাল লইয়া॥

তাতে অবশ্য যায় আসে না। ধর্মঠাকুর বলে যান—'আজি হৈতে রামদাস কবিবর তুমি।'

সীতারাম দাস: ধর্মমঙ্গলের তৃতীয় বিখ্যাত কবি সীতারাম দাস—তিনি 'মনসামঙ্গল'ও লিখেছেন। তাঁরও এ ধারার অনুসরণে আত্ম-পরিচয় আছে। জাতিতে তাঁরা কায়স্থ; বর্ধমানের খণ্ডঘোষের সুখসাগর গ্রামে ছিল বাড়ি। প্রথম গৃহদেবতা গজলক্ষ্মী সীতারামকে ধর্মের কীর্তন করতে স্বপ্নাদেশ দিয়েছিলেন। কিছুকাল গেল। ইতিমধ্যে মহাসিংহ এসে সাহাপুর গ্রাম লুঠ করে পুড়িয়ে দিয়ে গেল। সাধারণ মানুষের সর্বনাশ হল। কবিদেরও ঘর-দুয়ার গেল। কবির খুল্লতাত ভাই তাঁকে শ্যাওড়া বনে পাঠাল কাঠ আনতে। সীতারাম প্রভাতে বের হতে না হতেই নানা লক্ষণ দেখা দিতে লাগল—"শঙ্খচিল মাথায় উড়িছে ঘনেঘন", তাও দেখতে পেলেন। বনের মুখে গ্রামে বসে তিনি তামাক খাচ্ছেন, এমন সময় একজন লোক দৌড়ে এসে বললে—ওপথে যেয়ো না, বেগার ধরে নিচ্ছে সিপাহীরা। ভয় পেলেও সীতারাম বনে গেলেন—কাঠ কাটতে হবে যে। বৈশাখ মাস, বন কুরচির ফুলে ভরা; বড় সুন্দর। কিন্তু পরক্ষণেই ত্রাস এল কবির প্রাণে—সামনেই দেখলেন ঘোড়া! নিশ্চয়ই নিকটে সিপাহী আছে, কবিকে বেগার ধরবে। সীতারাম অমনি ছুটলেন—পিছনে ঝড়ের শব্দে মনে করলেন বুঝি ঘোড়ার খুরের শব্দ! ছুটে ছুটে দেখা পেলেন এক সন্ন্যাসীর। সন্ন্যাসী আশ্বাস দিয়ে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে চললেন। একটু পরেই সীতারামের নিকট 'জটিল ঠাকুর' নিজের পরিচয়ও দিলেন। তিনি 'নিরঞ্জন নিরাকার'। ইন্দাস গ্রামের 'নারায়ণ পণ্ডিতের ঘরে আমার বিশ্রাম'—এখন 'আমার মঙ্গল গীত কর গিয়া তুমি।' সীতারাম অত সহজে তাতে স্বীকৃত হলেন না। তিনি আপত্তি করলেন—আমি ছেলেমানুষ, কিই বা আমার বুদ্ধি। ঠাকুর ভরসা দিলে সীতারাম তখন আবার আপত্তি করলেন,—হয়তো জাত যাবার ভয়ে,—পরকালে তাঁর কি হবে। ধর্মঠাকুর ভরসা দিলেন 'পরিণামে মোর পদ পাবে অনায়াসে।' এভাবে 'ডাবলি ইনশিওরড্' হলেন সীতারাম। কাঠ না নিয়ে তিনি ঘরে ফিরে চণ্ডীমণ্ডপে শুলেন, গায়ে জ্বর। আবার মা গজলক্ষ্মী স্বপ্নে বললেন—গীত লেখো গিয়ে। সীতারাম কিছুদিন বাউলের মতো হয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়ালেন। ইন্দাসে গিয়ে উঠলেন নারায়ণ পণ্ডিতের গৃহে। বাঁকুড়া রায় ধর্মঠাকুরের তিনি সেবায়েত। সেখানেই প্রথম আরম্ভ হল সীতারামের গীত-

রচনা। এদিকে খবর পেয়ে খুল্লতাতও তাঁকে নিয়ে এল নিজেদের বাড়ি—সেখানেই 'বারমতি করিলাম সাঙ্গ চল্লিশ দিনে।' সীতারাম মানুষটি সরল হলেও সৌন্দর্যবোধও আছে—বৈশাখের বন ও ফুল দেখে মুগ্ধ হন, আর সে বর্ণনা মামুলী কবি-বর্ণনা নয়।

সীতারাম দাস যখন ধর্মমঙ্গল লেখেন তখন খ্রীঃ ১৬৯৮; অব্দের গণনায় সপ্তদশ শতাব্দ শেষ হচ্ছে। অবিচ্ছেদ্য ভাবেই অবশ্য অষ্টাদশ শতকে চলবে ধর্মমঙ্গল রচনা। তখন আমরা ধর্মমঙ্গলের আরও বিখ্যাত কবিদের সাক্ষাৎ পাব—ঘনরাম চক্রবর্তী, মাণিকরাম গাঙ্গুলী, সহদেব চক্রবর্তী প্রভৃতি। কিন্তু সপ্তদশ শতকের সেই কবিদের কাব্য ও আত্মকাহিনী বলবার ভঙ্গী থেকে যা বুঝতে পারি এখন তা হচ্ছে এই—কবিদেব কবি-দৃষ্টিতে একটা পরিবর্তন এসে যাচ্ছে। দেবমাহাত্ম্য নিয়েই তখনো কাব্য রচনা হচ্ছে বটে, ধর্মমঙ্গলের এই কবিরাও ভক্তি ও অলৌকিকত্বের দোহাই দিচ্ছেন সত্য, কিন্তু আর-একটা জিনিসও এসে যাচ্ছে—মানুষের সহজ সরল জীবনের কথা, তা বলবার আগ্রহ, মানুষকে সেই মানুষ হিসাবেও দেখবার মতো দৃষ্টির উন্মেষ। বৈষ্ণব ভক্ত-জীবনী গ্রন্থের সঙ্গে ধর্মঠাকুরের ভক্ত এসব কবির আত্ম-কাহিনীর অংশ তুলনা করলে মনে হয়—এদের জগৎটা শুধু প্রাকৃত-জনের জগৎ নয়, অনেক সহজ ও বাস্তব জগৎ। হয়তো প্রাকৃত জীবন ও প্রাকৃত দেবতার কাহিনী বলেই এত বাস্তব চেতনা সম্ভব হয়েছে। কারণ সাধারণ মানুষের সাধারণ জীবনযাত্রা ও দেব-কাহিনী—অনেক সময়ে স্থূল হলেও—আবার অনেক বেশি স্বচ্ছন্দ। আমরা তা দেখি—ধর্মের আখ্যানে, নানা মঙ্গলকাব্যে, শিব-বিষয়ক গীত, ছড়া ও কাহিনী থেকে।

শিবমঙ্গল

বেদের ঝড়ঝঞ্ঝার দেবতা ছিলেন রুদ্র, আর উপনিষদের দেবতা ছিলেন উমা হৈমবতী; অনেক আগেই তাঁরা মঙ্গলের দেবতা শিবে ও দেব-গৃহিণী ও দেব-জননী পার্বতীতে পরিণত হয়ে গিয়েছিলেন। দ্রাবিড়ভাষীদের কোন্ তাম্রবর্ণ (শম্ভু) ও রক্তবর্ণ (শিবন্) ধ্বংসের দেবতা; মোহেন্-জো-দড়োর প্রাগ্-বৈদিক লিঙ্গেশ্বর ও যোগীশ্বর দেবতা, বৌদ্ধদের ধ্যানী বুদ্ধের শান্ত স্থির আদর্শ এবং প্রাচীন জাতি-উপজাতি ও জন-সমাজের আরও কত দেবতার কল্পনা ও কাহিনী যে পৌরাণিক শিবের পরিকল্পনায় এসে মিশেছিল, সে আলোচনা অনাবশ্যক; কারণ তা বাঙলা সাহিত্যের জন্মের পূর্ববর্তী কথা।

সঙ্গত-অসঙ্গত,অসামঞ্জস্য-ভরা কথা ও কাহিনীকে আপনার মধ্যে গ্রহণ করতে সক্ষম বলেই যেন এ দেবতা নীলকণ্ঠ। দ্বন্দ্বময় জগৎ ও জীবনের নানা দ্বন্দ্বের প্রতিফলন তাই দেখা যায় এই দেব-চরিত্রে। অথচ সেই সঙ্গেই এই ইঙ্গিতও আছে যে, তিনি দ্বন্দ্বের অতীত, দেবাদিদেব, যোগী মহেশ্বর। শিব সংসার-ত্যাগী মহাবোধি নন, সংসারী হয়েও পরম জ্ঞানী! বাঙালী উচ্চস্তরের মনে এই কৈলাসের শিব—গৃহস্থ দেবতার ও কল্যাণের দেবতার আদর্শ—যতই প্রভাব বিস্তার করুন, বাঙালী সাধারণ মানুষের কাছে এই আশুতোষ দেবতা আরও নানাভাবে তাদের ঘরের মানুষ হয়ে উঠতে লাগলেন। তাঁর সে প্রকাশের ইতিহাস আছে বাঙ্‌লার লোক-গীতে এবং ধর্মমঙ্গল ও নানা মঙ্গল-কাব্যের শিব ঠাকুরের ছড়ায়।

দেশের অধিকাংশ সাধারণ মানুষ কৃষক, তাদের উৎপাদন-বৃদ্ধির আদি দেবতাও ছিলেন কৃষকরূপে কল্পিত। সামাজিক আপোষ-রক্ষার সূত্রে পৌরাণিক হিন্দুর সেই দেবাদিদেব এই কৃষক-দেবতার সঙ্গে এক হয়ে গেলেন। কৃষকের বাস্তব জীবন-যাত্রার অনুরূপেই গড়ে ওঠে কৃষকের সংস্কার ও কল্পনা। কৃষক-শিবের চরিত্রও তাই রচিত হতে থাকে বাঙ্‌লার প্রাকৃত-জনের জীবনাদর্শে; সঙ্গে সঙ্গে পার্বতীর চরিত্র ও আচরণও ঢালাই হতে থাকে এই কৃষক-দেবতার চরিত্রের সঙ্গে খাপ খাইয়ে। এই শিথিল চরিত্রাদর্শ নাথশৈব সম্প্রদায়ের শিব-পার্বতীর চরিত্রকেও প্রভাবিত করেছে কিনা কে জানে। বাঙ্‌লা দেশের অনেক প্রাচীন সংস্কার ও কল্পনা কিন্তু আশ্রয় পেয়ে গেল নিম্নতম স্তরের এই বাঙালী শিবের কল্পনায় ও চরিত্রে। পৌরাণিক শিব-গৌরীর মর্যাদা হয়তো তাতে বাড়ল না, কিন্তু উপায় কি? লোক-জীবনের শিবের ছড়ায় কথায় রয়েছে জন-সমাজের শিবের প্রধান পরিচয়।

'শিবের গীতে'র এই শিব কৃষক। একটু অলস কৃষক, কৃষিকার্যে উদাসীন, তাঁর সংসারে অভাব লেগেই আছে। নিম্নশ্রেণীকে পরোক্ষে অযোগ্য প্রমাণ করার এও একটা উচ্চবর্গীয় ধূর্ত প্রয়াস কিনা কে জানে? ভিক্ষাবৃত্তিতে এই শিবঠাকুরের লজ্জা নেই—ভিক্ষা তো বৌদ্ধ শ্রমণ ও হিন্দু ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসী যোগীদের একটা ব্রত; কৃষক হলেই কি তার ভিক্ষা করতে নেই? অকিঞ্চন, অনাসক্ত পৌরাণিক শিবকে ভিক্ষুক শিবে পরিণত করতে তাই বাঙালী জনসমাজের তখন একটুও বাধে নি। কিন্তু তাদের শিব কোচ-পাড়ায়

কোচনীর সঙ্গে প্রণয় করতেও ব্যস্ত। তাদের পার্বতীও কম নন; মোহিনী বাগ্‌দিনী বেশে ঠাকুরটিকে ঘাট মানিয়ে তবে তিনি ছাড়েন। এই হল শিবের এক রূপ।

কালক্রমে বাঙালী শিব নিম্নতম স্তর থেকে মধ্যস্তরে প্রোমোশন পেলেন। পূর্বযুগের উচ্চবর্ণের একটি অংশ ছিল ব্রাহ্মণ, করণ রাজপুরুষ, বৈশ্য। উচ্চবর্ণের হলেও তারা সবাই উচ্চবর্গের নয়। তুর্ক বিজয়ের পরে এই বৃত্তিজীবী উচ্চবর্ণ এবং ক্ষমতাচ্যুত হিন্দু উচ্চস্তরের অন্য একটা অংশ, এই নিয়ে বাঙালী হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গোড়াপত্তন হচ্ছিল—তা বোঝা যায়। তারাই ছিল বাঙ্‌লা সাহিত্যের প্রধান ভিত্তি, লেখক ও শ্রোতা। পৌরাণিক ভাবের পালিশ পঞ্চদশ শতক থেকে বাড়তে থাকে, কৃষক শিবও ততই এই মধ্যবিত্ত সংসারের ভালমানুষ কর্তাটি হয়ে ওঠেন। পার্বতী হয়ে ওঠেন আবার অভাবের সংসারের গৃহিণী—রেঁধে-বেড়ে স্বামীপুত্রকে খাইয়ে পরিতৃপ্ত। অথচ অভাবের সংসারে কোথা থেকে আসে খাদ্যব্যঞ্জন, স্বামীটি তার খোঁজও রাখেন না। কোঁদল বাধে তাই হর-পার্বতীতে। কখনো সে কোঁদল বাধে নারদের চক্রান্তে—স্বামীর কাছে এক জোড়া শাঁখা চান গৌরী সাধ করে, শিব ঠাকুরের যোগ্যতা নেই, তা যোগাবেন কি করে? তাই চটে যান উল্টে দেবতাটি। দেবীও অমনি রাগ করেন, চলেন বাপের বাড়ী। তারপরে বাঙালী মধ্যবিত্ত সংসারে যা ঘটে সেই ভাবেই মীমাংসা হয় দরিদ্র মধ্যবিত্তের সেই দেব-দম্পতির এই অতি-পরিচিত ও অতি-সহজ কলহ। সত্যই মানতে হয় এও পার্বতী-পরমেশ্বরের মাহাত্ম্য গান নয়। এ হচ্ছে আমাদের বাঙালী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের অভাবে-ঘেরা সুখ-দুঃখভরা সংসারের কথা। তাই মহিষমর্দিনী পার্বতী হয়ে ওঠেন আমাদের কন্যা—যিনি বৎসরে তিন দিনের জন্য পিত্রালয়ে আসেন।—সব দেবতার কথাই আসলে মানুষের কথা। তবে কোন্ স্তরের মানুষের আর মানুষের কোন্ জীবনাংশের কথা, তার উপরই নির্ভর করে সেই দেব-কাহিনীর মূল্য।

নিম্নস্তর, মধ্যস্তর ছাড়া সমাজের বাহিরের কোঠায় শৈব নাথ গুরুদের শিবও আছেন, পার্বতীও আছেন। লৌকিক শিবেরই আর এক রূপ তাতে দেখি। সেখানে শিব হলেন মহাগুরু, সাক্ষাৎ দিগম্বর, দুই নারী নিয়ে তিনি কেলি করেন। সেখানে গোরখনাথের পরীক্ষা করতে গিয়ে পার্বতী নিজেই মীননাথের মত সিদ্ধার শক্তিতে বাঁধা পড়েন, রাক্ষসী হয়ে থাকেন। তখন শিব তাঁকে খুঁজতে বের হন, উদ্ধার করেন, গোরখনাথকেও শিব পরীক্ষা

করতে এগিয়ে যান ;—এ ধরনের অজস্র কাহিনীও এসেছে এই তন্ত্রের গুরু শিবের মধ্যে। ধর্মঠাকুরের গানেও শিবের নামের এসব লৌকিক কথা ও কাহিনী এসে মিশেছে। আবার পশুপতি শিব আদিম ব্যাধ-নিষাদের দেবতারূপেও দেখা দেন মাঝে মাঝে। এরূপে উচ্চ, মধ্য, নিম্ন এবং জাতি-উপজাতি ও তান্ত্রিক, নাথসিদ্ধা প্রভৃতি নানা শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের ধারণানুযায়ী বাঙালী শিব আরও নতুন নতুন সত্তাও লাভ করেছেন ; পৌরাণিক হর-গৌরী, দুর্গা, ভগবতী প্রভৃতি মধুর ও মহৎ পরিকল্পনাও তার পাশে সামঞ্জস্যহীন ভাবেই অক্ষুণ্ণ রয়েছে। এখানেও সমন্বয় হয় নি, হয়েছে নানা স্তরের দেব-কল্পনার সংমিশ্রণ।

মঙ্গল-কাব্যের শিবের গীতে পাওয়া যায় শিব-পার্বতীর সেই লৌকিক ও সাধারণ সত্তার পরিচয়। গাজনে এই লৌকিক শিব-পার্বতীকেই দেখা যায়, ধর্মপুরাণেও এই রূপই বর্ণিত। কিন্তু শিবায়নে বা শিবমঙ্গলে এই শিবের থেকে অধিকতর দেখা যায় পৌরাণিক হর-গৌরীর প্রভাব। শিবের গান সুপ্রাচীন—'চৈতন্য-ভাগবতে' দেখি মহাপ্রভু তা শুনে শঙ্কর-ভাবাপন্ন হয়েছেন। গাজনের গানও নিশ্চয়ই ধারাবাহিক ভাবে অনেকদিন থেকে চলে এসেছে। কিন্তু এসব গান লোক-সাহিত্যের সীমা পার হয়ে সাহিত্যের গণ্ডিতে প্রবেশ করতে পারে নি—পারলেও তার প্রমাণ বড় কম। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কিন্তু দেখা যায় চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মপুরাণ বা শৈব নাথদের (গোরখ-নাথের কাহিনী) থেকে পৃথক করে শুধু শিবকে নিয়ে শিবায়ন রচনা আরম্ভ হয়েছে।

কাব্য-পরিচয় ঃ শিবমঙ্গলের প্রথম কাব্য হল দ্বিজ রতিদেবের 'মৃগলুব্ধ' —১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দের রচনা। এ কাব্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে পাওয়া গিয়েছে, রতিদেব নিজ পরিচয় দিতে কার্পণ্য করেন নি ঃ

> পিতা গোপীনাথ মাতা মধুমতী (বসুমতী ?)
> জন্মস্থল সুচক্রদণ্ডী চক্রশালা খ্যাতি।

সুচক্রদণ্ডী চট্টগ্রামের পটিয়া থানার সংলগ্ন একটি গ্রাম। চট্টগ্রামেই শৈব মহাতীর্থ রয়েছে চন্দ্রনাথ ও স্বয়ম্ভুনাথ। আর একটিমাত্র চট্টগ্রামেই বৌদ্ধধর্ম জীবন্ত। 'মৃগলুব্ধে'র কাহিনী হচ্ছে মৃগ ও লুব্ধের (ব্যাধের) কাহিনী, সে প্রসঙ্গে শিব-চতুর্দশীর মাহাত্ম্যকীর্তন। প্রসঙ্গক্রমে হরিনামের মাহাত্ম্য, রামের মহিমা সবই উপদিষ্ট হয়েছে।

চট্টগ্রামেই প্রায় অনুরূপ আর একখানা কাব্যও পাওয়া গিয়েছিল, রাম-রাজার 'মৃগলুব্ধ'-সংবাদ। এ কবি কিন্তু নিজের পরিচয় রেখে যান নি। মৌঃ আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ তাঁকে মগ বলেই অনুমান করতেন। রতি-দেবের ও এই রামরাজার লেখার তুলনা করে তিনি বলেন: "রতিদেবের রচনা প্রায় সরল ও বিশুদ্ধ, রামরাজার রচনা অপেক্ষাকৃত জটিল ও অস্পষ্ট।" কিন্তু উপভোগ করবার মত জিনিস রতিদেবের প্রায় ৮ শও পয়ার নাচাড়ি শ্লোকের মধ্যেই বা কি আছে?

সপ্তদশ শতাব্দীর এই শেষ দিকে পশ্চিম বাঙলায়ও 'শিবায়ন' রচনা করছিলেন কবিচন্দ্র নাম বা উপাধির এক কবি। রামকৃষ্ণ রায় বা দাসের 'শিবায়ন' সুবৃহৎ কাব্য—১৬৮৪ খ্রীষ্টাব্দের রচনা। এ কাব্য মুদ্রিত হয় নি। প্রায় ৮০০০ পদে তা সম্পূর্ণ। কবি নিজ পরিচয় রেখে গিয়েছেন। হাওড়া জেলার রসপুর গ্রামে তাঁর বাড়ি ছিল। তিনি দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ, নিজেকে তিনিও 'কবিচন্দ্র' বলে উল্লেখ করেছেন। এ কাব্যে পঁচিশ পালায় সৃষ্টি-পত্তন থেকে আরম্ভ করে আছে দক্ষযজ্ঞ, উমার সম্পূর্ণ উপাখ্যান, গঙ্গা-ত্রিপুর কাহিনী, দুর্গার কোন্দল, উষা-অনিরুদ্ধ কথা প্রভৃতি পৌরাণিক কাহিনী। বিষয়বুদ্ধিহীন, স্বামীর হাতে পড়লে বাঙালী স্ত্রীর যে দুঃখে ভুগতে হয়, তা বেশ ফুটেছে 'দুর্গার কোন্দলে'। কবির ভাষাও 'মঙ্গল-কাব্যের গৌরব যুগের ভাষা'।

'শিবায়নে'র পাঠযোগ্য শ্রেষ্ঠ কাহিনী রচনা করেন রামেশ্বর চক্রবর্তী—কিন্তু সে অষ্টাদশ শতাব্দীতে, যদিও তা সে-শতাব্দীর গোড়ার দিকে (১৭১০-১১) রচিত। এ কাব্য আট পালার কাহিনী, 'অষ্টমঙ্গলা'। আর তাতে পৌরাণিক কাহিনী ছাড়াও শিবের চাষ-কাহিনী পাওয়া যায়, অবশ্য তা ধর্মপুরাণাদি থেকেই সংগৃহীত। রামেশ্বরের কাব্যের আসল নাম 'শিব-সংকীর্তন'। মেদিনীপুরে তা প্রচলিত, সেখানে 'শিবায়ন' বলেই এ গ্রন্থ পরিচিত। মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল থেকে এসে কবি কর্ণগড়ের ভৌমিক, মুর্শিদকুলি খাঁর দেওয়ান, যশোবন্ত সিংএর দয়ায় কর্ণগড় অঞ্চলে এসে বাস করেন। রামেশ্বরের পাণ্ডিত্য যথেষ্ট, গর্বও কম নয়:

যশোবন্ত সিংহে দয়া কর হর-বধূ!
রচে রাম অক্ষরে অক্ষরে ঝরে মধু।

এ মধু বটতলার ছাপানো পুঁথি থেকে গৌড়জন পান করেছে। কিন্তু

সে পৌরাণিক অংশের বর্ণনার জন্য নয়, বরং দেবত্ববর্জিত সেই দরিদ্র শিব ঠাকুরের পারিবারিক চিত্রের জন্য, বিশেষ করে সে সব অংশের জন্য যেখানে গৌরী ভিক্ষালব্ধ অন্ন রন্ধন করে স্বামীপুত্রকে পরিবেশন করছেন, আর 'দুই সুতে সপ্তমুখ, পঞ্চমুখ পতি' সেই অন্ন-ব্যঞ্জন দিতে না দিতে শেষ করছেন।

তিন জনে বার মুখ পাঁচ হাতে খায়।
এই দিতে এই নেই হাঁড়ি পানে চায়॥

শুধু দারিদ্র্যের বর্ণনা নয় (আশুতোষ ভট্টাচার্যের 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস' দ্রষ্টব্য), কারণ,

দেখি দেখি পদ্মাবতী বসি একপাশে।
বদনে বসন দিয়া মন্দ মন্দ হাসে॥

এ কালে পাঠকও সঙ্গে সঙ্গে তাই হাসে—সহজ কৌতুকে। এ কাব্যেরই অন্য অংশে আছে পার্বতীর শূন্য হাতে সেই শঙ্খপরার সাধ, আর তাতে স্বামী-স্ত্রীর কলহ। সে জিনিসটিও দারিদ্র্যেরই ছবি, কিন্তু কমেডির হাস্যচ্ছটা তার মধ্যেও উঁকি দিচ্ছে না কি? আমরা অষ্টাদশ শতকে এসেছি, দেবতাদের নিয়ে এখন কৌতুকও বোধ করতে চাই। একারণেই নিম্নমধ্যবিত্ত সংসারের শিব-ঠাকুরটির জন্য রামেশ্বরের 'শিবায়ন' এখনো অংশবিশেষে মধুক্ষরা। না হলে সাধারণ ভাবে শিবায়ন-কাব্যসমূহ নীরস এবং কাব্য হিসাবে তুচ্ছ। বাঙালীর সমাজতত্ত্বের দিক থেকে শিব-কাহিনী যত গুরুতর, বাঙলা সাহিত্যের দিক থেকে শিবায়ন বা শিবমঙ্গলের ধারা তেমনি বৈশিষ্ট্যবর্জিত।

অন্যান্য মঙ্গল-কাব্য

সপ্তদশ শতাব্দী শেষ হবার পূর্বে আরও অনেক দেব-দেবীর মাহাত্ম্য রচিত হতে আরম্ভ হচ্ছিল, তা 'মঙ্গলকাব্যে'র ছাঁচেই ঢালাই করা। এর মধ্যে নিমতা গ্রামের (২৪ পরগণার) কবি কৃষ্ণরাম দাসের একখানা কাব্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কৃষ্ণদাস 'শীতলামঙ্গল' 'ষষ্ঠীমঙ্গল'ও লিখেছিলেন, কিন্তু তাঁর রচিত 'রায়মঙ্গল'কে গুরুত্ব দিতে হয় বেশি।

'রায়মঙ্গল' হচ্ছে ব্যাঘ্রের দেবতা দক্ষিণরায়ের কথা। সুন্দর বনের সান্নিধ্যে তখনকার দিনে ব্যাঘ্র যদি দেবতার বাহন না হত ও দেব-মাহাত্ম্য না লাভ করত, তা হলে আশ্চর্য হবার কথা ছিল। দক্ষিণরায় সেই বাঘের দেবতা।

দক্ষিণরায়ের কথা আগেই চলিত ছিল। অনেক কাহিনীর মতোই এ কাহিনী-তেও সদাগর আছে আর সাগর মধ্যে পরীক্ষার্থ দেবীর মায়া-প্রদর্শনও আছে। সদাগর দেবদত্তের বিদেশে কারাবাসও হল। তার অন্বেষণে পুত্র পুষ্পদত্ত গেল বনে কাঠ চিরে তার নৌকা গঠন করাবে। দক্ষিণরায়ের গাছে হাত দিতেই রায়ের বাঘরা কাঠুরেদের মেরে ফেলল। অবশ্য দক্ষিণরায়ের পূজা দিতে সব ঠিক হয়ে গেল। সদাগর-পুত্র তারপর ডিঙা ভাসাল। ডিঙা এসে পৌছল মুসলমান পীর বড় খাঁ গাজীর মোকামে ; বড় খাঁ গাজীকে পূজা না দিয়েই যাচ্ছিল পুষ্পদত্ত। আর যায় কোথায়? গাজীর সঙ্গে যুদ্ধ বেধে গেল দক্ষিণরায়ের ; দুই দলেরই সৈন্য বাঘ। বিষম যুদ্ধ! সৃষ্টি বুঝি শেষে রসাতলে যায়! তখন পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ অর্ধ-পয়গম্বর রূপে আবির্ভূত হয়ে একটা আপোষ রফা করে দিলেন। টিকি আর টুপি তাঁর মাথায়—আর 'কোরাণ পুরাণ দুই হাতে'। ভগবান্ এই স্থির করে দিলেন, এই পথে যারা যাবে বড় খাঁ গাজীর মোকামেও তাদের পূজা দিতে হবে। তাছাড়া এদিকে বাঘের দেবতা দক্ষিণরায়ের এলাকা থাকবে, কিন্তু কুমীরের দেবতা কালুরায়েরও থান হবে হিজলীতে। বেশ বোঝা যায় নিম্নস্তরের হিন্দু ও মুসলমান অত্যন্ত সহজ-ভাবে একটা বোঝাপড়া করে নিয়েছে (ধর্মমঙ্গলের 'বড় জালালি'তেও তা মনে হয়)। উভয়েই উভয়ের দেবতা ও পীরদের মেনে নিয়েছে, উভয়কেই তারা পূজা দেয়।

সাধারণ মানুষের এই স্বাভাবিক জীবনযাত্রার সূত্রে এই জাতীয় মিলনের পথ অনেক আগে সহজ হয়ে উঠেছিল—উপরতলার শাসক-সমাজেও এ মিলন সহজ হয়ে আসছিল। ষোড়শ শতাব্দী থেকে নানা বাধা সত্ত্বেও,—হুসেন শাহ, নুসরৎ শাহ বা তাঁদের লস্কর পরাগল খাঁর মতো মুসলমান শাসক-গোষ্ঠী তা সহজতর করে তোলেন। শাসিত উচ্চবর্গের হিন্দুর আত্মরক্ষার প্রয়াস, সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ ও বর্জন-নীতি অনেকাংশে নিরর্থক হয়ে উঠতে থাকে। বাঙ্‌লা সাহিত্যের ক্ষেত্রে মুসলমান শাসক-গোষ্ঠীও শুধু মাত্র আশ্রিত-জন-প্রতিপালক রইলেন দাহনী থেকে আরম্ভ করে কাব্য-রচনায় উৎসাহী হয়ে উঠলেন—রেসাঙ্গ বা আরাকানের রাজসভা তো বাঙ্‌লা সরস্বতীর প্রধান-তম এক পীঠস্থান হয়ে উঠল—সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকেই। উচ্চ ও মধ্যবর্গের এরূপ জাতীয় সাহিত্য রচনার চেষ্টায় জাতীয় মিলনের এই জন-বনিয়াদ আরও দৃঢ় হয়ে উঠবে, মনে হল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পৌরাণিক অনুবাদ শাখা

(খ্রীঃ ১৫০০—খ্রীঃ ১৭০০)

এই চৈতন্যপর্বকে কেউ কেউ বলেছেন পৌরাণিক প্রাবল্যের যুগ। তাও মিথ্যা নয়। সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের একটা প্রধান উপায়ই ছিল জন-সমাজকে পুরাণের আখ্যায়িকা শুনিয়ে অনুগত ও ভক্তিমান করে রাখা। মঙ্গল-কাব্যের মধ্যেও লৌকিক ধারার থেকে পৌরাণিক ধারা ক্রমেই প্রবলতর হয়। অনুবাদ শাখার মধ্যে ভাগবত অবলম্বন করে কৃষ্ণমঙ্গলের ধারা রচিত হচ্ছিল, অন্য দিকে পরিবেশন চলছিল রামায়ণ মহাভারত ও পৌরাণিক কাহিনীর।

রামায়ণ-মহাভারত : ফুলিয়া পণ্ডিত কৃত্তিবাস বাঙলা রামায়ণের আদি কবি; তিনি প্রাক্-চৈতন্য যুগের কবি। বাঙলা মহাভারতের আদি-রচয়িতা "কবীন্দ্র" পরমেশ্বরও প্রাক্-চৈতন্য না হোক, শ্রীচৈতন্যের সমকালীন কবি,—হয়তো বা বয়সে অগ্রজও। বাঙলার এই প্রথম মহাভারত রচিত হয় পূর্ববঙ্গের পূর্বপ্রান্তে চট্টগ্রাম নোয়াখালী জেলার সীমান্তস্থিত ফেণী-নদীর উপকূলে। তখনো হুসেন শাহ গৌড়েশ্বর (খ্রীঃ ১৪৯৩-খ্রীঃ ১৫১৯)। "আর্যাবর্তের অন্য কোন প্রাদেশিক সাহিত্যে মহাভারত অবলম্বনে লেখা এত পুরানো কাব্য আর পাওয়া যায় নাই"—এ কথা বাঙলা-ভাষীদের স্মরণীয় এবং সে হিসাবে এ গ্রন্থও পরম আদরণীয়।

নানা কারণে অবশ্য পরবর্তী কবি কাশীরাম দাসের মহাভারত (খ্রীঃ ১৬০২-১০) বাঙালীর মনকে জয় করেছে। তার মধ্যে একটি কারণ কাশী-রামের কৃতিত্ব; অন্যটি পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় মহাভারত হিসাবে তাঁর গ্রন্থের শ্রীরামপুরের ছাপাখানার সহায়তা লাভ। পূর্ববঙ্গে কিন্তু কবীন্দ্র পরমেশ্বরের সমাদর তখনো কম ছিল না, তাঁর হাতেলেখা পুঁথিও সর্বত্রই সু-প্রচলিত ছিল, এই বিংশ শতকে পর্যন্ত চট্টগ্রাম-ত্রিপুরা-নোয়াখালী অঞ্চলে তা সুলভ।

'পরাগলী মহাভারত' : কবীন্দ্র পরমেশ্বরের মহাভারতের সাধারণ পরিচয় 'পরাগলী মহাভারত' বলে। গ্রন্থে বারবার উল্লেখ আছে হুসেন

শাহের ও তাঁর পুত্র নুসরৎ শাহের মহানুভবতার কথা। হুসেন শাহের লস্কর পরাগল খাঁ ও তাঁর পুত্র ছুটি খাঁ এই মহাভারতের কাহিনী বাঙলায় শোনবার আগ্রহ প্রকাশ করেন। পরাগল খাঁ সুলতান হুসেন শাহের সেনাপতি রূপে ত্রিপুরার রাজার বিরুদ্ধে প্রেরিত হন, সুলতানের 'লস্কর' বা প্রধান সেনাপতিরূপে তিনি সে অঞ্চলেই বসবাস করেন—চট্টগ্রামের জনশ্রুতিতে তিনি চট্টগ্রাম-বিজেতা বলেও বিখ্যাত। ফেণী নদীর তীরে পরাগলপুরে এখনো তাঁর বংশধরগণ পদস্থ পরিবার। পুরাণ মহাভারতের এবং নিশ্চয়ই রামায়ণের উপাখ্যানসমূহ শ্রবণ ইতিপূর্বেই এই শাসকবর্গের মুসলমানদের পক্ষে অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল—সে কাহিনী তাঁদের হৃদয়-মন স্পর্শ করত। পরাগল খাঁর মনেও নেশা লাগে। তিনি সভাকবি কবীন্দ্র পরমেশ্বরকে ভারত-কথা বাঙলায় বলবার জন্য অনুরোধ করলেন:

তাঁহার আদেশে মালা মস্তকে ধরিল।
কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাস পাঁচালী রচিল॥

পরমেশ্বর কোথাও এইরূপে কোথাও 'কবীন্দ্র পরমেশ্বর' বলে, কোথাও শুধু 'কবীন্দ্র' বলে নিজের উল্লেখ করেছেন। মুক্তকণ্ঠে কবি প্রশংসা করেছেন হুসেন শাহের ও পরাগল খাঁর।

লস্কর পরাগল খাঁন গুণের নিধান।
অষ্টাদশ ভারথে যাহার অবধান॥
দানে কল্পতরু সে যে মহা গুণশালী।
কুতূহলে করাইল ভারথ পাঁচালী॥

কবিতা হিসাবে এ রচনা সামান্য জিনিস. তত বিরাট নয়। কিন্তু মোটের উপর আঠারো পর্বেই সরল ভাষায় কবীন্দ্র পরমেশ্বর অষ্টাদশ পর্ব মহাভারতের কাহিনী বলে উঠতে পেরেছেন—এইটাই যথেষ্ট। কাহিনীর গুণেই তা সে যুগে আকর্ষণীয় হয়েছিল, এখনো অপাঠ্য নয়।

'ছুটিখানী মহাভারত': কবীন্দ্র পরমেশ্বর যখন মহাভারত রচনা করেন তখন পরাগল খান পরিণতবয়স্ক:

পুত্র পৌত্র রাজ্য করে খান মহামতি।
পুরাণ শুনন্ত নিত্য হরষিত মতি॥

ত্রিপুরা-অভিযানে পিতার সহকারী ছিলেন তাঁর পুত্র। পিতার আমলে

এঁর পরিচয় ছিল 'ছুটি খান' বলে। আর ইনিও ছিলেন পরাগলের মতোই মহাভারতের অনুরক্ত। তাঁর বিশেষ ইচ্ছা হল অশ্বমেধ-পর্বকথা বিস্তৃতাকারে শোনবার। কবীন্দ্রের মহাভারতে তা ছিল সংক্ষিপ্ত। ছুটি খানের আদেশে শ্রীকরনন্দী জৈমিনি-সংহিতার অশ্বমেধ-পর্ব অবলম্বনে রচনা করলেন এক নূতন অশ্বমেধ-পর্ব কথা—মনে হয় তখনো পরাগল খান জীবিত।

শ্রীকর নন্দীর এই লেখা 'পরাগলী মহাভারতের' পরিশিষ্ট-বিশেষ। অনেক পুঁথিতে তা একত্র মিশে গিয়েছে। ছুটি খান পিতারই অনুরূপ দান ধ্যানে যশস্বী।

চিরকাল জীবন্ত লস্কর ছুটি খান।
যাহার শক্তিয়া সে প্রেম সন্নিধান॥
শ্রীকর নন্দী যে পয়ার রচিল।
জৈমিনি কহিলেক যে হেন দেখিল॥

এ কাহিনীর ভূমিকাভাগে আমরা ত্রিপুরা অভিযানেরও উল্লেখ পাই,

ত্রিপুরা নৃপতি যার ভয়ে এড়ে দেশ।
পর্বত গহ্বরে গিয়া করিল প্রবেশ॥

যৌবনাশ্ব, নীলধ্বজ-জনা, সুধন্বা, প্রমিলা-অর্জুন, বভ্রুবাহন প্রভৃতি নয়-দশটি উপাখ্যানও এই অশ্বমেধ পর্বে বর্ণিত হয়েছে। অশ্বমেধ পর্বে অভিযান বর্ণনার সুযোগ বেশি, সেনাপতির তা শোনবার আগ্রহ হবেই। তাই সম্ভবত শ্রীকর নন্দীকে ছুটি খাঁ এ পর্ব বিশদ করবার আদেশ দিয়েছিলেন।

অন্যান্য রচয়িতা : নানা কবির লেখা মহাভারতের নানা উপাখ্যান এসে মিশেছে 'সঞ্জয়ের মহাভারতে'। সঞ্জয়ের পরিচয় নিশ্চিত করে জানা যায় না। জৈমিনির মতো অশ্বমেধ পর্ব সবিস্তারে বর্ণনা করবার চেষ্টাও সেদিনে আরও হয়েছিল। রামচন্দ্র খান তারই মধ্যে একজন। তাঁর পরিচয় অনিশ্চিত (বাঃ সাঃ পরিচয় ৭৩৫)। এক পুঁথিতে তিনি ব্রাহ্মণ, আর পুঁথিতে কায়স্থ, তবে তিনি যখন 'খান' তখন পদস্থ রাজপুরুষ হবেন, আর তিনি বৈষ্ণব ছিলেন,—হয়তো বা সেই জমিদার রামচন্দ্র খাঁও হতে পারেন যিনি পুরীর পথে শ্রীচৈতন্যকে নির্বিঘ্নে ছত্রভোগে গৌড় উৎকল সীমা উত্তীর্ণ করিয়ে দিয়েছিলেন (১৫০৯? দ্রষ্টব্য—ডঃ সেন, বাঃ সাঃ ইঃ ১২।৩, ইংরেজিতে লেখা, 'বাঙলার ইতিহাস' ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৪৮)। রামচন্দ্র খানের অশ্বমেধ পর্ব খ্রীঃ ১৫৩২-'৩৩এ চৈতন্যের তিরোধান কালে রচিত।

আরও কিছুকাল পরে (১৫৬৭-৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ?) দ্বিজ রঘুরাম উড়িষ্যার রাজা মুকুন্দদেবের জন্য রচনা করেন আর একখানি 'অশ্বমেধ-পাঞ্চালী'—তখন সুলেমান কররাণীর হাতে মুকুন্দদেব নির্জিত।

কোচবিহারের ভারত-কাব্য : চৈতন্য-পর্বে ষোড়শ শতাব্দীর ভারত-পাঁচালীর কবিদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন 'নলদময়ন্তী কাহিনী'র (খ্রীঃ ১৫৪৪-৪৫) রচয়িতা পীতাম্বর। হয়তো তিনিই কোচবিহারের রাজা সমরসিংহের আদেশে লিখেছিলেন 'মার্কণ্ডেয় পুরাণ' ও ভাগবতের দশম স্কন্ধ। কিন্তু কোচবিহারের কবি অনিরুদ্ধ রাম সরস্বতীর 'মহাভারত পাঁচালী' আরও উল্লেখযোগ্য। কোচবিহারের রাজা নর-নারায়ণ (খ্রীঃ ১৫৩৮-১৫৮৭ ?) ও রাজভ্রাতা শুক্লধ্বজের (চিলা রায়) আশ্রয়ে একটি কবি ও পণ্ডিতের কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। তার বিশেষ তাৎপর্য বোঝবার মত (পর পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। সম্ভবত অনিরুদ্ধের অগ্রজ কবিচন্দ্র ছিলেন রাজার সভাকবি। কিন্তু অনিরুদ্ধ যে কবি ও ভক্ত তাতে সন্দেহ নেই। তিনি কামরূপের ব্রাহ্মণ ; কোচবিহারের রাজসভায় তখন 'গৌড়ে কামরূপে যত পণ্ডিত আছিল' তাঁরা সমবেত হয়েছেন ; কামরূপীয় সাহিত্যের শঙ্করদেবও সেখানে এসেছিলেন। অনিরুদ্ধ সেখানে শুক্লধ্বজের নির্দেশে লিখলেন 'ভারত-পয়ার'—বনপর্ব, উদ্যোগপর্ব, ভীষ্মপর্ব ; এবং শেষে শুক্লধ্বজের কৃত ব্যাখ্যা মত 'জয়দেব' নামক কাব্যও। অনিরুদ্ধের ভারত-পাঁচালী উত্তরবঙ্গে প্রচলিত হয়।

সপ্তদশ শতকে মহাভারত-রামায়ণের প্রধান এক রচনা-ক্ষেত্র ছিল উত্তরবঙ্গে, কোচবিহার রাজাদের উৎসাহে, পৃষ্ঠপোষকতায় তার প্রথম পত্তন হয়। ষোড়শ শতকেই অনিরুদ্ধ 'রাম সরস্বতী' থেকে এ রচনা-ধারার প্রারম্ভ। তারপর সপ্তদশ শতকে কিরাত পর্বের কবি কবিশেখর ও শ্রীনাথ ব্রাহ্মণের ভারত-পাঁচালীর নাম করা যায় ; আরও অনেকে দু'এক পর্ব করে রচনা করেছিলেন। এসব লেখায় সাহিত্যিক মূল্য যাই থাক্, কোচবিহারের রাজাদের বিষয়ে তথ্য কিছু কিছু তাতে পাওয়া যায়।

কাশীদাসী মহাভারত : বাঙ্‌লা মহাভারতের প্রধান কবি কাশীরাম দাসের মহাভারত-সপ্তদশ শতকের প্রথম দশ বৎসরের মধ্যে (খ্রীঃ ১৬০২ ১৬১০-এর) লিখিত বলে অনুমান করা হয়। কাশীদাস এখন কৃত্তিবাসের মতোই একছত্র কবি। তাঁর পরিচয় সুবিদিত, তাঁর কাব্যেও তা রয়েছে। বর্ধমানের 'ইন্দ্রানী নামেতে দেশ বাস সিঙ্গি (সিদ্ধি ?) গ্রামে'। তাঁর পিতার নাম

কমলাকান্ত (দেব ?), জাতিতে তাঁরা কায়স্থ এবং সাধনায় কবি পরিবার। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণদাস লিখেছেন 'শ্রীকৃষ্ণবিলাস'; কনিষ্ঠ গদাধর 'জগন্নাথ মঙ্গল' বা 'জগৎ মঙ্গলে'র কবি, আর কাশীদাস 'মহাভারত'-কার। গোটা পরিবারই বৈষ্ণবভাবাপন্ন, তাতে সন্দেহ নাই। প্রবাদ আছে, কাশীরাম 'আদি, সভা, বন, বিরাটের কতদূর' লিখেই স্বর্গপুরে যান এবং অষ্টাদশ পর্ব সমাপ্ত করেন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দরাম দাস। সত্য হোক্ মিথ্যা হোক্, তাতে ক্ষতি নেই। 'কাশীদাসী মহাভারতে' আমরা একাধিক কবির লেখা পাই— বাঙালীর এই ভারত-পাঁচালী স্রোতেও এসে মিশেছে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন কবির কাব্যপ্রবাহ, তাতে বৈষ্ণব ভক্তিরসের মাত্রাটা বেড়েছে। কবিত্ব ও পাণ্ডিত্য দুইই কাশীদাসের ছিল।

মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

সুদীর্ঘকাল মানুষ পান করেছে এই কাশীদাসী অমৃত। শুধু শ্রীরামপুরের [illegible]য়ের কৌশলে তা ঘটে নি। মূল মহাভারতের বিরাট ব্যাপ্তি ও [illegible] ঐশ্বর্য কোথা থেকে আসবে বাঙলায়? কিন্তু কাশীদাসে একটা [illegible] ও স্নিগ্ধতা আছে; তা ভক্তিমিশ্রিত সহজধর্মবোধ-সংযোগে জাতীয় [illegible]ত করেছে, জাতীয় মনের সঙ্গে সঙ্গে আবার এ মহাভারতও গঠিত হয়ে [illegible]ছে। কৃত্তিবাসের মতোই কাশীদাসকেও এই বিশেষ অর্থে লোক-কাব্য বলা চলে।

মহাভারতের আংশিক ও সম্পূর্ণ রচনা নিয়ে বাঙলা মহাভারত ৩০ খানার মতো পাওয়া যায়। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকেরও রচিত মহাভারত আরও রয়েছে, তালিকা বাড়ানো যাবে। পূর্ববঙ্গের লেখকও আছেন,—রাজেন্দ্র দাস, গঙ্গাদাস সেন, ষষ্ঠীবর প্রভৃতি; সে সব কবিদের লেখা মিশে গিয়েছে সে অঞ্চলের 'সঞ্জয়ের মহাভারতে' (সঞ্জয় নামীয় কবিও ছিলেন)। সঞ্জয়ের মহাভারত নিয়ে তাই বাঙলা সাহিত্যে বহু আলোচনা হয়েছে এক সময়ে (বঃ সাঃ পত্রিকা, ৩৪।২)

রামায়ণ

কৃত্তিবাসের পরে রামায়ণ-কাহিনী যাঁরা লিখেছিলেন, তাঁরা কোথায় গেলেন? অনেকে কৃত্তিবাসের মধ্যেই মিলিয়ে গিয়েছেন। হয়তো কৃত্তিবাসেরই তাঁরা অনুকারক ছিলেন। সপ্তদশ শতকে তেমন বিশিষ্ট

রামায়ণ আর পাওয়া যায় না। ময়মনসিংহের মনসা-মঙ্গলের কবি বংশীদাসের কন্যা চন্দ্রাবতীর নাম আজও আমাদের মুখে মুখে। তাঁর একটি রামায়ণ বা রামায়ণের গাথা ও-অঞ্চলে চলে, আজ সকলের তা সুপরিচিত। এ লেখা যদি চন্দ্রাবতীর বলে—বা তৎকালীন বলেও—নিঃসন্দেহ হওয়া যেত, তা হলে ষোড়শ (বা সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধের?) কবি বলে নিশ্চয়ই চন্দ্রাবতী এখানে গণনীয়া হতেন। বাঙলার 'প্রথম স্ত্রীকবি' খ্যাতির জন্য তথাপি চন্দ্রাবতী নমস্যা। তবে রামায়ণ-গায়ক হিসাবে উত্তরবঙ্গের 'অদ্ভুত আচার্য'ই প্রধান উল্লেখযোগ্য। তাঁর আসল নাম নিত্যানন্দ আচার্য, 'অদ্ভুত আশ্চর্য রামায়ণ কথা' রচনা করেছেন-বলেই এখন তাঁর এই পরিচয়। পাবনা জিলার সোনাবাজু পরগণার বড়বাড়ি গ্রামে ছিল অদ্ভুত আচার্যের নিবাস; জীবন-কাল কেউ কেউ আকবরের কালেও অনুমান করেছেন। কবি রামায়ণ-গায়ক ছিলেন, স্বয়ং রঘুপতি তাঁকে দেখা দিয়ে বললেন—'কিছু গাও শুনি।' ভুলুয়ার (নোয়াখালী) দ্বিজ ভবানী দাসের 'শ্রীরাম পাঁচালী' কাব্য অধ্যাত্ম-রামায়ণ অবলম্বনে লিখিত হয়। কবি ভুলুয়ার রাজা জগৎ মাণিক্যের আদেশে এ গ্রন্থ লেখেন, দক্ষিণাটা ('দিনে দশ মুদ্রা') নিঃসন্দেহে বাড়িয়ে বলেছেন—[illegible] কবিত্ব-খ্যাতি বাড়ে নি। অবশ্য অষ্টাদশ শতকে রামায়ণের আরও র[illegible] প্রকাশিত হলেন—যেমন কোচবিহার ও বিষ্ণুপুরের কবিরা ও [illegible] চক্রবর্তী ও ফকিররাম কবিভূষণ। কিন্তু মোটের উপর সপ্তদশ শতকে [illegible] রামায়ণের কবি বেশি নেই। অবশ্য কামরূপীয়া 'শ্রীরাম পাঁচালী'র [illegible] মাধব কন্দলী ও উত্তরাকাণ্ডের শঙ্করদেব প্রভৃতি রামায়ণ-ধারার স্মরণীয় কবি (পর পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বাঙলা সংস্কৃতির প্রসার ও বিবিধ কাব্যধারা

(খ্রীঃ ১৫০০—খ্রীঃ ১৭০০)

হুসেন শাহ, নুসরৎ শাহ যখন বাঙলা কাব্য সৃষ্টির উৎসাহ-দাতা হয়ে উঠলেন তখন তাঁদের দৃষ্টান্ত যে তাঁদের সামন্ত ও সেনাপতিরাও অনুসরণ করবেন, তা সহজেই বোঝা যায়। পরাগল খাঁ, ছুটি খাঁ-এর প্রচেষ্টা তারই প্রমাণ। কিন্তু বাঙলা সাহিত্য রাজসভায় জন্মে নি, রাজ-কৃপায় লালিত-পালিত হবার সুযোগও তার ভাগ্যে বিশেষ জোটে নি। প্রধানত রাঢ়ের পল্লীকেন্দ্রে, হয়তো পল্লীর 'রাজা' বা জমিদারের উৎসাহে তার অনুশীলন দেশব্যাপী হয়ে উঠেছিল বলেই গৌড়ের সুলতানরাও ক্রমে তার পৃষ্ঠপোষক হয়ে পড়ছিলেন। পল্লীর লৌকিক আসর থেকেই সে পৌঁছেছিল রাজসভার দ্বারে,—সভায় চলত ফারসিই ;—পাঠান রাজত্ব শেষ হয়ে গেলে মোগল-রাজত্বে বাঙলা সাহিত্যের পক্ষে আর এ সৌভাগ্যের সম্ভাবনা রইল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখতে পাই, এ সময়ে বাঙলার সীমান্তে স্বাধীন ও অর্ধস্বাধীন রাজাদের রাজসভায় বাঙলা সাহিত্যের কয়েকটি সৃষ্টি-কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। এর মধ্যে উত্তরবঙ্গে ছিল কামতা-কামরূপের বা কোচ রাজবংশের রাজসভা ; পূর্ববঙ্গে ছিল ত্রিপুরা ও আরাকানের (রোসাঙ্গের) রাজসভা ; এবং পশ্চিমবঙ্গে মল্লভূমি-ধলভূমের রাজসভা।

নৃ-বিজ্ঞানের পণ্ডিতেরা প্রথমেই হয়তো লক্ষ্য করতে বলবেন যে, এ সব রাজশক্তি ও শাসক-গোষ্ঠী আসলে কেউ পুরাতন বা নতুন আর্যভাষী গোষ্ঠীর নয়। উত্তর ও পূর্ব বঙ্গে সীমান্ত রাজ্যগুলি ছিল 'কিরাত'-জাতির দেশ ও রাজ্য, অর্থাৎ প্রধানত মঙ্গোলয়েড্-জাতির মানুষের দেশ। তাদের পূর্বে ওসব অঞ্চলে 'নিষাদ' বা অস্ট্রিকজাতির অধিবাসীরাও ছিল এবং অস্ট্রিকদের দানও কিছু কিছু স্বীকৃত করে নিয়েছিল আগন্তুক মঙ্গোল জাতির বিজেতারা। এসব জাতির ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক কীর্তির সুগ্রথিত বিবরণ উপস্থিত করেছেন শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'কিরাত-জন-কৃতি' নামক তথ্যবহুল ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থে (এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল,

১৯৫১)। পশ্চিমবঙ্গের মল্লভূম ধলভূমের রাজশক্তি ও শাসকশক্তিও হয়তো আসলে সেই নিষাদ ও দ্রাবিড় মিশ্রিত উপজাতিদেরই থেকে উদ্ভূত। মঙ্গোল কিরাত প্রভাব যখন উত্তর উড়িষ্যা ও গোণ্ডদেরও স্পর্শ করছে বলে মনে করা হয়, তখন এদেরও স্পর্শ করে থাকবে। (তুলনীয় জে. এচ. হাটনের মত—'কিরাত-জন-কৃতি'তে উল্লেখিত, পৃঃ ৭১; এবং কোল ও কিরাত পরস্পরের সম্পর্ক, ঐ, ২৯ স্তবক।)

কিরাত-অঞ্চল

নেপালে ও হিমালয়ের পাদদেশস্থ বিহার-বঙ্গ-কামরূপ অঞ্চলেও কতকাংশ প্রতিষ্ঠিত ছিল 'হিমালয়-প্রান্তিক মঙ্গোলয়েড্' মহাশাখার মানুষ। উত্তরবঙ্গের কোচ্‌রা ছিল বোডো-মহাশাখার মঙ্গোলয়েড্ বা কিরাত জাতি। কাছাড়ি, গারো, মেচ, রাভা, এবং টিপ্‌রা (ত্রিপুরা) প্রভৃতি জাতিরা এই বোডো মহাশাখার অন্তর্গত। হাজার বৎসর আগে প্রায় সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে ও আসামে বোডো জাতির নানা শাখাই বসবাস করত, এখন অবশ্য আর তারা ততটা বিস্তৃত নয়। অহোমরা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় প্রধান হয়। খাসীরা জাতিতে কিরাত গোষ্ঠীর হলেও তাদের ভাষা রয়ে গিয়েছে অস্ট্রিক গোষ্ঠীর, মুণ্ডারির দূর-জ্ঞাতি'—আমরা তা জানি।

কুকি-চীনা ও নাগা প্রভৃতি জাতিরা আসাম-বর্মা মহাশাখার মঙ্গোলয়েড্। এর মধ্যে কুকি-চীন গোষ্ঠীর মোঙ্গল জাতিরা মণিপুর রাজ্যের (মেইথেই) ও লুসাই পাহাড়ের প্রধান অধিবাসী। কুকি জাতি সেখান থেকে ত্রিপুরা রাজ্যে (টিপরাইরা অবশ্য বোডো মহাশাখার) বিস্তৃত হয়েছে, আর পার্বত্য চট্টগ্রামে কুকি-চীন জাতিরই দেশ। আরাকান অবশ্য এখন বর্মী-ভাষীদের জেলা। কিন্তু মনে হয় আরাকানের মোন্-জাতীয় অস্ট্রিক গোষ্ঠীর আদিবাসীদের সঙ্গে প্রথম এসে মিশেছিল চট্টগ্রামের পথে ত্রিপুরা-নোয়াখালীর দিক্‌কার বোডো মহাশাখার মঙ্গোলয়েড্‌রা এবং তারপরে পার্বত্য-চট্টগ্রামের কুকি চীন-ভাষী মঙ্গোলয়েডরা। বর্মী-ভাষী 'ম্রান-মা' জাতি খ্রীঃ ১২৮০ পর্যন্তও এ অঞ্চলে প্রবেশ করে নি। আরাকান তাই বর্মী-জাতির সীমান্তপারের দেশ হয়ে ওঠে তার অনেক পরে (কিরাত-জন-কৃতি পৃঃ ৮৭)।

কিরাত অঞ্চলে বাঙ্‌লার প্রসার : হিন্দ্‌-মঙ্গোলয়েড্‌দের এই তিন মহাশাখা—যথা, হিমালয়ী মঙ্গোলয়েড্‌ (নেওয়ারী), ভোটচীনা বোডো ও আসামবর্মী (কুকিচীন)—বাঙ্‌লা ভাষার সম্পর্কে আসে।

বাঙ্‌লার হিন্দ্‌-আর্য সভ্যতার ধারা এসব প্রত্যন্ত জাতিদের শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে টেনে অঙ্গীভূত করে নিচ্ছিল। রাঢ় থেকে সে স্রোত প্রবাহিত হয় মল্লভূমের দিকে। নেপালের পথে গৌড়-মৈথিল-নেওয়ারী নেতৃত্বে তা চলে তিব্বতে চীনে। গৌড় ও বিহারের পথে তা পূর্বাপর চলেছে কামরূপ ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা ধরে পূর্বদিকে। পট্টিকের (কুমিল্লা) চট্টগ্রাম-আরাকান থেকে তা যায় ব্রহ্মে ও বহির্ভারতে। তাই বঙ্গ ও পৌণ্ড্রবর্ধন ভুক্তি থেকে (বিশেষ করে ঢাকা, ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা এই অঞ্চল দিয়ে) এ সভ্যতার ধারা সুর্মা উপত্যকার পথে শ্রীহট্ট-কাছাড়-মণিপুরের দিকে বিস্তৃত হয়, এবং ত্রিপুরা-নোয়াখালি-চট্টগ্রামেও গিয়ে পৌঁছে। এ বিস্তৃতি অবশ্য সর্বত্র সমভাবে ঘটে নি, আর একই সাংস্কৃতিক তরঙ্গ যে সর্বত্র গিয়ে পৌঁছেছিল তাও নয়। কিন্তু তুর্ক বিজয়ের পূর্ব থেকেই যে প্রসার আরম্ভ হয়েছিল (দ্রষ্টব্য : কিরাত-জ-ক, ৪৪, ৮০, ইত্যাদি) তুর্ক বিজয়ের পরে তা আরও প্রবল হয়ে ওঠে। ইতিহাসেও এখানে-ওখানে তার চিহ্ন আবিষ্কার করা যায়—দনুজমর্দন দেবের মতো রাজার মুদ্রা থেকে, কিরাত নামের সঙ্গে কিরাত রাজাদের সংস্কৃত নাম গ্রহণ থেকে, হিন্দু দেবদেবীর উল্লেখ থেকে। যেমন, আমরা দেখি দনুজমর্দন দেব (খ্রীঃ ১৪১৬-১৪১৮) 'চণ্ডী-চরণ পরায়ণ' ; কামতা-কামরূপের নরনারায়ণ 'শ্রীশ্রী শিব-চরণ-কমল-মধুকর ; কাছাড়ের যশোনারায়ণ (খ্রীঃ ১৮৫৩) 'হর-গৌরী-চরণ-পরায়ণ' ; জয়ন্তীপুরের লক্ষ্মীনারায়ণ (খ্রীঃ ১৬১৯) 'শিব-চরণ-কমল-মধুকর', ইত্যাদি। অর্থাৎ কাল হিসাবে দেখি সেই পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে এই হিন্দ্‌-কিরাত সংস্কৃতি প্রায় সর্বত্রই উদ্ভূত হচ্ছে বা [illegible] অনেক সময়ে হিন্দু দেবদেবীরা এই সব জাতির নিজস্ব দেবদেব[illegible] কুক্ষিগত করে নিয়েছেন, অথবা তাদের সহযোগী করে নিয়েছেন (যেমন, ত্রিপুরী ও মণিপুরীদের মধ্যে) ; প্রায়ই রাজারা চন্দ্রবংশের নামে আপনাদের পরিচয় স্থির করে নেন (যেমন, মণিপুরীরা, অর্জুন-চিত্রাঙ্গদার বংশধর ; কাছাড়ের রাজারা ভীম-হিড়িম্বার বংশধর, ইত্যাদি) ; [illegible]-তান্ত্রিক ক্রিয়াদির সঙ্গে কখনো তাদের আদিম পশুবলি, [illegible], খাপ খেয়ে যায় ; কখনো ব্রাহ্মণ পুরোহিতের পাশাপাশি সসম্মানে

টিকে আছেন তাদের আদি-দেবদেবীয় পুরোহিতরাও (যেমন, ত্রিপুরার 'চন্তাই', 'দেওয়াই', প্রভৃতি)। এভাবে একটি বিশিষ্ট সংস্কৃতিধারার সৃষ্টি হয়, তাকেই বলা হয়, 'হিন্দুমঙ্গোলয়েড্ কৃতি' (দ্রষ্টব্য : পূর্বোক্ত 'কিরাত-জন-কৃতি', ৪০)। এই সংস্কৃতির প্রধান বাহন হতেন বাঙালী ব্রাহ্মণ (নেপালে বৌদ্ধ তান্ত্রিক, নাথ গুরুরাও) ; তাদের শাস্ত্রীয় মাধ্যম হত সংস্কৃত ভাষা (নেপালে প্রাকৃত ও অবহট্‌ঠ) ও বাঙলা ভাষা এই সব জাতির মধ্যে তাই বাংলা ভাষা একটা প্রতিষ্ঠালাভ করে। গাড়ো, খাশী-জয়ন্তিয়া, মণিপুরী প্রভৃতি কিরাত গোষ্ঠীর জাতিরা তথাপি বাঙলা ভাষা গ্রহণ করে নি; কাছাড়ীরা (ডিমাপুর) সাহিত্য সৃষ্টি করে নি। বাঙলা সাহিত্যের সৃষ্টিক্ষেত্র হিসাবে এই ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে গণনীয় হয় প্রধানত কোচবিহার, ত্রিপুরা ও আরাকান ; নেপালে অবশ্য তৎপূর্বেই বাঙলা ও মৈথিলীর অনুশীলন সুদৃঢ় ছিল।

মল্লরাজারা এই কিরাত-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নন। শ্রীনিবাসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তাঁরা বাঙালী বৈষ্ণব ধর্মের ও সাহিত্যের ক্রমশ প্রধান পৃষ্ঠপোষক হন। অবশ্য 'কবীন্দ্র' শঙ্কর চক্রবর্তী প্রভৃতি বিষ্ণুপুরী কবিরা অষ্টাদশ শতকের চৈতন্যদেবের পরে ওড়িষ্যায়ও বাঙলা বৈষ্ণব গ্রন্থ কিছু রচিত হয়, সে সবের যা উল্লেখযোগ্য চৈতন্য-সাহিত্যের মধ্যেই তা উল্লেখিত হয়েছে।

নেপালের রাজসভা

বাঙলা সাহিত্যের প্রাচীন কেন্দ্র ছিল নেপালে। সপ্তদশ শতক পর্যন্তও নেপাল গোর্খাদের রাজ্য হয় নি ; মঙ্গোল-গোষ্ঠীর নেওয়ারীদেরই রাজ্য ছিল, সর্বরকমে তাদেরই স্বদেশ। গোর্খারা আর্যভাষা গোষ্ঠীর রাজপুত ; [illegible]র কুমায়ুন অঞ্চল থেকে এসে গোর্খা-জাতি নেপাল জয় করে মাত্র [illegible] খ্রীষ্টাব্দে,—অর্থাৎ পলাশীরও পরে। গোর্খা শাসক-জাতির পৌনে দু'শত বৎসরের শাসন ও বিরোধিতায় পরাজিত নেওয়ারী জাতি শুধু নির্জিত হয় নি : নেওয়ারী ভাষা, নেওয়ারী সাহিত্যও প্রায় বিলুপ্তির দিকে যায়। কিন্তু নেওয়ারী সংস্কৃতি বা নেওয়ারী আমলের সংস্কৃত-তিব্বতী ও বাঙলায় লিখিত অমূল্য বৌদ্ধ ও হিন্দু পুঁথিপত্র তথাপি রক্ষা পেয়েছে 'চর্যাপদে'র আবিষ্কার সম্পর্কেই আমরা তা দেখেছি। নৃ-তত্ত্বের

নেওয়ারীরা 'হিমালয়-প্রান্তিক মঙ্গোলয়েড্' মহাশাখার মানুষ। পাল যুগেই তিব্বত ও মিথিলা-গৌড়ের মধ্যস্থলে নেওয়ারীরা এক নিজস্ব সংস্কৃতির সেতু যোজনা করে; এইরূপে নেওয়ারী সংস্কৃতির উদ্ভব হয়। নেওয়ারী সংস্কৃতিতে দান যুগিয়েছেন তখন বাঙালী ও মৈথিল পণ্ডিতেরা। চতুর্দশ শতকে মিথিলার রাজ্য হারিয়ে মিথিলেশ্বর হরি সিংহ (হরসিংহ)-দেব নেপালে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বাঙালী ব্রাহ্মণরা ছিলেন ভাতগাঁওএর মল্লরাজাদের রাজগুরু, 'রাজোপাধ্যায়' নামে পরিচিত। গোর্খা বিজয়ে তাঁরাও প্রভাব প্রতিপত্তি হারান; তার পূর্ব পর্যন্ত তাঁরা বাঙ্‌লা দেশের সঙ্গে বিবাহাদি সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখতেন। চতুর্দশ থেকে অষ্টাদশ শতকেরও কিছুকাল নেপালের ভাতগাঁও, কাঠমুণ্ড, পাটণ, এই তিন রাজসভাতেই বাঙ্‌লার অনুশীলন চলেছিল। নেওয়ারী রাজা ও রাজগুরুদের পৃষ্ঠপোষকতায় নেপালে বাঙ্‌লা নাটক অভিনীত হত—তার গদ্যাংশ, অভিনয়-নির্দেশ প্রভৃতি থাকৃত নেওয়ারীতে। কাব্যাংশ বাঙ্‌লা অনেকটা মৈথিলীমিশ্রিত বাঙ্‌লা ব্রজবুলির অনুরূপ। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহে এ সব পুঁথি রয়েছে; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদও চারখানি 'নেপালে বাঙ্গালা নাটক' প্রকাশিত করেছেন (অন্যান্য বিবরণ দ্রষ্টব্য—ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী লিখিত প্রবন্ধ, বঃ সাঃ পত্রিকা, ৩৭এ; এবং ডঃ সুকুমার সেনের বাঃ সঃ ইতিহাস—খ্রীঃ ৩৯৭-৯৯)। সর্বাপেক্ষা পুরনো নাটক (চতুর্দশ শতকের ?) 'রামাঙ্ক নাটিকার' লেখক রাজগুরুর পুত্র ধর্মগুপ্ত 'বাল বাগীশ্বর'। নাটকটি লেখা সংস্কৃতে প্রাকৃতে; কিন্তু লৌকিক ভাষায় কথাবস্তু দেওয়া হয়েছে নাটকের শেষে। সপ্তদশ শতাব্দীর ভাতগাঁওয়ের রাজা জগজ্জ্যোতি মল্লদেব ও তাঁর পুত্র জগৎপ্রকাশ মল্লদেবের নামেও নাটক ও পদ রয়েছে। পাটনের (ললিতাপুরের) সমসাময়িক রাজা সিদ্ধি নরসিংহ দেবের সভায় (সপ্তদশ শতকে) রচিত হয় 'গোপীচন্দ্র নাটক' (পরে দ্রষ্টব্য)। কাঠমুণ্ডের রাজা 'কবীন্দ্র' প্রতাপ মল্লদেবের নামে একটি সঙ্গীত-শাস্ত্রের বই ও বৃষ্টির স্তোত্র আছে। ভাতগাঁওয়ের রাজা ভূপতীন্দ্র মল্লদেব (অষ্টাদশ শতকের প্রারম্ভে) ও শেষ রাজা রণজিৎ মল্লদেবের নামে অনেক পদ পাওয়া যায়। কাশীনাথ কৃত 'বিদ্যাবিলাপ', কৃষ্ণদেব-কৃত 'মহাভারত' ও গণেশ-কৃত 'রাম-চরিত্রে'র (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত, ও শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'নেপালে বাঙ্গালা নাটক' চারখানার অন্তর্ভুক্ত) ভণিতায় ভাতগাঁওয়ের এই শেষ দুই মল্লরাজা ভূপতীন্দ্র ও রণজিতের উল্লেখ রয়েছে;

অতএব তা অষ্টাদশ শতাব্দীর রচনা। এ বাঙলা মৈথিলী-নেওয়ার প্রভাবিত, পড়া কষ্টকর, কিন্তু নাট-গীত হিসাবে এ সাহিত্য স্মরণীয়, এবং পদসমূহও কবিত্ব-বর্জিত নয়। তথাপি প্রধানত, বাঙালী সংস্কৃতির একটা বিলুপ্ত অধ্যায়ের চিহ্ন হিসাবেই এ সব মূল্যবান্।

কামরূপ-কামতা ও কোচবিহারের রাজসভা

কামরূপ ইতিহাস-প্রসিদ্ধ রাজ্য। তুর্করা এ রাজ্য বার বার আক্রমণ করেও জয় করতে পারে নি। যে রাজবংশই তখন রাজত্ব করুক, তুর্করা বলে কামরূপের সাধারণ অধিবাসীরা ছিল কোঁচ, মেছ, আঁড়ু; অর্থাৎ মঙ্গোলয়েড্ গোষ্ঠীর মানুষ। কামরূপে ও উত্তরবঙ্গে কোঁচেরা শক্তি হিসাবে দাঁড়িয়েছিল পালরাজত্বের শেষদিকে, হয়তো দশম শতকেই। আসামে দুর্ধর্ষ অহোম্‌জাতির অভ্যুদয়ে কামরূপ ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে (সু-কাংফার সময়ে, খ্রীঃ ১২২০-১৩৩২) আহোমদের নিকট নতি স্বীকার করে। এক শতাব্দী পরে দেখি অহোম রাজা সু-হুঙ্গ-মুঙ্গ (খ্রীঃ ১৪৯৭-১৫৩৯) নাম গ্রহণ করেছেন 'স্বর্গ-নারায়ণ'। মুঘল সাম্রাজ্যের সমস্ত আক্রমণ ঠেকিয়ে হিন্দু-মঙ্গোলয়েড অহোম-শক্তি সগৌরবে রাজত্ব করেন খ্রীঃ ১৭০৫ পর্যন্ত; তারপরে তার পতন আরম্ভ হয়। এদের রাজত্বকালেই বাঙলা থেকে অসমীয়া সাহিত্যও স্বতন্ত্র হয়ে উঠতে থাকে।

কোঁচশক্তির কামরূপে অভ্যুদয় ঘটল বিশা কোঁচ বা বিশ্বসিংহের (খ্রীঃ ১৪৯৬-১৫৩৩) রাজত্বে। কোঁচদের মধ্যে কথিত হয়—বিশা শিব ও কুচনীর পুত্র; শিব দুর্গার তিনি ভক্ত, গৌহাটির কামাখ্যা দেবীর আরাধক। নিজ পুত্রদের তিনি কাশীতে বিদ্যালাভ করতে পাঠান। পুত্রদ্বয় নর-নারায়ণ (খ্রীঃ ১৫৩৩ বা ১৫৪০-১৫৮০) ও শুক্লধ্বজ (চিলা রায়) ছিলেন প্রায় আকবরের সমসাময়িক। কাশী থেকে শিক্ষালাভ করে দু ভাই ফেরেন, উত্তর বঙ্গ থেকে শ্রীহট্ট-ত্রিপুরা পর্যন্ত তাঁরা রাজ্যবিস্তার করেছিলে, কামাখ্যা মন্দিরও তাঁরা পুনর্নির্মাণ করেন, বিশেষ করে পৌরাণিক অনুবাদে উৎসাহ দেন; বৈষ্ণব আন্দোলনেরও তাঁরা ছিলেন সহায়ক। আসামের বৈষ্ণব গুরু শঙ্করদেব এই কোঁচরাজাদের রাজ্যে তাঁর ধর্মপ্রচারের সুযোগ পেয়েছিলেন। এই রাজসভায় মহাভারত রামায়ণ ভাগবতের কাহিনী নিয়ে বাঙলা কাব্য

রচনার আগ্রহ ষোড়শ শতকের মধ্যভাগ থেকে আরম্ভ হয়, অষ্টাদশ শতাব্দীতেও চলে। যথাস্থানে তা উল্লিখিত হয়েছে।

কামরূপীয়া সাহিত্য : এই অঞ্চলের বাঙলা কবি-সমাজেরই অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন বর্তমান অসমীয়া সাহিত্যের যাঁরা আদি-কবি বলে গণ্য সেইসব ভক্ত, পুণ্যচরিত কবিরা—মাধব কন্দলী, শঙ্করদেব ও মাধবদেব। তাঁদের কাব্য উত্তরবঙ্গের তৎকালীন বাঙলা ভাষা কামরূপীয়াতে রচিত; সে কামরূপীয়া বর্তমান অসমীয়া অপেক্ষা বর্তমান বাঙলারই নিকটতর। অবশ্য তাঁদের লেখাতে মৈথিলীর প্রভাবও দেখতে পাই প্রচুর, তাঁরাও 'ব্রজবুলি'তে পদ রচনা করেন।

মাধব কন্দলীর 'শ্রীরাম পাঁচালী' (খ্রীঃ ১৫৮৬?) স্বাধীন কামতার প্রাচীনতম কাব্য-নিদর্শন। লঙ্কাকাণ্ড পর্যন্ত তা পাওয়া যায়, উত্তরাকাণ্ড পাওয়া যায় শঙ্করদেবের লেখা।

শঙ্করদেব মোটামুটি শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক। তাঁর অগ্রজ হলেও, মনে হয় শতাধিক বৎসর জীবিত থেকে তিনি দেহত্যাগ করেন খ্রীঃ ১৫৬৮তে। তিনি শুধু বাঙলার চৈতন্যের মতোই আসামের বৈষ্ণব-আন্দোলনের প্রবর্তকমাত্র নন, তিনি কামরূপ-সাহিত্যেরও প্রবর্তক। ব্রহ্মপুত্র তীরে বড়দোয়া গ্রামে সম্ভ্রান্ত কায়স্থ বংশে তাঁর জন্ম। তিনিও কৃষ্ণ নাম বিতরণ করে দেন আশূদ্র সকলকে। স্বভাবতই অহোম রাজ্যের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা এই কায়স্থ বৈষ্ণব গুরুর বিরোধী হয়ে ওঠেন। কারণ, শ্রাদ্ধ-শান্তি কিছুই তিনি অনুমোদন করেন না :

> কৈবর্ত কোলতা কোচ ব্রাহ্মণ সমস্ত।
> একলগে খায় দুধ চিড়া ফল যত ॥

এতটা দুঃসাহস শ্রীচৈতন্যেরও হয়েছিল কিনা সন্দেহ। শঙ্করদেব তাই আশ্রয় গ্রহণ করলেন এসে কামতা রাজ্যের রাজা নরনারায়ণ ও শুক্লধ্বজের কাছে। তাঁদের সুখ্যাতিও তাঁর লেখায় প্রচুর। রামায়ণের উত্তরাকাণ্ড ছাড়া তিনি ভাগবতপুরাণ প্রভৃতি নিবন্ধ রচনা করেন। আর লেখেন 'শ্রীরাম-বিজয় নাট' ও 'রুক্মিণী-হরণ নাট'—প্রথম দিককার বাঙলা গদ্যের দৃষ্টান্তও মিলে এইসব 'নাটে' (দ্রষ্টব্য : ডঃ সেন, ইতিহাস ১৮।৪)। তাঁর শিষ্য মাধবদেব লেখেন 'ভক্তিরত্নাকর' ও 'কংসবধ যাত্রা'। মাধবদেব শেষ-জীবনে বড়পেটা ছেড়ে পশ্চিম কামতার রাজা লক্ষ্মীনারায়ণের আশ্রয় গ্রহণ করেন।

শঙ্করদেবের ও শ্রীচৈতন্যের নীলাচলে সাক্ষাৎ ঘটেছিল, এ কথা জানা যায়। এ সম্বন্ধে আরও জানবার আগ্রহ স্বাভাবিক; কিন্তু সে পরিচয়ের কোনো উজ্জ্বল রেখা চৈতন্য-জীবনীতে অন্তত খুঁজে পাওয়া যায় না। শঙ্করদেবের শিষ্যদের মধ্যে অবশ্য তাঁর মৃত্যুর পরে এ নিয়েই দুটি মতবাদ দেখা দেয়। 'দামোদরিয়া' সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন ব্রাহ্মণ দামোদর, তাঁরা শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে সম্পর্ক স্বীকার করতেন। আর 'মহাপুরুষিয়া' দলের নেতা ছিলেন কায়স্থ মাধবদেব; তাঁরা শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে সম্পর্ক স্বীকার করতেন না। কামরূপ থেকে যে বৈষ্ণব-ধর্ম আসাম প্রদেশে বিস্তৃতিলাভ করে তা প্রধানতঃ মহাপুরুষিয়াদেরই প্রচারিত। এ মতবাদে ভক্তির অভাব ছিল না, কিন্তু মধুর রসের মাতামাতিটা ছিল কম।

আসামে বৈষ্ণব-ধর্মের গুরু হিসাবে শঙ্করদেব স্বভাবতই আজ অসমীয়া সাহিত্যেরও উৎস-মুখ; তাঁদের 'নাট্যকাব্য', তাঁদের 'নামঘোষা', 'কীর্তন-ঘোষা' প্রভৃতি এই গুরুরই দানে পরিস্ফুট। কিন্তু কামরূপীয়া কাব্যধারার কবি হিসাবে মাধব কন্দলী, শঙ্করদেব ও মাধবদেব বাঙ্‌লা সাহিত্যেরও প্রধান তিন কবি,—আমরা তা মনে না রাখলেও এ সত্য সত্যই থাকবে।

কোচ-সাম্রাজ্য অবশ্য দীর্ঘদিন স্থায়ী হয় নি। নরনারায়ণ ও শুক্লধ্বজ পুত্রদের মধ্যে প্রথমত দুইভাগে রাজ্য বিভক্ত করলেন: উত্তরবঙ্গে পড়ে কোচবিহার, এবং গোয়ালপাড়ায় থাকে কোচ-হাজো রাজ্য। ক্রমেই কোচ রাজ্য আরও খণ্ডিত হয়ে পড়ে। অনেক যুদ্ধের শেষে মোগল সাম্রাজ্যের বশ্যতাও তারা স্বীকার করে। কিন্তু এই ষোড়শ শতকের মধ্যভাগ থেকে উত্তরবঙ্গে কোচবিহারের রাজসভা বাঙ্‌লা সাহিত্য-সৃষ্টির একটি ধারার উদ্বোধন করেছিলেন, তাতে ভুল নেই।

ত্রিপুর রাজসভা

কোচবিহারের তুলনায় ত্রিপুরা রাজ্যের দান বাঙ্‌লা সাহিত্যের ইতিহাসে সামান্য। এখনো আগড়তলা প্রভৃতি বড় বড় কেন্দ্রগুলির বাইরে দূর অঞ্চলে টিপ্‌রারা তাদের বোডো ভাষা পরিত্যাগ করে নি, কিন্তু ইংরেজ আমলেও বাঙ্‌লা রাষ্ট্রভাষা ছিল মাত্র একটি রাজ্যে—সে রাজ্য 'স্বাধীন ত্রিপুরা'। প্রথম দিকে কাছাড়ীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তারপর ত্রিপুর-রাজ রত্নফা (আনুমানিক খ্রীঃ ১৩৫০) রত্নমাণিক্য নাম গ্রহণ করেন।

বহু বাঙালী উচ্চবর্ণ পরিবারকে আনিয়ে তিনি রাজ্যে সংস্কৃত ও বাঙলা চর্চার গোড়াপত্তন করেছিলেন। এক-শতাব্দী পরে ত্রিপুরার রাজা হন ধন্য-মাণিক্য (খ্রীঃ ১৪৬৩-১৫১৫) তিনি চট্টগ্রাম ও আরাকান অধিকার করাতে হুসেন শাহ্-এর সঙ্গে তাঁর যুদ্ধের সূচনা হয় (খ্রীঃ ১৫১৩)—সেই যুদ্ধেই সম্ভবত নুসরৎ শাহ ও পরাগল খাঁ প্রেরিত হয়েছিলেন গৌড় থেকে। কিন্তু 'ছুটিখানী মহাভারত' যাই বলুক, ধন্যমাণিক্য শেষ পর্যন্তও পরাজিত হন নি। তাঁর অল্প পরেই রাজা হন বিজয়মাণিক্য (খ্রীঃ ১৫২৯-১৫৭০)—তিনিও আকবরের সমসাময়িক। পূর্ববাঙলার পাঠান শক্তি তখন বিক্ষত, মোগল সাম্রাজ্যও তখন প্রতিষ্ঠিত হয় নি; তখন ত্রিপুররাজ গোবিন্দমাণিক্য সোনারগাঁ বিক্রমপুর পর্যন্ত আপনার রাজ্য বিস্তার করেন। এর পরে টিপ্‌রা শক্তি ক্ষীণবল হয়ে পড়ে। ১৭১১ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিপুর-রাজ যুদ্ধে বন্দী হন; তিনি মুক্তিলাভ করে বারাণসী ও বৃন্দাবন চলে যান। কিন্তু ত্রিপুর-রাজ্য বাঙলা সুবার অন্তর্ভুক্ত হয় নি।

বাঙলা সাহিত্যে ত্রিপুর রাজসভার প্রাচীন কীর্তি হল 'রাজমালা'—পয়ারে লেখা রাজবংশের কথা। ইতিহাসের থেকে তাতে পৌরাণিক কাল্পনিকতা অনেক বেশি; তবু তা বাঙলা সাহিত্যে মূল্যবান। ১৪৫৮ খ্রীষ্টাব্দে শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বর নামে দুই ব্রাহ্মণ ও চংতাই দুর্লভচন্দ্রের সহযোগে ধন্যমাণিক্য রাজবংশের এই কাহিনী সংকলন করান; খ্রীঃ ১৬৬০ ও শেষে খ্রীঃ ১৮৩০-এ তাতে নতুন তথ্য সংযোজিত হয়। একে ত্রিপুরার পুরাণ বলা চলে। বিজয়মাণিক্য ও গোবিন্দমাণিক্যের উৎসাহে সংস্কৃত গ্রন্থেরও বাঙলায় অনুবাদ হয়েছিল। তাই বাঙলা রচনার একটা ঐতিহ্য সেখানে জন্মে; বাঙলা পুঁথিও ও-অঞ্চলে দুর্লভ নয়—(ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন ও মৌঃ আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ এসব পুঁথিপত্রের সংবাদ আমাদের যুগিয়েছেন)। পুঁথির কাল অনেক সময় অনিশ্চিত, সাহিত্যিক মূল্যও অনিশ্চিত।

মণিপুরে বাঙলা-সংস্কৃতি

মণিপুর রাজ্যের কুকি-চীনদের ইতিহাস অবশ্য কৌতূহলোদ্দীপক। তাদের নিজেদের গাথা, কাহিনী, পুরাণ খুব চিত্তাকর্ষক; কিন্তু মণিপুরে এসব লেখা হয়েছে মেইথেইদের নিজস্ব মণিপুরী ভাষায়। মণিপুরে চৈতন্য-দেবের বৈষ্ণব-ধর্ম আজ সর্বব্যাপী, তার মাধ্যমে বাঙালী সংস্কৃতি মণিপুরী

জীবনে ও সাহিত্যে একটি ছাপ এঁকে দিয়েছে। সম্প্রতি তার উপর 'হিন্দী' রাষ্ট্রভাষাও চেপে বসছে। কিন্তু চৈতন্যধর্ম মণিপুরে বিস্তারলাভ করে অনেক পরে—অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। শ্রীহট্ট থেকেই এ ধর্ম মণিপুর যায়। শ্রীহট্ট চৈতন্যদেবের পিতৃভূমি,—বেশ বোঝা যায় বৈষ্ণব ঐতিহ্য শ্রীহট্টে কামরূপে বরাবর ছিল। শ্রীহট্ট অদ্বৈত আচার্যের জন্মভূমি; শ্রীরাম পণ্ডিত, শ্রীচন্দ্রশেখর দেব ও মুরারি গুপ্ত শ্রীহট্টেরই মানুষ; চৈতন্যদেবের পরে শ্রীহট্ট চৈতন্যধর্মের অব্যাহত ঐতিহ্যের কেন্দ্র হয়ে ওঠে—তা বৈষ্ণব-সাহিত্যের ইতিহাস দেখলেও আমরা বুঝি। এখান থেকেই বাঙলাও প্রসারিত হয় মণিপুরে ও ত্রিপুরায়। মণিপুরী ভাষা (মেইথেই) অষ্টাদশ শতক থেকে বাঙলা লিপিতে লিখিত হচ্ছে। আর অন্যদিকে বাঙলার বৈষ্ণব-ধর্মকে গ্রহণ করে মেইথেই শিল্প-বোধ উদ্ভাবন করেছে অপূর্ব-সুন্দর মণিপুরী 'রাস' নৃত্যকলা। কিন্তু মণিপুর বাঙলা সাহিত্যে প্রত্যক্ষ কোনো দান যোগায় নি, তার নিজের সাহিত্য আছে।

আরাকান বা রোসাঙ্গের রাজসভা

বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে সত্যকারের যে রাজসভার নাম চির-সমুজ্জ্বল, সে হচ্ছে রোসাঙ্গের রাজসভা। রোসাঙ্গ ছিল আরাকানের রাজধানী। অস্ট্রিক, বোডো, কুকি-চীন ও বর্মাদের ক্রম-মিশ্রিত উপাদান দিয়ে আরাকানের নৃ-বৈজ্ঞানিক ইতিহাস রচিত। খ্রীষ্টীয় শতকের প্রথম থেকেই আরাকানে ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ, ক্ষত্রিয়, প্রভৃতি উত্তরভারতীয় ঔপনিবেশিকদের সমাগম শুরু হয়; বর্তমান ম্রোহউং (আকিয়াবের সন্নিকটস্থ), বা পুরাতন বেসলি বা বৈশালীনগর, ছিল তাদেরই স্থাপিত প্রথম রাজধানী। ম্রোহউং-এ রাজা আনন্দচন্দ্রের নামে সংস্কৃত ভাষায় স্তম্ভ-প্রশস্তি আছে। চট্টগ্রাম-আরাকানে অষ্টম শতাব্দীর পূর্বেই বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, সে প্রশস্তি থেকে তা স্পষ্ট হয়। বর্মীভাষা ব্যাপ্ত হয়ে গেলেও সপ্তদশশতক পর্যন্ত আরাকান ভারতবর্ষেরই একটি অংশ ছিল। চাটিগাঁতে পাঠান রাজারাও একটি কেন্দ্র স্থাপন করে সীমান্ত রক্ষা করতেন। তারপরে সে অঞ্চলে ত্রিপুরার ধন্যমাণিক্য ও পরাগল খাঁর অভিযানের কথা আমরা জানি ছুটি খাঁর পরে অবশ্য আর সেই পরাগলী-ঐতিহ্য বা হুসেন-শাহী ঐতিহ্যের সন্ধান সে অঞ্চলে কিছুদিন পাওয়া যায় না। তখন পাঠান-মোগল ও নানা আঞ্চলিক রাজাদের ভাগ্যপরীক্ষার কাল।

হয়, গৌড়ের সুলতানদের পতন আরম্ভ হলে (১৫৩৮-১৫৭৫) গৌড়ের মুসলমান উজীর-ওমরাহরা শ্রীহট্টে ও চট্টগ্রামের দিকে পশ্চাদ্গমন করে থাকবেন ; হয়তো তাঁদের সঙ্গে জৌনপুরী শর্কিদের 'শরণার্থী' অভিজাতরাও ছিলেন, তাঁরাও শ্রীহট্ট ও চট্টগ্রামের দিকে বাস করিতে যান। শ্রীহট্টের ও চট্টগ্রামের সুফী প্রভাবিত অভিজাতরাই আরাকানের আমীর-ওমরাহ্ নিযুক্ত হতেন। আরাকান রাজসভায় আরবী-ফারসি-বিদগ্ধ এবং সুফী-মতবাদে অনুরক্ত কবিদের আবির্ভাব তাই সম্ভব হয়। এই জন্ত দেখি—বিদগ্ধ মুসলমান ফারসি রচনা ছেড়ে এখন বাঙ্‌লা রচনায় উৎসাহ বোধ করলেন। বাঙ্‌লার বিভিন্ন অঞ্চলে সৈয়দ মর্তুজা, নসীর মামুদ, আলী রাজা প্রভৃতি বৈষ্ণব পদকার মুসলমান ভক্ত কবিদের আবির্ভাবও সম্ভবত সহজ হয়েছিল এই সুফী-মতবাদের প্রসারে। বাঙ্‌লায় সুফী সাধনার প্রভাব শুধু কাব্যক্ষেত্রে নয়, লোক-জীবনে ও সাধন-ক্ষেত্রেও যথেষ্ট প্রবেশলাভ করেছিল। (এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য ডঃ এনামুল হকের 'বঙ্গে সুফী প্রভাব' নামীয় গ্রন্থ ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ইংরেজি প্রবন্ধ 'ইস্‌লামিক মিস্টিসিজম্' ও ডঃ সুকুমার সেনের আলোচনা, বাঃ সাঃ ইঃ)

রোসাঙ্গ-সাহিত্যের অভিনবত্ব : আরাকানের রাজারা ছিলেন 'মগ'—অর্থাৎ বর্ম জাতীয় মানুষ, তাঁরা ধর্মে ছিলেন বৌদ্ধ। বর্মীগোষ্ঠীর মগী ভাষাই তাঁরা বলতেন, কিন্তু বাঙ্‌লা ভাষাও চলত। ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে মগের অত্যাচার ও ফিরিঙ্গির অত্যাচারে নিম্নবঙ্গের বাঙালী জনসাধারণের জীবন দুর্বিষহ হয়েছিল, এ কথাও বিস্মৃত হবার নয়। 'মগের মুলুক' কথাটা তাদের সেই কুকীর্তির স্মৃতি জাগিয়ে রেখেছে। দয়া ধর্ম সদাশয়তা, এমন কি স্থায়ী রাজনৈতিক বুদ্ধি, এসব কোনো গুণ তাঁদের বিশেষ ছিল মনে হয় না ; কিন্তু ছিল সম্ভবত একটা রাজকীয় গুণ—বর্মার বর্মীদেরও তা ছিল :—ধর্ম-সংকীর্ণতাবর্জিত অনুগ্রহ বিতরণের ব্যবস্থা। অন্ততঃ কে হিন্দু, কে মুসলমান, কে বৌদ্ধ এ নিয়ে তাঁদের মাথাব্যথা ছিল বলে মনে হয় না। এ কি 'কিরাত'-কৃতিরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ? হয়তো মগেরা অন্তান্ত মঙ্গোলয়েড্‌দের মতো অতটা হিন্দু-সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে নি ; মধ্যযুগের সাংস্কৃতিক প্রতিরোধমূলক বাঙালী পুনরভ্যুদয় মগদের তাই কবলিত করে ফেলবার মতো সময় ও সুযোগ পায়নি ; ইস্‌লামী সংস্কৃতি সম্বন্ধেও তাদের তাই কোনো বিরোধিতা জন্মেনি। বিশেষত, সুফী মতবাদের ইস্‌লাম, হিন্দু প্রেমধর্মের ও যোগ-সাধনার সঙ্গে

মিশ্রিত ও মিলিত হয়ে তাদের নিকট অনুগ্রহ মনোহর রূপেই উপস্থিত হয়েছিল। কাজেই রোসাঙ্গের রাজসভায় দেখি সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের দায়ে বর্জন-বুদ্ধির স্থান হয়নি।

এই রোসাঙ্গের রাজসভায় আমরা বাঙ্‌লা ভাষার প্রথম শক্তিশালী মুসলমান কবির দর্শন পাই, এবং প্রথম আদরণীয় মানবীয় প্রণয়-কাহিনীর পরিচয় লাভ করি;—বাঙ্‌লা সাহিত্যের ইতিহাসে এই দুইটি বস্তুরই গভীর অর্থ আছে।

কারণ, প্রথমত বুঝেছি—মুসলমান বিদ্বজ্জন আরবী-ফারসি চর্চা সত্ত্বেও এবার বাঙ্‌লার সৃষ্টিক্ষেত্রে প্রবেশ করেছেন। এইটা শাসকবর্গের—এই মুসলমানদের—বাঙালীত্বেরও যেমন অবিসংবাদিত প্রমাণ, বাঙ্‌লা ভাষার সর্বব্যাপী প্রতিষ্ঠারও তেমনি অকাট্য প্রমাণ। বুঝতে পারি—বাঙ্‌লা সাহিত্য আর শুধু হিন্দুর সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের সাহিত্য নেই, এই সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয় পাদ থেকে হিন্দু-মুসলমান বাঙালীর সাংস্কৃতিক সংযোগের সাহিত্য হয়ে উঠছে। তখন রাজা থিরি-থু-ধম্মার (='শ্রীসুধর্মা', আনুমানিক খ্রীঃ ১৬৩২-১৬৩৮) রাজত্বকাল; সেনাপতি ('লস্কর উজীর') আশরাফ্‌ খানের অনুরোধে বাঙ্‌লায় কাব্য-রচনায় ব্রতী হলেন কবি দৌলত কাজী।

দ্বিতীয়ত, বাঙ্‌লা সাহিত্য এতদিন দেবদেবীর মাহাত্ম্য নিয়ে ব্যস্ত ছিল, প্রকাশ্যত মানবীয় প্রণয় নিয়ে কাব্য লেখা হয়নি। অথচ সংস্কৃত-সাহিত্যে মানুষের প্রণয়-কাহিনীর অভাব ছিল না; এবং লোকসমাজ চিরদিনই এসব প্রণয়-কাহিনী বলত, শুনত, গাইত। অবশ্য রোমাণ্টিক প্রণয়-লীলারই মুখপাত্র ছিল সেই সংস্কৃত সাহিত্যের নর-নারী। রোমান্সের বিস্ময়-রস পার্থিব জীবনে না খুঁজে, কবিরা তখনো তা খুঁজতেন অলৌকিকতায়, দেবদেবী, যোগী-মায়াবী অপ্সরা প্রভৃতির ক্রিয়া-কর্মে। যাকে 'মানব-চরিত্র' বলে তা তখনো কাব্যে নেই। তথাপি সংস্কৃত কবিদের সে সব কাব্যে মুখ্যত কথাবস্তু ছিল রোমাণ্টিক মানবীয় প্রণয়, এটি কম কথা নয়। অপভ্রংশ পর্যন্ত এই মানবীয় প্রণয়-কাহিনীর ধারা ভারতীয় সাহিত্যে অব্যাহত ছিল। ভারতবর্ষের হিন্দী, গুজরাটী প্রভৃতি আধুনিক সাহিত্যের প্রথম দিককার রচনায়ও সে ধারার সন্ধান পাওয়া যায় (যেমন, মাধবানল ও কামকন্দলী বিষয়ক কথা)। বাঙ্‌লায় কিন্তু ধর্মসংস্কার-মুক্ত এরূপ ঐহিক (secular) কাব্যকথা নেই; এমন কি বিদ্যাসুন্দর কাহিনীও বাঙ্‌লায় ধর্মের খোলসটি

পরে দেখা দেয়, সে খোলস বজায় রেখে চলে। অথচ সাহিত্য যতক্ষণ পর-লোক ও ধর্মের এই গাঁটছড়া ছেড়ে মর্ত্যলোক ও মানব-প্রকৃতির সঙ্গে মিলন-সূত্র খুঁজে না পায়, ততক্ষণ সাহিত্য আত্মপ্রতিষ্ঠিত নয়। কবি দৌলত কাজীর 'লোর-চন্দ্রাণী' বা 'সতীময়না' এই হিসাবে বাঙলা কাব্যের আত্ম-প্রতিষ্ঠার নূতন প্রয়াস, তা ধর্ম-সংস্কার-মুক্ত মানবীয় প্রণয়-কাহিনীর প্রথম একটি কাব্য।

প্রণয় কাব্যের এই ভারতীয় ধারা বাঙলায় এসময়ে এল, নিঃসন্দেহে হিন্দ্-ফারসি রোমাণ্টিক কাব্যধারার প্রবাহে মিশে বিদগ্ধ মুসলমান কবিদের সার্থক প্রয়াসে। মানবীয় প্রণয় কাব্য বাঙলায় এর পূর্বেও রচিত হয়ে থাকবে,—বিদ্যাসুন্দরের প্রথম জানা বাঙলা কাব্য লেখা হয়েছিল নুসরৎ শাহের পুত্র যুবরাজ ফিরুজ শাহের উৎসাহে "দ্বিজ" শ্রীধরের দ্বারা, তা বলেছি। নেপালে প্রাপ্ত বাঙলা নাটকের মধ্যেও দেখেছি—কাশীনাথের লিখিত 'বিদ্যাবিলাপ' নাটক পাওয়া গিয়েছে। হয়তো আরও এ জাতীয় লেখা যা ছিল তা টিকে নেই। আর, দৌলত কাজীর পূর্বেও হয়তো কোনো কোনো মুসলমান কবি কিছু লিখে থাক্‌বেন। যেমন কবি সাবিরিদ খান বা শাহ মহম্মদ সগীর প্রাচীনতর হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু এ বিষয়ে তথাপি নিঃসংশয়ে বলা যায়—দৌলত কাজীই প্রথম শক্তিশালী বাঙালী মুসলমান কবি; 'লোর চন্দ্রাণী' বাঙলা সাহিত্যের প্রথম স্মরণীয় secular বা ধর্ম-সংস্কার-মুক্ত মানবীয় প্রণয় কাব্য—এবং রোসাঙের রাজসভা এ ধারার উদ্ভবক্ষেত্র।*

দৌলত কাজীর 'সতী ময়না' বা 'লোর চন্দ্রাণী': 'সতী ময়না' বা 'লোর চন্দ্রাণী' দৌলত কাজী সমাপ্ত করে যেতে পারেন নি; কবি

* অবশ্য দুর্ভাগ্যের কথা, সাধারণ বাঙালী পাঠকের পক্ষে দৌলত কাজীর কাব্য বা আরাকানের গৌরব আলাওলের কাব্যসমূহও দুষ্প্রাপ্য। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত মৌঃ আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদের অমূল্য গ্রন্থখনি 'প্রাচীন পুঁথির বিবরণ'ই ছিল অনেক দিন পর্যন্ত সাধারণ উপাদান। তারপরে ১৯৩৫এ ডঃ এনামুল হক ও আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ সাহেবের 'আরাকান রাজসভায় বাঙলা সাহিত্য' প্রকাশিত হয় এবং ১৯৩৭ সালে ডঃ শহীদুল্লাহ্ সাহেবের সম্পাদিত 'পদ্মাবতী, ১ম খণ্ড'ও ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এখনো তবু পাঠক-সাধারণের অনেক সময়ে এই সব গ্রন্থের রসাস্বাদন করতে হয় উদ্ধৃতি থেকে—প্রাঃ পুঃ বিঃ, ডঃ দীনেশ সেন ও ডঃ সুকুমার সেনের বাঃ সাঃ ইতিহাস থেকে। হবিবি প্রেসে মুদ্রিত 'লোর চন্দ্রাণী' বা আলাওলের কাব্যও এতদিন দুষ্প্রাপ্য ছিল, যথোচিতভাবে সম্পাদিত হয় নি। সম্প্রতি বিশ্বভারতীর 'সাহিত্য প্রকাশিকা' গ্রন্থে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র ঘোষালের টীকাটিপ্পনীসহ 'লোর চন্দ্রাণী' প্রকাশিত হয়েছে।

আলাওল পরে (খ্রীঃ ১৬৫৯) তা সম্পূর্ণ করেন। দৌলত কাজী এ কাব্য লেখেন রাজা 'শ্রীসুধর্মা'র 'লস্কর উজীর' আশরফ্ খানের অনুরোধে (অর্থাৎ ১৬২২ থেকে ১৬৩৮ এর মধ্যে ; তখন সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বের শেষদিক, সাজাহানের রাজত্বের প্রথম ভাগ)। আশরফ্ খান ছিলেন 'চিশ্তি' সম্প্রদায়ের স্ফী গুরুর শিষ্য। অন্তত সাতটি স্ফী সম্প্রদায় বাঙলা দেশে নিজেদের মতবাদ প্রচার করেছিলেন: যথা, সুহ্রাবর্দি, চিশ্তি, কালন্দরীয়া, মাদারিয়া, আধমিয়া, নক্শবন্দিয়া ও কাদিরিয়া। অনুগৃহীত কবি কিছু অত্যুক্তি করতে পারেন, কিন্তু 'চিশ্তিয়া' খান্দান আশরফ্ খান যে অসাধারণ গুণগ্রাহী ছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই।

পরদেশী স্বদেশী নাহিক আত্মপর।
দীঘি সরোবর দিলা অতি বহুতর ॥
নীতি-বিদ্যা কাব্য-শাস্ত্র নানা রসময়।
পঠিতে শুনিতে নিত্য আনন্দ হৃদয় ॥

আরবী-ফারসি উপদেশ তিনি শুনতেন, এ কাহিনীও সম্ভবত শুনেছিলেন,—অবধী (গোহারি) ভাষায় উত্তর ভারতে তা প্রচলিত ছিল,—এখনো দক্ষিণ বিহারের গ্রাম-সঙ্গীতে লোরক মল্লের লোককাহিনী গীত হয়। আশরফ্ খান কবিকে বাঙলায় এ কাহিনী রচনা করতে বললেন :

দেশী ভাষে কই তাক পাঞ্চালীর ছন্দ।
সকলে শুনিয়া যেন বুঝয়ে সানন্দ ॥

দৌলত কাজী পাঞ্চালীর ছন্দে যে 'ময়নার ভারতী' লিখলেন কথা-বস্তুতে তা হিন্দ-ফারসি প্রণয়-কথা ; কিন্তু রূপে ও ভাবে তা বাঙলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃত কাব্যাদর্শে ও সংস্কৃত-বাঙলা ঐতিহ্যে রচিত, বিদগ্ধ ও বিশুদ্ধ বাঙলা কবিতা। ভূমিকাংশে আছে প্রথমে আল্লা ও রসুল বন্দনা, তারপরে রাজা শ্রীসুধর্মার সুবিচারের প্রশংসা—'কাকে কেহ না হিংসে উচিত ব্যবহার', আশরফ্ খানের পূর্বোক্ত প্রশংসা, রাজার বিপিন বিহারের কথা, এবং আশরফ্ খানের দ্বারা কাব্য রচনার নির্দেশ। তারপরে গল্প আরম্ভ হয় :

রাজার কুমারী এক নামে ময়নামতী।
ভুবন বিজয়ী যেন জগৎ পার্বতী ॥

'স্বামীর লোরক নাম নৃপতিনন্দন'। তিনি গেলেন বিপিন বিহারে (রাজা সুধর্মার মতোই), সেখানে এক যোগী এসে তাঁকে দেখালে গোহারি দেশের

রাজকন্তা চন্দ্রালীর চিত্র। চন্দ্রালী বিবাহিতা, কিন্তু চন্দ্রালীর স্বামী বামন-বীর নপুংসক। যোগীও বোঝালেন—বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী তখন এতই সুবিদিত—

চন্দ্রালীর তোমার মিলন মনোরম।
বিদ্যা সঙ্গে সুন্দরের যেন সমাগম॥

লোরক মুগ্ধ হয়েছিলেন, অমনি মিলনে উদ্যোগী হলেন; যোগীর সঙ্গে চললেন গোহারি রাজ্যে। রাজকন্যা চন্দ্রালীও সেখানে গবাক্ষ থেকে লোরককে দেখে আত্মহারা হলেন। ধাইয়ের মধ্যস্থতায় দুজনার দেখা হল দেবমন্দিরে, মিলন হল গোপনে চন্দ্রালীর গৃহে। তারপর স্বচ্ছন্দ মিলনের বাধা দেখে তাঁরা বনপথে নিজ দেশে পালাচ্ছিলেন, বামন তাড়া করলে। যুদ্ধে কিন্তু বামন নিহত হল। চন্দ্রালীকেও সর্পে দংশন করেছিল, কিন্তু এক সাধু তাঁকে পুনর্জীবিত করলেন। গোহারির রাজা তাঁদের তখন রাজ্যে ফিরিয়ে আনলেন। সেখানেই লোর ও চন্দ্রালী রাজ্য করেছেন।—এ হল প্রথম খণ্ড লোর-চন্দ্রালীর কথা। ময়নামতী এ খণ্ডে 'কাব্যে উপেক্ষিতা'।

দ্বিতীয় খণ্ডে সতী ময়নামতীর কথা। বিরহিণী ময়নামতী একান্তে পতির মঙ্গল-চিন্তায় হরগৌরীর আরাধনা করেন। তাঁর সুযশে আকৃষ্ট হল ছাতন নামে প্রতিবেশী এক রাজপুত্র। সে রত্না মালিনীকে দূতীর কাজে নিযুক্ত করলে। দূতী কথা পাড়ে—পদ রচনা করে উত্তর দেন ময়নামতী। দূতী বলে:

হেলায় যৌবন যাইব পাছে পাইবা শোক।
পুরুষ মিলাইয়া দিমু ভুঞ্জ সুখভোগ॥

ময়নামতী বিরক্ত হন। মালিনী তখন কৌশলী সেনাপতির মত পরোক্ষ-পথে আক্রমণ চালায়। আরম্ভ করে নববর্ষার বর্ণনা—বৈষ্ণব পদাবলীর সুচারু রীতিতে—

দেখ ময়নামতী প্রথম আষাঢ়
চৌদিকে সাজে গম্ভীর। ইত্যাদি

ময়নাও উত্তর দেন আসাবরী রাগে—আরও সুমধুর পদে:

আই ধাই কুজনী কি মোহে শুনাওনি
বেদ-উক্তি নহে পাটং। ইত্যাদি

তারপর শ্রাবণ মাস;—তেমনি রাগ-রাগিণীতে প্রস্তাব ও উত্তর। বাঙলা 'বারমাস্তার' একঘেয়ে ইতিহাসেও এ ঋতুবর্ণন অপূর্ব নূতন জিনিস। দৌলত

কাজী গীতি-কবিতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। কিন্তু জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষাংশ রচনার পূর্বেই দৌলত কাজী পরলোকগত হন। বহু বৎসর পরে তা শেষ করে সৈয়দ আলাওল অসমাপ্ত কাহিনী সমাপ্ত করেন; কিন্তু আলাওলের কবি-গৌরব এ কাব্যে বর্ধিত হয় নি। সেই দ্বিতীয় খণ্ড শেষ হয়—ময়নামতী দূতীকে তাড়িয়ে দিলে। তৃতীয় খণ্ড সম্পূর্ণ আলাওলের রচনা—এক ব্রাহ্মণের হাতে শুক-সারি দিয়ে ময়না ব্রাহ্মণকে পাঠালেন লোরের নিকট। সারির কথায় লোরের পূর্বস্মৃতি জেগে উঠল। তখন পুত্র প্রচণ্ডতপনের হাতে সেই রাজ্য দিয়ে তিনি চন্দ্রানীকে-শুদ্ধ স্বদেশে ফিরলেন,—দুই রাণীকে নিয়ে সুখে রাজ্য করতে লাগলেন।

কবি আলাওলঃ রোসাঙ্গের রাজসভায় দৌলত কাজীর পরেই উদিত হন কবি সৈয়দ আলাওল। তিনিই সে সভার শ্রেষ্ঠ কবি। 'সতী ময়না'র শেষাংশ রচনায় তিনি কবিত্বে দৌলত কাজীর সমতুল্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে পারেন নি, তা সত্য। কিন্তু বাঙ্‌লা সাহিত্যে আলাওল তথাপি বৃহত্তর প্রতিভা। সে প্রতিভা বহুমুখী,—সঙ্গীতে, নৃত্যে, দর্শনে বহু বিষয়ে তা স্বচ্ছন্দ; ভাবৈশ্বর্যেও তাঁর কাব্য গভীর; সূফী প্রেমোন্মাদনার ও রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলার সংযোগে তা চিত্তস্পর্শী। তাঁর কবিকৃতি ও বাণীরচনাও অকৃত্রিম; বাঙ্‌লা কাব্যের সীমান্ত তিনি ক্লাসিক-ধর্ম বা শিষ্ট-বাণীরূপে মার্জিত করে যান। সর্বোপরি ধর্ম-সংকীর্ণতামুক্ত মানবিকতার এমন একটি ভাবলোক আলাওল সৃষ্টি করেছেন যা মধ্যযুগে দুর্লভ। তাই কবিকঙ্কণের মত মানব-চরিত্র-রসিক না হলেও, কিম্বা পদাবলীর কবিদের মতো সুতীব্র হৃদয়াবেগের অধিকারী না হলেও, আলাওলই একমাত্র কবি যিনি সেই মধ্য-যুগের পার থেকেও তাঁর উদার মানবিকতায় কতকাংশে স্মরণ করিয়ে দেন এ যুগের রবীন্দ্রনাথকে।

কবিজীবন ও কাব্যঃ আলাওলের জীবনও কম বৈচিত্র্যপূর্ণ নয়। গ্রন্থমধ্যে নানাস্থানে তিনি নিজ পরিচয়ও রেখে গিয়েছেন। তাঁর পিতা ছিলেন ফতোয়াবাদ পরগণার শাসনকর্তা 'মজলিস কুতুবের' অমাত্য, এবং 'গৌড় মধ্যে মুলুক ফতোয়াবাদ শ্রেষ্ঠ'। এ 'মুলুক' তবু কোথায় বলা এখন দুঃসাধ্য। ফতোয়াবাদ নিম্ন বঙ্গেরই কোথাও হবে, ফরিদপুরেও হতে পারে। কারণ, "মধ্যে ভাগীরথী ধারা বহে অনুক্ষণ"। তা ছাড়া, কার্যোপলক্ষে যখন একবার পিতাপুত্র নৌকাযোগে কোথাও যাচ্ছিলেন তখন সেখানে দেখা হল

'হারমাদ'দের সঙ্গে—নিম্নবঙ্গের অবস্থা তখন কিরূপ তা বুঝতে পারা যায়। পিতা যুদ্ধ করে মারা যান, আলাওল ভাগ্যবশে এলেন আরাকান রাজ্যের রাজধানী রোসাঙ্গে। সেখানে তিনি প্রথম হন রাজ-আয়োয়ার। আলাওলের প্রতিভা সেখানে সর্বদিকেই বিকাশের সুযোগ লাভ করে থাকবে; তালিব-আলিম বলে তাঁর খ্যাতি শীঘ্রই রোসাঙ্গের ওম্‌রাহ্‌ মহলে ছড়িয়ে পড়ল।

বহু মহন্তের পুত্র মহা মহানর।
নাট গান সঙ্গীত শিখাইনু বহুতর।

কবি প্রথমে স্থান পেলেন শ্রীচন্দ্র সুধর্মার মন্ত্রী সোলেমানের আসরে।—

তাহান সভাতে গুণিগণ অবিরত।
জ্ঞান উক্তি রস কথা সুনন্ত সতত॥

সোলেমানেরই কথায় আলাওল হাত দেন দৌলত কাজীর 'সতী ময়নামতী' কাব্য সমাপ্ত করার কাজে। তখনো হয়তো আলাওলের কবিশক্তি পূর্ণস্ফূর্তি লাভ করে নি। অন্তত তিনি বিদ্বান্ মানুষের মতই বিনয়ী। দৌলত কাজীর কীর্তি উল্লেখ করে তাই আলাওল বলছেন—

তান সম আমার না হয় পদ গাঁথা।
গুণিগণ বিচারিয়া কহ সত্য কথা॥

আর 'সতী ময়নামতী' শেষও করেছেন এই বলে—

মুই মোহা পাতকীর পাপ নাহি ওর।
আশীর্বাদ কর স্বর্গগতি হোউক মোর॥

সোলেমানের অনুরোধেই পরে আলাওলের আর একখানি গ্রন্থও প্রণীত হয় (খ্রীঃ ১৬৬৩); তা হচ্ছে 'তোহ্‌ফা'—ফারসিতে লিখিত ইসলামি ধর্ম নিবন্ধের তা অনুবাদ। যদি কবির কথারম্ভের উক্তি মামুলী বিনয় না হয়, তা হলে 'তোহ্‌ফা' কবির শেষ বয়সের রচনা:

মুই আলাওল হীন দৈব বশ অনুদিন
বিধি বিড়ম্বিল বৃদ্ধকালে।
পাইতে ঈশ্বর মর্ম না করিলুঁ কোন কর্ম
বৃথা জন্ম গোঁয়াইনু কালে। ইত্যাদি—

ইতিমধ্যে ভাগ্যবিড়ম্বনা আলাওলের যথেষ্ট ঘটেছে। কারণ আলাওলের নাম, যশ রাজদরবারেও পৌছেছিল, তাতেই বিপদও ঘটে। রোসাঙ্গে তখন রাজা ও রাজভগ্নীর যৌথ-শাসন, রাজভগ্নীই মুখ্য পাটেশ্বরী। সেই রাজভগ্নীর

প্রধান অমাত্য ছিলেন মাগন ঠাকুর। তিনিও ছিলেন পীরভক্ত। তিনি কবিকে বিশেষ সমাদর করেন। এই মাগন ঠাকুরের অনুরোধে আলাওল বাঙ্‌লায় অনুবাদ করলেন অবধীতে লেখা মালিক মহম্মদ জায়সীর প্রসিদ্ধ কাব্য 'পদুমাবত্‌'। আলাওলের শ্রেষ্ঠ কীর্তি এই 'পদ্মাবতী'। মাগন ঠাকুরের অনুরোধেই আলাওল ফারসি আখ্যায়িকা-কাব্য 'সয়ফুলমুলক বদি উজ্জমাল'ও বাঙ্‌লায় অনুবাদে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু সে কাব্য অর্ধেক অনুবাদ হয়েছে, এমন সময়ে মাগন ঠাকুরের মৃত্যু হল। কাব্য আর তখনকার মতো শেষ হল না। এর পরেই সম্ভবত আলাওলের ভাগ্য-বিপর্যয়ও ঘটে। পরাজিত শাহ্‌ শুজা আরাকানের রাজদরবারে আশ্রয় নিতে আসেন, এবং কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর সঙ্গে রোসাঙ্গ-রাজের বিবাদ হয়, সুজা সপরিবারে নিহত হন। কিন্তু শুজার মৃত্যুর পূর্বেই সম্ভবত আলাওল রচনা করেন—'সপ্ত পয়কর' (কবি নিজামীর 'হপ্ত পয়করে'র অনুসরণে)। তখন শ্রীচন্দ্র সুধর্মা রাজা (খ্রীঃ ১৬৫২—১৬৮৪)। কবির কথা থেকে মনে হয় শুজাও জীবিত ছিলেন ;

দিল্লীশ্বর বংশ আসি যাহার চরণে পশি
তার সম কাহার মহিমা,…

সেনাপতি সৈয়দ মহম্মদ ছিলেন সুধর্মার সেনাপতি, তিনিই নিজামীর ফারসি কাব্য শুনতে চান বাঙ্‌লায়। সে গ্রন্থে আছে—সাত দিনের সাতটি গল্প। আলাওলের গল্পের কথারম্ভ এরূপ ; রাজপুত্র বাহ্‌রাম বিদেশে ছিলেন, রাজা এক শিল্পীকে দিয়ে তাঁর জন্য সাত রঙের সাতটি 'টঙ্গি' নির্মাণ করিয়েছিলেন—শ্রীহট্ট, ময়মনসিংহে টঙ্গিই রাজাদের বিলাস-প্রাসাদ। এদিকে রাজার মৃত্যু হলে মন্ত্রী সিংহাসন অধিকার করে। বাহ্‌রাম ফিরে এসে যুদ্ধ করে নিজ রাজ্য উদ্ধার করলেন, প্রতিবেশী সাত রাজাকে পরাস্ত করে সাত রাজকন্যাকে বিবাহ করলেন, তাঁদের এক-একজনকে দিলেন বাসের জন্য এক-একটি টঙ্গি। এক-এক রাজকন্যার কাছে তখন এক-একদিন তিনি একটি করে গল্প শুনতেন। 'সপ্ত পয়কর' এই গল্প-সপ্তক।

কিন্তু রোসাঙ্গে এর পরেই হয়তো শুজার বিদ্রোহ ঘটে। আলাওলের শত্রু-পক্ষ ছিল। শুজার সঙ্গে রাজার বিরোধ-সময়ে তারা আলাওলকেও বিদ্রোহী বলে অপবাদ প্রচার করে। আলাওল তাই কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলেন।

বহুল যন্ত্রণা দুঃখ পাইলুঁ কর্কশ।
গর্ভবাসে প্রায় ছিলুঁ পঞ্চাশ দিবস॥

রাজা অবশ্য পরে নির্দোষ বুঝে কবিকে মুক্তি দেন। কিন্তু তখন আলাওল নিঃসম্বল, দেহ মনেও ভগ্ন—

আয়ু ছিল শেষ আমার রাখিল বিধাতাএ।
সবে ভিক্ষা জীব রক্ষা ক্লেশে দিন যাএ॥

অনেক দিন পরে কবির সে দৈন্য লাঘব হল শ্রীচন্দ্র সুধর্মার প্রধান অমাত্য সৈয়দ মুসার আশ্রয় লাভ করে। তিনিও পীরভক্ত। তাঁর অনুরোধেই নয় বৎসর পরে আলাওল অসমাপ্ত 'সয়ফুল-মুলুক বদিউজ্জমাল' সমাপ্ত করেন—রাজপুত্র সয়ফুলমুল্‌ক্‌ ও পরীরাজকন্যা বদিউজ্জমালের তা প্রণয়-বৃত্তান্ত। জীবনে অনেক তিনি সয়েছেন, সুফী কাদিরি গুরুর শিষ্য আলাওলের তখন কবি-যশেও আগ্রহ নেই।

রচিনু পুস্তক আমি নানা আলাজালা।
বৃদ্ধকালে ঈশ্বর ভাবেতে হৈলে ভালা॥

কিন্তু সৈয়দ মুসা জানালেন—এতো সাধারণ লোকের মতো কথা। আর—

অন্য জন নহ তুমি আলাওল গুণী।

অবশ্য আলাওলের কবিত্ব আর পুনঃস্ফূর্তি লাভ করল না। তাঁর মনে তখন একটা বিষন্ন বৈরাগ্যের ছায়া নামছে:

যদি মোর কবিরসে সুখ লাগে মনে।
আশীর্বাদ কর মোরে ফকীর কারণে॥
ঈশ্বরেতে মুক্তি মাগ আমার লাগিয়া।
পড়িও ফতেয়া এক মুষ্টি অন্ন খাইয়া॥

এ সুর ভারতীয় বৈরাগ্যের সুপরিচিত সুর, সুফী কবিরও মনের কথা।

আলাওলের শেষ রচনা 'সেকান্দার নামা' (খ্রীঃ ১৬৭১)—তাও কবি নিজামীর 'ইসকান্দর নামার' অনুবাদ। এ কাব্য আলাওল লেখেন সৈয়দ মুসার আশ্রয়ে মজলিস নবরাজের সভায়। সে সভাও গুণীর সভা ছিল। গ্রন্থারম্ভে আমরা জানতে পারি—আলাওল তাঁকে বলেছিলেন হিন্দু-জাতি নানা দুঃখে অর্থ উপার্জন করেও মন্দির, পুষ্করিণী প্রভৃতি দেয়, তাদের নাম তাতে ধন্য হয়। কাব্য-রসিক নবরাজ উত্তরে জানান—মসজিদ্‌, পুষ্করিণী নিজ দেশে মাত্র থাকে, কিন্তু গ্রন্থকথা দেশবিদেশের মানুষ শোনে। সেকান্দরের মহাবীরত্বের যে সব কাহিনী আছে কবি আলাওলই তা

বাঙলায় রচনা করে নবরাজের নামও সেইভাবে ধন্য করুন; কাব্যই নবরাজকেও দিবে অমরতা।

'সতী ময়নামতী'; 'পদ্মাবতী', 'সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জমাল', 'সপ্তপয়কর', 'তোহ্‌ফা' ও 'সেকান্দর নামা'—এই ছয় খানা ছাড়াও আলাওল পদাবলী ও গানও রচনা করেছেন। তবে আলাওলের প্রধান কীর্তি 'পদ্মাবতী'।

'পদ্মাবতী'—মালিক মহম্মদ জায়সীর 'পদুমাবত্‌' কাব্যের অনুবাদ। একমাত্র 'সতী ময়নামতী'ই অনুবাদ নয়, না হলে আলাওল কাব্যে মৌলিক গল্প উদ্ভাবন করেন নি, সেকালে কেই বা তা উদ্ভাবন করত? প্রচলিত কথাবস্তু নিয়েই কবিরা কাব্যসৃষ্টিতে প্রবৃত্ত হতেন। আসলে কাব্যের অনুবাদ হয় না; তাই কাব্যের সার্থক অনুবাদ মাত্রই মূলানুগত নূতন সৃষ্টি। পদ্মাবতীও তা'ই। এ কাব্যে আলাওল কোথাও মূলের যথাযথ অনুগামী হয়েছেন, কোথাও বা স্বচ্ছন্দ নিয়মে জায়সীর অনুসরণ করেছেন। কোথাও তা সংক্ষিপ্ত করেছেন, কোথাও বা তিনি নূতন কথা যোগ করেছেন। নিজেই কবি জানিয়েছেন,—

> এই সূত্রে কবি মহাম্মদে করি ভক্তি।
> স্থানে স্থান প্রকাশিব নিজ-মন উক্তি॥

পদ্মাবতীর গল্প সুপরিচিত, তা চিতোরের পদ্মিনীর উপাখ্যান। এ কাহিনীতে অবশ্য পদ্মাবতীকে পত্নীরূপে লাভ করেন রাজা রত্নসেন। তান্ত্রিক পণ্ডিত রাঘবচেতন আলাউদ্দীনকে প্ররোচিত করে পদ্মাবতীকে লাভ করার জন্য। আলাউদ্দীনের ছলনায় রাজা বন্দী হন, কিন্তু গোরা তাঁকে মুক্ত করেন। অন্যদিকে আর এক রাজা দেওপালও পদ্মাবতীকে লাভ করার জন্য চিতোর আক্রমণ করে। যুদ্ধে সে নিহত হয়, রত্নসেনও আহত হয়ে প্রাণ হারান। তার-পর পদ্মাবতী সে চিতায় সহমৃতা হন। আলাউদ্দীন সে চিতা প্রণাম করে দিল্লী ফিরে যান। আলাওলের রচিত পদ্মাবতীর শেষাংশ পাওয়া যায় নি। পাওয়া গেলে নিশ্চয়ই সূফী আলাওলও সূফী-সাধক জায়সীর মতোই তাতে জানাতেন পদ্মাবতী কাব্য হচ্ছে আধ্যাত্মিক রূপক, পদ্মাবতী (পদ্মিনী) মানুষের বুদ্ধি, রাজা রত্নসেন মন, রাঘব-চেতন শয়তান, আলাউদ্দীন মায়া, ইত্যাদি। পদ্মা-বতীর পাঠ নিয়েও বহু বিতর্ক আছে। কারণ, এ পুঁথি সাধারণত লিখিত হত ফারসি-আরবী হরফে, অথচ আলাওলের ভাষা সুমার্জিত বাঙলা, সংস্কৃত তার ভিত্তি। তাই বাংলায় লিপ্যন্তর-কালে অশিক্ষিত প্রকাশকরা নানা ভ্রম-প্রমাদে পতিত হয়েছেন। ঢাকা থেকে 'পদ্মাবতী, ১ম খণ্ড', কিছু কাল পূর্বে

মুঃ শহীদুল্লাহ্ সাহেবের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে, তারও 'পাঠ সংশোধন' সুদীর্ঘ।) জায়সীরও কাব্যে যা আলওলের নিজ সংযোজন তা তাঁর মাত্রাজ্ঞানের পরিচায়ক, কখনো বা তাঁর পাণ্ডিত্যের ও প্রতিভার প্রমাণ, কখনো বা তাঁর পরিচিত বাঙালী পরিবেশেরই স্বাভাবিক প্রতিফলন। যেমন, পদ্মাবতীর সখীদের কথা, সিংহলের সখীগণের নিকট পদ্মাবতীর বিদায় গ্রহণ, প্রভৃতি (ডঃ সুকুমার সেন সবিস্তারে তা বিচার করেছেন)। কাব্যে প্রসঙ্গক্রমে সঙ্গীত শাস্ত্রের মতামত বা নৃত্যের উল্লেখ করবার প্রলোভন আলাওল সম্বরণ করতে পারেন নি। কিন্তু তিনি বুঝতেন কাব্যে তা অপরিহার্য নয়; তাই কৈফিয়ৎ দিয়েছেন 'না কহিলে দোষ হয়, কৈতে বাসি ডর।' যোগ-সাধনা সম্বন্ধে কবির জ্ঞান সুগভীর, তার প্রমাণও কাব্যে আছে। এমন কি এই প্রবণতার আধিক্যে ক্ষণে ক্ষণে লেখা দুর্বোধ্যও। হিন্দু যোগক্রিয়া ও মুসলমান যোগক্রিয়া দুইই ছিল কবির সুবিদিত। নিম্নে হিন্দু-যোগের কথা আমরা পাই;

উড়িয়ান বন্ধ কটি পরন কৌপীন।
অনাহত শব্দ মধ্যে মন কৈল লীন॥
তথাতে কুণ্ডলী দেবী আছে নিদ্রাবত।
সর্পরূপ ধরি রহে সুষুম্নার পথ॥ ইত্যাদি।

আর কবি নিজে ছিলেন সূফী; সূফী প্রেম-সাধনায়ও তাই কবি ভাবনিমগ্ন।

প্রেম বিনে ভাব নাহি ভাব বিনে রস।
ত্রিভুবনে যত দেখ প্রেম হন্তে বশ॥
প্রেম হন্তে জনমে বিরহ তিনাক্ষর।
পঞ্চাক্ষরে বিরহিনী লক্ষ্য পঞ্চশর॥ ইত্যাদি

এর পরে বুঝতে কষ্ট হয় না—এ কবি পদাবলীর কবিদেরও স্বজাতি, আন্তরিকতার স্পর্শে আলাওলের সেই সব পদ ও গান সত্য সত্যই সমৃদ্ধ। যথা,

আহা মোর বিদরে পরাণ
জাগিতে স্বপনে দেখি তুমে নাহি আন। ধ্রু।
কি জানি লিখিছে বিধি এ পাপ করমে
পাইয়া পরশমণি হারাইলুঁ ভ্রমে॥ ইত্যাদি।

অথবা ব্রজবুলিতে

তুয়া পদ হেরইতি, বাতুল যুবতী কামিনী-মোহন কটাক্ষে হীন ভেল।

প্রেম মদে বিভোল, সতত বহয় লোয়,
অবয়ব পরিহরি শুদ্ধিবুদ্ধি হরি গেল ॥

চন্দন চন্দ্রকিরণ মানে আনল সমান
সৌরভ বিশিখ তবে লাগে।

ভ্রমর কোকিল রব শুনি অতি পরাভব
মন্মথ-বাণ আনল পরে জাগে

কিঞ্চিৎ প্রাণ ঘটে আছে ধুকধুক তুয়া আশ্বাসে।

শ্রীযুত মাগন, রসিক সুজন, আরতি বিহীন
আলাওলে ভাবে ॥

মধ্যযুগের বাঙ্‌লা সাহিত্যে আলাওল অদ্বিতীয় স্রষ্টা না হলেও নব চেতনার প্রভাত-তারকা, যুগান্তের ইঙ্গিত।

মানবীয় প্রণয়-কাহিনী ও অধ্যাত্ম প্রেম-সাধনা দুই প্রেরণাকেই সাহিত্যে আলাওল সম্মিলিত করেছেন। দ্বিতীয়ত, বাঙালী ঐতিহ্যে নিষিক্ত ব্রজলীলায় যেমন তিনি পদ রচনা করছেন, তেমনি সংস্কৃত-জগতের কথাবস্তুর (Matter of Sanskrit World) সঙ্গে ফারসি-আরবীয় কথাবস্তু, এমনকি তোহ্‌ফার মত ধর্ম-নীতিকেও (Matter of Perso-Arabic World) স্বচ্ছন্দে এই পৌরাণিক-প্রতিরোধপুষ্ট বাঙ্‌লা ভাষায় আলাওল সুগ্রথিত করে তুলেছেন। বাঙ্‌লা কবিতার পরিমণ্ডলকে তিনি এই সূত্রে প্রসারিত করে দিয়েছেন; অথচ সেই মুসলমানী জগতে বিচরণ করেও তাঁর বাণী কিছুমাত্র আত্মভ্রষ্ট হয় নি। তা ফিরে এসে দাঁড়ায় বাঙ্‌লা ভাষার সংস্কৃতবিধৃত ভিত্তিভূমিতেই। তাঁর কবি-কর্মের দিকে তাকালে তাই চতুর্থত দেখতে পাই,—তাঁর কাব্যে বাঙ্‌লা কবিতা নব্য-ক্লাসিকতায় সমৃদ্ধ, প্রাঞ্জল ও প্রসাদগুণে পরিচ্ছন্ন; বুঝতে পারি—বাঙ্‌লা কবিতার শৈশব শেষ হয়েছে, এবার সে আপনার রূপকে চিনে উঠতে পারছে। পঞ্চমত, পাণ্ডিত্য, বৈদগ্ধ্য ও ধর্ম-সংস্কার মুক্ত আধ্যাত্মিকতায় আলাওল যেমন সভ্য মানুষের (civilized man) কবি, এমন আর মধ্যযুগের কোনো বাঙালী কবিকে মনে হয় না। শেষ কথা—এবং সর্বাপেক্ষা বড় কথা,—আলাওল বাঙ্‌লার জাতীয় সাহিত্যের প্রথম ভিত্তি স্থাপয়িতা।—বাঙ্‌লার নিম্নবর্গের মধ্যে বহুপূর্বেই হিন্দু-মুসলমানের মিলিত জীবন গঠিত হয়ে উঠেছিল, তা আমরা জানি। একালে দক্ষিণারায় ও বড় খাঁ গাজী প্রভৃতির আখ্যানে তার রূপ সাহিত্যিক পথেও পরিস্ফুট হচ্ছিল। হুসেন শাহ্‌-এর

কাল থেকেই বাঙালী উচ্চবর্গের মধ্যেও যে সেই সাংস্কৃতিক বিরোধ ক্রমশ প্রশমিত হয়ে আসছিল, তাও পূর্বেই দেখেছি; কিন্তু ধর্ম-সংস্কারাবদ্ধ বাঙ্‌লা সাহিত্য তখনো হিন্দু সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের ঐতিহ্যেই প্রতিপালিত হচ্ছিল। মধ্যযুগের সমস্ত সাহিত্যে মুসলমান জীবন ও চিন্তা প্রায় অনুপস্থিত। এমনি সময়ে রোসাঙ্গের রাজসভায় ধর্ম-সংস্কার-মুক্ত সুফী ও হিন্দু আধ্যাত্মিক সাধনার স্বাভাবিক সম্মেলন সহজ হয়ে উঠল। অন্যদিকে সেখানে লৌকিক প্রণয়-কাহিনীর অনুশীলনে ধর্ম-সংস্কার-মুক্ত মানবতার ধারণাও জন্মলাভ করছিল। এক্ষণে আলাওলের মত পণ্ডিত বিদগ্ধ ও উচ্চবর্গের মুসলমান কবি বাঙলা সাহিত্যকে আপনার বলে গ্রহণ করে—আপনার কীর্তির দ্বারা—বাঙ্‌লার জাতীয় সাহিত্যের মিলন-ক্ষেত্র রচনার সূচনা করলেন—যে ক্ষেত্র 'আবাদ করলে ফলত সোনা'। সাহিত্যের মধ্য দিয়ে হিন্দু মুসলমান, উচ্চ মধ্য ও নিম্ন সকল শ্রেণীর বাঙালীর জাতীয় চেতনা তখন থেকে পরিপুষ্ট ও ঐক্যবদ্ধ হয়ে উঠতে পারত।

বাঙ্‌লায় মুসলমান কবিদের আবির্ভাব: রোসাঙ্গ রাজসভায় আরও কবি ছিলেন, 'কোরেশ' মাগন নামে কবির 'চন্দ্রাবতী' নামে খণ্ডিত এক পুঁথি আছে। কিন্তু আলাওলের পরে রোসাঙ্গের আলো নিভে এল। তাহলেও চট্টগ্রাম অঞ্চলে উদার অধ্যাত্ম-বোধের দীপ তখনো নির্বাপিত হয়নি। পরাগলপুরের সৈয়দ সুলতান তেমনি একটি সমুজ্জ্বল দীপশিখা—তিনিও সুফী সাধক, আবার তিনিও রাধাকৃষ্ণের পদাবলী-গায়ক। একই সময়ে তিনিও মুসলমান ধর্মের নিয়ম-নীতি নিয়ে কাব্য লিখছেন, সংস্কৃত 'হরিবংশের' অনুকরণে তিনি (খ্রীঃ ১৬৫৪) 'নবীবংশ' লিখছেন—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, কৃষ্ণও তাঁর সেই নবীদের অন্তর্গত,—আর তাঁর অন্য গ্রন্থ 'জ্ঞান-প্রদীপ' বা 'জ্ঞান-চৌতিশা' তান্ত্রিক যোগ-রহস্যের কাব্য। কবি মহম্মদ খানও সপ্তদশ শতকের অভিজাত গোষ্ঠীর আর-এক কবি। তাঁর 'মুক্তাল হোসেন' নবীবংশের কথা হলেও আবার চট্টগ্রামের কথা, কবির নিজ বংশের কথাও তাতে আছে। পাঠযোগ্য কাব্য তা; লিখতে বসে কবিরা বাঙ্‌লা কবিতায় এখন আর হোঁচট খান না, তা স্পষ্ট। তা ছাড়া, হিন্দু পুরাণ-কাব্যাদির প্রভাবে মুসলমান ধর্মের কথা-কাহিনীও যে ঢালাই করা আরম্ভ হয়েছে, 'মুক্তাল হোসেন' তারও প্রমাণ। শেখ চাঁদের 'রসুল বিজয়'ও তাই উল্লেখ-যোগ্য। অষ্টাদশ শতকে এ ধারাতেই 'নবীবংশ', 'জঙ্গনামা' প্রভৃতি আরও

বহু গ্রন্থ রচিত হবে। শ্রীহট্টে, চট্টগ্রামে, উত্তরবঙ্গে, ও শেষে পশ্চিমবঙ্গে তখন তা সুলভ হয়।

কিন্তু শাহ মহম্মদ সগীরের বা কবি সাবিরিদ খান-এর কাল সুনিশ্চিত হলে হয়তো বাঙলার মুসলমান কবিদের মধ্যে তাঁরাই কেউ প্রাচীনতম বলে গণ্য হবেন, কারণ তাদের ভাষার স্থানে স্থানে প্রাচীনতার লক্ষণ দেখা যায়। কবিদের আত্ম-পরিচয় থেকে কাল নির্ণয় করা সম্ভব নয়। সাবিরিদ খান অভিজাত গোষ্ঠীর সন্তান, বিশেষতঃ মানবীয় প্রণয়-কাহিনীর ধারার কবি। কিছুটা সংস্কৃত জ্ঞানও তাঁর ছিল, সেই আলঙ্কারিক-ঐতিহ্য তাঁর লেখায়ও সুরক্ষিত। বিদ্যাসুন্দরের মুসলমান কবি—এবং ভারতচন্দ্রের পূর্বেকার বিদ্যা-সুন্দরের কবি হিসাবে সাবিরিদ খান তাই বিশেষ স্মরণীয় হয়ে আছেন। শাহ মহম্মদ সগীরের 'ইউসুফ জোলেখা'ও সেরূপ সুন্দর প্রণয়-কাব্য। সুফী ও অনুরূপ ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হিন্দু ও মুসলমান কবিরা যখন প্রণয়-গাথাকে অধ্যাত্ম রূপকে পরিণত করে গ্রন্থ লিখছেন (কুতবনের 'মৃগাবতী', জায়সীর 'পদুমাবত' প্রভৃতি 'অবধী' কাব্যের অনুকরণে), সাধারণ জনসমাজ তখন আরব্য উপন্যাস ও ইউসুফ-জোলেখা, লায়লা-মজনু প্রভৃতি আরবী-ফারসি প্রণয়-গাথা বা চন্দ্রমুখী নীলা, ভেলুয়া প্রভৃতি দেশীয় প্রণয়-গাথা নিয়ে যে আনন্দ লাভ করেছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। সপ্তদশ শতাব্দী শেষ হতে না হতেই তাই দেখতে পাই এরূপ মানবীয় প্রণয়-গাথা-রচয়িতারও অভাব নেই।—অসার্থক হলেও এধারায় হিন্দুর তুলনায় মুসলমান লেখকই হয়তো তখন বেশি পাব।

দুই শতাব্দীর দান

অর্থাৎ কাল পরিবর্তিত হচ্ছিল; যত ধীরেই হোক্ সমাজের জীবন-যাত্রা ও চেতনা ক্রমেই পরিবর্তিত হয়। এমন কি, সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে মোগল রাজত্ব যখন ভেঙে পড়ছে, অন্যদিকে তখনি বৃহত্তর সামাজিক পরিবর্তনেরও সূচনা হচ্ছে। এতদিন পর্যন্ত বাঙালী সমাজের ভিত্তি ছিল স্বয়ং-সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন পল্লী-সভ্যতা। কিন্তু পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ইংরেজ, ফরাসি প্রভৃতি ফিরিঙ্গি বণিকদের আগমনে বাঙলা দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার হচ্ছিল—আমদানি রপ্তানি বাড়ছিল, ভারতীয় পণ্যজাতের জন্য বৈদেশিক 'বাজার' তৈরী হচ্ছিল; দেশেও গঞ্জ-হাট জেঁকে উঠছিল,

বিদেশী বাণিজ্যের ফলে রৌপ্য মুদ্রার প্রচলন বৃদ্ধি পাচ্ছিল ;—আর মুদ্রাগত অর্থনীতির ('মানি ইকোনমি') সম্মুখে সামাজিক বিচ্ছিন্নতা ও সামন্ত-তান্ত্রিক স্বাধীনতা বরাবর টিকে থাকতে পারে না, এ হচ্ছে সহজ-বোধ্য কথা। কিন্তু, বাঙলার ব্যবসা-বাণিজ্য, ধন-দৌলত তখন বিদেশী আগন্তুকদের বিস্ময় উৎপাদন করে, অথচ সামন্ত কাঠামোর মধ্যে দেশীয় বণিকশ্রেণী তত শক্তিশালী হচ্ছে না, ক্রমবর্ধিত বহির্বাণিজ্য বরং চলে গেল ফিরিঙ্গি বণিকদের হাতে। যে বণিক মধ্যবিত্ত শ্রেণী বাঙালী জাতীয়তার মেরুদণ্ড হতে পারত, সামন্ত পীড়নে তারাই দুর্বল রইল। অন্যদিকে সেই শাসকদের শোষণে সাধারণ মানুষও দরিদ্র, উৎপীড়িত। যে বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী নিঃসন্দেহে তখন কতকটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তারা সামন্ততন্ত্রেরই উপজীবী —যথা, হিন্দু উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ ; অর্থাৎ পণ্ডিত, গুরু, পুরোহিত, ঘটক, পাঠক, কবিরাজ, রাজপুরুষ, আমলা, কর্মচারী এবং বৃত্তিজীবী (নবশাখ) নিম্ন মধ্যবিত্ত (দ্রষ্টব্য—তপনকুমার রায় চৌধুরীর Bengal under Akbar and Jahangir, ৫ম ও ৬ষ্ঠ অধ্যায়)। তারাই তখনো ছিল বাঙলা সাহিত্যের প্রধান অবলম্বন: লেখক ও রসিক। মুসলমানরা সম্ভবত প্রধানত দুই বর্গে বিভক্ত হতেন—হয় আমীর, জায়গীরদার প্রভৃতি, নয় একেবারে শহরের কারুজীবী ও গ্রামের কৃষক। মধ্যযুগের মুসলমান সমাজে এই মধ্যবিত্তের অভাবেই কি বাঙলা সাহিত্যেও মুসল-মানদের স্থান শূন্য থাকছিল? হিন্দু-মুসলমান নিম্নবর্গীয় অর্থাৎ শ্রমজীবী, কৃষিজীবী ও বিত্তহীনরা অন্যদের 'পাঁচালী'র বা কীর্তনের আসরের প্রান্তে স্থান পেত, তাতে আনন্দলাভ করত ; কিন্তু এই নিম্নস্তরের অনেক উপভোগ্য জিনিস লোক-সঙ্গীত, লোক-গাথা, প্রভৃতি লিখিত হয়ে 'সাহিত্য' হয়ে ওঠেনি ; কিছুটা মাত্র নানা ভাবে মঙ্গল-কাব্যে, প্রণয়-কাব্যে, গীতে ছড়ায় প্রবেশ করেছে।

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের পরে বাঙলা সাহিত্য আলাওল প্রভৃতি কবিদের কীর্তিতে জাতীয় সাহিত্যে পরিণত হবার সুযোগ লাভ করছিল, কিন্তু সেই মহৎ সম্ভাবনা সম্বন্ধে বাঙালী সাহিত্য-স্রষ্টারা সচেতন হয়নি। কারণ, সমাজে সমাগত আর্থিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন সম্বন্ধে সচেতন কোনো শ্রেণী তখন উদ্ভূত হয়নি, সমাজে 'জাতীয় চেতনা'ও তাই জাগে নি। জীবন-যাত্রায় কিংবা মানসিক সৃষ্টিতে কোনো ক্রমেই এর সঙ্গে ইউরোপীয়

রিনাইসেন্সের তুলনা হয় না। কাজেই, 'বৈষ্ণব রিনাইসেন্স' কথাটি অমূলক ও ভিত্তিহীন। বাঙ্‌লা সাহিত্য সপ্তদশ শতকের শেষেও প্রধানত সামন্ত-সমাজের উপজীবী অন্য মধ্যবিত্তদের হাতেই পুষ্ট হতে লাগল—ধর্মের প্রেরণা ও ধর্মের খোলস আল্‌গা হলেও তা খসে গেল না, প্রণয়-গাথার মধ্য দিয়েও জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে সুস্থ চেতনা তেমন ভাবে উন্মেষিত হল না, বৃহত্তর রাজনৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখেও বিরাট পৃথিবীর কোনো বৃহৎ সমস্যা সম্বন্ধে পল্লী-পালিত বাঙালী সাহিত্যিক বা মনস্বীদের ঔৎসুক্য জাগল না। বৈষ্ণব আন্দোলন তার রাগানুগা ভক্তি, লীলারস-তত্ত্ব ও প্রচার-প্রবণতার জন্য ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর বাঙ্‌লা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু বৈষ্ণব ছাড়াও যে বাঙালী পণ্ডিত সমাজ ছিলেন তাঁরা বাঙ্‌লা সম্বন্ধে ছিলেন উদাসীন। নবদ্বীপ, কোটালিপাড়া, বিক্রমপুর প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ কেন্দ্রের পণ্ডিতদের নাম বাঙ্‌লা সাহিত্যে নেই। বাঙালীর শ্রেষ্ঠ মনীষা তখন নব্যন্যায়ের চর্চায়, স্মৃতি ব্যাকরণ দর্শনের অনুশীলনে সন্তুষ্ট, বাঙ্‌লা সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁরা নিশ্চেতন। দুই একজন বৈষ্ণব পণ্ডিতকে বাদ দিলে এই কালের বাঙ্‌লা-লেখকদের মধ্যে দার্শনিক নেই, মনস্বী নেই, বুদ্ধিবাদী নেই। বাঙ্‌লা গদ্যও তাই তখন জন্মাতে পারল না—বৈষ্ণব কড়চা ও নিবন্ধের ভাঙাভাঙা কথা, কোচবিহার রাজাদের পত্র, এবং দোম আন্তোনিওর 'ব্রাহ্মণ রোমান্‌ ক্যাথলিক সংবাদ' থেকে তার নিদর্শন পাই এবং বুঝি—বাঙ্‌লা গদ্য সাহিত্যের জন্মের এখনো বহু দেরি। বুদ্ধিজীবীরই গদ্যকে পরিপোষণ করার কথা, তাঁরা তখন সংস্কৃতের ভক্ত। অপর দিকে সাধনার জগতে ষোড়শ সপ্তদশ শতাব্দী বাঙালী তন্ত্রাচার্যদেরও গৌরবের যুগ ;—বাঙ্‌লা সাহিত্যে তাঁদের চিহ্নও প্রায় নেই ; যা আছে তা সহজিয়া যোগতন্ত্রের।

এই সীমাবদ্ধতার কথা মনে করলে অবশ্য ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর বাঙ্‌লা সাহিত্য নিয়ে উচ্ছ্বসিত হওয়া আর সাজে না, চৈতন্য-পর্বের এই 'গৌরব যুগ' নিয়েও গর্ব করা সম্ভব হয় না। কিন্তু স্বীকার করতে হবে তার মূল লক্ষ্য যে সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ তা সিদ্ধ হয়েছিল ; বিজেতার (আরবী-ফারসি) সংস্কৃতির নিকট বিজিত (সংস্কৃত ও বাঙ্‌লা) সংস্কৃতি পাঁচশত বৎসরেও হার মানে নি। অবশ্য প্রধানত তার একটা কারণ—মূলত আরবী-ফারসি-বাহিত বিজেতৃ-

সংস্কৃতিও ছিল সামন্ত-বর্গের সংস্কৃতি; এবং সংস্কৃত-বাঙ্‌লা বাহিত দেশীয় সংস্কৃতিও ছিল সামন্ত-যুগের সংস্কৃতি, দুই-ই মধ্যযুগীয় চিন্তা ও চেতনার মধ্যে সীমাবদ্ধ। এই দুই সংস্কৃতির মধ্যে তুলনায় মোটের উপর সংস্কৃতের ভাণ্ডার নানাদিকে যত সমৃদ্ধ ছিল, ফারসি সংস্কৃতি সর্বদিকে তত সমৃদ্ধ ছিল না। তাই তার সাধ্য হল না—ভারতীয় বাঙালী সংস্কৃতিকে উৎখাত করে। প্রবলতর ভারতীয় সংস্কৃতি তাই আত্মরক্ষা করতে পারল, এবং পরে আরবী-ফারসি বিষয়বস্তুকেও আত্মসাৎ করবার মত যোগ্যতা অর্জন করল। তা ছাড়া, সাহিত্য হিসাবে চৈতন্যপর্বের বাঙ্‌লা সাহিত্যকে অন্যান্য বহু ভাষার সমসাময়িক সাহিত্যের সঙ্গে তুলনা করলেও আবার আশ্বস্ত হতে পারি—এই মধ্যযুগীয় বায়ুমণ্ডলেও বাঙালী সাহিত্য-প্রতিভা নিস্তব্ধ থাকে নি, এবং এমন কিছু কিছু সৃষ্টিও তার আছে যা বিশ্ব-সাহিত্যে অগ্রাহ্য নয়; এমন ক্ষেত্রও প্রস্তুত হয়েছিল—যা 'আবাদ করলে ফলত সোনা'।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মধ্যযুগ ও নবাবী আমল

(খ্রীঃ ১৭০০—খ্রীঃ ১৮০০)

'নবাবী আমল' বলতে মোটামুটি অষ্টাদশ শতককেই আমরা এখানে ধরে নিচ্ছি। রাজা-রাজ্যের ইতিহাসের দিক থেকে তা নিশ্চয়ই ভুল। কারণ, সে গণনায় নবাবী আমল মাত্র পঞ্চাশ বৎসরই স্থায়ী হয়েছিল, খ্রীঃ ১৭০৭ থেকে ১৭৫৭। সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যু হয় খ্রীঃ ১৭০৭ অব্দে; তার পূর্বে বাঙ্‌লার নবাবদের স্বতন্ত্র শাসনের কল্পনাও কেউ করতে পারে নি। আর, ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর পরে মীরজাফর নামেই হয়েছিল নবাব। নবাবী শাসনের পরিবর্তে খ্রীঃ ১৭৫৭ থেকে 'ইংরাজ রাজত্বের' আরম্ভ হয়। কিন্তু তা শুধু পূর্বেকার মতো রাজা বা রাজবংশের পরিবর্তন নয়, বিদেশীয় এক বণিক-শক্তির রাজ্যলাভ। "এশিয়ার ইতিহাসের প্রথম সামাজিক বিপ্লবের" সূত্রপাত হল সেই রাজনৈতিক পরিবর্তনে—এতকাল যা ঘটে নি এবার তা ঘটবে; ভারতের যুগ-যুগ-স্থায়ী, বিচ্ছিন্ন, স্বয়ং-সম্পূর্ণ পল্লী-সমাজ (Village

Community) ও পল্লী-সভ্যতা এই বণিক-সভ্যতার আক্রমণে ভাঙ্‌তে আরম্ভ করবে। এই হিসাবে ভারতীয় সমাজের পর্ববিভাগে একটা সাধারণ ছেদ খ্রীঃ ১৭৫৭; সাহিত্যেও প্রায় সে-সময়ে ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর সঙ্গে (খ্রীঃ ১৭৬০-৬২ অব্দে) একটা পর্বশেষ বলা যেতে পারে। কিন্তু তার পরে আর একটা যুগ-সন্ধিকাল আসে। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর কাল সমাজ-জীবনে নূতন কালের প্রারম্ভ নিশ্চিত হয় না। এই সন্ধিকালের সাহিত্যেও তাই নবাবী আমলের জের টানা চলে অনেকদিন, এমন কি উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধেও তা শেষ হয় নি। তথাপি খ্রীঃ ১৮০০ অব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠায় এবং মুদ্রাযন্ত্রের সহায়তায় উনিশ শতকের নূতন সাহিত্য-প্রয়াসের উদ্বোধন হয় —যদিও সেই নূতন সাহিত্য জন্ম নেয় আসলে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। এসব কারণেই গোটা অষ্টাদশ শতককে মোটামুটি 'নবাবী আমল' বলে ধরা সুবিধাজনক। তারপর 'আধুনিক যুগ', তার বিভিন্ন পর্ব।

রাজনৈতিক বিপর্যয়

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দিকেই মোগল সাম্রাজ্যের ক্ষয়-লক্ষণ দেখা দিয়েছিল। দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধে আওরঙ্গজেবের রাজকোষ শূন্য। তাঁর প্রধান ভরসা তখন মুর্শিদ কুলী খাঁর কর্মদক্ষতা ও বাঙ্‌লার রাজস্ব। মুর্শিদ কুলী খাঁ বাঙ্‌লায় দেওয়ান হয়ে আসেন খ্রীঃ ১৭১০ অব্দে, তখন শাহ্‌জাদা আজীম-উদ্দীন বাঙ্‌লার সুবাদার (খ্রীঃ ১৬৯৭—খ্রীঃ ১৭১২)। মুর্শিদ কুলী খাঁ কাগজে-পত্রে সুবাদার নিযুক্ত হন খ্রীঃ ১৭১৩ অব্দে। মাঝে দু বৎসর (খ্রীঃ ১৭০৮-১৭০৯ পব্দে) তাঁকে অন্যত্র বদলি করাও হয়েছিল। কিন্তু সে দু' বৎসরের পরে যেদিন মুর্শিদ কুলী খাঁ বাঙ্‌লায় ফিরে আসেন সেদিন থেকে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত (খ্রীঃ ১৭১৭) তিনিই প্রকৃতপক্ষে বাঙ্‌লার রাজকার্য নির্বাহ করেছেন। দিল্লীর ভগ্নপ্রায় মোগল তখ্‌ত যেই অধিকার করুক, বাঙ্‌লা দেশের শাসন-ব্যবস্থা মুর্শিদ কুলী খাঁর বিচক্ষণ কঠিন হস্তেই থাকে; দিল্লীর ভাগ্যবিপর্যয় তখন বাঙ্‌লাকে তাই স্পর্শ করে নি। খ্রীঃ ১৭১৭ অব্দে যখন মুর্শিদ কুলী খাঁর মৃত্যু হয়, তখন দাক্ষিণাত্য, অযোধ্যা প্রভৃতির মত বাঙ্‌লাও প্রায় স্বতন্ত্র রাজ্য হয়ে উঠেছে, মুর্শিদ কুলী খাঁ নামে না হলেও কার্যতঃ 'বাঙ্‌লার নবাব'।

মুর্শিদ কুলী খাঁর পরে সুবাদার হয় তাঁর উচ্ছৃঙ্খল জামাতা সুজাউদ্দৌলা (খ্রীঃ ১৭১৭-খ্রীঃ ১৭৩৯); তারপরে সুজাউদ্দৌলার চরিত্রহীন পুত্র সরফরাজ খাঁ (খ্রীঃ ১৭৩৯-৪০)। অচিরেই আলীবর্দী খাঁ তাঁকে নিহত করে বাঙ্‌লার

নবাব হয়ে বসলেন (খ্রীঃ ১৭৪০-১৭৫৬)। আলীবর্দীর বুদ্ধি ও কর্মোত্তম সত্ত্বেও পশ্চিম বাঙলা 'বর্গীর উপদ্রবে' তখন ছারখার হয়, আলীবর্দী শেষ পর্যন্ত ওড়িষ্যা প্রদেশ মারাঠাদের ছেড়ে দিয়ে তাদের তুষ্ট করেন। অন্যদিকে ফিরিঙ্গি বণিকদের মধ্যে পর্তুগীজ ও ওলন্দাজরা নিস্তেজ ; ফরাসীদের বাধা দান সত্ত্বেও ইংরেজরা তখন প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছে। কারণ, ইউরোপে তার বণিক-শ্রেণী মধ্যযুগের অবসান ঘটিয়ে প্রথম আধুনিক যুগের কর্ণধার হয় ; রাষ্ট্রে প্রথম ক্ষমতা লাভ করে, জাতীয় রাষ্ট্র (নেশন ষ্টেট) গঠন করে ; গণতন্ত্র, ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও আইনের শাসন (Rule of Law) প্রতিষ্ঠিত করে (খ্রীঃ ১৬৮৮)। চতুর্দিকের এই ঘনায়িত বিপদের মধ্যে অর্বাচীন যুবক সিরাজউদ্দৌলার (খ্রীঃ ১৭৫৬-খ্রীঃ ১৭৫৭) রাজ্যরক্ষার মতো শক্তি বা সহায় কিছুই ছিল না। আলীবর্দী খাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে মীরজাফরও তাই সিরাজের স্থলে নবাব হতে চাইল, এবং হল 'ক্লাইবের গর্দভ' (খ্রীঃ ১৭৫৭-১৭৬০)। মীরকাশেমও বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামের রাজস্ব ইংরেজ-বণিকদের লিখে দিয়েই মীরজাফরের স্থলে নবাব হয় ; তারপর নবাবী-শাসনের পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করতে গিয়ে সবংশেই সে ধ্বংস হয় (১৭৬০-১৭৬৪)। এর পরে ১৭৬৫তে সম্রাট শাহ আলমের হাত থেকে দেওয়ানী লাভ করল 'কোম্পানি'। 'কোম্পানির আমল' যে আরম্ভ হয়েছে, নবাবী আমল যে নেই, সেই আট বৎসরে তা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। একদিকে তারপর ক্লাইব-হেস্টিংসের রাজকোষ লুণ্ঠন, দেশ-শোষণ, অত্যাচার, উৎপীড়ন, মন্বন্তর, ছোটখাটো বিদ্রোহ ও অরাজকতা, অন্যদিকে ইংরেজের রাজ্য-বিস্তার, শোষণের স্বার্থে শাসন-সংগঠন, শৃঙ্খলা-প্রতিষ্ঠা, কর্নোয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (খ্রীঃ ১৭৯৩), জমিদারীতন্ত্র ও নূতন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব—এইরূপে হাজার দুই-আড়াই বৎসরে মন্দগতি সমাজ-ব্যবস্থার ভিত্তি-ক্ষয় আরম্ভ হয়, এদেশেও মধ্যযুগের অবসান হতে থাকে। রাজপ্রসাদজীবী ভাগ্যান্বেষীরা ফারসির মতো ইংরেজি শিখতেও উদ্যোগী হচ্ছিল ; খ্রীঃ ১৮০০ অব্দের দিকে এ বোধ রামমোহনের মতো বুদ্ধিমান বাঙালীদের মনেও না জন্মে আর উপায় ছিল না—ইংরেজ রাজত্বে এক নূতন সমাজের ও সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁদের পরিচয় করতে হবে।

সামাজিক পরিবেশ

জমিদারের উৎপত্তি : অষ্টাদশ শতকের এই রাজনৈতিক বিপর্যয়ের

সঙ্গে সামাজিক উত্থান-পতনও কিছু কিছু ঘটছিল। অষ্টাদশ শতকের প্রারম্ভেই মুর্শিদ কুলী খাঁর রাজস্ব-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। অবসন্ন মোগল সাম্রাজ্যের শূন্য কোষাগারে মুর্শিদ কুলী খাঁ বাঙ্‌লার রাজস্ব নিয়মিত যুগিয়েছেন—নির্মম কঠিনভাবে পুরাতন জায়গীরদার জমিদারদের উৎপীড়ন করে। তারা অনেকেই ছিল অপদার্থ, বংশানুক্রমে বিলাস-ব্যসনে মগ্ন। বাকী খাজনার দায়ে মুর্শিদ কুলী খাঁ তাদের জায়গীর বন্ধ করে জমি 'খালাস' বা খাস করে নিলেন; জায়গীরদারদের ওড়িশ্যার অনাবাদী জমি 'ইজারা' দিলেন আবাদ করবার জন্য; কিংবা দিলেন তাদের নানকার জমি, বনকর জলকরের স্বত্ব। তারা অধিকাংশ ছিল মুসলমান আমীর খানদান, সেই মুসলমান খানদানীদের তাই তখন পতন শুরু হল। পুরাতন ও অপদার্থ হিন্দু অভিজাতদের উপর যে উৎপীড়ন হত তা আরও ক্রূর;—তাদের উপর 'বৈকুণ্ঠবাস' বা পুরীষকুণ্ডে স্নান, ঠাণ্ডা-গারদ, এবং ধর্মান্তর গ্রহণেরও আদেশ হত। মুর্শিদ কুলী খাঁর দ্বিতীয় ব্যবস্থা হল 'মাল-জামিনি'—অর্থাৎ ইজারাদারদের থেকে জামিন নিয়ে চড়া রাজস্বের শর্তে জায়গীর ইজারা দেওয়া। প্রকৃতপক্ষে এ ব্যবস্থাই কোম্পানিও দেওয়ানী পেয়ে (খ্রীঃ ১৭৬৫) বহাল রাখে। মুর্শিদ কুলী খাঁ এরূপ ইজারা বেশি দিয়েছিলেন তাঁর অধীনের খাজনা ও হিসাবে-দক্ষ হিন্দু-কর্মচারীদের—এঁরাই অনেকে তাই পরে কর্নোয়ালিসের কৃপায় বাঙ্‌লার জমিদার হন। অবশ্য খ্রীঃ ১৭১০-এর পরে বাঙালী হিন্দু কর্মচারীরা আরও বড় সুযোগ লাভ করেছিল। দিল্লীর সম্রাট দুর্বল, পশ্চিম থেকে তাই রাজকর্মচারী না এনে মুর্শিদ কুলী খাঁ বিশ্বস্ত ও চতুর বাঙালী ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থদেরই দেওয়ানী ও কানুনগোর কাজে নিযুক্ত করলেন;—তখন তারাও ফার্সিনবীশ,—তারাও অনেকে আবার জমি ইজারা নিয়ে ক্রমে 'জমিদার' হয়ে বসল। তারপর অবশ্য কোম্পানির আমলে এ নিয়মেই ক্লাইব-হেস্টিংসের মুনসী-দেওয়ানরাও জমিদার হবে। কিন্তু কথা এই যে, মুর্শিদ কুলী খাঁর শর্ত মতো খাজনা আদায় করতে এই নতুন ইজারাদাররা বাঙ্‌লার চাষীদের যে কি ভাবে পীড়ন করত, তা আজ বলা অসম্ভব। সে লুণ্ঠনে মণিরত্নজহরতে মুর্শিদাবাদের রাজকোষ ভরে ওঠে,—তা'ই ক্লাইব-হেস্টিংস পরে বিলাতে চালান দেয়। যাই হোক্‌, এই চতুর দেওয়ান-কানুনগোরাই হলেন আধুনিক বাঙ্‌লার সম্ভ্রান্ত জমিদারবংশের প্রতিষ্ঠাতা—যথা, সেনবর্ধের শ্রীকৃষ্ণ হালদার, ময়মনসিংহ-মুক্তাগাছার শ্রীকৃষ্ণ আচার্য চৌধুরী, নাটোরের রঘু-

নন্দন, ইত্যাদি, ইত্যাদি। (দ্রষ্টব্য, ইংরেজিতে লেখা 'বাঙ্‌লার ইতিহাস' ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪০৮-৪১৬)।

ফারসি-নবীশ এসব নূতন 'রায়-ই-রায়ান'দের উৎপত্তিতে এবং পুরাতন রাজা-জমিদারদের বিলোপে সাহিত্য-সংস্কৃতির পুরাতন আসর যত সহজে ভেঙে যায়, নূতন আসর তত তাড়াতাড়ি গড়ে ওঠে না। যখন তা গড়ে ওঠে তখন 'নবাবী আমলের' মেজাজই তাতে দেখা দেয়; আদর বাড়ে আড়ম্বরের, বচন-চাতুর্যের, পোষাকি-পনার। কৃষ্ণচন্দ্রের সভার সঙ্গে রোসাঙ্গের রাজসভার তুলনা করলেই এ কথা বোঝা যায়। যে আধ্যাত্মিক আগ্রহ ও সুস্থ মানব-চেতনা আরবী-ফারসি থেকে দৌলতকাজী-আলাওলের মধ্যে দেখা গিয়েছিল তার পরিবর্তে দেখা দিল প্রাণহীন, আস্থাহীন অবক্ষয়ের লক্ষণ।

পলাশীর প্রেক্ষাপট : রাজনৈতিক ও সামাজিক যে অধঃপতন অষ্টাদশ শতকের প্রথম থেকেই প্রত্যক্ষ হয়, তার বীজ ছিল আসলে সমাজের গভীরতর তলদেশে। আকবর-জাহাঙ্গীরের ভূমি-ব্যবস্থায় সামন্তবর্গের ক্ষমতা খর্ব করে কেন্দ্রীয় রাজ-সরকার প্রবল শক্তি ও প্রতাপ অর্জন করেছিল। তারপরে সামন্তযুগের অবসানই ছিল অনিবার্য,—ফিরিঙ্গি বণিক সেই পরবর্তী যুগের ঘোষণাপত্র নিয়েই ভারতবর্ষের দ্বারে উপস্থিত হয়েছিল। কিন্তু ভারতীয় সমাজ তা পাঠ করতে অক্ষম, সে বিপ্লব সাধন করবার মত শক্তি সমাজে জন্মে নি। সামন্ত শক্তির বাধায় বণিক শক্তি দুর্বলই থেকে গিয়েছে। জগৎশেঠ উমিচাঁদ প্রভৃতি অবাঙালী বণিকেরা দেশের বণিকশক্তির মুখপাত্র হয়ে বিদেশীয়বণিকশক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়ায় নি;—সিরাজউদ্দৌলাকে বিতাড়িত করে তারা দেশে বণিক যুগ প্রতিষ্ঠিত করবার কথা কল্পনা করেছিল, এরূপ মনে হয় না। সামন্ততন্ত্রের মধ্যে পচ্‌তে পচ্‌তে ভারতীয় সামন্ত-সমাজ এক হিসাবে অসহায় ভাবেই বণিক-রাজের নিকট আত্ম-সমর্পণ করল। নইলে মাত্র একটি যুদ্ধে—যাতে কোম্পানীর পক্ষে ১৬ জন সিপাই ও ১২ জন গোরা সৈনিক মাত্র নিহত হয়, আহত হয় সর্বশুদ্ধ ৭২ জন, এবং নবাব পক্ষে নিহত হয় প্রায় ৫০০ সিপাই, আহত হয় আরও ৫০০, এই সামান্য যুদ্ধে,—এত বড় একটা জাতি বা দেশ—সুবা বাঙ্‌লা ও বিহার —কখনো বিদেশী শাসন স্বীকার করে নিত না,—যুদ্ধ চলত এক জীবনকাল ধরে, প্রাণ দিত দেশের হাজার হাজার মানুষ। কিন্তু সে প্রশ্নই এক্ষেত্রে ওঠে নি। কারণ 'দেশ' বলতে বা 'জাতি' (নেশন) বলতে আমরা এখন যা বুঝি,

সামন্ত-যুগে তার ধারণাও জন্মে না। বাঙ্‌লার মানুষ জানত—বাঙ্‌লা দেশ নবাবের 'রাজ্য',—দেশের উপর জনসাধারণের দাবী নেই। ইজারাদারদের অত্যাচারে তারা জর্জরিত হচ্ছিল। বর্গীর হাঙ্গামায় তাদের প্রাণ অতিষ্ঠ হয়েছে। কাজেই বাঙ্‌লাদেশ পরাধীন হল, এই বেদনা কেউ তেমন তীব্রভাবে অনুভবও করতে পারে নি। তারা বুঝেছে—সিরাজউদ্দৌলার রাজ্য গেল, 'কোম্পানি' সে রাজ্য লাভ করল।

এমনকি, বিদেশীয় বলেও ইংরেজদের বিরুদ্ধে যে বিশেষ বিক্ষোভ জনসাধারণের ছিল তা নয়। খ্রীষ্টান ও বিধর্মী বলে অবশ্য আপত্তি ছিল, বিদেশী বলে নয়। কারণ, বাঙালী জনসাধারণ তো বরাবরই দেখেছে—নবাবরা কেউ তাদের স্বদেশীয় ছিল না, তারা বাঙালী ছিল না। মোগল শাসনকালে দিল্লী থেকেই প্রধান প্রধান শাসকেরা প্রেরিত হত;—অনেকেই তারা ভারতীয়ও নয়; পারসিক, আরবীয়, আফগানী, তুর্ক ভাগ্যান্বেষী। এই অষ্টাদশ শতকে বাঙ্‌লার মসনদ যাঁরা অধিকার করেছিলেন, তাঁরাও সে হিসাবে কেউ বাঙালী নন বাঙ্‌লা-ভাষী নন। মুর্শিদ কুলী খাঁ নিজে জন্মেছিলেন ভারতের ব্রাহ্মণ-কুলে; কিন্তু লালিত-পালিত হন পারসিক প্রভুর আশ্রয়ে শিয়া মুসলমান-রূপে পারস্যে। ফারসি ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতিতেই তিনি মানুষ—হিন্দু ধর্ম থাক, ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতিও তাঁর কোনো দরদ ছিল না। তাঁর জামাতা সুজাউদ্দৌলা আফসার তুর্ক বংশীয়। আলিবর্দী খাঁও আরব-তুর্ক বংশীয়। দরিদ্র ভাগ্যান্বেষী। মীরজাফর—সেও ভারতবর্ষে এসেছিল ভাগ্যান্বেষী রূপে। এই নবাবেরা কেউ হোসেন শাহ্‌ নুসরৎ শাহের মত বাঙালী শাসক হন নি, মোগল শাসন ব্যবস্থায় তা আর সম্ভব হত না। অন্তত বাঙ্‌লা ভাষা বা বাঙ্‌লা সাহিত্যের সঙ্গে কারও পরিচয় ছিল না।

ফারসি প্রভাবের বিস্তার: মোগল শাসনে দেওয়ান, বক্সী প্রভৃতি বড় বড় কর্মচারীরা দিল্লী থেকে প্রেরিত হত। কেউ তারা দীর্ঘকাল বাঙ্‌লায় বসবাস করত না। যারা জায়গীর, মনসব পেয়ে এখানে বসবাস করত তারাও দিল্লীর কেতা ছাড়তে চাইত না; ফারসি সংস্কৃতি ও ফারসি সাহিত্য ছেড়ে যদি প্রয়োজনে ক্বচিৎ কিছু তারা চর্চা করত তা হচ্ছে হৈন্দবী বা উর্দু। অর্থাৎ এই অভিজাতবর্গ ছিল ফারসি সাহিত্যে মশগুল। শুধু মুসলমান রাজপুরুষ নয়, মোগল রাজ্যের কর্মচারী বা ঠিকাদার রূপে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল থেকে দু'শত বৎসর ধরে হিন্দু ক্ষেত্রী ও লালা প্রভৃতি ভারতীয়েরা

বরাবর আসছিল বাঙ্‌লায়। মুর্শিদাবাদ ও কলকাতার বড়বাজারে তারা কম বাদ করত না। কিন্তু তারাও এই ফারসি-কেতা ও হৈন্দবী ভাষা নিয়েই তখন চলত। বাঙ্‌লা দেশেও যেসব ব্রাহ্মণ বৈদ্য, মধ্যবিত্ত কায়স্থ প্রভৃতি, পাঠান আমলের মতো, এই মোগল-শাসনে রাজকার্যে স্থান লাভ করে তারাও ফারসি, আরবী এবং 'যাবনী-মিশাল' হৈন্দবী বা উর্দুতে (ভারতচন্দ্র প্রভৃতির মতো) দোরস্ত হত। (দ্রষ্টব্য, ইংরেজিতে লেখা 'বাঙ্‌লার ইতিহাস', ২য় খণ্ড, পৃ: ২২৩।) তবে এরা দেশের নিকটতর, তাই এরা বাঙ্‌লা ঐতিহ্যের একেবারে বাইরে যেতে পারে নি। মোগল আমলের সম্ভ্রান্ত গোষ্ঠীর এরূপ সুদীর্ঘকালের প্রভাবে হিন্দু-মুসলমান বাঙালী উচ্চবর্গ বাইরের জীবনযাত্রায় একটু একটু করে দরবারী আদব-কায়দা অনুসরণ করতে আরম্ভ করে। অষ্টাদশ শতকে দেখি—বাঙালীর পোষাক-পরিচ্ছদে, কথায়-বার্তায়, ভাবনায়-ধারণায় একটা দরবারী আড়ম্বর ও ফারসি পালিশ জমেছে, —ফলে ফারসি-আরবী বিষয়বস্তু (Matter of Perso-Arabic World) বাঙালীর আপন হয়ে উঠছে। ভারতীয় ফারসি-সংস্কৃতিকে আশ্রয় করে সেই সূত্রে শাসকবর্গের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান সাংস্কৃতিক বিভেদও কমে এসেছে।

অবশ্য, এ ঐক্য সামাজিক হিসাবে হচ্ছে ক্ষয়িষ্ণু সভ্যতার ঐক্য;—প্রাণহীন, আড়ম্বর-সর্বস্ব, বিলাসী এবং কতকাংশে নীতিবোধ-বিবর্জিত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই ক্ষয় প্রকট হল—তা রোধ করতে চেষ্টা করবে, দেশে এমন সামাজিক শক্তি কোথাও নেই;—'নবাবী' আমল এই ক্ষয়েরই শেষপাদ। লক্ষ্য করবার মতো,—সেদিনের ভারতস্থ ইংরেজও এই দুর্নীতি ও বিলাস-আড়ম্বরে সমভাবে যোগ দিয়েছিল, তাই স্বদেশে তাদেরও নাম হয়েছিল 'নাবুব'।

'নাবুবী'-আমল : নবাবের পরে কোম্পানি যখন ক্ষমতা লাভ করলে তখন ইংরেজি 'বণিক-সভ্যতা' এদেশে ইংরেজরা প্রবর্তন করে নি, এই সামাজিক অবক্ষয়ও তাই রুদ্ধ হয়নি। বরং সেদিনের ইংরেজ ব্যক্তিগতভাবে ও শাসক-গোষ্ঠীরূপেও ('কোম্পানি' হিসাবে) প্রচলিত দুর্নীতি ও বিলাস-ব্যসন বাড়িয়ে চলেছে। কোম্পানির নামে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করা, দেশীয় বণিক ও কারিগরদের লুঠ করা ও ধ্বংস করা—এতো নবাবী আমলেই ছিল তাদের পেশা। পলাশীর পরে তাতে ইংরেজ বণিকদের কোনো বাধাই রইল না। বরং মীরজাফর-মীরকাশেমদের নবাব বানিয়ে উৎকোচ ও

উপঢৌকন লাভের আর একটা সুবর্ণ সুযোগ এল। বারাণসীর চৈতসিং, অযোধ্যার বেগমরাও তাই নিস্তার পেল না (খ্রীঃ ১৭৭৮-১৭৮২)। ক্লাইব, হেস্টিংস্‌, প্রভৃতি প্রধানরা বিলাতে ফিরে যান অপরিমিত ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়ে। শুধু তাই নয়, এই লুণ্ঠনে, আড়ম্বরে ও নীতিহীন বিলাস-ব্যসনে অভ্যস্ত কোম্পানির সাহেবদের বিলাতের লোকে ইংরেজ বলেই মান্‌ত না— বিদ্রূপ করে বলত 'নাবুব'। মুর্শিদ কুলী খাঁর ইজারাদাররা বাঙ্‌লার সাধারণ প্রজারায়তকে শোষণ করতে কিছুই বাকী রাখেনি, তা দেখেছি। তারপরে বর্গীরা পশ্চিম বাঙ্‌লার উচ্চ নীচ সকলকে লুঠ করে ত্রাসগ্রস্ত করেছিল। কোম্পানিও শাসন হাতে নিতে না নিতেই শোষণের ও লুণ্ঠনের মাত্রা যে হারে বাড়াল তা শুনলে মুর্শিদ কুলী খাঁও চমকিত হতেন। দেওয়ানী যে বৎসর কোম্পানি নিজের হাতে নিলে সেই খ্রীঃ ১৭৬৫-৬৬ অব্দে ভূমি-রাজস্ব ছিল ১,৪৭০ হাজার পাউণ্ড,—তার পরে ইজারা নিলাম বাড়তেই থাকে। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের বৎসরেও তা কিছুমাত্র বাকী পড়েনি, এই ছিল হেস্টিংসের গর্ব। তার পর বৎসর খ্রীঃ ১৭৭১-৭২এ সে রাজস্ব হয়েছিল ২,৩৪১ হাজার পাউণ্ড; চার বৎসর পর খ্রীঃ ১৭৭৫-৭৬এ তা উঠল ২,৮১৮ হাজার পাউণ্ডে; আর, খ্রীঃ ১৭৯৩তে কর্নোয়ালিস্‌ রাজস্ব একটু কম হারে ধরে তা স্থির করে ফেললেন ৩,৪০০ হাজার পাউণ্ডে। আশ্চর্য নয় যে, খ্রীঃ ১৭৭০-এ যে মন্বন্তর হল তাতে দেশের এক-তৃতীয়াংশ মানুষ মরল, লোকের পরিত্যক্ত বসতি জঙ্গলে পরিণত হল।

ভূমি-রাজস্ব ও ব্যক্তিগত লুঠ বা রাজকোষ-লুণ্ঠন তো ছিলই, দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যও কোম্পানি দেশের মানুষের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে যায়। তাই গবর্নর ভেরলেস্ট-এর মুখে শুনি খ্রীঃ ১৭৬৬-৬৮ দুই বৎসরে বিলাত থেকে আমদানীর পরিমাণ ছিল ৬,২৪,৩৭৫ পাউণ্ডের, আর বিলাতে রপ্তানীর দাম ৬৩,১১,২৫০ পাউণ্ড; এর মধ্যে মুর্শিদাবাদের রাজকোষের মণিমুক্তার দামও আছে। কোম্পানির সাহেবদের ব্যবসায়ী-দৌরাত্ম্যে দেশের ব্যবসায়ী ও পাইকাররা আরও আগে থাকতেই ধ্বংস হতে বসেছিল। এখন বণিক শাসনে তাদের জীবনলাভের সম্ভাবনাও আর রইল না। ক্রমে গোটা ভারতবর্ষই ইংরেজের 'ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা'র অধীন হল। এ দেশের আর্থিক শক্তি সংগঠনের সম্ভাবনা তাই পলাশীর পরে আরও সুদূর হয়ে গেল, যথার্থ সামাজিক বিপ্লব আরও তাই ব্যাহত হল ইংরেজ-শাসনে। অন্য দিকে

ভারত লুণ্ঠনের ঐশ্বর্যেই ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেকটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের ভাবী-সৌভাগ্যের গোড়া-পত্তন হয় ;—ইংরেজ বণিকের ব্যবসা বাড়ে, বাণিজ্য বাড়ে, কল-কারখানার উপযোগী পুঁজি জমে ওঠে ইংরেজের হাতে,—ভারতের অর্থে বিলাতী পুঁজিবাদের ভিত্তি স্থাপিত হয়ে যায় খ্রীঃ অষ্টাদশ শতকের মধ্যেই। অর্থাৎ পলাশীর পাপ-চক্রে বাঙালী সমাজ আরও বাঁধা পড়ে ;—দেশে সমাজ-বিপ্লব সংঘটিত হল না বলে বিদেশী বণিক্ রাজা হল, আর বিদেশী বণিক্ রাজা হল বলেই পুরনো পল্লী-সমাজ ও তার আর্থিক ব্যবস্থা সে ভাঙ্‌ল, কিন্তু সমাজ-বিপ্লব কিছুতেই সার্থক হতে দিল না।

কোম্পানির আমলের 'ঔপনিবেশিক ব্যবস্থায়' তাই কি ফল লাভ হল? পুরনো অভিজাতরা নিঃশেষ হল, তাদের সহযোগী পূর্বেকার মধ্যবিত্ত শ্রেণীও অনেকাংশে নিরাশ্রয় হল, দেশীয় ব্যবসায়ী বণিকরা আরও দুর্বল হল, এবং কারিগর, চাষা ও প্রজা-সাধারণ উপদ্রবে, উৎপীড়নে, মন্বন্তরে আরও দুর্দশাপন্ন হল। আর রক্ষা পেল কারা? রক্ষা পেল পূর্বযুগের কিছু কিছু চতুর ইজারাদার, কোম্পানির সহযোগী কিছু কিছু ব্যবসায়ী বেনিয়ান, সাহেবদের অনুগ্রহ-জীবী দেওয়ান, মুন্সি, দালাল, মুৎসুদ্দি ;—এবং এদেরই আশ্রিত সহকারী উচ্চবর্ণের কিছু কিছু মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত। কর্নোয়ালিসের ভূমি-ব্যবস্থায় এদের একটা স্থায়ী এবং স্থাণু জীবিকা-ক্ষেত্র মিলল, এরা মধ্যস্বত্বভোগী ও বেতনজীবী হয়ে কতকাংশে একটা সামাজিক শক্তিও হয়ে উঠতে পারল—উনবিংশ শতকে তা দেখা যাবে।

কিন্তু মোটের উপর খ্রীঃ ১৭৫৭ থেকে খ্রীঃ ১৮০০ পর্যন্তও আমরা ইংরেজ শাসন ও এদেশের ইংরেজ চরিত্রের যে পরিচয় পাই তাতে কোম্পানির আমলের এই প্রথম ভাগ নবাবী আমলেরই জের। সেই একই সমাজ-চরিত্র —বা সামাজিক চরিত্রহীনতা—এ সময়েরও প্রধান লক্ষণ। অর্থাৎ নবাবরা গেল, 'নাবুব'দের আমল চলল। সমস্ত অষ্টাদশ শতকের বাংলা সাহিত্য এই সামাজিক অবক্ষয়ের প্রতিলিপি : মধ্যযুগ শেষ হয়েছে, কিন্তু আধুনিক যুগের পথ অবরুদ্ধ ; দেবতায় আস্থা নেই, কিন্তু মানুষেই বা আস্থা কোথায়? বিষয়-বুদ্ধির অভাব নেই, কিন্তু বাস্তব-বোধ কোথায়? পৌরুষ কোথায়? উদ্যোগ কোথায়? মনুষ্যত্ব কোথায়?

অষ্টম পরিচ্ছেদ

পুরাতনের অনুবৃত্তি

(খ্রীঃ ১৭০০—খ্রীঃ ১৮০০)

সকল যুগেই যা যুগ-লক্ষণ, তার পাশেই থাকে পূর্বযুগের প্রচলিত অনেক লক্ষণ এবং হয়তো যা আগামী যুগে পরিস্ফুট হবে তারও বীজ। আপাতদৃষ্টিতে অনেক সময়ে তাই ভাবী লক্ষণগুলি যেমন চোখেই পড়ে না, তেমনি অতীতের পল্লবিত বিস্তারকেই মনে হয় প্রধান। অষ্টাদশ শতক যখন আরম্ভ হচ্ছে তখনো তাই বৈষ্ণব-সাহিত্য, মঙ্গল-কাব্য, পৌরাণিক অনুবাদ প্রভৃতি প্রচলিত সাহিত্য-রূপ প্রকাশ্যতঃ প্রবলই ছিল, কিন্তু ছিল না তাতে প্রাণস্ফূর্তি। অভ্যাস-মতো অভ্যস্ত নিয়মে কবিরা যা লিখছিলেন বাহ্যতঃ তা হয়তো ত্রুটিহীন, কিন্তু অন্তরে প্রায়ই দৈন্যগ্রস্ত।

বৈষ্ণব-সাহিত্যের ধারা

অষ্টাদশ শতকে মনে হয় বৈষ্ণব-সাহিত্যের ধারাও বাহ্যতঃ সমভাবে প্রবহমাণ—পদাবলী লেখা হচ্ছে, জীবনী-কাব্য রচিত হচ্ছে, কৃষ্ণ-মঙ্গলের নূতন কাব্যও প্রণীত হচ্ছে। বরং কোনো কোনো দিকে নূতনত্বও দেখা যায়—বৈষ্ণব-কাব্য ও বৈষ্ণব-শাস্ত্রের বঙ্গানুবাদ এ সময়ে বেশ বৃদ্ধি পায়, এবং শ্রীহট্টে বৈষ্ণব-সাহিত্যের একটি কেন্দ্র গড়ে ওঠে, বিষ্ণুপুরের রাজসভা বৈষ্ণব-সাহিত্যের তখনো প্রধান পীঠস্থল হয়ে আছে। ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের বৈষ্ণব-সাহিত্যের কথা বলতে গিয়ে প্রয়োজন বোধে অষ্টাদশ শতকের এরূপ প্রধান প্রধান কাব্যের কথাও আমরা উল্লেখ করেছি—যাতে ধারাবাহিকতা স্পষ্ট হয় এজন্য। পুনরুল্লেখের ভয় থাকলেও দু'এক ক্ষেত্রে এখনো সে সব গ্রন্থ ও লেখকদের কথা আলোচনা না করলে আরও ত্রুটি ঘটবে।

জীবনী-কাব্য: বৈষ্ণব-জীবনীকারদের মধ্যে পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে প্রেমদাসের নাম ও নরহরি চক্রবর্তীর নাম।

প্রেমদাস নামেই পুরুষোত্তম সিদ্ধান্তবাগীশের পরিচয়, তাঁর কাব্যে যথারীতি নিজের কুলপরিচয়ও আছে। প্রেমদাস দুখানি বৈষ্ণব-জীবনীর রচয়িতা। তার মধ্যে 'চৈতন্য-চন্দ্রোদয়কৌমুদী' (খ্রীঃ ১৭১২-১৩) মূল কাব্য

নয়, কবিকর্ণপুরের সংস্কৃত নাটক 'চৈতন্য-চন্দ্রোদয়ে'র তা অনুবাদ, এবং সৌভাগ্যক্রমে সুপাঠ্য অনুবাদ। তার পরবর্তী গ্রন্থ 'বংশীশিক্ষা' (১৭১৬-১৭), চার উল্লাসে সমাপ্ত। কবির গুরুর পিতৃপুরুষ বংশীবদনকে (চট্ট) শ্রীচৈতন্য তত্ত্ব-কথা উপদেশ দিচ্ছেন, সে উপলক্ষে বংশীবদনের পুত্র-পৌত্রাদি, চৈতন্যদেব, জাহ্নবী দেবী প্রভৃতির কথাও কিছু কিছু জানা যায়—চণ্ডীদাসের ভণিতায় সাধনাঘটিত পদও কিছু আছে। 'রসরাজ'-সাধনার ধারার তত্ত্ব আছে এ গ্রন্থে,—মূল উদ্দেশ্য জীবনী-রচনা নয়।

নরহরি চক্রবর্তী বহু গ্রন্থের প্রণেতা। এ যুগের জীবনী-কাব্যের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ কবি। "তাঁর 'ভক্তি-রত্নাকর' বৈষ্ণব-ইতিহাসের বিশ্ব-কোষ-তুল্য।" 'নরোত্তম-বিলাস' সে গ্রন্থের পরিশিষ্টস্বরূপ। কিন্তু নরহরির তৃতীয় জীবনী-গ্রন্থ 'শ্রীনিবাস-চরিত্র' পাওয়া যায় নি। তা ছাড়াও নরহরি চক্রবর্তী ('ঘনশ্যাম' নামে) অনেক পদ রচনা করেছেন, 'গীত-চন্দ্রোদয়' নামে পদ-সংকলন গ্রন্থেরও তিনি সংকলক, 'গৌর-চরিত্র চিন্তামণি' নামক গৌরাঙ্গ-পদাবলীরও সংগ্রাহক। ছন্দ বিষয়েও তিনি গ্রন্থ লিখেছিলেন। নরহরিরও নিজের কথায় তাঁর পরিচয় রয়েছে—বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর শিষ্য জগন্নাথ ছিলেন তাঁর পিতা, আর তাঁদের বাড়ি ছিল গঙ্গার পূর্বতীরে সৈয়দাবাদের নিকটে (মুর্শিদাবাদ)। এই 'ভক্তি-রত্নাকর' অষ্টাদশ শতকের বৈষ্ণব-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ, বৈষ্ণব-জীবনী ও বৈষ্ণব-কথার আকর।

আরও জীবনী-গ্রন্থ আছে। তার মধ্যে উদ্ধবদাসের 'ব্রজমঙ্গলে' আগ্রহ জাগতে পারে, তাতে কবি লোচনদাসের কথা আছে বলে। লোচনদাস 'চৈতন্য-মঙ্গলে'র চৈতন্যলীলা, কৃষ্ণলীলা ও রাগাত্মিকা পদাবলীর কবি ও সাধক।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চৈতন্য-জীবনীও লিখিত হয়েছে; তার মধ্যে শ্রীহট্টের কবিরা শ্রীচৈতন্য ও তাঁর জ্ঞাতিদের নিয়ে নিবন্ধ-কাব্য লিখতে উৎসাহী ছিলেন। তা ছাড়া কৃষ্ণ-মঙ্গল জাতীয় কাব্য-নিবন্ধ প্রভৃতিও সেখানে রচিত হয়েছে। নবনীদাসের 'জগন্মোহন ভাগবত' উল্লেখযোগ্য। মনে হয় লেখক সে অঞ্চলের সুফীভাবের দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছিলেন। বাঙালী বৈষ্ণব-সাধনায় ও সংস্কৃতিতে শ্রীহট্টের স্থানটি বোঝা যায়—শ্রীহট্টের সুফী-ঐতিহ্য স্মরণে রাখলে। ঊনবিংশ শতকেও শ্রীহট্টে ভক্ত-জীবনী ও বৈষ্ণব নিবন্ধাদি লেখা হয়েছে।

'কবিচন্দ্রে'র 'কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যের' কয়েকটি পালা বহুস্থলে পাওয়া যায়। গ্রন্থ বড় ছিল এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই রচিত হয়েছিল দুর্জয় সিংহের রাজ্য-কালে (খ্রীঃ ১৭০২এর পূর্বে ?)। 'ভাগবতামৃত' বা 'গোবিন্দ মঙ্গলের' —'প্রসাদ চরিত্র' লিখিত হয় গোপাল সিংহ দেবের রাজ্যকালে—'ব্যাসের আদেশে দ্বিজ কবিচন্দ্র গায়।' ভাগবতের দশমস্কন্ধ তাতে সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে, অন্য লীলা সংক্ষিপ্ত। তবে নানা নূতন কাহিনীও যোগ হয়েছে,— সেগুলি বাঙালী বৈষ্ণবদের কল্পনার বাহাদুরি—যেমন কলঙ্ক-ভঞ্জন, কৃষ্ণকালী ইত্যাদি। শঙ্কর চক্রবর্তী আরও অনেক গ্রন্থ লিখেছিলেন—তাঁর 'অধ্যাত্ম রামায়ণ পাঁচালী'ই 'বিষ্ণুপুরী রামায়ণ' নামে সুপ্রচলিত, (পরে দ্রষ্টব্য); তাঁর লিখিত 'সংক্ষিপ্ত ভারত পাঁচালী' আছে, 'ধর্ম-মঙ্গল'ও আছে এ অঞ্চলে। 'কবিচন্দ্র' বিখ্যাত কবি, নিজের পরিচয়ও রেখে গিয়েছেন। শঙ্কর ছিলেন পানুয়া নিবাসী মুনিরাম চক্রবর্তীর পুত্র—'লেগ্যোর দক্ষিণে গ্রাম পানুয়ায় বসতি।'

পৌরাণিক ও বিবিধ কাব্য—কৃষ্ণলীলার পুঁথির অভাব নেই—মল্লভূমি থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত সবত্রই কিছু-না কিছু পাওয়া যায়। শুধু ব্রজলীলা নিয়েই নয়, বৈষ্ণবদের সমাদৃত নানা পৌরাণিক আখ্যায়িকা নিয়েও অনেক কাব্য রচিত হয়েছে; বিষ্ণুপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, পদ্মপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ প্রভৃতি থেকে তা আহরিত; যেমন প্রহ্লাদ-চরিত্র, ধ্রুব-চরিত্র, তুলসী-চরিত্র, প্রভৃতি। এসব নিয়ে কথকতা, পাঁচালী যেমন হত, তেমনি পুঁথিও তখন হয়েছে।

গতানুগতিক ভাবে ভাগবত ও পুরাণ থেকে কৃষ্ণলীলার কাহিনী ও নৌকাখণ্ড প্রভৃতি কাহিনী উনবিংশ শতকেও যে রচিত হয়ে চলে, তাও জানা কথা।

অনুবাদ ও নিবন্ধ—গীতগোবিন্দের অনুবাদ খান চার পাঁচ আছে এসময়কার, আগেও অনুবাদ ছিল। বৈষ্ণব গোস্বামীরা যেসব সংস্কৃত কাব্য, নাট্য, দর্শন লিখেছিলেন তা-ই ছিল বৈষ্ণবদের প্রধান অবলম্বন। সে সবের অনুবাদও তাই প্রয়োজন ছিল; তা একটা পুণ্যকর্মও হয়ে দাঁড়ায়। প্রেমদাস অনূদিত 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়কৌমুদী'র মতো তা উপাদেয় হোক্ বা না হোক, সে সব অনুবাদের সমাদর ছিল। যেমন, রূপ গোস্বামীর 'ললিত-মাধব-নাটকে'র অনুবাদ করেন স্বরূপচরণ গোস্বামী 'প্রেমকদম্ব' নামে; যদুনন্দন

দাস 'বিদগ্ধ মাধবের' অনুবাদ করেন 'রসকদম্ব' নামে, রায় রামানন্দের 'জগন্নাথবল্লভ' নাটকের অনুবাদ করেন গোপাল দাস। 'উজ্জ্বলনীলমণি'র ও 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'র একাধিক অনুবাদ চলে, তা স্বাভাবিক। গোস্বামীদের কবিতার, স্তবের, সংস্কৃত উদ্ধৃতির—সবকিছুরই অনুবাদ হতে লাগল। কিন্তু ভারতীয় অন্য ভাষা থেকে বৈষ্ণবজীবনীর একমাত্র অনুবাদ নাভাজীর 'ভক্তমাল' গ্রন্থ, তা দেখেছি।

এসব অনুবাদ গ্রন্থেব অপেক্ষাও সাহিত্যের পক্ষে অবান্তর বৈষ্ণবদের লেখা বৈষ্ণব নিবন্ধ ও তার অনুবাদ,—একমাত্র বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ইতিহাসেই তার দাম থাকতে পারে। বাঙ্‌লা গদ্যের অস্ফুট আভাসও তাতে কিছুটা পাওয়া যায়।

মঙ্গল-কাব্যের ধারা

মঙ্গল-কাব্যের লৌকিক আধারের উপর পৌরাণিক বিষয়-বস্তুর ভার ক্রমশঃই বৃদ্ধি পেয়েছিল। অষ্টাদশ শতকে পৌঁছে দেখি পৌরাণিক আখ্যায়িকাসমূহই এ ধারার প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়াচ্ছে, কখনো কখনো একমাত্র বিষয় হয়ে উঠেছে। তাই চণ্ডীমঙ্গলের চণ্ডীর থেকে এখন মার্কণ্ডেয় চণ্ডী বা দেবী ভাগবতের চণ্ডীর মাহাত্ম্য-রচনা কম প্রচলিত নয়। এদিকে অষ্টাদশ শতকে এবং উনিশ শতকেও মঙ্গল-কাব্যের সেই সরল বাস্তবতা কমে গিয়েছে। এরূপ অধিকাংশ কাব্যের সাহিত্যিক,—কিংবা সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক,—মূল্য বিশেষ নেই, অযথা তাই আমাদের তালিকা দীর্ঘ করে কি হবে? একালের মঙ্গল-কাব্যের মধ্যে বৈশিষ্ট্য অর্জন করে ধর্মমঙ্গল। ধর্মমঙ্গলের স্বতন্ত্র আলোচনা এখানে প্রয়োজন; কারণ ধর্মমঙ্গলের প্রধান যুগ অষ্টাদশ শতক। শিবায়নও প্রকৃতপক্ষে এসময়েই স্বাতন্ত্র্যলাভ করে।

মনসা-মঙ্গল ঃ মনসা-মঙ্গলের কাব্যে যা রচিত হচ্ছে তাতে এই কালের ছন্দ ও ভাষার সহজ পরিচ্ছন্নতা পাওয়া যায়, কিন্তু তার বেশি বিশেষ কিছু নেই—হট্টের কবি ষষ্ঠীবরের (দত্ত) লেখায় ছাড়া (রামায়ণ-রচয়িতা ষষ্ঠীবর অন্য লোক)। সে গ্রন্থে হর-পার্বতীর প্রাগৌদ্বাহিক লীলা-কাহিনীতে একটু নূতনত্ব আছে, গৌরীর 'কাব্যাদেবী'র পূজা ও শিবের 'কেওয়ালী' (কাপালিক) নাটগীত দু'টি নূতন ব্যাপার। অধিকাংশ কবিই (২০ জনেরও বেশী) পূর্ববঙ্গের,—একজন ছিলেন সুবঙ্গের রাজা। চট্টগ্রামের রামজীবন

বিদ্যাভূষণ (খ্রীঃ ১৭০৩-৪) মনসা-মঙ্গল ছাড়া 'আদিত্য চরিত', 'সূর্যমঙ্গল পাঁচালী' প্রভৃতি লিখেছিলেন। পূর্ববঙ্গের মনসা-মঙ্গলসমূহ পালাগানের নিয়মে গায়েনের মুখে মুখে পরিবর্তিত হয়ে হয়ে গড়ে উঠেছে ; উত্তরবঙ্গের ও পশ্চিমবঙ্গের মতো নির্দিষ্ট লেখকের লিখিত কাব্য হয়ে ওঠে নি।

উত্তরবঙ্গের কাব্যে দুটি খণ্ড স্থির হয়ে এসেছে ; যথা, দেবখণ্ড, তাতে আছে দেবদেবীদের প্রণয়, ঈর্ষা, বিবাদ প্রভৃতি ; আর বণিকখণ্ড, এটিই চাঁদ বেণে ও বেহুলার কথা। উত্তরবঙ্গের কবিদের মধ্যে জগজ্জীবন ঘোষাল দিনাজপুরের কোচ-আমোরার লোক, জীবনকৃষ্ণ মৈত্র করতোয়াতীরের লাহিড়িপাড়া গ্রামের অধিবাসী (দ্রঃ—বঃ সাঃ পরিচয়, পৃঃ ২৮৬-৯৯)

পশ্চিমবঙ্গের কবিদের মধ্যে দ্বিজ বাণেশ্বর (রায়ের) নাম আছে। উনবিংশ শতকেও সেনভূম-মল্লভূমের মধ্যবর্তী আখড়াসোলের গ্রামের কবি দ্বিজ রসিক বিরাট মনসা-মঙ্গল গ্রন্থ রচনা করেছেন, দেখতে পাই (দ্রঃ—বঃ সাঃ পরিচয়, পৃঃ ২৯২)।

চণ্ডীমঙ্গল : মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের প্রভাব কেউ কাটিয়ে উঠতে আর পারল না ; পূর্বানুবৃত্তি করে অনেকে তবু রচনা করেছেন চণ্ডীমঙ্গল। উত্তরবঙ্গের মোদককুলের শ্রীকৃষ্ণজীবন দাস লিখেছেন 'দুর্গামঙ্গল', চট্টগ্রামের মুক্তারাম সেন লিখেছেন 'সারদামঙ্গল', ভবানীশঙ্কর দাস 'মঙ্গলচণ্ডী পাঞ্চালিকা'। রামচন্দ্রযতির চণ্ডীমঙ্গলই (খ্রীঃ ১৭৬৬-১৭৬৭) কয়েকটি কারণে আলোচ্য। প্রথমতঃ, রামচন্দ্র-যতি 'রামায়ণে'রও লেখক, এ কাব্যেই আরও তিনি জানিয়েছেন যে তা ছাড়াও 'সংস্কৃতে পঁচিশ পুস্তক করি আর'। দ্বিতীয়তঃ, এই মঙ্গলকাব্যে মুকুন্দরামের চণ্ডীর বিরুদ্ধে সন্ন্যাসী কবি (হয়তো আপন অক্ষমতার বশেই) কড়া সমালোচনা করেছেন—"পুরানো বাঙ্‌লা সাহিত্যে এইই প্রথম সাহিত্য সমালোচনা"। কাব্যমধ্যে ভারতচন্দ্রের উল্লেখও আছে।

বিক্রমপুর জপসা গ্রামের জয়নারায়ণ সেন (রায়) 'চণ্ডিকামঙ্গল' ছাড়াও 'হরিলীলা' লিখেছিলেন (খ্রীঃ ১৭৭২-৭৩, 'হরিলীলা' কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯২৩এ প্রকাশিত হয়)। ভারতচন্দ্রের যুগের কবিকৃতির যে উন্নতি ঘটেছে, 'হরিলীলা'য়ও তা দেখা যায়। কিন্তু উল্লেখযোগ্য হচ্ছে এই পরিবারের সাহিত্য ও বিদ্যানুশীলন (দ্রষ্টব্য—দীনেশচন্দ্র সেন 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য', 'বঙ্গসাহিত্য পরিচয়', পৃঃ ১৪৭৭)। জয়নারায়ণের অগ্রজ রামগতি ও অনুজ রাজনারায়ণও গ্রন্থ রচনা করেছেন—অগ্রজ ছিলেন ধর্মানুগত তিনি যোগশাস্ত্রের

গ্রন্থ লিখেছেন; অনুজ ছিলেন রসবিলাসী, তিনি গ্রন্থ লিখেছেন সংস্কৃতে। কিন্তু তার চেয়ে স্মরণীয় কবির ভ্রাতুষ্পুত্রী আনন্দময়ী;—তিনিও 'হরিলীলা'র কিছু কিছু রচনা করেছিলেন, আর তাঁর বিদ্যার খ্যাতিও ছিল সর্বত্র (দ্রষ্টব্য—বঃ সাঃ পরিচয়, পৃঃ ১৮৭২)। চণ্ডিকামঙ্গলে কালকেতু ও ধনপতির কাহিনী ছাড়াও মাধব-সুলোচনার কাহিনী জয়নারায়ণ যোগ করেন তাঁর ভাগিনেয়ী গঙ্গা ও ভ্রাতুষ্পুত্রী দয়াময়ীর অনুরোধে। মোটামুটি এ সময়কার অনেক মঙ্গলকাব্যের অপেক্ষা জয়নারায়ণের এ গ্রন্থ আদরণীয়।

চণ্ডী সপ্তশতীর অনুসরণে লিখিত চণ্ডী ও ধনপতি খুল্লনার কাহিনী নিয়ে লেখা ব্রতকথা-শাখার লেখাগুলির খোঁজ নেওয়া বিড়ম্বনা। মূল্য যাই হোক্, লেখা ও লেখকের অভাব নেই।

ধর্মমঙ্গল ও ধর্মের গীত

অষ্টাদশ শতকের মঙ্গলকাব্যের মধ্যে ধর্মমঙ্গল কাব্যেই সজীবতা দেখা যায়; নূতন করিয়া এখানে কবি-কৃতিত্বও দেখিয়েছেন। অবশ্য এ দিনের সূচনা হয়েছিল সপ্তদশ শতকের শেষদিকে, আমরা তা দেখেছি। 'নবাবী আমলের' ধর্মমঙ্গলের ও ধর্মের গানের প্রধান কবিদের কথাই তাই এখানে আলোচনা করা হল,—যেমন, ঘনরাম চক্রবর্তী, নরসিংহ বসু, মাণিক গাঙ্গুলী, রামকান্ত রায়, সহদেব চক্রবর্তী প্রভৃতি। এঁরা সকলেই প্রায় সেই দামোদর তীর ও বর্ধমান-হুগলীর অন্তর্গত ধর্মঠাকুরের প্রিয় বিশেষ অঞ্চলের অধিবাসী।

ধর্মমঙ্গল বা ধর্মের গানের কথা বাঁধাধরা; তাতে বৈচিত্র্য বড় নেই। সাধারণভাবে কবিদের এক-আধটুকু বৈশিষ্ট্য তাতে দেখা যায়,—তাও সময়ে সময়ে। কিন্তু এটা দেখছি একালের ধর্মমঙ্গলের কবিরা মোটামুটি পদ্য-রচনা করতে অসুবিধা বোধ করেন না। তাও হয়তো অষ্টাদশ শতকের সাধারণ গুণ, ও শিল্পটা লেখকদের অভ্যস্ত হয়েছে। কিন্তু সে শতাব্দীর ক্ষয়-লক্ষণ ধর্মমঙ্গলের কাব্যধারায় কম, কারণ ধর্মমঙ্গল পল্লীর জনতার জিনিস।

ধর্মমঙ্গলের কথাবস্তু একঘেয়ে, কিন্তু তার কবিদের আত্ম-কাহিনী বিচিত্র। অবশ্য তাতেও কতকগুলি মামুলী জিনিস আছে—যেমন, কবিমাত্রই স্বপ্নে আদেশ পান, পথে বেরিয়ে ব্রাহ্মণ-বেশী ধর্মঠাকুরকে দেখতে পান (পূর্ব-যুগে সিপাহী বা সন্ন্যাসী সেজেও তাঁকে দেখতে পেতেন), পথে দিশাহারা

হন, শঙ্খচিল উড়তে দেখেন, গৃহে ফিরে জ্বরে পড়েন, জ্বরের ঘোরে আবার আদেশ শুনতে পান, ইত্যাদি। সেদিনের জীবনের আচার-নিয়মের মতোই এগুলোও ছিল এ ধরণের কাব্যের ও কবি-জীবনের 'কন্‌ভেন্‌শান্‌'—প্রথা, নিয়ম। সেদিনের গ্রাম্য জীবন-যাত্রার ধরণটাও (প্যাটার্ন) ছিল একটু এক-ঘেয়ে। তা সত্ত্বেও প্রত্যেক কবিরই পরিবার-পরিজন ও নিজ নিজ বাস্তব জীবন-পরিবেশ স্বতন্ত্র, কাজেই সেসব উল্লেখ করতে গিয়ে প্রত্যেককেই নূতন কথা কিছু বলতে হয়। তাই ধর্মমঙ্গলের আখ্যানাংশ থেকেও কবি-কাহিনীর অংশ চিত্তাকর্ষক হয়। যা ছিল একসময়ে কবিদের পক্ষে প্রথাগত কুল-পরিচয়, এ কাব্যধারায় তা অনেকাংশে পরিণত হয়েছে আত্মজীবনী রচনায়।

ঘনরাম চক্রবর্তী—ধর্মমঙ্গলের সুপরিচিত কবি ঘনরাম চক্রবর্তী 'কবিরত্ন'। ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ সেনকে বাদ দিলে ঘনরামের খ্যাতিই এ শতাব্দীতে অধিক। অন্যান্য ধর্মমঙ্গলের কবির মত ঘনরামের আত্মকাহিনী পাওয়া যায় না, কিন্তু ডঃ সুকুমার সেনের সংগ্রহ থেকে সে পরিচয় সহজ-লভ্য হয়েছে। ঘনরাম বর্ধমানের সন্নিকটে কৃষ্ণপুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন, বর্ধমানের মহারাজা কীর্তিচন্দ্র ছিলেন তাঁর আশ্রয়স্থল। খ্রীঃ ১৭১১তে তাঁর 'ধর্মমঙ্গল' রচনা শেষ হয়,—তিনি 'সত্যনারায়ণের পাঁচালী'ও রচনা করেছিলেন।

ঘনরামের বিষয়ে সংগৃহীত জীবনী-কথায় ঘনরামের অপেক্ষা বেশি আছে তাঁর গুরু ভট্টাচার্যের কথা, নীলাচলযাত্রা, রামচন্দ্রের সাক্ষাৎকার, গুরুর নির্দেশ মতো ঘনরামের রামায়ণ লেখার চেষ্টা, আর শেষে ধর্মমঙ্গল লেখার আদেশ।

ঘনরামের ধর্মমঙ্গল ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলের'র বহুপূর্বে রচিত, কিন্তু ইছাই ঘোষের যুদ্ধযাত্রা বা কানড়ার যুদ্ধ প্রভৃতি অংশ (দ্রঃ—বঃ সাঃ পরিচয়, পৃঃ ৪৩৬, ৪৪৪ আদি) তুলনা করলে ঘনরামকে অযোগ্য পূর্বগামী বলা চলে না। পদ্য স্বচ্ছন্দগামী, অথচ অনুপ্রাসে অলঙ্কারে চমকপ্রদ। লখ্যা কিম্বা হরিহর বাইতির স্ত্রীর মতো স্ত্রীচরিত্র রচনায় সত্য-নিষ্ঠা ছাড়াও ঘনরাম আর একটি নূতন অনুভূতির প্রমাণ দিয়েছেন; তাঁর দৃষ্টি উদার; ভারতচন্দ্রের স্ত্রী-চরিত্র তুলনা করলেই তা বুঝা যায়।

সামরিক লোভে হরিহর বাইতির নিম্নোক্ত উক্তি লক্ষণীয়:

হরিহর বলে শুন বাইতির কী।
বসে কর বিলাস তোমার লাগে কী॥

ধন হতে ধরম ধরণী ধন্ত লোকে।
অবলা অবোধ জাতি কি বুঝাব তোকে।...
অধর্মের বাধ্য বস্থ ধর্মের অকার্য।
আগে পেলাম এত ধন পিছে পাব রাজ্য ॥

এরূপ ধন-স্তুতি মহাভারতেও আছে, তথাপি এ 'নবাবী আমলে'রই আভাস।

কিন্তু কি অর্থে ঘনরাম নিম্নোক্ত নিবেদন করছেন, তা বোঝা এখন দুষ্কর:

রাজার মঙ্গল চিন্তি দেশের কল্যাণ।
দ্বিজ ঘনরাম কবিরত্ন রস গান ॥

এ পংক্তি যদি আধুনিক প্রক্ষিপ্ত না হয়, এবং এখানে "দেশ" যদি সত্যই বর্ধমান অঞ্চল ও "রাজা" কীর্তিচন্দ্রকে না বুঝিয়ে থাকে, তা হলে এইখানে পাই বাঙ্‌লা সাহিত্যে এই প্রথম (খ্রীঃ ১৭১১) দেশাত্মবোধের আবির্ভাব। অথচ দেশাত্মবোধ কিছুটা থাকলে পলাশীর প্রহসনটা এমন ট্র্যাজিডিতে পরিণত হবার কথা নয়।

নরসিংহ বসু—নরসিংহ বসুর ধর্মমঙ্গলের পুঁথিতে জাফর খাঁর (মুর্শিদ-কুলী খাঁ) নাম রয়েছে। এ কবিও বর্ধমানের কীর্তিচন্দ্রের সমসাময়িক, তাই অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে তাঁর পুঁথি রচিত হয়ে থাকবে। বর্ধমানের শাঁখারী গ্রামে তাঁদের বাস ছিল। পিতৃহীন বালক পিতামহীর নিকট পালিত হয়। কায়স্থ কবি জানিয়েছেন—সেই পিতামহীর চেষ্টায়

বাঙ্গলা পারসী উড্যা পড়াল্য নাগরী।

সেদিনের শিক্ষিত মানুষের ভাষা-শিক্ষাটা তা হলে নিতান্ত সামান্য হত না। তারপর নরসিংহ বসু বীরভূম রাজনগরের আসফুল্লা খানের পক্ষে বকীল হন মুর্শিদাবাদের রাজদরবারে। কিন্তু নিজের কাব্য প্রণয়নের সূচনায় তিনি দেশের অবস্থা যত বলতে পারতেন তত বলেন নি।—মুর্শিদ কুলী খাঁর আমল; আসফুল্লার খাজনা বাকী পড়ায় নরসিংহ ছুটে আসেন রাজনগর; খাজনা পাঠিয়ে নিজেও আবার মুর্শিদাবাদ রওনা হন,—এই গোবেগ যাত্রাটি সুন্দর বর্ণিত হয়েছে। তারপর তিনি কুমুটির ধর্মঠাকুরের স্থলে পেলেন সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ। নরসিংহকে ধর্মমঙ্গল লিখতে বলে সন্ন্যাসী অন্তর্হিত হলেন। নিজ গ্রাম শাঁখারীতে পৌঁছে কবির জ্বর হল। তারপর মুর্শিদাবাদ গিয়ে

তিনি খাজনা মিটিয়ে দিলেন, নিশ্চিন্ত হয়ে তখন লিখতে বসলেন ধর্মের গান,—কারণ 'ধর্মের কৃপায় হইল দরবার জয়।' (দ্রষ্টব্য—বঃ সাঃ পরিচয়, পৃঃ ৪৫৬-৫৮১)

মানিকরাম গাঙ্গুলী—মানিক গাঙ্গুলীর ধর্মমঙ্গলে কাল উল্লেখিত হয়েছিল সংকেতে। অনেক পূর্বেকার কবি বলে তাঁকে তাই ধরা হত। এখন শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি সে প্রশ্ন সুমীমাংসা করে দিয়েছেন। তাই জানি—এর রচনা শেষ হয়েছিল খ্রীঃ ১৭৮১তে। কাব্য মধ্যেও এর সমর্থন পাওয়া যায়—মদনমোহনের প্রতিষ্ঠা (খ্রীঃ ১৬৯৪) ও 'রাধার কলঙ্ক-ভঞ্জন' কাহিনী সপ্তদশ শতকের জিনিস। তা ছাড়া কাব্যে ঘনরামের প্রভাব অনুমান করা যায়, রূপরামের নামও পাওয়া যায়। ভাষায়ও অষ্টাদশ শতকের কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্য আছে; একটু হাস্যরসও মানিকরামের ছিল। কবি আত্ম-কাহিনী লিখে গিয়েছেন।

মানিকরাম হুগলী জেলার আরামবাগ মহাকুমার বেলডিহার (বেলটে) গদাধর গাঙ্গুলীর পুত্র। নানা টোলে পড়ে মানিকরাম গিয়েছিলেন ভুড়াড়িতে ন্যায় পড়তে, কিন্তু মনঃস্থির করতে পারছিলেন না। সেখানে স্বপ্ন দেখলেন—গৃহে ফিরতে আদেশ হল। ঘরের পথে নদী পেরিয়ে তিনি দিশাহারা হলেন, তখন ছুটতে লাগলেন। দেশড়ার মাঠে তখন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বেশে দেখা দিলেন ধর্মঠাকুর—

অপূর্ব অদ্ভুত মূর্তি আশা-বাড়ি হাতে।

ব্রাহ্মণের কিন্তু 'দেখিতে দেখিতে হল যুবত্ব-শরীর'; তিনি নিজের নাম বললেন 'রাজ্যধর বিদ্যাপতি রঙ্গপুরে ধাম'। সত্য ধর্ম উপদেশের জন্য মানিকরামকে তিনি নিজ গৃহে আহ্বান জানালেন। একটু গিয়েই কিন্তু কবি ফিরে দেখেন কেউ কোথাও নেই। তারপর আর-এক ধর্মের পূজারী ব্রাহ্মণও পথে কবিকে জিজ্ঞাসা করলেন 'রাজ্যধর বিদ্যাপতির' কথা, এবং বললেন ধর্মের পাদুকার সেবা করতে। অমনি মানিকরাম দেখলেন সম্মুখে দিব্য সরোবর, তাতে পদ্ম ফুটে আছে। কবি সে ফুল তুললেন। 'ধর্মায় নমঃ' বলে পুজো করলেন। এরপর বাড়ি ফিরে দুদিন বাড়িতে থেকে চললেন রঙ্গপুর। পথে তারাজুলীর তীরে আবার দেখলেন এক ব্রাহ্মণ, কিন্তু সে ভয়ঙ্কর দস্যু মূর্তি, মানিকরামকে সে খুন করতে চায়। অনেক অনুনয়ে রঙ্গপুর যাবার কথা বলাতে কবি রেহাই পেলেন। রক্ষা পেয়ে যেই আবার

দৌড়ুলেন, দেখ্‌লেন—ব্রাহ্মণও নেই। রঙ্গপুরে গিয়ে দেখেন—কোথায় রাজ্যধর বিদ্যাপতি? সে নামের কেউ নেই সেই গ্রামে। কবি ভয় পেয়ে স্বগ্রামে ফিরে এলেন। যথারীতি জ্বর এল আর জ্বরের মধ্যেই স্বপ্নে এলেন ধর্মঠাকুর,—বললেন, ধর্মের গান লেখো।

বিশ্বের কারণ আমি বাঁকুড়া রায় নাম।

আদেশ হল 'বার দিনে সমাপ্ত হইবে বারমতি'। মানিক গাঙ্গুলী কবিতা লিখবেন, আর তাঁর চতুর্থ সহোদর গায়েন হবেন। কিন্তু ধর্মের পুঁথি ব্রাহ্মণে লিখলেও গায়েন ও পূজারী হয় সাধারণতঃ নীচ জাত। তাই মানিকরামের ভাইএর জন্য অনুনয়—

জাতি যায় তবে প্রভু যদি করে গান।

ঠাকুরও সান্ত্বনা দিলেন—ভক্তাধীন ভগবানের মতো—'আমি তোর জাতি, তোমার অখ্যাতি হলে আমার অখ্যাতি।' এর পরে লেখা আরম্ভ। মোটামুটি ভালোই লিখছেন তা মানিকরাম।

রামকান্ত রায়—রামকান্ত রায়ের আত্মকাহিনীতে নূতনত্ব আছে। তিনিও দামোদর-অঞ্চলের লোক; বর্ধমানের রাজা তেজচন্দ্রের জমিদারীর অন্তর্গত সেহারা গ্রামের তাঁরা অধিবাসী। সেখানে বাঞ্ছারাম সরকারের বাড়ির কাছেই বাব্‌লাতলায় ছিল ধর্মঠাকুরের স্থান; গ্রামে এ দেবতার নাম বুড়াঠাকুর। রামকান্ত তাঁর আদেশেই ধর্মমঙ্গল লিখেছিলেন অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে (খ্রীঃ ১৭৮৩?)। উপলক্ষটা এরূপ (দ্রষ্টব্য—ডঃ সেন: বাঃ সাঃ ইতিহাস, পৃঃ ৭২৯-৭৩৭): কবি বলছেন 'মাস ছয় বেকার বসিয়া আছি ঘরে'। তাঁরা চাষী গৃহস্থের পরিবার, কায়স্থ; ঘরে বসে খাওয়া চলে না। ক্ষেতির কাজ করা ছাড়া আর গতিও নেই; কিন্তু কবির তা মনে ধরে না। হয়তো ক্ষেতের চাষ-বাসে লাভও তখন কমে আসছিল, এবং সেদিনেও লেখাপড়া শিখলে কেউ ওরকম ক্ষেতের কাজে আগ্রহ বোধ করত না, তা অনুমান করতে পারি। যা হোক্, তার চেয়েও বেশি লক্ষণীয় বেকার কবির বেকারত্বের বর্ণনা। বোধ হয় বাঙ্‌লা সাহিত্যে তা এই প্রথম এবং এখনকার তুলনায়ও এ বর্ণনা একেবারে পুরনো হয়ে যায় নি।

দিনে দিনে অধিক হইল উচাটন
প্রবৃত্তি না দেয় কিসে বিচলিত মন।

ধড় ফড় করে প্রাণ অন্তর বিকল
কভু ভাবি মনেতে যাইব নীলাচল।

এদিনে হলে শহরে আসতেন—দরখাস্ত নিয়ে ঘুরতেন। সেদিনে—

দিবানিশি শয়নে স্বপনে দেখি কত
দিন কুড়ি উচাটন সয় এই মত।
কাহারে না বলি কিছু অন্তর গুমরে
সারাদিন বেড়াই সভার ঘরে ঘরে।
বহুদিন ডানি বাহু ডানি চক্ষু নাচে
ইচ্ছা নাই বচন কহিতে কার আছে।
নিদ্রা নাই শয়নে শর্বরী জাগরণে
উম্মা হয় যদি কিছু বলে কোন্ জনে।

খ্রীঃ ১৭৮৩-র তুলনায় বেকারের অবস্থা এখন আরও জটিল হয়েছে, মনোভাবও তীব্র হয়েছে; কিন্তু এ বর্ণনা এখনো সত্য। রামকান্ত রায় বেকারের অনুভূতি যথার্থ বর্ণনা করতে পেরেছেন,—এ সহজ শক্তির কথা নয়।

এর পরে অবশ্য আসল প্রস্তাবনা। একদিন ভাদ্রমাসে কৃষাণের জন্য জলপান দিয়ে আসতে রামকান্তকে পিতা মাঠে পাঠালেন। মনে রাগ হলেও রামকান্ত চললেন, আর ঘরের বা'র হতেই দেখলেন শঙ্খচিল।—আর মার নেই। বুড়াঠাকুরের বাব্‌লা গাছের দিকে কবি তাকালেন, দেখলেন সেখানেও বসে আছে শঙ্খচিল। কবির অন্তর হৃষ্ট। জলপান দিয়ে ক্ষেতে তাই ধান দেখে বেড়াতে ইচ্ছা হল। বেড়াতে লাগলেন। বেলা বাড়ছে, তৃষ্ণায় ছাতি ফাটে, কিন্তু বাড়ি ফিরবার ইচ্ছা হলেও ফিরতে পারেন না, এমনি দৈব-চক্রান্ত। রামকান্ত রায় প্রায় ছোটখাটো একজন সাইকোলজি-ক্যাল কথা-সাহিত্যিক। কিন্তু বর্ণনাও করতে কবি জানেন—নাম করে করে স্পষ্ট করে তোলেন প্রতিটি বস্তু; ওইতো সাকুড়া-পুকুর দেখা যায়। মুখে চোখে তিনি জল দেন। গায়ে কাঁটা দেয়। শরীর কেমন ছম ছম করে। মাঠের মধ্যে ঘোর অন্ধকার দেখেন। পা অবশ, গায়ে ঘাম ঝরে, একবারে সম্বিৎ হারান! চোখ যেই মেলেছেন

হেন কালে দেখি এক অদ্ভুত ব্রাহ্মণ।

বুঝা গেল যে তিনি কে। কিন্তু একটু নূতনত্ব আছে

অর্ধচন্দ্র পরিধান কানেতে জবা ফুল
মাথায় লম্বিত জটা সর্প সমতুল।

বিষ্ণুর মতো নয়, শিবের মতো দেখতে ব্রাহ্মণ। কবি বিস্ময়ে বিমূঢ়। ভয় না অভয়, নিদ্রা না জাগরণ কিছুই সাইকোলজিস্ট-কবি ঠিক পান না। অবশ্য ব্রাহ্মণ ঠাকুরই কবিকে এ অবস্থা থেকে উদ্ধার করলেন। জানালেন সকাল থেকে তিনি রামকান্তকে খুঁজছেন, একা তাঁকে একবারও পান্ না;—তিনি গাঁয়ের বুড়া রায়। কবি অবশ্য তখনো স্তম্ভের মতন দাঁড়িয়ে—'কোথা আছি, কিবা করি, কিছু নাই মনে।' ওদিকে ব্রাহ্মণ

বারমতি লিখিতে বলেন বার বার।

তারপর তিনি অন্তর্হিত হলেন, আবার পথে দেখা দিলেন। কিন্তু বিকল রামকান্ত ঘরে ফিরে অবশ হয়ে পড়লেন, তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে রইলেন, স্নানাহারও করতে চান না। ঠাকুরই আবার শিয়রে এসে বসলেন—কি করবেন, গরজ যে তাঁর,—রামকান্তকে তিনি উঠতে বললেন, স্নানাহার করতে বললেন, বোঝালেন গান লিখিয়ে রামকান্তের কীর্তি তিনি দেশ-দেশান্তরে খ্যাত করবেন। পরের দিন থেকে রামকান্ত লিখতে বসলেন, সাত দিনে একশ পাতা লিখলেন। তারপরে আর কলম চলে না, পুঁথি তাই তখন অসমাপ্ত রইল। পূজার পরে বিজয়া দশমীর রাত্রিতে আবার বুড়া রায় তাই দেখা দিলেন;—বুড়া রায়ের জয় বলে আবার পুঁথি আরম্ভ করতে আদেশ দিলেন। ভরসা পেয়ে কবিও আবার লিখতে বসলেন, এবং

বারমতি সাঙ্গ হল্য বাসট্টি দিবসে।

রূপরাম বা অন্যান্য কবির তুলনায় রামকান্তের আত্মকাহিনী ঘটনাংশে বৈচিত্র্যহীন, কিন্তু তা চিত্তাকর্ষক বাস্তবতায় ও কবির মানসিক অবস্থার বর্ণনায়। আসল কাব্য ধর্মমঙ্গলে সে গুণ তত স্পষ্ট নয়।

এসব কবি ছাড়াও রামচন্দ্র (বাঁড়ুজ্জে) খ্রীঃ ১৭৩২-৩৩এ ধর্মমঙ্গল লেখেন, তাঁরও আত্মকাহিনী অংশ পাওয়া যায় নি। ভণিতা প্রভৃতি থেকে জানা যায় বাঁকুড়া বিষ্ণুপুরের দামোদর তীরের চাযোট গ্রামে তাঁর নিবাস ছিল। ধর্মপুরাণও তিনি লিখেছিলেন। সে সময়েরই কবি মল্লভূমির আলিগুঠিয়া গ্রামের চাষী ব্রাহ্মণ প্রভুরাম মুখুজ্জে ও শঙ্কর চক্রবর্তী 'কবিচন্দ্র'ও ধর্মমঙ্গল লিখেছিলেন।

ধর্মের গীত ও ধর্মপুরাণ—লাউসেনের আখ্যান ছাড়াও ধর্মের গীত, পূজা-পদ্ধতি প্রভৃতি নিয়ে নানা আখ্যান গড়ে ওঠে, তা আমরা জানি (পূর্বে আলোচিত হয়েছে)। এসবকে সাধারণ ভাবে 'ধর্মপুরাণ' বলা হয়। এসব কাহিনীতেই সৃষ্টি পত্তন (শিবায়নের) শিবের চাষ, সদা ডোমের ও রামাই পণ্ডিতের কাহিনী, 'ঘরভাঙা', ও হরিশচন্দ্র লুইধর আখ্যায়িকার সঙ্গে মীননাথ গোরক্ষনাথের কাহিনী ও গঙ্গার উপাখ্যানও স্থান পেয়েছে। বাঙ্‌লা দেশের মাটিতে যে-সব কাহিনী-আখ্যায়িকার জন্ম ধর্মের নামে সে সবকে সহজে গাঁথা যায়, মূল যোগসূত্রটা যুগিয়েছেন ধর্মনিরঞ্জন ও আদ্যা দেবী। আদ্যা দেবীর আখ্যাই কেতকা, এবং কখনো তিনি শিবের পত্নী চণ্ডী, কখনো বা কেতকা শিবের কন্যা এবং চণ্ডীর প্রতিদ্বন্দ্বিনী (ডঃ সুকুমার সেনের বাঃ সাঃ ইতিহাসে পৃঃ ৭৩৮-এ সম্বন্ধ-নির্ণয় দ্রষ্টব্য)। তাই ধর্মের গীতের মধ্যে ধর্মপুরাণও পড়ে, মীননাথ গোরক্ষনাথের কথাও মিলে, আর ধর্ম-নিরঞ্জনের নানা ছড়া ও গীতও পাওয়া যায়।

ধর্মপুরাণ বা অনিল পুরাণের প্রধান লেখক অষ্টাদশ শতকের দুজন; সহদেব চক্রবর্তী ও "রামাই পণ্ডিত" (ও নামে হয়তো আসলে লেখক রামাই পণ্ডিতের দোহাইতে পুঁথি চালাবার চেষ্টা করেছেন)।

সহদেব চক্রবর্তী—সহদেব চক্রবর্তীর 'অনিল পুরাণ'—যতটা স্থির হয়েছে—মনে হয় শতাব্দীর মধ্যভাগে, বা তৃতীয় পাদে রচিত। 'ধর্মমঙ্গলে'র কবিদের মতো। তিনি আত্মকাহিনী লেখেন নি, তবে পরিচয় দিয়েছেন—সেদিনে কুল-পরিচয় না দিলে কারো চলত না। সহদেবের পিতার নাম বিশ্বনাথ, নিবাস হুগলি জেলার বালিগড়ের রাধানগর। তিনি শুধু ধর্মঠাকুরের আদেশ পান নি, গ্রন্থ লেখার জন্য কালু রায়ও তাঁকে স্বপ্নে আদেশ দিয়েছিলেন—বোঝা যাচ্ছে একেবারে আহেলি দেবতারাও ধর্মের এলাকায় আসতে শুরু করেছিলেন। পদ্য রচনায় একটা দক্ষতা সহদেব চক্রবর্তীর ছিল—কাহিনী প্রভৃতি অবশ্য ধরাবাঁধা।

"রামাই পণ্ডিত"—'রামাই পণ্ডিতে'র নামীয় 'দ্বিজ' লক্ষণের (?) 'অনিল পুরাণ'ই একালে 'শূন্য পুরাণ' নামে বাঙ্‌লায় সুপরিচিত। এর অন্তর্ভুক্ত 'নিরঞ্জনের রুষ্মা' প্রভৃতি পূর্বেই আলোচিত হয়েছে (কবি হয়তো জাজপুরেরই লোক)। কিন্তু এ পুঁথিতে মীননাথ-গোরক্ষনাথের কাহিনীর

কথাও আছে। ধর্মের গীতের সঙ্গে সে সবের সম্পর্ক থাকলেও মীননাথ-গোরক্ষনাথ কাহিনী স্বতন্ত্র উল্লেখের যোগ্য।

শিবায়ন : ধর্মের গীতের অন্তর্ভুক্ত হলেও শিবায়ন স্বতন্ত্রভাবেও রচিত হয়। তার মধ্যে রামেশ্বরের শিবায়নই শ্রেষ্ঠ, অষ্টাদশ শতকের প্রারম্ভে (১৭১০-১১) রচিত হলেও তা রুচিতে, নীতিতে, এবং কাব্যগুণে সপ্তদশ শতকেরই উপযোগী,—সে যুগের সাহিত্য মধ্যে তা তাই পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে। অবশ্য রামেশ্বরের কাব্যে যুগের উপযোগী অলঙ্কারপ্রিয়তা ও অনুপ্রাসের ঝোঁকও বেশ আছে। কিন্তু তবু তা স্বচ্ছ। বিষয়বস্তুতেও মাঝে-মাঝে আদিরস আছে—যেমন থাকবার, কিন্তু তা কৃত্রিমতায় রসানো নয়। রামেশ্বরের দাবী সত্যই

চন্দ্রচূড় চরণ চিন্তিয়া নিরন্তর।
ভব-ভাব্য ভদ্রকাব্য ভণে রামেশ্বর॥

এ কাব্যে বাঙালী নিম্ন মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের সংসারের চমৎকার চিত্র পাওয়া যায়—হরপার্বতীকে অবলম্বন করে তা রচিত। তা থেকে বুঝতে পারি রাজসভায় 'নবাবী আমল' যত কৃত্রিমতা জমাচ্ছে, সমাজের অন্য স্তরে তা ততটা স্পর্শ করেনি—অন্ততঃ খ্রীঃ ১৭১০-১১তে দক্ষিণ রাঢ়ের জীবন-যাত্রায় তা নেই।

অন্যান্য মঙ্গলকাব্য—এসব মঙ্গলকাব্য ছাড়া নূতন দেবদেবীদের নিয়েও অষ্টাদশ শতকে মঙ্গলকাব্য জাতীয় পুঁথি প্রণীত হয়;—তা নানা পৌরাণিক বা স্থানীয় দেবদেবীর মাহাত্ম্য। সে সবের কিছু কিছু তখনো ব্রতকথার স্তর ছাড়িয়ে ওঠেনি। পুঁথির মধ্যে পাই সূর্যমঙ্গল, গঙ্গামঙ্গল, শীতলামঙ্গল, লক্ষ্মীমঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, সরস্বতীমঙ্গল প্রভৃতি। আবার, কিছু কিছু দেবদেবী-মাহাত্ম্য পাঁচালী জাতীয় নূতন ধরণের কাব্যে রূপ নিয়েছে। ষোড়শ সপ্তদশ শতকেও এসব কোনো কোনো দেবদেবী এ সব রচনায় গৃহীত হয়েছিলেন। দেবদেবীর পাঁচালীর মধ্যে অষ্টাদশ শতকে মিলে সুবচনীর পাঁচালী, শনির পাঁচালী ইত্যাদি। অন্য প্রয়োজনে না হলে এসব পড়া এখন বৃথা।

মঙ্গলকাব্য জাতীয় এরূপ রচনার মধ্যে উলা গ্রামের দুর্গাদাস মুখুজ্জের 'গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিণী' উল্লেখযোগ্য,—রাজনারায়ণ বসু পর্যন্ত ছেলেবেলায় এ কাব্যের পালাগান শুনেছেন। এটি 'অষ্টমঙ্গলা' পাঁচালী কাব্য। গঙ্গাস্নানাগত বাঙালীদের নিয়ে কবির রসিকতায় নতুনত্ব না থাকলেও তা লক্ষণীয়—

শ্রীচৈতন্যের যুগ থেকে একেবারে দীনবন্ধু-অমৃতলালবসু পর্যন্ত এই 'ক্যালি-ডোনিয়নরা' গৌড়ীয় রসিকতার উপাদান যুগিয়েছে। তবে বিংশ শতকে তারা যুগিয়েছে কবি, মোহিতলালের মতো বাঙালীত্ব-বাদীদের ক্রোধও। কারণ বাঙালী জাতীয় জীবনে শিক্ষায় সাহসে আজ 'বাঙালরাই' সবল বাঙালী, আর সাহিত্যেও আজ তারা নগণ্য নেই। কিন্তু বোঝবার মতো কথা এই—বাঙালী জাতীয়-চেতনা এভাবেও দুর্বল থেকে গিয়েছে।

পাঁচালী হিসাবে অবশ্য 'সত্যনারায়ণের পাঁচালী' প্রভৃতির কথা স্বতন্ত্র আলোচ্য, কারণ, তা বাঙ্‌লা দেশে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত, এবং এসময়কার একটি বিশিষ্ট সামাজিক বিবর্তনের স্বাক্ষর।

বিদ্যাসুন্দর কাহিনীও মঙ্গলকাব্য ও পাঁচালী কাব্য থেকে স্বতন্ত্র করে আলোচ্য, যদিও তা 'কালিকামঙ্গলে'র অন্তর্ভুক্ত। নবাবী আমলের বিশেষ একটি দিকের প্রতিলিপি মিলে এই কাব্যেই।

ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল'কে নামে ছাড়া মঙ্গলকাব্য বলা অসম্ভব। কারণ যদিও তা পালা করে গাওয়া হয়েছিল, আসলে তা পালাগান নয়, পূজা-পার্বণে তা গাওয়া হত না ; রাজসভায় রসিকদের উপভোগের জন্যই তা রচিত, তার সঙ্গে পূজা-অর্চনার কোনো মূল সম্পর্ক ছিল না।

পৌরাণিক অনুবাদ-শাখা

পদাবলী ও মঙ্গলকাব্যের মতো রামায়ণ-মহাভারত ও ভাগবত প্রভৃতির রচনাও পুরাতনের অনুবৃত্তি ; তথাপি তার একটা নিজস্ব মর্যাদা আছে। কৃত্তিবাস ও কাশীরামই অবশ্য অষ্টাদশ শতাব্দীতে রামায়ণ-মহাভারতের সর্বগ্রাহ্য কবি। কিন্তু বিশেষ করে কৃত্তিবাসের রামায়ণে নূতন সংযোজিত হতে লাগল নানা বাঙালী উপাখ্যান, প্রচলিত কৃত্তিবাসী রামায়ণে তা কৃত্তিবাসের নামেই চলে। কাশীরামের নামে এরূপ সংযোজন বেশি হয় নি, ভাষার পরিবর্তনই হয়েছে। তা ছাড়াও রামায়ণ-মহাভারতের উপাখ্যান-রচয়িতারা অসংখ্য। কাজেই, বিশেষ উল্লেখযোগ্য রামায়ণ-কার বা মহাভারত-কার, কিংবা সংযোজন-রচয়িতার কথা জানাই যথেষ্ট।

রামায়ণ

রায়বার : কৃত্তিবাসের নামে প্রচলিত জিনিসের মধ্যে একটি 'অঙ্গদ রায়বার', অন্যটি 'তরণীসেন বধ'। রায়বার অষ্টাদশ শতকের একটি বিশিষ্ট সৃষ্টি,—মোটেই অনুবাদ নয়, তা উদ্ভাবনা। কথাটির মূল অর্থ রাজবার, রাজস্তুতি,—

এই শতাব্দীতে রায়বার বুঝাত রাজসভার ইতর উত্তর-প্রত্যুত্তর, রাজাদের শুভ্র ঘটা সম্বন্ধে অবজ্ঞা। ছন্দ সাধারণত নাচাড়ি। রাজা ও রাজসভার মর্যাদা ও শালীনতা বোধ আর নেই, তা বোঝা যায়। রায়বারের অধিকাংশ রচয়িতা মল্লভূমির। প্রথম একজন রচয়িতা ফকিররাম 'কবিরাজ' বা 'কবিভূষণ', ইনি 'সত্যনারায়ণের পাঁচালী'ও লিখেছিলেন খ্রীঃ ১৭০১-০২তে। শঙ্কর চক্রবর্তী 'কবিচন্দ্র' মল্লভূমির কবি, ইনি সেই 'কৃষ্ণমঙ্গলের' ও ভারত পাঁচালীর কবি, তাঁরই 'অধ্যাত্ম রামায়ণ' 'বিষ্ণুপুরী রামায়ণ' নামে চলে। কবিচন্দ্রের নামেও 'অঙ্গদ রায়বার' আছে (বঃ সাঃ পরিচয়, পৃঃ ৫২৪)। আরও ছয়-সাত জন লেখকের রায়বারও পাওয়া যায়। স্থূল হলেও এ গালাগালি পরবর্তী কালের কবিদের খেউড়-তর্জার একটা জ্ঞাতি, আসরে তেমনি তা মুখরোচক হয়ে উঠেছিল।

তরণীসেনের যুদ্ধ ঃ বাঙালীর ভক্তিধর্মের মাত্রাজ্ঞানহীন বাড়াবাড়িতে সৃষ্টি হয় তরণীসেনের উপাখ্যান। বিভীষণের পুত্র তরণীসেন রামভক্ত যুবক, দুর্জয় বীর, তিনি যুদ্ধে এলেন রামের হাতে মরে স্বর্গে যাবেন বলে। অনেক চেষ্টায় তাঁর এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল। তখন রণক্ষেত্রে তাঁর কাটামুণ্ড 'রাম' নাম জপ করতে লাগল। কাটামুণ্ডের এই শক্তি বাঙালী জন-সাধারণের সহজ-গ্রাহ্য একটি ঐতিহ্য হয়ে ওঠে (দক্ষিণরায়েরও শুধু মুণ্ডই দেখা যায়,—কালু খাঁ গাজীর সঙ্গে যুদ্ধে দেহচ্যুত হলেও তা প্রাণহীন হয় নি)। তরণীসেন-বধের কথা পড়ে না কাঁদে এমন বাঙালী স্ত্রী-পুরুষ নেই। এই রায়বার ও ভক্তির মাত্রাহীনতা, ভাঁড়ামি ও এই ভাবালুতা,—দুইটিই বাঙালী বৈশিষ্ট্য। রামায়ণের এই কাহিনী দু'টি তাই বাঙালীর উদ্ভাবনা হিসাবে মনে রাখবার মতো। অবশ্য এমনি আর-একটি মাত্রাজ্ঞানহীন কাহিনী হচ্ছে মহাভারতের 'দাতাকর্ণে'র কাহিনী। তাও বাঙালীর উদ্ভাবনা—হরিশচন্দ্র-রোহিতাশ্ব কাহিনীর তা বাঙালী সংস্করণ। এ বিষয়েও রচনার তখন অভাব ছিল।

তরণীসেনের উপাখ্যানের প্রধান এক রচয়িতা হলেন দ্বিজ দয়ারাম (দ্রঃ— বঃ সাঃ পরিচয়, পৃঃ ৫৪৯)।

মল্লভূমির শঙ্কর চক্রবর্তী 'কবিচন্দ্র' ও দ্বিজ সীতাসুত (গ্রন্থের 'বাল্মীকি-পুরাণ') উত্তরবঙ্গের কৃষ্ণদাস পণ্ডিত (সংক্ষিপ্ত শ্রীরাম পাঁচালী), চণ্ডীমঙ্গলের কবি রামানন্দ যতি এবং কোচবিহারের জন-ছয়-সাত রামায়ণ-কবিদের ছেড়ে দিতে পারি, দু'জন অষ্টাদশ শতাব্দীর রামায়ণ-রচয়িতা কিন্তু স্মরণীয়।

রামানন্দ ঘোষ : রামানন্দ ঘোষের 'রামায়ণ' কাব্য (খ্রীঃ ১৭৮০ ?) সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। তাঁর পরিচয় এখনো অনিশ্চিত। কাব্য মতে তিনি কালিকাতন্ত্রে আস্থাশীল 'বুদ্ধাবতার'—

সর্ব শক্তিমত্ত আর ইচ্ছা কালিকার
কলিযুগে রামানন্দ বুদ্ধ-অবতার।

অষ্টাদশ শতকে এই কথা অদ্ভুত শোনায়। কারণ, বুদ্ধদেব অবতার-মধ্যে গণ্য হলেও জয়দেবের পরে তাঁর মাহাত্ম্য আর বাঙ্‌লা কাব্যে শুনি না। বাঙ্‌লার পুরনো তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের হয়তো এই স্মৃতি শেষ। 'বুদ্ধাবতারে'র আবির্ভাবের কারণ—

ম্লেচ্ছভোগ্য বসুন্ধরা হইল সংসারে
দাসীরূপা হইল লক্ষ্মী নীচ জাতি-ঘরে।

তাই তাঁর প্রতিজ্ঞা (আদিপর্ব)

যখন ম্লেচ্ছের রাজ্য বলে কাড়ি লব
একছত্র রাজা করি দারুব্রহ্মে দিব।

কোথা হতে হঠাৎ দেখা দিল এ সঙ্কল্প? মহারাষ্ট্র ও বর্গীদের নিয়ে দুরাশা পোষণ সম্ভব নয়, কৃষ্ণচন্দ্র-জগৎশেঠদের নিয়ে তা আরও অসম্ভব। এ কাব্য খ্রীঃ ১৭৬৫র পরেকার বলেই অনুমিত হয়। তাহলে এ উক্তি একটা দুঃসাহসী মহৎ সংকল্প। রামানন্দ যৌবনে সন্ন্যাস নিয়েছিলেন, হয়তো সন্ন্যাসী বিদ্রোহের একটা পূর্বাভাস বা প্রতিধ্বনি তাঁর এ কাব্য। কিন্তু শুধু রাজনৈতিক নয়, ধর্মের মোহভঙ্গও এই সন্ন্যাসী কবির হয়েছিল। তাঁর পূর্বে সন্ন্যাসের বিরুদ্ধে স্পষ্ট সাক্ষ্য এমন করে কেউ দিতে সাহসী হন নি।

শরীর করিনু পণ আমি এ পামর
না হৈল (বস্তু) চর্ম চক্ষের গোচর।
ধনীতে বাঞ্ছয়ে ধন জলে বাঞ্ছে জল
নাহি মিলে কাঙ্গালের কড়ার সম্বল।...
দারা ছাড়ি পাপ ভরা ভরিনু অপার
অস্থিচর্মসার কইল অভিশাপ তার।
দারা সুত সুতা আর বন্ধু কেহ নাই
অবশেষে কি হইবে নাহি মিলে খাই।

নিশ্চয়ই এ এক প্রবল ব্যক্তিত্ববান্ অস্থির কালের অস্থিরচিত্ত মানুষের খেদোক্তি। মধ্যযুগের সাহিত্যে এরূপ স্বীকারোক্তি অভাবনীয় ছিল। তদপেক্ষাও নূতন রামানন্দ ঘোষের এই শেষদিককার স্বীকৃতি:

দারুব্রহ্ম সেবা করি জেরবার হৈল
বৃথা কষ্ট সেবি কাল কাটা নহে ভাল।
বস্তুহীন বিগ্রহ সেবিয়া নহে কাজ
নিজ কষ্ট দায় আর লোক-মধ্যে লাজ।

এ যেন আধুনিক মনোভাবাপন্ন মানুষের কথা।

সেদিনের সমাজে ধর্মে আস্থা কমে এসেছে তা দেখতে পাব, কিন্তু এমন স্পষ্ট, সুদৃঢ় ঘোষণা আর দ্বিতীয়টি কোথায়? এই জন্যই "তাহার কাব্যটি পুরানো বাঙ্গালা সাহিত্যে একক"। তথাপি ট্রাজিডিতেই তাঁর কাব্যের সমাপ্তি হল, যেহেতু এই বাস্তববোধ সত্ত্বেও কবি তাঁর মুক্তির পথ আবিষ্কার করতে পারেন নি। বুদ্ধির মুক্তি তাঁর ঘটেছে, কিন্তু মুক্তির বুদ্ধি তাঁর জাগ্রত হয় নি। কবিত্বের জন্য ততটা নয়, কিন্তু এক নূতন চেতনার প্রতিভূ হিসাবে রামানন্দ ঘোষ বাঙ্‌লা সাহিত্যে সত্যই একক, ভবিষ্যতের আভাস।

জগৎরাম: জগৎরাম রায় (বাড়ুজ্জে) তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র রামপ্রসাদের সহযোগে 'অদ্ভুত রামায়ণ' সম্পূর্ণ করেন; 'দুর্গাপঞ্চরাত্রি'ও তাঁদের দুজনার রচনা। রামচন্দ্র কর্তৃক অকালে দুর্গাপূজা—দুর্গাপঞ্চরাত্রির বিষয়; পঞ্চমী হতে দশমী পর্যন্ত পাচ পালা, শেষ দুই পালাই পুত্রের রচনা। পঞ্চকোটের অভ্যন্তরে রাণীগঞ্জের নিকটে ভুলুই গ্রামে তাদের নিবাস ছিল। এ কাব্য নয় কাণ্ডে বিভক্ত—লঙ্কাকাণ্ডের পরে পাই পুষ্করকাণ্ড, রামবাস এবং উত্তরাকাণ্ড, রচনা কাল খ্রীঃ ১৭৭১।

জগৎরামের শেষ ও নিজস্ব রচনা হল 'আত্মবোধ' নামে আধ্যাত্মিক রূপক কাব্য (খ্রীঃ ১৭৭৭-৭৮)। তাও রাম-মাহাত্ম্যেরই কাব্য, যদিও রামায়ণের অনুবাদ নয়। বারো 'উল্লাসে' রচিত এই গ্রন্থে মনের সুমতি কুমতি দুই পত্নীর কলহাদির ভেতর দিয়ে রাম-প্রাপ্তি অর্থাৎ জ্ঞানলাভ ও সাধন তত্ত্বোপলব্ধির কথা বিবৃত হয়েছে। শাস্ত্রজ্ঞান, বিদ্যা, ধর্মানুরাগ সব মিলিয়ে 'আত্মবোধ' এক বিশিষ্ট সৃষ্টি। কবি বৈষ্ণব রাগানুগা পদ্ধতির সাধক, তবে জগৎরাম কৃষ্ণের স্থলে রামের ভক্ত। কিন্তু দেশকালপাত্র, পঞ্চকোট, নিজ গ্রাম, পরিবার,

পরিজন, নিজগৃহ, সব কিছুতেই তাঁর অকুণ্ঠ স্বীকৃতি দেখি। জগৎরাম ঠিক যেন রামানন্দ ঘোষের বিপরীত দিক থেকে সেই একই মন নিয়ে জীবন দেখছেন। দৃষ্টিকেন্দ্রটি রামায়ৎ বৈষ্ণবের হলেও দৃষ্টি জীবন-রসিক মানুষের। 'আত্মবোধ' রামানন্দ ঘোষের মত সমাজ-বিপ্লবী সৃষ্টি উদ্যোগী পুরুষের কাব্য নয়। যেমন, পঞ্চকোট সম্বন্ধে জগৎরাম বলছেন :

মোর প্রতি এই স্থান মহাতীর্থ স্থান
এই স্থানে জন্ম লভি দেখিনু ভুবন।...
এই দেহ পাইলাম কত পুণ্য ফলে
এ জিহ্বায় কভু কভু রাম শব্দ বলে।...
এই সর্ব অবয়ব কলেবর খানি
এ দেহ-রূপ মধ্যে রাম-বস্তু চিনি।
দেহালয় দেবালয় বেদে সত্য কয়
এ দেহ জানে সেই আনন্দে ভাসয়।

এ অবশ্য একালের বস্তুবাদীর কথা নয়, ভাববাদীদের 'দেহতত্ত্বের' কথা।

এ ধারণাও চৈতন্য-যুগ থেকেই বৈষ্ণবদের স্বীকৃত। কিন্তু অন্য কবিদের লেখায় এইরূপ জীবন-চেতনা দেখা যায় না। জগৎরামের শেষ তত্ত্বও রাগাত্মিকাভক্তি-সম্মত, কিন্তু তথাপি বিশিষ্ট :

মলে মুক্ত হবে তার প্রত্যয় কি হয়
জীয়ন্তেতে মুক্ত বিনা মনে না লাগয়।...
যার জালা মুক্ত হলে মুক্ত বলি তায়
প্রকৃতি আশ্রয় বিনা এ জালা না যায়।
প্রকৃতি স্বরূপে রাম দেখ বর্তমান
রসরাজ স্ত্রী পুরুষ দেহে অধিষ্ঠান।

এও মুক্তির বুদ্ধি, কিন্তু বস্তুগত মুক্তির নয়, ভাবগত মুক্তির। মধ্য যুগের শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্যে এ মুক্তি পরিকল্পিত : লীলাময়ের লীলা আস্বাদনের মধ্য দিয়েই জীবনে এ মুক্তি আয়ত্ত হয়। জগৎরামের মনে রামানন্দের মত তাই 'ম্লেচ্ছ-ভোগ্য বসুন্ধরা'র জন্য কোন জালা নেই।—জীবন-রসের আস্বাদনে তিনি পরিতৃপ্ত। কবিকর্মেও জগৎরাম অনিপুণ নন,—ভারতচন্দ্রেরই যুগের কবি তিনি,—পাণ্ডিত্যও তাঁর যথেষ্ট (দ্রষ্টব্য : বঃ সাঃ পরিচয়, পৃঃ ৫০৮-৫১৪)।

মহাভারত

অষ্টাদশ শতকের মহাভারত-কারদের সংখ্যাও কম নয়। ছোট বড় বহু আখ্যানের বহু রচয়িতা আছেন। কিন্তু এমন কোনো বৈশিষ্ট্য কারও লক্ষিত হয়নি যাতে তাঁদের নাম এখনো স্মরণ রাখা প্রয়োজন হবে।

শঙ্কর চক্রবর্তী 'কবিচন্দ্রে'র মতো মল্লভূমির কবিরা আছেন; কোচবিহারের মহাভারতকারাও লেখা থামান নি; শ্রীহট্টেও ভাগবতের মতো মহাভারতের আখ্যান নিয়ে কাব্য-রচয়িতা অনেক—যেমন, গোপীনাথ দত্ত, সুবুদ্ধি রায়। পূর্ববঙ্গে ষষ্ঠীবর-গঙ্গাদাস (সেন) পিতাপুত্রের লেখা মহাভারতের একাধিক পর্ব পাওয়া যায়;—তাঁরা মনসামঙ্গলের পুঁথিও লিখেছেন, লবকুশের যুদ্ধও লিখেছেন। তাঁদের পরিচয় ও জাতি অবশ্য সুনিশ্চিত নয়। উৎকল ব্রাহ্মণ সারল কবির 'ভারত পাঁচালী' দক্ষিণ রাঢ় ও উড়িষ্যায় প্রচলিত ছিল। 'নলদময়ন্তী'র আখ্যান নৈষধের প্রভাবে লিখেছেন কেউ কেউ, আর 'শকুন্তলা'র উপাখ্যানও স্বতন্ত্রভাবে লিখেছেন অন্ততঃ একজন—রাজেন্দ্র দাস।

পৌরাণিক বিষয়ের অনুবাদ—ভাগবত প্রভৃতি বৈষ্ণব শাস্ত্রের অনুবাদের মতোই পৌরাণিক অন্য গ্রন্থ ও আখ্যানসমূহের অনুবাদও পূর্ব থেকেই চলে আসছিল। তবে অনুবাদে বৈষ্ণবদের সঙ্গে অন্য কারো তুলনা হয় না। এসব পৌরাণিক ধারার অনুবাদের প্রধান কেন্দ্র বরাবরই কোচবিহারের রাজসভা। কোচ রাজাদের নামেও অনুবাদ দেখা যায়। প্রহ্লাদ-চরিত্র, উষাহরণ, তুলসী চরিত্র, হরিশ্চন্দ্র পালা প্রভৃতি কোনো কাহিনীরই অনুবাদ তখন বাদ যায় নি। ঊনবিংশ শতকেও এই সব রামায়ণ, মহাভারত পুরোমাত্রায় লেখা চলেছে (দ্রঃ—ডঃ সুকুমার সেনের বাঃ সাঃ ইতিহাস, পৃঃ ৮৮৭-৯০৪)।

নবম পরিচ্ছেদ

নাথ-যোগীদের কাহিনী

নাথ-যোগী ও সিদ্ধাচার্যদের কথা বাঙলা সাহিত্যের জন্মকথার সঙ্গে জড়িত, তা চর্যাপদের আলোচনাকালে আমরা দেখেছি। মীননাথ (মৎস্যেন্দ্রনাথ), জালন্ধরি পাদ (হাড়ি পা), গোরক্ষনাথ, (গোরখনাথ, গোর্খনাথ), কানু পা (কাহ্নপাদ)—এঁরা কে, কখন জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এ দের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্কই বা কি ছিল, সে বিষয়ে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রধান পণ্ডিতেরা এখনো একমত নন। একদিকে এঁদের সম্প্রদায়ের ধারা বহন করছে কান-কাটা যোগীরা ও নানা অবধূত সম্প্রদায় তাদের বেশভূষায়, সাধনায়, অন্যদিকে এঁদের স্মৃতি ও কাহিনী জাগিয়ে রাখছে বাঙলাদেশে উত্তরবঙ্গের ও পূর্ববঙ্গের যোগীজাতি। তর্ক ও সমস্যা অনেক আছে, কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহ নেই—সেই যোগী ও সিদ্ধাদের নানা কাহিনী বাঙালী জনসাধারণের মধ্যে বাঙলা সাহিত্যের প্রাচীনতম যুগ থেকেই চলে আসছে—প্রাক্-মুসলমান যুগ থেকে একেবারে ব্রিটিশ যুগেও তা প্রচলিত ছিল, 'ধর্মপুরাণে'ও তাই তা পাওয়া যায়। এমন কি, এসব কাহিনী বাঙলা ছেড়ে উত্তরভারতের জনসাধারণের মধ্যেও বিস্তারলাভ করেছিল, কিন্তু সে দেশেও তার বাঙালী-জন্ম অস্বীকার হয় নি, কাহিনী থেকে তা ধরা যায়। বাঙলায় মুসলমান জনসাধারণের মধ্যেও এ কাহিনী সমাদৃত হয়েছে, তথাপি সে কাহিনীর মধ্যে মুসলমান প্রাধান্যের ছাপ নেই। অবশ্য মৎস্যেন্দ্রনাথ মুসলমান পীরদের কাহিনীতে মোছন্দর বা মোছর পীরে পরিণত হয়েছেন (পরে দ্রষ্টব্য)। যা'ই হোক, বাঙলার হলেও গোপীচন্দ্রের গান সর্বভারতীয় মর্যাদালাভ করেছে।

সাধারণভাবে এসব নাথ-যোগীদের কাহিনী দু'ভাগে বিভক্ত করা চলে, একটি হল নিছক সিদ্ধাদের কাহিনী, মীননাথ ও তাঁর শিষ্য গোরখনাথের কাহিনী। এ কাহিনীর মূল কথাটি হল শিষ্য গোরখনাথের দ্বারা কামিনী-মোহগ্রস্ত গুরু মীননাথের উদ্ধার। এ কাহিনীর সাধারণ নাম তাই 'গোরক্ষবিজয়' বা 'মীনচেতন'। যোগীদের পরম গুহ্য সাধনা হল—'বিন্দু-ধারণ', ঊর্ধ্বরেতা হয়ে ষট্‌চক্রভেদ করা, ইত্যাদি। অতএব, স্ত্রীসংসর্গ বিষয়ে যোগীদের সর্বাধিক বিরোধিতা

অর্থাৎ বর্মচোরা লোক। দ্বিতীয় কাহিনীটির মূল হল রাজা গোপীচন্দ্রের (গোবিন্দ চন্দ্রের) সন্ন্যাস; তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রাজমাতা ময়নামতী ও তাঁর গুরু জলন্ধরি পাদের (হাড়ি পা'র) যোগবিভূতির কথা। জন-সমাজের নিকট এটির আকর্ষণ রাজপুত্রের সন্ন্যাস-গ্রহণের কথা ব'লে। এই দু' কাহিনী অবলম্বন করেই সিদ্ধা ও যোগীদের অলৌকিক শক্তির গল্প পল্লবিত হয়ে উঠেছে, গায়কের মন অসম্ভবের রাজ্যে বিচরণের সুযোগ লাভ করেছে, সাধারণ মানুষের স্থূল বিস্ময়বোধ ও কল্পনা এসব কাহিনীতে একটা সহজ পরিতৃপ্তি লাভ করেছে।

লক্ষ্য করা যায়—এসব সিদ্ধ যোগীদের যোগশক্তি, পীর ফকিরের কেরামতি বা ঐন্দ্রজালিক-সুলভ কীর্তিকলাপের কাহিনীগুলোও প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে একটা ধরাবাঁধা মামুলী রূপ লাভ করেছে—এখনকার যোগী, সন্ন্যাসী, পরমহংস, গুরুদেব নামেও আমরা তারই পুনরুক্তাবনা দেখতে পাই। সাধকদের অপৌরুষের জন্ম থেকে স্ত্রীকে মাতৃ-সম্ভাষণ পর্যন্ত অনেক জিনিসই সেই যোগসিদ্ধাদের লৌকিক ও স্থূল ঐতিহ্যের অন্তর্গত। এ ঐতিহ্য যে ভাবেই উদ্ভূত হোক, চলে আসছে ছড়ায় গানে, এর সঙ্গে সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় যোগীদের কথার ও গল্পের একটা সম্পর্ক আছে। মুসলমান ফকির-দরবেশদের কেরামতির গল্পেও তা পুষ্ট হয়েছে। বাঙ্‌লা মঙ্গলকাব্যের, বিশেষ করে ধর্ম-মঙ্গলের কাহিনীর সঙ্গে এসব অলৌকিক কাহিনীর সম্পর্ক স্পষ্টতই স্বীকৃত। কিন্তু সিদ্ধ যোগীদের কাহিনী লিখিতাকারে বাঙ্‌লা সাহিত্যে প্রবেশ করেছে অনেক বিলম্বে।

'গোরক্ষ-বিজয়ের' পুঁথি পাওয়া যায় অষ্টাদশ শতকে এসে—বাঙ্‌লায় সহদেব চক্রবর্তীর ও 'রামাই পণ্ডিতে'র ধর্মপুরাণে বা 'অনিল পুরাণে'। স্বতন্ত্রাকারে উত্তর বঙ্গের ও ত্রিপুরা-চট্টগ্রাম অঞ্চলের গোরক্ষ-বিজয় সম্বন্ধীয় পুঁথি শেষ দিকে পাওয়া যায়—ফয়জুল্লা (আব্দুল করিম সাহিত্য-বিশারদ সম্পাদিত 'গোরক্ষ-বিজয়ের' কবি), শ্যামাদাস সেন (নলিনীকান্ত ভট্টশালী সম্পাদিত 'মীনচেতনের' কবি), ভীমসেন রায় বা ভীম দাস (বিশ্বভারতীর পুঁথির কবি)—এ ক'জনা সে কাহিনীর কবি হিসাবে গণনীয়। এঁদের কাব্যে ভাষায় এবং ভণিতায় এত মিল যে সত্য-সত্যই এঁদের ক'জন কবি ক'জন গায়েন তা নিয়ে তর্ক আছে (দ্র.—ডঃ সেন, বাঃ সাঃ ইতিহাস ও ডঃ শহীদুল্লাহ্‌—সাঃ পঃ পত্রিকা, ৬০।৩), এবং থাকবে।

গোরক্ষ-বিজয়ঃ—গোরক্ষ-বিজয়ের কাব্য অপেক্ষা কাহিনীটিই উল্লেখ-

যোগ্য। মঙ্গলকাব্যের মতো সেই সৃষ্টিতত্ত্ব দিয়েই এ কাহিনীরও আরম্ভ! আদিদেব ও আদ্যাদেবীর পরেই এ কাহিনীতে জন্মান চার সিদ্ধা, জন্মমাত্রেই তাঁরা লেগে যান যোগাভ্যাসে। মীননাথের অনুগত হলেন গোরক্ষ; আর জলন্ধরির (হাড়ি পা'র) অনুগত হলেন কানু পা'। তারপর সিদ্ধাদের কেরামতি। শিবের মুখ থেকে গৌরী মহাজ্ঞান শুনছিলেন, কিন্তু গৌরী পড়লেন ঘুমিয়ে (যেমন পড়েছিলেন অভিমন্যুর মাতা সুভদ্রা—মহাভারতে); আর মৎস্যরূপে (বা মাছের পেটে থেকে) ফাঁকি দিয়ে 'মহাজ্ঞান' শুনে নিলেন মীননাথ। সে ফাঁকির কথা বুঝে শিব তাঁকে অভিশাপ দিলেন—মীননাথ এই মহাজ্ঞান এক সময়ে বিস্মৃত হবেন। কি করে তা হবে? সিদ্ধারা যোগী, তাঁরা স্ত্রীসংসর্গ করবেন না। তাঁদের পরীক্ষা করতে গৌরী নামলেন আসরে; মোহিনীরূপে গৌরী অন্ন পরিবেশন করতে গেলেন। আর যেমন চিরদিনই এই মহর্ষি তপস্বীদের নিয়ম তেমনিই হল সিদ্ধাদের অবস্থা। স্ত্রীদর্শনমাত্র তিন সিদ্ধাই ধরা পড়লেন মোহজালে। কেবল অটল রইলেন গোরক্ষনাথ (ইউরোপীয় নাইটদের মধ্যে পার্সিভালের মতো নয় কিন্তু);—তাঁর মনে গৌরীকে দেখে এল শিশুভাব। যেমন যার ভাবনা তেমনি হল তার পরিণাম। গুরু মীননাথ—কামভাবের জন্য তাই কদলী নগরে গিয়ে রমণী-সমাজে আত্মজ্ঞান বিস্মৃত হয়ে লাগলেন বিলাসে। হাড়ি পা' (জলন্ধরি পাদ) পটিকায় (পট্টিকের?) গিয়ে রাণী ময়নামতীর পুরীতে লাগলেন হাড়ির কাজে—মোহবশে তাই তিনি কামনা করেছিলেন। সেখানে ময়নামতীর ছেলে রাজা গোপীচাঁদ হাড়ি পা'কে মাটির তলায় আবদ্ধ করলেন। এদিকে গৌরীও রেহাই পেলেন না। গোরক্ষের নিকটে হেরে, তাঁকে ফাঁদে ফেলতে না পেরে তিনি নিজেই পড়লেন তাঁর পেটে মাছিরূপে বাঁধা। পরে গোরক্ষ তাঁকে রাক্ষসী করে রাখলেন। তখন শিব বেরুলেন তাঁর উদ্ধারে। গোরক্ষনাথ শিবঠাকুরকে বেশ দু'কথা শোনালেন—নিজের স্ত্রীকে সাম্‌লাতে পার না, বেশ দেবতা তো হে তুমি! ভাঙ ধুতরা নিয়েই আছ! যাই হোক: দেবীকে মুক্তি দিলেন গোরক্ষ। এদিকে শিবের বরে এক তপস্বিনী রাজকন্যা গোরক্ষের পত্নী হলেন। হলে হবে কি, গোরক্ষ ছ'মাসের শিশু হয়ে শিশুভাবে পত্নীর স্তন্যপান করতে চাইলেন! অবশ্য পরে গোরক্ষের বরে রাজকন্যা তাঁর কৌপীন-ধোয়া জলপান করেই পুত্রলাভ করলেন। তারপরে নিজেও গোরক্ষ বেরুলেন গুরুর উদ্ধারে—কানু পা'ও চললেন তাঁর গুরু হাড়ি পা'র উদ্ধারে। কদলীর দেশে গোরক্ষ

মঙ্গলা-কমলা দু'রাণীর সমস্ত বাধা ঠেলে নটী বেশে গিয়ে রাজদ্বারে দাঁড়ালেন—দ্বার থেকে মৃদঙ্গে বোল তুললেন গোরক্ষ :—কাহিনীতে এইখানেই এ গান জমে—বোল শুনে মীননাথ চকিত হলেন। তারপর শিষ্য আরম্ভ করল নটীবেশে নৃত্যগীত। মাদলের বোলে তিনি মনে করিয়ে দিলেন গুরুকে পূর্বস্মৃতি, নাচগানে তত্ত্বকথা উপদেশ দিয়ে মনে করিয়ে দিলেন 'মহাজ্ঞান'। রাণীরাও পুত্র কোলে নিয়ে ঘিরে ধরে মীননাথকে,—মোহের বন্ধ কেটেও কাটে না যেন। কিন্তু শিষ্য গুরুকে উদ্ধার করলেন, মীননাথ চেতনা লাভ করলেন ;—কাহিনীর নাম তাই 'মীনচেতন'।

গোপীচন্দ্রের গান :—গোপীচন্দ্রের (গোবিন্দচন্দ্র) কাহিনী সমস্ত উত্তর ভারতেই প্রচলিত। স্বভাবতঃ সর্বত্রই তাতে স্থানীয় অবস্থানুযায়ী কিছু কিছু পরিবর্তন হয়েছে ; যেমন, গোপীচন্দ্র হয়েছেন কোথাও রাজা ভর্তৃহরির ভাগিনেয়, কোথাও বা উজ্জয়িনীর বিক্রমাদিত্য বা ধারানগরের রাজা ভোজের সঙ্গে সংযুক্ত। কিন্তু মোটের উপর সমস্ত কাহিনী একটা বিষয়ে প্রায় একমত। গোপীচন্দ্র বাঙ্‌লার সঙ্গে সম্পর্কিত, এবং প্রায় কাহিনীতেই গোপীচন্দ্র বাঙ্‌লার রাজা। (এসব নানা কাহিনীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের জন্য দ্রষ্টব্য : লেখকের ইংরেজী প্রবন্ধ 'রাজা গোপীচন্দ্রের কাহিনী'—প্রোসিডিংস অ্যাণ্ড ট্রান্‌জাক্‌শান্‌স অব্ দি সিক্‌স্‌থ্ ইণ্ডিয়া ওরিয়েন্টাল্ কন্‌ফারেন্‌স্, ১৯৩০, এবং ডঃ সুকুমার সেনের বাঃ সাঃ ইতিহাস)। ঐতিহাসিকেরা চিন্তা করছেন—কোথায় ছিল এই গোপীচন্দ্রের রাজ্য—পট্টিকেরায় (লালমাই,—ময়নামতী পাহাড়ের মধ্যে ত্রিপুরা জেলায়), না, রঙ্গপুরে, কোথায় ? তিনি কি পালগোষ্ঠীর কোন রাজা (গ্রিয়ার্সন) না, রাজেন্দ্র-চোলের অনুশাসনের উল্লিখিত গোবিন্দচন্দ্র (দীনেশ সেন), ইত্যাদি। বাঙ্‌লা সাহিত্যের দিক থেকে সেই প্রশ্ন তত গুরুতর নয়, কিন্তু যে সব বাঙ্‌লা ছড়া ও গান এ সম্পর্কে আমরা পেয়েছি তার পরস্পরে কাহিনী-অংশ তুলনা করে বোঝা বেশি প্রয়োজন (দ্রষ্টব্য—লেখকের পূর্বোল্লিখিত ইংরেজি প্রবন্ধ)। অবশ্য একদিক থেকে সবগুলি কাহিনীই প্রায় একরূপ, এবং আমাদের পক্ষে এখানে কাহিনীর সারাংশ জানাই যথেষ্ট ; প্রয়োজন বরং স্থির করা—কোন্ কাহিনী কখনকার রচনা (দ্রঃ, শহীদুল্লাহ্—সাঃ পঃ পত্রিকা, ৩০।৩) এবং তার সাহিত্যিক গুণাগুণ কি।

গোপীচন্দ্র কাহিনীর প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় মালিক মহম্মদ জায়সীর

'পদুমাবতে'। কিন্তু এ বিষয়ে প্রথম বাঙ্‌লা গ্রন্থ বোধহয় নেপালে রচিত সপ্তদশ শতাব্দীর বাঙ্‌লা নাটক 'গোপীচন্দ্র নাটক'। পুঁথি অবশ্য ঊনবিংশ শতকের নেওয়ারী লিপিকারের লেখা,—অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালা থেকে তার অনুলিপি করে এনেছিলেন। মূলে পাটনের রাজা সিদ্ধেশ্বর সিংহ দেবের রাজ্যকাল (খ্রীঃ ১৬২০-১৬৫৭) উল্লিখিত হয়েছে। বাঙ্‌লা দেশের বাইরের এ নাটকটি ছাড়া গোপীচন্দ্রের গান বাঙ্‌লায় আর যা পাওয়া যায় তা সবই অষ্টাদশ শতকের বা তার পরেকার। সে সবের মধ্যে প্রথম প্রকাশিত হয় পণ্ডিতবর গ্রিয়ার্সনের উদ্যোগে রঙ্গপুরের একটি সংগ্রহ 'ময়নামতীর গান' (এশিয়াটিক সোসাইটির দ্বারা খ্রীঃ ১৮৭৮এ প্রকাশিত), তারপরে প্রকাশিত হয় (শিবচন্দ্র শীল মহাশয়ের সম্পাদনায়) চুঁচুড়া থেকে সংগৃহীত দুর্লভ মল্লিকের 'গোবিন্দচন্দ্রের গীত'। পরে পাওয়া গেল মুঃ গোলাম রসুল খোন্দকার প্রকাশিত সুকুর মামুদের 'গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস'; শ্রীযুক্ত নলিণীকান্ত ভট্টশালী ও বৈকুণ্ঠনাথ দত্তের সম্পাদনায় প্রকাশিত ভবানী দাসের 'ময়নামতীর গান',—এটি সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রাকার কাহিনী। বীরেশ্বর ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সুকুর মামুদ ও ভবানী দাসের পুঁথিও পুনর্মুদ্রিত করে প্রকাশ করেছেন (১৯২৪) 'গোপীচন্দ্রের গানে'।

রঙ্গপুরের গানের অনুযায়ী গোপীচন্দ্র কাহিনী সংক্ষেপে হচ্ছে এরূপ: মাণিকচন্দ্র ছিলেন বাঙ্‌লার রাজা। ময়নামতী তাঁর পাঁচ রাণীর এক রাণী; আবাল্য তিনি গুরু গোরক্ষনাথের শিষ্যা, থাকতেন স্বামীর থেকে স্বতন্ত্র। রাজার মন্ত্রীদের অত্যাচারে প্রজারা ধর্মঘট করে শিবের শরণ নিল (প্রজা-বিদ্রোহ বা শ্রেণী-সংগ্রাম জিনিসটার এখানে স্পষ্টভাবেই উল্লেখ পাওয়া যায়); তাতে রাজার মৃত্যু হল। ময়নামতী চললেন যমপুরীতে, সেখানে যমদূতদের শাস্তি দিয়ে তিনি (বেহুলার মতোই) স্বামীর প্রাণ উদ্ধার করবেন। কিন্তু শিব তাঁকে নিরস্ত করলেন। ভরসা দিলেন—মাণিকচন্দ্র আর ফিরে আসবে না, কিন্তু ময়নামতী পুত্রলাভ করবেন, আর গোরক্ষনাথের শিষ্য হাড়ি পা'র শিষ্যরূপে সে ছেলে লাভ করবে মহাজ্ঞান। ময়না 'সতী' হতে গেলেন, কিন্তু আগুন তাঁকে স্পর্শ করল না। যথাসময়ে পুত্র গোপীচন্দ্র জন্মাল। ক্রমে তার বিয়ে হল অদুনা ও পদুনা এই দু' বোনের সঙ্গে। দুই রাণী ও আরও এক শত রমণী নিয়ে গোপীচন্দ্র রাজ্য করেন মনের সুখে।—এ পর্যন্ত এ পুঁথির

ভূমিকা: আর তা ভবানী দাসে নেই, স্বকুর মামুদেও বিশেষ তা পাওয়া যায় না। এর পরে আরম্ভ হয় আসল কাহিনী। ময়নামতী পুত্রকে বলেন—রাজ্য, রাণী, বিলাস সব ত্যাগ করে গুরু হাড়ি পা'র নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করো। পুত্র অত সহজে তাতে স্বীকৃত হলেন না; বরং সংশয় প্রকাশ করলেন যে, ময়নামতীর সঙ্গে হাড়ি পা'র অবৈধ সম্বন্ধ আছে। এই সন্দেহের জন্যই অবশ্য সন্ন্যাস গ্রহণের পরেও গোপীচন্দ্রকে এক বেশ্যার দাস হতে হবে। এদিকে রাণী অদুনা গোপীচন্দ্রকে প্ররোচিত করেছিলেন। আপাততঃ ময়নাকে তাই পরীক্ষা দিতে হল।—যোগীদের যেসব আশ্চর্য শক্তির কথা বলা হয়, সে সব এখানেও দেখি—গরম তেলে ময়না সিদ্ধ হলেন, মরলেন না; নদীর উপর দিয়ে হেঁটে গেলেন, ডুবলেন না; ইত্যাদি (কোনো কোনো গানে এ পরীক্ষা দিতে হয় হাড়ি পা'কে, ময়নামতীকে নয়)। তখন গোপীচন্দ্র বুঝলেন, যোগই সত্য, ঠিক করলেন হাড়ি পা'র শিষ্যত্ব নেবেন। তা শুনে রাজাকে বাধা দেবার জন্য রাণী অদুনা ব্রাহ্মণদের ঘুষ দিলেন, নাপিতকে হাত করলেন। রাজা যোগীদের ছিন্নকন্থা পরলেন, কানে পরলেন কাঠের কুণ্ডল, হাতে তুলে নিলেন শিঙ্গা। তারপর রাজা গেলেন রাণীদের কাছ থেকে বিদায় নিতে। রাণীদের অনুনয়-বিনয়-বেদনা-ক্রন্দন নিয়ে এখানে আবার কাব্য-কাহিনী জমে। কিছুতেই কিছু যখন হয় না, রাণীরাও চান শেষে যোগিনী হতে। কিন্তু হাড়ি পা'র কামিনী জাতির প্রতি ব্যঙ্গবিদ্রূপ তীব্র। হাড়ি পা' রাজার জন্য 'যোগচক্র' প্রস্তুত করলেন। গোপীচন্দ্রকে যোগের তত্ত্ব উপদেশ দিলেন—এখানে কবি আবার সেই শ্বাস-প্রশ্বাস, যোগের পদ্ম, ষট্‌চক্র প্রভৃতি বাঁধাধরা গূঢ় তত্ত্বের অবতারণা করেন। শেষ পর্যন্ত মোহমুক্ত রাজা তাঁর স্ত্রীদের মা বলে সম্বোধন করেন। হতাশ হয়ে রাণীরা আত্মহত্যা করেন। গুরু তখন তাঁদের পুনরুজ্জীবিত করেন আর রাজাকে যোগী করে নিয়ে বের হন। দেশ-দেশান্তরে, কত কি রাজ্য—একবার' নটীর দাস হয়েও রইলেন তাতে রাজা,—তারপর গুরু তাঁকে দিলেন মহাজ্ঞান।—কোন কোন কাহিনীতে প্রবুদ্ধ রাজাকেও আবার রাজ্য করতে অনুমতি দেন গুরু।

এই সংক্ষিপ্তসার কথা থেকে অবশ্য যা এ কাহিনীর স্থূল বা কদর্য অংশ তা বাদ পড়ল, কিন্তু কাহিনীতে তার অভাব নেই। কারণ, মীননাথ জাতীয় নাথ-গুরুদের স্ত্রীবিরাগটা উদ্দাম কামুকতারই উল্টো পিঠ। তাই এই বিকৃত-বৈরাগ্যের কাহিনী ও অবধূত-কাপালিকদের তান্ত্রিক গুহ্য-প্রক্রিয়াকে আজও

করে সাধারণের সহজ কামনা ও সহজ সংযম দুইই স্থূল আকারে প্রকাশিত হয়েছে—যেমন সহজিয়া রাগাত্মিকা পদাবলী ও যোগ-সাধনায় পেয়েছে তা সূক্ষ্ম প্রকাশ। কিন্তু উত্তর-ভারতব্যাপী জনতার কাছে গোপীচন্দ্রের কাহিনীর প্রধান আকর্ষণ সেজন্য হয় নি। আকর্ষণ জন্মে একদিকে প্রধানতঃ যোগীদের সম্বন্ধে—পীর-ফকিরদের সম্বন্ধেও—জনতার শিশুসুলভ ভয়ভক্তি-বিস্ময়ের জন্য। আর অন্যদিকে এই যোগী-কাহিনীর সঙ্গে এমন একটি চিরদিনের রোমান্টিক-আবেগময় কাহিনীর সংযোগ ঘটাতে;—অর্থাৎ রাজা গোপীচন্দ্র (গৌতম বুদ্ধ কিম্বা শ্রীচৈতন্যের মতোই) রাজ্য, রাজ-পাট, প্রেয়সী রাণী ও যৌবনের ভোগবিলাস সব ছেড়ে বরণ করছেন ত্যাগৈশ্বর্যময় সত্যের পথ, যোগ-সাধনার পথ। রাজপুত্র ত্যাগের পথ গ্রহণ করছেন, এইটা স্বপ্নের মতো সুন্দর কাহিনী জন-সাধারণের কাছে, আর সুকুর মামুদের মতো গ্রাম্য কবিদেরও কল্পনা এই কাব্যাংশটিতেই সচরাচর একটু মুক্তি পেয়েছে; যোগ-শক্তির বর্ণনায় ও যোগ-প্রক্রিয়ার বর্ণনায় জানাতে পেরেছে তারা প্রচলিত যোগ-বিদ্যার সম্বন্ধে তাদের সংস্কারগত বিশ্বাস আর যোগ-প্রক্রিয়া সম্বন্ধে তাদের ঐতিহ্যগত সাধারণ জ্ঞান।

দশম পরিচ্ছেদ

বিদ্যাসুন্দর কাব্য ও কালিকা-মঙ্গল

প্রণয়-কাহিনীর একটা পরিণতি বিদ্যাসুন্দর কাহিনীতে। কিন্তু বাঙ্‌লায় কালিকা-মঙ্গলের মধ্যেই এই পালাটিকে হিন্দু কবিরা জুড়ে দিয়েছেন;—সাবিরিদ খাঁ (সপ্তদশ শতাব্দী বা তার পূর্বকার) ছাড়া 'বিদ্যাসুন্দরে'র উল্লেখযোগ্য মুসলমান কবিও নেই বলে বলা চলে। বিদ্যাসুন্দরের পাঁচালী সহজেই এই কালিকা-মঙ্গলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছে। মানবীয় প্রণয়-কাহিনীর অন্য ধারাও অবশ্য ছিল (পর পরিচ্ছেদে তা দ্রষ্টব্য)। প্রণয়-লীলায় বাঙালী কবিরা প্রায় সকলেই নিষ্ঠাবান্‌,—'বৃথা মাংস খান না'। অভ্যাসটা অবশ্য একেবারে নূতন নয়, এই দেবীভক্ত কবিদেরও তা একান্ত বিশেষত্ব নয়,—পূর্ব যুগেও রাধাকৃষ্ণের নামে কবিরা প্রণয়-গাথা নিবেদন করে নিচ্ছিলেন। ভয়ঙ্করী, কালী করালবদনী

শ্রীকৃষ্ণের অনুরূপ প্রণয়-লীলায় নায়িকা হবার মতো দেবী নন, অষ্টাদশ শতাব্দীতে যুগ-মাহাত্ম্যে কালিকা তাই হয়ে উঠলেন প্রণয়ি-জন-তারিণী, আর প্রণয়-কাহিনীও জারিয়ে নেওয়া হল এই পুরনো রসে। দেবদেবীদেরও ইভোল্যুশন আছে, বরাবরই সে ক্রমবিকাশ চলেছে। কিন্তু কাহিনীটি হল বিদ্যাসুন্দরের, কালিকা দেবীর নয়। কাজেই কালিকা দেবীর ইভোল্যুশনি কুলজী নিয়ে এখানে আর বিচার-বিতর্কের প্রয়োজন নেই।

বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর মূল অবশ্য অনেক পিছনে। স্বর্গত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় লিখেছেন, "লোকে বলে বিদ্যাসুন্দর বররুচির লেখা। কোন্ বররুচি তার ঠিকানা নেই।"—(শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী সম্পাদিত সাঃ পঃ প্রকাশিত বলরাম 'কবিশেখর' বিরচিত 'কালিকা-মঙ্গলের' মুখবন্ধ)। শাস্ত্রী মহাশয়ের অভিমত: "বিদ্যাসুন্দরের গোড়া কিন্তু গুজরাটের রাজধানী 'অনহিলপত্তনে'—ইংরেজী ১১শ শতকে।"—এ মতে কাশ্মীরী পণ্ডিত বিহ্লনের 'চৌরপঞ্চাশৎ'-এর ৫০টি শ্লোকই হল এর মূল। বাঙ্লা দেশে প্রাপ্ত বররুচির নামীয় ৫৪টি শ্লোকের 'বিদ্যাসুন্দর' ও ৫৪৬ শ্লোক-সমন্বিত আর একখানি 'বিদ্যাসুন্দর' (১৯২২ ইং সনে শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র এ কাব্যের পরিচয় ইংরেজি প্রবন্ধে ওরিয়েন্টাল কন্‌ফারেন্‌সে দিয়েছিলেন), বররুচির সেই সব শ্লোকের সঙ্গে 'চৌরপঞ্চাশতে'র শ্লোকের মিল কতটা,—এবং চালুক্য-নৃপতি বিক্রমাদিত্য ত্রিভুবন মল্লের (খ্রীঃ ১০৭৮-১১২৬) সভাকবি 'বিক্রমাঙ্ক-দেবচরিত'-রচয়িতা কাশ্মীরী কবি বিহ্লনই চৌরকবি কিনা,—এসব বিষয় নিয়ে যে তর্ক আছে তা এ প্রসঙ্গে গুরুতর নয় (দ্রঃ—পরিষদ-প্রকাশিত 'ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী', ২য় সংস্করণের ভূমিকা)। মেনে নিতে পারি—ভারতচন্দ্রের পূর্ব থেকেই সংস্কৃতের ৫৪ বা ৫৪৬ শ্লোকের বিদ্যাসুন্দর বাঙ্লা দেশে প্রচলিত ছিল, এবং সে 'চৌরপঞ্চাশৎ' ও বিদ্যাসুন্দর কাহিনী অন্ততঃ বাঙ্লা দেশে একত্রিত বা সম্পর্কিত হয়ে গিয়েছিল ; তার প্রমাণ 'চৌরপঞ্চাশৎ'-এর ও ঐ সংস্কৃত কাব্যের শ্লোক ভারতচন্দ্রও উদ্ধৃত করেছেন (যেমন, সুন্দর 'ময়ূরনাদের' বিষয়ে শ্লোকটি আবৃত্তি করেছেন বিদ্যার কাছে, এবং চৌরকবির শ্লোক পাঠ করেছেন রাজার কাছে)।

কিন্তু শুধু 'চৌরপঞ্চাশৎ'-এর কাহিনী নয়, বাঙ্লা বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর মধ্যে দুটি বিভিন্ন রূপ পাওয়া যায়—তার মূলও সংস্কৃতে আছে (দ্রষ্টব্য ডঃ সুকুমার সেন—বাঃ সাঃ ইতিহাস, পৃঃ ৮২৪-৮৩২)। তার একটিতে বিদ্যাশিক্ষা উপলক্ষ্য

করে বিদ্বান্ গুরুর সঙ্গে ছাত্রী সুন্দরী রাজকন্তার প্রণয়-সঞ্চার। বলা বাহুল্য, এরূপ ঘটনা সর্বদেশে সর্বকালে ঘটে, তবে তার জন্ত কালিকার দোহাই দিতে হয় না। দ্বিতীয় গল্পটিতে আছে বাধা সত্ত্বেও প্রণয়ী কবির সঙ্গে প্রণয়িনী রাজকুমারীর গোপন মিলন। এটির প্রধান দৃষ্টান্ত অবশ্য কাশ্মীরের কবি বিহ্লনের (দ্বাদশ শতাব্দী ?) 'চৌরপঞ্চাশৎ'; কিন্তু 'রোমিও অ্যাণ্ড জুলিয়েট' থেকে ক'টা রোমান্স গোপন মিলনের সুযোগ না থাকলে জমে ? নরনারীর প্রণয়-লীলা যখন সনাতন, তখন ওসব চতুর নায়ক-নায়িকারাও আসলে 'সনাতনী', এসব ব্যাপারও 'সেই চিরপুরাতন কথা'। সংস্কৃত ও ভারতীয় অন্তান্ত ভাষায় এ জাতীয় উপাখ্যান নিশ্চয়ই অনেক ছিল; লোকমুখে বা পূর্বাপর চলিত ছিল সেক্ষেত্রেও কবিরা তারই সাহিত্যিক রূপ দিয়েছেন। বাঙলায়ও এরূপ প্রণয়-প্রধান নানা লোক-কথা যে ছিল তার প্রমাণ রয়েছে 'মৈমনসিংহ গীতিকা'য় (পর পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

বিদ্যাসুন্দরের কহিনীর প্রথম বাঙলা রচয়িতাদের কথা আমরা জানি—'দ্বিজ' শ্রীধর, সাবিরিদ খাঁ; পরে নিমতার কৃষ্ণদাম দাস ও 'কবিবল্লভ' প্রাণরাম চক্রবর্তীও এ কাহিনী বিবৃত করেছেন। মৈমনসিংহের কবি কঙ্ক কে ও তাঁর নামের বিদ্যাসুন্দর কবেকার তা সন্দেহজনক। বিংশ শতকের মার্জিত বুদ্ধি ও ভাষার ছাপ তাতে অবিসংবাদিত। কিন্তু বাঙলা সাহিত্যে বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর জয়-জয়কার অষ্টাদশ শতকেই, আর তা দেখা দেয় আবার দ্বিতীয়ার্ধে,—ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর যখন সমস্ত শতাব্দীর মানস-বিলাস রূপে 'রসিক'-জনদের মনোহরণ করে, তার পরে। 'বিদ্যাবিলাপ' (নেপালের নাটক) রচয়িতা কাশীনাথ ছাড়াও এ শতাব্দীর কবি হলেন 'কালিকা-মঙ্গল' রচয়িতা বলরাম চক্রবর্তী 'কবিশেখর'। তাঁর কাব্যে 'উৎকল-দ্রাবিড় দেশের' যুবক সুন্দর পড়ুয়া বেশে বিদ্যার আশায় বর্ধমানেই এসে বিদ্যাকে লাভ করে। এ রচনা সরল, 'রসের' প্রাবল্য তখনো দেখা দেয় নি। গোবিন্দ দাসের 'কালিকা-মঙ্গল' অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত,—তিনি চট্টগ্রামের 'পদ্মপুরাণ'-রচয়িতা গোবিন্দ দাসও হতে পারেন। পাঁচ ভাগে তাঁর কাব্য রচিত, বৃত্রাসুর-বধ থেকে ভানুমতীর কথা প্রভৃতি অনেক কিছু তাতে আছে; শেষভাগে বিদ্যাসুন্দর কাহিনী। এ কাব্য যাঁরই লেখা হোক্, তাঁর কবিত্ব, ছন্দোবৈচিত্র্য, গানের মাধুর্য এ শতাব্দীর উপযোগী। অধিকন্তু একটু ভক্তিভাবও তাতে আছে—

বোধহয় দূর পূর্ববঙ্গের অর্থাৎ পাড়াগেঁয়ে কবি বলে। অন্যান্য জিনিসের মধ্যে এতে মীননাথের উদ্ধারের কথাও রয়েছে—গোরক্ষনাথ কালিকার কৃপাতেই তা সম্পন্ন করেন। বিদ্যাসুন্দরের কবিদের মধ্যে এর পরেই আসেন ভারতচন্দ্র, তারপরে আসেন রামপ্রসাদ সেন; এবং ক্রমে লেখা হয় রাধাকান্ত মিশ্র, কবীন্দ্র চক্রবর্তী ও নিধিরাম আচার্য প্রভৃতির 'কালিকা-মঙ্গল'।

ভারতচন্দ্র: ভারতচন্দ্র শুধু অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রধান কবি নন, তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবি-প্রতিনিধি। পলাশীর পূর্বেকার পঞ্চাশ বৎসরের তিনি মুখপাত্র, পলাশীর পরেকার পঞ্চাশ বৎসরের তিনি আদর্শ-স্থাপয়িতা—এবং সাহিত্যিক কুশলতায় রবীন্দ্রনাথের যুগেও তিনি প্রমথ চৌধুরীর মতো বিদগ্ধ সমালোচকদের অকুণ্ঠিত প্রশংসা-ভাজন, অশ্রুবিলাসী বাঙালী জাতির পক্ষে প্রয়োজনীয় প্রতিষেধক তিনি। কিন্তু ভারতচন্দ্র শুধু 'বিদ্যাসুন্দরে'র কবি নন,—'বিদ্যাসুন্দর' তাঁর 'অন্নদা-মঙ্গল' কাব্যের একটি অংশ মাত্র। তা ছাড়াও তিনি দু'খানি 'সত্যনারায়ণের পাঁচালী'র রচয়িতা; মৈথিল কবি ভানুদত্তের 'রসমঞ্জরী' নামক নায়ক-নায়িকা-লক্ষণ গ্রন্থের কুশলী অনুবাদক এবং অসমাপ্ত 'চণ্ডী-নাটকে'র কবি; সংস্কৃত 'নাগাষ্টক' ও 'গঙ্গাষ্টকে'রও তিনি রচয়িতা; 'অন্নদা-মঙ্গলে' তাঁর সুমধুর ধুয়া গানও রয়েছে। 'অন্নদা-মঙ্গলে'র ও 'বিদ্যাসুন্দরে'র বিচ্ছুরিত ঔজ্জ্বল্যে সে সব বিলুপ্ত হয়ে যাবার মতো নয়। কবি ঈশ্বর গুপ্ত প্রায় একশত বৎসর পূর্বে (খ্রীঃ ১৮৪৫) ৺কবিবর ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন-বৃত্তান্ত ও তাঁর রচনাবলী সংগ্রহ করে প্রকাশ করেন—একালের কবি-জীবনী রচনায় তা বোধহয় একটি প্রথম প্রয়াস (এ 'জীবন-বৃত্তান্ত' সাহিত্য পরিষদ-প্রকাশিত 'ভারতচন্দ্র' গ্রন্থাবলীর ভূমিকাংশে উদ্ধৃত হয়েছে)।

ভারতচন্দ্র সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান। ভরদ্বাজ-গোত্রের মুখুজ্জে বংশে তাঁর জন্ম; ভুরশুট পরগণার পেঁড়ো বসন্তপুরে তাঁদের নিবাস ছিল। তাঁদের পূর্বপুরুষ জমিদারী সূত্রে 'রায়' উপাধি লাভ করেছিলেন। ভারতচন্দ্র পিতার কনিষ্ঠ পুত্র, সম্ভবতঃ ১১১৯ সালে (খ্রীঃ ১৭১৩) তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ইতিমধ্যে বর্ধমানের রাজাদের কোপে তাঁর পিতা তাঁর বিষয়-বিত্ত হারান। ভারতচন্দ্র (আপনার মাতুলালয়ে বাস করে?) প্রথম শিক্ষারম্ভ করেন সংস্কৃতে; ব্যাকরণ ও অভিধান শেষ করে চতুর্দশ বৎসর বয়সেই বিবাহ সমাধা করেন (তাঁর কোনো কোনো ভণিতায় 'রাধানাথ' শব্দটি দেখে কেউ কেউ মনে করেন তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল রাধা; আর

ভারতচন্দ্র একাধিক রাধা-ভাগ্যও সঞ্চয় করেন নি। আসলে 'রাধানাথ' হয়তো 'কৃষ্ণ'চন্দ্র—পারিষদের নয়, প্রভুরই বিশেষণ)। জমিদারী-ঐতিহ্য মতো তারপর ভারতচন্দ্র ফারসিতে শিক্ষালাভ করতে যান দেবানন্দপুরের রামচন্দ্র মুন্সীর কাছে। এইখানেই বোধহয় তিনি 'সত্যনারায়ণ পাঁচালী' দু'খানি লিখেছিলেন (খ্রীঃ ১৭৩৭-৩৮);—আসলে তা দুটি ছোট কবিতা মাত্র। পরে যথারীতি তিনি বিষয়কর্ম আরম্ভ করেন। ভারতচন্দ্র বর্ধমানে আসেন বিষয়ের তদারকে। ইতিমধ্যে বর্ধমানের রাজারা রায়দের ইজারা-তালুক খাশ করে নিয়েছিলেন। আমলাদের চক্রান্তে তিনি বর্ধমানে কারারুদ্ধ হন। কোন ক্রমে পলায়নের সুযোগ পেয়ে ভারতচন্দ্র বর্ধমান থেকে সেই রাজ্য ছেড়ে একেবারে কটক হয়ে পুরী চলে যান। এমন অবস্থায় অনেক মানুষের মনেই বৈরাগ্য জন্মে; আশ্চর্য নয়, ভারতচন্দ্রেরও তখন বৈরাগ্য ও ভক্তি জন্মেছিল। বৈষ্ণব বেশে সংসারবিরাগী হয়ে তিনি তখন যাত্রা করেন বৃন্দাবন। পথে খানাকুলে কুটুম্ববাড়ীর লোকেরা তাঁকে চিনে ফেলল, ভারতচন্দ্রেরও আর বৈরাগী সন্ন্যাসী হওয়া সম্ভব হল না। শ্বশুরবাড়ী হয়ে ভারতচন্দ্র স্বগৃহে ফিরে এলেন। বর্গীর হাঙ্গামায় হয়তো দেশ তখন তটস্থ। ভারতচন্দ্র বৃত্ত্যন্বেষণে ফরাসডাঙার ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর কিছুদিন উমেদারি করতে লাগলেন; তাঁরই সুপারিশে তিনি নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভাসদ্ নিযুক্ত হলেন। ভারতচন্দ্রের বেতন হল ৪০৲, তিনি বাসাবাটি পেলেন, রাজসভায় স্থানলাভ করলেন। কবির কৃতিত্বে মুগ্ধ হয়ে কৃষ্ণচন্দ্র উপাধি দিলেন 'কবিগুণাকর'। কৃষ্ণচন্দ্রের কথায় তাঁর অন্নপূর্ণা পূজা উপলক্ষ্য করে কবি লেখেন কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ ভবানন্দ মজুমদারের ও তাঁর স্থাপিত সেই রাজবংশের প্রশস্তি। সে গ্রন্থেরই নাম 'অন্নদা-মঙ্গল'। কবিকঙ্কণের 'শ্রীশ্রীচণ্ডীমঙ্গলে'র অনুরূপ সুবিখ্যাত কাব্য ভারতচন্দ্র লিখবেন এই ছিল কৃষ্ণচন্দ্রেরও ইচ্ছা, ভারতচন্দ্রের আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর রুচিও সে কাব্যে তৃপ্ত না হলে চলবে কেন? 'অন্নদা-মঙ্গল' তাই মঙ্গল-কাব্যের আকৃতি পেলেও প্রকৃতি পাবে, এ কৃষ্ণচন্দ্রেরও আকাঙ্ক্ষিত ছিল না। 'অন্নদা-মঙ্গলে'র মধ্যে তাই রাজা কৃষ্ণচন্দ্রও চাইলেন বিদ্যাসুন্দরের কাহিনীর স্থান, ভারতচন্দ্রও তা যোগালেন (খ্রীঃ ১৭৫২) সভাকবির মতো মহা উৎসাহে;—আপনার কৃতিত্বেও তিনি পরিতৃপ্ত হয়েছিলেন, সন্দেহ নেই। মূলাজোড়ে কবিকে কৃষ্ণচন্দ্র জমিজমা ইজারা দিলেন, সেখানে তাঁর নিবাস স্থির

হল। এখানেই পত্তনিদার রামদেব নাগের দৌরাত্ম্যের বিরুদ্ধে তিনি 'নাগাষ্টক' লিখে পত্রযোগে তা কৃষ্ণচন্দ্রকে প্রেরণ করেছিলেন। ১৭৬১-৬৩ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র ৪৮ বৎসর বয়সে ভারতচন্দ্রের মৃত্যু হয়।

অন্নদামঙ্গল : অন্নদামঙ্গল (বা অন্নপূর্ণামঙ্গল) ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর নয় বৎসর পূর্বে রচিত হয় (খ্রীঃ ১৭৫২-৫৩)। এ কাব্যে আটটি পালা, কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় তা প্রথম গীত হয়েছিল। অন্নদামঙ্গল তিনখণ্ডে বিভক্ত ; সে বিভাগ এরূপে করা চলে : প্রথম খণ্ড—শিবায়ন-অন্নদামঙ্গল ; দ্বিতীয় খণ্ড—বিদ্যাসুন্দর-কালিকামঙ্গল ; এবং তৃতীয় খণ্ড—মানসিংহ-অন্নপূর্ণামঙ্গল। তিন খণ্ডের মধ্যে সম্পর্ক ক্ষীণ ; কাব্যের যোগসূত্র হচ্ছেন আসলে অন্নদা, অন্নদার কৃপায় ভবানন্দের ভাগ্যোদয়, এই হল কাব্য-কথা।

প্রথম খণ্ডে দেবদেবীর বন্দনা ও কৃষ্ণচন্দ্রের সভাবর্ণনের পরে গীতারম্ভ,—সতীর দেহত্যাগ, উমার জন্ম, শিববিবাহ, ক্রমে দেবীর অন্নপূর্ণামূর্তি ধারণ, শিবের ভিক্ষা-যাত্রা, কাশীপ্রতিষ্ঠা, ব্যাসের শিবনিন্দা প্রভৃতি শিবায়নের ও মঙ্গলকাব্যে বিষয় বর্ণনাতেই চৌদ্দ আনি শেষ। তারপরে তাড়াতাড়ি আসে হরিহোড়ের বৃত্তান্ত, এবং ভবানন্দের জন্ম ;—হরিহোড় দেবীর অনুগ্রহে লক্ষপতি হয়েছিল, তাকে ছেড়ে দেবী চললেন নদী পার হয়ে ভবানন্দের গৃহে। অন্নদার ভবানন্দ-ভবনে যাত্রার এই প্রথম খণ্ড শেষ। দেব-দেবীর এই আখ্যানসমূহে মঙ্গলকাব্যের ধারায় ভারতচন্দ্র চণ্ডীমঙ্গলের মুকুন্দরাম ও শিবায়নের রামেশ্বরকে অনুসরণ করেছেন। অবশ্য বলেছি—এ মাহাত্ম্যবর্ণনা আকৃতিতেই মঙ্গলকাব্যের অনুরূপ, প্রকৃতিতে স্বতন্ত্র। চতুর মানুষের রঙ্গ-রসিকতার দৃষ্টিতে ভারতচন্দ্র সমস্ত দেব-দেবীকে দেখেছেন—দেবদেবীর প্রতি তাঁর ভয়ভক্তি বিশেষ নেই ; কলা-কুশল কবির মতো তিনি কাব্যবিন্যাস করেছেন সিদ্ধহস্তে ; বিশেষ করে রঙ্গ ও ব্যঙ্গ মজা করেছেন ব্যাসদেবকে নিয়ে। অবশ্য আরও একটা ঐতিহ্য ছিল, বাঙ্‌লা নাট-গীতে নরদ-ব্যাসদেব প্রভৃতি ঋষিরা ইতিপূর্বেই হয়ে উঠেছিলেন সঙ্‌-এর মতো হাস্যকর বুড়ো। যাই হোক, এ খণ্ডের 'শিবের দক্ষালয় যাত্রা' (মহারুদ্ররূপে মহাদেব সাজে'), 'দক্ষযজ্ঞনাশ', 'রতিবিলাপ', 'শিব-বিবাহ', কোন্দল ও শিবনিন্দা ('আই আই ওই বুড়ো কি এই গৌরীর বর লো।'), হরগৌরীরূপ, কৈলাস-বর্ণন, হর-গৌরীর বিবাদ সূচনা ('শঙ্কর কহেন শুন শুনহ শঙ্করি' ইত্যাদি), এবং অন্নদার ভবানন্দ-ভবনে যাত্রা ('অন্নপূর্ণা উত্তরিলা গাঙ্গিনীর তীরে'—

সেখানে ঈশ্বরী পাটনীর সহিত সাক্ষাৎ ঘটল) প্রভৃতি অংশ একালের বাঙালী পাঠকেরও পরিচিত ; সে সব বিষয় তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে হয় না। গল্পের দিক থেকে মনে রাখতে হয়, গাঙ্গিনীর ওপারে আন্দুলিয়া গ্রামের রাম সমাদ্দারের পুত্র ভবানন্দ মজুমদারই কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ—রাজা মানসিংহ তাঁকে দিল্লী নিয়ে যাবেন, কানুনগো ভবানন্দ তখন রাজা খেতাব পাবেন—এই হবে সমগ্র কাব্যের আসল আখ্যান। প্রথম খণ্ড ভবানন্দের জন্মে ও অন্নদার হরিহোড়কে ছেড়ে ভবানন্দকে অনুগ্রহ দানেই সমাপ্ত।

দ্বিতীয় খণ্ডের আরম্ভে মানসিংহের বাঙলায় আগমন। প্রতাপাদিত্যকে দমন করা তাঁর উদ্দেশ্য। কিন্তু বর্ধমানে এসেই মানসিংহ কানুনগো ভবানন্দ মজুমদারের কাছে শুনতে চাইলেন বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী—মোগল সেনাপতি মানসিংহ কাছুয়া যেন অষ্টাদশ শতাব্দীর রাজা কৃষ্ণচন্দ্র। অতএব এখণ্ড হল বিদ্যাসুন্দর-কালিকামঙ্গল। সমগ্র খণ্ডের মধ্যে বিদ্যাসুন্দর শুনতে শুনতে রাজা মানসিংহের বা কবির আর হুঁসই নেই—মূল আখ্যান কি। কালিকার মাহাত্ম্য-কীর্তনও নিতান্ত গৌণ, 'আসলে বিদ্যা ও সুন্দরের সুরঙ্গ-ভেদী প্রণয়-কাহিনীই ঐখণ্ডে কবির মুখ্য অবলম্বন'।

ভারতচন্দ্রের কাহিনীটি এরূপ : বর্ধমানের রাজা বীরসিংহের কন্যা বিদ্যা প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, বিচারে যে তাঁকে জয় করতে পারবে সে-ই হবে তাঁর পতি। কেউ বিচারে পারে না, বিবাহও হয় না। রাজা তাই গোপনে ভাট পাঠালেন কাঞ্চীতে,—কাঞ্চীর রাজা গুণসিন্ধু রায়ের পুত্র সুন্দর অসাধারণ পণ্ডিত। ভাটের কাছে বিদ্যার খ্যাতি শুনে সুন্দরও এলেন পড়ুয়া-রূপে বর্ধমানে। তারপর ? সুন্দরের বর্ধমান দর্শন—এদিকে সুন্দর দর্শনে নাগরী-গণের খেদ,

আহা মরে যাই লইয়া বালাই
কুলে দিয়া ছাই ভজি উহারে।
যোগিনী হইয়া ইহারে লইয়া
যাই পলাইয়া সাগর পারে।

এদিকে সুন্দরের সঙ্গে ঘটল রাজবাটীর মালিনীর সাক্ষাৎ ;—বাঙলা সাহিত্যে মালিনী (কুট্টনীরই উত্তরাধিকারিণী) অনেক আগেই ছিল, কিন্তু হীরা মালিনী তাদের চূড়ান্ত পরিণতি। সুন্দর বর্ধমান শহরে হীরা মালিনীর ঘরে

বাসা নিলেন, বিদ্যার খোঁজ খবর করলেন। মাল্য রচনা করে ও শ্লোক রচনা করে হীরার হাতে পাঠালেন সেই 'করজোড় রতিপ্রাজ্ঞা'র উদ্দেশে। লক্ষ্য ব্যর্থ হল না। বিদ্যার কাছ থেকেও এল তেমনি শ্লোকে রচিত উত্তর। এর পরে মালিনীর ব্যবস্থার পালা আরম্ভ হল। প্রথম উভয়ের দর্শন, সুরঙ্গপথে একেবারে রাজকন্যার গৃহে সুন্দরের উদয়, উভয়ের কৌতুকারম্ভ, বিচার, গন্ধর্ব-বিবাহ, বিহার। ফলে, বিদ্যার গর্ভ, রাণীর কন্যাকে তিরস্কার, রাজার ক্রোধ, রাজাদেশে কোটালের চোর-ধরা, বিদ্যার আক্ষেপ, বন্দী সুন্দরকে দেখে 'নারীগণের পতি-নিন্দা', 'রাজার নিকট চোরের শ্লোকপাঠ', এদিকে মশানে সুন্দরের কালীস্তুতি, কালীর অভয় দান, সুন্দর-কৃপায় বীরসিংহেরও দিব্যজ্ঞান লাভ, এবং বিদ্যা ও সুন্দরের পুনর্মিলনের শেষে 'বিদ্যাসহ সুন্দরের স্বদেশ যাত্রা'—এইরূপে এই দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত। কিন্তু কোথায় বা রাজা মানসিংহ, কোথায় বা এ গল্পে ভবানন্দ? মূল গ্রন্থের সঙ্গে বিদ্যাসুন্দরের সম্পর্ক নেই। দ্বিতীয় খণ্ডটি সে হিসাবে অবান্তর—অথচ এটিই 'অন্নদামঙ্গলে'র উৎকৃষ্ট ভাগ।

বাঙলা দেশে এমন কোনো ছাত্রছাত্রী নেই যে এ কাহিনী জানে না, বা চুরি করেও এই বিদ্যাসুন্দর পড়ে নি। এমন পাঠকও কেউ নেই, যে স্বীকার করবে না—এ কবির কৃতিত্ব অনন্যসাধারণ, এবং ভারতচন্দ্রের খ্যাতি—বা অখ্যাতি—সম্পূর্ণই তাঁর প্রাপ্য।

তৃতীয় খণ্ড মানসিংহের বর্ধমান থেকে যশোর যাত্রায় আরম্ভ; তাতে মানসিংহ-প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধ আছে; বেশ কৃতিত্বের সঙ্গে তা সেরে নিয়ে কবি ভবানন্দকে পাঠালেন মানসিংহের সঙ্গে দিল্লী। বাদশাহকে মানসিংহ বাঙলার বৃত্তান্ত পেশ করলেন—ভবানন্দের মুখে অন্নদার ব্যাখ্যা শুনে বাদশাহ জাহাঙ্গীরের ক্রোধই হল। তাঁর দেবতা-নিন্দায় ভবানন্দ আপত্তি করলেন; ফলে ভবানন্দের কারাদণ্ড হল। তারপরে কারাগারে মজুমদারের অন্নদাস্তব, অন্নদার অভয়দান, দেবীর ভূতপ্রেতদের দিল্লীতে উৎপাত; অন্নদার মায়া-প্রপঞ্চ—তাতে রাজসভা আর চেনা যায় না—

রক্ত শতদলে পাতশা অভয়া
উজির হইল জয়া নাজির বিজয়া। ইত্যাদি।

এসবে পাত্‌শা বিমূঢ়। তখন তাঁর ভক্তি হল, মজুমদারকে অনেক বিনয় সম্ভাষণ করলেন, এবং 'রাজাই ফরমান' দিলেন। বাঙালী মজুমদারও আর দেরী

না করে ঘরমুখো হলেন। পথে অবশ্য কবির গঙ্গা বর্ণন, অযোধ্যা বর্ণন ইত্যাদির অবসর হল। বাড়ী ফিরে মজুমদার একেবারে অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন। এদিকে পতি নিয়ে দুই সতীনের সেখানে ব্যঙ্গোক্তি চলেছে। মজুমদার কৃতী পুরুষ, দু'জনেই সন্তোষবিধান করলেন। তারপর রাজ্য আরম্ভ করলেন, অন্নদা পূজা করলেন। এবং যথাসময়ে মজুমদার স্বর্গযাত্রা করলেন, গ্রন্থও শেষ হল।

'অন্নদা-মঙ্গল'ই ভারতচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ রচনা। তাই মনোহর হলেও কেউ আর 'রসমঞ্জরী'র কথা বলে না। কিন্তু অন্নদা-মঙ্গলের এসব আখ্যানের থেকে অন্নদা-মঙ্গলের অন্তর্ভুক্ত ধুয়াগানগুলি এক হিসাবে আরও আদরণীয়। যেমন, দ্বিতীয় খণ্ডের 'পুর-বর্ণনার' ধুয়া গান—

ওহে বিনোদ রায় ধীরে যাও হে···
নিত্য তুমি খেল যাহা নিত্য ভাল নহে তাহা
আমি যে খেলিতে কহি সে খেলা খেলাও হে।
তুমি যে চাহনি চাও সে চাহনি কোথা পাও
ভারত যেমতি চাহে সেই মত চাও হে॥

কিংবা 'বিদ্যাসুন্দর দর্শনে'—

কি বলিলি মালিনি ফিরে বল বল।
রসে তনু ডগমগ মন টল টল॥

কিংবা 'অন্নদার জরতী বেশে ব্যাস ছলনায়'—

কে তোমা চিনিতে পারে গো মা।
বেদে সীমা দিতে নারে॥ ইত্যাদি

রামপ্রসাদের গানের একটা আভাসও এ পদ বহন করে আনে।

আসলে এসব গানের একটা পুরাতন পথে পা বাড়াতেই পুরনো ভক্তি-ভাবটুকুও ভারতচন্দ্র কবিকর্মসূত্রেই এ সব স্থলে সঞ্চার করতে পেরেছেন; সঙ্গে সঙ্গে দিয়েছেন তাতে একটা মার্জিত চারুতা, একটু নূতন ভঙ্গিমা। এই চারুতা ভারতচন্দ্রের অন্যান্য লেখায়ও আছে, কিন্তু নেই ভাবের ক্ষীণ প্রাণোত্তাপও।

ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে আমাদের মূল্যবোধ পরিবর্তিত হতে আরম্ভ করেছে, এক নূতন সাহিত্যাদর্শও তখন থেকেই গৃহীত হতে থাকে। আশ্চর্য হয়ে তথাপি স্বীকার করতে হয়—কবি ভারতচন্দ্র এখনো আমাদের নিকট বাঙ্‌লা

কাব্যের এক শ্রেষ্ঠ কলাকার। মাইকেলেরও তিনি সমাদর লাভ করেছেন—শুধু দুটি সনেটে ('অন্নপূর্ণার ঝাঁপি' ও 'ঈশ্বরী পাটনী') নয়, মাইকেলের ছন্দোবদ্ধ পদের সুরে ভারতচন্দ্রের ততোধিক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথ—ভারতচন্দ্রের রুচি, নীতি বা জীবনবোধ কোনটাই অনুমোদন করবার মতো কবি নন ;—কিন্তু তিনিও মনে করতেন, "রাজসভা-কবি রায়গুণাকরের অন্নদামঙ্গল গান, রাজকণ্ঠে মণিমালার মতো, যেমন তাহার উজ্জ্বলতা, তেমনি তাহার কারুকার্য।" ভারতচন্দ্রের যেখানে কৃতিত্ব সেখানে তিনি রবীন্দ্রনাথের সহিত তুলনীয়। আলাওল-এর ক্লাসিক বা শিষ্ট রচনা-রীতির পরিণতি ভারতচন্দ্রে। উদ্ধৃতি-দান অনেকাংশে নিষ্প্রয়োজন ;—বিদ্যালয় থেকেই আবাল্য আমরা সে সবের সঙ্গে পরিচিত হতে বাধ্য হই। নিখুঁত ছন্দ ও অপরিমিত শব্দ-সম্পদ ভারতচন্দ্রের ক্লাসিক রীতির প্রধানতম অবলম্বন। বাঙ্‌লা ছন্দের এমন যাদুকর তাঁর পূর্বে আর জন্মে নি ; তাঁর পরে রবীন্দ্রনাথ. সত্যেন্দ্রনাথ প্রভৃতি নিশ্চয়ই জন্মেছেন. কিন্তু তাঁরা জন্মেছেন সম্পূর্ণ নূতন কালে, অনেক উত্তরাধিকারের সৌভাগ্য লাভ তাঁদের ঘটেছে। তাই বাঙ্‌লা ছন্দঃপরিচয়ের পুস্তক-লেখকদের প্রধান আশ্রয় পূর্বে ছিলেন ভারতচন্দ্র, এখন তৎসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথের নিদর্শনও যুক্ত হয়। এই সব সূত্রে ভারতচন্দ্রের এদিকটির সঙ্গে বাঙালীমাত্রই পরিচিত। এমনই সুবিখ্যাত কবিগুণাকরের শব্দ-কুশলতা। যেমন তাঁর শব্দের অফুরন্ত ভাণ্ডার, তেমনি তাঁর অভ্রান্ত শব্দ-চয়ন ;—এরও দৃষ্টান্ত দিয়ে শেষ করা যায় না। বাঙ্‌লার শব্দ-ভাণ্ডারের দ্বার ফারসি ও হিন্দীর জন্য আলাওল-প্রমুখ কবিরা উন্মুক্ত করেছিলেন, কিন্তু ভারতচন্দ্রের মতো তাঁরা ফারসি-হিন্দী শব্দকে এমন দু'হাতে গ্রহণ করতে সাহসী হন নি। অথচ ভারতচন্দ্র প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি শব্দকে গ্রহণ করেছেন যাচাই করে, বাছাই করে, ওজন করে,—প্রত্যেকটি ফারসি ও হিন্দী শব্দের স্থান হয়েছে লালিত্যগুণের জন্য, বিশেষ বাক্য-রচনায় তার উপযোগিতার জন্য। এ বিষয়ে ভারতচন্দ্র তাঁর নীতিও ব্যাখ্যা করে গিয়েছেন।

মানসিংহ পাতশায় হইল যে বাণী।
উচিত সে আরবী পারসী হিন্দুস্থানী॥
পড়িয়াছি সেই মত বর্ণিবারে পারি।
কিন্তু সে সকল লোকে বুঝিবারে ভারি॥

না রবে প্রসাদ গুণ না হবে রসাল।
অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল॥
প্রাচীন পণ্ডিতগণ গিয়াছেন কয়ে।
যে হোক সে হোক ভাষা কাব্য রস লয়ে॥

প্রসাদগুণ ও রসালতা,—তাঁর এই শব্দ-চয়নের মানদণ্ড। তাঁর সে শব্দমালা সমগ্র বাক্যকে স্বাচ্ছন্দ্য দান করে, আর তাঁর বাক্যচয় একত্রিত হয়ে সৃষ্টি করে প্রসাদগুণ, সরসতা। ভারতচন্দ্রের বাগ্‌বিন্যাস তাই অনুপম। তার 'কারুকার্য' ও 'উজ্জ্বলতা' কোনোটিই চোখে না পড়বার মতো নয়, অথচ তা সম্পূর্ণরূপে কাব্যের প্রয়োজন-সম্মত। এজন্যই সেই অপূর্ব গুণের প্রমাণস্থল হয়েছে ভারতচন্দ্রের ভাষা—পাশ্চাত্ত্য কাব্য-জিজ্ঞাসায় যার নাম 'স্টাইল'। এজন্যই প্রমথ চৌধুরীও ভারতচন্দ্রকে এত অসামান্য মনে করেছেন। ভারতচন্দ্রের মতো এত ঝক্‌-ঝকে তক্‌-তকে কথা বাঙলা সাহিত্যে আর কেউ জোগাতে পারেন নি—স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও না।

স্টাইল বলতে অবশ্য শুধু বাগ্‌বিন্যাস বোঝায় না। অর্থের সঙ্গে বাক্যের —পার্বতীর সঙ্গে পরমেশ্বরের,—অভিন্নতাও তাতে বোঝায়। ভারতচন্দ্র হয়তো এ-কালের এ কথায় আপত্তি করবেন না, কারণ 'কাব্য রস লয়ে'। এবং নিশ্চয়ই শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারের যে অসামান্য সংযোগে তাঁর কাব্য 'রসাল' হয়ে উঠেছে, মৃদু তির্যক হাস্যে কবি তা আমাদের মনে করিয়ে দেবেন :

অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।
কোন গুণ নাহি তার কপালে আগুন॥ ইত্যাদি

কিম্বা— বিনানিয়া বিনোদিয়া বেণীর শোভায়।
সাপিনী তাপিনী তাপে বিবরে লুকায়॥
কে বলে শারদ শশী সে মুখের তুলা।
পদনখে পড়ে তার আছে কতগুলা॥

কিম্বা সেই বিদ্যার দরবার—

তড়িত ধরিয়া রাখে কাপড়ের ফাঁদে।
তারাগণ লুকাইতে চাহে পূর্ণচাঁদে॥

বুঝ্‌তে পারা যায় কবি বেশ ভালো ভাবেই জানেন

ভারত ভারত খ্যাত আপনার গুণে।

পুরাতন অলংকার শাস্ত্র দিয়ে যদি কাব্যের পরিমাণ হয় তা হলে নিশ্চয়ই এ দামী কারুকর্ম। · কিন্তু সূক্ষ্ম কার্যের জন্য তো কাব্যের মূল্য নয়, ভারতচন্দ্রও বলেন 'কাব্য রস লয়ে'। তবে যে-'রস' নিয়ে সেদিন কাব্যের বিচার হত, সে-'রসের' মূল্য আজ কাব্যের বাজারে কমে গিয়েছে। 'রসাল' কথাই ছিল সে যুগে কাব্যের প্রাণ, আর 'রসিকতা' বলতে তখনো অনেক সময়েই বোঝাত আদিরস নিয়ে এই চাতুর্য। 'কাব্য রস লয়ে', ভারতচন্দ্র এই কথাটা জানতেন; কিন্তু কথাটার অর্থ আজ বদলে গিয়েছে। তিনি শোনেনও নি তখন—এ রস 'জীবন-রস' এবং 'মানব-রস'—সর্বরসসার। মধ্যযুগের মানসে সেই সত্য সহজে অনুভূত হতে পারে না; অষ্টাদশ শতাব্দীর কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় তার আভাস মেলাও অসম্ভব। সে সভায় রসিক পুরুষরা রস বলতে 'রসাল' কথাই বুঝতেন। এই কারণেই 'নারীগণের পতিনিন্দা' তাঁরা উপভোগ করতেন; সংস্কৃত কবিতার বুদ্ধিগ্রাহ্য রসিকতার (wit) ঐতিহ্যে পুষ্ট বলে সে রসিকতায় তাঁরা অভ্যস্ত ছিলেন; ব্যাসদেবকে নিয়ে স্থূল পরিহাস, দাসু-বাসুর খেদ, এসবও ছিল তখনকার প্রচলিত কথকতা, নাটযাত্রার পরিচিত উপকরণ; দেবদেবীর দাম্পত্যকলহ বা দুই স্ত্রীর সাপত্ন্যকলহ, মেয়েদের এ জাতীয় নারী-বৃত্তি ছিল তাঁদের অভিজ্ঞতার জগতের কৌতুকোপকরণ। কিন্তু এর বেশি আর তাঁদের দৃষ্টি মানুষের জীবনে প্রবেশ করে নি, অভিজ্ঞতায় তা স্থান লাভ করে নি। মুকুন্দরামের মধ্যে মানুষের যতটুকু পরিচয় দেখা গিয়েছিল, ভারতচন্দ্রে তার আর নেই। সেই চরিত্র-চিত্র কংকট সব্যাজ রেখা-চিত্রে পরিণত হয়েছে; এই রেখার ধার আছে, কিন্তু রূপ নেই। একবার মাত্র ভারতচন্দ্র জীবনে হঠাৎ একটি জীবন্ত স্বাভাবিক মানুষের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। হয়তো তাঁর নিজের মনে নেই আর তার কথা—পাঠকেরই মনে বেঁচে রয়েছে সেই সরল বাঙালী মাঝি ঈশ্বরী পাটনী আর অবজ্ঞাত বাঙালী জনশ্রেণীর সেই সত্য প্রার্থনা—'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে'। চিরকালের মূঢ় ম্লান মূক বাঙালীর সমস্ত বাস্তব ও আধ্যাত্মিক ইতিহাসও এই কথাটিতেই ভাষা পেয়েছে—'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।'

এ কথা পরিষ্কার, মধ্যযুগ তখন বিগতপ্রায়। অথচ ভারতচন্দ্রকে আধুনিক যুগের কবি বলাও অসম্ভব, মধ্যযুগের কবি বলাও দুঃসাধ্য। তাঁর মনের গঠনে আবেগবাহুল্য নেই—সেখানে বুদ্ধির প্রাধান্যই প্রবল, ধর্মবোধে তিনি

ভারাক্রান্ত নন, দেবদেবীরা মানব-মানবীর মতোই তাঁর নিকটে রসিকতার উপাদান ; ঐহিকতা (secularity) তাঁর চিন্তার ও কাব্যের স্বাভাবিক গুণ, তিনি কালিকাকে দিয়ে সুন্দরকে ত্রাণ করান, কিন্তু বিদ্যা ও সুন্দরের বিহারকে বৃন্দাবনী অপার্থিবতায় 'শোধন' করিয়ে নেন না। বিদ্যা-সুন্দরের প্রণয়-ব্যাপারকে রক্তমাংসের যুবক-যুবতীর অত্যন্ত সহজ এবং বাস্তব যৌন-সম্ভোগ রূপেই ভারতচন্দ্র চিত্রিত করেছেন। এই বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য, এই ঐহিকতা-বাদ ও প্রণয়-রচনায় বাস্তবতাবাদ—আধুনিক কাল-ধর্ম। অন্যদিকে, এ কালের রুচি ও নীতিতে ভারতচন্দ্রের আদিরসাত্মক বর্ণনা আমাদের কাছে দোষাবহ ঠেক্‌বে, —না ঠেকলে মনে করতে হবে আমরা একালের মানুষ নই। অবশ্য, একালের শিক্ষা-দীক্ষা সত্ত্বেও আমরা এ রচনা উপভোগ করতে পারি ;—না পারলে বুঝতাম আমাদের উপভোগ-শক্তি সুস্থ নেই, প্রতি-নিয়ত হলীউডী চিত্র-তারকাদের যৌন-বিজ্ঞাপনীতে তা আমরা খুইয়েছি। নিঃসন্দেহ যে, ভারতীয় এবং অনেক প্রাচীন সাহিত্যে দেহ-বর্ণনায় বা সম্ভোগ-বর্ণনায় কবি বা শ্রোতারা কেউ বিশেষ কুণ্ঠাবোধ করতেন না। আরও নিঃসন্দেহ এই যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় এই আদিরস-চর্চার একটা কৃত্রিম মূল্যও দেখা দিয়েছিল,—সে কৃত্রিমতা ভারতচন্দ্রের কারুকার্যে ও উজ্জ্বলতায় ঢাকা পড়ে নি। এবং একালের আমরা মানতে পারি—এই কৃত্রিম যৌন-বিলাসও বরং ভালো;—ব্রজলীলার ভাবালুতায় রসানো কৃত্রিম প্রণয়-গীত আরও অসহ্য।

তথাপি ভারতচন্দ্রের কবিতা একালের নয়—তা অষ্টাদশ শতকের ছাড়া আর কোনো কালের নয়। কৃত্রিম কালের তা কৃত্রিম সৃষ্টি ;—তার মানুষও কৃত্রিম।

এ কৃত্রিমতা ভারতচন্দ্রের একান্ত গুণ নয়। প্রথমত তা নবাবী আমলের গুণ—যখন মধ্যযুগ শেষ হয়েছে, অথচ যুগান্তর সংঘটিত করতে সমাজ-শক্তি অক্ষম। দ্বিতীয়ত, এ হচ্ছে রাজসভার গুণ, যেখানে কৃত্রিমতা প্রায় স্বতঃসিদ্ধ ; তন্মধ্যে বিশেষ করে কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভার গুণ। কৃষ্ণচন্দ্র যতই চতুর হোন্‌, জীবনে কোনো গভীরতা বা দায়িত্ববোধের নামগন্ধ তাঁর ছিল বলে প্রমাণ নেই। ভারতচন্দ্র সেই রাজসভায় খাপ খেয়ে গিয়েছেন আশ্চর্য রকমে, তা স্পষ্ট দেখি। বৈদগ্ধ্যে, বুদ্ধির ছটায়, বাক্যের ঘটায়, সব্যাজ রসিকতায় (wit), বিকার বিলাসিতায়, তাঁকে সে যুগের মুখপাত্র মনে করতে পারি। বিশেষ করে লক্ষ্য করতে পারি তাঁর মধ্যে একটা অগভীরতা, আসর জমাবার চেষ্টা, চটক লাগাবার

এবং চমক লাগিয়ে মজা দেখবার ছেলেমানুষ-সুলভ প্রবৃত্তিও। এদিক থেকে দেখলে মনে হবে আসলে 'বিদ্যাসুন্দর' বিষপুষ্প নয়, ও হচ্ছে কাগজের ফুল।

বিদ্যা ও সুন্দরের বিহার বর্ণনার জন্য নয়,—নিশ্চয়ই তা এ কালের রুচিতে ও কাব্যাদর্শে বর্জনীয়,—বরং এই কৃত্রিমতার জন্যই ভারতচন্দ্র বড় বলে গণ্য হবার অযোগ্য। এ কাব্যে প্রাণ নেই, জীবনের স্ফূর্তি নেই, এবং মানুষ নেই, আর মানুষ না থাকলে কোনো লেখা আধুনিক যুগের কাব্য হয়না। রাজসভায় —সেই নবাবী-আমলে শাসক আশ্রয়ে—বড় কবি তখন জন্মাতে পারে না, বাঁচতে পারে না, স্থিরও থাকতে পারে না। কিন্তু ভারতচন্দ্রকে দেখি তিনি সে রাজসভাতেই—কবি হিসাবে—জন্মেছেন, বেঁচেছেন এবং বেশ খোশ মেজাজে বসে বসে সরু সুতো কেটেছেন ;—নতুন নাগরীয় আসরের রসিক-পুরুষদের তোষণ করেছেন, মেজে ঘষে ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে কথার উপরে কথা চাপিয়ে পলাশীর প্রাক্কালে বাঙালী শাসক-গোষ্ঠীর আসর জমিয়েছেন, এবং মৃত্যুর পরে পলাশীর রক্ত সন্ধ্যায়—সেই ধ্বসে পড়া, গলে পড়া, নবাবী আমলের মৌতাতে ঝিমন্ত বাঙালী 'জমিদার' ও তৎপরবর্তী কলকাতার 'বাবু' সমাজে—এবং তাদের অনুগত 'ভদ্র' সমাজেরও মধ্যে—রেখে গিয়েছেন এই মৌতাতের ভাণ্ড আর রঙীন কাগজের ফুল : নিষ্প্রাণ, এবং অনেকাংশে আজকের দিনে, নির্বিষও।

এ বিষয়ে সন্দেহ নেই ভারতচন্দ্র অসাধারণ কলাকুশলী কবি আর তাঁর কালের সেই কৃত্রিম সামাজিক পরিস্থিতিতে তিনি তেমনি অসাধারণ মোহ বিস্তার করতে পেরেছিলেন। পূর্বগামী মুকুন্দরাম প্রভৃতি কবিদের যশ তখন সাময়িকভাবে ম্লান হয়ে যায়। 'কালিকামঙ্গলে'র কবিরা তাঁর অনুকরণে লেগে যান, তাঁরা কেউ তাঁর গুণ না পেলেও তাঁর দোষকে দ্বিগুণ করে তুললেন,—তাতে আশ্চর্য হবার নেই। এ প্রভাব কত ব্যাপক ও কত দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল তা তখনকার সাহিত্য-ক্ষেত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই বুঝতে পারব—হালহেডের ব্যাকরণ (খ্রীঃ ১৭৭৮), ফরস্টারের অভিধান (১৭৯৯-১৮০২), লেবেডফের ব্যাকরণে (১৮০১) ভারতচন্দ্রের বহুল উদ্ধৃতি মিলে। লেবেডফের উদ্যোগে প্রথম (১৭৯৫) বাংলা নাটকের যে অভিনয় হয় তাতে ভারতচন্দ্রের গানই গীত হয়েছিল, শ্যামবাজারে নবীনচন্দ্র বসুর বাড়িতে (১৮৩৫) বাঙালীরা প্রথম যে নাটক অভিনয় করেন তা 'বিদ্যাসুন্দর'। গোপাল উড়ে 'বিদ্যাসুন্দর'কে যাত্রাগানে রূপান্তরিত করে তার জনপ্রিয়তা বাড়িয়ে দেন। 'অন্নদামঙ্গল কাব্য'

প্রথম মুদ্রিত করেন গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য ইংরেজি ১৮১৬ সালে, তা-ই প্রথম বাঙ্‌লা সচিত্র পুস্তক (দ্রঃ—সাঃ পঃ সংস্করণ, ভূমিকা)। শুধু ভারতচন্দ্রের নয়, নবাবী আমলেরও প্রভাব এ সব থেকে অনুমেয়।

রামপ্রসাদ : ভারতচন্দ্রের পরেই অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রধান কবি রামপ্রসাদ সেন 'কবিরঞ্জন'। রামপ্রসাদ অবশ্য কালীকীর্তনের জন্যই সর্বজনসমাদৃত, 'সাধক-কবি' বলেই তাঁর খ্যাতি। কিন্তু ইদানীং একথাও আমাদের স্মরণ-পথে পুনরুদিত হয়েছে যে, রামপ্রসাদও বিদ্যাসুন্দর লিখেছিলেন, আর সে কাব্য তুচ্ছ নয়। তা ছাড়া তিনি 'কৃষ্ণকীর্তন'ও কিছু কিছু লিখেছিলেন, তবে প্রধানত তিনি শাক্তপদাবলীরই শ্রেষ্ঠ কবি। অবশ্য রামপ্রসাদের নামে যে সব গীতি প্রচলিত তা বিভিন্ন রামপ্রসাদের,—যথা 'দ্বিজ' রামপ্রসাদের, কবিওয়ালা রামপ্রসাদের, বা পূর্ববঙ্গীয় অন্য এক রামপ্রসাদেরও। আসল রামপ্রসাদ হচ্ছেন রামপ্রসাদ সেন 'কবিরঞ্জন'। তাঁর শাক্ত পদাবলীতেই বাঙ্‌লার মানুষের প্রাণ ভাষা পেয়েছে।

রামপ্রসাদ সম্ভবত ভারতচন্দ্রের বয়ঃকনিষ্ঠ কবি। রামপ্রসাদ সেন জন্মেছিলেন বৈদ্য বংশে, হালিশহরের নিকটবর্তী কুমারহট্ট গ্রামে। তাঁর পিতার নাম রামরাম সেন, ভ্রাতাভগ্নী প্রভৃতি অনেকের নামও কবি করেছেন। তাঁর পরিপোষকের নামও আছে—মহারাজ রাজেন্দ্র রাজকিশোর, তাঁর আদেশে তিনি 'বিদ্যাসুন্দর' রচনা করেন।

রামপ্রসাদের 'বিদ্যাসুন্দর' তত প্রসিদ্ধি লাভ করতে পারে নি, কারণ ভারতচন্দ্রের কাব্যের মতো তা যুগ-চরিত্রকে ততটা প্রকাশিত করতে পারে নি। যাকে আমরা এখন অশ্লীল বলি, রামপ্রসাদের 'বিদ্যাসুন্দর' তা থেকে মুক্ত নয়; কারণ তখনো সাহিত্যে তা অশ্লীল বলে গণ্য হত না। কিন্তু যে রঙ্গ ও ব্যঙ্গের প্রাধান্যে এবং কথার চটকে ভারতচন্দ্র যুগ-কবি, রামপ্রসাদ তাতে তাঁর সমকক্ষ নন। না হলে রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরে চরিত্র-চিত্রণের চেষ্টা আছে, মানুষের খোঁজ পাওয়া যায়, এমন কি ঘরোয়া ভাবেরও সন্ধান মিলে—কালীর পদের কবি তাঁর স্বভাব একেবারে খোয়াবেন কি করে? আর সেই সঙ্গে কাব্যগুণও তাঁর আছে।

রামপ্রসাদ তবু গানের জন্যই প্রসিদ্ধ (দ্রঃ—বঃ সাঃ পরিচয়, পৃঃ১৫২২)। সে গানে বাঙ্‌লার মাটির গন্ধ আছে, মানুষের প্রাণকেও সেই অষ্টাদশ শতকে সে গীত স্পর্শ করেছিল। কোনো কোনো পদে এমন একটা ঘরোয়া ভাবের

সরল শ্রী ও আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতা আছে যা লোকগীতে ছাড়া সাধারণত পাওয়া যায় না—অন্তত সাধারণ বৈষ্ণব পদাবলীতে তা দুর্লভ। ভয়ঙ্করী কালী, দুর্গার মতোই, বাঙালীর কাছে দয়াময়ী জননী হয়ে উঠেছেন--আর রামপ্রসাদী গীতের মারফত এই সম্পর্কটি রসস্নিগ্ধ হয়ে বাঙলা দেশের জনচিত্তেও পুনঃপ্রবেশ করেছে। হয়তো তিনিই এই নূতন ঐতিহ্যের স্রষ্টা। সেই কৃত্রিমতার যুগে রামপ্রসাদের কাব্যে ও গীতে, ভাবে ও ভাষায় একটা অকৃত্রিমতা দেখা যায়, যা প্রায় ব্যতিক্রম। আসলে একেবারে ব্যতিক্রম নয়; কারণ, উপরতলার এই কৃত্রিমতা পল্লী-সমাজের জনচিত্তকে সে যুগেও কবলিত করতে পারে নি—ধর্মমঙ্গল থেকে পল্লীর নানা গীতে গানে আমরা তা অনুভব করতে পারি। রামপ্রসাদের গানে গীতে একটা ব্যর্থতার ও নৈরাশ্যের সুর আছে, কিন্তু কৃত্রিমতা নেই, বিকৃতি নেই। শিক্ষা ও পাণ্ডিত্যসূত্রে বৈদগ্ধ্য ও রাজসভা দ্বারা আকৃষ্ট হলেও রামপ্রসাদ লোক-সমাজের থেকেই আপনার প্রাণের আশ্রয় ও সঙ্গীতপ্রেরণা লাভ করেছিলেন।

অলঙ্কারের ঝঙ্কারও তাঁর গীতে কম নয়—

> শ্যামা বামা কে
> তনু দলিতাঞ্জন শারদ সুধাকর মণ্ডল বন্দিনী রে।
> কুন্তল বিগলিত শোণিত শোভিত তড়িত জড়িত নবঘন ঝলকে॥…
> ভীম ভবার্ণব তারণ-হেতু ঐ যুগল চরণ তব করিয়াছি সেতু
> কলয়তি কবি রামপ্রসাদ কবিরঞ্জন
> কুরু কৃপালেশং জননি কালিকে।

বাক্যালঙ্কারও যথেষ্ট :—

> ভ্রমর চকোরেতে লাগিল বিবাদ
> এ কহে নীল কমল ও কহে চাঁদ। ইত্যাদি…

কিন্তু রামপ্রসাদের আসল বৈশিষ্ট্য তাঁর আন্তরিক ভক্তি ও সরল বাচনভঙ্গিতে :—

> বল মা আমি দাঁড়াই কোথা।
> আমার কেহ নাই শঙ্করি হেথা॥
> মা সোহাগে বাপের আদর এ দৃষ্টান্ত যথা তথা। ইত্যাদি…
> কেবল আসার আশা ভবে আসা আসা মাত্র সার হলো।
> যেমন চিত্রের পদ্মেতে পড়ে ভ্রমর ভুলে রলো।

মা নিম খাওয়ালে চিনি বলে কথায় কথায় করে ছলো।
ওমা মিঠার লোভে তিত মুখে সারা দিনটা গেল। ইত্যাদি—
মা মা বলে আর ডাকব না।
ওমা দিয়েছ দিতেছ কতই যন্ত্রণা॥ ইত্যাদি…
রসনায় কালী কালী বলে।
আমি ডঙ্কা মেরে যাব চলে॥…
আমার মন মাতালে মেতেছে আজ
মদ-মাতালে মাতাল বলে॥ ইত্যাদি…
এমন দিন কি হবে তারা
যবে তারা তারা তারা বলে
তারা বয়ে পড়বে ধারা।
হৃদি পদ্ম উঠবে ফুটে, মনের আঁধার যাবে ছুটে
তখন ধরাতলে পড়ব লুটে, তারা বলে হব সারা॥ ইত্যাদি…

'কলুর বলদ', 'কৃষিকাজ' ও 'মানবজমি' বিষয়ক তুলনাগুলোও স্মরণীয়। তত্ত্ব-বিশ্লেষণের উপমাও চমৎকার

প্রথমে প্রকৃতি স্থূলা অহঙ্কারে লক্ষকোটি।
যেমন শরার জলে সূর্য অভাবেতে স্বভাব যেটি॥ ইত্যাদি…

কালিকামঙ্গলের বা বিদ্যাসুন্দরের আরও রচয়িতা ছিলেন—যেমন রাধাকান্ত মিশ্র,—তিনিই বোধহয় কলকাতার প্রথম কবি,—'কবীন্দ্র' চক্রবর্তী, চট্টগ্রামের নিধিরাম আচার্য প্রভৃতি। দোষে-গুণে তাঁরা আজ বিস্মৃত-প্রায়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে সুন্দর চোর কালিকার প্রসাদে দেশে ফিরে গিয়ে বিদ্যাকে নিয়ে রাজত্ব করেছিলেন কিনা ঠিক নেই। তবে বাঙলা দেশের দিকে দৃষ্টিপাত করলে মনে হয়—বাঙলায় থাকলে সে কাজ তাঁর পোষাত না। কোম্পানির আমলে তিনি কলিকাতা কৃষ্ণনগর প্রভৃতি শহরের নূতন ভাগ্যবন্তদের মধ্যে আসর জাঁকিয়ে বসতেন, বিদ্যাসুন্দর গান শুনতেন, শুনতেন চন্দ্রকান্তের কাহিনী, বত্রিশ সিংহাসন, বেতাল পঞ্চবিংশতি বা ফারসি কড়া-পাকের প্রণয়-কথা গোলেবকাওলি। এদিকে দেবদেবীর পূজা হত, পূজা উৎসব উপলক্ষ্য করে তিনি তখন বসতেন কবিগান, যাত্রা, তরজা, খেউড়, ঢপ-কীর্তন, নূতন পাঁচালী প্রভৃতি শুনতে। ১৮০০এর পরেও সে আসর শহরে 'বাবু'রা প্রায়

পঞ্চাশ বৎসর জীইয়ে রেখেছিলেন—একদিকে 'কামিনীকুমার' প্রভৃতি উপাখ্যান, অন্যদিকে কবির লড়াই, খেউড়, হাফ-আখড়াই, টপ্পা প্রভৃতি তাঁদের 'রস' জোগাত। বিদ্যাসুন্দরের অনুকরণ-প্রাবল্য সত্ত্বেও বাক্য-রচনায় ভাঁটা পড়ে, গীতে গানেই কলিকাতা রঙ্গালয়ে শহুরে বাবুদের আশা মিটত। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকেই এই সব শহুরে ও সৌখীন গীত-ধারাও বাঙলায় দেখা যায় (পরে দ্রষ্টব্য); বিদ্যাসুন্দরের মতো তাতেও পৌরাণিক কাহিনী বা দেবদেবীর নাম থাকত। যথার্থ ধর্মসঙ্গীতও ছিল। কিন্তু আসলে তা অনেক সময়েই প্রণয়-সঙ্গীত ; আর অনেক প্রণয়-সঙ্গীতের মধ্যেই পাওয়া যায়—প্রথম দিকের এই নবাবী আমলের প্রণয়-বিলাসীদের কৃত্রিম জীবন ও রস-লোলুপ মনের প্রতিধ্বনি, পরবর্তী কালের বাবু-বিলাসের আয়োজন উপকরণ।

একাদশ পরিচ্ছেদ

পাঁচালী, 'ইসলামী পুরাণ', গাথা, গীতি ও বিবিধ রচনা

'শ্রীরাম পাঁচালী', 'ভারত পাঁচালী' এবং মঙ্গলকাব্যসমূহ ছাড়াও অন্য দেব-দেবীর পাঁচালী পাওয়া যায়, তা দেখেছি ; যেমন, শীতলার পাঁচালী, সূর্যের পাঁচালী, ইত্যাদি। সুবচনী, সত্যনারায়ণপ্রভৃতি দেবতাদের পাঁচালী মঙ্গলকাব্য নাম পায়নি, তা পাঁচালীই রয়েছে। সুবচনীর ব্রতকথা পূর্ববঙ্গে পাঁচালীর স্তরেও উঠতে পারে নি। এদিকে প্রধান পাঁচালী হল সত্যনারায়ণের পাঁচালী।

সত্যপীরের পাঁচালী—মুসলমান আগমনের পূর্বে লোক-মনে নাথগুরু ও সিদ্ধাদের আসন যেখানে ছিল, মুসলমান পীর ও ফকিররা তাঁদের কেরামতির খ্যাতিতে সেইখানেই অতি সহজে আসন গ্রহণ করেছিলেন। তারপর জন-জীবনে দুই ধর্মের এই পীর ও গুরুদের সমান প্রভাব বিস্তৃত হয়, সমভাবে তাঁদের মাহাত্ম্য-গানও ক্রমে রচিত হতে থাকে। এই জন-জীবনের সহজ সংমিশ্রণেই উদিত হন সত্যপীর বা সত্যনারায়ণ। সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বেই দক্ষিণ রায় ও পীর বড় খাঁ গাজী ও কালু রায়ের দ্বন্দ্ব ও বোঝাপড়া সমাপ্ত হয়েছিল।

তখনো দ্বন্দ্ব না থাক্ তার স্মৃতি ছিল। কিন্তু এখন এই অষ্টাদশ শতকে হিন্দু-মুসলমান প্রতিদ্বন্দ্বিতার চিহ্নও আর সত্যপীরে বা সত্যনারায়ণে দেখা যায় না। এখানেও সূফী প্রভাব সক্রিয় ছিল তা অনুমান করা যায়। সূফীদের ভাষায় আল্লাহ্ হলেন 'হক' = সত্য,—সত্যপীর ও সত্যনারায়ণের পক্ষে এই 'সত্য'-শব্দটি অচ্ছেদ্য অঙ্গ। পশ্চিম বঙ্গেই হয়তো এই পীর-মাহাত্ম্যের উদ্ভব। 'সত্যপীরের কাহিনী' পূর্ববঙ্গে কতটা প্রচলিত জানি না। কিন্তু সত্যনারায়ণের কাহিনী পাঁচালী আর তাঁর 'শিনি' পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের মধ্যে এখনো সুপ্রচলিত। সত্য-পীরের পাঁচালীতে দুইটি উপাখ্যান—দুইই ব্রতকথার মতো ঐহিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের কামনায় উদ্ভূত। একটি কাহিনী এরূপ:—এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ, ভগবান তাঁর প্রতি দয়া করে ফকির বেশে দেখা দিলেন, তাঁকে সত্যপীরের শিনি দিতে বললেন। ব্রাহ্মণ পুজো দিল আর ধনশালী হয়ে উঠল। দ্বিতীয় কাহিনীটি সেই সওদাগরের বাণিজ্য-যাত্রার ছাঁচে ঢালা, ধনপতি-ফুল্লরার কাহিনীরই অনেকটা অনুরূপ।

এবার রচয়িতাদের কথা: ধর্মমঙ্গলের ঘনরাম চক্রবর্তী, 'শিবায়নে'র রামেশ্বর ভট্টাচার্য, 'রায়বারের' ফকিররাম দাস 'কবিভূষণ', প্রভৃতি হলেন 'সত্যনারায়ণের পাঁচালী'র প্রথম দিককার কবি। আরও অনেক নাম রয়েছে। তারপরে—স্বয়ং ভারতচন্দ্র (দু'খানা সত্যনারায়ণ-পাঁচালীর তিনি রচয়িতা) থেকে আরও অন্তত ৩০।৪০ জন লেখক সত্যনারায়ণের পাঁচালী লিখেছেন। এ ব্যাপারে আসল কথাটা কবিদের কবিত্ব নয়, আসল কথাটা এ কাহিনীর সামাজিক মূল ও তার সামাজিক মূল্য। হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির আপোষ তখন স্থায়ী হয়েছে। মনে হয়, মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুরাই সত্যপীরের বেশি ভক্ত। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের কবি আরিফ্ ও কৈজুল্লার সত্যপীরের পাঁচালী থেকে বুঝি এ ধরণের ধর্মীয় ধারণা মুসলমান সমাজেও প্রসারলাভ করেছে। কৈজুল্লা প্রথমে আল্লা, রসুল প্রভৃতি মুসলমানদের নমস্যদের বন্দনা করে পরে বন্দনা করছেন:

> হিন্দুর ঠাকুরগণে করি প্রণিপাত
> খানাকুলের বন্দিব ঠাকুর গোপীনাথ।
> যমুনার তটে বন্দো রাস-বৃন্দাবন
> কৃষ্ণ বলরাম বন্দো শ্রীনন্দ-নন্দন। ইত্যাদি

সত্যপীর ও সত্যনারায়ণ প্রভৃতি দেবতাদের সঙ্গে (ফারসী-হিন্দী প্রভাবিত রোমান্টিক গল্পের এবং) জনসাধারণের রূপকথা ও কাহিনী সহজেই এসে মিশে

যেত। সওদাগর, বাণিজ্যযাত্রা এবং বিদেশে বিপদ, কিম্বা রাজপুত্র-রাজকন্যা, শুক-সারি বা অমনি বিদ্যাধরী-মায়াবিনী জাতীয়া বিলাসিনীর পাল্লায় রাজপুত্রের আত্মবিস্মরণ, এমন কি রূপান্তর (ভেড়া হয়ে যাওয়া) ইত্যাদি গল্পগুলি সমাজের সার্বজনীন সম্পত্তি। এরূপ পালাই ছিল আরিফের 'লালমোনের কেচ্ছা'– ফকির রামের 'সখীসোনা' প্রভৃতি। বিপদ-ত্রাণের জন্য এ সব গল্পে যোগী, সিদ্ধা, ফকির প্রভৃতি পূর্বেও থাকত, তাদের সঙ্গে তাই কোনো পীর বা সত্যনারায়ণকে তখন জুড়ে দিতে কষ্ট হয় নি। এরূপ গীত হল 'মাণিক পীরের গীত।' আর এক ধরণের 'পাঁচালী'তে পীরকে মানব সন্তান করে এক রকম সমকালীন উপকথার আকার দেওয়া হয়,—অবশ্য সে সব কাহিনীর ঘটনা বাস্তব নয়।

সত্যপীর-মাণিকপীর ছাড়াও পূর্ববঙ্গে 'ত্রৈলোক্যপীর' দেখা দেন। পশ্চিমবঙ্গে বড় খাঁ গাজী পীরের কাহিনীও চলে। 'সমসের গাজীর গান'ও আছে। আর নাথগুরু মৎস্যেন্দ্রনাথ মুসলমান সাধারণের কাহিনীতে মছন্দলী পীর বা মোছরা পীরেও পরিণত হন। এসব পীরের গান ও ছড়ার অবশ্য সাহিত্যিক মূল্য নেই ; তবে বাঙালী সমাজের অবস্থার দিক থেকে দেখলে এগুলো পুরাণের অনুবাদের থেকে বেশি মূল্যবান।

তা ছাড়া, এই পীরের পাঁচালী ধরণের রচনা উনবিংশ শতকেও চলতে থাকে। এই সব সাহিত্যের সঙ্গে একদিকে যোগ রয়েছে—নাথসিদ্ধাদের অনুরূপ লোক-প্রচলিত কাহিনীর, এবং ভারতবর্ষে চোয়ানো ফারসী-আরবী রোমান্টিক রূপকথার। অন্যদিকে অবশ্য গীত ও প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নূতন পাঁচালীও অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকেই উদ্ভূত হতে থাকে।

ইসলামী পুরাণ

সৈয়দ সুলতানের 'নবীবংশ' (খ্রীঃ ১৬৫৪), মহম্মদ খানের 'মুক্তালহোসেন' (খ্রীঃ ১৬৪৬), শেখচাঁদের 'রসুল বিজয়' সপ্তদশ শতকেই দেখা দিয়েছিল জানি। অষ্টাদশ শতকে এই মুসলমানী পুরাণ রচনা আরও বেড়ে যায়—উনবিংশ শতকেও তা বাড়ে বই কমে না। চট্টগ্রাম থেকে এবার কেন্দ্র এসেছে উত্তর বঙ্গে। হায়াৎ মামুদ লিখেছেন 'আম্বিয়াবাণী' (খ্রীঃ ১৭৫৮) এবং তার 'জঙ্গনামা'; তা ছাড়াও হায়াৎ মামুদ ফারসি থেকে 'হিতোপদেশ' বাঙ্‌লায় অনুবাদ করেন এবং ইস্‌লামী শাস্ত্রীয় জ্ঞানের পুঁথি লেখেন 'হিতজ্ঞানবাণী' (খ্রীঃ ১৭৫৩)।

'জঙ্গনামা'র গুরুত্ব আছে। এ হচ্ছে মোহররমের পূর্বেকার ও কারবালার কাহিনী,—যুদ্ধ-বর্ণনায় ও শোকাবহতায় সত্যই এ কাহিনী কাব্যের উৎকৃষ্ট উপাদান। মুসলমানের নিকট তো তা আদরণীয় হবেই। জঙ্গনামার প্রথম দিককার কবি মহম্মদ খাঁ, সৈয়দ সুলতান, শেখচাঁদ, প্রভৃতি সপ্তদশ শতাব্দীর ও চট্টগ্রামের কবি। নসরুল্লা খাঁ ও মনসুর অষ্টাদশ শতাব্দীর; তাঁরাও চট্টগ্রামের। তার পরে উত্তর বঙ্গের হায়াৎ মামুদ ও পশ্চিম বঙ্গের গরীবউল্লা। গরীবউল্লার 'জঙ্গনামা' অসমাপ্ত কাব্য, সৈয়দ হামজা তা সমাপ্ত করেন খ্রীঃ ১৭৯২তে। এই জঙ্গনামা এদিককার নামকরা পুঁথি, প্রায় হিন্দুদের মহাভারতের মতই গম্ভীর ব্যাপার। বীরভূমের একজন হিন্দু রাধাচরণ গোপও 'জঙ্গনামা' লিখেছেন। হিন্দুদের কৃষ্ণ, বলরাম, হরিশ্চন্দ্র প্রভৃতির কাহিনী নাম বদলে এসব ইসলামী পুরাণে অবাধে অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছে। স্বভাবতঃই এ সব ইস্‌লামী পুরাণে আরবী ফারসি শব্দ জুটবে বেশি; কিন্তু ক্রমেই তা এত বেশি হয়ে উঠতে থাকে যে তাতে জন্ম নেয় ভাষার এক বিকৃত রূপ—'মুসলমানী বাঙ্‌লা'। এইটি আলাওলের বিপরীত পথ। এবেশে বাঙ্‌লা ভাষার প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে, তাই এই ভাষার অত্যাচারে ইস্‌লামী বিষয়ও মুসলমান সম্প্রদায়ের গণ্ডি ছাড়িয়ে এ দেশে সকলের গ্রাহ্য হয় নি—জাতীয় বিষয় হয়ে উঠতে তা পারল না। অর্থাৎ আলাওলের ক্ষেত্র মুসলমান লেখকরাও আবাদ করতে পারলেন না। অথচ ঊনবিংশ শতকে 'কেচ্ছা' ও 'মুসলমানী পুরাণ' তাঁরা যথেষ্ট লিখেছেন।—তার সাহিত্য-গুণ প্রায়ই নেই।

গরীবুল্লার দ্বিতীয় কাব্য 'ইউসুফ জোলেখা'। তাতে হিন্দু কবিদের মতোই তিনিও সকলের জন্য আল্লার আশীর্বাদ ভিক্ষা করেছেন :

আসরে বসিয়া যত হিন্দু মুসলমান।
সবাকার তরে আল্লা হও মেহেরবান ॥

ভুরশুটের সৈয়দ হামজা মুসলমান কবিদের মধ্যে সব চেয়ে বেশি গ্রন্থ লেখেন—'মধুমালতী', 'আমীর হামজা', 'জৈগুনের পুঁথি' (হানিফার জঙ্গনামা), ও 'হাতেম-তাইর কেচ্ছা' (খ্রীঃ ১৮০৪)। এই শেষ গ্রন্থে উপদেশ দান কালে যা বলা হয়েছে তাতে সাধারণ মুসলমান গৃহস্থ-সংসারের একটা জীবনাদর্শের পরিচয় পাই (ডঃ সেন—ইসলামি বাঃ সাঃ, পৃঃ ১১৬)। মুসলমান লেখকদের নিকট রোমান্টিক প্রণয়-গাথার মতোই প্রিয় ছিল যুদ্ধ-কাহিনী। কিন্তু অষ্টাদশ শতকের

এই মুসলমান লেখকেরাও কেউ ইংরেজের রাজ্য-শাসনে বিক্ষুব্ধ নন—এসব কাব্য দেখে এরূপই মনে হয়। কিন্তু ক্ষমতা-চ্যুত শাসকবর্গের নিশ্চয়ই বিক্ষোভ ছিল।

লোকগাথা

অষ্টাদশ শতকে এসে সাহিত্যে এই প্রণয়-কাহিনীর ধারা আর স্বচ্ছ ও স্বচ্ছন্দগতি রইল না, অবশ্য বিস্তার লাভ করল অনেক। মুসলমান কবিরা বিশেষ করে এ ধরণের কাব্য রচনায় উৎসাহী ছিলেন। কিন্তু কোথায় আলাওল-দৌলত কাজী আর কোথায় অষ্টাদশ বা উনবিংশ শতকের সেই কবিরা? অষ্টাদশ শতকে যে সব কাহিনী এ প্রণয়কাহিনীর ধারাকে পুষ্ট করে, তার মধ্যে ছিল মনোহর মধুমালতীর কথা। আলাওলও এ কাহিনীর উল্লেখ করেছিলেন, হিন্দীতে এ কাহিনী প্রচলিত ছিল। অন্য কাহিনীর মধ্যে বেশি পরিচিত বিক্রমাদিত্য-কাহিনীমালার 'বেতাল পচিশী', 'দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা', প্রভৃতি উপাখ্যান।

কিন্তু এ সব অপেক্ষা লোক-গাথায় যে-সব প্রণয় কাহিনী গড়ে উঠে, সেগুলি বেশি লক্ষণীয়। কাব্য-সৌন্দর্য তাদেরও অনেক সময় সামান্য। বিশেষ করে, অধিকাংশ লোক-গাথা কখনো লিখিত হয় নি; তাদের ভাষা এত পরিবর্তিত হয়েছে যে, উনবিংশ বা বিংশ শতাব্দীর রচনা বললেও অন্যায় হবে না। এ সব লোকগাথার মধ্যে পাই কোচবিহারে উমানাথের লেখা রাজপুত্র হীরাধর ও তিন বন্ধুর কথা (অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে লেখা?), পশ্চিমবঙ্গে সরফের 'দামিনী চরিত্র' হয়তো সর্বপ্রাচীন, উত্তরবঙ্গের 'নীলার বারমাসি গান', তারই অনুরূপ (১৭৯০?) খলিলের রচিত চন্দ্রমুখীর পুঁথি—এই শেষ পুঁথি অনেকটা হিন্দী 'মৃগাবতী' কাব্য-কাহিনীর অনুরূপ।

কিন্তু অধিকাংশ লোক-প্রিয় গাথা মুখে মুখেই চলছিল—গায়েনের মুখে মুখে তার বিকাশ ও বিবর্তন ঘটেছে। সে সব গাথার মধ্যে যুদ্ধের কথাও আছে, ভক্তিমূলক গল্পও আছে, কিন্তু আসল কথাটা প্রায়ই প্রণয়ের গীত, যেমন, 'মৈমনসিংহ গীতিকা' ও 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র (চন্দ্রকুমার দে সঙ্কলিত) গাথা-সমূহ। বাঙ্‌লা লোক সাহিত্য অবশ্য স্বতন্ত্র আলোচনার যোগ্য।

মৈমনসিংহ গীতিকা ও পূর্ববঙ্গ গীতিকা: মৈমনসিংহ গীতিকার কাল নির্ণয় করা প্রায় অসম্ভব। কিন্তু সমস্তগুলি আখ্যায়িকাই বিংশ শতকের উদ্ভাবনা বা সেই শতাব্দীতে জোড়াতালি দিয়ে গঠিত, কিংবা বিংশ শতকের এক বা একাধিক

চন্দ্রকুমার দের রচনা, একথাও ভাবা দুঃসাধ্য। কারণ, তা হলে বলতে হবে চন্দ্র-কুমার দে বা সেই রচনাকাররা বাঙ্‌লা সাহিত্যের প্রধান পল্লীকবি। আমাদের বিশ্বাস এ ভাবনাও ঠিক নয়। গাথাগুলি মুদ্রণের জন্য পরিমার্জিত হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু মূলত 'মহুয়া'র মতো কোনো কোনো আখ্যায়িকার বীজ পুরাতন। লোক-সমাজে এরূপ চলিত আখ্যায়িকার ভাঙা গড়া, জোড়া-তালি দেওয়া যেমন চলে এ ক্ষেত্রে, তেমনি জোড়াতালি দেওয়া চলেছে। অর্থাৎ এসব আখ্যায়িকার উৎপত্তি ও বিকাশ লোকসমাজে। দ্বিতীয়ত, মোটের উপর পল্লীকবি ও গায়েনদের রচনা এসব গাথার মধ্যে এখনো টিকে আছে, তা উবে যায় নি, এরূপ অনুমান অন্যায় নয়। ভাষা যতটা পরিমার্জিত হয়েছে, কথাবস্তু ততটা বা সে পরিমাণে বদলায় নি। ভাববস্তুও বেশি শোধিত হয় নি। বেশির ভাগ আখ্যায়িকা অষ্টাদশ শতকেই গড়ে উঠে থাকবে।—এদের সঙ্গে সাধারণ মুসলমান সমাজে প্রচলিত ফারসি রোমান্স ও প্রণয়-কাহিনীর যোগ ঘনিষ্ঠ নয়, একটা সাধারণ সম্পর্ক আছে মাত্র। উনিশ শতকে যে এসব গাওয়া হত তা মনে করা কারণ আছে। যত পরিমার্জিত হোক, ইংরেজ আমলের বিজ্ঞাপন গাথাগুলিতে নেই। অষ্টাদশ শতাব্দীর অপেক্ষা পুরাতন বলে এসব গাথাকে মার্কা দেওয়া যদি অসম্ভব হয়, তা হলেও কাব্য হিসাবে শুধু লোক কাব্য বলে নয়—বাঙ্‌লা ইতিহাসে তাদের ফার্স্ট ক্লাস মার্ক দিতেই হবে। যে শতাব্দীরই হোক, পল্লীর সাধারণ মনে যে পচ ধরে নি, এ সব গাথা তারই প্রমাণ।

লোকগীতির নাগরিক বিবর্তন: অষ্টাদশ শতকে পল্লীর লোক-জীবন অবশ্য লোক-গীতি ও লোক-গাথার মধ্য দিয়েই আত্মপ্রকাশের পথ আবিষ্কার করতে বাধ্য হয়। পণ্ডিত-কবি বা বিদগ্ধ লেখকেরা তখন পুরাতন পরিপোষকদের (পেট্রন্) হারিয়ে হয় নীরব হয়েছিলেন, নয় লিখেছেন গতানু-গতিক পদ ও মঙ্গলকাব্য; আর নইলে নতুন পরিপোষকের রুচি অনুযায়ী লিখেছেন বিদ্যাসুন্দর জাতীয় পাঁচালী। সেদিকে আরও ঝোঁক বাড়ল নূতন 'নাগরিক' সমাজের উদ্ভবে। বাণিজ্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পল্লী-সভ্যতার মধ্যে শহর-বন্দর পূর্বেই গড়ে উঠ্‌ছিল। অষ্টাদশ শতকে মুর্শিদাবাদ, কাশিমবাজার, হুগলি ও কলিকাতার একটা শহরে সমাজও গড়ে ওঠে—পূর্ববঙ্গে অবশ্য তা দেখা দেয় নি। ঢাকা বাঙ্‌লা সাহিত্যে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, আর অষ্টাদশ শতাব্দীতে তা অবজ্ঞাত। শতাব্দীর শেষ দিকে (খ্রীঃ ১৭৬৫-৭৫) সকলের বৈভব হরণ করে

রাজধানী কলিকাতা জেঁকে উঠল। এ শহরের সমাজে বণিক ব্যবসায়ীর ঐতিহ্যহীন ধন-বিলাসের সঙ্গে এসে মিশল নবাবী আমলের বিকৃত ঝোঁক, মুর্শিদাবাদের ক্ষয়গ্রস্ত আভিজাত্যের শূন্য আড়ম্বর। তাতেই 'নবাবী আমলের' বিকৃত-রুচির নাগরিকতা এখানে প্রস্তুত হল, আর দেখা দিল সেই বিকৃত নাগরিক রুচি ও অগভীর নাগরিক আদর্শানুরূপ সাহিত্য—উপাখ্যান, কাহিনী এবং নানা গীত ও গান। শুধু কলিকাতায় নয়, নিকটবর্তী শহর অঞ্চলেরও এ বিলাস কতকটা ছড়িয়ে পড়ে—ভাগীরথীর দুই কূলের সভ্য-সমাজ তাই এরূপ সাহিত্য ও সঙ্গীত চর্চায় কলিকাতার অনুসরণ করে। এখানকার 'শারি', 'জারি' (আসলে বিলাপ, এখন বোঝায় 'দেহতত্ত্ব' বিষয়ক গান), 'মালসী', এসব নানা রীতি ও নানা ধরণের চলিত গীতের একটা হিসাব মিলে রাজা জয়নারায়ণ ঘোষালের লেখায়। সে লেখা অবশ্য উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক্‌কার (১৮১৩-১৫); তবে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধের বাঙালী সমাজের বেশ নিখুঁত চিত্র আছে এই গ্রন্থ 'শ্রীকরুণা নিধান বিলাসে'। জয়নারায়ণের সে তালিকায় আছে প্রথমত সংকীর্তন ও কীর্তনের নানা ধরণের উল্লেখ। তারপর

পাঁচালি অনেক ভাঁতি রামায়ণ সুর।
কথকতা তরজাতে শাড়িতে প্রচুর॥
ভবানী ভবের গান মালসী মাথুর।
গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী বিজয়াতে ভোর॥
বাইশ আখড়া ছাপ প্রেমে চুরচুর।
গোবিন্দমঙ্গল জারি গাইছে সুধীর॥…
কালিয়দমন যাত্রা রাস চণ্ডীযাত্রা ধীর।
রচিল চৈতন্যযাত্রা রসে পরিপুর॥
সাপড়িয়া বাদিয়ার ছাপের লহর।
বাঙ্গালার নব গান নূতন ঝুমুর॥

এ অবশ্য পশ্চিমবঙ্গের—বিশেষ করে শহরে মহলের—গীতগানের হিসাব [শাড়ি ('সারি') গানের দৃষ্টান্ত তবু বাস্তব-চেতন এই কবি পূর্ববঙ্গীয় ভাষায় দিয়েছেন]। এধারার আরও বিকাশ হবে উনিশ শতকে—'বাবুদের' আমলে, সে প্রসঙ্গেই এসব গানের কথা বিশেষ আলোচ্য। অষ্টাদশ শতকের এই শেষ-দিক্‌কার হিসাবে এ বিষয়ে দু' একটি সাধারণ কথা জানা থাকা উচিত।

'পাঁচালী' প্রথম থেকেই ছিল, তা আমরা বলেছি ;—আখ্যান ছিল তার বিষয়বস্তু, আর চামর দুলিয়ে মন্দিরা বাজিয়ে তা গাওয়া হত। এখন তার একটা রূপ দেখি সত্যনারায়ণের পাঁচালী প্রভৃতিতে। কিন্তু নূতন পদ্ধতিতে পাঁচালী কীর্তনের অনুসরণ করল। তারপর পাঁচালীতে এসে আবার জুটল লোক-রঞ্জনের জন্য রসিকতা, হাল্‌কা তামাসা। এদিকে 'যাত্রা' উদ্ভূত হল—দেবদেবীর উৎসব উপলক্ষ্য করেই যাত্রা প্রথমে অভিনীত হত, আর তাতে তিন জন ছিল অভিনেতা। প্রথম কৃষ্ণলীলাই ছিল যাত্রার বিষয়বস্তু, বিশেষ করে কালীয়দমন পালা। তারপর দেখা দিল চৈতন্য-যাত্রা, চণ্ডীযাত্রা। শেষে বিদ্যাসুন্দর-যাত্রাও এল ; উনিশ শতকে এল ক্রমে পৌরাণিক পালা ও থিয়েটারি যাত্রার যুগ। 'তরজা' আরবী কথা—অনেকটা ছড়ার মতো জিনিস। চৈতন্যদেবের সময়েও তার প্রচলন ছিল—পুরাতন কালের 'প্রহেলিকা' থেকেই তার পরিণতি। পরে তরজা অর্থ দাঁড়াল ছড়ায় গানে উত্তর-প্রত্যুত্তর। 'কবিগান'ও অবশ্য গানে উত্তর-প্রত্যুত্তর, কিন্তু দুই দলে। কৃষ্ণলীলা কবি-গানের বিষয়বস্তু, গানের ভাগ-বিভাগও ছিল বেশ নিয়ম-বাঁধা। কবি-গানের এই উত্তর-প্রত্যুত্তর চরমে উঠত যে অংশে, প্রথমে তারই নাম ছিল 'খেড়ু' বা 'খেউড়'। ভারতচন্দ্রের যুগেও তা বেশ একটা আকর্ষণীয় জিনিস ছিল। উনিশ শতকের শেষে তা যা দাঁড়াল, সে অর্থেই আমরা এখন খেউড় শব্দটা প্রয়োগ করি। সে শতাব্দীতেই কবিগানও তরজা 'লড়াই'তে পরিণত হয়—পূর্ববাঙ্‌লার 'কবি' এখনও অনেকটা লড়াই, চলিত নামও 'কবির লড়াই'।

'সারি' (শারি) গান, জারি গান, লোকগীতি এখনও অচল হয় নি, বিশেষত পূর্ববঙ্গে। কিন্তু পশ্চিম বাঙ্‌লার নূতন নাগরিক সংস্কৃতির বিশেষ পরিচয় হল 'আখড়াই'তে। কবি-গানকে পাঁচালী-কীর্তনের ঢঙ ছাড়িয়ে নূতন করে ঢালাই করে কলিকাতায় মহারাজ নবকৃষ্ণ উদ্ভাবন করলেন 'আখড়াই'য়ের। তিনটি মাত্র গানে তা গঠিত : প্রথম 'মালসী', তারপর প্রণয়গীতি (মিলন বিষয়ক), শেষ 'প্রভাতী' (মিলনাবশেষ বিচ্ছেদের আক্ষেপ)। এই আখড়াই রীতিমত কালো-য়াতি ব্যাপার, নানাবিধ যন্ত্রযোগে তা গীত হত। কাজেই তা আরও ছেঁটেকেটে সরল করে তৈরী হল (উনিশ শতকে) মধুপাকের 'হাফ্‌-আখড়াই'। কবিগান, আখড়াই, পাঁচালী,—এসবের পুরো মরসুম পড়ে উনিশ শতকের প্রথম দিকে (ডঃ এস্‌. কে. দে'র ইংরেজিতে লেখা উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্‌লা সাহিত্য

দ্রষ্টব্য) ;—সেজন্যই রাম বসু, আণ্টুনি ফিরিঙ্গি, ভোলা ময়রা প্রভৃতি 'কবি'দের নাম,—শ্রীদাম দাস, রাম ঠাকুর, কলুইচন্দ্র সেন, নিধিরাম গুপ্ত, প্রভৃতির আখড়াইতে দান,—কিম্বা দাশরথি রায়ের পাঁচালীতে কীর্তি—এখানে আলোচ্য নয়, সেই ধারাটা শুধু এখানে লক্ষণীয়।

অধ্যাত্ম গীত

অবশ্য সঙ্গীতের আর-একটা ধারাও সমানেই বয়ে চলেছিল। তাকে বলা চলে অধ্যাত্ম-ধারা। চর্যাপদ থেকে তা বরাবর বয়ে আসছিল, বৈষ্ণবপদাবলীও তারই একটা স্রোত। এ-ধারাকে বলতে পারি—সাধক-গীতিধারা। কিন্তু গতানুগতিক হলেও তাকে গতানুগতিক বললে সবটুকু বলা হয় না। বৈষ্ণব রাগাত্মক পদ আসলে সেই সাধকগোষ্ঠীর একটা প্রকাশ। সম্প্রদায়গত রচনায় এ ধারা সীমাবদ্ধ থাকে না। সুফী সাধকেরা তাতে প্রেমের নূতন আবেগ প্রবাহ সঞ্চার করেন। আউল-বাউল-দরবেশ-সাঁই প্রভৃতি নানা সাধকগোষ্ঠী এই ধারায় নিজেদের অধ্যাত্ম অবদান জুগিয়ে যান। অষ্টাদশ শতকে রামপ্রসাদ শাক্ত-পদাবলীর শ্রেষ্ঠ কবি হিসাবে আবির্ভূত হলেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও তাঁর বংশধর রাজা শিবচন্দ্র, কুমার নরচন্দ্র প্রভৃতি, রাজা নন্দকুমার, বর্ধমানের দেওয়ান রঘুনাথ রায় এবং শেষে কমলাকান্ত (ভট্টাচার্য) শাক্ত সঙ্গীতের ধারাকে পরিপুষ্ট করেন। বিংশ শতকে এসে রবীন্দ্রনাথের রসপিপাসু চিত্ত এসব অধ্যাত্ম সঙ্গীতের, বিশেষ করে বাউল গানের পুনরাবিষ্কার করে; আর তখন থেকে আমরা এই পরমাশ্চর্য লোক-গীতিধারার অবজ্ঞাত স্রষ্টাদের কয়েকজনার নামও আয়ত্ত করতে পেরেছি—যেমন লালন ফকির, মদন বাউল, গগন হরকরা, ফকির ভোলা শা, বিশা ভুঞিমালী, গঙ্গারাম বাউল, ইত্যাদি। এঁরা অবশ্য সবাই উনবিংশ শতকের মানুষ। কিন্তু অষ্টাদশ শতকেও সাধনার এই ধারা—সাহিত্য ও সঙ্গীতের এই সংযুক্ত স্রোত—লোক-সমাজের অন্তস্তলে পূর্বের মতোই প্রবাহিত হত। সাহিত্য বা ইতিহাসে তার মূল্যটা 'বাবুদের' আখড়াই বা পাঁচালীর থেকে বড় বলেই প্রমাণিত হয়েছে।

বাস্তব ঘটনার আখ্যায়িকা

যতই আত্মবিস্মৃত হোক 'নবাবী আমলের' শাসক-বর্গের ভাগ্যবানরা, লোকচিত্তে কঠিন সত্যের অস্তিত্ব ছায়াপাত করেছে তখনো। কিন্তু সে ছায়াকে

বোঝাবার বা সাহিত্যিক রূপ দেবার মতো শক্তি সাধারণের ছিল না। অবশ্য লেখকেরা কেউ কেউ তা লক্ষ্য করেছেন।

"মহারাষ্ট্র পুরাণ": গঙ্গারাম দত্তের 'মহারাষ্ট্র পুরাণ' এ কারণেই বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব প্রয়াস। নড়াইলের গঙ্গারাম দত্ত বড় একখানা রামায়ণেরও কবি। মহারাষ্ট্র পুরাণে আছে বর্গীর হাঙ্গামায় উৎপীড়িত (খ্রীঃ ১৭৪২-৪৩) পশ্চিমবঙ্গের কথা, আলিবর্দীর পরাভব, জনসাধারণের বিরোধিতায় ভাস্কর পণ্ডিতের পরাভব ও নিধন। এই জনসাধারণের বিক্ষোভ যদি সত্যই এতটা প্রবল হয়ে থাকে, তা বলে পলাশীর পরে সে জনসাধারণ গেল কোথায়? হয়তো তাদের খুঁজতে হবে মজনু ফকিরের পিছনে, সন্ন্যাসী বিদ্রোহের 'দস্যুদের' পাশে। সেই যাই হোক্, গঙ্গারাম দত্ত কাহিনী বলেছেন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে—সমসাময়িক কালের একটা সজীব চিত্র এ কাব্য, 'ঐতিহাসিক কাব্য' হিসাবেও বাঙলায় অভিনব। গঙ্গারামের কবিত্ব সাধারণ, আখ্যান ঢালাই হয়েছে পুরাণের রীতিতে—ব্রহ্মা, শিব, নন্দী, এসবের সহায়ে এ গল্পের অবতারণা। কিন্তু বিষয়বস্তু নূতন—তা আগামীকালের আভাস। উত্তর-বঙ্গের রতিরাম দাসের 'দেবীসিংহের অত্যাচার' বিষয়ক ছড়ায় ও মজনু ফকিরের অত্যাচারের ছড়ায় এই ঘটনা-মূলক কাব্যধারার আরও পরিচয় পাই। ঊনবিংশ শতকে এরূপ দুই ধারা স্পষ্ট হয়ে উঠল—গদ্যে 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' প্রভৃতি আর পদ্যে ত্রিপুরার 'রাজমালা' ঐতিহাসিক কাব্যে; 'বানের ছড়া', 'রাস্তার ছড়া', 'সাঁওতাল হাঙ্গামার ছড়া' (রাইকৃষ্ণ দাসের লেখা) বাস্তব ঘটনার কাব্য। এসব বেড়েই চলে। এর মধ্যে বিশেষ লক্ষণীয় হল রঙ্গপুরের কৃষ্ণহরি দাসের—'নয় আনার ছড়া'। দশশালা বন্দোবস্তের পূর্বে নয়-আনার জমিদার প্রজাদের দাবীর জোরে নিজের জমিদারীর পুনরুদ্ধার করেন। প্রজাশক্তির এই সংহতি ও সমাবেশ—একটা নূতন ঘটনা। রঙ্গপুরের রতি রায় দেবীসিংহের অত্যাচারের ছড়ায়ও এরূপ প্রজা-বিদ্রোহের কথা বলেছেন। সন্ন্যাসী বিদ্রোহের কেন্দ্রও রঙ্গপুর। এসব ঘটনা থেকে বুঝতে পারি—গ্রাম্যকবি বুঝেছেন প্রজাশক্তি তুচ্ছ শক্তি নয়।

এ ধারারই মধ্যে একটা স্থান বিজয়কুমার সেনের লেখা—ভূ-কৈলাসের রাজা জয়নারায়ণ ঘোষালের পিতা কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষালের গঙ্গাপথে কাশীযাত্রার কথা 'তীর্থমঙ্গল' খ্রীঃ ১৭৭০-এ লেখা—গঙ্গার দুপারের গ্রাম ও নগরের তথ্যবহুল বর্ণনা হিসাবে এ গ্রন্থও একটি নূতন জিনিস। অবশ্য জয়নারায়ণ ঘোষাল তখন

বাঙালী সমাজের একজন শীর্ষস্থানীয় পুরুষ হয়ে ওঠেন, সমাজকল্যাণের কর্মেও তিনি এগিয়ে যান। এসব কাব্যের মধ্যে আমরা দেখি তথ্য-চেতনা,—তা আগামী যুগেরই বীজ—যুগসন্ধির মধ্যে নূতনের ক্ষীণ ছায়া।

কালান্তরের আয়োজন

অবশেষে নবাবী আমলের জের টানাও ফুরিয়ে এল। তা ফুরিয়ে আসারই কথা। কারণ, ১৭৫৭'র পরে যে শক্তি রাজ্যলাভ করে তার কর্মচারী-প্রতিনিধিরা যতই 'নাবুবী' করুক, সে শক্তি নবাবী শক্তি নয়, সে সামন্তশক্তি নয়; সে উদ্যোগী বণিক-শক্তি—পৃথিবীতে যারা ক্ষমতাবলে আধুনিক সভ্যতার কর্ণধারত্ব লাভ করেছে। সেই উদ্যোগ, সাহস, বাস্তববোধ, এমনকি দূরদৃষ্টি ওয়ারেন্ হেস্টিংসের মতো ইংরেজদেরও কম ছিল না। শত অত্যাচার ও পীড়নের সঙ্গে সঙ্গেও তাই কোম্পানি অষ্টাদশ শতকের শেষপাদে শাসন-কর্মে একটা শৃঙ্খলা স্থাপন করেছিল, বিচারে-আচারে নিয়ম-নীতি প্রবর্তন করেছিল, এমন কি, এ দেশের নিয়ম-কানুন, ধর্ম ও সংস্কৃতি পর্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আয়ত্ত করতে অগ্রসর হয়েছিল। নাথানিয়াল ব্রাসে হালহেডকে দিয়ে হেস্টিংস ফারসি থেকে হিন্দু আইন এই উদ্দেশ্যে সংকলিত করান। হেস্টিংস বাঙ্লায় ও ফারসিতে অভিজ্ঞ ছিলেন, আরবী-উর্দুতেও তাঁর জ্ঞান ছিল। কোম্পানির কর্মচারী চার্লস্ উইলকিন্‌স বাঙ্লা মুদ্রণের জন্য বাঙ্লা হরফ প্রথম কাটলেন। পর্তুগীজ বণিক ও পাদ্রীদের কাছ থেকে পাশ্চাত্ত্য মুদ্রণ-পদ্ধতির কথা জানলেও ভারতের কোন রাজা বা নবাব মুদ্রাযন্ত্রের বিষয়ে বা হরফ নির্মাণে কিছুমাত্র উদ্যোগী হন নি। হালহেডের বাঙ্লা ব্যাকরণ মুদ্রিত হল ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে, তাতে বাঙ্লা কথা বাঙ্লা হরফে প্রথম মুদ্রিত হয়। পর্তুগীজরা বাঙ্লা বই ছেপেছিল লিস্‌বন থেকে, রোমান হরফে পর্তুগীজ পাদ্রী ম্যানোয়েল দা আসুম্পসাঁওএর বাঙ্লা-পর্তুগীজ ব্যাকরণ ও শব্দকোষ, এবং 'কৃপারশাস্ত্রের অর্থভেদ' নামক গদ্যে প্রশ্নোত্তর-গ্রন্থ লিস্‌বন থেকে ১৭৪৩ খ্রীঃ মুদ্রিত হয়। রেনেলের 'বেঙ্গল এটলাস' প্রকাশিত হয় ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে, বাঙ্লা দেশের এই বৈজ্ঞানিক জরীপের তুলনা নেই। এই সময়ে (১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে) স্থাপিত হয় কলিকাতা মাদ্রাসা। আর অল্পকালের মধ্যেই স্যার

উইলিয়ম জোন্‌সের উদ্যোগে উইলকিন্‌সের সহকারিতায় প্রতিষ্ঠিত হয় এশিয়াটিক সোসাইটি অব্ বেঙ্গল—প্রাচ্যবিদ্যার প্রথম মহাগবেষণাগার।

সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক থেকে বিচার করলে বলতে হবে, কি ইউরোপে, কি ভারতে, মুদ্রাযন্ত্রের প্রবর্তনের সঙ্গেই মধ্যযুগের অবসান অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে—জ্ঞানবিজ্ঞানের দ্বার সকলের পক্ষে উন্মুক্ত হয়। জ্ঞান ও বিদ্যা আর শাসক-শ্রেণীর একচেটিয়া থাকতে পারে না; কালান্তর তখন অনিবার্য। হালহেডের ব্যাকরণ না হোক, খ্রীঃ ১৮০০ অব্দে শ্রীরামপুর মিশন ও শ্রীরামপুর মিশন প্রেস প্রতিষ্ঠার পরে বাঙ্‌লা গ্রন্থ মুদ্রণের সূচনা হল। ঠিক সেই বৎসরই স্থাপিত হল ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ, উইলিয়ম কেরী তার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হলেন, বাঙ্‌লা গদ্যে গ্রন্থ রচনা আরম্ভ হল। প্রকৃতপক্ষে বাঙ্‌লা গদ্য জন্মগ্রহণ করল,—আর জন্মগ্রহণ করল বাংলা সাহিত্যের আধুনিক কাল।

খ্রীঃ ১৮০০ অব্দে পৌঁছে আমরা বুঝতে পারি—নবাবী আমল নেই, তার যুগসন্ধির অন্ধকারও বিলীয়মান, কালান্তর সমাগত। অথচ সে কালান্তর অসম্পূর্ণ থাকতে বাধ্য। কারণ, যে সময় ফরাসী বিপ্লবের রক্ত-প্লাবনে ইউরোপের দেশে দেশে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা ভেসে গেল, জাতীয়তা, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও 'মানুষের অধিকার' যুগাদর্শ হয়ে উঠল, এবং নব নব যন্ত্র আবিষ্কারে ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্লবের (খ্রীঃ ১৭৬৪-১৮১৫) পথ প্রস্তুত হল,—ঠিক সেই সময়েই (১৭৯৩) বিদেশী রাজশক্তি কর্ণওয়ালিসী ব্যবস্থায় বাঙ্‌লা দেশে জমিদারীতন্ত্রের পত্তন করে এ দেশের ভগ্নপ্রায় সামন্ত-ব্যবস্থাকে পাকা করে গাঁথল, রাষ্ট্রে বাণিজ্যে এদেশীয় মানুষের সকল উদ্যোগ-অধিকার নিষিদ্ধ করে এদেশের সমাজকে আরও পঙ্গু ও অসহায় করে দিলে। পিছনে তাকিয়ে দেখি—মধ্যযুগের বাঙ্‌লা সাহিত্য সপ্তদশ শতকে যে ক্ষেত্র রচনা করছিল অষ্টাদশ শতকে তা আবাদ হয় নি—সম্মিলিত সাধনায় জাতীয় সাহিত্য গড়ে উঠতে এখনো বাকী। এর পরে সাম্রাজ্যবাদী ভেদনীতির কালে বিক্ষুব্ধ ভগ্নোদ্যম মুসলমান ও কেরানি-ভাগ্যে পরিতৃপ্ত হিন্দু বাঙালী ভদ্রলোক আর একযোগে জাতীয় সাহিত্য ও জাতীয় জীবন গঠনের সুযোগ লাভ করবে কি করে? সম্মুখে তাকিয়ে দেখি—যে পল্লী-সমাজের বুকে বাঙালী সংস্কৃতি ও সাহিত্য জন্মলাভ করেছিল, তা ছেড়ে এবার ইংরেজ আমলে তার নূতন আসর রচনা হচ্ছে ইংরেজের তৈয়ারী কলকাতা শহরে। মহাশক্তি-শালী বণিক-সভ্যতার আঘাতে ভারতের পল্লী-অর্থনীতি ও পল্লী-সমাজ ক্রমশঃ

ভেঙে যাবে ; নূতন বণিক-সভ্যতার অবাধ মানসিক ও আধ্যাত্মিক দানে—ইউরোপীয় সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসাদে, বাঙালী মানসেও কালান্তর সমাসন্ন হবে, নূতন সভ্যতার আস্বাদনে বাঙালীর প্রাণ চঞ্চল হবে; অথচ বাস্তব ক্ষেত্রে বাঙালী জীবন থাকবে ঔপনিবেশিক সমাজের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নিগড়ে আবদ্ধ। উদ্যোগ-অধিকার-বঞ্চিত সেই বাঙালী উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তের পরিচালনায় এরূপ অপরিসর জীবন-ক্ষেত্র থেকে বাঙালী সংস্কৃতি কিরূপে আহরণ করবে স্বদেশীয় প্রাণরস ও গ্রহণ করবে আধুনিক সভ্যতার দিগ্‌দেশ-প্লাবী আশীর্বাদ—নূতন জীবন-যাত্রা, নূতন জীবন-দর্শন, এবং নূতন সাহিত্যাদর্শ?

সেই প্রশ্নেরই উত্তর বাঙলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ।

নির্ঘণ্ট

বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা

দ্বিতীয় খণ্ড

নবযুগ

নিবেদন

'বাঙ্‌লা সাহিত্যের রূপরেখা' দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হল। প্রথম খণ্ডে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙ্‌লা সাহিত্য আলোচিত হয়েছিল, তার 'নিবেদনে' আমি আমার দৃষ্টিভঙ্গি ও আলোচনা-পদ্ধতির কথা যা বলেছি, তার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এই খণ্ডে আধুনিক যুগের বা নবযুগের বাঙ্‌লা সাহিত্যের আলোচনা আরম্ভ হল—মাত্র ইং ১৮০০ থেকে ইং ১৮৫৭-৫৮ পর্যন্ত কালের বাঙ্‌লা সাহিত্যের কথাই এ ভাগে বলা হয়েছে। নবযুগের বাঙ্‌লা সাহিত্যের পক্ষে এ কাল 'প্রস্তুতির পর্ব'; 'প্রকাশের পর্ব' বা 'সৃষ্টির পর্ব' আসে এর পরে—মধুসূদন-বঙ্কিমের সঙ্গে।

সাহিত্য-সৃষ্টির দিক থেকে এ পর্ব বৃহৎ নয়, এ জন্য সাহিত্য-রসিকেরা এ পর্বের যথার্থ গুরুত্ব অনেক সময়ে উপলব্ধি করেন না। কিন্তু 'বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস মূলতঃ বাঙলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসের একটি অঙ্গ এবং বাঙালীর ইতিহাসেরই একটি শাখা'—এই মূল দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই এ পর্বও আমি আলোচনা করেছি। তাই শুধু রস-বিচারে আমি আলোচনা আবদ্ধ রাখি নি; বরং তৎকালীন বাঙালী জীবনের সমগ্র পরিবেশটিই এ জন্য আভাসিত করবার প্রয়োজন বোধ করেছি। অবশ্য মুখ্যতঃ যা সাহিত্যের রূপরেখা, তার পরিমিত আয়তনকেও একেবারে অতিক্রম করা আমার অভিপ্রায় ছিল না। এই দুই অভিপ্রায়ের মধ্যে সংগতি স্থাপন করবার জন্যও চেষ্টার ত্রুটি করি নি, তবু ত্রুটি থেকে গিয়েছে। কারণ অনেক সময়ে মনে হয়েছে কোনো কোনো বিষয় আমাদের শিক্ষিত সাধারণের নিকট যেমন সুবিদিত, অন্য কোনো কোনো বিষয়ের গুরুত্ব তেমনি তাঁদের অগোচর। এ ধারণার বশেই এই খণ্ডে কোথাও তথ্যের আধিক্য, কোথাও তার বিশদ উল্লেখ বা পুনরুল্লেখ, কোথাও সে তুলনায় বহুবিদিত তথ্যের অনধিক আলোচনা যা রইল এবারের মত আমি তা এই আকারেই উপস্থাপিত করলাম—শিক্ষিত সাধারণের তা গোচরীভূত হোক। তাঁদের মতামত ও সমালোচনা লাভ করলে তদনুযায়ী বারান্তরে এই আলোচনা পরিমার্জিত করা যাবে।

বলা বাহুল্য, আমি কোনো মৌলিক পুঁথিপত্র আবিষ্কার করি নি। কিন্তু এ পর্ব, এবং সমগ্র উনিশ শতকের বাঙলা সাহিত্য, সংস্কৃতি ও বাঙালী জীবন সম্বন্ধে আমার দৃষ্টিভঙ্গিতে মৌলিকত্ব থাকবার সম্ভাবনা, আলোচনা পদ্ধতিতেও তাই মৌলিকত্ব থাকতে বাধ্য। সে সবের মূল্য পাঠক বিচার করবেন।

এ পর্বের লেখক ও গ্রন্থাদির সম্বন্ধে তথ্যগত অনিশ্চয়তা অনেকাংশে বিদূরিত হয়ে এসেছে। সে জন্য বিশেষভাবে স্মরণীয় পথিকৃৎগণ—প্রথম ডঃ সুশীলকুমার দে, পরে স্বর্গীয় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। দু'জনারই গ্রন্থাদির, বিশেষতঃ 'সাহিত্য-সাধক চরিতমালার' ও 'দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালার' আমি পুনঃ-পুনঃ শরণ নিয়েছি। ডঃ সুকুমার সেন, মনোমোহন ঘোষ, সজনীকান্ত দাস, যোগেশচন্দ্র বাগল প্রমুখ পণ্ডিতেরাও বহু ক্ষেত্রে আমার পথ-প্রদর্শক। নানা বিষয়ের আলোচনায় মুদ্রণকালে ও তৎপূর্বে, আমাকে বিশেষ রূপে উৎকৃত করেছেন আমার পত্নী শ্রীযুক্তা অরুণা হালদার, অগ্রজ রঙ্গীন হালদার. অধ্যাপক দেবীপদ ভট্টাচার্য, বন্ধুবর সুনীল চট্টোপাধ্যায় ও অনিল কাঞ্জিলাল। তা ছাড়া জ্ঞাতে অজ্ঞাতে কত স্বর্গত ও জীবিত, কত মনস্বী সুহৃদ ও বন্ধুর নিকট যে আমি ঋণী তা নিজেও জানি না। যাঁদের কথা জানি তাঁদের নাম গ্রন্থমধ্যে স্বীকার করেছি। যদি তাতে ত্রুটি থেকে থাকে সে অনিচ্ছাকৃত অপরাধ আমাকে জানালে বাধিত হব। আমার খ্যাতনামা প্রকাশক ও প্রকাশালয়ের বিচক্ষণ কর্মী বন্ধুদের নিকট আমি নানা দিকে কৃতজ্ঞ।

এ আলোচনা অসম্পূর্ণ, ভ্রমপ্রমাদও তাতে থাকা সম্ভব। আমার আশা সমালোচকগণ তা প্রদর্শন করে আমাকে উপকৃত করবেন। শিক্ষিত সাধারণের নিকট প্রত্যাশা—তাঁরাও যুগ-জিজ্ঞাসায় ও মূল গ্রন্থাদি পাঠে আগ্রহ বোধ করবেন। তা হলে পরবর্তী সৃষ্টিমুখর কালের জীবন-পরিচয়ও সাহিত্য-আলোচনায় লেখক উৎসাহ লাভ করবেন। ইতি—

গোপাল হালদার

সংকেত ও গ্রন্থপঞ্জী

গ্রন্থোল্লিখিত লেখক ও পুস্তক-পত্রিকাদির নাম পঞ্জী মধ্যে দ্রষ্টব্য। কোনো কোনো লেখকের ও পুস্তকের নাম বহুবার উল্লেখিত হওয়ায় সংক্ষেপিত হয়েছে।

সংকেত

সাঃ সাঃ চরিত—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ প্রকাশিত চরিত সমূহ।

ডঃ দে (সুশীলকুমার)—'সাহিত্যের ইতিহাস' বা Bengali Literature =History of the Bengali Literature in the 19th Century by Dr. S. K. De.

ডঃ সেন (সুকুমার)—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম ও ২য় খণ্ড)

" " —বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য

বঃ সাঃ পঃ=বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্

বঃ সাঃ পরিচয়=বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়—ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত।

কঃ বিঃ=কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

গ্রন্থপঞ্জী

মূল গ্রন্থাদি, দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা ও সাহিত্য পরিষদের দ্বারা পুনর্মুদ্রিত সংকলন গ্রন্থাদি ও উপরোক্ত গ্রন্থসমূহ ব্যতীত কয়েকখানি আলোচনা-গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য :

কাজী আবদুল ওদুদ—বাংলার জাগরণ (বিশ্বভারতী)

সজনীকান্ত দাস—বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ (মিত্র ঘোষ)

Amit Sen—Notes on Bengali Renaissance (N. B. Agency)

মনোমোহন ঘোষ—বাংলা সাহিত্য

যোগেশচন্দ্র বাগল—উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা

সূচী

নবযুগ

প্রথম ভাগ—প্রস্তুতির পর্ব (খ্রীঃ ১৮০০—খ্রীঃ ১৮৫৭)

প্রথম ভাগ

প্রস্তুতির পর্ব

(খ্রীঃ ১৮০০—খ্রীঃ ১৮৫৭)

শিক্ষা ও সংঘাত

প্রথম পরিচ্ছেদ

ঔপনিবেশিক পরিবেশ

ইং ১৭৫৭ অব্দে পলাশীতে ইংরেজ রাজত্বের সূত্রপাত হয়েছিল। সে রাজ্য আইনতঃ আরম্ভ হয় ইং ১৭৬৫তে, কোম্পানির বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভে। ভারতের আধুনিক ঐতিহাসিকরা ইং ১৭৬৫ থেকেই এ দেশের আধুনিক কাল গণনা করেন। তার মধ্যে ১৭৬৫ থেকে সিপাহী যুদ্ধের শেষ ১৮৫৮ পর্যন্ত কালকে বলা হয় 'কোম্পানির আমল'। ইং ১৮৫৮র ১লা নভেম্বর ব্রিটেনেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়া স্বয়ং ভারত-শাসনভার গ্রহণ করেন; ১৮৭৭ সালে তিনি ভারতসম্রাজ্ঞী বলে ঘোষিত হন। ১৯৪৭ পর্যন্ত ভারত-শাসন ব্রিটিশরাজের অধীনেই চলে। খ্রীঃ ১৮৫৮ থেকে খ্রীঃ ১৯৪৭ পর্যন্ত কাল ব্রিটিশ-রাজের শাসন-কাল ('India under the Crown') বা 'ব্রিটিশ-রাজের আমল'।

যুগ ও পর্ব: অবশ্য খ্রীঃ ১৭৫৭ থেকে খ্রীঃ ১৯৪৭ পর্যন্ত এই একশ' নব্বুই বৎসরকে সাধারণভাবে 'ইংরেজ রাজত্ব' বলা হয়। আর এক হিসাবে এই ইংরেজ রাজত্ব-কালকে (১৭৫৭ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত) 'ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার যুগ'-ও বলা চলে—এটি সামাজিক-রাজনৈতিক গণনা। সেই দৃষ্টিতে দেখলে ইং ১৭৫৭ থেকে ইং ১৮৫৮ পর্যন্ত কালকে ব্রিটিশ 'বণিক-পুঁজির (Merchant Capital) শাসন-পর্ব' এবং ইং ১৮৫৮ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত কালকে ব্রিটিশ 'শিল্প-পুঁজির (Industrial Capital) শাসন-পর্ব'ও বলা যায়। তবে ১৮৯০এর সময় থেকে এই 'শিল্প-পুঁজি' যে পৃথিবীব্যাপী 'সাম্রাজ্যতন্ত্র' (Imperialism)-এর রূপ গ্রহণ করতে থাকে তাও স্মরণীয়। বলা বাহুল্য, এসব তারিখ চুলচেরা ভাবে ধরা উচিত নয়, মোটামুটি তা এক-একটা পর্বের সূচক মাত্র। না হলে ব্রিটিশ শিল্প-মালিকেরা ১৮৫৮র পূর্বেই ভারত-শাসনে প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিল, তাতে সন্দেহ নেই। মনে রাখা দরকার—ঘড়ির কাঁটা দেখে যুগের আরম্ভ হয় না, যুগের সমাপ্তিও হয় না; প্রকাশেরও পূর্বে চলে আয়োজন, আর সমাপ্তিরও শেষে থাকে জের বা পরিশিষ্ট।

এ সব রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পট-পরিবর্তনের মূল্য অবশ্য বাঙলা সাহিত্যে প্রত্যক্ষ নয় পরোক্ষ মাত্র। এমন কি, শিক্ষা ও সংস্কৃতির অন্যান্য বিভাগে সে প্রভাব যতটা স্পষ্ট, সাহিত্য ও সুকুমার-শিল্পের ক্ষেত্রে তা ততটাও স্পষ্ট নয়। তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। নবাবী আমলের বাঙলা সাহিত্যে যেমন সিরাজদ্দৌলা-মীরজাফর-মীরকাশেমের নাম নেই, তেমনি ইংরেজ আমলের বাঙলা সাহিত্যেও ক্লাইব-হেষ্টিংস্ থেকে শুরু করে ডালহৌসি-ক্যানিং কেন, লিন্‌লিথ্‌গো-ওয়েভেলদেরও কোনো পরিচয় নেই। আধুনিক বাঙলা সাহিত্যও জন্মেছে এবং বর্ধিত হয়েছে বাঙালী-সমাজের বুকে। বাঙালী-সমাজে একালে যে বিরাট পরিবর্তন ঘটেছে তা না বুঝলে উপলব্ধি করা যায় না যে, কেন, কি ঘাত-প্রতিঘাতের সূত্রে পূর্ব যুগের বাঙলা বা ভারতীয় সাহিত্যের এমন রূপান্তর ঘটল। যথাসম্ভব সেই সমাজের ইতিহাসের সঙ্গে মিলিয়েই তাই এই সাহিত্যেরও পর্ব-বিভাগ যুক্তিযুক্ত। সেদিক থেকে আমরা গোটা অষ্টাদশ শতাব্দীকে সাধারণভাবে 'নবাবী আমল' (খাশ নবাবী আমল + 'নাবুবী আমল') বলেছি। ইং ১৭৯৩এর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরেই অবশ্য আর-একটা নূতন সামাজিক ব্যবস্থার সূত্রপাত হয়। তবুও মোটামুটি ইং ১৮০০ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত কালকেই বাঙলায় 'ঔপনিবেশিক মধ্যবিত্তের যুগ' বা বাঙালী 'ভদ্রলোকের যুগ' বলে গ্রহণ করেছি। অবশ্য ১৮১৭ (হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা) থেকে ১৯১৮ (প্রথম মহাযুদ্ধের অবসান) পর্যন্ত কালটা তাঁদের প্রতিপত্তির কাল। এই কালেই পড়ে বাঙলার 'জাগরণের যুগ' বা যাকে বলা হয় বাঙলার রিনাইসেন্স। তন্মধ্যে ১৮০০ থেকে প্রায় ১৮৫৭-৫৮ পর্যন্ত কালকে বলব তার 'প্রস্তুতির পর্ব'; ইং ১৮৫৮ (বা ইং ১৮৫৯) থেকে প্রায় ইং ১৮৯৩ পর্যন্ত কালকে বলতে চাই 'প্রকাশের পর্ব', তখন 'বাংলার জাগরণের' বা 'বাঙলার রিনাইসেন্সের' ভরা জোয়ার। সে জোয়ার ১৮৯৩ কেন, ১৯০৫ পর্যন্ত দুকূল ছাপিয়ে প্রবাহিত। তথাপি বঙ্কিমের পরবর্তী কালকে (বিশেষ করে ১৯০৫এর 'স্বদেশী যুগে'র সময় থেকে) জাতীয় 'অভিযানের পর্ব' বলাই শ্রেয়ঃ। অবশ্য তার মধ্যে আরও ভাগ-বিভাগ আছে। যেমন, ১৯০৫ থেকে ১৯১৮ 'স্বদেশীর যুগ'; ১৯১৮ থেকে ১৯৪২ 'বিশ্বসংকটের যুগ'; তারপর 'কালান্তর'। ইং ১৯১৮র সময়েই 'কালান্তরের' বীজও উপ্ত হয়; কিন্তু তা অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে ১৯৪১-৪২এর সময়ে।

মানুষের নাম দিয়ে যদি এসব পর্বকে চিনতে হয় তা হলে সে নাম হবে সাহিত্যের যুগ-পুরুষদের নাম। যেমন, প্রথম, রামমোহন-বিদ্যাসাগরের যুগ (১৮০০-১৮৫৮); দ্বিতীয়, মধুসূদন-বঙ্কিমের যুগ (১৮৫৯-১৮৯৩); তৃতীয়, রবীন্দ্রনাথের যুগ (১৮৯৪-১৯৪১)। মোটামুটি ভাবে অবশ্য আমরা বাঙালী জীবনের এ যুগের আর একটা সাধারণ বিভাগও করি—তা হল 'উনবিংশ শতকের বাঙলা'—তার প্রথমার্ধ 'প্রস্তুতির পর্ব', দ্বিতীয়ার্ধ খাশ 'রিনাইসেন্স' অথবা 'প্রকাশের পর্ব'। এ খণ্ডের পরে 'বিংশ শতকের বাঙলা'। কাজ চালাবার পক্ষে এ বিভাগও বেশ সুবিধাজনক, যদিও এটা তারিখ-দাগা বিভাগ।

কিন্তু ১৭৫৭র রাজনৈতিক পরিবর্তনেই যে এই বাঙালী জীবন ও বাঙালী সমাজ বিশেষভাবে পরিবর্তিত হয়ে যায়—ক্লাইব্-হেস্টিংস্‌দের ভুলে গেলেও সে বিষয়ে সন্দেহ করা চলে না। পলাশীর ফলেই বাঙালী সমাজ মধ্যযুগ ছাড়িয়ে উঠতে লাগল। এ চেষ্টাটা সক্রিয় হয়ে উঠতে থাকে ১৮০০র পর থেকে। আর এই পলাশীর পাপে—বা ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার চাপে, যা'ই তাকে বলি,—সেই ১৯৪৭ পর্যন্তও বাঙালী জীবন আধুনিক কালের মধ্যে সম্পূর্ণ আত্মপ্রতিষ্ঠ হতে পারল না,—রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের এই ঔপনিবেশিক প্রেক্ষাপট ও ভাব-বিপর্যয়ের অভিনব রূপ তাই বিশেষ লক্ষণীয়। কারণ, আধুনিক বাঙলা-সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি তার সঙ্গে নানাসূত্রে জড়িত।

॥ ১ ॥ রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট

(১) **ইংরেজের রাজ্যবিস্তার:** ইং ১৮০০ থেকে ইং ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত যে বৎসরগুলি এল তাকে আর 'নাবুবী আমল' বলবার উপায় নেই। কারণ, ১৮০০ সালের পূর্বেই শাসকেরা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে বসেছেন। এমন কি, ১৭৯৩এর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করে রাজস্ব ব্যবস্থায়ও তাঁরা স্থায়িত্ব এনেছেন। আর, ১৭৭৩ সালের 'রেগুলেটিং অ্যাক্ট' ও ১৭৮৪ সালের পিট্-এর 'ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট' দ্বারা সেই বণিক্ কোম্পানিকে ব্রিটিশ রাজশক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন করে নিয়েছেন। ভারত-জয়ের ভূমিকা যখন এভাবে প্রস্তুত, উদ্যোগী পুরুষেরা তখন চুপ করে বসে থাকেন কি করে? রাজ্যবিস্তার ছিল ওয়েলেস্‌লির (১৭৯৮ থেকে ১৮০৫) প্রধান লক্ষ্য। মৈশুরের টিপু সুলতানের পতন ঘটল (ইং ১৭৯৯), নানা ফড়নবিশের মৃত্যুর (ইং ১৮০০) পরে মারাঠা

শক্তির পতন ঠেকাবার মত কেউ রইল না, অবশ্য সে পতন সম্পূর্ণ হল ইং ১৮১৯ অব্দে। তারপরও দেশীয় একটি রাজশক্তি ছিল—শিখ শক্তি; রণজিৎ সিং-এর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সেই শিখ শক্তিও ভেঙে পড়ল। ১৮৪৯এ পাঞ্জাবও কোম্পানির রাজ্যভুক্ত হয়ে গেল। যুদ্ধ-বিগ্রহ ও রাজ্যবিস্তারের ইতিহাসে আফগান যুদ্ধ, বর্মা যুদ্ধ, নেপাল যুদ্ধ, কিংবা ভারতমহাসাগরে ইংরেজ আধিপত্য স্থাপন—এসবও গণনীয়, কিন্তু সাহিত্যের বিচারে তার মূল্য কী? সমাজের হিসাবেই বা গুরুত্ব কতটুকু? এসব যুদ্ধ-বিগ্রহ, রাজ্যবিস্তার কলকাতা থেকেই পরিচালিত হয়েছে; কিন্তু কলকাতার বা বাঙলার বাঙালী সমাজকে তা প্রায় স্পর্শও করেনি। অবশ্য যুদ্ধ ও রাজ্যজয়ের আসল মাশুল জুগিয়েছে প্রধানতঃ বাঙলা ও অযোধ্যা। তাতে নিরুপায় প্রজাশ্রেণী শুধু শোষিতই হয়েছে। তবে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদ থেকে দু'চারজন বাঙালী কর্মী পুরুষ কমিসারিয়েটে কাজ ও ঠিকাদারী নিয়ে 'পশ্চিমে' গিয়েছেন, সেখানে বসবাস করেছেন, সেসব অঞ্চলে নতুন শিক্ষা-দীক্ষাও কিছুটা প্রচলিত করতে কালবিলম্ব করেন নি। ইংরেজের তল্পীদার রূপে সৌভাগ্য লাভ করলেও নানা সূত্রে পরবর্তী কালের জন্য (বিশেষ করে এই উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ও শেষ ভাগে) তাঁরা উত্তর ভারতে বাঙালীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করেন, সুশিক্ষা ও দেশপ্রীতিরও একটা ঐতিহ্য রচনা করে যান। অর্থাৎ, ইংরেজের রাজ্যজয়ে শিক্ষিত ও ভদ্রলোক বাঙালীর পরোক্ষ কিঞ্চিৎ সৌভাগ্য লাভও ঘটেছে। কিন্তু স্পষ্টতঃ কোনো রাজনৈতিক বা সামাজিক উল্লাস বা বিক্ষোভ এইসব যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে দেখা দেয় নি। যুদ্ধ ও রাজ্যজয় অপেক্ষা বরং কোম্পানির শিক্ষা-বিষয়ক প্রস্তাব (১৮১৩ ও ১৮৩৫) ও সমাজ সংস্কারের উদ্যোগে (১৮২৯, ১৮৪৩, ১৮৫৪ ইত্যাদি), বেণ্টিংক্-মেকলের প্রয়াসেই বাঙালী সমাজ বেশি চকিত ও বিচলিত হয়েছে। তার পূর্বেই অবশ্য বাষ্পীয় পোত (১৮২৪), তণ্ডুল কল (১৮২৬), গম-ভাঙার কল (১৮২৯), এমন কি নূতন তাঁত (১৮৩০) কলকাতার বাঙালীকে আকৃষ্ট করেছে। তারপরে ডালহৌসির (১৮৪৮-১৮৫৬) Conquest ও Consolidation—তাঁর দেশীয় রাজ্য গ্রাসের নীতি—বাঙলা দেশে উদ্বেগ সঞ্চার করেছিল কিনা তা বলা কঠিন। তবে তাঁর প্রারব্ধ Development, নব প্রবর্তিত টেলিগ্রাফ (১৮৫৪) ও রেলপথ (১৮৫৩) প্রভৃতি নূতন যন্ত্রশিল্পের আভাস নিয়ে এসে সমাজের সকল স্তরের মানুষকেই

চঞ্চল ও চমকিত করেছিল। অবশ্য ততক্ষণে নতুন শিক্ষারও যথেষ্ট প্রসার বাঙলায় ঘটেছে, 'জাগরণে'র জোয়ার দেখা দিয়েছে। কোম্পানির রাজনৈতিক আয়ু ডালহৌসির পরেই ফুরিয়ে গেল সিপাহী যুদ্ধে। বাঙলা দেশের ব্যারাক-পুরে পশ্চিমাঞ্চলের সিপাহীরাই এ বিদ্রোহের সূচনা করে ২৯শে মার্চ ১৮৫৭ সালে। উত্তরাপথ মাথা চাড়া দিয়ে উঠলেও বাঙালীর তখন বিশেষ মাথা খারাপ হয় নি, দেখা যায়। অথচ প্রায় তখন (১৮৫৮) বা একটু পরেই (১৮৫৯ অব্দে) নীলকরের অত্যাচার প্রতিরোধ করতে বাঙালী মাথা তুলে দাঁড়াল দেখতে পাই,—সিপাহী যুদ্ধের পরিণাম দেখেও সে নিস্তব্ধ থাকে নি।

এ কথা অবশ্য ঠিক নয় যে, ইংরেজের শাসন ও শোষণ বাঙলা দেশে সকলে মাথা পেতে মেনে নিয়েছে। বিদেশী ও বিধর্মীর শাসনের বিরুদ্ধে পলাশীর পর থেকে ছোট বড় অভ্যুত্থান চলেছে। যেমন, ঢাকার নবাব সরফরাজ খাঁ, বীরভূমের নবাব আসাদ জামাল খাঁ প্রভৃতি সামন্ত প্রধানদের বিদ্রোহ; সন্ন্যাসী ও ফকিরদের নেতৃত্বে নানা জাতের বৃত্তিহীন মানুষের অভ্যুত্থান; মেদিনীপুরের চুয়াড়দের বিদ্রোহ, শ্রীহট্টের সংঘাত (১৭৯৯), ও মুর্শিদাবাদের উজীর আলীর চক্রান্ত ও বিদ্রোহ (১৭৯৯) প্রভৃতি বিভিন্ন প্রচেষ্টা—তাতে মুসলমানও ছিল, হিন্দুও ছিল। ১৮০০এর পরেও কোম্পানির শোষণের ও উৎপীড়নের শেষ ছিল না। বরং দেশের অর্থনৈতিক বিপর্যয় আরও ঘনিয়ে ওঠে। কাজেই ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের (ইং ১৮০০ থেকে ইং ১৮৫৭) আগুন বাঙলা দেশে বরাবরই এখানে-ওখানে জ্বলে উঠেছিল, তা' দেখতে পাই (দ্রষ্টব্য: অধ্যাপক শশিভূষণ চৌধুরী লিখিত নবপ্রকাশিত ইংরেজী গ্রন্থ *Civil Disturbances during the British Rule in India (1765-1867)*; World Press, 1955)।

(২) **আন্তর্জাতিক সংযোগ:** এ সব আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ বা ভারতীয় যুদ্ধের চেয়ে ইংরেজের নিকট (১৭৯৩ থেকে ১৮১৪ পর্যন্ত) দুশ্চিন্তার কারণ হয়েছিলেন নেপোলিয়ন। পলাশীর পূর্বেই অবশ্য ফরাসী, ওলন্দাজ প্রভৃতি ইউরোপীয় বণিক্‌ শক্তিকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইংরেজ কোম্পানি প্রায় পরাস্ত করেছিল। তার প্রধান কারণ, ফরাসী বা ওলন্দাজ বণিক্‌ মণ্ডলের পিছনে রাজনৈতিক শক্তি যোগাবার মত যথার্থ বণিক্‌ রাষ্ট্র ('বুর্জোয়া স্টেট') তাদের স্বদেশে—ফ্রান্সে বা হল্যাণ্ডে—তখনো প্রতিষ্ঠিত হয় নি। বুর্জোয়া রাষ্ট্র

এতদিন পর্যন্ত (অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ) একমাত্র ব্রিটেনেই ছিল (ইং ১৬৮৮ অব্দের 'রক্তহীন বিপ্লবের' ফলে তা' স্থায়ী হয়)। একশত বৎসর পরে হলেও 'ফরাসী বিপ্লবের' (১৭৮৯-১৭৯৩) দুর্বার তেজ নিয়ে নেপোলিয়ন ফ্রান্সে সেই বুর্জোয়া রাষ্ট্রই গঠন করেন। তখন তিনি হারানো সুযোগ পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় পাশ্চাত্ত্য পৃথিবী মথিত করে বেড়ান। মৈশুর, মারাঠা প্রভৃতি ভারতীয় রাজশক্তির সঙ্গেও ফরাসী রাজশক্তির কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। শেষ ফলাফল যা' ঘটে তা' আমরা ইতিহাসে দেখতে পাই ; কিন্তু পরোক্ষে যে বীজ তাতে উপ্ত হয় তা' বিস্মৃত হবার মত নয়। বাণিজ্য ব্যাপারেই তার ফল প্রথম দেখা দিল। নেপোলিয়ন ইউরোপ খণ্ডের বাজার ব্রিটেনের বণিক্‌দের মুখের ওপর বন্ধ করে দেন। তার ফলে বাধ্য হয়েই ব্রিটেন তার নবাবিষ্কৃত যন্ত্রশক্তির বলে নিজ উৎপাদন বৃদ্ধি করতে অগ্রসর হল ; এবং সেই উৎপন্ন মালের বাজার হিসাবে ভারতবর্ষকেই আবার প্রধান আশ্রয়স্থল করে ফেলল। অর্থাৎ ব্রিটিশ শিল্পবিপ্লব ও ভারতের কুটিরশিল্পের সর্বনাশ নেপোলিয়নীয় যুদ্ধে নিকটতর হয়ে উঠল। সে যুদ্ধের দ্বিতীয় ফল আরও দুর্নিরীক্ষ্য—তা' রাজনৈতিক। ইংরেজের রাজ্যলাভে ভারতের ভাগ্য ব্রিটিশ রাজনীতির সঙ্গে জড়িত হয়ে যায়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেই কারণেই সমুদ্রপথ সুপ্রশস্ত হয়, বহির্বিশ্বের সঙ্গেও নূতন করে ভারতের একটা সম্পর্ক গড়ে উঠতে থাকে। নেপোলিয়নীয় যুদ্ধ সেদিকেও ভারতবাসীর দৃষ্টি খুলে দেয়। ইংলণ্ডের রিফর্ম অ্যাক্ট, দক্ষিণ আমেরিকায় স্পেনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, ইতালির নেপ্‌লস্‌-এ অষ্ট্রিয় সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে মুক্তিসংগ্রাম—রাজা রামমোহনকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। প্রজাতন্ত্রের 'তেরঙ্গা ঝাণ্ডা' ইয়ং বেঙ্গলের যুবকদেরও প্রবুদ্ধ করত। ফ্রান্সের স্থান উনিশ শতকে ক্রমে গ্রহণ করে রুশিয়া। ভারতবর্ষের মনে তারও একটা ছায়া ঐ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে পড়ে, তা' আমরা জানি (বালক রবীন্দ্রনাথ মাতার নির্দেশ মত সেই আশঙ্কা জানিয়েই পাঞ্জাব-প্রবাসী মহর্ষিকে প্রথম পত্র লিখেছিলেন, 'জীবনস্মৃতি' দ্রষ্টব্য)। বলা বাহুল্য, ব্রিটিশ রাজনীতি সম্বন্ধে বাঙালীর সশ্রদ্ধ আগ্রহ জেগেছিল ইংরেজী-শিক্ষা প্রচলিত হলে ; আর আন্ত-র্জাতিক রাজনীতিতে যথার্থ জিজ্ঞাসা তার পূর্বে জাগতে পারে না—সংবাদপত্রের প্রচার না বাড়লে শিক্ষিত সাধারণের সে বিষয়ে আগ্রহ জন্মে না। সামন্ত রাজারা শুধু চুক্তি ও চক্রান্তই করতে পারেন, তার বেশি সমকালীন

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বোঝবার মত ইচ্ছা বা সামর্থ্য তাঁদের ছিল না। এই জন্যই ভারতে 'আন্তর্জাতিক চেতনা'র গুরু বলতে হয় রাজা রামমোহন রায়কে।

(৩) **হুইগ্‌-টোরির ইণ্ডিয়া-পলিসি:** কিন্তু পরাধীন জাতির রাজনীতি নেই, কারণ রাষ্ট্র তার নিজের নয়। ভারত রাষ্ট্র ছিল কোম্পানির ব্যবসা। ব্রিটিশ রাজনীতিতে ভারত-ভাগ্য জড়িয়ে গেলে ব্রিটেনের হুইগ্‌-টোরির দলগত হার-জিতের খেলায় কোম্পানির ভারতীয় শাসন-নীতি ও শাসন-পদ্ধতি একটা বড় ঘুঁটি হয়ে পড়ে। ভারতীয়রা অবশ্য স্বদেশে নিজেদের এই ভাগ্য-বিবর্তনেও দর্শক থাকতেই বাধ্য ;—প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে (১৭৬৫-১৮১৫) তাঁরা নিষ্ক্রিয় ও নিস্পৃহ দর্শকই থাকেন। কিন্তু ব্রিটিশ রাজনীতির সেই আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে ভারতবাসীর দুর্ভাগ্য ও দুর্দশার রক্তমাখা কাহিনীও ক্ষণে ক্ষণে উদ্‌ঘাটিত হয়ে পড়ত হুইগ্‌দের মুখে। তারাই ক্লাইব্‌-হেষ্টিংস-এর 'ইম্পীচ্‌মেণ্ট' ঘটায়। তারাই কোম্পানির লুণ্ঠন, অত্যাচার, দুর্নীতির মুখোশ খুলে কোম্পানির বাণিজ্যাধিকার বাতিল করার জন্য আন্দোলন করত। এসব করেছে তারা নিজেদের দলীয় স্বার্থের তাগিদেই। তার মূল কারণটা এই—সেই কবে (ইং ১৬০০ অব্দে) রাণী এলিজাবেথের হাত থেকে জনকয়েক ইংরেজ বণিক্‌ ভারতভূমিতে বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার প্রথম পায়। যে বণিক্‌রা তা পেল না তারা কেউ কেউ অনেক চেষ্টা করে একশ' বৎসর পরে (১৭০৮) 'সংযুক্ত' কোম্পানির ভেতর ঢুকতে পেল। কিন্তু তার পরেই একদিকে ফরাসী ওলন্দাজ প্রভৃতি বিদেশীয় বণিক্‌দের হারিয়ে ইংরেজ কোম্পানি ভারতের বহির্বাণিজ্যে যথার্থই একচ্ছত্র বাণিজ্যাধিকার আয়ত্ত করে ; আর অন্যদিকে পলাশীর পরে রাজ্যলাভ করে বেপরোয়া শোষণ ও লুণ্ঠনের অধিকারী হয়। 'নাবুবী আমলের সেই ঐশ্বর্য যখন ইংলণ্ডের মানুষদের চোখ ঝলসে দিচ্ছে তখন অন্যদিকে নতুন নতুন অনেক ইংরেজ বণিক্‌ মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে ;—তারা আরও উদ্যোগী, আরও বেশি তাদের আকাঙ্ক্ষা। তাই এই উদ্যোগী বণিক্‌দের প্রধান স্বার্থ হল ভারতীয় বাণিজ্যে কোম্পানির একচেটিয়া অধিকার লোপ করে 'অবাধ বাণিজ্যাধিকার' স্থাপন করা। ব্রিটিশ অর্থশাস্ত্রের আদিগুরু অ্যাডাম্‌ স্মিথ্‌, তাই একচেটিয়া বাণিজ্যের কুদৃষ্টান্তরূপে কোম্পানির বর্ণনা করেছেন। ঠিক এ সময়েই আবার আমেরিকা বিদ্রোহ করে স্বাধীন হয়। তার ফলে সেই ইংরেজ বণিক্‌দের ঔপনিবেশিক বাজার

সংকুচিত হয়ে পড়ে ; ভারতের বাজারে প্রবেশ তাদের পক্ষে আরও প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। আর ঠিক এ সময়েই (১৭৬০-এর পরে) এই উদ্যোগী বণিক্‌দের প্রয়োজন অনুযায়ী ব্রিটেনে নূতন নূতন যন্ত্রপাতির উদ্ভাবনা আরম্ভ হয়, ব্রিটেনের 'শিল্প-বিপ্লবে'র সূচনা হতে থাকে ;—সেসব কথা মুখ্যতঃ 'অর্থ নৈতিক প্রেক্ষাপটে'র প্রসঙ্গেই আলোচ্য। কিন্তু এই বণিক্ শাসনের বনিয়াদই হল অর্থনৈতিক তাড়না। সেই শাসনের নীতি ও পদ্ধতিতে এসব কারণে যে পরিবর্তন ঘটল তা' বোঝবার জন্যই এ কথা এখানেও উল্লেখ করতে হয় যে, কোম্পানির অংশীদার গদীয়ান বণিক্‌দের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের রাজনীতিতেই তখন (ইং ১৭৬৫এর সময় থেকে) উদ্যোগী নতুন বণিক্ ও অঙ্কুরায়িত শিল্প-মালিকদের দ্বন্দ্ব ঘনিয়ে উঠেছে। তাতে হুইগ্-দল হয়েছে 'অবাধবাণিজ্য'-কামী উদ্যোগীদের মুখপাত্র, আর টোরি-দল হয়েছে 'একচেটিয়া বাণিজ্যাধিকারী' কোম্পানির আশ্রয়—সেদিনে ইংলণ্ডের রাজা-উজীর থেকে পার্লামেণ্টের সদস্যদের মতামত প্রায় প্রকাশ্যেই কোম্পানির ঘুষেই নিয়ন্ত্রিত হত—মাদার অব পার্লামেণ্টের এ রূপ স্মরণীয়। তবু ইং ১৭৭৩এর 'রেগুলেশন অ্যাক্ট' ও ১৭৮৪র পিট্-এর 'ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট' ভারত-শাসনে কোম্পানির অধিকার অনেকটা খর্ব করে ব্রিটিশ-রাজের অধিকার স্থাপিত করে। তাতে পুরনো বণিক্‌দের রাজনৈতিক ক্ষমতা মূলতঃ হ্রাস পেলেও 'একচেটিয়া বাণিজ্যের' অধিকার রইল। ১৮১৩তে কোম্পানির সনদ পরিবর্তনের কালে ভারতবর্ষে কোম্পানির এক-চেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার লোপ করা হয় (চীনে তা' তখনো থাকে)। ব্রিটেনে তখন শিল্পবিপ্লব পুরো দমে চলতে শুরু করেছে। ১৮১৩র পরে কার্যতঃ তাই হুইগ্‌দল ও ব্রিটিশ 'শিল্প-পুঁজি'রই ক্ষমতা ভারত-শাসনে প্রবল হয়ে ওঠে। অবশ্য, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 'একচেটিয়া বণিকের' পরিবর্তে 'শিল্প-পতিদের' প্রভাব স্থাপিত হয় ১৮৩৩এ—প্রায় বিশ বৎসরে। তখন কোম্পানির সনদ আবার পরিবর্তিত হয়-তাতে চীনের বাণিজ্যেও আর কোম্পানির অধিকার রইল না। মেকলে তখন হুইগ্‌নীতির মুখপাত্র ছিলেন। ইং ১৮৫৩তে যখন সনদ আবার পরিবর্তিত হয় তখন ব্রিটিশ শিল্প-পুঁজি ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত। এদেশে, তখন বাঙালী শিক্ষিত নেতারা রাজনৈতিক আন্দোলন ও দাবী উত্থাপন করেছিলেন। তাতে হুইগ্ রাজনীতিতে বিশ্বাস সুস্পষ্ট। দেশে তখন প্রায় দু'পুরুষ ধরে 'লিবারল্ এডুকেশন' চলছে।

(৪) **নূতন রাজনৈতিক চেতনা :** কোম্পানির শাসনের আভ্যন্তরীণ বিবর্তনের দিক থেকে এই সনদ পরিবর্তনের পর্যায়গুলিও তাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য—বিশেষ করে, ইং ১৮১৩র পর্যায়ের, ইং ১৮৩৩এর পর্যায়ের এবং শেষে ১৮৫৩এর পর্যায়ের পরিবর্তন। শাসক ও প্রশাসনের ব্যবস্থা ছাড়াও শিক্ষা ও সামাজিক ব্যাপারেও ইং ১৮১৩ থেকে ১৮৫৩এর মধ্যে সুস্পষ্ট ব্যবস্থা হয়ে যায়। যেমন, ইং ১৮১৩তে প্রথম শিক্ষা ব্যাপারে বার্ষিক ১ লক্ষ টাকা ব্যয় করার সিদ্ধান্ত হয়। খ্রীষ্টান মিশনারিরা ভারতে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের অনুমতি ইং ১৭৯৩তেও পায় নি, এবার (ইং ১৮১৩তে) তারাও প্রথম অনুমতি লাভ করল। তাতে তারাও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান খোলবার সুযোগ পেল। ১৮৩৩এর সনদে ইংরেজরা এদেশে জমির স্বত্বস্বামিত্ব অর্জন করবার অধিকার পেল। তাতে ইংরেজরা জমির মালিক হয়ে নীলের চাষ দ্রুত বাড়াতে লাগল। প্রথম দিকে কৃষক বা জমিদার কারও নীল চাষে আপত্তি হয় নি ; বরং নূতন cash crop বা 'নগদা ফসল' উৎপাদন দেশের পক্ষে লাভজনক হয়েছে। ইং ১৮৫৩-তে সনদের আবার পরিবর্তন হয়—তখন বাঙলার শিক্ষিত শ্রেণী নানা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার দাবী করে। তারই ফলে শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাব—উড্-এর ডেস্‌প্যাচ্ (১৮৫৪)—প্রণীত হয়। ব্রিটিশ ভারতের সরকারী শিক্ষানীতির তা' ভিত্তিস্বরূপ। তখন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনও স্থির হল। সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসেও এই 'লিবারল্' শিক্ষাবিষয়ক ও সামাজিক ব্যবস্থাসমূহ স্মরণীয় জিনিস।

অবশ্য ব্রিটিশের রাজনৈতিক-সামাজিক বিবর্তন এবং ভারত-শাসনে 'এক-চেটিয়া বণিকের' স্থলে 'শিল্প-পতিদের' ক্রমাধিকার স্থাপন নিয়ে ইং ১৮০০এর পূর্বে ভারতীয়েরা কেউ মাথা ঘামান নি। ১৮১৩র সনদ পরিবর্তনের কালেও ভারতীয়দের কথা শোনা যায় না—বাঙালী সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তখন শিল্পবিপ্লবের ফলে বিপর্যস্ত। কিন্তু ইং ১৮৩৩এর কালে দেখতে পাই—সনদ পরিবর্তনের ব্যাপারে বাঙালী প্রধানরা নিজেদের বক্তব্য উপস্থিত করতে ব্যগ্র। অবশ্য তার পূর্বেই মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা, সতীদাহ প্রভৃতি ব্যাপারে বাঙালী শিক্ষিত সমাজ অ্যাজিটেশন' করতে শিখেছে। বলা বাহুল্য, তা' নূতন রাজনৈতিক চেতনারই প্রকাশ। এই রাজনৈতিক চেতনারও প্রাথমিক উন্মেষ ১৮১৭এর দিকেই ঘটে থাকবে—হিন্দু কলেজ স্থাপন, নানা পুস্তিকা প্রচার ও সংবাদপত্র প্রকাশের আগ্রহে তারই লক্ষণ দেখতে পাই। 'লিবারল্ এডুকেশন্'

তখনি প্রবর্তিত হচ্ছিল। প্রাচীনপন্থী আর প্রগতিপন্থী দু'রকম দৃষ্টিই তখন ছিল। কিন্তু ইং ১৮৫৩ সনে সনদ পরিবর্তনের সময়ে বাঙালীরা অনেকাংশে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া অ্যাসোশিয়েশন'-এর আওতায় (সম্পাদক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর)। তখন তারা শুধু ভারতীয় শিল্পে সরকারের উৎসাহদান, আর রাজকর্মে ভারতীয়দের অধিকতর নিয়োগই দাবী করে নি— ভারতের জন্য ভারতীয় সংখ্যাধিক্যে আইন সভাও দাবী করে বসল; অর্থাৎ ইং ১৮৩৩ ১৮৫৩, এই বিশ বৎসরে তাদের রাজনৈতিক চেতনা রীতিমত দানা বেঁধে উঠেছিল।

শিক্ষিত শ্রেণীর এই রাজনৈতিক বোধ (বা পাব্লিক্ লাইফ্-এর উন্মেষ), এ একটা মৌলিক ভাব-বিপর্যয়। পূর্ব যুগের সামন্ত স্বার্থের রাজনৈতিক বোধের থেকে এ যে স্বতন্ত্র জাতের তা বোঝা দরকার। অথচ উৎপীড়িত জনসমাজের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ-প্রতিরোধের সঙ্গেও শিক্ষিতদের এই রাজনৈতিক চেতনার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল না। ১৮০০ থেকে ১৮৫৭ পর্যন্ত ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সামন্ত-স্বার্থের বিদ্রোহ ও জন-স্বার্থের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ যা ঘটেছে, বাঙালী শিক্ষিতরা তা থেকে মোটামুটি দূরেই ছিলেন।

(৫) **শোষিতের প্রতিরোধ:** কোম্পানির শাসনের বিরুদ্ধে বাঙলার প্রথম যুগের বিদ্রোহ প্রভৃতি অবশ্য ইং ১৮০০-এর পূর্বেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। ১৭৯৩-র চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে যেমন ইংরেজ শাসনের উপর নির্ভরশীল একদল নূতন জমিদার সৃষ্টির ব্যবস্থা হল তেমনি ভূমি-বঞ্চিত কিছু প্রাচীন জমিদার-ইজারাদারও তাতে ক্ষুব্ধ থেকে গেল। ৬০ বৎসর পরে ১৮৫৭এর ভারতীয় বিদ্রোহের কালে বাঙলায় এই পুরাতন সামন্তগোষ্ঠীর বিদ্রোহের শক্তি বিশেষ ছিল না। বরং ১৮১৭-১৮৫৭ এই ৪০ বৎসরে বাঙালী শিক্ষিত মধ্যবিত্তই তখন বাঙলায় জাগ্রত শক্তি। 'উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে' অর্থাৎ বর্তমান উত্তরপ্রদেশে পূর্ব যুগের সামন্ত অভিজাতরা কিন্তু ১৮৫৭র কালে একেবারে বলহীন হয়ে পড়ে নি। বাঙলার বাইরে ইং ১৮০০র পরেকার এরূপ একটি রাজনৈতিক ঘটনা হচ্ছে কটকের পাইক বিদ্রোহ (১৮১৭-১৮) ও বারাণসীর জনসাধারণের প্রতিবাদ আবেদন (১৮১০-১৮১১); এ দুটি বাঙলার দুয়ারের ঘটনা (অনুরূপ আন্দোলনের সংবাদ অধ্যাপক শশিভূষণ চৌধুরীর Civil Disturbances in India, 1765-1857-এ দ্রষ্টব্য)। বাঙলার ঘরের মধ্যে এ-ধরনের প্রধান

প্রধান ঘটনা হল : ওহাবী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত বারাসাত অঞ্চলে তিতু মিঞার বিদ্রোহ (১৮৩১) ; ফরিদপুর, নদীয়া, ২৪-পরগণায় অশান্তি, বিশেষ করে 'ফরাজী'দের অভ্যুত্থান (১৮৩৮-১৮৪৭) ; ছোটনাগপুরের কোল-বিদ্রোহ (১৮৩১-৩২) ; মানভূমের ভূমিজ গঙ্গনারায়ণের হাঙ্গামা (১৮৩২) ; শ্রীহট্টের উত্তরে খাশিয়াদের অভ্যুত্থান (১৮২৯-১৮৩৩) ; ময়মনসিংহের শেরপুরের পাগলপন্থীদের গোলমাল (১৮৩৩) ; আর সর্বশেষে সিপাহী যুদ্ধের পূর্বক্ষণে সাঁওতাল অভ্যুত্থান (ইং ১৮৫৫-১৮৫৬)। এ সব বিদ্রোহের প্রায় প্রত্যেকটির পিছনেই নানা সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণ ছিল। ওহাবী বিদ্রোহেও যে তা' না ছিল, এমন নয়। কিন্তু বিশেষ করে মুসলমানদের ধর্মগত গোঁড়ামিই ছিল তার প্রাণ, আর অন্যতম কারণ মুসলমানদের রাজনৈতিক ক্ষমতাচ্যুতি। অন্যান্য বিদ্রোহের প্রধান প্রধান কারণ কোম্পানির ক্রমবর্ধিত শোষণ ও উৎপীড়ন, ব্রিটিশ শিল্পবিপ্লবের ফলে জনসাধারণের অর্থনৈতিক বিপর্যয়, রাজ-কর্মচারী এবং কোম্পানির অনুগত গোমস্তা জমিদার মহাজন ও দালাল শ্রেণীর নানাবিধ শোষণ ও উৎপাত ;—এ সব মিলে প্রজা-সাধারণের জীবন দুর্বহ করে তুলেছিল। এক-একবার তাই অপেক্ষাকৃত সরল ও পশ্চাৎপদ লোকগোষ্ঠী পূর্বাপর বিবেচনায় অসমর্থ হয়ে আপনা থেকেই বিদ্রোহ করে বসত। কিন্তু বিদ্রোহ সার্থক করবার মত সংগঠন ও বল কারও ছিল না। সাধারণের ছড়ায়, গানে তাদের কথা লোকে বলেছে—কখনো প্রশংসা করে, কখনো নিন্দা করে। কিন্তু শিক্ষিতরা তা এতই নিষ্ফল উন্মত্ততা বলে মনে করেছে যে, সাহিত্যে এসব বিদ্রোহের কথা লেখার প্রেরণা পায় নি। অবশ্য তখনও সাহিত্য অর্থ প্রধানতঃ শিক্ষাবিষয়ক পুস্তক রচনা বা সংবাদপত্র লেখা। রাজনৈতিক প্রতিরোধ অপেক্ষাও সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংঘাতেই এ ধরনের সাহিত্যের তখন উদ্বোধন হয়।

॥ ২ ॥ সামাজিক সংঘাত

'স্বদেশী সমাজ' : এই সামাজিক ঘাত-প্রতিঘাতে বাঙালীর রাজনৈতিক প্রচেষ্টার প্রকাশ দেখা যায় ইং ১৮৪২এর দিকে। অবশ্য তার সংঘাত আরম্ভ হয়েছিল অনেক পূর্বেই। এক অর্থে বলা যায় পলাশী থেকেই তার সূচনা।

মূল কথাটা স্মরণে রাখা প্রয়োজন—রাজা-রাজ্যের পতন-অভ্যুদয়ে ভারতীয় পল্লীসমাজের যথার্থ বিপর্যয় ঘটত না—তার নিজস্ব গতিধারা তাতে সময় সময়

কতকটা ব্যাহত বা কতকটা পুষ্ট হত মাত্র। পল্লীসমাজ (village community) ও পল্লীর স্বয়ংসম্পূর্ণ আর্থিক জীবন (self-sufficient village economy), জাতি-ধর্মের (caste-class) সামাজিক ব্যবস্থা, জন্মান্তর ও কর্মবাদে অবিচলিত আস্থা (ideology)—এই তিনটি বিশিষ্ট জিনিস ভারতীয় জীবনধারাকে একটা নির্দিষ্ট খাতে নিস্তরঙ্গ রীতিতে বইয়ে নিয়ে যেত।

ভারতীয় সামন্ত-নীতি পাশ্চাত্ত্য সামন্তদের ম্যানোরিয়াল সিস্টেমের (manorial system) থেকে স্বতন্ত্র (এ বিষয়ে শেলভেংকরের ইংরেজী বই Problem of India দ্রষ্টব্য)। আমাদের সামন্ত অধিরাজ ও তার অধীন সামন্ত রাজারা রাজ্যরক্ষা ও প্রজাপালনের জন্য পল্লীর প্রজাসাধারণের কাছ থেকে ফসলের হারে সামান্য কিছু কর বা রাজস্ব গ্রহণ করতেন, আর রাজশক্তি সেচের বড়-বড় খাল, রাজপথ প্রভৃতি নির্মাণ ও রক্ষা করত। রাজাশ্রয়ে শ্রেণী শিল্পী ও রাজকর্মচারীদের নিয়ে বর্ধিত হত ভারতের পৌর-সভ্যতা। কিন্তু পল্লী-সমাজের স্বাতন্ত্র্য ও আত্মকর্তৃত্বে এই রাজশক্তি হাত দিতেন না। এরূপ সমাজের একটা আদর্শ রূপ রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'স্বদেশী সমাজে' কল্পনা করেছেন, আর তাঁরও পূর্বে কার্ল মার্কস্ অদ্ভুত নিপুণতায় তার বাস্তব রূপ বর্ণনা করেছেন (দ্রষ্টব্য 'কাপিটাল', ১ম খণ্ড)। এ সমাজের গতিবিমুখতা, নিরুদ্যম, প্রকৃতিবশ্যতা, মানব মহিমা সম্বন্ধে নিশ্চেতনতা ও মানুষের আত্মাবমাননার কথাও কঠিন ভাষাতেই সেই সঙ্গে মার্কস্ বর্ণনা করেছেন ('দি ব্রিটিশ রুল ইন ইণ্ডিয়া' শিরোনামায় ১৮৫৩তে 'নিউ ইয়র্ক ডেলি ট্রিবিউনে' লেখা পত্রাদি দ্রষ্টব্য)। তুর্ক বিজয়েও সেই মূল ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতি পরিবর্তিত হয় নি। কিন্তু পলাশীর পরে সেই সমাজের পরিবর্তন বাঙলায় অনিবার্য হয়ে উঠল।

বিপ্লব ও বিপর্যয়ঃ ইংরেজ কোম্পানি মুঘল-পাঠান কেন, পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী প্রভৃতি শক্তির অপেক্ষাও উন্নততর সামাজিক শক্তির বাহক, সে এল ব্রিটেনের ধনিক-বিপ্লবের উত্তরাধিকার নিয়ে। বাঙলায় বা ভারতবর্ষে অবশ্য ইংরেজরা ধনিক-বিপ্লব সঞ্চারিত করতে এল না, এল বরং নিজেদের ধনিক-শোষণ ও ধনিক-শাসন বিস্তারিত করতে। তাই আমাদের পল্লী সমাজের স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতিকে ধ্বংস না করে তার উপায় নেই. আর সেই শোষণের দায়েই এই শোষিত সমাজকে শাসনযন্ত্রের নাগপাশে বেঁধে স্বাভাবিক বিকাশ থেকে বঞ্চিত না রাখলেও তার চলে না। বাঙালী সমাজে ও ভারতীয় সমাজে

তাই ইংরেজ রাজত্বে গতানুগতিক সামন্ততন্ত্রের ব্যবস্থা ভেঙে যেতে লাগল, কিন্তু ধনিকতন্ত্রী জীবন্-যাত্রাও গড়ে উঠতে পারল না। বরং সেই শূন্যতার মাঝখানে ইংরেজ শাসকরা দাঁড় করিয়ে রাখল একটা 'আধা-সামন্ততান্ত্রিক শোষণ ব্যবস্থা' —দেশী রাজা জমিদার মহাজন প্রভৃতি ইংরেজ শাসনের তাঁবেদার, দায়িত্বহীন আমলাতন্ত্র ও ব্রিটিশ ধনিক-ব্যবস্থার ক্রমবর্ধিত শোষণ,—এই হল ১৯৪৭ পর্যন্ত ইংরেজ রাজত্বের শাসন-ব্যবস্থার রূপ—ইংরেজ আমলের এই সাধারণ সত্য বিস্মৃত হবার নয়। ইংরেজ শাসন চেপে বসলে যা ঘটবার কথা তা সমাজ-বিপ্লব নয়, তার নাম সমাজ-বিপর্যয়। যাকে সমাজ বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় 'কলোনিয়্যাল সিস্টেম বা 'ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা', এ শাসন তা' ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু ইংরেজের অভীষ্ট না হলেও ইংরেজের এ ব্যবস্থাই ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের অবসান ঘটাল; আর সেই শ্রীহীন অবস্থার মধ্যে ইংরেজের বাহিত বুর্জোয়া ভাবধারাও সমাজের হত-চেতন সৃষ্টিশক্তিকে একটু চঞ্চল, সচেতন করে তুলল। এই বাস্তব বিপর্যয়ে পুষ্ট হল নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং এই ভাব-বিপর্যয়ে পুষ্ট হল সে শ্রেণীর অন্তর্নিহিত সৃষ্টিশক্তি। অবশ্য সেই সৃষ্টিশক্তিও ঔপনিবেশিক ব্যবস্থায়ই আবার বাস্তব ক্ষেত্রে ব্যাহত হল। তবু নানা ঋজুবঙ্কিম পথে তা স্ফূর্তও হল তীব্র মানস-প্রচেষ্টায়।

১৮০০ থেকে এই সমাজ-বিপর্যয়ের ও সামাজিক সংঘাতের আঘাতে বাঙালী জীবনে সেই 'দিন বদলের পালা এল। এল—সমাজের মধ্য থেকে স্বাভাবিক নিয়মে নয়—সমাজের বাইরে থেকে ধনিক-শোষণের তাড়নায়। এল ওপরতলার বিদেশীয় ধনিক-শাসনযন্ত্রের চাপে, নিচের তলায় জীবন যাত্রার বিকাশের ফলে নয়। ইং ১৮১৭র কাছাকাছি আমরা দেখি বাঙালীর এ বোধের উন্মেষ হয়েছে, ১৮৫৭র কাছে পৌছতে পৌছতে দেখি তা' নানা সামাজিক সাংস্কৃতিক আয়োজনে-ব্যবস্থায়, অনুষ্ঠানে-প্রতিষ্ঠানে রূপ লাভ করতে সচেষ্ট।

সামাজিক বিপর্যয় সত্বেও, ইংরেজ আপনার অনিচ্ছাতেও এভাবে 'এশিয়ার প্রথম সমাজ-বিপ্লবের অচেতন অস্ত্র' হয়ে গিয়েছে। হয়ত বলা উচিত, সেই বিপ্লবের 'সচেতন বাধা'ও হয়েছে। একটা ছোট কথা এই প্রসঙ্গেই তাই উল্লেখ করা উচিত। ভারতের সামন্ততন্ত্রে—সেই স্বতন্ত্র পল্লী-সমাজ ও কর-সন্তুষ্ট সামন্ত শাসনে, ভাঙন ধরেছিল কিন্তু অনেক দিন থেকেই আর আপনা থেকেই। এমন কি, খিলজী ও তুঘলক সম্রাটরাও (ইং ১২৯০-১৩৮৮)

লাখেরাজ বাজেয়াপ্ত করেছিলেন, টাকায় খাজনা আদায় করতে চেয়েছিলেন, জায়গীরদারদের বদলী করে জায়গীরদারী বিলোপের চেষ্টা করেছিলেন (কেম্ব্রিজ হিস্ট্রি অব ইণ্ডিয়া, ৩য় খণ্ডে এ-সবের উল্লেখ আছে)। অবশ্য তা' দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। শের শাহ (ইং ১৫৪২-১৫৪৫) পথঘাট তৈরী করে বাণিজ্য প্রসারের ব্যবস্থা করেন আর সরাসরি গ্রামের রায়ত-চাষীর সঙ্গেই রাজস্বের বন্দোবস্ত করে পল্লীকেন্দ্রিক সমাজকে ও জায়গীরদারীকে দুর্বল করেন। আকবর-জাহাঙ্গীরের আমলে শের শাহ্-এর এ প্রয়াসকেই তোডর মল রাজস্ব ব্যবস্থার ভিত্তি করেছিলেন। তাঁরা টাকায় খাজনা দেওয়াও প্রচলিত নিয়ম করে তুলতে চান। তার ফলে টাকার প্রচলন বা 'মানি ইকোনমি'ও কিছুটা প্রবর্তিত হবার কথা—মহাজনী সাহুকারীও দেখা দেয়। সাজাহান প্রভৃতি নীল চাষ করতেন, নিজেরাও ব্যবসায় করতেন, অর্থাৎ দেশে বণিক্ শক্তির গুরুত্ব তখন থেকেই বাড়ছিল বলে মনে হয়। তাছাড়া, মধ্য যুগের সাধুসন্তদের প্রচারে জাতি-বন্ধন শিথিল হওয়ায় অধ্যাত্মক্ষেত্রে ব্যক্তিরও মুক্তির পথ হয়েছিল। (এসম্বন্ধে আগ্রহ থাকলে রামকৃষ্ণ মুখার্জির ইংরেজীতে লেখা ১৯৫৫তে বার্লিন থেকে প্রকাশিত The Rise and Fall of the East India Company গ্রন্থে সংগৃহীত তথ্যসমূহ দ্রষ্টব্য।) অর্থাৎ সামন্ত-সমাজব্যবস্থা বাস্তব ও মানসিক দুই ক্ষেত্রেই ক্রমে ভাঙছিল; বাঙলা সাহিত্যে তার প্রমাণ ভারতচন্দ্রের 'অন্নদা-মঙ্গল', রামানন্দ ঘোষ ও জগৎরাম বাঁড়ুজ্জে। কিন্তু দূর দূরান্তরে বিচ্ছিন্ন সমাজে যা' শিকড় গেড়ে আছে, তাকে উন্মূলিত করার মত শক্তি মুঘল-সাম্রাজ্যের শেষ দিকে দেশের অভ্যন্তরে জন্মাবার পূর্বেই এসে গেল পাশ্চাত্য বণিকেরা। তাদের মধ্যে একমাত্র ইংরেজই ধনিক রাষ্ট্রের দূত আর ধনিক-তন্ত্রের অগ্রদূত। তারাই ক্রমে এ দেশেও প্রাধান্য লাভ করল, পলাশীতে জিতল; আর যা' পাঠান ও মুঘল সম্রাটরা পারেন নি তা' ক্রমে সম্পন্ন করল—নিজেদের শোষণ স্বার্থে যেভাবে যতটা দরকার। মনে হয় না কি—ভারতীয় সমাজ নিজের শক্তিতেও সামন্ত-তন্ত্র শেষ করত, কিন্তু তার সময় লাগত বেশি; ইংরেজ বণিক্ সেই ধ্বংসের কাজটা দ্রুতই করেছে। অবশ্য স্বাভাবিক নিয়মে যা' সম্পন্ন করতে আমাদের সময় লাগত তার স্থলে আমরা ধনিক-ব্যবস্থাও স্বাভাবিক ভাবে গড়ে তুলতে পারতাম। তার পরিবর্তে সবই চলল অস্বাভাবিক পথে—ইংরেজ বণিকের রাজ্যলাভে তাই সেই গঠনের সুযোগ আমরা পেলাম না, ধনিক-ব্যবস্থা প্রায় দু'শত বৎসর ঠেকে রইল,—

সামন্ত-ব্যবস্থা ভেঙে গেলেও লুপ্ত হতে পারল না। আমরা ঠেকে রইলাম ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার বালুচরে—ন যযৌ ন তস্থৌ।

অবশ্য এই সব সামাজিক ইতিহাসের তথ্য ও তত্ত্ব আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের আলোচনায় গৌণ বিষয়। কিন্তু যে সমাজ-বিপর্যয়ের আবর্তে ইংরেজ-শাসনে আমরা, আমাদের সাহিত্য, আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের জীবন শুদ্ধ পাক খেতে লাগলাম তার অর্থ সম্পূর্ণ উপলব্ধি করতে হলে ভারতীয় সামন্ত-তন্ত্রের বাস্তব ও সামাজিক বৈশিষ্ট্য, আমাদের সমাজ-শক্তির ব্যাহত বিকাশের কথাও মনে রাখা প্রয়োজন। [এ জন্যই ইংরেজিতে লেখা রমেশচন্দ্র দত্তের The Economic History of India দু-খণ্ড, Under Early British Rule ও Under Victoria, রজনী পামে দত্তের India Today ও কার্ল মার্কসের ভারতবিষয়ক লেখার ইংরেজি সংকলন Marx on India প্রভৃতি গ্রন্থের সঙ্গে পরিচয় না রাখলে বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসের ছাত্রেরও চলে না। অধ্যাপক নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহের নব-প্রকাশিত Economic History of India, from Plassey to the Permanent Settlement (প্রকাশিত —1965)-এ আরও মূল্যবান তথ্য সংগৃহীত হয়েছে।]

(১) **বাস্তব-বিপর্যয়:** ইতিহাসের যে নিয়মে ইংরেজ বণিক্ রাজ্যলাভ করল সে নিয়মেই অন্যান্য কতকগুলো বিকাশও অনিবার্য হয়ে পড়ে; এবং তার ফলে বাঙলার ও ভারতবর্ষের জীবনে বাস্তব-বিপর্যয় ও ভাব-বিপর্যয় দুই-ই সংক্রামিত হয়। বাঙলাতেই প্রথমত তা' আরম্ভ হয়, এবং বাঙলাতেই তা' বিস্তারলাভ করে। কৃষকের সর্বনাশ, ভূ-স্বামীর উৎখাত, কৃষির পতনের সঙ্গে সঙ্গে তন্তবায়দের বৃত্তিধ্বংস ও পল্লীশিল্পের সর্বনাশ বাঙলাতেই আরম্ভ হয়, এবং বাঙলাতেই তা' ব্যাপক ও গভীর সমস্যার সৃষ্টি করে। ইং ১৮০০ সালের পূর্বেই তার স্বরূপ অবশ্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। পল্লীসমাজের প্রধান অবলম্বন কৃষি ও কৃষি-নির্ভর পল্লীশিল্প। কিন্তু কোম্পানির রাজস্বের পীড়নে কৃষক ও ভূস্বামী সর্বস্বান্ত হল। কুঠির কর্মচারী ও গোমস্তার অত্যাচারে তন্তুশিল্পী দাদন-দেওয়া দাসে পরিণত হয়, পল্লীশিল্প দমিত হয়। কোম্পানি ও তার কর্মচারীদের দৌরাত্ম্যে মীরকাশেমের পূর্বেই অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য থেকে দেশের সওদাগর বণিকেরা বিতাড়িত হয়। মীরকাশেমের সময়েই জগৎশেঠদের প্রভাব খর্বিত হতে থাকে ও হেস্টিংসের সরকারী 'জেনারেল কোম্পানি'র দেশী

দালালদের নাম শোনা যায়। এসব প্রত্যক্ষ অবস্থা। পরোক্ষেও ব্রিটেনে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপাদেই আরম্ভ হয় যন্ত্রের উদ্ভাবনা ও শিল্পবিপ্লবের সূচনা। এ সব তথ্য বরাবর মনে না রাখলে সমাজ-চিত্রটা যথার্থরূপে স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। সুখপাঠ্য না হলেও আমরা এখানে এই সমাজ-চিত্রের অতি প্রয়োজনীয় দিক ক'টি সংক্ষেপে উল্লেখ করছি।

প্রথম কথা: সর্বশ্রেণীর সর্বনাশ: যে সমাজের বুকে বাঙলা সাহিত্য ও বাঙলা সংস্কৃতি ভূমিষ্ঠ ও পালিত হত সে সমাজের ভাঙন দ্রুত এগিয়ে যায়। প্রজা সাধারণ মরে, পুরনো অভিজাতরা পঙ্গু হয়। শিল্পীরা মরে, বণিক্‌রা বিলুপ্ত হয়। কারণ, রাজস্ব বাড়ে—ইং ১৭৬৫-র ১'৪৭ লক্ষ (এক লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার) টাকার রাজস্ব ১৭৯২ সনে দাঁড়ায় ২'১৮ লক্ষে (দুই লক্ষ আঠারো হাজারে)। লুণ্ঠনের বোঝাও বাড়ে। হিসাব করলে দেখা যায় নবাবের যা' ভূমি-রাজস্ব ছিল, কোম্পানির কর্মচারীদের লুণ্ঠন তার চতুর্গুণ পরিমাণ হত। এ টাকার অবশ্য এক কড়াও দেশে থাকল না, বিদেশে গেল। পূর্ব যুগে নবাব-বাদশাহেরা উৎপীড়ন করলেও দেশেই তাঁদের সেই অর্থ ব্যয়িত হত। কিন্তু এখন দেশের ধনসম্পদ গেল সমুদ্রপারে, বিলাতের পকেটে। দেশবাসীর ঋণের ভারও সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে। কোম্পানির যুদ্ধবিগ্রহের সমস্ত খরচাই শাসকেরা চাপাতে থাকে প্রজার স্কন্ধে। ইং ১৮১৩ থেকে 'হোম চার্জ' যোগানো হল ভারতের নিয়ম। যে সব সামন্ত ও অভিজাত গোষ্ঠী সমাজের শিল্পী ও গুণীদের প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে পোষণ করত ১৭৬৫র পরে তারা অনেকেই সম্পত্তি হারায়। অন্যদিকে কোম্পানি ও তার সাহেব কর্মচারী ও দেশী গোমস্তাদের অত্যাচারে তন্তুবায়দের হাড় কালো হতে থাকে। তন্তুবায়েরা বাধ্য হয়ে বিদেশী বণিকের দাদন নিয়ে সস্তায় কোম্পানির দাস হয়ে পড়ে। বহির্বাণিজ্য ও অন্তর্বাণিজ্য হারিয়ে সওদাগর বণিকেরা কোম্পানির দালালী নিতে বাধ্য হয়। গোটা ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের একটা খামারে পরিণত হয়, ভারতবাসী হয় ইংরেজ মুনিবের ক্ষেত্রদাস। ঢাকা, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি শহরগুলোর পতন ঘটে—অবশ্য তার জায়গায় কলকাতার শ্রীবৃদ্ধি হয়। ঢাকায় পূর্বে বাসিন্দা ছিল দেড় লক্ষ; কিন্তু ইং ১৮৪০এ দেখা যায় মাত্র ৩০।৪০ হাজার লোক ঢাকার অধিবাসী। ঢাকা থেকে ইং ১৭৮৭তেও ইংলণ্ডে ৩ লক্ষ টাকার মসলিন রপ্তানী হত। ২০ বছর পরে, ইং ১৮০৭এ, আর

মসলিন রপ্তানীর চিহ্নও দেখা যায় না। এ থেকে সহজেই বোঝা যায় পল্লীসমাজে কৃষক, জমিদার বা বণিক্ সওদাগর কারও আর সাধ্য রইল না যে, কোনরূপ সংস্কৃতি বা সাহিত্যের পোষকতা করবে। নতুন ভাগ্যবান্‌দের শহর কলকাতাতেই সেরূপ আসর গড়ে ওঠা সম্ভব—অন্ত কোথাও নয় (দ্রষ্টব্য: Hunter-এর Annals of Rural Bengal—"from the year 1770 the ruin of two-thirds of the old aristocracy of Lower Bengal dates")।

দ্বিতীয় কথা: শিল্পবিপ্লবের বাজার বিস্তার—যখন আমাদের পল্লী-সমাজ এরূপে পর্যুদস্ত তখনি ইংলণ্ডের ভূমিতে শিল্পবিপ্লব জন্ম নিচ্ছে। উদ্যোগী বণিকদের তাগিদে যন্ত্রোদ্ভাবনা ইং ১৭৬০ থেকে ইংলণ্ডে অদ্ভুত গতিতে বৃদ্ধি পায়। বস্ত্রশিল্পই ছিল চিরদিন ভারতের প্রধান শিল্প আর যন্ত্র আবিষ্কারের ফলে তাতেই প্রথম বিপ্লব ঘটল। প্রথম আবিষ্কার, হারগ্রিব্‌সের 'স্পিনিং জেনি', ইং ১৭৬৭এ। তারপর প্রধান আবিষ্কার ইং ১৭৬৫তে ওয়াট্‌সের ষ্টিম এঞ্জিন, ১৭৮৫তে কার্টরাইটের বাষ্পচালিত তাঁত। এসবে বস্ত্রোৎপাদন বাড়বার কথা—ভারত থেকে ইংলণ্ডে বিলাস-বস্ত্র ছাড়া অনুরূপ বস্ত্রের রপ্তানী কমা তাই অনিবার্য। বিশেষতঃ ১৭৭৬ থেকে মার্কিন উপনিবেশ বিদ্রোহ করায় ভারতই ব্রিটিশ শিল্পের প্রধান 'বাজার' হল। অর্থাৎ ভারতবর্ষ (প্রধানতঃ বাংলা) বিলাতের পক্ষে কাঁচামালের প্রধান যোগানদার ও বিলাতের উৎপন্ন পণ্যের ক্রেতা হবার কথা। বিলাতের সেই কল-কারখানার পুঁজিও অবশ্য আসছিল কোম্পানি ও তার কর্মচারীদের বাংলা-লুটের টাকা থেকে; এ টাকা না হলে ইংলণ্ডের শিল্পবিপ্লব সহজসাধ্য হত না। শিল্প বাণিজ্যের এই নূতন 'ধনিক-পুঁজি'কে অবশ্য কোম্পানির 'বণিক্-পুঁজি' সহজে ভারতের 'বাজার' ছেড়ে দিতে চায় নি—'অবাধ বাণিজ্য' ও 'একচেটিয়া বাণিজ্যের' সে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। এর পরে ১৮০০র কাছাকাছি নেপোলিয়নের ইউরোপ অধিকারে ইংলণ্ডের পণ্যোৎপাদন বাড়ে, ভারতের বাজারে ধনিক-পুঁজির আধিপত্যও সুনিশ্চিত হয়ে যায়,—এসব কথা আবার উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। সাধারণ ভাবে শুধু এই ক'টি কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা প্রয়োজন:—

এক, ইং ১৭৬০ থেকে ১৮৩০ পর্যন্ত কালটাকে বৈজ্ঞানিক বিবর্তনের ইতিহাসে বলা হয় 'আবিষ্কারের প্রথম যুগ' (দ্রষ্টব্য বার্নাল—Science in

History)। যন্ত্রপাতি যেমন আবিষ্কার হয় অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিও তেমনি পরিষ্কার হতে থাকে (অ্যাডাম স্মিথের Wealth of Nations প্রকাশিত হয় ইং ১৭৬৫তে)। বুর্জোয়া চিন্তার জগতেও আশা ও পরিচ্ছন্নতা দেখা দেয় (১৭৮৯র ফরাসী বিপ্লবের কাল থেকে)।

দুই, ইং ১৮০০র দিকে দেখি এসব বাস্তব ও মানসিক পরিবর্তনের স্রোত ইংলণ্ডে প্রবল হয়ে উঠেছে, ভারতে তার ঢেউ ক্রমে ক্রমে একটু একটু লাগছিল। ১৮১৫র কাছাকাছি ইংলণ্ডে এই শিল্পবিপ্লবের ভরা জোয়ার। (ব্রুক্‌স্ অ্যাডাম্‌স্ The Law of Civilisation and Decay, পামে দত্ত India Today, page 95-এ উদ্ধৃত)। ইং ১৮১৩তে কোম্পানির চার্টার পরিবর্তনে ভারতেও শিল্প-পুঁজির অধিকার কতকটা স্বীকৃত হয়—তখনো ভারতের পণ্য উৎকৃষ্ট বলে পৃথিবীতে গণ্য। কিন্তু এ দেশের শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এই সময় (১৮১৩) থেকে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থাও পুরোপুরি কায়েম হতে থাকে। পূর্বেই, একদিকে যেমন ব্রিটিশ কল কারখানার মালের জন্য বিনা শুল্কে বাজার খুলে দেওয়া হয়েছিল, অন্যদিকে তেমনি ভারতের পণ্যের উপর ট্যাক্‌স কেবলি বাড়ানো হয়েছিল। তা সত্ত্বেও ১৮১৩ পর্যন্ত বিলাতের বাজারে ভারতীয় বস্ত্রই ছিল সস্তা। তাই তখন শতকরা ৭০।৮০ হারে ভারতীয় বস্ত্রের উপর শুল্ক বসল (মিলের 'History of British India'য় উইলসনের কঠিন মন্তব্য দ্রষ্টব্য)। তারপর ১৮৩৩ পর্যন্ত যে ভাবে বিলাতী বস্ত্রের আমদানী বাড়ল আর যে ভাবে ভারতীয় বস্ত্রের রপ্তানী কমল, যে ভাবে তামা সীসা লোহা কাচ ও মাটির বাসন শতকরা ৪০০৲ টাকা হারে রপ্তানী শুল্ক বসিয়ে বন্ধ করা হল আর ব্রিটেন থেকে তা আসতে লাগল মাত্র শতকরা ২॥০ টাকা হারে আমদানী শুল্ক দিয়ে, সে সব তথ্য রমেশচন্দ্র দত্ত উল্লেখ করেছেন। দু'একটা মোটা অঙ্ক মনে রাখাই যথেষ্ট—ইং ১৮১৩তে কলকাতা থেকে ২০ লক্ষ পাউণ্ডের বস্ত্র বিলাতে রপ্তানী হয়। আর ১৮৩০এ সে রপ্তানী তো গেলই, কলকাতা উল্টো ২০ লক্ষ পাউণ্ডের বিলাতী কাপড় আমদানী করে। মস্‌লিনের দেশে মস্‌লিন লুপ্ত হল ; বিলাতী কলের সূক্ষ্ম বস্ত্র তখন 'মস্‌লিন' নাম পেল। ১৮২৭এ এদেশে সেই 'বিলাতী মস্‌লিন' আসত ১০ লক্ষ গজ। ১৮৩৭এ আসছে দেখি ৬ কোটি ৪০ লক্ষ গজ।

তিন, ইং ১৮৩৩ পর্যন্ত কোনো বাঙালী নেতার এসব দিকে দৃষ্টি ছিল কিনা জানি না ; কিন্তু কারও মুখে প্রতিবাদ ফোটেনি। হিন্দু কলেজের 'ইয়ং বেঙ্গল'

প্রথম ব্যবসা বাণিজ্যের এ অবস্থার দিকে দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, ব্যবসায়ে তাঁরা নামেনও (রামগোপাল ঘোষ, ভোলানাথ চন্দ, প্রভৃতি)। কিন্তু ক্রমেই ব্যবসা ক্ষেত্রে দেশীয় বণিকেরা প্রতিহত হয়ে ফিরে আসতে থাকেন (রুস্তমজী কাওয়াসজী, দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতিদের ভাগ্য-নাশ এ সম্পর্কে স্মরণীয়)।

চার, ১৮৩৩এ বাঙলায় পোত আসছিল (প্রথম আসে ১৮২৫এ), গম-পেষা যন্ত্র কলকাতায়ও স্থাপিত হচ্ছিল (১৮২৯-৩০)। এর পর থেকে চা-বাগান (১৮৩৩), কয়লার খনি (১৮২০-৪০) প্রভৃতিতে ইংরেজ পুঁজির দৃষ্টি পড়ে। ইং ১৮৫৩-৫৬ হচ্ছে ডালহৌসির কাল—"Conquest, Consolidation and Development"এর কাল। চটকল (রিষড়ায় ইং ১৮৫৩ সালে স্থাপিত), রেলপথ ও টেলিগ্রাফের ব্যবস্থা হল—বিলাতি পণ্যের বাজার ভারতে প্রসারিত হতে লাগল। শিল্পবিপ্লবের এরূপ প্রসারে তাই ভারতের যুগ-যুগান্তরের পল্লীসমাজ যেমন ধ্বসে যাচ্ছিল তেমনি এই 'ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা নিজের অভ্যন্তরেই যুগের গতিবেগ, ধনিকতন্ত্রের আয়োজন-অনুষ্ঠান, শিক্ষা-দীক্ষা, ভাবনা-ধারণার বীজও বহন করে নিয়ে আসছিল, তাও দেখতে পাব। ১৮০০ থেকে ১৮৫৭ পর্যন্ত কালে বাঙালী সমাজও এসব বাস্তব পরিবর্তনে প্রতিনিয়ত দোলা খেতে থাকে। একটা ভাব-বিপর্যয়ের মধ্যে সমাজ এগিয়ে যায়, সাহিত্য ও সংস্কৃতির পক্ষে তা এক গভীর সত্য।

তৃতীয় কথা : ভূমিস্বত্বের উপস্বত্ব ও মধ্যবিত্তের আত্মপ্রতিষ্ঠা— প্রাচীন পল্লী-সমাজের ভাঙন ক্রমাগত বেড়ে চলেছে, তার স্থানে তৈরী হচ্ছে 'ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা', আধা-সামন্ততন্ত্র। বাঙলা বিহারে এ সমাজের বিশেষ ভিত্তি হল—কর্নওয়ালিস্-প্রবর্তিত 'জমিদারী প্রথা'। এ ব্যবস্থা অবশ্য ১৭৯৩তে বাঙলায় চিরস্থায়ী ঘোষিত হয়। কিন্তু মাদ্রাজে মনরোর 'রায়তওয়ারী প্রথা' এবং আরও পরে অন্যত্র 'মহালওয়ারী প্রথা' কোম্পানি প্রবর্তন করে। সে সব ব্যবস্থায় কয়েক বৎসরের মত জমির বন্দোবস্ত হত এবং কোম্পানি চড়া ডাকে জমি বন্দোবস্ত দিতেন। অর্থাৎ এসব প্রথায় রাজস্ব বৃদ্ধি করার সুযোগ কোম্পানির পুরোপুরি থাকে—জমিদারী প্রথায় তা থাকে না ;—সে সুযোগ কোম্পানিও পুরোপুরি গ্রহণ করে। তার ফলে ওসব অঞ্চলের রাজস্বের ভারে চাষী জমি ইস্তফা দিয়ে সমুদ্র পারে কুলি চালান যেতে থাকে, আর জমি সাহুকার মহাজনের হাতেই গিয়ে জমে। অর্থাৎ বাঙলায় বা বাঙলার বাইরে কোনখানেই কৃষক জমির মালিক থাকেনি, জমিদার বা অন্য যে নামেই হোক

খাজনাভোগী অ-কৃষক শ্রেণী 'ভূম্যধিকারী' হয়েছে। তফাৎ এই—বাঙলায় জমির বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী, অন্যত্র তা' নির্দিষ্টকালের জন্য হয়। তাই বাঙলায় ভূমির মালিকানা যেমন আভিজাত্যের মাপকাঠি, তেমনি মুনাফারও কামধেনু হয়ে ওঠে। ১৭৯৩এর কর্ন'ওয়ালিসী ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিল—জমির ওপর পল্লী-সমাজের স্বত্ব খর্ব করে ব্যক্তিস্বত্ব সৃষ্টি করা এবং সেই স্বত্ব দিয়ে বিলাতের মত কৃষিকর্ম-নিপুণ একদল দেশীয় ভূম্যধিকারী (Landlord) সৃষ্টি করা—তারা জনগণের স্বাভাবিক নেতা হবে এবং তারা নিজেদেরই স্বার্থে হবে কোম্পানির পরিপোষক (পরে লর্ড বেন্টিঙ্ক স্পষ্ট ভাষায় এই 'দালাল'-সৃষ্টির উদ্দেশ্যটা ব্যক্ত করেন)। মুর্শিদকুলী খাঁর আমল থেকেই অবশ্য এরূপ খাজনা-আদায়কারীদের 'জমিদার' করে জমি ইজারা দেওয়া হচ্ছিল কর্নওয়ালিসী ব্যবস্থা তারই পরিণতি—একথা কেউ কেউ বলেন (History of Bengal, Vol. II)। কিন্তু ঔপনিবেশিকতার যে পরিবেশে এই পরিণতি ঘটল, আর ঔপনিবেশিকতার ভিত্তিরূপে যে ব্যবস্থা প্রণীত হল, ব্রিটিশ শিল্পবিপ্লবের অভ্যুদয়ের মুখে ইং ১৮০০ সনের পরে তার অর্থ স্পষ্ট হয়ে উঠল। এখানে আমরা তা' সংক্ষেপে উল্লেখ করছি :—

এক. পুরনো অভিজাতদের হাত থেকে জমি খসে গেল। অনেক ক্ষেত্রে এখন জমিদার হয়ে বসল চতুর নতুন ভাগ্যবানরা—সাহেবদের মুন্সি বেনিয়ান, দালাল প্রভৃতি, যারা কলকাতা শহরে ও বাজারে বন্দরে টাকার ফিকিরে ঘুরে বেড়াত, জমি ও প্রজার সঙ্গে যাদের কোনো সম্পর্কই থাকত না। এই জমিদারদের দেয় রাজস্ব চিরস্থায়ী বা স্থির হলেও তাদের আদায় বা শোষণ বেপরোয়া বেড়ে যেতে কোনো বাধা ছিল না। অর্থাৎ জমিদারদের শোষণের মাত্রা রইল না।

দুই, এই জমিদাররা অনেকে দালাল, মুৎসুদ্দি, ইংরেজের অনুগ্রহজীবী, কলকাতার অধিবাসী। তাই গ্রামাঞ্চলের জীবনের সঙ্গে এদের যোগাযোগ ছিল না, এরা absentee landlordরূপে শহরবাসী হয়েই থাকত। এদের শিক্ষা-দীক্ষা বা রুচিও দু' এক পুরুষে এতটা উন্নত হল না যাতে এরা পল্লীপ্রধান প্রাচীন সংস্কৃতি ও শিক্ষা প্রভৃতিকে বনেদী অভিজাতদের মত পরিপোষণ করবে (দ্রষ্টব্য, ডঃ সুশীলকুমার দে'র ইংরেজিতে লেখা Bengali Literature in the 19th Century, পৃ. ২৮-২৯)। এই শহরে ধনীদের পোষকতা পেল বরং নতুন ধরনের 'বাবু বিলাস'—যাত্রা, কবি, আখড়াই, তরজা আর

বুলবুলির লড়াই প্রভৃতি (পরে 'নববাবু বিলাস' দ্রষ্টব্য)। অবশ্য ইংরেজী শিক্ষা পেয়ে ইংরেজ হুইগ্-টোরির মত এঁদের মধ্যেও কেউ কেউ নতুন কালচারের পরিপোষক হলেন—যেমন, রামমোহন রায়, রাধাকান্ত দেব প্রভৃতি (দ্রষ্টব্য : লেখকের 'সংস্কৃতির রূপান্তরে' 'বাঙলার কালচার' পরিচ্ছেদ)।

তৃতীয় কথা, জমি শোষণে জমিদারীতে যে অভাবনীয় মুনাফার সুযোগ পাওয়া গেল বাঙলায় তার দুটি বিষময় ফল ফলল : বাঙলা দেশে বণিক্-ব্যবসায়ী, বৃত্তিজীবী (দ্বারকানাথ ঠাকুর, দুর্গাচরণ লাহা, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রভৃতি) বা যে কোনো অর্থবান্ লোক ব্যবসা-পত্র ছেড়ে মুনাফার লোভে জমিদারী কিনতে থাকলেন। এমন কি, বিংশ শতকের প্রথম পাদেও অবস্থা অব্যাহত ছিল। এর সঙ্গে বোম্বাইয়ের একালের বণিক্ ও অর্থবান্দের তুলনা করলে দেখব—সেখানে জমিদারী ও মুনাফার সুযোগ ছিল না; অর্থবান্রা সেখানে তাই টাকা খাটাতে লাগল প্রথম ব্যবসায়ে, তারপর কলকারখানায়। জমিদারীতন্ত্র বাঙালীর বাণিজ্য-প্রয়াস ও শিল্পোদ্যোগকে আরও পঙ্গু করেছে। এর ফলে জমিদারী কিম্বা বাড়িভাড়া বা কোম্পানির কাগজে টাকা খাটানোই বাঙালী অবস্থাপন্নের পক্ষে নিয়ম হয়ে ওঠে। পুরুষানুক্রমে যে কোনো একটা স্থায়ী বিধি-ব্যবস্থা, স্থাণু অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানকে জমিদারীর মত আঁকড়িয়ে থাকাই হল এই অলস শ্রেণীর অভ্যাস।

চার জমিদাররা প্রথম থেকেই কৃষির প্রতি উদাসীন থেকে কেবল মুনাফা আহরণের সহজ উপায় খুঁজেছিল। যুগ যুগান্তর ধরে প্রজা যে জমি চাষ করত বর্ধিত খাজনার লোভে জমিদাররা তা থেকে প্রজাদের উৎখাত করছিল। আবার প্রায় প্রথম থেকেই বাঙলা দেশে সৃষ্টি হতে লাগল জমিতে মধ্যস্বত্ব—তালুকদারী, পত্তনিদারী, দর-পত্তনিদারী প্রভৃতি নানা স্তরের উপস্বত্ব। এই ভূমিস্বত্বের উপস্বত্ব আশ্রয় করেই বাঙলা দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণী প্রথম দাঁড়িয়ে ওঠে। পরে (১৮৩৫) সরকারী চাকরিও হয় তার দ্বিতীয় আশ্রয়।

একটা কথা : খাজনাভোগী ও জমির মালিক একটা মধ্যবিত্ত শ্রেণী বাঙলাদেশে মুসলমান আমলেও ছিল; সম্ভবতঃ হিন্দু আমলেও তাদের দেখা যায়। রাজকর্মচারী, টোলের পণ্ডিত, বৈদ্য প্রভৃতি উচ্চবর্ণের বৃত্তিধারীরা জমিতে এরকম উপস্বত্ব ভোগ করতেন (দ্রষ্টব্য—'ইতিহাস' পত্রে ডঃ নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহের প্রবন্ধাদি)। এঁরা পূর্বেও অক্ষম ছিলেন না—কিন্তু এখন জমিদারীতন্ত্রের মধ্যে এঁরা সংখ্যায় ও ক্ষমতায় ক্রমেই প্রসার লাভ করতে পারলেন। শ্রেণী

হিসাবে বাঙালী 'ভদ্রলোক' তাই দাঁড়িয়ে উঠল। অবশ্য কর্ন'ওয়ালিস সামান্য বেতনে ছাড়া দেশীয়দের সরকারী-কর্মে নিয়োগ নিষিদ্ধ করেছিলেন। ইং ১৮৩৫এর পরে যখন শিক্ষিত দেশীয়দের ১ শত টাকার উর্ধ্ব' বেতনেও রাজকার্যে নিয়োগের নীতি বেণ্টিঙ্ক ঘোষণা করেন তখন এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্যতম জীবিকোপায়ও আয়ত্ত হল। হিন্দু কলেজের শিক্ষা গৌরবে ইংরেজী বিদ্যায় কৃতবিদ্যরা (কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মধুসূদন দত্ত, পরে হরিশ মুখুজ্জে প্রভৃতি) সামাজিক মর্যাদায় ক্রমে জমিদারদের সমকক্ষ হন। এ কথা বোঝা দরকার: (ক) এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও শিক্ষিত শ্রেণী (intelligentsia) কালক্রমে এক হয়ে ওঠেন। বাঙলার 'ভদ্রলোক' শ্রেণী বলতেও এঁদেরই বোঝায়। (খ) বাঙালী মধ্যবিত্ত মোটামুটি জমিতে বাঁধা; অনেকটা সামন্ত ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত। তাই বাঙালী মধ্যবিত্ত ধনিক-উদ্যোগে উৎসাহী ইংরেজী 'মিডল ক্লাস' হয়ে উঠে নি। এবং (গ) নানাবিধ কারণে কোনো দিনই মুসলমান মধ্যবিত্ত যথেষ্ট সংখ্যায় উদ্ভূত হতে পারে নি—মুসলমান রাজত্বকালে মধ্যবিত্ত বিশেষ গণনীয় ছিল না। ১৭৯৩এর জমিদারী-তন্ত্রের মধ্যেও মুসলমান সম্ভ্রান্তদের মোটেই স্থান হয় নি। (ঘ) প্রথম দিকে (ইং ১৮১৭-৫৮ পর্যন্ত) রামমোহন, রাধাকান্ত দেব, কিম্বা পাথুরিয়াঘাটা, পাইকপাড়া, জোড়াসাঁকোর 'রাজা'রা ও কালিপ্রসন্ন সিংহ প্রভৃতি অভিজাত-গোষ্ঠী নতুন সমাজ-জীবনে নেতৃত্ব করেছেন। কিন্তু গোটা উনবিংশ শতক জুড়ে জমিদারীতন্ত্রের আওতায় মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক-শ্রেণীর শ্রীবৃদ্ধি সম্ভব হতে থাকে। প্রথমে হিন্দু কলেজে শিক্ষা পেয়ে ও পরে স্কুল কলেজের ক্রমবিস্তারে ভদ্রলোক শ্রেণী আত্মপ্রকাশের সুযোগ পায় আর তার সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার'ও করে। তাই, এই 'ঔপনিবেশিক যুগে'র বাঙলা সংস্কৃতি বা সাহিত্যকে কেউ মধ্যবিত্তের সাহিত্য' বা 'ভদ্রলোকের সাহিত্য' বললে তা একেবারে ভুল হবে না। অন্ততঃ ইং ১৮১৭ (হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা) থেকে ১৯১৮ (প্রথম মহাযুদ্ধের শেষ ও কৃষি সংকটের প্রকাশ-কাল) পর্যন্ত একশত বৎসরকে 'মধ্যবিত্তের মধ্যাহ্নকাল' বা ভদ্রলোকের শতাব্দী' বললেও অন্যায় হয় না। (ঙ) আর একটি কথাও তাই স্পষ্ট—'কলোনির মধ্যবিত্ত' আত্মদ্বন্দ্বে, শিক্ষায়, চারিত্রিক অসঙ্গতিতে খণ্ডিত জীবন যাপন করতে বাধ্য; তার সাহিত্যেও তার আঁকা-বাঁকা, তীব্র তির্যক্ প্রকাশ প্রত্যাশিত।

চতুর্থ কথা: মুসলমানের ভাগ্যবিপর্যয়—ধর্মগত পার্থক্য সত্ত্বেও

বাঙালী মুসলমান বাঙালী। বাঙালী মুসলমান ও বাঙালী হিন্দুর সম্পর্ক ভারতের অন্য প্রান্তের হিন্দু ও মুসলমানের সম্পর্কের মত নয়। কারণ, এখানে তারা সকলেই শুধু একই (বাঙলা-ভাষা) ভাষা-ভাষী নয়, একই জীবনযাত্রারও অধিকারী ছিল। পাঠান আমল থেকেই বাঙলার মুসলমান তাই বাঙালী। মুঘল আমলেও তা'ই। সে সময়েও অবাঙালী মুসলমান শাসকশ্রেণী সাধারণ মুসলমানের এই বাঙালীত্ব নিয়ে আপত্তি করে নি। বরং অষ্টাদশ শতাব্দীতে এসে ওপরতলার বাঙালী হিন্দুও অনেকটা মুসলমানী আদবকায়দা গ্রহণ করে ওপরতলার মুসলমানের কাছাকাছি এসে গিয়েছিল—নিচের তলায় গ্রাম্য সমাজের হিন্দু-মুসলমান তার বহুদিন পূর্বেই পরস্পরের আত্মীয় হয়েছে। বাঙালী জাতীয়তার এই 'প্রোসেস্'টা বিশেষ করে বাধা পেল বরং ১৭৫৭এর পর থেকে, তৃতীয় এক শক্তির রাজ্যলাভে। সাধারণ হিন্দু ও মুসলমান অবশ্য প্রায় নিষ্ক্রিয়ভাবেই তা মেনে নেয়। কিন্তু স্বভাবতই ওপরতলার মুসলমান সামন্তরা ইংরেজ-আমলে ক্ষমতা হারিয়ে বারবার বিদ্রোহ করেছিল; কিছু কিছু হিন্দু সামন্তও ছিল সেরূপ বিদ্রোহী। তবে সাধারণভাবে বলা যায়, নবাবদের দরবারী নিয়মের বদলে কোম্পানির ইংরেজী আধিপত্য মেনে নিতে হিন্দু-রাজ-কর্মচারীদের বা হিন্দু রাজপ্রসাদজীবীদের বেশি বাধা হল না। বিশেষ করে, চতুর হিন্দু বৃত্তিজীবীরা তৎপূর্বেই দালাল, মুন্সি, মুৎসুদ্দি হিসাবে কোম্পানির সাহেবদের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। কাজেই হিন্দু অভিজাতদেরও ইংরেজ-প্রাধান্য স্বীকার করতে বেশি আপত্তি হয় নি। কিন্তু মুসলমান অভিজাত তার গর্ব ও সুযোগ ছাড়তে যে সেরূপ সহজে রাজী হল না, তা সহজবোধ্য। সাধারণ মুসলমানও (১৭৬৪এর পরে) চমকিত হয়ে দেখল—নবাবের রাজ্যনাশে সে আর 'রাজার জাতি' রইল না। বরং কোম্পানির লুণ্ঠনে, শোষণে উৎপীড়িত সাধারণ মুসলমানও পূর্বেকার শাসক মুসলমানের ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের স্বপ্নে একটা নিষ্ক্রিয় সহানুভূতি বোধ করত। তাই বলা যায়, বাঙালী মুসলমান,—কেউ প্রকাশ্যে, কেউ গোপনে, কেউ সক্রিয় ভাবে, কেউ নিষ্ক্রিয় ভাবে,—মোটের ওপর কোম্পানির শাসনের বিরোধীই ছিল। অপর দিকে, হেস্টিংস-এর মত চতুর শাসক অবশ্য কলকাতায় মাদ্রাসা স্থাপন করে তাদের বিরূপতা দূর করতে চাইছিল; কিন্তু মুসলমানদের প্রতি আশঙ্কা ও সন্দেহ কোম্পানির শাসক-গোষ্ঠীর মনে বরাবরই ছিল (কাজী আব্দুল ওদুদ সাহেব 'বাঙলার জাগরণে' তা' মনে করেন নি। দ্রষ্টব্য বাঃ জা, পৃ ১১৪)। কার্যতঃ মুসলমানদের

প্রভাব-প্রতিপত্তি নষ্ট করা ছিল ১৭৬৫ থেকে প্রায় ১৮৭৫ পর্যন্ত অলিখিত ব্রিটিশ নীতি। ব্রিটিশ রাজত্বের প্রথম দিকে মুসলমান অভিজাতরা বিশেষ সুবিধা লাভ করল না, করবার কথাও নয়। কারণ, জমির ইজারাদারী ও খাজনা আদায়ের কাজে মুর্শিদকুলী খাঁর সময় থেকে (ইং ১৭০৭এর কাছাকাছি) হিন্দু দেওয়ান ও কর্মচারীই প্রাধান্য অর্জন করে। পরে ইং ১৭৯৩তে জমিদারী প্রথার আওতায় মধ্যস্বত্ব-লাভেও মুসলমানগণ বিশেষ যত্নপর ও অগ্রসর হন নি। কারণ, মুসলমান সমাজে ওপরতলার অভিজাত ও নিচতলার কৃষক বৃত্তিজীবী ছাড়া মধ্যবিত্ত শ্রেণী ততদিন পর্যন্ত প্রায় ছিল না.—বাঙালী মধ্যবিত্ত প্রায়ই ছিল হিন্দু। ১৮২৮এর লাখেরাজ বাজেয়াপ্তের নীতিতে মুসলমান শিক্ষাদীক্ষার আর্থিক আশ্রয়ভূমিও হারাল—এ সাংস্কৃতিক বিপাকের তুলনা নেই। এর পরে 'হুসরার' রাজত্বে ক্ষোভের বশে দূরে সরে থেকে মুসলমান সমাজ আপনার আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রাধান্য আরও হারাতে লাগল। (মুসলমানের দুর্গতি বোঝবার পক্ষে W. W. Hunter-এর Indian Mussalmans অবশ্য দ্রষ্টব্য।)

যতই তার দুর্দশা বৃদ্ধি পেল ততই স্বাভাবিক ভাবে মুসলমান সমাজে ক্ষুব্ধ আত্মজিজ্ঞাসাও জাগল। ক্ষুব্ধ আত্মজিজ্ঞাসা সুস্থ আত্মজিজ্ঞাসা নয়। ঊনবিংশ শতকের তৃতীয় দশকে সে তাই মনমতো উত্তর দেখল ওহাবী তত্ত্বে ও কর্মনীতিতে। সহজেই রাজ্যচ্যুত মুসলমান মেনে নিল ইসলামের বিশুদ্ধ নীতি থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে বলেই বাঙলার ও ভারতের মুসলমানের এই শাস্তি। অর্থাৎ ধর্মগত গোঁড়ামি ও মধ্যযুগীয় মতাদর্শকেই মুসলমানরা আঁকড়ে ধরতে গেল। রায় বেরিলীর সৈয়দ আহমদ ইং ১৮২২এর পরে মক্কা থেকে ফিরে আম্বালা, পাটনা, কলকাতা পর্যন্ত এই ওহাবী বিদ্রোহের আহ্বান জানান,—মধ্য বাঙলা তাতে কম সাড়া দেয় নি। পরবর্তী প্রায় ৫০ বৎসর কাল পর্যন্ত পাটনা ও মধ্য বাঙলা হয় ওহাবী আন্দোলনের কেন্দ্র (ইং ১৮২৬-১৮৭০)। তত্ত্ব হিসাবে ওহাবী-মতবাদ কতজন বাঙালী গ্রহণ করেছিল ঠিক নেই; কিন্তু এই জেহাদী মনোভাব বাঙলা দেশে বেশ ব্যাপক হয়। তিতুমীরের অভ্যুত্থান (১৮৩১) তার প্রকাশ্য প্রমাণ (অথচ হিন্দুসমাজে তখন বাঙালী ইয়ং বেঙ্গলের বিদ্রোহ বহ্নিমান)। ঢাকা ও ফরিদপুরে মৌঃ শরিয়তুল্লা ও দুধামিঞার নেতৃত্বে পরিচালিত অনুরূপ আন্দোলন, 'ফরাজী' আন্দোলন নামে (প্রায় ১৮২৮ থেকে ১৮৩০ পর্যন্ত) জনসাধারণের মধ্যে প্রবল আকার ধারণ করে। সেখান থেকে

দলে দলে মুসলমান যুবক শিখদের বিরুদ্ধে জেহাদে যোগদান করতে যেত, পাঞ্জাবে ও সীমান্তপ্রদেশে প্রাণ দিত (ইং ১৮৫১ পর্যন্ত)। পরে (দ্বিতীয়ার্ধে), অবশ্য মুসলমানের ধর্মবিশুদ্ধির চেষ্টা পরিত্যক্ত হল না, তবে নবাব আবদুল লতিফ ও মৌঃ কেরামত আলীর চেষ্টায় ব্রিটিশ বিরোধ কমল। ২৪ পরগণা, নদীয়ায় তিতু মিঞা বা তিতুমীরের (ইং ১৮৩১-১৮৩২) মুসলমান ও হিন্দু কৃষকের বিদ্রোহ কলকাতাকেও শঙ্কিত করে তোলে। ধর্মগত গোঁড়ামি সত্ত্বেও ফরিদপুর ও নদীয়ার দুই আন্দোলনই বহুল পরিমাণে ছিল উৎপীড়িতের ব্যর্থ বিদ্রোহ। কিন্তু ধর্মোন্মাদদের বাড়াবাড়িতে হিন্দু নেতারা সংবাদপত্রে এসব আন্দোলনের বিরুদ্ধে কলরব তোলে। আন্দোলনও ব্যর্থ হয়ে যায়।

ব্যর্থ বিদ্রোহের পরে ইং ১৮৩৫ থেকে ইং ১৮৩৮এর মধ্যে বাঙালী মুসলমান সমাজ শেষ ক্ষমতাও খোয়ায়। ১৮২৮ থেকেই কোম্পানির সরকার 'আয়েমা' সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে মুসলমান-সমাজের শক্তিকেন্দ্র ভেঙে দিয়েছিল। ১৮৩৫-এর পরে ১৮৩৮এ কোম্পানি ফৌজদারী বিচারে কাজীদের স্থান বাতিল করে এবং আদালতের কাজে ফারসির পরিবর্তে বাঙলা ভাষা প্রবর্তন ক'রে মুসলমান সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠাও বিনষ্ট করে। (এ বিষয়ে সাধারণ ভাবে W. Cantwell-Smith-এর Modern Islam in India, 1943 ও W. Hunter-এর পুনর্মুদ্রিত Indian Mussalmans, 1871 দ্রষ্টব্য।) অবশ্য ওহাবী-চক্রান্ত তথাপি বাঙলা থেকে উত্তর প্রদেশ পর্যন্ত গোপনে-গোপনে চলতে থাকে।

কিন্তু এই বিক্ষোভ, হতাশা ও ওহাবী চিন্তার প্রভাবে শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ভাগ্যবিপর্যয় থেকে মুসলমানের যে ভাববিপর্যয় দেখা দিল তা জানা প্রয়োজন। পূর্বে বিশেষ করে তার লক্ষ্য ছিল শিখ সাম্রাজ্য। ইংরেজের বিরুদ্ধে বৈরিতা কমল যখন মৌঃ শরিয়তুল্লা ভারতবর্ষকে দার-উল-ইস্লাম ঘোষণা করলেন। কিন্তু ধর্ম ও সংস্কৃতিতে তিনিও চাইলেন বিশুদ্ধ ইস্লামের প্রসার—সমস্ত হিন্দু ভাব ও প্রথা-নিয়মের সঙ্গে মুসলমান জনগণের সম্পর্কচ্ছেদ। তখন থেকে শরিয়তের নিয়ম কানুন অক্ষরে অক্ষরে পালন করে সমাজ-শুদ্ধি করার জন্ত বাঙলায় মুসলমানের মধ্যে অবাধ প্রচার চলে। এর এক প্রত্যক্ষ ফল :—ইংরেজী শিক্ষার প্রতি বাঙলার ও ভারতের মুসলমানের দীর্ঘকালীন ঔদাসীন্য থেকে যায়। পরোক্ষ ফল বাঙালীর জাতীয়তা ও বাঙালীর সংস্কৃতির পক্ষে আরও মারাত্মক হয়। বাঙালী মুসলমান বাঙালী হিন্দুর সঙ্গে চিরদিন একযোগে যে সামাজিক

পার্বণ উৎসবাদি পালন করত ক্রমশঃ তা' থেকে দূরে সরে যেতে লাগল,—এবং একান্ত ভাবে শরিয়তী গোঁড়ামি ও আরবী-ফারসি ধর্ম-শিক্ষাকেই আশ্রয় করতে গিয়ে গতানুগতিক আরবী ফারসি বিষয়বস্তু ও কেচ্ছা, ধর্মনামা ও ইসলামী পুরাণ রচনা করল (১৮০০-১৯০০)। অর্থাৎ বাঙালী সংস্কৃতির প্রস্তুতি (১৮০০-১৮৫৭) ও প্রকাশের (১৮৫৭-১৯১৮) পথে বাঙালী মুসলমান পশ্চাৎপদ হয়ে রইল। ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার ফলে বাঙালী হিন্দু যখন আধুনিক শিক্ষাদীক্ষা সংগ্রহ করেছে (১৮১৭ থেকে), ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার বিরোধিতায় বাঙালী মুসলমান তখন সামন্ত যুগের গোঁড়ামিকে আরও সবলে আঁকড়ে ধরেছে। ফলে সে শুধু আত্মবিস্মৃত নয় যুগভ্রষ্ট এবং আত্মদ্রোহীও হয়ে পড়ল। বাঙালী মুসলমান নিজেও তাই পশ্চাৎপদ হয়ে রইল, ঊনবিংশ ও বিংশ শতকের বাঙালীর জাতীয় বিকাশকেও অবজ্ঞা করল। অবশ্য মুসলমানের এ ভাব-বিপর্যয় শুধু নিজের ঔদাসীন্যের জন্যে হয় নি, নানা বাস্তব অসুবিধার জন্যেই ঘটেছে। সরকারী বিরোধিতা বিশেষ করে তার ভাগ্যেই বেশি জুটেছে। সিপাহী যুদ্ধের পরে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইংরেজের বিরূপতা কিছু কাল আরও বৃদ্ধি পায়। ক্রমে উত্তর প্রদেশে সৈয়দ আহমদ খাঁ ইংরেজী শিক্ষাদীক্ষা ও ইংরেজের সহযোগিতার দিকে মুসলমানদের মুখ ফেরাতে পারেন। তার পূর্বেই বাঙলাদেশে মুসলমানদের ইংরেজী শিক্ষা দিতে চেষ্টা করেন নবাব আব্দুল লতিফ। মৌঃ আব্দুল লতিফ (ফরিদপুরের) ইং ১৮৬৮, ও সৈয়দ আমির হোসেন (পাটনার) ইং ১৮৮০'তে মুসলমানদের সপক্ষে আধুনিক শিক্ষার দাবী তোলেন। পাদ্রী লঙ্ ও হিন্দু সম্প্রদায়ের মুখপত্র 'বেঙ্গলী' ও 'হিন্দু পেট্রিয়ট' তাঁদের দাবী জোর গলায় সমর্থন করেন। হাণ্টার সাহেব এ দাবী সমর্থন করলেও ছোটলাট এ্যাশলি তাতে উৎসাহ দেন নি। বাঙলায় সৈয়দ আমীর আলীও তখন বাধা সৃষ্টির পরিবর্তে সৈয়দ আহমদের মত যুক্তিসিদ্ধ ইস্লামের ব্যাখ্যা করছিলেন। এই ইংরেজী-শিক্ষিত স্বল্পসংখ্যক মুসলমান সহজেই ইংরেজ-রাজের সুনজরে পড়েছেন, তা ঠিক ; কিন্তু মুসলমান সমাজ তাই বলে তখন ইংরেজের সুনজরে পড়ে নি। স্বদেশী যুগের পূর্ব পর্যন্ত মুসলমানই ছিল সাম্রাজ্যবাদের দুয়োরাণী, এ কথা মোটামুটি ঠিক। বিংশ শতকে সে সুয়োরাণী হয়।

যা এখানে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য তা হচ্ছে এই যে, প্রথমতঃ ১৮০০এর পরে ইংরেজ শাসনের মধ্যে যেটুকু নতুন শক্তি সংগঠনের বাস্তব সুযোগ এল তা

বাঙালী হিন্দুরাই গ্রহণ করল, বাঙালী মুসলমানরা পেল না ও গ্রহণ করতে পারল না। দ্বিতীয়তঃ, বাঙালী হিন্দু ও বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকে যে আর্থিক বৈষম্য ও অসম বিকাশের সূত্রপাত হল তা দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ বিংশ শতকে দুই সম্প্রদায়কে প্রতিদ্বন্দ্বী করে তোলার সুযোগ পেল। তৃতীয়তঃ, জাতীয়তার ও জাতীয় সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এই অসম বিকাশের ছায়া ১৮৫৭এর পর থেকে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। এক-আধজন মুশাররফ হুসেন বা নজরুল আর পরবর্তী কালের (বিংশ শতকের) বাঙালীর ইতিহাসের ট্র্যাজিডিকে (১৯০৬-৪৭) ঠেকাবার পক্ষে যথেষ্ট হল না।

সমগ্রভাবে দেখলে বাঙলা সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা বড় দুর্ঘটনাই এইটি :—একই জাতির অঙ্গীভূত হয়েও বাঙালী হিন্দুর ও বাঙালী মুসলমানের এই অসম বিকাশ। বাঙালী সংস্কৃতি ও সাহিত্যে প্রধান প্রতিষ্ঠা হিন্দুর ; মুসলমান সেখানে প্রতিষ্ঠাহীন অনেকাংশে আত্মবিস্মৃত, তার সৃষ্টি-প্রতিভা এখনো প্রায় অনাবিষ্কৃত। ঊনবিংশ শতকের বাঙালী জাগরণে এজন্য হিন্দুত্বের রঙ ক্রমেই বেশি করে লাগল (বিশেষ করে 'প্রকাশের পর্বে'), আর ক্রমেই বাঙালী হিন্দু ও বাঙালী মুসলমানের মধ্যে ভেদরেখা গভীর হয়ে উঠতে থাকল।

পঞ্চম কথা ঃ কলিকাতা কমলালয়—পল্লীসমাজ যেমন ভাঙল ও শিল্প-পণ্যের বাজার গড়ে উঠল শহরে, তেমনি আধুনিক বাঙালী সমাজের জীবন কেন্দ্রিত হয়ে উঠতে লাগল কলকাতায়। হুগলী, চুঁচুড়া, কৃষ্ণনগরেও তার ছায়া পড়ে। কিন্তু আধুনিক কলকাতাই আধুনিক বাঙলা সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র। গৌড় বা নদীয়ায় পূর্ব পূর্ব যুগের বাঙলা সাহিত্য সত্য সত্যই কতটা রচিত হয়েছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। মোটামুটি এতদিন পর্যন্ত বাঙলা সাহিত্য ছিল পল্লীসমাজের বুকের জিনিস। তাই পল্লীসমাজ ভাঙলে বাঙলার সমাজ সাহিত্য সংস্কৃতি সব-কিছুরই বাসাবদল হ'ল—এল শহরে, কলকাতায়।

এ কলকাতা অবশ্য ইংরেজেরই শহর। তবে কলকাতা জব চার্নকের আবিষ্কার নয়। কারণ, জব চার্নক যখন কলকাতা আশ্রয় করেছিলেন তারও পূর্বে সুতানটি কলকাতায় গঙ্গাতীরের একটা গঞ্জ বা আড়ত ছিল।* বিপ্রদাসের

---

* কলকাতা নাম থেকেই তা' বোঝা যায়—এটি 'কল' বা 'কলি' শামুক চূণের 'কাতা' বা গোলা, আড়ত। 'চূণা গলি', 'চুণাপুকুর' তার স্মৃতি এখনো জেগে রয়েছে। শ্রীযুত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এ ধারণা পোষণ করেন।

মনসামঙ্গলে (১৪৯৫-৯৬) কলকাতার প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে প্রায় এক শত বৎসর পরে কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গলে (ইং ১৬০৪ ?) ভাগীরথীর দুই তীরের গ্রামের নাম রয়েছে। আর তারও প্রায় একশত বৎসর পরে ইং ১৬৯৮ খ্রীষ্টাব্দে বাঙালী জমিদার সাবর্ণ চৌধুরীদের কাছ থেকে ইংরেজ কোম্পানি কলকাতা, সুতানটি ও গোবিন্দপুর ইজারা নেয়। আর্মানি বণিকেরা ইংরেজের আগেই এখানে ব্যবসা গেড়েছে। কলকাতার প্রাচীনতম চিহ্ন হচ্ছে আর্মানি গির্জায় রীজাবিবির (১৬৩১ ইং) সমাধি-চিহ্ন। সুবর্ণবণিক ও তন্তুবায়রা তখনো ব্যবসা-প্রধান ছিল। প্রথমে সুরাট, বোম্বাই, মাদ্রাজও কোম্পানির ব্যবসা-কেন্দ্র হিসাবে সামান্য ছিল না। তারপর ইংরেজের ভাগ্যোদয়ের সঙ্গে কলকাতা ফেঁপে উঠল। কোম্পানির কুঠির বেনিয়ান, মুৎসুদ্দি রূপে ব্রাহ্মণ কায়স্থ 'অভিজাত'দের পূর্বপুরুষেরাও কলকাতায় আসতে লাগল। ইংরেজ বণিকের গঠনপ্রতিভা ও শক্তির ওপর ভরসা করে কেউ কেউ বর্গীর ভয়ে কলকাতা আশ্রয় করল। রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণবল্লভ প্রভৃতি ভাগ্যান্বেষীরাও অনেকে কলকাতায় আশ্রয় নেয় নবাবের বিরোধী পক্ষ রূপে। তারপরে পলাশী—১৭৫৭। ১৭৬৮ সালে মুর্শিদাবাদ থেকে শাসনকেন্দ্র কলকাতায় চলে এল। ১৭৭৩ থেকে কলকাতাই হল ইংরেজের ভারত রাজ্যের রাজধানী। ইং ১৯১১ পর্যন্ত কি চীনের বাণিজ্য, কি বর্মা যুদ্ধ—সমস্ত অর্থনৈতিক ও মানসিক-আধ্যাত্মিক উদ্যোগ ইংরেজ রাজশক্তি এখানে থেকেই প্রারম্ভ করেছে, ও পরিচালিত করেছে। স্বভাবতই বণিক্‌যুগের পরে ঔপনিবেশিক শিল্প-প্রসারের প্রধান ক্ষেত্রও হয়েছে কলকাতা। গঞ্জ থেকে কলকাতা হয়েছে বন্দর, তারপর শিল্পনগর, শেষে মহানগর। হাণ্টারের অনেক কথার মতই এই কথাও অর্ধসত্য, তবে স্মরণীয় অর্ধসত্য ("Our Indian Empire")। ভারতবর্ষে ইংরেজের কৃতিত্ব আধুনিক নগর নির্মাণ, "এ কাজে আমাদের ইংরেজদের যোগ্যতা প্রতিভা যে অতুলনীয় তা আধুনিক শিল্পবাণিজ্য কেন্দ্রে আমাদের মহানগর নির্মাণের সাফল্যে প্রমাণিত হয়। আমাদের মহানগর নির্মাণের অসাধারণ প্রতিভা ছিল বলেই ভারতবর্ষে নতুন শ্রমশিল্পযুগের সূচনা হয়েছে।" অথবা, ইংলণ্ডে শিল্পযুগ এল বলেই ইংরেজের মহানগর নির্মাণের প্রতিভাও বিকাশ লাভ করল। না হলে ক্লাইভের কথাতেই জানি, তাঁর আমলেও মুর্শিদাবাদ লণ্ডনের অপেক্ষা বিশালতর ছিল! তারপরে ইংরেজের 'গঠন-প্রতিভায়'

ঢাকা, সুরাট, মুর্শিদাবাদ ক্রমেই ম্রিয়মাণ হ'ল ; কাশিমবাজার, হুগলী, মালদহ আর জাগল না ; বরং খালবিল মজে পুরনো গঞ্জ, বন্দর পরিত্যক্ত হল। কাজেই মূল সত্য হল—শিল্পবিপ্লব ও শিল্পবিপ্লবে ইংরেজের নেতৃত্ব, এই হল ইংরেজের প্রতিভার অর্থ।

কিন্তু কলকাতা জাগল। কাদের নিয়ে জাগল কলকাতা? ইংরেজ আর্মানি, মারোয়াড়ী, ক্ষেত্রী প্রভৃতি বণিক্‌দের শুদ্ধ কলকাতা জেঁকে উঠল তার প্রথম ব্যবসায়ী বণিক্‌ বাসিন্দা, মল্লিক, শেঠ, বসাক, শীল, বড়াল, আঢ্য প্রভৃতি সুবর্ণবণিক্‌ ও তন্তুবায়দের নিয়ে। তারপর ইংরেজ কোম্পানি ও তার সাহেবদের বেনিয়ান, মুৎসুদ্দি, দেওয়ান, মুন্সি প্রভৃতি অনুগ্রহজীবী ভাগ্যান্বেষী-দের নিয়ে। মহারাজা নবকৃষ্ণ, রাজা রাজবল্লভ, দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, গোবিন্দ মিত্র, কান্তবাবু, গৌরী সেন, দর্পনারায়ণ ঠাকুর, লক্ষ্মীকান্ত ধর, রাজা সুখময় রায়, আমীর চাঁদ, বৈষ্ণবচরণ শেঠ, হাজারীমলদের এখানে ভাগ্যলাভ হল। ১৮০০এর পূর্বেই জগৎশেঠের ঐশ্বর্য প্রায় শেষ হয়ে গেল,—হেষ্টিংস স্থাপন করেছিলেন প্রথম জেনারেল ব্যাঙ্ক (১৭৭০)। তারপরে আরও ব্যাঙ্ক গড়ে ওঠে। লণ্ডনের ব্যাঙ্কের শাখাও প্রতিষ্ঠিত হয়। ইংরেজ বণিকের ১৯টি এজেন্সি হাউস ইং ১৭৯৭-এই এখানে ছিল, ১৮১৩এর পর থেকে উদ্যোগী বণিক্‌দের এজেন্সি হাউসের সংখ্যা কলকাতায় বৃদ্ধি পেতে থাকে। এইসব এজেন্সি ফার্মই একালের চা, কয়লা, লোহা, পাট প্রভৃতি শিল্পপণ্যের মহাকায় ব্রিটিশ কারবারীদের পথপ্রদর্শক। আর, এদের পার্শ্বচর ও অনুচর রূপে এগিয়ে এসেছিলেন কাওয়াসজী রুস্তমজী, কার-টেগোর কোম্পানির দ্বারকানাথ, রামদুলাল দে, মতিলাল শীল প্রমুখ দেশীয় উদ্যোগী পুরুষেরা। (রুস্তমজী কাওয়াসজীর বিষয়ে দ্রষ্টব্য যোগেশচন্দ্র বাগলের "উনবিংশ শতকের বাংলা"।) দিশী বিলিতি বণিক্‌-সহযোগিতার প্রথম প্রতিষ্ঠান রুস্তমজী টার্নার অ্যাণ্ড কোং (১৮২৭এর পূর্বে), ও কার-টেগোর অ্যাণ্ড কোং (১৮৩৪)। বীমা ব্যবসায়ে, ব্যাঙ্ক পরিচালনায়, জাহাজ ব্যবসায়ে রুস্তমজী ছিলেন অগ্রগণ্য—তখনো কলকাতায় জাহাজ নির্মাণ হত। ১৮৪৮এ 'ইউনিয়ন ব্যাঙ্কে'র পতনে দু'টি ভারতীয় বণিক্‌ প্রতিষ্ঠানই লুপ্ত হল। তখনো বাঙালীরা অনেকে ব্যবসায়ী ছিলেন। কিন্তু ১৮৫০-এ পৌঁছতে না পৌঁছতেই দেখি—দেশীয় বণিকেরা কেউ পণ্যোৎপাদনে অগ্রসর হতে পারলেন না। ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক চালাতে গিয়ে রুস্তমজী ও দ্বারকানাথ ব্যর্থমনোরথ হলেন।

জাহাজী ব্যবসায়ে পি এণ্ড ও-র পত্তনে কাওয়াসজী পরাহত হলেন। পূর্বেকার দেশীয় ব্যবসায়ীরা অধিকাংশই জমিদারী কিনে, বাড়ির মালিক হয়ে, কোম্পানির কাগজে পুঁজি খাটিয়ে নিরুদ্যম বিলাসে জীবন-যাপন করেছেন। বেণ্টিঙ্কের কৃপায় শিক্ষিত বাঙালী সরকারী চাকরীতে পদ ও প্রতিষ্ঠা অর্জনে ঝুঁকে পড়ল। বাঙালী পুঁজি স্থায়ী ও স্থাণু হয়ে বসল জমিতে, বাড়িতে, কোম্পানির কাগজে। ১৮৫৮ সালেও আশুতোষ দে, রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি বড় বড় বাঙালী ব্যবসায়ী ছিলেন, বেনিয়ানের কাজও করতেন অনেকে (এ বিষয়ে বিনয় ঘোষের 'বাঙলার নব জাগৃতি'-তে উদ্ধৃত হিসাব দ্রষ্টব্য)। কিন্তু ততক্ষণে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার চৌহদ্দির মধ্যে বাঙালী ব্যবসায়ীর পক্ষে স্বাধীন উদ্যোগ সুসম্ভব নয়। এবং বেনিয়ান, মুৎসুদ্দি, দেওয়ান, দালালদের অত সাহসও হল না। অতএব, ১৮৩৮এর পর থেকে নব্য শিক্ষিত বাঙালী যেমন ডিপুটিগিরি পেয়ে চাকুরে হয়ে উঠলেন, মুৎসুদ্দিদের বংশধররা তেমনি বাবু-বিলাসে আরও নিমগ্ন হলেন। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নববাবু বিলাসে' (১৮২৩ ও কালী সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌সা'য় (১৮৬২) তাঁদের ব্যঙ্গচিত্র স্থায়ী হয়ে আছে। তা' থেকে কলকাতার 'বাবু'দের জন্ম ও বিবর্তনের কথাও জানতে পারি—

"ইংরাজ কোম্পানি বাহাদুর অধিক ধনী হওনের অনেক পন্থা করিয়াছেন এই কলিকাতা নামক মহানগর আধুনিক কাল্পনিক বাবুদিগের পিতা কিম্বা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আসিয়া…বেতুনভুক হইয়া কিম্বা রাজের সাজের খাটের ঘাটের মাঠের ইটের সরদারী চৌকিদারী জুয়াচুরি পোদ্দারী করিয়া অথবা কোম্পানির কাগজ কিম্বা জমিদারী ক্রয়াধীন বহুতর বিবাবসানে অধিকতর ধনাঢ্য হইয়াছেন…" ('নববাবু বিলাস')।

কলকাতার শ্রীবৃদ্ধিতে এদের ঐশ্বর্য ও বাবু-বিলাস বৃদ্ধি পায়। এবং সেই প্রয়োজনে কলকাতায় যে শহুরে সংস্কৃতির সৃষ্টি হয়—পাঁচালী, কবিগান, যাত্রাগান, খেউড়, তরজা, টপ্পা, হাফ-আখড়াই ও বুলবুলির লড়াই প্রভৃতিতে আমরা তার রূপ দেখতে পাই ;—একেই আমি 'বাবু কালচার' বলতে চেয়েছি।

কলকাতার গতিমুখর জীবনযাত্রায় শুধু এদেরই জন্ম হল না। সমস্ত বাঙলার বিলাসীদের যেমন কলকাতা আকর্ষণ করল তেমনি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করে সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা করে, ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা করে,—শিল্পবাণিজ্যে শিক্ষায়-দীক্ষায় শতমুখী উদ্যোগে আয়োজনে—সমাজ-জীবনে ভাব-বিপর্যয়ও কলকাতা অনিবার্য করে তুলল। তাই নূতন সংস্কার নিয়ে পুরুষশ্রেষ্ঠ রামমোহন

রায়ের মত ধনাঢ্য 'দেওয়ান' (ইং ১৮১৪), স্ত্রীশিক্ষা ও প্রাচ্য-বিদ্যাচর্চায় দৃঢ়ব্রত রাধাকান্ত দেব, নবোদ্যোগী দ্বারকানাথ ঠাকুর, উন্নয়নকামী প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রমুখ পুরুষ-প্রবরেরা শতাব্দীর প্রথম পাদেই এখানে উদিত হলেন। হিন্দু কলেজে অদ্ভুত-কর্মা 'ইয়ং বেঙ্গল', আর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রমুখ যুগন্ধর পুরুষেরা কলকাতাতেই সমগ্র ভারতবর্ষের জাগরণের যুগ উদ্বোধন করলেন। কলকাতার এই মহৎ সাধনাতে বাঙলা সাহিত্যেও আধুনিক যুগ জন্ম লাভ করল—বিষয়বস্তু নতুন হল, পরিধি বিস্তৃত হল, চিত্ত প্রবুদ্ধ হল।

॥ ৩ ॥ ভাব-বিপর্যয়

সমাজ-সংঘাতের ফলে ভাব-সংঘাত অনিবার্য, আর ভাব-সংঘাতই সাহিত্যের প্রবাহে প্রত্যক্ষভাবে নূতন বেগ সঞ্চার করে। ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার পক্ষে আবার এ কথাটাই বিশেষ রূপে সত্য। কারণ সে ব্যবস্থায় শাসক-শক্তি বাস্তব ক্ষেত্রে পরাধীনদের আত্মপ্রতিষ্ঠ হতে দেয় না—অথচ মানসিক ক্ষেত্রে পরাধীন-দের সম্পূর্ণ বাধা দিতেও পারে না। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভারত-বাসীর, বিশেষ করে আবার বাঙালীর, চোখের ঠুলিও বৈদেশিক শাসন সাহায্যেই খুলে যেতে লাগল। এবং, একবার তা খুলে যাবার পরে সাধ্য কি সে চোখে কেউ ঠুলি পরিয়ে দেয়? ইং ১৮০০-এর থেকে ১৮৫৭-এর মধ্যে বাঙালীর ভাবনেত্রই শুধু খুলল না, তার রসানুভূতিও ক্রমে জাগ্রত হল।

মুদ্রাযন্ত্র পূর্বেই এসেছিল। বাঙলা অক্ষরে বাঙলা বই ছাপা হয়েছিল উইল-কিন্স্ পঞ্চানন কর্মকারের কৃতিত্বে হ্যালহেডের ব্যাকরণ (A Grammar of the Bengali Language) ইং ১৭৭৮ অব্দে, হুগলী থেকে বাঙলা অক্ষরে মুদ্রিত সম্পূর্ণ গ্রন্থ (Regulations for the Administration of Justice in the Courts of Dewanee Adalat) আইনের বই ইম্পের কোড কলকাতা থেকেই ছাপা হয়েছিল ১৭৮৫ অব্দে। কলকাতার প্রথম প্রেসে প্রথম ইংরেজী সংবাদপত্র হিকির 'বেঙ্গল গেজেট' (১৭৮০) ছাপা হতে থাকে। এদিকে উইলকিন্সের ইংরেজী অনুবাদ 'ভগবদ্গীতা'ও বারাণসী থেকে ১৭৮৫তে প্রকাশিত হয়। আর ১৭৯৯এর ডিসেম্বর মাসে ফর্স্টারের বাঙলা-ইংরেজী শব্দ-সংগ্রহ (A Vocabulary) প্রথম ভাগ ছাপা হয়েছিল। তারপর ১৮০০ অব্দে শ্রীরামপুরে শ্রীরামপুর মিশনেরও মুদ্রাযন্ত্রের কাজ শুরু হয়, আর কলকাতায়

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। আরবী, ফারসি, সংস্কৃত ছাড়াও হিন্দুস্থানী, বাঙলা, তেলুগু, মারাঠী, তামিল, কানাড়ি ভাষা শিক্ষার ও পাঠ্য-গ্রন্থ প্রণয়নের আয়োজন চলল। ১৮০০ থেকে ইং ১৮১৫ পর্যন্ত কালটা বাঙলা লেখার এই প্রথম পর্বের কাল। তার পূর্বেই বেনিয়ান-মুৎসুদ্দির দল ইংরেজী শব্দ মুখস্থ করছিল, মুন্সি-দেওয়ানরা (যেমন, রামরাম বসু, তারিণীচরণ মিত্র প্রভৃতি) ইংরেজী শিখছিল। শেরবোর্ন স্কুল, কানিংহামের ক্যালকাটা অ্যাকাডেমি, ড্রমণ্ডের ধর্মতলা অ্যাকাডেমির মত ইংরেজী শেখার স্কুলও স্থাপিত হয়েছিল। ব্যবসায়ের খাতিরে ইংরেজী শেখা চলত। রাধাকান্ত দেব ও রাম-মোহনের মত উদ্যোগী পুরুষরা বৈষয়িক কাজের ইংরেজী বিদ্যা ছাড়িয়ে ইংরেজীর জ্ঞান-বিজ্ঞানের রাজ্যে সাগ্রহে প্রবেশ করেছিলেন। ১৮১৪ অব্দের শেষদিকে রামমোহন কলকাতায় এসে বাস করতে লাগলেন; ১৮৩০এর নভেম্বর পর্যন্ত তিনি কলকাতায় অধিষ্ঠিত থাকেন। ১৮১৫ অব্দে তাঁর 'বেদান্তগ্রন্থ' প্রকাশের সঙ্গেই এই 'দ্বিতীয় পর্যায়' বা রামমোহনী কালের সূচনা হল। ১৮১৩ অব্দে অবশ্য শিক্ষার জন্য সরকারী ব্যয়ের প্রস্তাব স্থির হয়; খ্রীষ্টান মিশনারিরাও খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের স্বাধীনতা পান; সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে বাঙলা স্কুল খুলে বসেন, আর ধর্মপুস্তিকা প্রভৃতি লিখে নামেন মসীযুদ্ধে। বাঙালী হিন্দু প্রধানরা তখন ইংরেজী শিক্ষা ও ইংরেজী-স্কুলের প্রয়োজন বেশি অনুভব করেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন সে দিনের মহাপ্রাণ ইংরেজ ডেভিড হেয়ার—শিক্ষিত বাঙালীর চিরদিনের নমস্য—আর সম্ভবতঃ ইংরেজের বিস্মৃত গৌরব। সুপ্রীম কোর্টের জজ স্যর এডওয়ার্ড হাইড্ ঈষ্ট-কে পুরোধা করে এই হিন্দু নেতারা হিন্দু কলেজ খুলতে এগিয়ে যান (ইং ১৮১৭ অব্দে)। মিশনারিদের শ্রীরামপুর কলেজ (১৮১৮) ও বিশপস্ কলেজ স্থাপিত হল (১৮২০); অন্যদিকে রামমোহন রায় ও ডেভিড হেয়ার নিজেরাও ইংরেজি শিক্ষার পাঠশালা খোলেন। সংবাদপত্র প্রকাশের কাজে নামলেন দু'তরফ ছেড়ে তিন তরফ—খ্রীষ্টান মিশনারি (সমাচার দর্পণ, ইং ১৮১৮–১৮৪১), হিন্দু প্রতিপক্ষ (সম্বাদ কৌমুদী, ইং ১৮২১ সমাচার চন্দ্রিকা, ইং ১৮২২) আর প্রগতিকামী হিন্দু রামমোহন ('সম্বাদ কৌমুদী'র পরে 'ব্রাহ্মণ সেবধি', প্রথম তিন সংখ্যা, ইং ১৮২১)। সমাজ ও সংস্কৃতির জগতে এভাবে খ্রীঃ ১৮১৫ থেকে ১৮৩০-এর মধ্যে অনিবার্য সংঘাত বাধল—নিরাকার ব্রহ্ম বনাম সনাতন হিন্দুধর্মের তর্ক, হিন্দুত্ব বনাম

খ্রীষ্টধর্মের তর্ক, শাস্ত্র বনাম যুক্তির তর্ক, রামমোহনই শুরু করলেন বাঙলায়, ইংরেজীতে, ফারসিতে, হিন্দুস্থানীতেও। ১৮১৫ থেকে ১৮৩০ (রামমোহনের বিলাত যাত্রা) পর্যন্ত রামমোহন এই সাংস্কৃতিক জগতের আসর জুড়ে ছিলেন। আর শুধু তর্কেও তার সমাপ্তি ঘটল না।—ডিরোজিও, ডেভিড হেয়ারের প্রেরণা, সত্য ও স্বাধীনতার নামে 'ইয়ং বেঙ্গলের' বিদ্রোহে আত্মপ্রকাশ করল (১৮৩০এর পরেই)। ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকরে'র (প্রথম প্রকাশ—২৮শে জানুয়ারি, ১৮৩১) মতই 'ইয়ং বেঙ্গলের' 'এনকোয়ারার' ও 'জ্ঞানান্বেষণ'কে (প্রথম প্রকাশ—১৮ই জুন, ১৮৩১) এজন্য এ-কালের মুখপত্ররূপে গণ্য করতে পারি। ক্রমে ইংরেজী শিক্ষার সপক্ষে মেকলের মন্তব্য (ইং ১৮৩৫) 'ওরিয়েন্টা-লিস্ট বনাম অ্যাঙলিসিস্টদের' সংঘাতের অবসান ঘটাল। ঢাকা, মেদিনীপুর, বরিশালে নূতন ইংরেজী স্কুল স্থাপিত হল। মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হওয়ায় চিকিৎসা বিজ্ঞানের কেন্দ্র তৈরী হল। বেন্টিঙ্কের (পরে হার্ডিঞ্জের, ইং ১৮৪৪) সরকারী কর্মে শিক্ষিতদের নিয়োগনীতি এই শিক্ষিত শ্রেণীর জন্য নূতন প্রতিষ্ঠা-পীঠ তৈরী করল। চাকুরে মধ্যবিত্ত এবার সমাজে একটা শক্তি হয়ে উঠতে পারবে। আর আইন আদালতে ফারসির স্থলে বাঙলার প্রবর্তন (১৮৩৮) যেমন বাঙলা ভাষার জন্মাধিকার স্বীকার করল, তেমনি শিক্ষার ভাষা হিসাবে বাঙলার পরবশ্যতাও মেকলের সময় থেকেই সুস্থির হয়ে রইল। 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র প্রতিষ্ঠায় (১৮৩৯) ও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র প্রকাশে (১৮৪৩) বাঙালী সমাজে ও বাঙলা সাহিত্যে সমাজ-সংস্কার ও স্বদেশাভিমানের ভাবোন্মাদনা সুস্থির রূপ পরিগ্রহ করতে থাকে। বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমারের হাতে বাঙলা ভাষা জ্ঞান-বিজ্ঞানের এবং দেবেন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ বসুর হাতে আত্ম-মর্যাদাময় ভাব-কল্পনার বাহন হয়ে উঠল—যুক্তির সঙ্গে রসানুভূতির ক্রমোন্মেষ ঘটছিল বিদ্যাসাগর ও দেবেন্দ্রনাথের গদ্য ভাষায়। প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদারের 'মাসিক পত্রিকা' (১৮৫৪), এই ভাষা ও ভাব অন্তঃপুরে পৌছে দেবার প্রয়াস। বিদ্যাসাগরের শিক্ষানীতি ও শিক্ষা-প্রয়াস, বিদ্যালয় স্থাপন, উডের শিক্ষা-বিষয়ক পত্র বা ডেস্‌প্যাচ (১৮৫৪) ও বর্তমান সরকারী শিক্ষা ব্যবস্থার গোড়াপত্তন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা (১৮৫৭), রাজনীতি ক্ষেত্রে বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সোসাইটি নামক দৃঢ় সংগঠনের প্রকাশ (১৮৪৩), তথাকথিত ব্ল্যাক বিলের সপক্ষে ও সনদ পরিবর্তনের কালে (১৮৫৩) রামগোপাল ঘোষ,

হরিশ মুখুজ্জে প্রভৃতির আন্দোলন, বিদ্যাসাগরের প্রবল পুরুষকারের চরম সাফল্য বিধবা-বিবাহ আইন পাশ করা (ইং ১৮৫৬), রেল ও টেলিগ্রাফের বিস্তার,—এসব বাঙলা দেশে যে ভাব-স্রোতকে সুপ্রবাহিত করে তোলে তাতে বুদ্ধির মুক্তিই শুধু সুদৃঢ় হয় নি, মুক্তির বুদ্ধিরও সূচনা হয়। একই কালে বাঙালী বহু বহু যুগের উত্তরাধিকার লাভ করল—রিনাইসেন্স, রিফর্মেশন, ফরাসী বিপ্লবের সঙ্গে শিল্প বিপ্লবের প্রবল তাড়না,—বেদান্তের সঙ্গে বাইবেল, শেক্স্‌পীয়রের সঙ্গে কালিদাস, বেকন ও হিউম, ও বেন্থাম টম্ পেনের সঙ্গে টডের রাজস্থান ও উপনিষদের ব্যাখ্যান। এ সত্য তখন প্রত্যক্ষ—অশোক আকবর যা' পারেন নি তা' সম্ভব হয়েছে, ইংরেজ কোম্পানি এক-রাজ্য-পাশে ভারতবর্ষকে একত্রবদ্ধ করেছে। শক-হূন-পাঠান-মোগলের যা' সাধ্য হয় নি বিলিতি ধনিকতন্ত্রের তা' সাধ্য হয়েছে—উপড়ে ফেলেছে অচল অনড় পল্লীসভ্যতার বনিয়াদ, এনে ফেলেছে 'মানি ইকোনমি' ও চলন্ত পৃথিবীর সঙ্গে 'বাজারের' যোগাযোগ। কবীর নানক চৈতন্যের কাছে যা' অভাবনীয় ছিল তা' সম্ভব করেছে মুদ্রাযন্ত্র ও রেলপথ,—টক্‌নোলজি ও ইডিয়োলজি মুক্তি দিয়েছে মানুষের চৈতন্যকে, মানবতাবাদ অবশেষে আবির্ভূত হচ্ছে। প্রস্তুতি সম্পূর্ণ।

॥ ৪ ॥ পথ ও প্রতিষ্ঠান

এই প্রস্তুতির কালটা অবশ্য কেবল সাহিত্যের পক্ষেই প্রস্তুতির কাল নয়,—আধুনিক যুগের বাঙালী-জীবন ও সংস্কৃতির পক্ষেও প্রস্তুতির কাল। সেই প্রস্তুতির প্রথম পথ হয় শিক্ষা, তার প্রধান রূপ দেখা দেয় সংঘাতে। ধর্ম, সমাজ ও জীবনের মৌলিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে এ সংঘাত তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে ওঠে। আর সংঘাতের ফলে গড়ে উঠতে থাকে নতুন-নতুন প্রতিষ্ঠান। উনবিংশ শতাব্দীর এই প্রথমার্ধের বিভিন্ন দিকের সে সব আয়োজন তাই লক্ষণীয়:—

বাঙলার মুদ্রাযন্ত্র (১৮০০) দিয়েই যুগের উদ্বোধন। কিন্তু (ক) ইংরেজী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বা স্কুল-কলেজ ও স্কুল-সোসাইটি (১৮১৮), স্কুল বুক সোসাইটি (১৮১৭) প্রভৃতিই নূতন শিক্ষার প্রথম ও প্রধান কেন্দ্র হয়। (খ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরেই ধর্মালোচনার প্রতিষ্ঠানের স্থান—মিশনারিরা ছাড়া রামমোহন ('আত্মীয় সভা', ইং ১৮১৫ সনে স্থাপিত), রাধাকান্ত দেব, ভবানীচরণ

বন্দ্যোপাধ্যায় ('ধর্মসভা') তার প্রধান কর্মকর্তা। (গ) তার সঙ্গে এল প্রচার-প্রতিষ্ঠান, বিশেষ করে বাঙলা সংবাদপত্র—'দিগ্দর্শন', 'বেঙ্গল গেজেট', 'সমাচার দর্পণ' (ইং ১৮১৮)। সংবাদপত্র ও পুস্তক-পুস্তিকার মাধ্যমেও সংঘাত জমে উঠল। এর পরেই (ঘ) লোকমত সংগঠনের ও পাব্লিক ম্যুভমেণ্টের আন্দোলনের পথও আবিষ্কৃত হল। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা খর্ব করার (১৮২৩) বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলনের বাহন হল সভা-সমিতি। গণ দরখাস্ত তার প্রকরণ (বা টেক্নিক্), 'অ্যাঙলিসিস্ট বনাম ওরিয়েণ্টালিস্ট'-দের শিক্ষাবিষয়ক সংঘাতে ও ১৮৩৩-এর সনদ পরিবর্তনের ব্যাপারেও তা দেখা গেল। এভাবে সভা-সমিতি ও আবেদন-নিবেদন গণ-আন্দোলনের একটা পরিচিত পদ্ধতি হয়ে গেল। (ঙ) পঞ্চম প্রকাশ ডিরোজিওর 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন' বা 'অ্যাকাডেমিক ইনস্টিটিউশন' (ইং ১৮২৮এর পূর্বেই প্রবর্তিত)। তা' প্রথম জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা সভা, বলতে পারি শিক্ষিত বাঙালীদের 'সংস্কৃতি-সভা'র গোড়াপত্তন।* অর্থাৎ শিক্ষিত শ্রেণী এবার শৈশব কাটিয়ে কৈশোরে পদার্পণ করছে—বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের যুগ এবার আসছে।

বলা বাহুল্য, এ সবই হচ্ছে নূতন ভাব-সংঘাতের প্রধান বাহন। না হলে বরাবরই এদেশে পণ্ডিত সভা ছিল, পণ্ডিতেরা প্রাচীন ধারায় বিচার করতেন। ইংরেজরা অষ্টাদশ শতকেই কলকাতায় নিজেদের সংস্কৃতি-প্রতিষ্ঠানও খাড়া করেন,—যথা, সভা, সংবাদপত্র, থিয়েটার ইত্যাদি। কলকাতার বেনিয়ান, মুৎসুদ্দি ও বড় মানুষেরা সে সব ইংরেজী কেতার সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে (যেমন, ১৮২৯এর পূর্ব পর্যন্ত এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলে) স্থান না পেলেও বিলাতী বিলাস-ব্যসনের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে গৌরব বোধ করতেন। দেশীয় বুলবুলির লড়াই-এর মতই ইংরেজের প্রবর্তিত ঘোড়দৌড়, জুয়াখেলা প্রভৃতিও তাঁদের ব্যসন হয় (George W. Thomson-এর *The Stranger in India*, London, 1843এর সাক্ষ্য দ্রষ্টব্য)। কিন্তু এ হল 'বাবু' দলের আয়োজন; তাঁদের সাংস্কৃতিক প্রকাশ তখনকার কবিওয়ালাদের রস-নিবেদনে পাওয়া যায়। কিন্তু সংঘাতমূলক ওসব শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ

---

* শ্রীযুক্ত বিনয় ঘোষ এই Learned Societyর বাঙলায় নাম দিতে চান 'বিদ্বৎ-সভা' (বিশ্বভারতী, ১২শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা)। আপত্তি নেই। তবে কানে ঠেকে বলে "Learned Society" বলতে শুধু সংস্কৃতি-সভাই বলা হল।

ছিল নূতন ভাবাদর্শের গন্থ-রচনায়, থিয়েটার-ব্যবস্থায়, নূতন সংস্কৃতি-প্রয়াসের। রিনাইসেন্সের যুগের সাহিত্য ও সমাজ-সংস্কারের প্রস্তুতি এসবে সুসম্পন্ন হয়।

এসব আয়োজন-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সাহিত্য ও সংস্কৃতির সম্পর্কটা তাই আকস্মিক নয়, আন্তরিক। এ পর্বের ভাব-বিপর্যয়ের কেন্দ্রস্থানীয় এসব প্রতিষ্ঠানের পরিচয়ও সংক্ষেপে সেরে রাখা ভাল। কারণ, সাহিত্য পরিচয়ে বারে বারে এদের দান স্বীকার করতে হবে।

(ক) **শিক্ষা প্রতিষ্ঠান : (১) ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ** (১৮০০) থেকে আধুনিক যুগের বাঙলা রচনার আরম্ভ। কিন্তু ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ দেশীয় লোকদের শিক্ষাদানের জন্ত স্থাপিত হয় নি, তাদের শিক্ষাদান করেও নি। কোম্পানির নবনিযুক্ত ইংরেজ কর্মচারীদের দেশীয় ভাষাসমূহ, আইন-কানুন. আচার-নীতি, সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়ে সুদক্ষ শাসক তৈরী করাই ছিল এই কলেজ-প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য। কথাটা আর একবার স্মরণ করা দরকার—এদেশে শিক্ষা-ব্যবস্থা চালু করা কোম্পানির মোটেই অভীষ্ট ছিল না। বার্ক-এর বক্তৃতা থেকেও আমরা জানি—শিক্ষা প্রবর্তিত করলে যে কোম্পানির শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে দেশবাসী সচেতন হয়ে উঠবে, এ বোধ কোম্পানির কর্তাদের খুবই তীক্ষ্ণ ছিল ; ভাষাটা হল এই—The most absurd and suicidal measure that could be devised। এ জন্তই তারা মিশনারিদের প্রচারের ও শিক্ষা দানেরও বিরোধী ছিল। 'কলকাতা মাদ্রাসা' (ইং ১৭৮১) ও 'সংস্কৃত কলেজ' (বারাণসী ১৭৯১) স্থাপন করে কোম্পানি চেয়েছিল নিজেদের কাজী, 'জজ পণ্ডিত' যোগাড় করতে ও দেশকে মধ্য যুগের আওতায় ঘুম পাড়িয়ে রাখতে। তবু রাজ্য যখন স্থাপিত হল দক্ষ শাসকও তখন চাইশ তাই ওয়েলেস্‌লি ইংরেজ শাসক শিক্ষার্থীদের জন্ত কলেজ প্রতিষ্ঠা করলেন—(নিজের শ্রীরঙ্গপত্তম বিজয়ের দিন ৪ঠা মে, ইং ১৭৯৯ তারিখটির সঙ্গে জড়িত করে. এই কলেজের প্রতিষ্ঠা-দিন তিনি গণিত করলেন —৪ঠা মে, ইং ১৮০০) এবং দেশের ভাবী শাসক ইংরেজ ছাত্রদের জানালেন— "God-like bounty to bestow expansion of intellect." তাই, অন্তান্ত ভাষার সঙ্গে এই কলেজে বাঙলা জানার ও বাঙলা বই লেখার সূচনা হল উইলিয়ম কেরির অধ্যক্ষতায় (মে, ইং ১৮০১। ইং ১৮০৭ পর্যন্ত এই কলেজের প্রাধান্ত ছিল ; পরে বিলাতেই কোম্পানির রাইটারদের শিক্ষার

প্রধান ব্যবস্থা হয়)। এসব বই ইংরেজদের পড়ার জন্তেই লিখিত ও মুদ্রিত; বইএর মূল্যও তাই বেশি ছিল। সাধারণ্যে সে সব বইএর প্রচার তাই সামান্তই হয়েছিল। তথাপি এরূপ ইংরেজ শাসকদের বাঙলা শেখার তাগিদেই বাঙলা দেশে বাঙলা গভের ও শিক্ষামূলক বাঙলা গ্রন্থ রচনার সূত্রপাত হল। রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' (ইং ১৮০১), কেরির 'বাংলা ব্যাকরণ' (ইং ১৮০১) থেকে হরপ্রসাদ রায়ের 'পুরুষ পরীক্ষা' (ইং ১৮১৫) পর্যন্ত কালটাকে 'বাঙলা গভের প্রথম যুগ' বলা অন্যায় নয়। কিন্তু সেটা বাঙালীর শিক্ষা-ব্যবস্থার কাল নয়, বাঙালীর পাঠের জন্ত গ্রন্থ প্রণয়নেরও কাল নয়। ফোর্ট উইলিয়মের পণ্ডিতদের লেখা বই তখনকার বাঙালী বিশেষ পড়তেও পায় নি। এমন কি, ইং ১৮১৩ সালের নূতন সনদে কোম্পানি শিক্ষার জন্ত যে এক লক্ষ টাকা বার্ষিক ব্যয় করতে স্বীকৃত হয়, ইং ১৮২৩এর পূর্বে সে উদ্দেশ্যে তা প্রয়োগের কোনো চেষ্টাই আরম্ভ হয় নি। ১৮২৩এ স্থাপিত হয় জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাক্শন নামক সরকারী শিক্ষা-দপ্তর— সরকারের পক্ষ থেকে শিক্ষা বিষয়ে প্রথম প্রয়াস।

(২) কিন্তু বাঙালীর শিক্ষালাভের চেষ্টা বাঙালীই তার পূর্বে আরম্ভ করে দিয়েছে। অবশ্য তা ছিল প্রধানত ইংরেজী শিক্ষার চেষ্টা—দায়ে পড়ে ও ব্যবসায়ের তাগিদে। স্বীকার করা উচিত যে, তার পূর্বে অষ্টাদশ শতকের অন্তত শেষার্ধে দেশে প্রচলিত শিক্ষার দুর্দিন এসেছিল। সে সময়ে গ্রামের পাঠশালায় দাগা-বুলনো ও শুভঙ্করী চলত। দেশে দু'-দশজন নৈয়ায়িক স্মার্ত বা জ্যোতিষী ও বৈয়াকরণ পণ্ডিত নিশ্চয়ই ছিলেন। কিন্তু চতুষ্পাঠীতে সচরাচর বিদ্যার্জন যা হত তাও শোচনীয়। ব্রাহ্মণদের মধ্যেও সংস্কৃতচর্চা প্রায় উঠে যাচ্ছিল। আর বাঙলায় পণ্ডিতরা বানানে 'ষত্ব', 'ণত্ব'-এর কোন ধারই ধারতেন না।—এসব বিষয়ে সমসাময়িক প্রমাণের অভাব নেই (দ্রষ্টব্য, ডঃ সুশীলকুমার দে'র Bengali Literature, pp. 52-54)। বিষয়ী লোকেরা ফারসি পড়ত, এবং মোটামুটি তা ভালোই শিখত। ইংরেজের ভাগ্যোদয়ে কলকাতা অঞ্চলের চতুর লোকেরা নাকি ১৭৮৭ থেকেই ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা করে (পাদ্রি লঙ-এর The Hand-Book of Bengali Missions-এ উল্লেখিত—ডঃ দে'র বই, p. 51)। ভবানীপুরের জগমোহন বসুর স্কুলই আদিতে স্থাপিত হয়েছিল ১৭৯৩তে। বাঙালীরা ব্যবসা পত্রের জন্ত ইংরেজ

মাস্টারদের নিকট ইংরেজী শিক্ষা করত ১৭৯৬তে। সে সব ইংরেজী-শেখার মজার দৃষ্টান্ত রাজনারায়ণ বসু দিয়েছেন। শেরবোর্ন কলেজ, ক্যালকাটা অ্যাকাডেমি, ধর্মতলা অ্যাকাডেমিতেও ভাগ্যবান্ ও বিষয়ী বাঙালী সন্তানরা ইংরেজী শিক্ষা লাভ করত।

(৩) তথাপি সে সময়ে শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করতে পারত ফিরিঙ্গি ছাড়া দু'চারজন বড় লোক ও চতুর ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর বাঙালী। কলকাতার মধ্যবিত্ত সন্তানরা আধুনিক শিক্ষালাভের যথার্থ সুযোগ পেল ১৮১৭তে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার কাল থেকে। ইংরেজী শিক্ষালাভ করেই মধ্যবিত্ত শ্রেণী প্রথম অভিজাতদের সমকক্ষ বলে গণ্য হল (যেমন, তারাচাঁদ চক্রবর্তী রসিককৃষ্ণ মল্লিক, প্যারীচাঁদ মিত্র, রাধানাথ শিকদার, রামগোপাল ঘোষ; কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি, পরে বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি)। অবশ্য ১৮৩০ পর্যন্ত কিম্বা ১৮৫০ পর্যন্ত রামমোহন, রাধাকান্ত দেব দ্বারকানাথই তাঁদের 'পেট্রন' বা নেতা। হিন্দু কলেজের প্রথম ও দ্বিতীয় ('ইয়ং বেঙ্গল') পর্যায়ের ছাত্রদের পরে মধুসূদন, ভূদেব, রাজনারায়ণ বসুর পূর্বেই বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি লেখকগণ সমাজে শীর্ষস্থানীয় হয়ে দাঁড়ান। রামগোপাল ঘোষ, হরিশ মুখুজ্জে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সর্বমান্য হন। অর্থাৎ তত্ত্ববোধিনীর প্রভাব কালে শিক্ষিত শ্রেণী এই ঔপনিবেশিক সমাজের প্রাধান্য আরম্ভ করেন —যতীন্দ্রমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁরাও হন সমাজের নূতন মুখপাত্র।

প্রধানত যে শিক্ষার মধ্য দিয়ে এই শিক্ষিত শ্রেণীর উদ্ভব তার বাহন ছিল ইংরেজী। হিন্দু কলেজ প্রভৃতিতে বাঙলা ভাষা প্রভৃতি শিক্ষার ব্যবস্থা থাকলেও ইংরেজীই ছিল বাহন; কার্যত বাঙলা কতকটা অবহেলিত হত। অবশ্য অল্প পরেই তার প্রতিবিধানও আরম্ভ হয়, বাঙলা শিক্ষার ওপরও গুরুত্ব দেওয়া হতে থাকে—স্কুল সোসাইটির পরিচালিত পটলডাঙার ইস্কুলের মত শতখানেক পাঠশালায়। অন্যদিকেও বাঙলা ভাষার অনুশীলন আরম্ভ হয়—প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত 'গৌড়ীয় সমাজের' মত সভায়। কিন্তু প্রথম থেকেই ইংরেজী অপেক্ষা বাঙলার মাধ্যমে শিক্ষাদানের চেষ্টা যাঁরা করেন তাঁরা খ্রীষ্টান মিশনারি। কারণ, ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে তাঁদের প্রধান লক্ষ্যস্থল ছিল ভদ্রলোক বা মধ্যবিত্ত নয়, বরং অবজ্ঞাত সাধারণ নর-নারী।

(৪) ইং ১৮১৭ সালের ২০শে জানুয়ারি কুড়িজন ছাত্র নিয়ে হিন্দু কলেজের কাজ আরম্ভ হয়। এ কথা বার বার বলবার প্রয়োজন নেই যে, এদিন থেকেই বাঙালীর শিক্ষার মোড় ঘুরল, মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণীর জন্ম সূচিত হল, নূতন জীবনাদর্শের সাধনা আরম্ভ হল। এর পরে আরও কলেজ হয়—মিশনারিদেরও সেদিকে উদ্যোগ দেখা গেল। এদিকে ১৮২৩ থেকে হিন্দু কলেজে বিজ্ঞান শিক্ষার যন্ত্রপাতিও আসে; বিজ্ঞান শিক্ষার ফলও সহজে অনুমেয়। ১৮২৬এর মে মাস থেকে ১৮৩১, ২৫শে মার্চ পর্যন্ত ডিরোজিও ছিলেন এ স্কুলের শিক্ষক। বুর্জোয়া জীবনাদর্শের শ্রেষ্ঠ প্রতীক ডিরোজিও, বাঙলা দেশের 'ইয়ং বেঙ্গলের' তিনি মন্ত্রগুরু। তাঁরই প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হন সেদিনের হিন্দু কলেজের ছাত্র (রেভাঃ) কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, দক্ষিণানন্দ (দক্ষিণারঞ্জন) মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, শিবচন্দ্র দেব, মহেশচন্দ্র ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার। ১৮৩০ থেকে ১৮৪৩ পর্যন্ত এঁরা বাঙালী সমাজকে মথিত করেন। তার পরেও ১৮৫৮ পর্যন্ত বাঙালী জীবনের বহু ক্ষেত্রে ডিরোজিওর শিষ্যরাই দিকপাল। ইউরোপের শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়ের সমতুল্য ছিল (ইং ১৮৩২) হিন্দু কলেজের ছাত্রদের সাহিত্যে ও বিজ্ঞানে অধিকার। রাজনারায়ণ বসু আত্মজীবনীতে সেদিনের হিন্দু কলেজের পাঠ্য বিষয়ের যে তালিকা দিয়েছেন তা' থেকে বুঝতে পারি—বিদ্যার কী প্রশস্ত বনিয়াদের উপর মাইকেল, ভূদেব, রাজনারায়ণ দাঁড়িয়েছিলেন। তাই, আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের এমন প্রশস্ত বনিয়াদ তাঁরা রচনা করতে পেরেছিলেন।

(৫) ১৮১৩র পরে খ্রীষ্টান মিশনারিরা কলকাতার চারিদিকে পাঠশালা স্থাপন করে—এ কথা পূর্বেই বলেছি। অবশ্য জন টমাস ও চার্লস গ্রাণ্টের (ইং ১৭৮৭র পর থেকে) খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের চেষ্টা সার্থক সূচনায় পরিণত হয় উইলিয়ম কেরির আগমনে (১৭৯৩)। ওয়ার্ড, মার্শম্যান, এদেশে আসেন ১৭৯৯তে। শ্রীরামপুরে ব্যাপটিস্ট মিশন ও ছাপাখানা (১৭৯৯) যখন গড়ে উঠল, তখন কেরির ঘোরাফেরা শেষ হল (জানুয়ারি, ইং ১৮০০)। ১৮১৩ পর্যন্ত তাঁদের কিন্তু ধর্ম প্রচারে অধিকার ছিল না। ইং ১৮১৩এর পরে মিশনারিরা ধর্মগত ও রাজনৈতিক সংকীর্ণতা বশেই দেশীয় লোকদের ইংরেজী শিক্ষায় উৎসাহ দিতেন না। শাসক ইংরেজের বরাবরই এ দেশে শিক্ষাবিস্তারে

সংশয় ও আপত্তি ছিল। হিন্দু কলেজ স্থাপনের পরে অবশ্য শ্রীরামপুরের কলেজ (১৮১৮) ও বিশপস্ কলেজ (১৮২০, খ্রীষ্টানদের জন্ত) এইরকম ইংরেজী উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠান হয়। আর ডাফ সাহেব এসে কলেজ খুললেন ১৮৩০এ। তাঁর প্রভাবে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় খ্রীষ্টান হন ইং ১৮৩৪এ, মাইকেল ১৮৪৩এ, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর আরও পরে। হয়তো 'মিশনারি গোঁড়ামির' ফলেই 'খ্রীষ্টানী বাঙলা' বাঙালীর বাঙলা হল না। বাঙলা বাইবেল বাঙালীর চিত্তকে স্পর্শও করল না, এবং খ্রীষ্টানী শিক্ষানীতি (বাঙলা তার বাহন হোক্ কি ইংরেজী তার বাহন হোক্) নয়া বাঙলার প্রস্তুতিতে বা সৃষ্টিতে বিশেষ কোন সহায়তা করতে পারল না। উল্টে বরং সেদিকে সহায়তা করল সেই শিক্ষা—যার বাহন মূলত ইংরেজী হলেও—যা পাশ্চাত্ত্য জীবনের ঐহিক দৃষ্টি, বৈজ্ঞানিক চেতনা ও মানবতাবাদের বার্তা নিয়ে এল। তারই প্রথম পীঠস্থান হিন্দু কলেজ। তারাচাঁদ চক্রবর্তীর মত ছাত্ররাই বাঙলা এবং সংস্কৃতেরও অনুশীলনে অগ্রগামী হন ;—রামমোহন-রাধাকান্তদেবের পরে 'ভারতবিদ্যা'র পুনরাবিষ্কারেও তাঁরাই কর্মী।

(৬) বাঙালীর জন্ত ইংরেজী ও বাঙলা পাঠ্য রচনায় যে প্রতিষ্ঠান প্রথম গঠিত হয় তা হচ্ছে 'কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি' (১৮১৭); আর এ সমিতিরই পরিপূরকরূপে বাঙালীর পাঠশালা সংস্কার করে আদর্শ বিদ্যালয় গঠন করবার মানসে গঠিত হয় 'স্কুল সোসাইটি' (১৮১৭ থেকে ১৮৩৩)। রাজা রাধাকান্ত দেব দু'সমিতিরই একজন প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন। ডেভিড হেয়ার ছিলেন স্কুল সোসাইটি'রও তেমনি কর্মকর্তা। দু'জনাই আবার হিন্দু কলেজেরও পরিচালকদের মধ্যে নেতৃস্থানীয়। ডেভিড হেয়ার নিজে শিমলা স্কুল, আরপুলি পাঠশালা (১৮১৮-১৮১৯) ও (প্রথম দিকে) পটলডাঙা স্কুল চালাতেন। সমিতির স্কুল থেকে ছাত্ররা উত্তীর্ণ হয়ে হিন্দু কলেজে পড়তে যেত। হিন্দু কলেজে উৎকৃষ্ট ছাত্ররা আসত স্কুল সোসাইটির পরিচালিত পটলডাঙা স্কুল থেকে। স্কুল বুক সোসাইটি ইংরেজী, বাঙলা ও ফারসি তিন ভাষাতেই সাহিত্য, গণিত, ব্যাকরণ, ইতিহাস, ভূগোল, জ্যোতিষ ও বিজ্ঞানের বিবিধ বিষয়ের পাঠ্য পুস্তক রচিত ও প্রকাশিত করেন।

পটলডাঙার স্কুলের পরেই রামমোহন রায়ের অ্যাংলো-হিন্দু স্কুল ; জগৎমোহন বসুর ভবানীপুরের ইউনিয়ন স্কুল অবশ্য পুরাতনের নবায়ন। রামমোহন রায়ের

স্কুলে ইংরেজী শিক্ষার সঙ্গে নীতিশিক্ষা ও ধর্মশিক্ষার ওপর জোর দেওয়া হত। এর পরে (১৮২৯এ) স্থাপিত হয় গৌরমোহন আঢ্যের ওরিয়েন্টাল সেমিনারি। তার পরে স্থাপিত হয় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা (১৮৪০) ও হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয় (ইং ১৮৪৫)—খ্রীষ্টানীর বিরুদ্ধে হিন্দু শিক্ষিতদের তা প্রতিরোধ আয়োজন।

(৭) হিন্দু কলেজের পরে মিশনারিদের শ্রীরামপুর কলেজ (১৮১৮) ও বিশপ্‌স্ কলেজ (১৮২০), সরকার পরিচালিত সংস্কৃত কলেজ (১৮২৪) ও কলিকাতা মাদ্রাসায়ও (১৮২৯ থেকে) ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। (ডাফ্ সাহেবের জেনারেল অ্যাসেম্‌ব্লিজ ইনষ্টিটিউশন ১৮৩০এ ও ডাফের 'ফ্রি চার্চ কলেজ' স্থাপিত হয় ১৮৪৩এ।) ১৮৩৫এ অবশ্য সরকারী ও বেসরকারী স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠার ধূম পড়ে গেল ('বাংলার উচ্চ শিক্ষা'—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল পৃঃ ২৭)। মেকলের আধিপত্যে ইংরেজী শিক্ষার জয় তখন সুস্থির হয়। এমন কি ২০ বৎসর ধরে স্কুল কলেজে বাঙলা শিক্ষা রীতিমত বর্জিত ও অবহেলিত হল। কিন্তু কতটুকু সফল হল মেকলের প্রত্যাশা? কতখানি হল ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙালী 'নকল ইংরেজ', আর কতখানি 'নতুন বাঙালী'? চটি-চাদরপরা পণ্ডিত বিদ্যাসাগর হলেন শ্রেষ্ঠ বুর্জোয়া (তথাকথিত) 'পাশ্চাত্ত্য' শিক্ষাদর্শের ও মানবাদর্শের প্রধান সেনানী (দ্রষ্টব্য ইং ১৮৫৪তে হ্যালিডে'র মিনিটের সঙ্গে সংযুক্ত বিদ্যাসাগরের মন্তব্য, সা. সা. চ.)। সাহেবি পোশাক সাহেবি নাম নিয়ে, বাঙালী প্রাণ মধুসূদন বসলেন মধুচক্র রচনায়—'গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।' সংঘাত না রইল তা নয়; কিন্তু ক্রমেই বোঝা গেল—বুর্জোয়া শিক্ষাদীক্ষা খ্রীষ্টান ধর্মের দান নয়, এমনকি, পাশ্চাত্ত্য জাতিদের একচেটিয়া সম্পত্তিও নয়। পৃথিবীর সকল মানুষেরই তাতে অধিকার আছে।

এ প্রসঙ্গেই এ সমস্ত শিক্ষা প্রয়াসের অন্তর্নিহিত দুর্বলতাও লক্ষণীয়। প্রথমত, যা কিছু বাঙালী গ্রহণ করেছে, গ্রহণ করেছে উপরতলায়, ও মূলত শিক্ষাদীক্ষার ক্ষেত্রে। তাতে ঔপনিবেশিক জীবনের বাস্তবক্ষেত্রে বাঙালীর বন্ধ্যাদশা স্থায়ী হয়ে থাকছে। এ গ্রহণ তাই মাটি থেকে রস গ্রহণ নয়, আকাশের সূর্যালোকের দিকে দু'বাহু মেলে দেওয়া। দ্বিতীয়ত, বাঙালী জীবনের এই আলোড়নের ত্রিসীমানায়ও বাঙালী মুসলমান নেই। 'হিন্দু কলেজ'

(হিন্দুদের আকৃষ্ট করার জন্য এ নাম দিয়েছিলেন হয়ত ডেভিড হেয়ার) থেকে একেবারে 'হিন্দুমেলা' পর্যন্ত (১৮৬৮) এই সুদীর্ঘ প্রয়াসের মধ্যে মুসলমান বাঙালীর স্থান কী, অগ্রগামী হিন্দু নেতারাও তা' তখন ভাবা প্রয়োজন মনে করেন নি। ওহাবী মনোভাবে ক্রম-কবলিত হয়ে মুসলমান মুখপাত্রেরা ও ভারতীয় সাধারণ মুসলমানগণ প্রতিবেশী হিন্দুর মতো আধুনিক শিক্ষাদীক্ষা গ্রহণ করলেন না। বাঙালী সংস্কৃতির দিক থেকে ব্যাপারটা neither progressive nor politic। এই যুগসন্ধির ক্ষণে এভাবে হিন্দু নেতাদের চক্ষেও মুসলমান মুখপাত্ররা এদেশে 'বিদেশী' ও এদেশের সংস্কৃতিতে উদাসীন বলেই প্রমাণিত হয়ে থাকছিলেন। ১৮২৯এ যখন মাদ্রাসায় ইংরেজী শিক্ষাদানের প্রস্তাব হয় তখন কলকাতার মুসলমানরা তাতে তীব্র আপত্তি জানান—অথচ সংস্কৃত কলেজে ইংরেজী শিক্ষা ছিল হিন্দুদেরও মনঃপূত। ১৮৫৪ এদেশের শিক্ষাজগতে স্মরণীয় বৎসর—ডিরেক্টরদের শিক্ষা 'ডেস্‌প্যাচ (সম্ভবত জন স্টুয়ার্ট মিলের রচিত) বা বিধানপত্র সে বৎসর প্রস্তুত হয়,—তার নাম দেওয়া হয় 'Charter of Indian Education'; আর এরই ফলে ইং ১৮৫৭ সালের জানুয়ারিতে স্থাপিত হয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,—কিছু পরে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় ও বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়। প্রেসিডেন্সি কলেজ (১৫ই জুন) হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকল ছাত্রের অধ্যাপনার কাজ শুরু করে। প্রথম বারের ১০১ জন ছাত্রের মধ্যে ২ জন ছিল মুসলমান। পরবর্তী কালে পৌঁছলে আমরা দেখব—মৌঃ (নবাব) আব্দুল লতিফ ১৮৭০এও দেখেছেন মুসলমান যে তিমিরে সেই তিমিরে। বাঙলার জাগরণে মুসলমানের জাগরণ হয় নি; বাঙলার প্রস্তুতি পর্বে তার প্রস্তুতি চলেছে বিপরীত দিকে—যুগশিক্ষা, যুগধর্ম, যুগাদর্শ ছেড়ে আরব-পরিবেশে উদ্ভূত ইস্‌লামের পুরাতন শিক্ষা, ধর্ম ও আদর্শের পথে।

(খ) **ধর্ম-সংঘাত**—'হিন্দু রাজত্ব', 'মুসলমান রাজত্ব' বললেও কেউ ইংরেজ আমলকে 'খ্রীষ্টান রাজত্ব বলে না। কারণ, ধর্ম দিয়ে আধুনিক যুগে রাজ্যের লক্ষণ স্থির হয় না। খ্রীষ্টান ধর্মের সঙ্গে ভারতবাসীর পরিচয় হয়েছিল অনেক পূর্বে মালাবারে সিরীয় খ্রীষ্টানদের আগমনে। পর্তুগীসদের আগমনে পাশ্চাত্ত্য বিশেষ করে, ক্যাথলিক খ্রীষ্টধর্মেরও, একটা দিকের পরিচয় এদেশের অনেকেই লাভ করে। দু'চার জন দোম আন্তোনিও যা'ই থাকুন, হার্মাদের

ধর্ম আমাদের মন স্পর্শও করে নি। কিন্তু ইংরেজ কোম্পানি বাণিজ্য ও লুণ্ঠনেই বেশি আগ্রহান্বিত ছিল, ধর্মপ্রচারে নয়। বুর্জোয়া বুদ্ধির বশে বরং তারা ভয় করত—ধর্ম নিয়ে ঘাঁটাতে গেলে মুনাফাতেই ঘাটতি পড়বে। খ্রীষ্টধর্মের যে বিশেষ রূপ ইংরেজ উদ্ভাবিত করে তা হচ্ছে রিনাইসেন্স-রিফর্মেশনে ধোলাইকরা খ্রীষ্টধর্ম, পলাশীর পরেও তা রাজধর্ম হল না। কারণ, কোম্পানির ধর্ম হল মূলত মুনাফায় ফাঁপান বণিক্ ধর্ম। ভারতবর্ষে বণিক্ ইংরেজের অন্য ধর্মের বা নীতির কোনো বালাই-ই ছিল না। ব্যবসা ছাড়া দেশী বা বিলিতী মেয়েমানুষ, মদ, জুয়া, ডুয়েল আর যেন-তেন-প্রকারেণ লুণ্ঠনই ছিল কাজ। দেনার দায়ে তবু দেশী মহাজন ও বেনিয়ান-পোদ্দারের কাছে তাদের টিকি বাঁধা থাকত। হিন্দুর পূজা-পার্বণে তারা যোগ দিত, কালিঘাটেও পূজা দিত। আর জুয়াখেলা থেকে জুলুমবাজি চালাতে খ্রীষ্ট ও শয়তানের নামে সমানে শপথ কাটত।

(১) ধর্মপ্রচারের নামে প্রথম নামলেন খ্রীষ্টান মিশনারিরা। ইং ১৭৮০তে জন টমাস (১৭৫৫-১৮০১) প্রথম একাজে নামেন মালদহে মুনসি রামরাম বসুকে সহায় করে। রামরাম বসু আশা দিয়েছিলেন তিনিও খ্রীষ্টান হবেন। কিন্তু কায়স্থ সন্তান সেদিকে পা দিলেন না। মিশনারি চেষ্টা যথার্থ আরম্ভ হল ১৭৯৩ থেকে, অর্থাৎ উইলিয়ম কেরি (১৭৬১-১৮৩৪) যখন এদেশে এলেন তখন থেকে। কেরির জীবন বাঙলার একালের মিশনারি ইতিহাসের প্রথম অধ্যায়। কেরির জীবন বাঙলা গদ্যেরও প্রথম অধ্যায়। স্থায়ী আস্তানা গাড়বার সুযোগ না পেয়ে টমাস ও রামরাম বসুকে নিয়ে এই কর্মবীর বাঙলা দেশের নানা স্থানে প্রথম কয় বৎসর ঘুরে বেড়ান (১৭৯৩-৯৯)। জোশুয়া মার্শম্যান (১৭৬৮-১৮৩৭), উইলিয়ম ওয়ার্ড (১৭৬৯-১৮২৩) এ সময়ে (১৭৯৯) এসে পৌছন। শেষটা দিনেমারদের অধিকৃত শ্রীরামপুরে মিশনারিগোষ্ঠী স্থান পেলেন। শ্রীরামপুর মিশনের পত্তন হল (১৮০০)। কেরি, মার্শম্যান, ওয়ার্ড—তিনজন এখানে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারে গা ঢেলে দেন।—প্রথমেই মুদ্রিত ও প্রকাশিত হল 'মঙ্গল সমাচার মাতিউর রচিত'। রামরাম বসুকে আবার এঁরা হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের কাজে লাগালেন; পদ্যে ও গদ্যে পুস্তিকা প্রকাশিত হতে লাগল। ইং ১৮০১ সালে কৃষ্ণ পাল নামে একজন হিন্দু কেরির নিকট খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়। এ কালের প্রথম খ্রীষ্টান এই কৃষ্ণ পাল।

ইং ১৮১৩র পরে মিশনারিরা লাইসেন্স নিয়ে ধর্মপ্রচারের অধিকার পেলেন। স্বয়ং কোম্পানিও 'কলকাতার বিশপ' প্রভৃতি যাজকাচার্যের পদ সৃষ্টি করে খ্রীষ্টান ধর্মকে কতকটা রাজধর্মের মর্যাদা দিল। এদিকে তখন রামমোহন-শ্রীরামপুরমিশন রাধাকান্তদেবের ধর্ম-বিচার চলত। ১৮৩৩এর পরে ডাফ্ সাহেব নবশিক্ষিত হিন্দুকে খ্রীষ্টধর্মে আকৃষ্ট করবার জন্য তুমুল উৎসাহে লাগলেন। কারণ হিন্দু কলেজে ইংরেজী শিক্ষা প্রসারিত হচ্ছে, 'ইয়ং বেঙ্গল' বিদ্রোহে মাথা খাড়া করে উঠছে। ক্রমে ডাফ্ সফল হলেন—কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় লালবিহারী দে, মধুসূদন দত্ত, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের মত সুসন্তানদের হিন্দু সমাজ হারাল। ফলে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতিও নতুন করে সংগঠিত হতে লাগল। একটি কথা লক্ষণীয়—হিন্দুদের নিকট মিশনারিদের প্রচার চললেও মুসলমানদের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারে তাঁরা তত আগ্রহ তখনো দেখান নি—হয়তো তা কঠিন বলে। হয়তো তা কোম্পানির পক্ষে বিপজ্জনকও হত বলে। হিন্দুরা বহুযুগ ধরে অন্য ধর্মের আক্রমণকে বিনা রক্তপাতে প্রতিরোধ করতে অভ্যস্ত। ছ'শ' বৎসরেও তারা নিজ ধর্ম ত্যাগ করে নি। ভিন্নধর্মীর রাজত্বে বাস করে, এমন কি তাদের রাষ্ট্র শাসনে সহায়ক হয়েও, তারা হিন্দু সংস্কৃতি সংগঠিত করতে জানে। অষ্টাদশ শতকের অধঃপতনে অবশ্য এই হিন্দু সমাজের উচ্চস্তরে ধর্মের ও নীতির বন্ধন শিথিল হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু স্বয়ংসম্পূর্ণ পল্লীসমাজের সাধারণ নর-নারীর মূল ধর্মবোধ শত কুসংস্কারের তলায়ও সুদৃঢ়ই থেকে গিয়েছে। অসম্ভব তাদের সহন-শক্তি, অদ্ভুত তাদের রক্ষণ-শক্তিও। লক্ষ লক্ষ পুস্তিকা বিতরণ করে ও প্রায় ৮০ খানা পুস্তিকা লিখে কেরি, মার্শম্যান, ওয়ার্ড সেই হিন্দু-জনসমাজকে তাই বিচলিত করতে পারেন নি। সমাজের শিক্ষিত স্তর বিচলিত হল মিশনারির পুস্তিকা প্রচারে নয়, পাশ্চাত্য শিক্ষা ও জীবনদর্শনের ফলে।

(২) হিন্দুসমাজে আলোড়ন জাগল। কিন্তু খ্রীষ্টান মিশনারিরা ছাড়া কেউ নিম্নস্তরের নিকট পৌছতে চান নি। হিন্দুদের এক সংস্কারকামী শাখার নেতা যেমন রামমোহন রায়, রক্ষণশীলতার নেতা তেমনি শিক্ষাব্রতী রাজা রাধাকান্ত দেব। ১৮১৫ সনে রামমোহন রায় 'বেদান্ত গ্রন্থ' ও 'বেদান্তসার' প্রকাশ করে এবং 'আত্মীয় সভা' স্থাপন করে প্রথম প্রচলিত হিন্দুধর্মের বহু-দেবতাবাদ ও সাকারোপাসনার বিরুদ্ধে নিজের মত প্রচারে নামেন। তাঁর

মত প্রচারের জন্য তিনি প্রধানত চার প্রকার পথ অবলম্বন করেন—(১) পুস্তক ও পত্রিকা প্রকাশ, (২) কথোপকথন ও আলোচনা, (৩) সভা স্থাপন, (৪) বিদ্যালয় স্থাপন (দ্রঃ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—রামমোহন. সা. সা. চ)। প্রচার আরম্ভ হতেই (১৮১৫) তিনি রক্ষণশীল সমাজ-কর্তাদের বিরাগভাজন হন ; এজন্য হিন্দু কলেজের (১৮১৭) পরিচালকমণ্ডলী থেকেও তাঁকে দূরে থাকতে হয়। অবশ্য এর পরেই তিনি সামাজিক ও শিক্ষার সংস্কারের আন্দোলনে অগ্রসর হয়ে যান। হিন্দু সমাজের আভ্যন্তরীণ ধর্ম আলোচনায় প্রথম সংঘাত বাধালেন রামমোহন রায়। ১৮১৫র 'আত্মীয় সভা'র পরে, ইং ১৮২১এ বিদেশীয় ধাঁচের 'ইউনিটেরিয়ান্ কমিটি' (অ্যাডাম-এর সহযোগে) স্থাপিত হয়, এবং শেষে ইং ১৮২৮এ (২০শে আগস্ট) স্থাপিত হল দেশীয় ধাঁচের 'ব্রহ্ম মন্দির'—লোকে যাকে সে সময়ে বল্‌ত 'ব্রহ্মসভা।'

(৩) ১৮২০ নাগাদ রামমোহন তাঁর The Precepts of Jesus ও An Appeal to the Christian Public in Defence of the Precepts of Jesus প্রকাশিত করেন। তার পরেই ইংরেজি ও বাঙলায় রামমোহন 'ব্রাহ্মণ সেবধি' (১৮২১ ?) পত্র ও 'ব্রাহ্মণ মিশনারি সংবাদ' প্রকাশ ও প্রচার করে মিশনারিদের বিরুদ্ধে একেশ্বরবাদী হিন্দুধর্মের প্রতিবাদ উত্থাপন করলেন। বন্ধু অ্যাডামকে তিনি পূর্বেই খ্রীষ্টানদের বিরুদ্ধে Unitarian মতবাদের সপক্ষে এনেছিলেন। Unitarian ধর্মমত প্রচার করে খ্রীষ্টানদের সঙ্গেও হিন্দু সংস্কারবাদীদের সংঘাত বাধালেন রামমোহন।

(৪) এ ছাড়া একটা বড় রকমের সংঘাত বাধে যখন হিন্দু কলেজের ডিরোজিও'র (১৮০৯-১৮৩১) শিষ্যদল মুক্তকণ্ঠে শুধু হিন্দু ধর্মেই নিজেদের অনাস্থা ঘোষণা করলেন না, কার্যত প্রায় সমস্ত ধর্মেই অনাস্থা প্রকাশ করলেন। Tom Paineএর Age of Reason ও ফরাসী বিপ্লবের Religion of Humanityর তাঁরাই এদেশে অগ্রদূত। তবে হিন্দু সমাজের মানুষ বলে হিন্দু-ধর্মের বিরুদ্ধেই তাঁদের প্রত্যক্ষ আক্রমণ। 'ইয়ং বেঙ্গলের' এই বিদ্রোহের প্রেরণাদাতা হিসাবে ডিরোজিও হিন্দু কলেজ থেকে বিতাড়িত হলেন। এঁদের প্রধান উৎসাহদাতা ডেভিড হেয়ার চাকুরে ছিলেন না বলে কেউ তাঁকে স্পর্শ করতে পারল না। কিন্তু নেতারা তাঁকে মানপত্র দিলেন না (১৮৩০)।

১৮৩১এ ডেভিড হেয়ারকে সে মানপত্র দিলেন দক্ষিণানন্দ বা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক প্রভৃতি ৫৩ জন ছাত্র। খ্রীষ্টানরা মৃত্যুর পরেও (১৮৪২) ডেভিড হেয়ারকে খ্রীষ্টান সমাধি-ক্ষেত্রে স্থান দিল না। কারণ তিনি খ্রীষ্টধর্মে আস্থা রাখতেন না। ভালোই হল। 'তাই ছাত্রপল্লী মাঝে বিরাজিছ তুমি, ছাত্রের দেবতা!'

দেশীয়দের মধ্যে 'ইয়ং বেঙ্গল' বা 'ডিরোজিয়ান দের প্রধান পরিচালক হন তারাচাঁদ চক্রবর্তী। তিনি হিন্দু কলেজের প্রথম একজন ছাত্র, আর রামমোহনের 'ব্রাহ্মসমাজের' সম্পাদক। কিন্তু রামমোহন তখন নেই, 'ব্রাহ্মসমাজ' নিস্তেজ; তারাচাঁদ চক্রবর্তী সক্রিয় রইলেন সংশয়বাদী 'ইয়ং বেঙ্গলদের' নিয়ে। এজন্ত সে সময়ে এই তরুণদের একটা নাম দেওয়া হয় 'চক্রবর্তী ফ্যাকশান' বা 'চক্রবর্তী চক্র' বলে (দ্রঃ যোগেশচন্দ্র বাগল—উঃ শঃ বাঙ্গলা)। কথাটা শুধু তারাচাঁদ চক্রবর্তীর সংস্কার-প্রতিজ্ঞার প্রমাণ নয়, যে দলের নায়ক তাঁর মত পুরুষ তাদেরও সততার ও প্রগতিবাদিতারও প্রমাণ। 'ইয়ং বেঙ্গলের' নামে সত্য মিথ্যা অনেক অপবাদ রটানো হয়েছে। আগুন সময়ে সময়ে দগ্ধ করে, তথাপি তা আগুন। 'ইয়ং বেঙ্গল'ও তেমনি আগুন।

মনে হয় ডিরোজিও-ডেভিড হেয়ারের শিষ্য 'ইয়ং বেঙ্গলে'র মধ্যে দু-ধরনের মানুষ ছিলেন—একদল রামগোপাল ঘোষের মত যা কিছু হিন্দু তা ঘৃণা করতেন আর ছিলেন সাহেবীভাবের পক্ষপাতী। এঁদেরই সহযাত্রী 'পারসিকিউটেড'-প্রণেতা কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। অথচ পাদ্রি হয়েও তিনি বাঙলা রচনা ও ভারতীয় সংস্কৃতির অক্লান্ত প্রচারক। তিনিই সকলের অগ্রণী; কিন্তু তিনি ডিরোজিওর ঠিক ছাত্র নন, তবে শ্রেষ্ঠ শিষ্য। তারপরেই তখনকার দিনে অগ্রগণ্য ছিলেন সূর্যকান্ত ঠাকুরের দৌহিত্র দক্ষিণানন্দ বা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় যিনি পরে বর্ধমানের তেজচন্দ্রের বিধবা কনিষ্ঠা রাণী বসন্তকুমারীকে 'সিভিল ম্যারেজ অ্যাক্ট' অনুসারে বিবাহ (১৮৪৮ ?) করেন, অর্থাৎ (শিবনাথ শাস্ত্রীকে তিনি যেমন বলেছিলেন) একই কালে জাত্যন্তরে বিবাহ, বিধবা বিবাহ ও সিভিল ম্যারেজ তিনি সম্পন্ন করেন। প্রধানত সেজন্ত বাঙলা ছেড়ে লক্ষ্ণৌতে তিনি গিয়ে বসবাস করেন, এবং সেখানে সিপাহী যুদ্ধের সময়ে ইংরেজের সহায়তা করায় হয়ে ওঠেন 'রাজা দক্ষিণারঞ্জন।' বেথুন স্কুলের মত বহু নবযুগের প্রতিষ্ঠানের পিছনে ছিল তাঁর উৎসাহ ও

সাহায্য। বাঙলা দেশ তাঁকে হারালেও তিনি কিন্তু হিন্দু সমাজ ত্যাগ করেন নি। অন্ত দলের মানুষদের মধ্যে নিশ্চয়ই গণ্য প্যারীচাঁদ মিত্র, রসিককৃষ্ণ মল্লিক প্রমুখ স্থির-চিত্ত সংস্কারকগণ। ধর্মবিষয়ে বিদ্রোহ বৃদ্ধি না করে তাঁরা শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারেই বেশি মন দেন। রামতনু লাহিড়ী এঁদের সমধর্মী হলেও নিজেই এক আদর্শনিষ্ঠ ভক্তিসুন্দর পুরুষ। পরবর্তীকালে বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন মনীষা প্রকাশিত হয়।

(৫) সতীদাহ সমর্থনেই 'ধর্মসভা' (১৮৩০) দানা বেঁধে ওঠে। পাদ্রি ডাফ্‌ও সে সময়ে খ্রীষ্টধর্মের দিকে (১৮৩০) যুবক বাঙলার অগ্রণীদের প্রবলভাবে আকর্ষণ করলেন—কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, পরে লালবিহারী দে, মধুসূদন দত্ত ও জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করলে নিশ্চয়ই তাঁদের বন্ধু ও আত্মীয়বর্গও বিদ্রোহ-পথ থেকে দূরে সরে যাওয়ার কথাই চিন্তা করে থাকবেন। 'ইয়ং বেঙ্গলে'র ধর্ম-বিষয়ে বিরূপতার পরিবর্তে ধর্মক্ষেত্রে রামমোহনের ধারাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর উদ্যোগী হন,—রামমোহনের জ্ঞানার্জনের ঐতিহ্যভার গ্রহণ করেন অক্ষয়কুমার দত্ত ও বিদ্যাসাগর, আর তাঁর ধর্মপিপাসার সদুত্তর খোঁজেন দেবেন্দ্রনাথ—খ্রীষ্টধর্মের বিরুদ্ধে 'ধর্মসভা'র নেতাদের মত তিনিও চাইছিলেন প্রতিরোধ।

ডিরোজিওর পরে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 'ইয়ং বেঙ্গলে'র ইতিহাসের নায়ক হয়ে পড়েন। দরিদ্র ব্রাহ্মণের সন্তান কৃষ্ণমোহন মাতুলালয়ে থেকে পড়তেন। একদিন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপস্থিতিতে সেই গৃহে বন্ধুরা একত্র হয়ে মাংসাহার করে গোরুর (?) হাড় প্রভৃতি প্রতিবেশী ব্রাহ্মণের গৃহে নিক্ষেপ করল, আর চীৎকার করে উঠল, "গোমাংস! গোমাংস!" না হলে যেন তাদের বিদ্রোহী মন শান্তি পায় না! পথে খাঁটি ব্রাহ্মণ বা পুরাতনপন্থীদের দেখলে তারা তখন বলে উঠত—"গোরু খাবি? গোরু খাবি?" কৃষ্ণমোহন কিন্তু তখন গৃহে ছিলেন না, তা সত্ত্বেও এই অপরাধেই তিনি গৃহ থেকে বিতাড়িত হন। তাঁর আত্মকথায় তিনি লিখেছেন, "হিন্দুধর্মের প্রতি বিরুদ্ধাচরণের মত খ্রীষ্টধর্মের বিরোধিতাও তাঁদের অনুরূপ স্পষ্ট ছিল। এ কাহিনীর বিষয়বস্তু (কৃষ্ণমোহন) কয়েক রাত্রি বহু বন্ধু সমভিব্যাহারে কলিকাতার রাজপথে বিচরণ করিয়াছিলেন। উদ্দেশ্য গস্‌পেল বা যীশুর বাণী প্রচারের ভাণ করিয়া, বাংলা ভুল উচ্চারণ এবং বাংলা ভাষায় শব্দ ও বাক্যাংশগুলির ভুল প্রয়োগ

অনুকরণ করিয়া মিশনারিদের লোকচক্ষে হাস্যাস্পদ ও হেয় প্রতিপন্ন করা।" সমাজ-বিতাড়িত কৃষ্ণমোহন অদম্য তেজে বৎসরখানেক ভেসে বেড়ান। শেষে ডাফের প্ররোচনায় খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন, আর শিক্ষিত যুবকদের (যথা মধুসূদন, জ্ঞানেন্দ্রমোহন প্রভৃতিকে) খ্রীষ্টান করবার জন্য নিরন্তর চেষ্টা করতে থাকেন। একথা ঠিক যে, 'ইয়ং বেঙ্গলে'র প্রধান লক্ষ্য ধর্ম জিজ্ঞাসা ছিল না, বরং ছিল সত্য-জিজ্ঞাসা ('enquiry') ও জ্ঞানপিপাসা ('জ্ঞানান্বেষণ') ; 'Enquirer' ও 'জ্ঞানান্বেষণ' ছিল এই বিদ্রোহীদের কাগজের নাম, অন্য পত্র 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর'। সভাসমিতি গঠন, সংবাদপত্র পরিচালনা প্রভৃতি দ্বারা শিক্ষা ও সমাজক্ষেত্রে তাঁরা বিপ্লব ঘটাতে চেয়েছিলেন। সেদিন 'ধর্ম' বলতে সাধারণতঃ আচার-ধর্মই বোঝাত। তাই 'ধর্মসভা'র (ইং ১৮৩০) সনাতনীরা এঁদের বিরুদ্ধে যে প্রবল চীৎকার তোলেন তাতে ক্রোধ ছিল বেশি, যুক্তি ছিল কম। এজন্যই ইয়ং বেঙ্গলও 'ধর্মসভা'র নাম দেয় 'গুড়ুম সভা'। উদ্দীপনার বশে মদ্য-পান ও নিষিদ্ধ আহারে ইয়ং বেঙ্গল উৎকট বাড়াবাড়ি করতেন। আর দুঃসাহসের বশে, সত্য মিথ্যা যত অভিযোগ অন্যেরা করত, তা তুচ্ছ করতেন। মা কালীকে 'গুড মর্নিং ম্যাডাম' কোনো ছেলে বলে থাকলে ('সংবাদ প্রভাকর', ইং ১৮৩১) নিশ্চয়ই বোঝা যায় তার সুবুদ্ধি না থাকলেও রঙ্গবোধ আছে। 'সমাচার চন্দ্রিকা'র পাতায় (যথা, ১৮৩০ ইং ৬ই নভেম্বর ; ১৮৩১, ২৬শে এপ্রিল ; ১৮৩১, ৯ই মে ইত্যাদি) পত্রসমূহের অনেক কথা—এই 'ধর্মসভা'র গোঁড়াদের পরিকল্পিত প্রচারের জন্য উদ্ভাবিত ও লিখিত বলে মনে হয়। 'ইয়ং বেঙ্গল' তুচ্ছ করলেও সংস্কারপন্থী 'সমাচারদর্পণে'র উত্তরদাতারা সে সবের উত্তর দিতে কার্পণ্য করেন নি।

(গ) **সমাজ-সংস্কার :** ধর্ম-সংঘাত ও সমাজ-সংঘাত তখন অবিমিশ্রিত ভাবেই জড়িত ছিল। তাই হিন্দুর প্রতিমা-পূজা এবং বহু-দেববাদ ও জন্মান্তর-বাদের তর্কে ধর্মালোচনা শেষ হত না। ব্যক্তিগত আচার-আচরণ ও কুসংস্কারের তর্ক-বিতর্কেই সে আসর বেশি জমত। কেরির মত পাদ্রীরা প্রথম থেকেই কৃষ্ণ ও খৃষ্টের তুলনা করে আন্দোলন শুরু করেন। কিন্তু হিন্দুর কুসংস্কারের বিরুদ্ধে শুধু তাঁরাই অভিযান চালান নি। গঙ্গাসাগরে সন্তান নিক্ষেপ সরকারই বন্ধ করে। সতীদাহের বিরুদ্ধেও ওয়েলেস্‌লির সময় থেকেই কড়াকড়ি শুরু হয়। সহমরণের বিরুদ্ধে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের মত পণ্ডিতদের অভিমত আগেই

সংগৃহীত হয়েছিল, সে আন্দোলন ক্রমে প্রবল হয়ে উঠল। একটু পরেই রামমোহন রায়ও তখনকার সংস্কারবাদী নেতাদের সঙ্গে সে আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন,—অমনি বাংলায় ও ইংরেজিতে তাঁর কলম চলল (খ্রীঃ ১৮২৯-১৮৩০ অব্দ)। সতীদাহ হিন্দুধর্মের অঙ্গ বলে একবার সে প্রথার সমর্থনে দাঁড়ায় রাজা রাধাকান্ত দেবকে সম্মুখে রেখে হিন্দু রক্ষণশীলেরা। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর লর্ড বেন্টিঙ্ক এই প্রথা আইন-বিরুদ্ধ বলে ঘোষণা করেন। অমনি (১৮৩০, ১৭ই জানুয়ারি) প্রতিবাদের জন্য 'ধর্মসভা' গঠিত হল। বেন্টিঙ্কের ঘোষণার বিরুদ্ধে বিলাতে আন্দোলন করবার জন্য 'ধর্মসভা' একজন সাহেব মুখপাত্রকে (মিঃ বেথী) পাঠাচ্ছিলেন। সে জাহাজ পথেই ডুবল—বিধবাদাহের মুখপাত্র বেথী জলে ডুবে মরলেন। এদিকে রামমোহন প্রভৃতিও লর্ড বেন্টিঙ্ককে ধন্যবাদ দিয়ে মানপত্র দান করেন।

রামমোহনের কালে (ইং ১৮১৫-১৮৩০) সতীদাহ আন্দোলনই অবশ্য সর্বাপেক্ষা বেশি আলোড়ন সৃষ্টি করে। কিন্তু সমাজ-সংস্কারের আন্দোলন শুধু তাতেই সীমাবদ্ধ থাকে নি। 'সমাচার-দর্পণ' সংস্কারকামীদের মুখপত্র হয়। কৌলীন্য প্রথার বিরুদ্ধে পত্রাদি ১৮৩০-৩১ সনের মধ্যে 'সমাচার-দর্পণ', 'জ্ঞানান্বেষণে' প্রকাশিত হতে থাকে—১৮৩৫-এর ('দর্পণে' প্রকাশিত) 'চুঁচুড়া নিবাসী স্ত্রীগণের পত্র' যদি সত্যই স্ত্রীগণের লিখিত হয় তাহলে তা নিশ্চয়ই সংস্কার আন্দোলনের অদ্ভুত প্রসারের পরিচায়ক। অবশ্য বহু বিবাহ এই সময় থেকেই বাঙলার নূতন নাটকেরও আক্রমণের বিষয় হয়ে উঠছে। তবে এই ইং ১৮৩১-১৮৪৩ বা 'ইয়ং বেঙ্গলে'র উন্মাদনার দিনে ধর্ম-সংস্কার অপেক্ষা সমাজ-সংস্কারেই সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হচ্ছিল। 'ইয়ং বেঙ্গল শুধু দু'একটি কুসংস্কার দূর করতে বা বহু বিবাহ রোধ করতে চান নি, স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে 'মানুষের অধিকার' তাঁরা দাবী করেছেন, আর এমন তেজে আর কেউ এদেশে তা দাবী করে নি। এর পরেই বিধবা বিবাহ অনুমোদিত ও আইনসঙ্গত করবার জন্য কর্মক্ষেত্রে নামলেন বিদ্যাসাগর। আর তা আইন-সঙ্গত (১৮৫৬) করেই তিনি নিবৃত্ত হলেন না,—বিধবা-বিবাহ প্রচলিত করতেও প্রবৃত্ত হলেন। পুস্তিকা, সংবাদপত্র, সভা-সমিতি ছাড়িয়ে তা ছড়ার গানেরও বিষয় হয়ে ওঠে।

একটা কথা উল্লেখযোগ্য—সমাজ-সংস্কারের আন্দোলনের একটা প্রধান

আশ্রয় ছিল মুদ্রাযন্ত্র ও সংবাদপত্র, আর দ্বিতীয় আশ্রয় ছিল রঙ্গমঞ্চ। বাঙলার রঙ্গমঞ্চ উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জাগতে থাকে (ইং ১৮৫৬-৫৭)—সমাজ-সংস্কারের প্রেরণা তার পূর্বেই নাটকের এক প্রধান আশ্রয় হয়। যেমন, ১৮৫৪তেই রামনারায়ণের 'কুলীনকুলসর্বস্ব' রচিত হয়।

বলা বাহুল্য, 'ইয়ং বেঙ্গলে'র রামগোপাল ঘোষ, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় শুধু সংস্কারে তৃপ্ত হবার মত লোক ছিলেন না। তাঁরা বিদ্রোহী, 'টম পেন'-পড়া যুবক। প্যারীচাঁদ মিত্র, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রামতনু লাহিড়ীর মত স্থিরচিত্ত ধীরগামী সংস্কারক তাঁরা সকলে নন। বিদ্যাসাগর-অক্ষয়কুমারের মত আত্মস্থ পুরুষও তাঁরা হতে পারেন নি। শুধু ধর্ম ও সমাজের বিধি-নিয়ম কেন, তাঁরা প্রাচীন ও মধ্যযুগের সমস্ত নীতিবোধ ও মূল্যবোধকে উড়িয়ে দিয়ে তার স্থলে Age of Reason ও Rights of Man প্রতিষ্ঠা করবার জন্য অধীর হয়ে উঠেছিলেন। এই দুঃসাহসের সেদিন প্রয়োজন ছিল।

(ঘ) **নীতির সংঘর্ষ—মূল্যবোধের পরিবর্তন**ঃ মধ্যযুগের নীতিবোধ ও মূল্যমান যে টিকছে না, তা তো ভারতচন্দ্রের যুগেই বোঝা যায়। কিন্তু নূতন মূল্যমান আমরা নিজে থেকে পাই নি। কোম্পানির 'বাবুরো' ও বেনিয়ান মুৎসুদ্দিরাও বুর্জোয়া নীতিবোধ (ময়্যাল সেন্স) ও বুর্জোয়া মূল্যমান (Standard of Values) প্রতিষ্ঠিত করতে পারে নি। সে জিনিসের ধারণা জন্মাতে থাকে ইংরেজি শিক্ষার ও ইংরেজ-চরিত্রের সঙ্গে ভদ্রলোক শ্রেণীর যথার্থ পরিচয়ে। রামমোহন রায় ও রাধাকান্ত দেবই এই সত্যের সন্ধান প্রথম পেয়েছিলেন। অবশ্য ইংরেজের অপরাজেয় সংগঠন শক্তি—যুদ্ধে, রাজ্যশাসনে, বিশেষ করে সম্প্রসারিত শিল্প-বিপ্লবে তার অতুলনীয় কৃতিত্ব, দেখেও একভাবে এ শিক্ষা পাওয়া যেত। এমন ইংরেজ-চরিত্রও এ দেশে ছিলেন যাঁর কাছে মাথা নত করে নিজেকেই উন্নত মনে হয়—যেমন তার উইলিয়ম জোন্স্ বা উইলকিন্সের মত বিদ্যানুরাগী, কেরি-মার্শম্যান-ওয়ার্ডের মত আদর্শে উৎসর্গীকৃত প্রাণ, আর ডেভিড হেয়ার, জেমস লঙ্ ও বেথুনের মত শিক্ষাব্রতী। কিন্তু নতুন জীবনাদর্শের জন্য যা অক্ষয় প্রেরণার উৎস নিশ্চয়ই তা জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডার। ইংরেজী শিক্ষার চাবিকাঠি দিয়েই সে ভাণ্ডার খোলা যেত। এদিক দিয়ে ডিরোজিও চিরস্মরণীয়।

নীতিবোধের দিক থেকেও প্রথম পর্বখণ্ডের পনেরো বৎসর (ইং ১৮০০-১৮১৫) খ্রীষ্টান মিশনারিদেরই কাল—তাঁরা 'খ্রীশ্চান মর‍্যালস্' বলে এই নতুন নীতিবোধকেই প্রচার করেন।

বুর্জোয়া মূল্যমানের সঙ্গে খ্রীষ্টের অবশ্য কোনো মূলগত সম্পর্ক নেই। ইংরেজ সমাজে তা প্রথম উদ্ভূত হলেও এই বুর্জোয়া মূল্যমান ইংরেজেরও একচেটিয়া সম্পদ নয়। কারণ, অনেক খ্রীষ্টান দেশ আছে বুর্জোয়া সমাজ-বিন্যাস যেখানে ঘটে নি, বুর্জোয়া জীবনদর্শনও গৃহীত হয় নি। আবার ইংরেজ ছাড়াও অন্য এরূপ জাতি আছে যারা নিজের ভাষায় ও সাহিত্যে বুর্জোয়া আদর্শকে রূপদান করেছে। অবশ্য, উনিশ শতকে ইংরেজের কাছ থেকে ধার-করা দৃষ্টি নিয়েই আমরা পৃথিবী দেখতে বাধ্য হয়েছি।--ঔপনিবেশিকতার তাও একটা অভিশাপ। তাই মনে করছি ইংরেজী শিক্ষা আর বুর্জোয়া জীবনদর্শন বুঝি এক ও অভিন্ন জিনিস, আর খ্রীষ্টান ধর্মনীতি ও বুর্জোয়া নীতি বুঝি একই জিনিসের নাম। এমন কি, একথাও ভেবেছি যে ইংরেজের অধীনতা দীর্ঘস্থায়ী না হলে বুঝি আমাদের সামাজিক ও মানসিক উন্নয়নও সুসম্ভব হবে না, এবং জাতীয় জাগরণও ব্যাহত হবে।

আশ্চর্য কথা এই যে, খ্রীষ্টধর্ম ও বুর্জোয়া নীতিবোধ সম্বন্ধে এ ভুল রামমোহন রায় বা রাধাকান্ত দেব, দুই প্রথম ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙালী প্রধানদের জন্মায় নি। দুইজনাই প্রাচীন সংস্কৃত জ্ঞানভাণ্ডার সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। অবশ্য রামমোহনই এই দ্বিতীয় পর্বখণ্ডের নেতা—তাঁর সহযোগী দ্বারকানাথ, তারাচাঁদ, প্রসন্নকুমার প্রভৃতি। 'কলিকাতা রাজবাটি'র গৌরব রাজা রাধাকান্ত কুল-মর্যাদার দাবীতেই রক্ষণশীল দলের নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন। তাহলেও হিন্দুকলেজ, স্কুল সোসাইটি, এবং স্ত্রীশিক্ষা, বিশেষ করে বাঙলা শিক্ষার প্রচলন, প্রভৃতি প্রত্যেকটি কল্যাণ-কর্মে তিনিই নায়ক—সংস্কৃত শব্দকল্পদ্রুমের (ইং ১৮২২-১৮৫৮) সংকলয়িতারূপে তিনি দেশীয় ধারার সংস্কৃত চর্চারও পথপ্রদর্শক পণ্ডিত। রুশিয়ার সেণ্ট পিটার্সবুর্গ বিজ্ঞান অ্যাকাডেমির তিনিই ছিলেন একমাত্র সম্মানিত ভারতীয় সদস্য। আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক যোগাযোগের দিক থেকেও এ তথ্যটি স্মরণীয়।

বুর্জোয়া নীতিবোধকে জাতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে খাপ খাইয়ে গ্রহণ করা রামমোহনের জীবনের সাধনা। আমাদের সাধারণ ভাষায়—এবং ভ্রান্ত ভাষায়

—আমরা একেই বলি 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের সমন্বয়'। এ জন্যই রামমোহন যুগ-দ্রষ্টা—তাঁর এই সাধনাই ভারতের এ যুগের শ্রেষ্ঠ পুরুষদের সাধনা। যাই হোক, রামমোহনের পরের দিকের কয়েক বৎসরের যুক্তি-বিচারে ও প্রয়াসে (১৮১৫-৩১) নতুন নীতিবোধ স্পষ্ট হয়ে ওঠে—যথা, শাস্ত্র অপেক্ষা যুক্তি বড় ; অধ্যাত্মবোধ সামাজিক আচার-নিয়মের বাধ্য নয়, 'মানুষের অধিকার' সর্বদেশেই অনস্বীকার্য।

রামমোহন 'ধর্মসংস্থাপনার্থায়' আসেন নি, ভক্ত সাধুসন্তও ছিলেন না ; কিন্তু পরমার্থ চিন্তাকে তিনি মহামূল্যবান মনে করতেন। এই ধর্মগত ভাব-বাদিতা তাঁর মধ্যে দৃঢ় ছিল। কিন্তু রামমোহনের যুগেই মানুষের অধিকারের এই বুর্জোয়া ঘোষণা রামমোহনের অধ্যাত্মতত্ত্ব থেকে মুক্ত হতে আরম্ভ করে। হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও (ইং ১৮০৯-১৮৩১এর ২৬শে ডিসেম্বর) হিন্দু কলেজে মাত্র ৫ বৎসর শিক্ষকতা করেন (ইং ১৮২৬, মে—১৮৩১, এপ্রিল)। সে শিক্ষা পুঁথির শিক্ষা নয়, সত্যজিজ্ঞাসায় দীক্ষা। এ দীক্ষার মূলমন্ত্র 'Doubt everything'। তাঁর পত্রে তিনি তা ব্যক্ত করেছেন (দ্রষ্টব্য : যোগেশচন্দ্র বাগলের বঙ্গানুবাদ,—'উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা' হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও, পৃঃ ১২৭) :

"আমি ছেলেদের শিক্ষার ভার লইয়া তাহাদের (ছাত্রদের) মন হইতে সঙ্কীর্ণতা ও গোঁড়ামি দূর করিতে তৎপর হইলাম। আমি এক একটি বিষয় লইয়া তাহার সপক্ষে ও বিপক্ষে কি কি যুক্তি থাকা সম্ভব, তাহা বুঝাইয়া দিতাম। এ বিষয়ে মনীষী বেকনই আমার আদর্শ।...মনে একটি সন্দেহের পরে সন্দেহের উদয় হইবে, ফলে সকল বিষয়েই অবিশ্বাস জন্মিবে।"

নাস্তিকতা ও আস্তিকতা দু' বিষয়েই তিনি সন্দেহসঙ্কুল জিজ্ঞাসার সমান উৎসাহ দিতেন। কলেজের পরে এভাবে তাঁর নেতৃত্বে ছাত্রদের আলোচনা-সভা গড়ে ওঠে—'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন বা ইনস্টিটিউশন।' সেখানে the young lions of the Academy roared out, week after week, 'Down with Hinduism! Down with Orthodoxy!' (দ্রষ্টব্য: লালবিহারী দে'র লেখা আলেকজাণ্ডার ডাফ্-এর স্মৃতিকথা দ্রষ্টব্য)। 'পার্থেনন' নামে ইংরেজি সাপ্তাহিক এই নর-শাদূ'লেরা সম্পাদিত করতেন। তাতে 'ইয়ং বেঙ্গলে'র বিদ্রোহস্ফুলিঙ্গ দেখে হিন্দু নেতারা চমকিত হলেন। ১৮৩০এ নবাগত

খ্রীষ্টান মিশনারি ডাফ্ সাহেবও ভয়ে বিস্ময়ে ভারতবর্ষে ফরাসী এন্‌সাইক্লো-পীডিস্টদের এই সংশয়বাদী বংশধরদের দেখেন।—বেদান্তবাদী ইউনিটেরিয়ান্ রামমোহনের বিতর্ক-পদ্ধতি ছাড়িয়ে 'হিন্দু কলেজে'র ডিরোজিওর যুগ এগিয়ে যাচ্ছিল বাস্তববাদের দিকে—বিদ্রোহের পথে। সত্য ও নির্ভীকতা হল তাঁদের মন্ত্র। যখন মেকলে বাঙালী চরিত্রের কলঙ্কের নিদর্শন দেখে ক্ষুব্ধ হচ্ছিলেন, তখনি 'হিন্দু কলেজের ছেলে মিথ্যা বলে না'—একথা প্রবাদবাক্য হয়ে দাঁড়ায়। আর কোনো যুগে কোনো দেশের ছাত্রদলের সম্বন্ধে এমন কথা বলা চল্‌ত কি? চিন্তা করলে মেকলেও মানতেন বাঙলার সেই 'ইয়ং বেঙ্গল' ইতিহাসের এক অদ্ভুত প্রকাশ।

ডিরোজিওর অকাল-মৃত্যুতে বাঙলা দেশ তার প্রিয়তম এই বিদ্রোহী সন্তানকে হারায়। কিন্তু সে বিদ্রোহ পরিচালনা করে চলেন তাঁরা শিষ্যরা। ইং ১৮৩১এই তা আরম্ভ হয়। সংবাদপত্র পরিচালনায়, পুস্তিকা রচনায়, শিক্ষাবিস্তারে, বিতর্কে, আলোচনায়, রাজনৈতিক ও সামাজিক সংস্কারান্দোলনে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিককে নিয়ে দক্ষিণানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, রাধানাথ শিকদার, রামতনু লাহিড়ী, শিবচন্দ্র দেব, রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ ডিরোজিও-শিষ্যরা এই তৃতীয় খণ্ডকালে (ইং ১৮৩১-১৮৪৩) যুক্তি ও মানবাধিকারের দীপ্ত বাণী ঘোষণা করেন। কার্যতঃ তাঁরা সাফল্য অর্জন করেন কিন্তু চতুর্থ পর্বে ১৮৪৩ থেকে ১৮৫৮এর সময়ে। তবে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, কতকাংশে দক্ষিণানন্দ মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষও হিন্দু-সমাজ থেকে ক্রমে বিচ্ছিন্ন হন। তাঁদের অনুগামী না হলেও অপরেরাও তাঁদের মত বুর্জোয়া নীতিবোধে প্রবুদ্ধ। তাই, 'ব্র্যাণ্ডি ও বইয়ের বিপ্লব' প্রবাহিত হয়। নূতন নীতিবোধের উন্মাদনায় মদ্যপান ও অমেধ্য মাংসাহার অভ্যাস ও কর্তব্য হয়ে ওঠে। হিউমের 'এসে' তাঁরা মুখস্থ করেছেন, পেন্-এর 'এজ অব রিজন্' ও 'রাইটস্ অব ম্যান' জাহাজ থেকে নামতে না নামতেই প্রায় লুঠ হয়ে যায়। কৃষ্ণমোহনের পত্রিকায় আগুন ছুটল ইংরেজিতে—" 'Hail, Freedom, hail!' rang through impassioned sentences." কিন্তু বন্ধুদের উগ্রতায়, বিদ্রোহের উন্মাদনায় ও মত্ততায় বাড়াবাড়ি না হওয়াই আশ্চর্য। কৃষ্ণমোহন স্বগৃহ থেকে যখন বিতাড়িত হলেন, তখনো বন্ধুত্যাগ বা নতি স্বীকার করলেন না। রোমানদের মত তাঁদের নির্ভীক কণ্ঠ—রোমানদের মতই তাঁরা অনমনীয়।

কারণ, "A people can never be reformed without noise and confusion." সভা-সমিতি ও সংবাদপত্র সেই confusion বা কোলাহলে মুখরিত হয়ে উঠল। 'ধর্মসভা' ও 'সমাচার চন্দ্রিকা'র হতাশ পিতারা দুর্বিনীত ছেলেদের সুগতির আর পথ দেখলেন না। যখন আলেকজাণ্ডার ডাফ্ হিন্দু শিক্ষিতদের খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করতে লাগলেন তখন খ্রীষ্টান-ধর্মের আক্রমণের বিরুদ্ধেই অবশেষে ব্রাহ্ম-সমাজের দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ধর্মসভার রাধাকান্ত দেব একত্র হলেন (১৮৪৫)। 'হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠিত হল; ভূদেব মুখোপাধ্যায় হলেন তার প্রথম অধ্যক্ষ। ১৮৪৭-৪৮এ হিন্দু কলেজের আরও কিছু ছাত্র ও শিক্ষক খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। হয়তো এ সবের প্রতিক্রিয়ায় রসিককৃষ্ণ মল্লিক, প্যারীচাঁদ মিত্র, রাধানাথ শিকদারের মত ডিরোজিওর শিষ্যদের (ইং ১৮৪৩-এর সময় থেকে) সুস্থ সংস্কারচেতনা সংহত হয়; রামতনু লাহিড়ী, শিবচন্দ্র দেবদের ধর্মজিজ্ঞাসা জাগ্রত হয়। রামগোপাল ঘোষ রাজনীতিতে ও কৃষ্ণমোহন শিক্ষা ও সমাজের বহু ক্ষেত্রে ক্রমে সুস্থ কর্মশক্তির পরিচয় দেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর স্বদেশাভিমান ও ধর্মবোধ নিয়ে রামমোহনের ভিত্তিতে তাঁর জীবনাদর্শকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার আয়োজন করতে লাগেন 'তত্ত্ববোধিনী সভায়' (ইং ১৮৩৯)। রামমোহনের জ্ঞানবাদী অধ্যাত্মতত্ত্ব, দেবেন্দ্রনাথের সপ্রেম অধ্যাত্ম-নিবেদনে ও রাজনারায়ণ বসুর হৃদয়াবেগে অভিষিক্ত হয়ে শিক্ষিত সমাজে প্রবল আকর্ষণশক্তি লাভ করল।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার যুগেও (১৮৪৩ থেকে) যুক্তিবাদ কিন্তু অধ্যাত্মবাদের দ্বারা সমাচ্ছন্ন হল না। অক্ষয়কুমার দত্ত ও বিদ্যাসাগর সেই Age of Reason-এরই দৃঢ়চিত্ত প্রবক্তা। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু অবশ্য অধ্যাত্মরাগে রঞ্জিত। কোন্ নীতিবোধ যে বিদ্যাসাগরকে পরিচালিত করেছে তাঁর লেখার মতই তাঁর কর্মেও তা প্রকট। যুক্তির সঙ্গে পৌরুষ, কর্তব্যনিষ্ঠার সঙ্গে মানব-মমতা—নূতন 'মূল্যবোধের এই জীবন্ত বিগ্রহরূপে বিদ্যাসাগর উনবিংশ শতাব্দীর বাস্তববাদী আদর্শের শ্রেষ্ঠ পুরুষ হয়ে আছেন।

জেনে বা না জেনে, বাঙালী বুদ্ধিজীবীরা এই পরিবর্তিত নীতিবোধ ও মূল্যবোধেরই অভাব দেখেছিলেন সিপাহী যুদ্ধে। আর তাতে বুর্জোয়া বিপ্লবের আবশ্যকীয় সংগঠন শক্তির ও নেতৃত্বের চিহ্নও ছিল না, বরং আপাত-দৃষ্টিতে সামন্ত নেতাদেরই প্রাধান্য ছিল। না হলে অসাধারণ দেশপ্রীতি, বিদেশীয়

শাসকের বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ ও দুর্দমনীয় সাহসিকতা—এসব ১৮৫৭এর বিদ্রোহে যথেষ্ট ছিল। কিন্তু বাঙলায় সমসাময়িক সাহিত্যে, বিশেষ করে লোকগীতে, সিপাহীযুদ্ধের মত এত বড় বিপর্যয়ের কোনো উল্লেখ প্রায় নেই।

(ঙ) **প্রতিষ্ঠান সংগঠন**—প্রত্যেক যুগই সেই যুগের উপযোগী প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করতে করতে আপনাকে প্রত্যক্ষ ও প্রতিষ্ঠিত করে নেয়। ঔপনিবেশিক পরিবেশেও সেরূপ প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে—শাসকদের অনুকরণে ও নিজেদের প্রয়োজনে। আধুনিক শিক্ষার প্রতিষ্ঠান গঠনে দেশবাসীই প্রথম উদ্যোগী হয়। কোম্পানি বাস্তব ক্ষেত্রে সামাজিক ও প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান দাঁড় করায়। শাসন বিভাগ, রাজস্ব বিভাগ প্রভৃতির অনেক পরে কোম্পানি শিক্ষালয় ও শিক্ষা-সংগঠনে হাত দেয় (ইং ১৮২৩)—শিক্ষা ব্যাপারে গঠন করে 'জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইন্‌স্ট্রাক্‌শান'। ইং ১৮৪২এ বঙ্গ-প্রদেশে তার নামকরণ হয় 'কাউন্সিল অব এডুকেশন' ও তার অধীনে গঠিত হয় 'লোকাল কমিটি'। অবশ্য ইং ১৮৩৫ থেকে প্রতি জেলায় জেলা স্কুল প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। ইং ১৮৫৪এর উডের ডেস্‌প্যাচের পরে ইং ১৮৫৫তে স্থাপিত হয় ডিপার্টমেণ্ট অব পাবলিক ইন্‌স্ট্রাকশান; এবং উচ্চ শিক্ষা, মধ্য শিক্ষা ও প্রাথমিক শিক্ষা এই ত্রিধারায় তখন শিক্ষাব্যবস্থা আরম্ভ হয়। ইং ১৮৫৭ সনের ২৮শে জানুয়ারি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হল। তার প্রথম কমিটিতে বাঙালী সদস্য ছিলেন প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ, রমাপ্রসাদ রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

মানসিক ক্ষেত্রের প্রধান একদিককার প্রতিষ্ঠান হল শিক্ষালয় ও শিক্ষা-সমিতি, এবং প্রকাশন-সমিতি। বেসরকারী ইংরেজরা ছিল প্রথম এ সবে পথপ্রদর্শক, কিন্তু ক্রমেই দেশীয় প্রধানরাও তাতে অগ্রসর হন। ইংরেজি ভাষা ছিল মুখ্য বাহন, কিন্তু হিন্দু কলেজ প্রভৃতি বাঙালী প্রতিষ্ঠানে ৮ বৎসর পর্যন্ত বাঙলাতেই শিক্ষা দেওয়া হত। মেকলের ব্যবস্থার (১৮৩৫) পরে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা প্রায় উঠে যেতে লাগল। উডের ডেসপ্যাচে (ইং ১৮৫৪) মাতৃভাষা চর্চার দিকে জোর দেওয়া হয়। তথাপি শিক্ষা ব্যাপারে বাঙলা ইংরেজির পিছনেই পড়ে যেতে থাকে। বাঙলা শিক্ষার আয়োজনও যা তখন হ'ত, হ'ত পিছনে পিছনে।

কিন্তু শিক্ষাই সব নয়। সেই সঙ্গেই জন্ম নেয় সাহিত্য সভা, আলোচনা

সভা, আন্দোলনের সভা, ডেপুটেশন, এবং বিশেষ করে সংবাদপত্র যার নাম 'ফোর্থ এস্টেট'। এসব সভা সমিতি বুর্জোয়া যুগের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান। পুরোপুরি বুর্জোয়া সামাজিক ব্যবস্থা না থাকলেও বুর্জোয়া শিক্ষা ও জীবনাদর্শ ক্রমে এই ধরণের প্রতিষ্ঠান কলকাতায় তৈরী করে ফেলল। পাশ্চাত্ত্যাদর্শের স্কুল, পাবলিক লাইব্রেরী, এমন কি থিয়েটারও প্রভাব বিস্তার করল। এ আন্দোলনের প্রধান প্রধান দিক ও প্রধান প্রধান প্রতিষ্ঠান কি?

(১) **সাময়িক পত্র:** সংবাদপত্রের কথাই প্রথম স্মরণীয়। কারণ, এ কালের প্রস্তুতি, বিশেষ করে, বাঙলা সাহিত্যের প্রস্তুতি, সংবাদপত্রকে আশ্রয় করেই অনেকাংশে বিস্তার লাভ করে। বাঙালীর পরিচালিত ইংরেজি সংবাদ-পত্রের কথাও তাই একেবারে বাদ দেওয়া যায় না। কারণ, ভাব-বিপর্যয় তাতেই বেশি পরিস্ফুট হয়—অধিকাংশ কৃতী পুরুষের পক্ষে ইংরেজিই ছিল তখন মুখ্য ভাষা, বাঙলা গৌণ।

গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের 'বেঙ্গল গেজেটি', না, শ্রীরামপুরের 'সমাচার দর্পণ', প্রথম বাঙলা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র কোন্‌টি, তা এক্ষেত্রে বিচারের বিষয় নয়। যে আয়োজনে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য ও বাঙালী সমাজ বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হয়েছে তা 'সমাচার দর্পণ'। অন্তত ইং ১৮১৮ অব্দের ২৩শে মে থেকে ১৮৪১ পর্যন্ত তার প্রথম পর্যায়ের কালে 'সমাচার দর্পণ'ই প্রধান বাঙলা সংবাদপত্র। মার্শম্যান সাহেবের নেতৃত্বে বাঙালী পণ্ডিতেরা তা সম্পাদন করতেন (দ্রষ্টব্য: ব্রজেন্দ্রনাথ—সং-সে-ক: ১ম. ভূমিকা)। মাসিক পত্রের দিক থেকে শ্রীরামপুরের তথ্যপূর্ণ মাসিক 'দিগ্‌দর্শন' তার পূর্বেই (এপ্রিল, ১৮১৮) প্রকাশিত হয়। ইংরেজি 'ফ্রেণ্ড অব্‌ ইণ্ডিয়া'ও শ্রীরামপুর মিশনের ঐ বৎসরের কীর্তি। অতএব এ দিকে মিশনারি নেতৃত্ব সর্বস্বীকার্য।

এর পরে বাঙলায় সংবাদপত্রের জগতে আরও প্রায় ২৮খানি সংবাদপত্র আবির্ভূত হয়—অনেকগুলিই অল্পকাল মধ্যেই বিলুপ্ত হয়। কিন্তু ১৮২১ অব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর প্রথম রামমোহন রায় প্রভৃতি হিন্দু নেতাদের পরিপোষণে প্রকাশিত হয় হিন্দুদের মুখপত্র 'সম্বাদ কৌমুদী'। ১৮২২ অব্দের ৫ই মার্চ ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদকতায় প্রকাশিত হয় হিন্দু রক্ষণশীলদের মুখপত্র 'সম্বাদ চন্দ্রিকা'। রামমোহন রায় ও দ্বারকানাথ ঠাকুরের উদ্যোগে নীলমণি হালদারের সম্পাদনায় 'বঙ্গদূত' ও ইংরেজি Bengal Herald

১৮২৯-এ প্রকাশিত হয়—(Colonisation-এর সমর্থন তাতে ছিল)। 'বঙ্গদূত' বাঙলায় প্রথম বুর্জোয়া প্রগতির বাহন। পরে এল স্বনামধন্য ঈশ্বর গুপ্তের সংবাদ প্রভাকর' (২৮শে জানুয়ারি, ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দ) 'ইয়ং বেঙ্গলে'র 'জ্ঞানান্বেষণ' এবং ১৮৩৫এর ১০ই জুন, প্রথম সাহিত্য মাসিক পত্র 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়'. আর শেষে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' (১৮৪৩), 'সম্বাদ ভাস্কর' (১৮৪৮),'সোমপ্রকাশ' (১৮৫৮)—এসব নাম বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। কিন্তু শিক্ষিত শ্রেণীর ভাবলোক গঠনের দিক থেকে যে সব বাঙলা সাময়িক পত্র ও সংবাদপত্র উল্লেখযোগ্য তার মধ্যে 'বঙ্গদূতে'র পরে ১৮৩১এর (১৮ই জুন প্রথম প্রকাশিত) দক্ষিণানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদিত 'জ্ঞানান্বেষণ'কে বিশিষ্ট স্থান দিতে হবে। 'জ্ঞানান্বেষণ' অবশ্য বাঙলা-ইংরেজি কাগজ। 'ইয়ং বেঙ্গলে'র বুর্জোয়া নীতিবোধ, রাজনীতিবোধ এমন কি ব্যবসায় ক্ষেত্রে ও ব্যবহারিক জীবনে দেশের পশ্চাদ্‌বর্তিতা সম্বন্ধে 'জ্ঞানান্বেষণ যে সচেতনতার পরিচয় দেয় তা রামমোহন-বিদ্যাসাগরেও তত স্পষ্ট নয়। তবে ভাব-সংগঠক হিসাবে প্রধান স্থান দিতে হয় 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'কে, এবং বাঙলা সাহিত্যচর্চার ও 'কলেজীয় কবিতাযুদ্ধের ক্ষেত্র হিসাবে ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর'কে। পঞ্চম কিন্তু প্যারীচাঁদ মিত্র-রাধানাথ শিকদারের ক্ষুদ্র 'মাসিক পত্রিকা'; তা অনন্যসাধারণ সহজবোধ্য বাঙলা গদ্যের আসর। আর 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'কে ছেড়ে দিলে এরূপ ইংরেজী সংবাদপত্রের মধ্যে বিশেষ স্মরণীয় 'পার্থিনন' (অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের আলোচনা সভার মুখপত্র. সম্ভবত: ১৮২৭-১৮২৮-এর জিনিস). তারপরেই ১৮৩১-এর (জুলাইতে প্রথম প্রকাশিত) কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের Enquirer, যার নামেই ডিরোজিওর বীজ মন্ত্রের পরিচয় রয়েছে.— আর যার উদ্দেশ্য ঘোষিত হয় 'Having thus launched our bark under the denomination of *Enquirer*, we set sail in quest of truth and happiness.' এই ঘোষণায়। 'ধর্মসভা'র সঙ্গে এরই সংগ্রাম বাধল: (দ্রষ্টব্য: বিনয় ঘোষের উদ্ধৃতিসমূহ. বিশ্বভারতী, ১২ ৩)—

"The bigots are up with their fulmination. The heat of the *Gurum Sabha* is violent"—ইত্যাদি। "Let the liberals' voice be like that of the Roman—a Roman knows not only to act but to suffer."

এ সঙ্গেই উল্লেখযোগ্য হিন্দু কলেজের প্রথম ছাত্র ও রামমোহনের তরুণ সহযোগী প্রসন্নকুমার ঠাকুরের 'Reformer' (১৮৩৪-১৮৩৫)। বাঙলা ভাষার ও সাহিত্যের সপক্ষে 'রিফর্মার' প্রচার করেছে। 'রিফর্মারে'র পাতায় প্রথম স্বাধীনতার স্বপ্নের ও রাজদ্রোহের ক্ষীণ আভাসও আবিষ্কার করা যায়—১৮৩৪-এর দুটি প্রবন্ধে (দ্রঃ যোগেশচন্দ্র বাগল—প্রসন্নকুমার ঠাকুর, বিশ্বভারতী)। বিশেষ করে রামগোপাল ঘোষের সম্পাদিত (তারাচাঁদ চক্রবর্তী, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতির লেখায় পুষ্ট) ১৮৪২-১৮৪৩ (নবেম্বর), Bengal Spectator-এর নামও পূর্বে করেছি। ১৮৬৩এ প্রকাশিত কাশীপ্রসাদ ঘোষের Hindu Intelligencer পরবর্তী Hindu Patriot-এর অগ্রদূত। সিপাহী যুদ্ধের বিদ্রোহের সময়ে ও তৎকালীন নীল বিদ্রোহের দিনে হরিশ মুখুজ্জে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' এ বাঙালী শিক্ষিতের ক্রমপরিপুষ্ট (লিবার‍্ল্) রাজনৈতিক চেতনার ও দেশপ্রীতির অপূর্ব পরিচয় দেন।

(খ) **সভা-সমিতি ঃ** ভাব-সংগঠনের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠান ইংরেজদের বণিক-সভা ও সাহিত্য-সভা প্রভৃতি অনেক দিন থেকেই ছিল ; কিছু কিছু দেশীয় পদস্থ লোকও তাতে ক্রমে স্থান লাভ করে। রুস্তমজী কাওয়াসজী ও দ্বারকানাথ ঠাকুর ইংরেজ বণিকের শক্তিকেন্দ্র 'বেঙ্গল চেম্বার অব্ কমার্সে'র' সদস্য ছিলেন (যোগেশচন্দ্র বাগল—উঃ শঃ বাঃ)। এশিয়াটিক সোসাইটি (ইং ১৮২৯ পর্যন্ত ভারতীয়দের স্থান দেয় নি), কেরির Agricultural and Horticultural Society প্রভৃতি সাংস্কৃতিক সমিতির কথাও অবিস্মরণীয়।

রামমোহন রায়ের 'আত্মীয় সভা'ই হয়ত বাঙালীর প্রথম সংগঠিত সভা। তাতে বিশেষভাবে তাঁর ধর্মমতের আলোচনা হত। পরবর্তী 'উপাসনা-সভা' (১৮২৮) Unitarian Committee ও ব্রহ্ম-সমাজে (১৮২৯) তা পরিষ্কার হয়। কিন্তু 'আত্মীয়-সভা'য় জাতিভেদ, অসবর্ণ বিবাহ প্রভৃতি বিষয়েও আলোচনা হত। সনাতনীদের 'ধর্মসভা'ও শুধু ধর্মালোচনার সভা নয়, সতীদাহ সমর্থনের আন্দোলনেই তার জন্ম। বলা বাহুল্য, তার পূর্বেই জনমত প্রকাশের অন্য সব পথ আবিষ্কৃত হয়েছে—যেমন, আবেদন-নিবেদন ও টাউন হলে সভা। কিন্তু স্পষ্টরূপে আলোচনা সভা স্থাপিত হয় হিন্দু স্কুলের অন্যতম প্রথম ছাত্র প্রসন্নকুমার ঠাকুরের উদ্যোগে 'গৌড়ীয় সমাজের' প্রতিষ্ঠায় (১৮২৩ সনের ২৩শে মার্চ)। মিশনারিদের আক্রমণে ও নিজেদের প্রাচীন শাস্ত্র সম্বন্ধে অজ্ঞতা দূর

করবার জন্য এ সমিতিতে হিন্দু সমাজের গোঁড়া ও উদার মতাবলম্বীরা অনেকেই একত্রিত হন। সতীদাহ, 'অ্যাঙলিসিস্ট বনাম ওরিয়েণ্টালিস্ট' প্রভৃতি অনিবার্য দ্বন্দ্বের কারণসমূহ তখনও প্রকট হয় নি। বাঙলা ভাষার মধ্য দিয়ে মৌলিক রচনার ও অনুবাদ সাহিত্য ও বিজ্ঞানের প্রচার 'গৌড়ীয় সমাজের' উদ্দেশ্য ছিল। বেশিদিন না চললেও এ 'সমাজ' ব্যর্থ হয় নি'। (দ্রঃ যোগেশচন্দ্র বাগলের প্রবন্ধ: প্রসন্নকুমার ঠাকুর. বিশ্বভারতী পত্রিকা, ৭।৩)। তারপর 'ডিরোজিও'র পর্ব—'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন' বা ইন্‌স্টিটিউশন (—১৮২৮ সনে আরম্ভ? যোগেশচন্দ্র বাগল, উঃ শঃ বাঃ—পৃঃ ১২৭,—তাতে "সপ্তাহে সপ্তাহে কাব্যদর্শনাদি আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম ও সমাজমূলক নানা প্রশ্ন, যথা—স্বদেশপ্রেম, পাপপুণ্য. সত্যবাদিতা. পৌত্তলিকতা, ঈশ্বরের অস্তিত্ব, নাস্তিক্যবাদ প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতা হইত।" "...it was...more like the Academies of Plato or the Lyceum of Aristotle" (লালবিহারী দে'র ভাষা, বিনয় ঘোষের উদ্ধৃতি—বিঃ ভাঃ ১২।২)। আবার মনে করতে পারি. "The young lions of the Academy roared out, week after week, 'Down with Hinduism! Down with Orthodoxy'!"

তারপর, New societies started up with utmost rapidity... Indeed the spirit of discussion became a perfect mania—এই হল নবাগত (১৮৩০) পাদ্রি আলেকজাণ্ডার ডাফ্-এর কথা। নতুন সমিতি হু-হু করে স্থাপিত হচ্ছে। বলতে হয়, আলোচনা যেন ওদের একটা দুরারোগ্য রোগ হয়ে উঠছে—এবং এ কালেও তা আমাদের যায় নি। এই নিছক ঐহিক শিক্ষা (purely secular education) পাদ্রি সাহেবকে দুঃখিতও করেছিল। এজন্য রামমোহনও হয়ত 'অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান হিন্দু অ্যাসোসিয়েশন' (১৮৩০) স্থাপনে সায় দিয়েছিলেন। যা'হোক. এ সকল আলোচনার প্রধান লক্ষণ ছিল মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা। এ সব সভা-সমিতি সবাইকার দানেই পরিপুষ্ট হয়। দু-একটির কথা তবু অবিস্মরণীয়—যেমন. দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পরিচালিত ১৮৩২ সনের 'সর্বতত্ত্বদীপিকা-সভা', তারাচাঁদ চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে পরিচালিত 'ইয়ং বেঙ্গলে'র বিবিধ ও বিচিত্র আলোচনার 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা' (Society for the Acquisition of General

Knowledge, ১৮৩৮-এ স্থাপিত) যেখানে রিচার্ডসনকে (১৮৪৩) ক্ষমা চাইতে হয়। আর সর্বাধিক সার্থক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তত্ত্ববোধিনী-সভা (১৮৩৯এর ৬ই অক্টোবর স্থাপিত), কালীপ্রসন্ন সিংহের 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা' (ইং ১৮৫৩) এবং ইংরেজ-বাঙালীর একযোগে প্রতিষ্ঠিত (১৮৫১) ও পরিচালিত 'বেথুন সোসাইটি' (দ্রঃ সাঃ পঃ পত্রিকা, ১৩৬৩, ১ম—৪র্থ সংখ্যা)।

মাত্র দশজন সভ্য নিয়ে তত্ত্ববোধিনীর সূচনা, দু বৎসরে সভ্য-সংখ্যা ৫০০ ছাড়িয়ে যায়, ক্রমে তা ৮০০তে ওঠে। একই কালে এর মধ্যে এসে সমবেত হন অক্ষয়কুমার দত্তের মত নিরঙ্কুশ জ্ঞানোপাসকেরা, এবং দেবেন্দ্রনাথের অনুগত রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতির মত স্বদেশভক্ত অধ্যাত্মবাদীরা। 'ইয়ং বেঙ্গলে'র বিদ্রোহের মধ্যে যে আত্মবিস্মৃতি ছিল তাতেই তাঁদের বিদ্রোহ ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। তাঁরা অনেকাংশে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর জাতির প্রাণকেন্দ্রের সঙ্গে শিক্ষিত নেতৃবর্গের এই বিচ্ছিন্নতা দূর করলেন। কিন্তু তাকে একটা অধ্যাত্ম-আদর্শের সঙ্গেও তিনি বেঁধে দিলেন। পরবর্তী-কালে তাঁর সেই ভাবুকতার মধ্য দিয়ে বাঙলা সাহিত্যে ভাবুকতায় সমৃদ্ধ সাহিত্য জন্মাল, তা ঠিক। কিন্তু বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদারের স্পষ্ট বস্তুনিষ্ঠ চিন্তার ধারাও কতকটা এ অধ্যাত্ম আদর্শে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, তাতেও ভুল নেই।

'বেথুন সোসাইটি' একটু পরে (১৮৫১) স্থাপিত হয়, তখন শিক্ষিত চেতনা রূপলাভ করছে। বিদ্যাসাগর, রঙ্গলাল এখানে প্রবন্ধ পাঠ করেন। সংস্কৃতি ক্ষেত্রে সমিতির দান কোনো কোনো দিকে অভিনব ; আর ১৮৫৯ থেকে 'জাগরণের' দিনেও নবোদ্যমে এই সোসাইটি অগ্রবর্তী হয়। বিজ্ঞানের আলোচনা ছিল তার একটা প্রধান কাজ। পাদ্রি জেমস্ লঙ্-এর উদ্যোগে সমাজ-বিজ্ঞানের আলোচনারও সূত্রপাত হয় এখানে। ইং ১৮৫৭-৫৮ পর্যন্ত 'বেথুন সোসাইটি'র অগ্রগণ্য কর্মীদের মধ্যে মার্কিন একেশ্বরবাদী পাদ্রি সি. এচ্. এ ড্যাল, জেম্স হিউম, ও চেভার্স প্রমুখ বিদেশীয়দের সঙ্গে পাই বিদ্যাসাগর, প্যারীচাঁদ মিত্র, কিশোরীচাঁদ মিত্র, ডাঃ গুডিভ্ চক্রবর্তী, রামচন্দ্র মিত্র, নবীনকৃষ্ণ বসু, প্রমুখ দেশীয়দের (১৮৫৯এ ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারও প্রবন্ধ পাঠ করেন)। বাঙলা সাহিত্যে এঁদের কারও কারও নাম নেই, কিন্তু বাঙালী মানসে দান রয়েছে। তাই পরবর্তী (সিপাহী যুদ্ধের শেষে ও নীল-

বিদ্রোহের সময়ের) একটি ঘটনা এখানেই উল্লেখ করছি—ইং ১৮৫৯-৬০এর সদস্য তারাপ্রসাদ চক্রবর্তীর কথা.— তিনি ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের জামাতা, পরে গুণবান্ বাঙালীর মতই ডিপুটিপদ পান। কিন্তু বেথুন সোসাইটির সভায় সেবার তিনিই সর্বপ্রথম এই মর্মে রাজনৈতিক উক্তি করেন যে, ইংরেজ ভারতবর্ষ ত্যাগ না করলে কি ইংরেজ, কি ভারতবাসী কারো মঙ্গল হবে না। (দ্রষ্টব্য যোগেশচন্দ্র বাগল. 'বেথুন সোসাইটি', সাঃ পঃ পত্রিকা ১৩৬৪, ৪র্থ সংখ্যা)।

জাতীয় চেতনা যে কতটা অগ্রসর হয়েছে তার প্রমাণ 'বেঙ্গল-ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়া সোসাইটি' নামে প্রথম রাজনৈতিক সমিতির প্রতিষ্ঠা (১৮৪৩)। এটি শুধু আলোচনা সভাই নয়, শাসন ও রাজনৈতিক প্রশ্নের আলোচনার জন্য সংঘবদ্ধ আন্দোলনেরও সভা। তৃতীয় দশকেই সতীদাহ-প্রশ্ন, অ্যাঙলিসিস্ট বনাম ওরিয়েণ্টালিস্টএর বিতর্ক, শেষে ১৮৩৩ সনের সনদ পরিবর্তন-কালীন নানা রাজনৈতিক সংস্কারমূলক প্রস্তাব অবলম্বন করে এদেশের 'পাব্লিক লাইফ' ও রাজনৈতিক চেতনা অগ্রসর হয়েছিল। ১৮৪০ সনে দ্বারকানাথ ঠাকুর বিলাত থেকে পার্লামেণ্টের সভ্য ভারতবন্ধু মিঃ জর্জ টমসনকে এদেশে এই রাজনৈতিক সংগঠন স্থাপিত করবার জন্য নিয়ে আসেন। 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা'য় প্রথম টমসন সাহেব এ বিষয়ে বাঙালী নেতাদের সঙ্গে আলাপ করেন। তাতে বিলাতে প্রতিষ্ঠিত 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি'র মত সংস্থা গঠনের প্রস্তাব স্থির হয়। ১৮৪৩, ২০এ এপ্রিল তারাচাঁদ চক্রবর্তী সে প্রস্তাব উত্থাপন করেন, তারপর সোসাইটি গঠিত হয়। প্রস্তাবে সমিতি গঠনের উদ্দেশ্য বলা হয়—দেশের অবস্থা, আইন-কানুন প্রভৃতি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশ, শান্তিপূর্ণ ও আইন-সঙ্গত উপায় (means of peaceable and lawful character) গ্রহণ করে দেশবাসীর সর্বশ্রেণীর মঙ্গল সাধন, তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার ও স্বার্থবৃদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রসর না হলেও এ সমিতিই পরে 'ল্যাণ্ড-হোল্ডাস্' অ্যাসোসিয়েশনে'র সঙ্গে মিশে 'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনে' (১৮৫১, ২৯শে অক্টোবর) পরিণত হয়। তার কিছু পূর্বেই অবশ্য খ্রীষ্টান আক্রমণে প্রগতিবাদী ও রক্ষণশীল হিন্দুরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন। রাধাকান্ত দেব নব-শোধিত 'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদক হন। এটি প্রধানত জমিদার ও সম্ভ্রান্তগণের প্রতিষ্ঠান। কিন্তু রাজনৈতিক সংগঠনের ইতিহাসে এই সোসাইটি

দেশীয় লোকের প্রথম সংগঠন; জাতীয় মেলার (১৮৬৭) বিশ বৎসর, ও জাতীয় কংগ্রেসের ৪০ বৎসর পূর্বে এর জন্ম।

১৮৪০ থেকে ১৮৫০এর মধ্যেই তাই দেখতে পাই বাস্তব ও ভাব-জীবনের পরিবর্তন সুস্পষ্ট হয়েছে। ১৮৪৯এ বেথুন সাহেব চারটি প্রস্তাব উত্থাপন করে মফঃস্বলের বিচারালয়ে ইংরেজদের বিচারের অনুমতি দিতে চেয়েছিলেন। তার বিরুদ্ধে সাহেবরা তীব্র বিক্ষোভ দেখায়। এ প্রস্তাবসমূহের তারাই নাম দেয় 'ব্ল্যাক অ্যাক্ট্স্।' রামগোপাল ঘোষের নেতৃত্বে বাঙালীরাও উল্টো দিকে প্রস্তাব সমর্থনে অগ্রসর হয়। সাহেবরাই অবশ্য জয়ী হয়, কিন্তু বাঙালীর রাজনৈতিক চেতনা এ সূত্রে আরও বৃদ্ধি পায়। এর পরে একদিকে ডালহৌসির রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সংগঠন, অন্যদিকে বিদ্যাসাগরের শিক্ষা-সমাজ-সংস্কার। ১৮৫৩এর সনদ পরিবর্তনের সময়ে বাঙালীরা যে দাবি তুলল তা বিশেষ তাৎপর্যময়—যথা, নীল ও লবণে কোম্পানির একচেটিয়া ব্যবসায়ের অবসান, দেশীয় শিল্পের উৎসাহদান, ভারতীয়দের উচ্চপদে নিয়োগ এবং ভারতশাসনের জন্য ভারতীয়-সংখ্যাধিক্যযুক্ত আইন সভা নিয়োগ। তারপরে এল শিক্ষা ডেস্‌প্যাচ (১৮৫৪); ১৮৫৭এর জানুয়ারিতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হল। এ সবে মিলে বাঙালী শিক্ষিতের লিবার‍্যাল্ রাজনৈতিক চেতনাই পরিপুষ্ট হয়।

১৮৫৭এর মার্চ মাসের ২৯শে যখন ব্যারাকপুরের সিপাহীরা বিদ্রোহ করল—মঙ্গল পাণ্ডে বীরের মত প্রাণ দিল—তখন তা এই বাঙালী শিক্ষিতদের দৃষ্টিতেও পড়ে নি। সিপাহী বিদ্রোহের আগুন অবশ্য মে মাসে জ্বলে উঠল। বাঙালী শিক্ষিত শ্রেণীর পক্ষে তখনও প্রধান কর্তব্য মনে হয়েছে—আত্মপ্রস্তুতি —বুর্জোয়া জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসার, জাতীয় ঐক্য, সংঘবদ্ধ প্রতিবাদ, সাধ্যায়ত্ত সংস্কারের জন্য আন্দোলন (Fight for limited objectives), যেমন,—সিপাহীদের প্রতি পরবর্তী অত্যাচারের প্রতিবাদ, নীলকরের অত্যাচারের প্রতিরোধ। সহানুভূতিশীলদের দৃষ্টিতেও সিপাহী বিদ্রোহ ছিল অকাল বোধন। সাহিত্য-রচনা, নাট্যাভিনয়, কোনো জিনিসেই তাঁরা বিক্ষিপ্ত মানসের পরিচয় দেন নি। বাঙালীর সমগ্র চিত্ত তখন সৃষ্টির প্রেরণায় উন্মুখ —তার জীবন-পিপাসা প্রকাশ-বেদনায় থর থর কম্পমান।

ইং ১৮০০ থেকে ১৮৫৭, বাঙলার ইতিহাসের এই কালটির দিকে এখন সমগ্রভাবে একবার তাকিয়ে দেখলে পূর্ব পূর্ব যুগের তুলনায় বাঙালী জীবন যে কত গতিমান, কত পরিবর্তমান হয়ে উঠেছে তা বুঝতে পারি। আধুনিক কালের প্রধান যুগলক্ষণ এই গতি। কাল যতই এগিয়ে চলে সেই গতির মাত্রা ততই (tempo) ক্ষিপ্রতর হয়। ততই জটিল ও বিচিত্র ঘটনা ও ভাবধারায় জীবন ঐশ্বর্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে। এই দীর্ঘকালের মধ্যে সেই ঔপনিবেশিক পরিবেশও কেবলই পরিবর্তিত হয়ে চলেছে—রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, এবং শিক্ষা-সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের ক্ষেত্রেও তা স্পষ্ট। ১৮০০ থেকে ১৮১৫ এই কালে—ইংরেজ আধিপত্যে একরাজ্য-বন্ধনে ভারত আবদ্ধ হচ্ছে, শিল্প-বিপ্লবে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা নূতনতর হচ্ছে, সনদ বদল হয়ে নতুন ধনিকশক্তি স্বীকৃতি লাভ করছে। তথাপি মনে হয় সে কাল মন্দ-স্রোত। তারপর রামমোহনের পর্যায়—সংঘাতের আরম্ভ, যন্ত্রের আগমন, শহরে মধ্যবিত্তের ও শিক্ষিত শ্রেণীর জন্ম। তৃতীয় পর্যায়ে 'ইয়ং বেঙ্গলে'র উন্মাদনার মুখে দেশ যখন টলমল তখনই অন্যদিকে কয়লা, চা প্রভৃতি ব্যবসায়ের গোড়াপত্তন হচ্ছে, যার ফলে রুস্তমজী কাওয়াসজী, দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতির ভাগ্যাকাশও আচ্ছন্ন হতে বাধ্য; চাকরির পথেই বরং মধ্যবিত্তের নতুন প্রতিষ্ঠা লাভ হচ্ছে, 'সংবাদ-প্রভাকরে'র পাতায় গুপ্ত কবির দেশীয় স্বাদেশিকতা আত্মপ্রকাশ করছে। তারপরে এল 'তত্ত্ববোধিনী'র পালা—বিদ্যাসাগরের কাল। তা'ই আবার ডালহৌসির যুগ, শিক্ষার যুগ, যন্ত্রযানের যুগ, নব্য ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের গোড়াপত্তনের যুগ, আর বিদ্যাসাগরের মানবতার যুগ। সকলের দানে বাঙলা গদ্য জন্মলাভ করছে, বাঙলা পদ্য পথ খুঁজছে, বাঙলা নাটক প্রতিভাকে আহ্বান করবার জন্য উদ্‌গ্রীব—এক কথায় বাঙালী সমাজ ও বাঙলা সাহিত্য সৃষ্টির জন্য প্রস্তুত।'

সমগ্রভাবে এ পর্বের সর্বপ্রধান সাহিত্যকর্ম তাই—বাঙলা গদ্যের উদ্ভাবনা। কেরির আমল থেকে বিদ্যাসাগরের প্রথম যুগ পর্যন্ত দীর্ঘকালের মধ্যে বাঙলা গদ্য ক্রমে দাঁড়িয়ে যায়। গদ্যেও সৃষ্টির কার্য আরম্ভ হয়—ব্যঙ্গ রচনা ও উপন্যাসের উন্মেষ তার নিদর্শন। অবশ্য বাঙলা নাটকেরও অভিনয় বৃদ্ধি পায়। এ পর্বেই নাটক প্রণয়ন আরম্ভ হয়, কিন্তু তার যথার্থ প্রতিষ্ঠা হয় পরবর্তী পর্বে—দীনবন্ধু-মাইকেলের দানে। সাহিত্যে সৃষ্টির সর্বাপেক্ষা বড় নিদর্শন

কাব্য—বাঙলা কাব্যের সম্বন্ধেও একথা সত্য। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্ত থেকে মধুসূদন (১৮৬০-৬১) ঐতিহ্যের পরিণতি মাত্র নয়; মধুসূদন এক বৈপ্লবিক বিকাশ। রঙ্গলাল প্রতিভাহীন। ঈশ্বর গুপ্ত এই শিক্ষিতদের বাঙলা রচনায় প্রেরণা দিয়ে একটা সেতুবন্ধনের কাজ সমাধা করেছেন। তাঁর নিজের দানের মূল্য বোঝা যায় একথা মনে রাখলে যে, গতানুগতিক ধারার সাহিত্য—কবিওয়ালা, তর্জা, খেউড় প্রভৃতি তাঁর কালেও পরিমাণে সামান্য ছিল না।

কিন্তু প্রস্তুতি পর্বের সাহিত্যের প্রধান কৃতিত্ব সৃষ্টিতে নয়—নূতন জীবন-যাত্রার জন্য জাতিকে প্রস্তুত করাতে, নূতন জীবনদর্শন প্রতিষ্ঠা করাতে, আর নূতন সাহিত্যাদর্শ আবিষ্কার করাতে। সে যুগের সাহিত্যের কাজ এই—এ কথা মনে রাখা প্রয়োজন। রস-বিচারে তার অনেকটাই সাহিত্য নয়, কিন্তু জীবন-বিচারে তাকে শিক্ষা ও ভাব-সংঘাতের সাহিত্য বলাও প্রয়োজন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গদ্য সাহিত্যের গোড়াপত্তন

(খ্রীঃ ১৮০০—খ্রীঃ ১৮৫৭)

মলিয়েরের নাটকের চরিত্র হঠাৎ আবিষ্কার করে অবাক হয়ে গেল – চিরদিনই সে গদ্যে কথা বলেছে। উনিশ শতকে পৌছে বাঙালীরও এই রকম বিস্ময়ের কারণ ঘটল – চিরদিনই সে কথা বলেছে গদ্যে আর লিখেছে পদ্যে। অন্তত আটশ' বা ন'শ' বছর ধরে এইরূপ চলেছে। দশম বা একাদশ শতকের চর্যাপদের দিন থেকে একেবারে ইং ১৮০১ অব্দের 'রাজা প্রতাপ আদিত্য চরিত্রে'র পূর্বক্ষণ পর্যন্ত বাঙলা সাহিত্য হচ্ছে বাঙলা পদ্য— বিশেষ করে পদ ও পাঁচালী। কিন্তু তাতে যে কি বিস্ময়কর সূক্ষ্ম আলোচনাও সম্ভব তার প্রমাণ কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ।

প্রায় সব সাহিত্যেই দেখি পদ্য আগে, গদ্য পরে। মনের মত কথা ও মনে রাখবার মত কথা সুর দিয়ে. ছন্দ দিয়ে ও মিল দিয়ে বলাই ছিল রীতি, নইলে তা বললেও স্মৃতিতে জীইয়ে রাখা যায় না। আর লেখা তো কথাকে জীইয়ে রাখবারই একটা কৌশল। লিখিত কথা ছন্দে ও মিল দিয়ে বলাই ছিল নিয়ম—অবশ্য মন্ত্র হলে ভিন্ন কথা, তা চিরবন্দনীয়।

অনেক ভাষার থেকে বাঙলায় যে গদ্য বিলম্বে জন্মাল তার একটা কারণ বাঙলা পয়ারের সহজ নমনীয়তা ও প্রকাশ-ক্ষমতা। 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'ই তার প্রমাণ। হয়ত এজন্যই বাঙলা গদ্যের অন্ধকার যুগ এত দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে। এবং আরও আশ্চর্যের কথা এই যে, সাগরপারের পাশ্চাত্ত্য জাতিরা এসে সুচতুরা ধাত্রীর মত গদ্যকে জননী-জঠর থেকে মুক্তি না দিলে হয়ত বাঙলা সাহিত্যের কোল সে তখনও আলো করত না। এ কথাটা অবশ্য উলটিয়েও বলা যায়—পাশ্চাত্ত্য জাতিদের আগমন ও বিস্তারের সঙ্গে আধুনিক যুগের আরম্ভ হল আর তাই গদ্যের প্রয়োজনও ক্রমেই বেশি ক'রে অনুভূত হল। কারণ. আধুনিক কাল ও তার জটিল জীবনযাত্রার দাবী গদ্য ছাড়া শুধু পদ্যে পূরণ করা যায় না। আধুনিক কাল না আসা পর্যন্ত গদ্যের আবশ্যকতা অনিবার্য হয়ে ওঠেনি। না হলে সংস্কৃত গদ্য বাঙালী লেখকদের

সম্মুখেই ছিল, উপনিষৎ ও নানা বিষয়ের ভাষ্যটীকা প্রভৃতির কথা ছেড়ে দিলেও সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যের কাদম্বরী, দশকুমারচরিত, বা হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্রে ব্যবহৃত গদ্য নামক ভাষাশৈলীর সঙ্গে তাঁরা পরিচিত ছিলেন। ফারসী, আরবী গদ্যের সঙ্গেও তাঁদের পরিচয় না ছিল তা নয়। দলিল দস্তাবেজ ছাড়া সাধারণ চিঠিপত্রও নিশ্চয়ই গদ্যে লেখা হত, তার প্রমাণও রয়েছে। বাঙালী বৈষ্ণবেরা তাঁদের নিবন্ধেও কিছু কিছু ভাঙা গদ্য ব্যবহার করেছেন। তবু পর্তুগীস পাদ্রীরাই প্রথম প্রয়োজনের তাগিদে বুঝলেন—খ্রীষ্টধর্মের কথা এদেশের লোককে বুঝিয়ে বলতে হলে লোকের কথাবার্তার রীতিতে গদ্যেই তা বলা দরকার। কিন্তু পর্তুগীসরাও বাঙালীর মনে গদ্যের এই প্রয়োজনবোধ জাগাতে পারেনি। আধুনিক যুগের বিচিত্র জীবনস্রোতের বাহন হয়ে এদেশে পর্তুগীসরা আসেনি। তা হয়ে এল ইংরেজ, যার সাহিত্যে গদ্যের প্রয়োজন পদ্যের ঐশ্বর্যের মতই তার পূর্বে সুপ্রমাণিত হয়ে গিয়েছে। জীবন-যাত্রায় যে আলোড়ন তারা তুলল, তারই প্রয়োজনে গদ্য-সাহিত্যের উদ্ভব (ইং ১৮০০ থেকে ১৮১৫র মধ্যে)। তার পরে যুগ-জীবনের সেই তাগিদ মেটাতে মেটাতে বাঙালীরও প্রস্তুতি চলল, বাঙলা গদ্যেরও প্রস্তুতি চলল (ইং ১৮১৫-১৮৫৭)। ক্রমে আমাদের আত্মপরিচয়ে সুনিশ্চিত হল গদ্যেরও ক্রমবিকাশ (ইং ১৮৭২ অব্দে 'বঙ্গদর্শন'-এর কাল থেকে)—এই হল উনিশ শতকের বাঙলা গদ্যের ইতিহাস।

॥ ১ ॥ বাঙলা গদ্যের অন্ধকার যুগ

কাল-নিশ্চয়তা এ-দেশের বহুক্ষেত্রেই দুঃসাধ্য, এমন কি, পুঁথিপত্রের প্রমাণও প্রায়ই অপরীক্ষিত। এই সহজ সত্য মনে রেখেই বলা যায়—(১) প্রথম বাঙলা গদ্যের নমুনা বোধ হয় ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে (১৪৭৭ শকাব্দে) অহোমরাজ স্বর্গনারায়ণকে (=স্বর্গদেব?) কোচবিহারের মহারাজা নরনারায়ণের লেখা পত্র। 'স্বর্গনারায়ণ' (১৫৬০ শকাব্দ) যদি 'স্বর্গদেব' না হন, তা হলে এ পত্রের তারিখের (১৪৭৭ শকাব্দ) সঙ্গে প্রায় একশত বৎসরের গরমিল ঘটে, আর পত্রের প্রামাণিকতায়ও সন্দেহ থেকে যায়। তবু পত্রের তারিখ অনুযায়ী খ্রীঃ ১৫৫৫ অব্দের বাঙলা গদ্যের নিদর্শনরূপে এখনও একে মেনে নেওয়া হয়। তার ভাষা থেকে এ কথাও বোঝা যায় সাধু ভাষা'র প্রচলনই সর্বস্বীকৃত।

(ক) চিঠিপত্র দলিল-দস্তাবেজের গদ্য : শিরোনামার সংস্কৃত সম্ভাষণাদির পরে মহারাজা নরনারায়ণের লিখিত এই প্রাথমিক বাঙলা গদ্যের নমুনা এই রকম :—

লেখনং কাযঞ্চ। এথা আমার কুশল। তোমার কুশল নিরন্তরে বাঞ্ছা করি। অখন তোমার আমার সন্তোষ সম্পাদক পত্রাপত্রি গতায়াত হইলে উভয়ানুকুল প্রীতির বীজ অঙ্কুরিত হইতে রহে। তোমার আমার কর্তব্যে বার্দ্ধতাক পাই পুষ্পিত ফলিত হইবেক। আমরা সেই উদ্যোগত আছি। ইত্যাদি।

সন্দেহ নিরসন হয় না। তবে পরের শতাব্দীতে অহোম রাজাদের একাধিক চিঠি পাওয়া যায়। তা অবশ্য পুরনো অসমিয়া ভাষা। কিন্তু পুরনো অসমিয়া ('কামরূপিয়া') আমাদের উত্তরবঙ্গের বাঙলা ভাষার সঙ্গে প্রায় অভিন্ন। সে সব চিঠির ভাষার রূপ এ চিঠির ভাষারূপের সগোত্র। কোচবিহার, কাছাড়ের রাজভাষাও ছিল বাঙলা।

যে-লেখা সম্বন্ধে সন্দেহ নেই তা হচ্ছে ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ঢাকা অঞ্চলের উপভাষায় লেখা একখানি চুক্তিপত্র। ব্রিটিশ মিউজিয়ামের বাঙলা কাগজপত্রের মধ্যে তা পেয়ে শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৩২৯এর (১৯২২) 'বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা'য় (তৃতীয় সংখ্যায়) তার ফটোগ্রাফ প্রকাশ করেন। তাতে জানি—সোনারগাঁয়ের দু'জন সাহেবের (গই ও গারবেল) আড়তের দালালি নিচ্ছে কৃষ্ণদাস ও নরসিংহদাস। উপভাষার নমুনা (ও-কার স্থলে উ-কার) হলেও বোঝা যায় বাঙলা গদ্যের সাধুরূপ ঠিক হয়ে আছে। এর তুলনায় প্রায় ৭৫ বৎসর পরেকার লিখিত (১৭৭৮ খ্রীঃ অব্দের) মহারাজ নন্দকুমারের পত্র (পুত্র গুরুদাসের নিকট) অধিক গুরুতর, কিন্তু তখনকার বাঙলা গদ্যের নমুনা দুর্লভ নয়,—চিঠিপত্রের বাঙলা গদ্যে তখন প্রায়ই পাই ফারসী শব্দের ছড়াছড়ি। বরং তার পূর্বে ১৭৩১ খ্রীঃ অব্দের (বাং ১১৩৮ সালের) গৌড়ীয় মোহান্তগণের লিখিত 'ইস্তফাপত্র' ও জয়পুরের প্রেরিত সভাপণ্ডিত কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্যের 'অজয়পত্র' বৈষ্ণব-ইতিহাসের গুরুতর জিনিস (এ পত্রটি অবশ্য পাঠ্য। 'বঙ্গসাহিত্য পরিচয়', পৃঃ ১৬৩৮-৪৩ দ্রষ্টব্য)। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া না পরকীয়া, এ বিচারে জয়পুরের স্বকীয়াবাদের পণ্ডিতেরা পরাজিত হয়ে বাঙলার পরকীয়াবাদের পণ্ডিতদের কাছে এই পরাজয়-পত্র লিখে দিয়েছিলেন। এই পত্র নানাদিক থেকেই ইতিহাসের একটি মুখ্য দলিল।

(খ) **নিবন্ধাদির গদ্য ঃ** এই সব চিঠিপত্র দলিল-দস্তাবেজের ভাষা থেকে বৈষ্ণব নিবন্ধকারদের লিখিত ভাষা স্বতন্ত্র, কিন্তু তাই বলে তাতে বাঙলা গদ্যের যথার্থ রূপ অধিক প্রতীয়মান, এমন নয়। পণ্ডিতী বিচারের প্রশ্নোত্তরের বা সহজিয়া সাধনার সাঙ্কেতিক ভাষার ছাঁদ সে সবে স্পষ্ট। তার মধ্যে প্রাচীনতম নিদর্শন বলে ধরা হয় রূপগোস্বামীর 'কারিকা'। প্রামাণিক বলা যায় নরোত্তম দাস লিখিত 'দেহকড়চা' নামক নিবন্ধের (১৬৮১-৮২ খ্রীষ্টাব্দ; দ্রঃ সুকুমার সেন, বাঃ সাঃ গদ্য) গদ্য। নমুনা ঃ—

"তুমি কে। আমি জীব। তুমি কোন্ জীব। আমি তটস্থ জীব। থাকেন কোথা। ভাণ্ডে। ভাণ্ড কিরূপ হইল। তত্ত্বস্তু হৈতে।" ইত্যাদি।

এ হচ্ছে প্রশ্নোত্তরের ভাষা। কড়চা বা নিবন্ধের ভাষা প্রায়ই এই এক ছাঁদের।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে গদ্য রচনার নানা নিদর্শন পাওয়া যায়। সহজিয়া নিবন্ধ, শূন্য পুরাণের (?) গদ্য ভাগ, ও কবিরাজী পাতড়া থেকে ন্যায়-জ্যোতিষের নিবন্ধ পর্যন্ত বহু ধরণের নমুনা দুর্লভ নয়। এ সবের কোথাও কোথাও যথার্থ বাঙলা গদ্যেরও সূত্রপাত দেখতে পাই। যেমন, 'ভাষাপরিচ্ছেদের' অনুবাদের (১৭৭৪-৭৫ খ্রীষ্টাব্দের) পুঁথির প্রারম্ভে :

"গৌতম মুনির শিষ্য সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন আমাদিগের মুক্তি কি করিলে হয় তাহা কৃপা করিয়া বলহ। তাহাতে গৌতম উত্তর করিতেছেন। তাবৎ পদার্থ জানিলেই মুক্তি হয়। তাহাতে শিষ্যেরা সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন। পদার্থ কতো।.........ইত্যাদি।"

এও অবশ্য প্রশ্নোত্তরে দর্শনের কথা। পঁচিশ বৎসর পরে কেরি বা ৪০ বৎসর পরে রামমোহন এ বিষয়ে যেরূপ বাঙলা লিখেছিলেন তার অপেক্ষা এ বাঙলা নিকৃষ্ট নয়। অবশ্য কালানুক্রমে ধরতে গেলে 'ভাষাপরিচ্ছেদে'রও ৫০ বৎসর পূর্বে পর্তুগীসরা বাঙলা গদ্য লিখছিলেন এবং তাই পুঁথির বাইরে মুদ্রিত ও প্রকাশিত বাঙলা ভাষার প্রথম নিদর্শন। আরও বড় কথা, পলাশীর ত্রিশ বৎসর পূর্বে (১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দে) 'সাহিত্যিক গদ্যে'রও আভাস মিলে।

(গ) **গল্পের গদ্য ঃ** 'নিবন্ধ'-সাহিত্যের মধ্যেই কথাবার্তার রেশ শুনতে পাই। কিন্তু ভাগ্যক্রমে একটি গল্পের নিদর্শন বাঙলা গদ্যে বেঁচে আছে।

১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দে রচিত '৺মহারাজ বিক্রমাদিত্য চরিত্র' নামক গদ্য গল্পের নমুনাটি এই জন্য বিশেষ মূল্যবান (এটিও ব্রিটিশ মিউজিয়ম থেকে শ্রীযুক্ত

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় নকল করে আনেন)। এটি গল্পগুণে যাই হোক্ জাতিতে সাহিত্য। প্রথম দুটি বাক্য উদ্ধৃত করছি (বন্ধনীতে ছেদ অবশ্য আমরাই দিচ্ছি পাঠকের পক্ষে বোঝবার সুবিধা হবে বলে):

"মোং ভোজ্জপুর (।) শ্রীযুক্ত ভোজরাজা (।) তাহার কন্না শ্রীমতি মৌনাবতি (।) সোড়ষ বরিস্তা (।) বড সুন্দরি (।) মুখ চন্দ্র তুল্য (।) কেষ মেঘের রঙ্গ (।) চক্ষু আকর্ন্ন পর্যন্ত্য (।) যুগ্ম ভ্রূর ধনুকের নেয়ায় (।) ওষ্ঠ রক্তিমে বর্ন্ন হস্ত পদ্মের মৃণাল (।) স্তন দাড়িম্ব ফল (।) রূপলাবণ্য বিদ্যুৎছটা (।) তার তুলনা আর নাঞী (।) এমন সুন্দরি কন্যার বিবাহ হয় নাঞী। কন্না পন করিয়াছে (।) রাত্রের মধ্যে জে কথা কহাইতে পারিবেক তাহাকে আমি বিভা করিব।..."

ভাষা নিশ্চয়ই বাঙলা, কিন্তু সাহিত্যাদর্শ সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্র সম্মত। বাঙলা গদ্যের দিক থেকে বলা যায়—উনিশ শতকেও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের আবির্ভাবের পূর্বে এরূপ গদ্য লেখা কম কথা নয়। এ লেখাকেই তাই বাঙলা গদ্য সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন বলতে পারি। সাহিত্য না হলেও সাহিত্যধর্মী এই প্রথম গদ্য।

অতএব দেখছি দলিল-পত্রের প্রয়োজনের গদ্য ছেড়ে যুক্তির গদ্য (যেমন, ভাষাপরিচ্ছেদের) ও সরস গদ্য (যেমন, এই বিক্রমাদিত্য চরিত্রের)—সাহিত্যের দুই রীতির গদ্য বাঙালী নিজেই অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে আবিষ্কার করছিল।

(ঘ) পর্তুগীসদের গদ্য-চর্চা: কিন্তু এসব লেখা পুঁথিতেই নিবদ্ধ। সচেতন গদ্য-চর্চার ও গদ্য-ব্যবহারের কৃতিত্ব পর্তুগীস্ পাদ্রি ও তাঁদের শিষ্যদের, তা মানতেই হবে। বিশেষ করে, মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে তাঁরাই অন্ধকার যুগের অন্তকাল ঘোষণা করেছিলেন। রোমান হরফে বাঙলা গ্রন্থ মুদ্রিত করে গদ্যকে তাঁরা স্থিরত্ব দিতে ও বহুল প্রচারিত করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু পর্তুগীজী বাঙলা গদ্যের উদ্ভবক্ষেত্র পূর্ব ও মধ্য বাঙলা, তাই পর্তুগীসরা বাঙলা গদ্যের প্রতিষ্ঠিত সাধুরূপ সর্বত্র রক্ষা করতে পারেননি। উপভাষার উপলাঘাতে ও বিদেশী বাক্যরীতিতে তাঁদের লিখিত গদ্য পড়তে গেলে বারে বারে ঠেকে যেতে হয়। তা ছাড়া, তাঁদের মুদ্রিত বাংলা বই রোমান্ হরফে মুদ্রিত। বাঙলা হরফে বাঙলা লেখা মুদ্রিত না হতে (খ্রীঃ ১৭৭৮ ও খ্রীঃ ১৭৮৩) বাংলা গদ্যের অন্ধকার যুগের অবসান হয়েছে, তা বলা যায় না। পর্তুগীস রাজ্যের মতই পর্তুগীস গদ্যও অতীত ইতিহাসের বস্তু—বাঙালীজীবনে তা প্রভাব বিস্তার করেনি। বাঙলা গদ্যের ইতিহাসে সেই চিহ্ন এখন অনেক সময় খুঁজেও পাওয়া

যায় না। যেমন, (১) খ্রীঃ ১৬৮৩ অব্দের পূর্বে লেখা পাদ্রি সান্তুচ্চি, গোমেশ ও সরয়বা নামক তিন জনের লিখিত বাঙলা শব্দ তালিকা, ব্যাকরণ, খ্রীষ্টীয় প্রার্থনা, খ্রীষ্টশাস্ত্র প্রভৃতি ; (২) সোনারগাঁয়ের শ্রীপুরের জেস্যুইট্ পাদ্রি ফেরনান্দেস্-এর ১৫৯৯এর পূর্বে লিখিত খ্রীষ্টধর্মের ব্যাখ্যান প্রসঙ্গ ; (৩) খ্রীঃ ১৫৯৯ অব্দে লিখিত সোসার খ্রীষ্টীয় প্রশ্নোত্তরের গ্রন্থ, এবং (৪) খ্রীঃ ১৭২৩এর পূর্বে পাদ্রি বের্‌বিয়েরের ক্ষুদ্র খ্রীষ্টীয় প্রশ্নোত্তর পুস্তিকা ;—চিঠিপত্র থেকে এসবের কথা এখন শুধু জানা যায়, নিদর্শন পাওয়া যায় না।

ইতিহাসের হাতে পৌঁচেছে মাত্র খানদুই পর্তুগীস গ্রন্থ : (১) দোম আন্তোনিওর 'ব্রাহ্মণ-রোমান্ ক্যাথোলিক সংবাদ' সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পাদে লিখিত হয়ে থাকবে (ডঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন ঐ নামে মূল পুঁথির অধিকাংশ সম্পাদন করেছেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তা ইং ১৯৩৭এ প্রকাশ করেছেন। তার 'প্রস্তাবনা'ও দ্রষ্টব্য)। গ্রন্থের লেখক বাঙালী : ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দের দিকে ভূষণার এক জমিদার-পুত্রকে মগ দস্যুরা অপহরণ করে। আগস্তিন সম্প্রদায়ের এক পর্তুগীস পাদ্রি তাকে টাকা দিয়ে ক্রয় করেন এবং খ্রীষ্ট ধর্মে দীক্ষিত ও শিক্ষিত করেন। এই ভূষণার জমিদার পুত্রেরই নাম দোম আন্তোনিও। তিনি খ্রীষ্টধর্মের বড় প্রচারক হন, প্রায় ত্রিশ হাজার লোক নাকি তাঁর প্রভাবে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে। এই গ্রন্থ তাঁরই রচনা। যেন একজন খ্রীষ্টান পাদ্রির ও ব্রাহ্মণের মধ্যে ধর্মের বিচার হচ্ছে, গ্রন্থটি এভাবে লেখা। প্রশ্নোত্তরে খ্রীষ্টধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করাই এর উদ্দেশ্য। ভাষার মধ্যে বাঙলার উপভাষার চিহ্ন প্রচুর। পর্তুগীসরা এ গ্রন্থ পরেও মুদ্রিত করেছিল বলে শোনা যায়। ভাষার সংক্ষিপ্ত নমুনা হিসাবে এইটুকু নেওয়া যাক্—প্রশ্নোত্তরের ভাষা মামুলি, কাটা কাটা, কাহিনীর ভাষাই নিচ্ছি।

"আর রামের দুই পুত্র লব আর কুশ সঙ্গে রামের বিস্তর যুর্ধ করিলেন পুত্র না চিনিয়া। শেষ মুনিসিয়া (=মুনি আসিয়া ?) পরাজয় (=পরিচয়) করিয়া দিল" ইত্যাদি।

(২) 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' খ্রীঃ ১৭৪৩ অব্দে রোমান্ অক্ষরে লিস্‌বন শহর থেকে মুদ্রিত হয় ('রঞ্জন প্রকাশালয় থেকে ১৩৪৬ বঙ্গাব্দে তা বাঙলা অক্ষরে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে)। এখানাও প্রশ্নোত্তর ছলে খ্রীষ্টধর্মের ব্যাখ্যা—তবে গুরু-শিষ্যের সংবাদ। গ্রন্থখানা ঢাকার ভাওয়াল পরগণার পর্তুগীস পাদ্রি মানোএল-দ-আসুম্পসাম্-এর রচিত। ভাওয়াল পরগণার

কোন দেশীয় লোকের হাত সে রচনায় ছিল—লেখায় সেই উপভাষার ছাপ আছে. আরবী-ফারসী শব্দও প্রচুর। তাছাড়া. পর্তুগীস থেকে অনুবাদের ছাপও যথেষ্ট প্রকট। তবু তা পড়া চলে; খানিকটা কৌতূহল চরিতার্থ হয়, কৌতুকও লাভ করা যায়। সেদিনের পাদ্রি আসুম্প্‌সাম্‌-কে প্রশংসা করতে হয়, তিনি 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' ছাড়াও পর্তুগীস ভাষায় একখানা বাঙলা ব্যাকরণ (কঃ বিঃ সম্পাদিত ও পুনর্মুদ্রিত) ও বাঙলা শব্দকোষ সংকলন করেছিলেন।

পাদ্রিদের এ ধরণেরই আরও দু'একখানা বই—রেস্তো ডি সেল্‌ভেস্ত্রো বা ডি সুজা রচিত প্রশ্নোত্তরমালা' ও 'প্রার্থনামালা'র কথাও শোনা যায়। এই পাদ্রি সাহেব কলকাতা ব্যাণ্ডেলের বাসিন্দা। বই পাওয়া গেলে দেখা যেত—হয়ত পূর্ববঙ্গের উপভাষার ছাপ নেই। তবে 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'ই পর্তুগীস রচনার প্রসিদ্ধ নমুনা। তাতে প্রশ্নোত্তরের মধ্যে মধ্যে ছোটখাটো ধর্মতত্ত্ব ও ভগবৎকৃপার গল্পও অনেক আছে। যেমন. 'তাত্ত্বেল-এর শেষ-দিককার গল্পটি নিই—মোটামুটি এটি ভাষার ভালো নমুনা :

সিদ্ধা লিউফ্রিদো বনবাসী-সকলের প্রধান আছিলেন। তিনি পাদ্রি-সকলকে লইয়া সঙ্গে, প্রতিদিন ধর্মঘরে ধ্যান করিতেন। ধ্যান করিয়া সাধুয়ে আপনার চৌকিতে বসিতেন। পাদ্রি সকলে এক এক করিয়া আসিয়া তাহান আশীর্বাদ লইত। একদিন সাধুয়ে অসুস্থ হইয়া ঘরে রহিলেন, ধর্মঘরে গেলেন না। এহা দেখিয়া ভূতে সাধুর ধরাণ লইল এবং সাধুর স্থানে বসিল। পাদ্রি-সকলে বড় পাদ্রির ধরাণ দেখিয়া, ভূত না চিনিয়া, ভূতের আশীর্বাদ লইতে লাগিল। এহার মধ্যে এক পাদ্রি সাধুর ঘরে থাকিয়া আসিল, আর বড় পাদ্রি ধর্মঘরে দেখিয়া কহিল: ঠাকুর এহা কি? তুমি এখানে আছ, এবং ধর্মঘরে? এহা কি মতে হইতে পারে? এহা শুনিয়া সাধুয়ে ভূতের বাজি চিনিয়া গেলেন ধর্মঘরে। দুয়ারসকল মেলিয়া দুয়ারে দুয়ারে আঙুল দিয়া ক্রুশ ক্রুশ করিলেন। পরে এক বেত দিয়া ভূতেরে মারিতে লাগিলেন, এবং ভূতে পালাইতে লাগিল।

গদ্যের নমুনা হলেও এসব লেখা সাহিত্যের নমুনা নয়।

(ঙ) ইংরেজের আয়োজন—বনিয়াদ-আবিষ্কার : বাঙলা ভাষাকে মুদ্রাযন্ত্রের বৈপ্লবিক সহায়তা-দান পর্তুগীসদের কৃতিত্ব নয়, সে কৃতিত্ব ইংরেজের। ভারতবর্ষে তামিল অক্ষরে প্রথম বই মুদ্রিত হয় মালায়ালাম ভাষায় খ্রীঃ ১৫৭৭ অব্দে। তাও ক্যাথোলিক ধর্মের বই। স্পেন দেশের এক পাদ্রি মহাশয়ের

উদ্যোগে তা ঘটে। বাঙলা অক্ষরে বাঙলা লেখা (পুরো বই নয়) ছাপা আরম্ভ হল প্রায় ২০০ বৎসর পরে—ইং ১৭৭৮এ হালহেড-এর বাঙলা ব্যাকরণ খ্রীষ্টশাস্ত্র প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রণীত হয়। সুতরাং "১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দকেই আমরা বাঙলা-গদ্যের ঐতিহাসিক যুগের আরম্ভ বৎসর বলিব", (সজনীকান্ত দাস, বাঙলা গদ্যের প্রথম যুগ)—এ মত সত্য। বিদ্যাজগতে মুদ্রাযন্ত্র বিপ্লব ঘটায়। তবে গদ্যের 'আরম্ভ' যথার্থরূপে হয় খ্রীঃ ১৮০১ অব্দে। তাই খ্রীঃ ১৭৭৮ থেকে খ্রীঃ ১৮০০ পর্যন্ত কালটিকে 'আরম্ভ' অপেক্ষাও 'আয়োজন-কাল' বলাই শ্রেয়ঃ। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে হালহেডের গ্রামারে বাঙলা গদ্য-রচনার আরম্ভ হয়নি; তবে বাঙলা মুদ্রণে গদ্যের সেই দীর্ঘ 'অন্ধকার-যুগ' শেষ হল তাতে সন্দেহ নেই।

বাণিজ্যের প্রয়োজনে ও রাজ্যশাসনের নিয়মে কোম্পানির উদ্যোগী পুরুষেরা পূর্বেই বাঙলা শিখছিলেন, তার প্রমাণ রয়েছে। নাথানিয়েল ব্রাসি হালহেড এই শিক্ষায় সাহায্য করবার জন্যই A Grammar of the Bengali Language বা 'বাঙলা ব্যাকরণ' রচনা করেন (১৭৭৬ ইং)। তার মুদ্রণ-ব্যবস্থার জন্য হেস্টিংস অনুরুদ্ধ হন। চার্লস উইলকিন্‌স্-এর এ-দিকে অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি ও হালহেড দুজনেই হুগলীর লোক। উইলকিন্‌স্ (পরে স্যর চার্লস উইলকিন্‌স্ ১৭৫০-১৮৩৬) স্মরণীয় পুরুষ। তিনি সংস্কৃত শিক্ষা করেন, আর ইংরেজিতে 'ভগবদ্‌গীতা' অনুবাদ করেন; তা ১৮৮৫ অব্দে লণ্ডনে মুদ্রিত হয়। প্রাচ্যবিদ্যার প্রথম পীঠস্থান কলকাতার 'এশিয়াটিক সোসাইটি' (খ্রীঃ ১৭৮৩) প্রতিষ্ঠায়ও উইলকিন্‌স্ স্যর চার্লস জোন্সের সহযোগী ছিলেন। হেস্টিংসের কথায় উইলকিন্‌স্ বাঙলা অক্ষর কাটাতে হাত দিলেন, আর এ কাজে তিনি পঞ্চানন কর্মকারকে সহকারী করে নিলেন (পরে পঞ্চানন ও তাঁর জামাতা মনোহর হরফ কাটার দক্ষ কারিগররূপে শ্রীরামপুরের মিশনের জন্য এ দেশের বহু ভাষার অক্ষর প্রস্তুত করে দেন)। ছেনী-কাটা ছাঁচে ধাতুদ্রব্য ঢালাই করে প্রথম বাঙলা হরফ তৈরী হল, আর তাতে খ্রীঃ ১৭৭৮ অব্দে হালহেডের ইংরেজিতে লেখা পূর্বোক্ত 'ব্যাকরণে' দৃষ্টান্তস্বরূপ কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসী মহাভারত ও ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর থেকে কিছু অংশ বাঙলা অক্ষরে মুদ্রিত হল। সম্পূর্ণ গ্রন্থ বাঙলায় রচিত নয় মৌলিক ও ধারাবাহিক রচনাও তাতে নেই। অর্থাৎ বাঙলা গদ্যের যথার্থ নমুনা নেই।

মুদ্রিত আকারে সে প্রয়াস বিলম্বিত হল। রাজকার্যে আইন-কানুনের বাঙলা অনুবাদই ইংরেজের প্রথম প্রয়োজন হয়, আর সঙ্গে সঙ্গে তাই প্রয়োজন হয় বাঙলা ব্যাকরণ, অভিধান ও শব্দকোষের। এসব সাহিত্য নয়, সাহিত্যের আশ্রয়ভূমি। হালহেডের বাঙলা ব্যাকরণের পরে ইং ১৭৮৫ অব্দে জোনাথান ডানকান-এর (Jonathan Duncan, 1756-1811) দেওয়ানী কার্যবিধির অনুবাদ মুদ্রিত হয়। ছয় বৎসর পরে ১৭৯১ অব্দে মুদ্রিত হয় তৃতীয় নিদর্শন —এডমনস্টোন্-এর (Neil Benjamin Edmunstone, 1765-1841) ফৌজদারী কার্যবিধির অনুবাদ—এ ভাষা 'ফারসী-ঘেঁষা'। তারপর, ১৭৯৩এ প্রকাশিত হয় ফরস্টার-এর (Henry Pitts Forster) 'কর্ণওয়ালিসী কোড্'-এর অনুবাদ ও ১৭৯৯ অব্দে তাঁর শব্দকোষের (সংক্ষেপে যা Vocabulary বলে উল্লেখিত হয়) প্রথম ভাগ; এই শব্দকোষের দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয় একেবারে খ্রীঃ ১৮০২ অব্দে। আরও দু-একজন এ ধরণের ইংরেজ রচয়িতা আছেন আপ্‌জন্ ও মিলার (সঃ কাঃ দাঃ 'বাঙলা গদ্যের প্রথম যুগ')। কিন্তু ইং ১৭৭৮ থেকে ইং ১৮০০ অব্দ পর্যন্ত কালের মধ্যে দুটি নামই এজন্য স্মরণীয়—একটি হালহেড, অন্যটি ফরস্টার (দ্রষ্টব্য ডঃ সু. দে'র ইংরাজিতে লেখা ১৯ শতক)।

হালহেড ও ফরস্টারেরও মৌলিক বাঙলা রচনা প্রায় কিছুই নেই। কিন্তু এই আইন-কানুনের অনুবাদে ভাষার বিষয়ে তাঁরা যথেষ্ট অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। বাঙলা ভাষা তাঁদের মুগ্ধ করেছিল। বাঙলার চিঠিপত্রে তখন ফারসীর দৃঢ় প্রভাব, আইন আদালতে তো ফারসীরই রাজত্ব। এঁরা ইংরেজ শাসক বলেই বেশ বুঝলেন বাঙলার আইন-আদালতে বাঙলা চলাই স্বাভাবিক, ফারসী সেখানে একটা কৃত্রিম বাড়াবাড়ি। অবশ্য ইং ১৮৩৮ সনের পূর্বে বাঙলা এ অধিকার লাভ করেনি। দ্বিতীয়তঃ, ইংরেজি আইনের বাঙলা অনুবাদেও ফারসী-আরবীর দিকে না ঝুঁকে এই ইংরেজ অনুবাদকরা ঝুঁকেছেন সংস্কৃতের দিকে। এর অর্থটা একটু অনুধাবনযোগ্য।

ভাষার রূপ ও রীতি সাধারণতঃ বিষয়ানুগ হয়। কিন্তু আইন-সম্পর্কিত বিষয়েও ইংরেজ লেখকেরা ফারসী-ঘেঁষা না হয়ে সংস্কৃত-ঘেঁষা হতে গেলেন কেন? তার কারণ, এই বিদেশী লেখকেরা একটা মূল সত্য ধরতে পেরেছিলেন —প্রাচীন ও মধ্যযুগের মধ্য দিয়ে বাঙালী ও বাঙলা ভাষা যে ভাবে বিকশিত

হয়েছে তাতে বাঙলার পক্ষে সংস্কৃতের শব্দভাণ্ডার ও ঐতিহ্য যতটা আপনার হয়ে উঠেছে, ফারসী-আরবীর ভাণ্ডার তা হয়নি (ফারসীর তুলনায় সংস্কৃত এ প্রাধান্য কি করে অর্জন করল তা এ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে আলোচিত হয়েছে)। এ উপলব্ধি দৌলত কাজী ও আলাওলের হয়েছিল। আর, জোর করেও যে আলাওলের উল্টো পথে গিয়ে সাহিত্য-সৃষ্টি করা যায় না, তার প্রমাণ অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধ থেকে 'মুসলমানী বাঙলার' কবিরা নিজেরাই জমিয়ে রেখে গিয়েছেন। অনেকগুলি কারণ সমাবেশে শৌরসেনী অপভ্রংশের বংশে 'হিন্দ্‌বী' (হিন্দোস্তানী) উদ্ভূত হয়েছে। উত্তর ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে মুস্‌লিম রাজশক্তির আরবী-ফারসীবাহিত সাংস্কৃতিক রীতিনিয়ম অঙ্গীভূত হয়ে যায়; দীর্ঘদিনে ফারসী-আরবীর ঐতিহ্য 'হিন্দোস্তানী' ভাষায় সংস্কৃত ঐতিহ্য অপেক্ষা অধিকতর প্রাধান্য লাভ করেছে। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে হিন্দু-মুসলমান গুণী ও মানী লোকেরা প্রায় চারশ বছর ধরে এ রকম মিশাল ভাষার (হিন্দ্‌বীর) চর্চা করে তাকে একটা সুমার্জিত ও স্বচ্ছন্দ রূপ দান করতে পেরেছেন: কিন্তু বাঙলা দেশে এরূপ কোন কারণই ঘটেনি—অষ্টাদশ শতকের নবাবী আমলে ফারসীর প্রভাব এসেছিল, কিন্তু তার শক্তি ও স্থায়িত্ব বেশি হয়নি। হয়ত বিদেশী বলেই হালহেড-ফর্‌স্টারের—বা অন্যান্য ইংরেজ মনস্বীদের—ফারসীর প্রতি অকারণ বিরাগ বা অহেতুক মোহ জন্মেনি। এঁরা বাঙলা ভাষারই সৌন্দর্য ও সম্ভাবনা বুঝে দেখেছিলেন। পর্তুগীজী বাঙলা ভাষার উপর তখন যতটা ফারসী-আরবী চেপে বসেছিল, হালহেড ও ফর্‌স্টারের বিচারে তাও মনে হয়েছে উৎপীড়ন। সে পীড়া থেকে বাঙলাকে মুক্ত করে তার স্বচ্ছন্দ প্রকাশ সম্ভব করবার জন্য তাঁরাই তখন আরও বেশি করে সংস্কৃত ভাষার শরণ নিলেন। পরে কেরি এই ধারণা ও উপলব্ধির প্রধান প্রবক্তা হন। এদিক থেকে এঁরা উনিশ শতকের বাঙলা ভাষার একটা বিরাট লক্ষণেরই প্রথম দৃষ্টান্তস্থল। সে লক্ষণের নাম 'সংস্কৃতীকরণ বা Sanskritisation। মধ্যযুগে বাঙলা ভাষায় দু'বার এই স্রোত আসে, আর উনিশ শতকে তা আবার (তৃতীয় বার) প্রবলভাবে প্রবাহিত হয়ে যায় (দ্রঃ ODBL)। এসব সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কার্যকারণে বাঙালী মুসলমানও বাঙলা ভাষার মোড় হিন্দোস্তানীর মত ফারসী-আরবীর দিকে ঘোরাতে পারেন নি,—হয়ত মোড় ঘোরানো সম্ভব ছিল না। কিন্তু উনিশ শতকের

মুসলমানের বাঙলা সাহিত্যের প্রতি ঔদাসীন্ত পরবর্তী কালে তাঁকে এই বাঙলার বিকাশধারা সম্বন্ধেও সন্দিহান করে তুলল—তাঁদের সন্দেহ হল বাঙলা ভাষার আকৃতি ও প্রকৃতি বুঝি বাঙালী হিন্দুর অভিসন্ধি-অনুযায়ী বিকাশলাভ করেছে। অথচ কার্যতঃ সবচেয়ে গোঁড়ারাই কেউ কেউ (যেমন মোঃ আক্রাম খাঁ) তখনও নিজেদের লেখায় সবচেয়ে বেশি সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করতেন। কারণ, ভাষার প্রকৃতি না মেনে তাঁরা পারেন নি।

ফর্‌স্টার আর একটি কাজও করেন—তিনি বাঙলা বানানকেও সংস্কৃতের নিয়মানুবর্তী করে তুলতে থাকেন। পূর্বযুগে বাঙলা বানানের বাপ-মা ছিল না। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের বানান দেখলে আজও লজ্জা পেতে হয়। বানানে সংস্কৃতানুযায়ী এই বিশুদ্ধি—একটু কড়া রকমের বিশুদ্ধিই—ধীরে ধীরে বাঙলা ভাষায় স্বাভাবিক নিয়ম বলে গ্রাহ্য হয়--ইংরেজের এসব ব্যাকরণ-অভিধানের প্রকাশে ও প্রচারে বিশেষ করে মুদ্রাযন্ত্রের অনমনীয় শৃঙ্খলা-শক্তির জন্ম। বাঙলা পাঠ্যপুস্তক এই বিশুদ্ধ বানান-পদ্ধতিকে একেবারে শৈশব থেকে ছাত্রদের মনে গেঁথে দিতে থাকে।

মৌলিক রচনা না থাকলেও বাঙলা গদ্যের মূল প্রকৃতি সম্বন্ধে এই ইংরেজদের স্থির বোধ জন্মেছিল। আর এঁদের পরে কেরি এসে সে আয়োজন সুদৃঢ় করে দিলেন। কিন্তু তার পূর্বে আর একটি আকস্মিক আবির্ভাবের কথা বলতে হয়।—রাজ্যচালনাও নয় ধর্মপ্রচারও নয়, নিতান্তই লোকচিত্ত বিনোদনের জন্ম একজন বিদেশী কলকাতায় ২৫ নং ডুমতলায় (এখনকার এজরা স্ট্রীটে) হঠাৎ বাঙালীকে দিয়ে বাঙলা ভাষায় লিখিয়ে দু খানা বাঙলা প্রহসনের অভিনয় করিয়ে গেলেন (খ্রীঃ ১৭৯৫ ও ১৭৯৬)। বই দু খানার নাম ইংরেজিতে পাওয়া যায়—The Disguise ও Love is the Best Doctor। গেরাসিম লেবেদেফ্ (Gerasim Lebedov) জাতিতে রুশ, কিন্তু আধুনিক বাঙলা রঙ্গমঞ্চের তিনি আদি পুরুষ; পরে তা আলোচ্য। সে প্রহসন দু'খানি মুদ্রিত হলে বা টিকে থাকলে হয়ত বাঙলা ভাষার প্রথম চলিত গদ্যের ও সাহিত্যিক গদ্যের নিদর্শন পাওয়া যেত। কিন্তু সেই দুটি প্রহসনের নামই মাত্র বিস্মৃতির অতল থেকে এখন উদ্ধার করা হয়েছে। লেবেদেফ্ ইংরেজিতে হিন্দীভাষার ব্যাকরণ প্রকাশ করেছিলেন। তিনি রাশিয়াতে নিজের সঙ্গে যে বাঙলা 'বিদ্যাসুন্দর' নিয়ে যান তাতে তাঁর লিপ্যন্তর

চেষ্টাও দেখা যায়। এসব সুরক্ষিত জিনিসের প্রতিলিপি এখন সুলভ হয়েছে। খ্রীষ্টধর্মের প্রচার ও শাসন-ব্যপদেশে ছাড়াও ইউরোপীয় জাতিদের একজন খাপছাড়া মানুষ আমাদের ভাষায় এভাবে নাম রেখে গিয়েছেন।

॥ ২ ॥ বাঙলা গদ্যের প্রথম পর্ব

খ্রীঃ ১৮০০ অব্দে শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন (১০ জানুয়ারি) ও শ্রীরামপুর মিশনের প্রেসের কাজ (মার্চ মাসে) আরম্ভ হয়। 'মঙ্গল সমাচার মাতিউর রচিত মুদ্রিত হতে থাকে। এই প্রেস থেকে শুধু খ্রীষ্টীয় প্রচারপুস্তক-মুদ্রণই হত না, কৃত্তিবাসী রামায়ণ (১৮০১) ও কাশীদাসী মহাভারত (১৮০২) প্রথম মুদ্রিত করে বাঙালী আপামর জনসাধারণের জীবনে শ্রীরামপুর প্রেস যে দান জুগিয়েছেন, শ্রীরামপুর মিশনের কাজ সে তুলনায় সামান্য। প্রায় এই বৎসরই (ইং ১৮০০) কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। কিছুদিন পরেই (১৮০১এর ১লা মে) শ্রীরামপুর মিশনের উইলিয়ম কেরির উপরেই কলেজের বাঙলা বিভাগের ভার অর্পণ করা হয়। এই কলেজের বাঙলা পাঠ্যপুস্তক রচনার দায়িত্ব, শ্রীরামপুর মিশনের বাইবেল ও খ্রীষ্টধর্মবিষয়ক পুস্তক-পুস্তিকা রচনার নেতৃত্ব এবং সাধারণভাবে বাঙলা গ্রন্থ মুদ্রণের কাজ—মুখ্যতঃ কেরি, ও গৌণতঃ তাঁর সহকারীদের উপর পড়ে। বাঙলা গদ্যের এই প্রথম পর্বকে তাই 'ফোর্ট উইলিয়মের পর্ব বা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ-শ্রীরামপুর মিশনের পর্ব' কিংবা সাধারণভাবে 'কেরির পর্ব' বললেও ভুল হয় না।

(ক) **শ্রীরামপুর মিশন :** শ্রীরামপুর ব্যাপ্‌টিস্ট মিশনের উদ্যোগে উইলিয়ম কেরির পরেই উল্লেখযোগ্য মার্শম্যান ও ওয়ার্ড-এর নাম। পরবর্তীকালে কেরি ও মার্শম্যানের মতই হেয়ার, কলভিন্‌ ও পামার-এর নামও বাঙালীর স্মরণীয় হয়ে ওঠে। 'সেকাল ও একালে' রাজনারায়ণ বসু এই প্রচলিত শ্লোকটি উদ্ধৃত করেছেন :

> হেয়ার কল্বিন্ পামারশ্চ কেরী মার্শমনস্তথা।
> পঞ্চ গোরা স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনং॥

এ শ্লোক বাঙালীরও গৌরবের কথা, কেরি মার্শম্যান প্রভৃতি মনস্বীদেরও গৌরবের কথা। কারণ দীপঙ্কর, কুমারজীব প্রভৃতির থেকে তাঁরা কম নমস্য নন। তবে শ্রীরামপুর মিশনের সঙ্গে পরবর্তী তিনজনের সম্পর্ক ছিল না।

বরং তার সঙ্গে সম্পর্ক বেশি ছিল ওয়ার্ড-এর এবং কেরির মিশনারি প্রয়াসের অগ্রণী ও সহযোগী টমাস-এর।

জন টমাস (খ্রীঃ ১৭৫৭-১৮০১) বাঙলায় প্রথম আসেন জাহাজের ডাক্তার হয়ে খ্রীঃ ১৭৮৩ অব্দে। অস্থিরচিত্ত এই ডাক্তার হিন্দুদের মধ্যে 'গসপেল' প্রচারের সংকল্প নিয়ে ১৭৮৭তে পাদ্রি হন। তাঁর প্রথম কৃতিত্ব—দেশীয় ভাষা ও হিন্দু ধর্মশাস্ত্র শিক্ষার জন্য তিনি রামরাম বসুকে (১৭৮৭ ইং) মুন্সি হিসাবে সংগ্রহ করলেন। টমাসের পরিচয়েই রামরাম বসু পরে কেরির মুন্সি হন। টমাস একজনকেও খ্রীষ্টান করতে পারেননি। অবশ্য এই ক্ষ্যাপা সাহেবকে খ্রীষ্টান হবার আশ্বাস দিয়ে রামরাম বসু বরাবরই দু'পয়সা কামাই করতেন। টমাসের দ্বিতীয় কৃতিত্ব—সস্ত্রীক উইলিয়ম কেরিকে বিলেত থেকে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে খ্রীঃ ১৭৯৩ অব্দে বাঙলায় নিয়ে আসা। তখন কেরি ও রামরাম বসুর যোগাযোগ ঘটল। মিশনের কাজ (১৮০০) আরম্ভ হতে না হতেই টমাস উন্মাদ হয়ে যান। কৃষ্ণ পাল নামক একজন হিন্দু প্রথম কেরির নিকট খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করলে. টমাস তা দেখে আনন্দে আর মাথা ঠিক রাখতে পারলেন না। উন্মাদ অবস্থায় দিনাজপুরে শীঘ্রই টমাস মারা যান।

উইলিয়ম কেরির যোগ্যতম সহকর্মী যশুয়া মার্শম্যান (খ্রীঃ ১৭৬৮—খ্রীঃ ১৮৩৭)। তিনিও প্রথমে ধর্মচর্চার সঙ্গে সামান্য তন্তুবায়ের জীবিকাবলম্বন করতেই বাধ্য হন। কিন্তু বিদ্যানুরাগের ফলে ক্রমে স্কুলের শিক্ষক হন। ভারতবর্ষে আসার আগেই তিনি ল্যাটিন, গ্রীক. হিব্রু, সিরিয়াক্ প্রভৃতি ভাষা, শিক্ষা করছিলেন। এদেশে এসে যা করেন, তা এই থেকে বোঝা যাবে— তিনি শ্রীরামপুর মিশনের শিক্ষা বিভাগের কর্তা হন, 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'র সম্পাদনার ভার নেন ও রামমোহনের সঙ্গে বিতর্ক তিনিই চালান, সংস্কৃত রামায়ণের ইংরেজি অনুবাদেও তিনিই কেরিকে সাহায্য করেন। চীনা ভাষায় বাইবেল অনুবাদ, ব্যাকরণ ও অভিধান রচনা তাঁর প্রধান কীর্তি। একবার দেশে গেলেও মার্শম্যান তাঁর কর্মক্ষেত্র শ্রীরামপুরেই জীবন অতিবাহিত করেন।

উইলিয়াম ওয়ার্ড (১৭৬৯-১৮২৩) ছাপাখানার কাজ নিয়ে কর্মজীবন আরম্ভ করেন; ক্রমে সংবাদপত্র সম্পাদনায় অভিজ্ঞ হন। প্রধানতঃ বাইবেল মুদ্রণের পুণ্য আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তিনি এদেশে আসেন। শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের তিনিই ছিলেন প্রধান তত্ত্বাবধায়ক। ছোটখাটো বই ছাড়া হিন্দুদের রীতিনীতির

উপর তাঁর চার-ভল্যুমে লেখা ইংরেজি গ্রন্থ আছে। খ্রীঃ ১৮২৩ অব্দে শ্রীরামপুরেই তাঁর মৃত্যু হয়।

কেরি ও রামরাম বসুর কীর্তিই বিশেষ করে বাঙলা সাহিত্যের গদ্যের ইতিহাসের অন্তর্গত। শ্রীরামপুর মিশনের সম্বন্ধে সাধারণভাবে তবু এইটুকু স্মরণীয়—ইঃ ১৮০১এ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কাজ আরম্ভ হবার পূর্বেই (১৮০১, ফেব্রুয়ারি) এখানে প্রথম 'বাইবেলে'র অনূদিত প্রথমাংশ (নিউ টেস্টামেন্ট) মুদ্রিত হয়। মঙ্গল সমাচার মতিউর রচিত—Gospel of St. Matthews (ইং ১৮০০, ৭ই ফেব্রুয়ারি) মূল গ্রীক থেকে অনূদিত। তার পরে ক্রমাগত বহু সংস্করণ মুদ্রিত হয় ও তার সংস্কার চলে। যথারীতি সম্পূর্ণ বাইবেলও ('ধর্মপুস্তক') মুদ্রিত (১৮০৮ খ্রীঃ) হয়। কেরির মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে তার সংস্কার চলেছিল। এ ছাড়া খ্রীষ্টধর্ম সম্বন্ধীয় বহু পুস্তিকা প্রণীত ও বিতরিত হয়। পদ্যে, প্রচলিত পাঁচালী রীতিতেও তা লিখিত হয়েছিল। এসব কাজে রামরাম বসু ছিলেন মিশনারিদের সহায়। ১৮১৮-এর পূর্বেই এইভাবে প্রায় ৮০ খানা পুস্তিকা রচিত হয় ও প্রায় ৭ লক্ষ কপির বিতরণও চলে। তাছাড়া, নানা পত্রপত্রিকা পরিচালনা ও জ্ঞানগর্ভ নিবন্ধ, পুস্তক ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন পরে মিশনের কৃতী পরিচালকদের কাজ হয়ে ওঠে। প্রচার ছাড়া এসব অনেক জিনিসেরই অবশ্য মূল্য সামান্য। মিশনের মূল প্রয়াস বাইবেল সম্বন্ধেও একথা সত্য (খ্রীঃ ১৮৩৯এ লণ্ডন থেকে রোমান্ অক্ষরে মুদ্রিত ইয়েটস-এর বাইবেল অনুবাদ অবশ্য তা নয়)। বহু সংস্করণে শ্রীরামপুরের বাইবেল সংশোধিত হয়েছে, কিন্তু ভাষা স্বচ্ছন্দ বা মার্জিত হয়নি। হয়ত মূলানুগতাই ছিল কেরি প্রমুখ অনুবাদকদের প্রধান লক্ষ্য। না হলে কেরির ভাষা-বোধ ছিল, তা অন্যত্র দেখতে পাই। ইংরেজি বাইবেল ইংরেজি সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। বাঙলা বাইবেল দুর্ভাগ্যক্রমে হাস্যকর। তা 'শাস্ত্র' হয়ে ওঠাতে 'খ্রীষ্টানী বাঙলাও' একটা পরিহাসের বিষয় হয়েছে। সত্যই যদি বাইবেল স্বচ্ছন্দ বাঙলায় অনূদিত হত তাহলে বাঙলা লেখকের ভাব-জগতের মধ্যে হয়ত যীশুর উক্ত কথা, বা গল্প ও ধারণা এমন বেমানান ঠেকত না। কারণ, আরবদের 'আরব্য রজনীর' মত, য়িহুদীদের ওল্ড টেস্টামেন্টও পৃথিবীর একখানা মহৎ গ্রন্থ, আর যীশুর কাহিনী সরল ও সরস অপূর্ব ভাব-সম্পদ। সে রস খাঁটি বাঙলায় পরিবেশিত হলে সাহিত্য হত।

(খ) **ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের দান (ইং ১৮০১):** ধারাবাহিক বাঙলায় গদ্য রচনার সূত্রপাত হয় কলেজ অব ফোর্ট উইলিয়ম-এ। কিন্তু শুধু বাঙলা রচনায় নয়—হিন্দী প্রভৃতি আধুনিক ভাষার রচনারও প্রথম সংগঠিত কেন্দ্র কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ। বাঙলা-বিভাগ সংগঠিত করতে বরং কয়েক মাস বিলম্ব হয়েছিল। কিন্তু খ্রীঃ ১৮০০ অব্দের ১৮ই আগস্ট কলেজের কাজ আরম্ভ হতেই হিন্দুস্থানী ও ফারসী এবং আরবী ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা হয়—গ্রীক লাতিন ইংরেজিও ছিল; এবং ইতিহাস আইন, জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষার ব্যবস্থাও ছিল। বাঙলা-বিভাগের দায়িত্ব নিতে উইলিয়ম কেরি আহূত হন খ্রীঃ ১৮০১ অব্দে। সদ্য-প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামপুর মিশনের বাইবেলের প্রথম পুস্তিকা তখন সবেমাত্র প্রকাশিত হয়েছে। উইলিয়ম কেরি ১৮০১এর মে মাসে কলেজে যোগদান করলেন। এইখানে রামরাম বসুকে তিনি নিয়ে এলেন, এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতদের লেখার কাজে নিযুক্ত করলেন। বাঙলার জন্ত প্রধান পণ্ডিত নিযুক্ত হন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, মাসিক বেতন (সেদিনের ২০০৲ টাকা। আরও সাতজন পণ্ডিত ছিলেন। একজন রামরাম বসু, বেতন পেতেন মাসিক ৪০৲ টাকা। ইংরেজ ছাত্রদের পড়াতে গিয়ে কেরি দেখলেন গদ্য বই বাঙলায় নেই। কেরির নেতৃত্বে এঁরাই বাঙলা গদ্যে পাঠ্যপুস্তক রচনায় ব্রতী হলেন। অবশ্য খ্রীঃ ১৮০৬তে ইংলণ্ডের হিল্‌স্‌বারিতে কোম্পানি এরূপ কর্মচারীদের জন্য এ ধরনের কলেজ স্থাপন করে তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। তাতে কলকাতার কলেজের গুরুত্ব কমতে থাকে। কিন্তু বাঙলা রচনার ক্ষেত্রে অন্ততঃ খ্রীঃ ১৮১৫ পর্যন্ত এই কলেজের বাঙলা বিভাগই শুধু সক্রিয় ছিল। অতএব, সে পর্বের বাঙলা সাহিত্য ফোর্ট উইলিয়ম কলেজেরই দানে পরিপালিত। কলেজ অবশ্য গুরুত্ব হারিয়ে ক্রমশঃ ম্লান হয়ে পড়ে। তবু শেষ দিকে বিদ্যাসাগর এ কলেজের বাঙলার অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। খ্রীঃ ১৮৫৪-তে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ একেবারে বিলুপ্ত হয়। কলেজের পণ্ডিতদের লেখা দিয়েই কলেজ আমাদের স্মৃতিতে আজ জীবিত আছে।

দু'টি কথা সে প্রসঙ্গেই স্মরণীয়:—পণ্ডিতেরা বই লিখছিলেন ইংলণ্ডে শিক্ষাপ্রাপ্ত সাহেব কর্মচারীদের দেশীয় ভাষা ও রীতিনীতির সঙ্গে পরিচিত করাবার জন্য,—সাহিত্য সৃষ্টির জন্তও নয়, দেশীয় ছাত্রদের পাঠের জন্তও নয়। দ্বিতীয়তঃ, এসব বই এই কারণে দুর্মূল্য হত; দেশীয় সাধারণ লোক তা কিনতও

না. পড়তও না। কিন্তু তা বলে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রভৃতির কাজ অজ্ঞাত ছিল না। এসব গদ্য নমুনা পরবর্তী পাঠ্য পুস্তকে বারবার সংকলিত হয়েছে।

ফোর্ট উইলিয়মের পর্বে খ্রীঃ ১৮০১ থেকে খ্রীঃ ১৮১৫ এই সময়ের মধ্যে ৮ জন লেখক ১৩ খানি বাঙলা গদ্য পুস্তক লিখেছিলেন। তার মধ্যে বিশেষ আলোচ্য :

কেরি রচিত	১। 'কথোপকথন' (খ্রীঃ ১৮০১)
	২। 'ইতিহাসমালা' (১৮১২)
রামরাম বসু রচিত	৩। রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র (১৮০১)
	৪। লিপিমালা (১৮০২)
গোলকনাথ শর্মা রচিত	৫। হিতোপদেশ (১৮০২)
মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার রচিত	৬। বত্রিশ সিংহাসন (১৮০২)
	৭। হিতোপদেশ (১৮০৮)
	৮। রাজাবলি (১৮০৮)
	৯। প্রবোধচন্দ্রিকা (১৮৩৩)
তারিণীচরণ মিত্র রচিত	১০। ওরিয়েণ্টাল ফেবুলিস্ট (১৮০৩)
রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় রচিত	১১। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং(১৮০৫)
চণ্ডীচরণ মুন্‌শী রচিত	১২। তোতা ইতিহাস (১৮০৫)
হরপ্রসাদ রায় রচিত	১৩। পুরুষ পরীক্ষা (১৮১৫)

(উইলিয়ম কেরি ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ বিষয়ে সজনীকান্ত দাসের প্রবন্ধ সংকলন 'বাঙলা গদ্যের প্রথম যুগ'-এ বহু তথ্য উল্লেখিত ও আলোচিত হয়েছে। তা কৌতূহলী পাঠকের অবশ্য দ্রষ্টব্য।)

উইলিয়ম কেরি (১৭৬১-১৮৩৪)

কেরির কাজের তুলনা নেই। সে কাজের জন্য বাঙালী কেন, ভারতবাসী মাত্রই কৃতজ্ঞ। কিন্তু তাঁর নিজস্ব রচনার থেকে অনেক বেশি মহত্তর তাঁর আয়োজন। কারণ কেরির নামে বাঙলা পাঠ্যপুস্তক মাত্র দু'খানা প্রকাশিত হয়—'কথোপকথন' ও 'ইতিহাসমালা'। তাতেও কতটা কেরির নিজের রচনা আছে, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না। অবশ্য বাইবেলের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া কেরির যা রচনা তা ঠিক বাঙলা গদ্যের অন্তর্গত নয়,—যেমন ইংরেজিতে লেখা 'বাঙলা ব্যাকরণ' (খ্রীঃ ১৮০১) ও

কেরির অসামান্য কীর্তি বাঙলা-ইংরেজি অভিধান (খ্রীঃ ১৮১৫-১৮২৫)। শুধু বাঙলা নয়, সংস্কৃত, মারাঠী, পাঞ্জাবী, কানাড়ী প্রভৃতি ভাষারও ব্যাকরণ, অভিধান প্রভৃতি কেরিরই নেতৃত্বে পণ্ডিতেরা রচনা করেন। শ্রীরামপুর মিশন থেকে 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ '১৮০১), 'কাশীদাসী মহাভারত' (১৮০২), বিষ্ণুশর্মার হিতোপদেশ ও বাল্মীকির রামায়ণও প্রকাশিত হয়। কেরি শুধু মিশনের অধিনেতা নন, এসব কর্মেরও সম্পাদক। কেরির ইংরেজি রচনা, বিশেষ করে কৃষি ও উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁর গবেষণাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। সাধারণ-ভাবে দেশে প্রকৃতি-বিজ্ঞানের বিষয়ে অনুসন্ধিৎসা জাগাবার চেষ্টা কেরির লেখায় ও তাঁর উদ্যোগে অনুষ্ঠানে আরম্ভ হয়—অবশ্য 'এসিয়াটিক সোসাইটি সে বিষয়ে আগেই অগ্রণী হয়েছিল। আসলে কেরির বুদ্ধি ছিল বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি, এদেশে যার প্রয়োজন ছিল সমধিক।

উইলিয়ম কেরির জন্ম ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে ; তাঁর পিতা এড্‌মণ্ড কেরি ছিলেন তন্তুবায়। কিন্তু তন্তুবায় হলেও বিলাতে লেখাপড়া শেখা যায়, তিনিও লেখাপড়া শেখেন। পরে তাই তিনি স্থানীয় অবৈতনিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা ও গির্জার প্যারিসের কেরানির বা মুহুরির কাজ পান। তাতে পুত্রের জ্ঞান-স্পৃহাও জাগ্রত হয়ে থাকবে, পিতৃ-সংস্পর্শেই উইলিয়ম কেরি প্রাকৃত বিদ্যার দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তিনি উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন কলম্বসের জীবনী পাঠে। তবু দরিদ্র পরিবারের ইংরেজ বালকের মত ১২ বৎসর বয়সে তাঁকে জীবিকার্জনের পথ দেখতে হয়। প্রথম যান কৃষিকর্মে,—তাঁর পূর্বাপর আকর্ষণ কৃষিবিজ্ঞানে। পরে তিনি শিক্ষানবীশ হলেন জুতোশেলাইয়ের কাজে। তবু গ্রামের এক তন্তুবায়-পণ্ডিতের কাছ থেকে লাতিন ও গ্রীক শিখতেও তাঁর বাধা হয়নি। ধর্ম বিষয়ে তখন আকর্ষণ জাগলেও সংসর্গদোষে তাঁর চরিত্র বরং এ সময়ে কলুষিত হয়। ক্রমে ধর্মযাজকদের সঙ্গ লাভ করে তা তিনি কাটিয়ে ওঠেন। কেরি বিবাহ করেছিলেন, পুত্র হল, অভাবও আছে-; জুতোশেলাইয়ের সঙ্গে কেরি তবু গ্রীক-লাতিনের মতই শিখে ফেললেন ফরাসি, ইতালিয়ান, ডাচ প্রভৃতি ভাষা। বুঝতে পারি কেরির ভাষা শিক্ষার স্বাভাবিক ক্ষমতা ছিল। তাঁর পরিশ্রম ও নিষ্ঠারও তুলনা নেই। এর পরে তিনি ১৭৮৯তে যথানিয়মে পাদ্রি হলেন। তারপর ভারতে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারে উৎসাহী জন টমাস প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। ধর্মের উৎসাহের সঙ্গে ঐ চরিত্রগুণ নিয়ে পুত্র-কলত্র প্রভৃতি

সহ কেরি খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যেই কলকাতায় এলেন (খ্রীঃ ১৭৯৩)। তখন তাঁর বয়স ৩২ বৎসর। জীবনের বাকি ৪১ বৎসর এদেশেই তাঁর কর্মময় জীবন উৎসর্গ করে কেরি শ্রীরামপুরে দেহত্যাগ করেন খ্রীঃ ১৮৩৪ অব্দে। তবু কেরির প্রথম ৭ বৎসরের প্রচার ও মিশনের চেষ্টা মসৃণ হয়নি। রামরাম বসুকে মুন্সি হিসাবে পেয়ে তিনি বাঙলা, হিন্দুস্থানী, ফারসী, সংস্কৃত শিক্ষা করেছিলেন। কিন্তু রামরাম বসুর চরিত্রহীনতার জন্য খ্রীঃ ১৭৯৬তে তাঁকে বিদায় দিতেও হয়। অন্য দিকে কোম্পানি দুটি জিনিসকে প্রজাদের আপত্তির ভয়ে ও নিজেদের কুশাসনের জন্য প্রশ্রয় দিতে তখন অসম্মত ছিলেন—একটি শিক্ষা, অন্যটি মিশনারিদের ধর্মপ্রচার। তাই প্রথম দিকে সপরিবারে কেরি কলকাতা, ব্যাণ্ডেল, নদীয়া, সুন্দরবন অঞ্চলে ভেসে বেড়ান। পরে (১৭৯৪) মালদহে মদনাবাটির নীলকুঠীর তত্ত্বাবধায়ক হয়ে একটু মাথা গুঁজবার স্থান লাভ করলেন। অভাবে, হতাশায় কেরির স্ত্রী প্রায় উন্মাদ হয়ে যান, একটি পুত্র কালগ্রাসে পতিত হল, তবু কেরির ভাষা-শিক্ষা ও আত্মপ্রস্তুতির সংকল্প টল্‌ল না—বাইবেল দেশীয় ভাষায় প্রকাশ করতে হবে; ব্যাকরণ, শব্দকোষ স্থির করে সেই চল্‌তি ভাষাকে আয়ত্ত করে সংহত করে না তুললে নয়। সঙ্গে সঙ্গে দেশের গাছপালা জীবজন্তু, মানুষের রীতি-নীতি সব তিনি লক্ষ্য করছেন। এই প্রস্তুতিই সার্থক হল যখন শ্রীরামপুর মিশনের উদ্যোগ কার্যকর হল (১০।১।১৮০০ ইং)। শ্রীরামপুর তখনও ডেনমার্কের অধীন। সেখান থেকে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করতে বাধা নেই। ব্যাপটিস্ট মিশন সেখানে তাই কেন্দ্র স্থাপনের সুযোগ পেল। ১৭৯৮তে বাঙলা মুদ্রণের জন্য মুদ্রাযন্ত্রও পাওয়া গেল। মার্শম্যান, ওয়ার্ড প্রভৃতি ততদিনে এসে পৌচেছেন (১৭৯৯, অক্টোবর)। কেরি এসে তাঁদের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন (১৮০০, জানুয়ারি)।

এর পরে অবশ্য কেরির সহায়-সংস্থানের অভাব হয়নি। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কাজে তিনি প্রথমে ৫০০৲ টাকা মাসিক বেতন পেতেন। কিন্তু শোক-দুঃখ ও দুর্বিপাক বারবার কেরির ভাগ্যে জুটেছে—সাময়িকভাবে অভাবও (১৮৩১) এসেছে। তাছাড়া দুবার স্ত্রী-বিয়োগ ঘটেছে; ফেলিক্স কেরির মত উপযুক্ত পুত্রকেও (১৮২২এ) হারিয়েছেন; বহু পরিশ্রমের 'ইউনিভার্স'াল ডিক্‌শনারি' বা ভারতীয় ১৩টি প্রধান ভাষার সর্বশব্দকোষ আগুনে পুড়ে গেল (১৮১২), আর তা পুনরায় সংকলন করতে পারেননি—

চোখের জল ফেলেছেন। খ্রীষ্টধর্ম প্রচার, বাঙলা গদ্যের পথ নির্মাণ, 'দিগ্‌দর্শন', 'সমাচার দর্পণ' ও 'ফ্রেণ্ডস অব ইণ্ডিয়া' প্রকাশে মার্শম্যানের সহযোগিতা, ভারতীয় বহু ভাষার গদ্যের ভিত্তিস্থাপন, এসব ছাড়াও খ্রীঃ ১৮১৫র পরে কেরির কাজের অভাব ছিল না। স্কুল বুক সোসাইটি প্রভৃতি প্রায় প্রত্যেকটি সমিতির সঙ্গেই তিনি সংযুক্ত ছিলেন। তা ছাড়াও স্মরণীয় ইং ১৮১৫ থেকে ১৮২৫র মধ্যে বাঙলা-ইংরেজি অভিধান প্রকাশ (মোট প্রায় ৮৫ হাজার শব্দ সম্বলিত), ১৮২১এ On the Agriculture in India নামক প্রসিদ্ধ বক্তৃতা রচনা, ও ১৮২৫এ ভারতবর্ষে 'এগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটি' স্থাপন।

এ বিষয়ে সন্দেহ নেই—কেরি খ্রীষ্টধর্মের প্রচারে তন্‌মন্‌ধন দিতে এসে ছিলেন। ধর্মের গোঁড়ামিও তাঁর কম ছিল না; এটি তাঁর মধ্যযুগ-সুলভ দৃষ্টিরই চিহ্ন। কিন্তু মনে হয় কাণ্ডজ্ঞান ও বাস্তব বুদ্ধিও তাঁর তেমনি যথেষ্ট ছিল। প্রথম থেকেই তিনি এদেশের প্রকৃতি ও মানুষের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য বদ্ধপরিকর হন, আর ক্রমেই দেখি তিনি সংস্কৃত ভাষার রূপ উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়েছেন; দেশের শিক্ষিত ও সাধারণ মানুষের সম্বন্ধেও শ্রদ্ধা পোষণ করেছেন। প্রথম থেকেই তিনি বাংলা ভাষা ও বাঙালীর জীবন-যাত্রার জ্ঞান প্রত্যেক ইউরোপীয়ের পক্ষে অপরিহার্য বলে অনুভব করেছেন। বাঙলা ভাষা সংস্কৃতের সাহায্যপ্রার্থী হবে, না, ফারসী ও হিন্দুস্থানীর উৎপীড়ন থেকে মুক্ত হবে, এবং আপনার ক্ষমতায় আপনি দণ্ডায়মান হতে সমর্থ হবে,—বাংলা গদ্যের সমস্ত আদর্শের অভাবেও—এই উপলব্ধি ক্রমেই তাঁর মনে দৃঢ় হয়। কেরির অক্লান্ত পরিশ্রম, অধ্যবসায়, ঐকান্তিক নিষ্ঠার লক্ষ্য যদিও ধর্মপ্রচার, কিন্তু তার ভিত্তি এই বৈজ্ঞানিক চেতনা, বাস্তববুদ্ধি, মানুষ ও পৃথিবীকে জানবার ও চেনবার আগ্রহ। এ জন্যই খ্রীষ্টান গোঁড়ামি সত্ত্বেও বৃদ্ধ কেরি বলেন (১৮২৫), "My heart is wedded to India, and though I am of little use, I feel a pleasure in doing the little I can."

(১) **'কথোপকথন'** : ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে কেরির 'কথোপকথন' প্রথম প্রকাশিত হয়। মাত্র দেড় মাস আগে প্রকাশিত হয়েছিল প্রথম বাঙালীর লেখা বাঙলা গদ্যের বই—রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র'। 'কথোপকথন' ইংরেজিতে 'Dialogues' বা 'Colloquies' বলেও প্রসিদ্ধ।

আমরা কেরির দেওয়া বাঙলা নামই গ্রহণ করছি। বইখানিতে বাঙলা ভাষায় কথাবার্তার মধ্য দিয়ে ইংরেজ কর্মচারীদের বাঙলা ভাষা ও বাঙালী সমাজের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য মোট ৩১টি অধ্যায় দেওয়া হয়েছে। কেরি কতটা তা নিজে লিখেছেন তা বলা শক্ত ; কিন্তু এ বই-এর বিষয় নির্বাচনে কেরির বাস্তব বুদ্ধির ও যুক্তিবাদী মনের স্বাক্ষর অভ্রান্ত। আইডিয়ার আকাশ অপেক্ষা মাটির পৃথিবীর সঙ্গেই মানুষের পরিচয় প্রথম হওয়া চাই। 'জমিদার-রাইয়ত -এর সম্পর্কের যত কথা. জায়গা-জমি, চাষ বাস, ক্ষেতখামার থেকে আরম্ভ ক'রে খাতক-মহাজন, যাজক-যজমান, ভদ্র-লোক.—গ্রাম্য জীবনের দৈনন্দিন যত বিষয়,—চাকর ভাড়া করা, সাহেব ও মুন্সির কথা. তিয়ারিয়া, ভিক্ষুক, মুটে-মজুর, হাটের বিষয় প্রভৃতি থেকে বিবাহ, ঘটকালী. বিবাহ-রাত্রির খাওয়া-দাওয়া, রোশনাইয়ের কথাবার্তা প্রভৃতি কিছুই এই কথোপকথন থেকে বাদ যায়নি। কিন্তু সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য স্ত্রীলোকের কথোপকথন, বিভিন্ন শ্রেণীর স্ত্রীলোকের কথাবার্তা। যে কোন ভাষায় এরূপ নিদর্শন পেলে সে ভাষার ও সে সমাজের আসল আটপৌরে রূপটি আর অগোচর থাকে না। পাত্র ও বিষয় ভেদে এই কথোপকথনের ভাষা যে গম্ভীর বা লঘু হবে, মার্জিত বা স্থূল হবে, এমন কি বাঙলা দেশে তা ফারসী ঘেঁসা, বা সংস্কৃত-মিশানো হয়ে থাকে. কেরি নিজেই তা উল্লেখ করেছেন। কথোপকথনের' পরের সংস্করণে সংস্কৃত মার্জনা কেরি বাড়িয়ে দেন. কিন্তু ভাষার 'শুচিবাই' তাঁকে পেয়ে বসেনি। তাই 'কন্দল ও 'মাইয়া কন্দলের' নিদর্শন দিতে তাঁর আপত্তি হয়নি। ডঃ সুশীলকুমার দে (*Bengali Literature*, পৃঃ ১৪৬) সত্যই বলেছেন—এদিক থেকে কেরি প্যারীচাঁদ, দীনবন্ধু প্রভৃতি খাঁটি বাঙলার স্রষ্টাদের পথ-প্রদর্শক। তাঁর 'গম্ভীর চালের' ও 'হালকা চালের', ভাষার নমুনায়ও বাঙলা গদ্যের এই যুগের প্রধান অন্তর্বিরোধের প্রথম আভাস পাওয়া যায়—পণ্ডিতী ভাষা'. না, 'আলাপী ভাষা' গদ্যে কোন্ ভাষা গ্রাহ্য হবে। কেরি নিজে ক্রমশঃই অনাবশ্যক সংস্কৃত পদ গ্রহণ করছিলেন। অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করা অপেক্ষা 'কথোপকথন' একবার দেখে নেওয়াই পাঠকের প্রয়োজন ('দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা'য় তা পুনর্মুদ্রিত হওয়ায় এখন তা সুসাধ্য)। তবে আধুনিক দাঁড়ি-কমা-সেমিকোলনের অভাবে একটু অসুবিধা বোধ করতে হবে. কিন্তু পরবর্তী অনেক বিচার-বিতর্কের গ্রন্থের

তুলনায় 'কথোপকথন' অনেক সময়েই সুপাঠ্য—ভাষা কিছুটা সাবলীল। দু'একটি ক্ষুদ্র অংশ দৃষ্টান্তস্বরূপ নেওয়া যাক—'ভদ্রলোকে ভদ্রলোকে' কথা হচ্ছে যারা 'আঙুল ফুলে কলাগাছ' হচ্ছেন তাঁদের সম্বন্ধে :

তাঁহার ('বড় ভট্টাচার্যের') ভ্রাতুষ্পুত্ররা কেমন আছেন।

তাঁহারা মহারাজ চক্রবর্তী তাঁহাদের সহিত কার কথা তাঁহার প্রতিযোগিতার লোক আমার দেশে নাই।

এবারে কোম্পানীর কায পাইয়া মহা-ধনাঢ্য হইয়াছে তাঁহারদের সমান ধনীলোক আমার দেশে চাকরী করিয়া হইতে পারেন নাই।

কেবল ধনী নহে বিষয়ও অনেক করিয়াছে আজি নাগাদ কমবেস লাকোটাকার জমিদারী করিয়াছে।

সমস্তই ভাগ্যের বশীভূত দেখ দিকি তাহারা কি ছিলেন এখন বা কি হইয়াছেন। এ আঙ্গুল ফুলিয়া কলাগাছ হইয়াছে।

বিষয়টির সামাজিক তাৎপর্যের কথা ছেড়ে দিই। দেখতে পাই ক্রিয়াপদে ও সর্বনাম প্রভৃতিতে চল্‌তি রূপের সঙ্গে সাধুরূপ মিশে গিয়েছে। এ দোষ ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষ পর্যন্ত প্রসিদ্ধ বাঙালী লেখকদেরও ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও তা সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে পারেননি। তার কারণ কতকটা হয়ত তখনো বানান-গত (orthographic) বিপদ ছিল, কতকটা হয়ত চলিতের 'মাত্রা' অনির্ধারিত ছিল।

'কথোপকথনে'র মজুরের কথাবার্তা একটু দেখলেই বুঝ্‌ব প্রভেদ কত :

কলনা কায়েতের বাড়ী মুই কায করিতে গিয়াছিনু। তার বাড়ী অনেক কায আছে। তুই যাবি।

না ভাই। মুই সে বাড়ীতে কায করিতে যাব না তারা বড় ঠেঁটা। মুই আর বছর তার বাড়ী কাজ করিয়াছিলাম মোর দুদিনের কড়ি হারামজাদগি করিয়া দিলে না মুই সে বাড়ীতে আর যাব না।......ইত্যাদি।

'মুই' 'ছিনু' প্রভৃতি এখন আর সাহিত্যের চলতি ভাষায় গ্রাহ্য নয়, গ্রাম্য বাঙলা। কিন্তু তখনো এই 'মাত্রা' কিছুমাত্র স্থির ছিল না।

আরও সচল ভাষায় লেখা 'স্ত্রিলোকের হাট করা'—সেদিনের সুতো-কাটুনীদের কথা :

আরটে সকাল বয়ে চল সুতা না বিকেলে তো নুন তেল বেসাতি পাতি হবে না।

গুটে বুন সেদিন কলাঘাটার হাটে গিয়াছিলাম তাহাতে দেখিয়াছি সূতার কপালে আগুণ লাগিয়াছে। পোড়া কপালে তাঁতি বলে কি আটপণ করে সূতাখান। সে সকল সূতা আমি এক কাহন পেচটিটে।......

অপেক্ষাকৃত ভদ্রঘরের কথাবার্তাও এমনি সাবলীল। কথোপকথন' রচনায় পণ্ডিতদের কারও কারও হাত ছিল এ কথা প্রায় স্বীকৃত। বাইবেলে কেরির নিজের লেখা যা পাই, তা থেকেও এ কথা যথার্থ মনে হয়। সে হাত কতটা আর সে হাত কার, তা বলা এখন দুঃসাধ্য। ১৮০১এ প্রকাশিত বই। রামরাম বসুই তৎপূর্ব পর্যন্ত কেরির প্রধান সহায়। কিন্তু তিনি তখন 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' রচনায় ব্যস্ত। কলেজের প্রধান পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারকে তাই 'কথোপকথনে'র জন্য দায়ী করলে তা অযৌক্তিক হয় না (সঃ কাঃ দাস—বাঃ গঃ প্রঃ যুঃ, পৃঃ ১১৮)। অন্যান্য ক্ষেত্রে মৃত্যুঞ্জয় নানাবিধ ভাষারীতিতে যে দখল দেখিয়েছেন, তাতে এরূপ কাজ তাঁর পক্ষে সহজ-সাধ্য।

কেরির কৃতিত্ব তবে কি? প্রথমতঃ, বই কেরির নামে, অতএব কেরিই লেখক, মৃত্যুঞ্জয় অনুমান মাত্র। দ্বিতীয়তঃ, বিষয়-নির্বাচন নিঃসংশয়ে কেরির। তৃতীয়তঃ, কেরি বহুভাষাবিদ্ হলেও মূলতঃ সাহিত্যশিল্পী ন'ন, মূলতঃ তিনি বৈজ্ঞানিক—গদ্যের প্রাথমিক প্রয়োজন হচ্ছে যোগাযোগের, আলোচনার এবং যুক্তি-চিন্তার বাহন হয়ে মানুষের জ্ঞান-জীবনকে মুক্ত করা। কেরি বাঙালীর সেই সামাজিক বাহনকে নির্মাণ করতে চেয়েছেন।

(২) **'ইতিহাসমালা'** : খ্রীঃ ১৮১২ সালে 'ইতিহাসমালা' প্রথম প্রকাশিত হয়। 'ইতিহাস' বলতে তখনো 'হিস্টরি' বোঝাত না, কেরি বোঝাতে চেয়েছেন 'স্টোরি', গল্প বা কাহিনী—যেমন বত্রিশ সিংহাসনে আছে। ইতিহাস-মালা'র গল্পগুলি অনুবাদমাত্র। এ বইও কেরির রচনা নয়, তাঁর সংকলন—বইয়ের ইংরেজি নামপত্রে এসব কথা পরিষ্কার (ইতিহাসমালা or A Collection of Stories in the Bengalee Language. Collected from Various Sources. By W. Carey, D. D. ইত্যাদি)। 'ইতিহাস-মালা' হচ্ছে তাই বাঙলা সাহিত্যের প্রথম গল্প-সংকলন—তবে সে সব গল্প মৌলিক সৃষ্টি নয়। ১৫০টি শিরোনামায় এ গ্রন্থে নানা স্থানের ১৪৮টি গল্প সমাহৃত হয়েছে। পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ, বেতাল পঞ্চবিংশতি প্রভৃতি সংস্কৃতের কথা-স্রোতস্বতী তো আছেই—তবে বাঙলা দেশের গল্পই বেশী।

ফারসী-হিন্দুস্থানী থেকেও কিছু সংগৃহীত হয়ে থাকবে। অন্ততঃ তিনটি গল্পে ঐতিহাসিক চরিত্রেরও দর্শন পাওয়া যায়—প্রতাপাদিত্য (হয়ত ভারতচন্দ্রের কাল থেকেই প্রতাপাদিত্য বাঙলা সাহিত্যে স্থান করে নিচ্ছিলেন), রূপ ও সনাতন, আকবর ও বীরবল।

গল্পগুলি ফোর্ট উইলিয়মের পণ্ডিতেরা লিখেছেন, তাতে সন্দেহ নেই। কে কোন্‌টি লিখেছেন, তা বলা অসম্ভব। অনুমান করা চলে, তাতে লাভ নেই। সমগ্রভাবে দেখে বলতে হয় খ্রীঃ ১৮০১ থেকে খ্রীঃ ১৮১২ এই ১১ বৎসরে বাঙলা লেখকরা গদ্য লেখায় অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন; কেরির বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে বাঙলা গদ্যের 'সিনট্যাক্‌স্‌ বা অন্বয়রীতি ধরা পড়েছে, এবং কেরি স্বয়ং ফারসী-হিন্দুস্থানী থেকে ছাড়িয়ে বাঙলাকে সংস্কৃতের তিলক-চন্দনে সাজাতে বেশী সচেষ্ট হয়েছেন। সবসুদ্ধ ১১ বৎসরে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের গদ্য-সৃষ্টি যে কতটা অগ্রসর হতে পেরেছিল 'ইতিহাসমালা তার একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। ভাষা মোটের উপর সচল। দু'একটি গল্পে সংস্কৃত প্রভাব প্রচুর। 'কথোপকথনে'র মত 'সবেগ সাবলীলতা' নেই, তা ঠিক। সেই দাঁড়ি-কমার অভাবে ঠেকতে হয়, না হলে এই পরিচিত ছোট্ট (১৩৪ সংখ্যক) 'ইতিহাস'টি মন্দ কি ?

সাধুস্বভাব এক ব্যাক্তি পথে যাইতেছিলেন তথায় এক সরোবরে কথগুলি লোক বড়িশীতে মাংসাদি অর্পণ করিয়া মৎস্য ধরিতেছে মৎস্যসকল আহারার্থ আসিয়া আপন আপন প্রাণ দিতেছে ঐ সাধু এইরূপ দেখিয়া নিকটস্থ এক রাজসভাতে গিয়া কহিলেন অদ্য পুষ্করিণীর তটে আশ্চর্য দেখিলাম সভাস্থিত ব্যক্তিরা কহিল কি তিনি কহিলেন দাতা ব্যক্তি নরকে যাইতেছে এবং গ্রহীতাও প্রাণ ত্যাগ করিতেছে তখন কোন সভ্য ব্যক্তি কহিল এমত হয় না কেননা দান করিলে উত্তম গতি হয় এবং গ্রহণ করিলে নিরপরাধে প্রাণ নাশ হয় না এই কথা শুনিয়া সাধু কহিলেন যে আহারের আশা দিয়া নিকটে বড়িশ মাংসাদি দান করিলে বিশ্বাসঘাতকতার পাপ ভোগ করিতে হয় অতএব এমন দাতার অবশ্য নরকপ্রাপ্তি হইতে পারে এবং ঐ মাংস-আহারলোভী যে মৎস্যাদি তাহারও অবশ্য প্রাণ নাশ হইতে পারে এই কথা শুনিয়া সকলে জানিলেন যে দাতারও নরকপ্রাপ্তি সম্ভব বটে এবং গ্রহীতারও এ মৃত্যু সত্য বটে।

একটু দাঁড়ি-কমার সাহায্য পেলেই লেখাটি সুপাঠ্য হয়ে ওঠে।

বাইবেলের অনুবাদ, ইংরেজিতে বাঙলা ব্যাকরণ (১৮০১), ও বাঙলা-ইংরেজি অভিধান (১৮১৫-'২৫) প্রভৃতি এখানে আলোচ্য না হলেও কেরির অবিস্মরণীয় কীর্তি।

কেরি-চরিত্র : উইলিয়ম কেরি অসামান্য পুরুষ ছিলেন এমন বলা যায় না, কিন্তু অসামান্য তাঁর কর্মজীবন। তার কারণ আজ আমরা বুঝতে পারি। একটা অসামান্য শক্তির মুখপাত্র হয়ে উঠেছে তখন কেরির জাতি। সেই শক্তি 'আধুনিক যুগ-ধর্ম'। তার বিপুল প্রভায় কেরির মত একাধিক ইংরেজ চরিত্র আলোকিত ও অসামান্য হয়ে ওঠে। কেরির চরিত্র বর্ণনায় তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রও বলেছেন—কেরির মনে বা জীবনযাত্রায় অসামান্যতার কোন চিহ্ন ছিল না। কেরি স্বয়ং আরও স্পষ্ট করেই এই মর্মের কথা এই ভ্রাতুষ্পুত্রকে লিখেছিলেন—"আমার অবর্তমানে আমাকে যদি কেউ বিচার করতে চায় তাহলে একটা তার মাপকাঠি তোমাকে বলে দিয়ে যাই। যদি সে বলে আমি পরিশ্রমী, তাহলে সে আমার সম্বন্ধে ঠিক কথা বলবে। তার বেশি কিছু বললে অতিরঞ্জন হবে। আমি খাটতে পারি। কাজ স্থির করে নিয়ে আমি তাতে লেগে থাকতে জানি। এই আমার একমাত্র গুণ;" [If he gives me credit for being a plodder, he will describe me justly. Anything beyond this will be too much. I can plod. I can persevere in any definite pursuit. To this I owe everything. পূর্বোক্ত বা: গ: প্র: যুগে উদ্ধৃত, পৃ: ১৩২]

প্রতিভার একটি সংজ্ঞা নাকি পরিশ্রম করবার অশেষ শক্তি। তাহলে উইলিয়ম কেরি নিশ্চয়ই প্রতিভাবান্ পুরুষ।

রামরাম বসু (?—১৮১৩)

বঙ্গজ কায়স্থ রামরাম বসু বাঙলার প্রথম মুদ্রিত মৌলিক গদ্যগ্রন্থের লেখক। 'রাজা প্রতাপ-আদিত্য চরিত্র' ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্রদের জন্য প্রকাশিত প্রথম পাঠ্য-পুস্তক; খ্রীঃ ১৮০১-এর আগস্ট মাসে তা বেরোয়। রামরাম বসুর দ্বিতীয় গদ্য-পুস্তক 'লিপিমালা' পর বৎসর খ্রীঃ ১৮০২ সালে প্রকাশিত হয়। এছাড়া রামরাম বসু 'খ্রীষ্টস্তবের' (খ্রীঃ ১৭৮৮) ও দুটি খ্রীষ্টসঙ্গীতের (খ্রীঃ ১৮০২) লেখক। এবং 'খ্রীষ্ট বিবরণামৃত' (খ্রীঃ ১৮০৫) নামে পদ্যে-রচিত খ্রীষ্টচরিত্রও তাঁরই লিখিত হতে পারে। আর, টমাস ও কেরি প্রমুখ খ্রীষ্টধর্ম প্রচারকদের বাইবেল অনুবাদে (গদ্য) ও হিন্দুর-

পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে প্রচারে যে তিনি প্রধান সহায় ছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। তাঁর রচিত 'হরকরা' (১৮০০), 'জ্ঞানোদয়' (১৮০০), ব্যঙ্গবিদ্রূপে হিন্দুদের চঞ্চল করে তুলেছিল। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠার অনেক পূর্ব থেকেই তিনি টমাস ও কেরির মুন্‌সি হিসাবে তাঁদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসেন। কলেজেও তিনি প্রথম থেকেই পণ্ডিত নিযুক্ত হন। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে সেই পদে অধিষ্ঠিত থাকা কালে তাঁর মৃত্যু হয়, তাঁর পুত্র নরোত্তম বসু তখন তাঁর স্থলে কলেজের পণ্ডিত নিযুক্ত হন।

রাজা প্রতাপাদিত্য এই বঙ্গজ কায়স্থের মনকে স্বভাবতঃই আকৃষ্ট করেছিল। গ্রন্থের দ্বিতীয় প্যারাটিতে রামরাম বসু তা বলেছেন :

সংপ্রতি সর্বারম্ভে এ দেশে প্রতাপাদিত্য নামে এক রাজা হইয়াছিলেন তাহার বিবরণ কিঞ্চিৎ পারস্য ভাষায় গ্রন্থিত আছে সাঙ্গ পাঙ্গ রূপে সামুদাইক নাহি আমি তাহারদিগের স্বশ্রেণী একই জাতি ইহাতে তাহার আপনার পিতৃপিতামহের স্থানে শুনা আছে অতএব আমরা অধিক জ্ঞাত এবং আর ২ অনেকে মহারাজার উপাখ্যান আনুপূর্বিক জানিতে আকিঞ্চন করিবেন এ জন্য যেমত আমার শ্রুত আছে তদনুযায়ি লেখা যাইতেছে।

ভাষার নমুনা হিসাবে এ অংশটিকে গ্রহণ করলে হয়ত ঠিক হবে না। কারণ, রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রে ফারসী শব্দের আধিক্য দেখা যায় ;—এই অংশে তা নেই। সে আধিক্য দু কারণে—প্রতাপাদিত্য বাদশাহী আমলের সামন্ত, যে রাজনৈতিক ও সামাজিক স্তরে তাঁর স্থান সেখানে সে সময়ে ফারসীর একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল। দ্বিতীয়তঃ কায়স্থ রামরাম বসুও ফারসী-পড়া পাকা মুন্‌সি—সাহেবদের সাহচর্যে তিনি ইংরেজিও শিখেছিলেন, সংস্কৃতেও তাঁর অধিকার কম ছিল না, কিন্তু বোধ হয় ফারসীর থেকে তা বেশি নয়। যাই হোক, রাজা প্রতাপাদিত্যের থেকে দু'শ বৎসর পরেকার এই বঙ্গজ কায়স্থের জীবনটাও কম কৌতূহলোদ্দীপক নয়। এ কালের ঔপন্যাসিকের হাতে রামরাম বসু ছোট খাটো একখানা উপন্যাসের নায়ক হয়েও উঠতে পারেন।*

রামরাম বসু কবে কোথায় জন্মেছিলেন, তা স্থির করা যায় না। তবে কার্যারম্ভে দেখি তিনি পাদ্রি টমাসের মুন্‌সি। সেদিনের সুপ্রীম কোর্টের

* 'কেরি সাহেবের মুন্‌সি' সম্বন্ধে ধারাবাহিক উপন্যাস লিখিত হয়েছে

ফারসী দোভাষী ছিলেন উইলিয়াম চেম্বার্স। রামরাম বসু তাঁর সুপারিশে টমাসের মুন্‌সি স্থির হন খ্রীঃ ১৭৮৭ অব্দে। তার পূর্বেই রামরাম বসু কিছু ইংরেজি শিখেছেন। টমাসের সঙ্গেই তিনি মালদহতে তাঁর মুন্‌সি হয়ে যান। সেদিনের আরবী-ফারসী শিক্ষার ফলে অনেকেরই মনে মুসলমান সংস্কৃতির প্রতি আকর্ষণ জন্মাত ও হিন্দু দেবদেবীর উপর বিশ্বাস শিথিল হত, তা অনুমান করা যায়। তাই বলে যে তাঁরা ধর্ম ও সমাজ ত্যাগ করতেন, তাও নয়। টমাসের মুন্‌সির পক্ষে তাই নিজ হিন্দুধর্মের অপেক্ষা মুনিবের খ্রীষ্টধর্মের প্রতি বেশী আকর্ষণ প্রকাশ করতে দ্বিধা হয়নি। বিশেষ করে সেই মুনিব যখন টমাসের মত উন্মাদ পাদ্রি। মুন্‌সির পক্ষে মুনিবকে বাগিয়ে নেওয়াই প্রধান কাজ; সেদিনের কোনো মুন্‌সি-মুৎসুদ্দিই তা অন্যায় মনে করত না। রামরাম খ্রীষ্টের অনুরাগী, এবং খ্রীষ্ট ভজতেও প্রস্তুত হচ্ছেন এ বিশ্বাস টমাসের মনে জন্মাতে তাই টমাসের এই মুন্‌সির কোনো দ্বিধা ছিল না। এই সূত্রে পাঁচ বছর টমাসকে তিনি বেশ দোহন করেন। টমাস দেশে গেলে রামরাম আর্থিক অসুবিধায় পড়েন এবং যথারীতি হিন্দু সমাজেরই সংস্কার-নিয়ম পালন করে চলেন। কিন্তু কেরিকে নিয়ে টমাস বাঙলায় ফিরে আসতেই (১৭৯৩) রামরাম বসু আবার তাঁদের সঙ্গে জুটলেন। তিনি কেরির মুন্‌সি নিযুক্ত হলেন। কেরির সঙ্গে তিনি মালদহ মদনাবাটিতে যান। এমন উপযুক্ত লোককে মুন্‌সি রূপে পেয়ে কেরি যে বিশেষ উপকৃত হয়েছিলেন, তা পরিষ্কার। কিন্তু খ্রীঃ ১৭৯৬এ তবু রামরাম বসুকে কেরির বিদায় দিতে হয়। পাদ্রিদের আশা কোনোদিন পূর্ণ হয়নি—রামরাম বসু বাইবেল অনুবাদে যত সাহায্য করুন, 'খ্রীষ্টস্তব যত লিখুন, জাতি ত্যাগ করে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেননি। অধিকন্তু এ সময়ে টমাস শুনলেন—নিকটস্থ এক যুবতী বিধবার প্রতি তিনি আসক্ত; সে বিধবার একটি সন্তান হয়, সন্তানটিকে গোপনে হত্যাও করা হয়েছে। কথাটা একেবারে পাদ্রিদের রটনা নাও হতে পারে। সেদিনের চতুর ও চৌকোস লোকদের পক্ষে এ ধরনের আচরণ মোটেই বিরল ছিল না। কেরি মুন্‌সিকে বিদায় দিলেন। কিন্তু গুণী মানুষকে একেবারে ছাড়াও যায় না। তাই শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠিত হতেই (খ্রীঃ ১৮০০) রামরাম বসু এসে যখন আবার কেরির সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন, কেরি তখন রামরাম বসুকে আবার মিশনের প্রচারকার্যে গ্রহণ করলেন। অবশ্য এর অল্প পরেই রামরাম বসু ফোর্ট উইলিয়ম

কলেজের পণ্ডিত নিযুক্ত হন। আর সে সময় সেই কলেজের পাঠ্যগ্রন্থ ছাড়া পদ্যে খ্রীষ্টধর্ম মহিমা প্রচারে ও হিন্দুধর্মকে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপবাণ-আঘাতে রামরাম বসুর কোনো দ্বিধা হয়নি। অবশ্য পরিবার পরিজন ত্যাগ করে তিনি কখনো খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেননি, বা করতে পারেননি। আর একটি কথাও এ প্রসঙ্গে বলা যায়। সব জিনিসের মতই অনেকে অনুমান করেছেন রামরাম বসু রামমোহনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েই পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে দাঁড়ান; আর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র'ও তিনি রামমোহনকে দেখিয়ে নেন। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিষ্কার করে দেখিয়ে দিয়েছেন এ অনুমান অমূলক। খ্রীঃ ১৭৮৭ সনের কাছাকাছি সময় থেকেই রামরাম খ্রীষ্টধর্মের সপক্ষে দাঁড়ান, আর কলমও ধরেন। রামমোহন তখন বালক। তবে খ্রীঃ ১৮০১-১৮০৩ এই সময়ে কলিকাতা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সঙ্গে রামমোহনের সংশ্রব ছিল, এই দু'জন যোগ্য লোকের সে সময়ে পরিচয় ঘটে থাকতে পারে। আসল কথা, দু'জনেরই হিন্দু দেবদেবীর বিরুদ্ধে প্রথম বিরাগ জন্মায় হয়ত আরবী-ফারসী শিক্ষা ও মুসলমানী সংস্কৃতির সম্পর্কে এসে। রামমোহনের অনেক পূর্বে ১৮০২ অব্দে 'লিপিমালা' পুস্তকের ভূমিকায় রামরাম বসু পরম ব্রহ্মের উদ্দেশে নতি ও প্রার্থনার কথা বলেছেন, এ গৌরবও তাঁর। কিন্তু 'মানি সত্য নিরঞ্জন' এ কথা কয়টি 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদে'ও দেখা যায়। আসলে পরমব্রহ্মের ধারণা বহু-দেববাদী হিন্দুসমাজের শিক্ষিত মানুষদের মধ্যে পূর্বাপরই প্রচলিত ছিল—আচার-আচরণে তাতে বাধা জন্মায় নি। রামরাম বসু যখন 'খ্রীষ্টচরিতামৃত বিতরণ করেছেন, রামমোহন বরং তখন খ্রীষ্টদের 'ত্রিতত্ত্বের' বিরুদ্ধে অ্যাডামকে দীক্ষিত করছেন, তাও দেখতে পাব। রামরাম বসুকে রামমোহনের চ্যালা প্রমাণ না করলেও রামমোহনের মাহাত্ম্য কিছুমাত্র খর্ব হয় না।

(৩) **রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র** (১৮০১)—অথও একখানা গ্রন্থ, মৌলিক রচনা এবং ঐতিহাসিক জীবনীরও নিদর্শন। এতগুলি কথা যে গ্রন্থ সম্বন্ধে বলতে হয়, তা তুচ্ছ করবার মত নয়। এ বই তবু বাংলা গদ্যের ইতিহাসে একটু উদ্ভট। তার ভাষার নিদর্শন পূর্বে আমরা দেখেছি, সে সম্বন্ধে তখনি সামান্য আলোচনাও করেছি। সংস্কৃত-ফারসী-আরবী-বাংলা শব্দ—যেমন যা এসেছে রামরাম বসু পাশাপাশি তা বসিয়ে যা কাণ্ড করেছেন, তা এখন ভাবাই যায় না। আর অন্বয়ের প্রয়োজনও তাঁকে সংযত করতে পারত না।

সম্ভবতঃ তাঁর সময় ও সংযমের অভাব ছিল—আর গদ্যের কোনো আদর্শ সম্মুখে না পেয়ে একটা কিছু খাড়া করাই ছিল তাঁর কাজ। যা করেছেন সেই ভাষা সত্যই কোনো নির্দিষ্ট রীতি বা পদ্ধতির পর্যায়ে পড়ে না। 'ইহার উপমা কেবল ইহাই'—"a kind of mosaic half Persain, half Bengali." অবশ্য ব্যতিক্রম অনেক আছে, কিন্তু আদর্শের অভাবে এ ধরনের কাণ্ড এ গদ্যেরই প্রথম যুগে আরও কিছুকাল চলেছে। তাঁর পদ্য বা গান গতানুগতিক পথে চলেছে। কিন্তু গদ্যে তেমন তৈরী পথ তিনি পাননি। তাঁর গদ্য তাই তাঁর আপন চরিত্রের প্রতিলিপি হয়ে উঠেছে। তাতে চাতুর্য আছে, সৃষ্টিশক্তি নেই; সাহস আছে, শৃঙ্খলা নেই; না হলে এক এক সময় তিনি প্রায় সহজ গদ্য লিখে উঠছিলেন যেমন, যশোরের বাজারের বর্ণনা; কিন্তু তখনি বাঙলার স্বাভাবিক অন্বয়নীতি ভুলে কথার ঝোঁকে অন্য পথে চললেন।

(৪) **'লিপিমালা'** (১৮০২)—দেড় বৎসর পরে প্রকাশিত হয়। 'লিপিমালা'য় ৪০টি লিপি আছে—আর তার শেষে আছে 'অক্ষমালা নামে অধ্যায়। প্রথম ধারায় আছে 'রাজা অন্য রাজাকে' লেখা ১০ খানি চিঠি, 'রাজা চাকরকে লেখা ৫ খানি চিঠি। দ্বিতীয় ধারায় আছে পিতা পুত্রকে গুরু লঘুকে মনিব সামান্য চাকরকে,—এরূপ নানা লোকের লেখা ২৫ খানি চিঠি। আসলে কিন্তু এসব চিঠিপত্র নয়; এসবে পত্রাকারে রাজা পরীক্ষিতের কথা, দক্ষযজ্ঞের কথা, নবদ্বীপে চৈতন্যের কথা, গঙ্গাবতরণের কথা প্রভৃতি নানা কাহিনী বিবৃত হয়েছে। সে সব কাহিনী পুরাতন, কিন্তু রচনা মৌলিক। তাই এ বইতেও রামরাম বসুর পরিচয় রয়েছে, একথা মানতে হবে। আর সে পরিচয় আরও স্পষ্ট। কারণ এ গ্রন্থে রামরাম বসুর ভাষা অনেকটা সংযত হয়ে উঠেছে, ফারসীর দৌরাত্ম্য কমেছে। কেউ কেউ মনে করেন (বাঃ গঃ প্রঃ যুঃ, পৃঃ ১৪৯), তার কারণ গদ্য রণাঙ্গনে ইতিমধ্যে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের আবির্ভাব। এটিও অনুমান ও সম্ভবতঃ অত্যুক্তি। এরূপও অনুমান করা চলে—কেরির 'কথোপ-কথন' গদ্যের অন্বয় স্থির করে এনেছিল। 'লিপিমালা'তে রামরাম বসুও সময় ও আদর্শ লাভ করে গদ্যের পথে সহজেই এখন চলতে পেরেছেন। সূচনাতেই তিনি 'পরব্রহ্মের উদ্দেশ্যে' নত হয়ে নিবেদন জানিয়েছেন,

> এই স্থানে (এ হিন্দুস্থানে) এখন এ স্থলের অধিপতি ইংলণ্ডীয় মহাশয়েরা তাহারা এ দেশীয় চলন ভাষা অবগত নহিলে রাজক্রিয়াক্ষম হইতে পারেন না ইহাতে তাহারদিগের আকিঞ্চন এখানকার চলন ভাষা ও লেখাপড়ার ধারা অভ্যাস করিয়া সর্ববিধ কার্যক্ষমতাপন্ন হয়েন।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের উদ্দেশ্য ছাড়াও এ কথায় কি 'কথোপকথনে'রও মূল কারণ নির্দেশ করা হয়নি? 'চলন ভাষা' লেখাই যখন উদ্দেশ্য তখন ফারসীর প্রভাবও কিঞ্চিৎ থাকবার কথা। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই—'লিপিমালা'য় তা প্রায় নেই; সংস্কৃতের প্রভাবই বরং অধিক, তার উৎকটতাও আছে। যেমন—

এ সামান্য বিষয় প্রযুক্ত এখানকার কোপের বাহুল্য হয় না শৃগালের গর্জনে কেশরী নাহি রোষে যদিত্তু হইল তবে তোমার কি গতিক হইবেক কোথায় যাইবা তোমার সহায় বা কে এবং রক্ষা বা কে করিবে। ইত্যাদি ('রাজা অন্য রাজাকে')।

কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'লিপিমালা'র সংস্কৃত-মিশ্রিত ভাষাও এরূপ বেসামাল নয়। যেমন, 'রাজা চাকরকে' লিপিতে সতীর কাহিনী বর্ণনা। কিন্তু 'চলন ভাষার' যথার্থ নমুনা সামান্য চাকরকে লিখিত মনিবের পত্রেই দেখতে পাই।

······অতএব তুমি পত্রপাঠ ভবানীপুর গ্রামে যাইয়া পাঁচ সাত দিবস সেই গ্রামে থাকিয়া তিন ভরা কাষ্ঠ বিক্রয় করিয়া টাকা শীঘ্র পাঠাইবা। এখানে ব্যয় পুসনের বড়ই অপ্রতুল হইয়াছে এবং আর কএকখান নৌকায় চালান দিতে হইবেক আমি এখান হইতেই কানাই মাঝিকে শীঘ্র বিদায় করিব তুমি তাহার অপেক্ষা করিবা না······ইত্যাদি।

এ বাঙলা যিনি লিখতে পারেন তিনি বাঙলা গদ্যের প্রকৃতি কিছুটা অনুভব করতে পেরেছেন। কিন্তু তাঁর নিজ প্রবৃত্তিই হয়ত রচনাকালে তার পক্ষে বারে বারে বাদ সেধেছে। না হলে গদ্য-সৃষ্টির কৃতিত্বও তাঁর প্রাপ্য হত; এখন প্রাপ্য হয়েছে শুধু প্রচেষ্টার কৃতিত্ব।

গোলকনাথ শর্মা (?—১৮০৩)

(৫) **হিতোপদেশ** (১৮০২)—গোলকনাথ শর্মা 'হিতোপদেশে'র অনুবাদক। তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত নন। সম্ভবতঃ তিনি ছিলেন কেরির সংস্কৃত শিক্ষক পণ্ডিত, খ্রীঃ ১৭৯৫ অব্দের কাছাকাছি তিনি হিতোপদেশের কিছু কিছু অংশের অনুবাদ করছিলেন। শেষ পর্যন্ত 'হিতোপদেশ প্রকাশিত হয় সম্ভবতঃ খ্রীঃ ১৮০২তে। খ্রীঃ ১৭৯৪ থেকে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত (খ্রী ১৮০৩) গোলকনাথ ও তাঁর ভ্রাতা কাশীনাথ মুখোপাধ্যায় মিশনারিদের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। সম্ভবতঃ, তাঁরা ছিলেন তখনকার মালদহের

মদনাবাটি অঞ্চলের অধিবাসী। 'হিতোপদেশে'র কয়েকটি উপভাষার চিহ্ন থেকেও এরূপ মনে হয়। স্বগৃহে গোলকনাথের মৃত্যু হলে (১৮০৩ খ্রীঃ) তাঁর স্ত্রী সহমৃতা হন, আর তাতে সহায়তা করার জন্ত কাশীনাথকেও মিশনারিরা চাকরি থেকে বিতাড়িত করেন—এটুকু তথ্যও জানা যায় (সজনী—বাঃ গঃ প্রঃ যুঃ, পৃঃ ১৫১-১৫২)। গোলকনাথের অনুবাদের ত্রুটি দেখানো যেতে পারে। ভাষায় 'বাঙাল'-বিচ্যুতিও আছে, বানান ও বাক্য-বিন্যাসও আগাগোড়া নির্দোষ নয়। তবু আসল কথাটা বলা শ্রেয়ঃ ;—বাঙলা গদ্যের বিচারে 'হিতোপদেশে'র ভাষা সত্যই সরল ; বাক্যরীতি মোটের উপর সহজবোধ্য। সংস্কৃতের অনুবাদ বলেই ভাষায় সংস্কৃত-প্রভাব প্রবল, কিন্তু তা পাণ্ডিত্য-কণ্টকিত নয়। এই ভাষায় মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের বিদ্যালঙ্কারিকতা নেই, রামরাম বসুর ফারসীর উৎকট আতিশয্যও নেই। নমুনা হিসাবে কথামুখের আরম্ভাংশ নেওয়া যাক :

> কোন নদীর তীরেতে পাটলীপুত্র নামধের এক নগর আছে সে স্থানে সর্ব স্বামী গুণোপেত সুদর্শন নামে রাজা ছিল। সেই রাজা এককালে কোন কাহার মুখে দুই শ্লোক শুনিলেন তাহার অর্থ এই শাস্ত্র সকলের লোচন অতএব যে শাস্ত্র না জানে সেই অন্ধ। আর যৌবন ধন সম্পত্তি প্রভুত্ব অবিবেক ইহার যদি এক থাকে তবেই অনর্থ সমুদয় থাকিলে না জানি কি হয়।.........
> ইত্যাদি।

পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ জাতীয় নীতিকথা সেদিনের পাঠ্যবিষয়ের তালিকায় বিশেষ গুরুত্বলাভ করেছিল। সংস্কৃত থেকে সে সব গল্পের আরও অনুবাদ হয়। গোলকনাথের 'হিতোপদেশ' (খ্রীঃ ১৮০২) ততটা প্রচারিত হয়নি। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'হিতোপদেশ'ই (খ্রীঃ ১৮০৮) রচনার গুণে ও অন্যান্ত কারণে অধিক আদর লাভ করেছে।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার (১৭৬২ ?—১৮১৯)

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ছিলেন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান পণ্ডিত (১৮০১-১৮১৬), সেদিনের পণ্ডিত-সমাজে অগ্রগণ্য। এ পর্বের (১৮০০-১৮১৫) বাঙলা গদ্যের ইতিহাসে তাঁকে শ্রেষ্ঠ আসন দিতে আপত্তি করা উচিত নয়। অবশ্য তাঁর প্রধান গ্রন্থ 'প্রবোধ চন্দ্রিকা' এ সময়ে রচিত হয়েছিল কিনা সন্দেহ। আর ১৮১৩-তে তা রচিত হয়ে থাকলেও প্রথম প্রকাশিত

হয়েছিল ১৮৩৩-এ। অন্য গ্রন্থ ও 'বেদান্ত চন্দ্রিকা' রামমোহনের 'বেদান্তগ্রন্থ' ও 'বেদান্তসারের' (খ্রীঃ ১৮১৫) প্রতিবাদে লিখিত হয় খ্রীঃ ১৮১৭ সনে। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়ের মৃত্যু ঘটে খ্রীঃ ১৮১৯ অব্দে। তাই রামমোহনের পর্বারম্ভে (ইং ১৮১৫) তিনি জীবিত থাকলেও তাঁর কৃতিত্ব তখন শেষ হয়ে এসেছে। মৃত্যুঞ্জয়কে তাই কেরির যুগের গদ্য-গুরু বলেই গণনা করা শ্রেয়ঃ। পূর্বেই দেখেছি মোট পাঁচ খানি বাঙলা গ্রন্থের তিনি রচয়িতা :

বত্রিশ সিংহাসন—খ্রীঃ ১৮০২

হিতোপদেশ—খ্রীঃ ১৮০৮

রাজাবলি—খ্রীঃ ১৮১৭

প্রবোধ চন্দ্রিকা—খ্রীঃ ১৮১৩ (?) প্রকাশকাল—খ্রীঃ ১৮৩৩

বেদান্ত চন্দ্রিকা—খ্রীঃ ১৮১৭

সেদিনের এই অসামান্য পণ্ডিতের জীবনী সম্বন্ধেও মিশনের পাদ্রিরা যতটুকু সংবাদ দিয়ে গিয়েছেন তার বেশী সংবাদ জানবার আমাদের উপায় ছিল না। অক্ষয়কুমার সরকার, ডাঃ সুশীলকুমার দে ও শেষে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নতুন তথ্য উদ্ধার করে আমাদের জ্ঞান আরও কতকাংশে প্রসারিত করেছেন।

ইং ১৭৬১-'৬৩ অব্দে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের জন্ম। পাদ্রিরা (জে. সি. মার্শম্যান—হিস্টরি অব শ্রীরামপুর মিশন-এ) বলেছেন, তিনি ওড়িস্যার অধিবাসী. তাঁর শিক্ষালাভ হয় নাটোরে, এবং পরে কলিকাতায় বাগবাজারে (রাজবল্লভ স্ট্রীটে) তিনি বাস স্থাপন করেন। ওড়িষ্যা বলতে তখন মেদিনীপুরকেও বোঝাত, হয়ত এখানেও তাই বুঝিয়েছে। তবে এও মনে হয় ওড়িষ্যার ভদ্রকে মৃত্যুঞ্জয়ের কোন এক পূর্বপুরুষ বাস করে থাকবেন. কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে মৃত্যুঞ্জয় ছিলেন রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ, "থানের চাটুতি শ্রীকরের সন্তান" (দ্রঃ ডঃ দেঃ পৃঃ ২০৩)। রামমোহন রায়ও বিচার কালে তাঁকে 'ভট্টাচার্য' বলে ইঙ্গিত করেছেন। ওড়িষ্যায় জন্মে থাকলেও মৃত্যুঞ্জয়কে তাই কুলগত ভাবে ওড়িয়া বলা কিছুতেই চলে না। তারপর, অধ্যয়ন অধ্যাপনা সবই তাঁর বাঙলায়। সম্ভবতঃ কেরি উত্তরবঙ্গে মদনাবাটি (মালদহ) থাকতেই তাঁর পাণ্ডিত্যখ্যাতি শুনেছিলেন, মৃত্যুঞ্জয়ের সঙ্গে সম্পর্কও স্থাপন করেছিলেন। অন্ততঃ কলকাতার দিকে আসার অনতিকাল পরেই যখন কেরি কলেজের

বাঙলা বিভাগের ভার নিলেন তার পূর্বেই মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে তিনি নিঃসন্দেহ হয়েছেন, হয়তো তখনি তাঁকে নিজের শিক্ষকও নিযুক্ত করেছেন। কারণ, দেখি কেরি প্রথম থেকেই তাঁকে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে ২০০, দু'শত টাকা মাহিনায় বাঙলা-বিভাগের প্রধান পণ্ডিত নিযুক্ত করেন (খ্রীঃ ১৮০১, মে মাস)। কেরির নির্দেশেই মৃত্যুঞ্জয় বাঙলা পাঠ্য-পুস্তক রচনায় হাত দেন। প্রথম লেখেন 'বত্রিশ সিংহাসন' (খ্রীঃ ১৮০২), এ গ্রন্থের জন্য দু'শত টাকা মৃত্যুঞ্জয় পারিতোষিক পেয়েছিলেন। খ্রীঃ ১৮০৫ থেকে কলেজের সিভিলিয়ানদের সংস্কৃত অধ্যাপনার ভার তাঁর উপর অর্পিত হয়—মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের পাণ্ডিত্যখ্যাতি তখন সুপ্রতিষ্ঠিত। 'হিতোপদেশ' ও 'রাজাবলি' (খ্রীঃ ১৮০৮) এবং 'প্রবোধচন্দ্রিকাও' (খ্রীঃ ১৮১৩?) এই ছাত্রদের লক্ষ্য করেই রচিত—সাহিত্য রচনার উদ্দেশ্যে বা জনসাধারণের উদ্দেশ্যে রচিত নয়। খ্রীঃ ১৮১৬ অব্দে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য সুপ্রিম কোর্টের 'জজপণ্ডিতের' পদে (৯ই জুলাইর পর) নিযুক্ত হন, এবং তাতে যোগদান করেন। এ সময়েই তিনি বেনামে রামমোহনের ব্রহ্মোপাসনা প্রভৃতি প্রচারের বিরোধিতা করে লেখেন 'বেদান্তচন্দ্রিকা' (খ্রীঃ ১৮১৭)। একমাত্র এ লেখাটিরই লক্ষ্য বাঙালী শিক্ষিত সমাজ। তখন তিনিও তাঁদের একজন নেতৃস্থানীয় পুরুষ—স্কুল বুক সোসাইটির পরিচালন-সমিতির সদস্য। হিন্দু কলেজ স্থাপনা কালেও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারকে নিয়মাবলী প্রণয়ন করতে হয়। সহমরণের বিরুদ্ধে রামমোহন রায়েরও পূর্বে প্রথম তাঁর মতামতই স্পষ্ট করে ব্যক্ত হয়। খ্রীঃ ১৮১৮এর পরে মৃত্যুঞ্জয় অসুস্থ হয়ে পড়েন, এবং খ্রীঃ ১৮১৯এর মধ্যভাগে মুর্শিদাবাদে তাঁর মৃত্যু হয়।

ফোর্ট উইলিয়ম-এর লেখকমণ্ডলীর মধ্যে যাঁরা পরবর্তী লেখকদের উপর প্রভাব বিস্তার করেছেন, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। দুর্ভাগ্যক্রমে অনেককাল পর্যন্ত এ প্রভাবের যথার্থ পরিমাপ হয়নি। মৃত্যুঞ্জয়ের বাঙলা অন্যায় ভাবেই অনেক সময়ে নিন্দিত হয়েছে। সে হাওয়া কতকটা ফেরে ডঃ সুশীল-কুমার দে'র বিচক্ষণ মূল্যায়নে। তারপর বিংশ শতকের দ্বিতীয় পাদে আবার কতকটা উল্টো হাওয়ায় মৃত্যুঞ্জয়ের কাঁধে এসে পড়ল বাঙলা গদ্যের সমস্ত নির্মাণ-কৃতিত্ব। ভাগ্যের খেলা ভিন্নও এ ব্যাপারে একালের মতবাদের খেলাও থাকতে পারে। কিন্তু আমরা মনে রাখতে পারি পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার

তখনকার পাদ্রিদের চোখে ছিলেন দেহে ও বিদ্যায় ডাক্তার জনসন—"a colossus of literature"; আর তাঁদের মতে "His knowledge of the classics was unrivalled, and his Bengali composition has never been surpassed for ease, simplicity, and vigour." (J.C. Marshman—The Life & Times of Carey, Marshman and Ward)। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার যুগপুরুষ নন, কিন্তু বাংলা গদ্যের ক্ষেত্রে তিনি সচেতন স্টাইলিস্ট। একালে প্রকাশিত মৃত্যুঞ্জয় গ্রন্থাবলী এজন্য আদরের জিনিস।

(৬) 'বত্রিশ সিংহাসন': খ্রীঃ ১৮০২ থেকে মৃত্যুঞ্জয়ের গদ্য-রীতির বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। কারণ, সত্যই এ ভাষার সঙ্গে 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রের ভাষায় আকাশ পাতাল প্রভেদ। বত্রিশ সিংহাসন ও বেতাল পঞ্চবিংশতি জাতীয় কাহিনীমালা এ দেশে সুপ্রচলিত। মৃত্যুঞ্জয় সম্ভবত এসব কাহিনী সংস্কৃত 'দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা' থেকেই অনুবাদ করে থাকবেন। ফারসীর চিহ্ন এখানে থাকা সম্ভবও নয়। মৃত্যুঞ্জয়ের চেষ্টা ছিল বরং বাঙলাকে সংস্কৃতের মার্জনায় মার্জিত করা। 'বত্রিশ সিংহাসন' অনুবাদের ভাষা 'অত্যধিক সংস্কৃতপ্রধান নয়', এ কথা সত্য; কিন্তু এ কথা মৃত্যুঞ্জয়ের পরবর্তী গ্রন্থাদির ভাষা সম্বন্ধে সত্য নয়। দীর্ঘ ও জটিল বাক্যবিন্যাসে এ বইয়ের ভাষা মাঝে-মাঝে বিভ্রান্ত করে, না হলে মোটের উপর তা সচল স্বচ্ছন্দ। ছোট অংশ থেকেও দোষ ও গুণ সহজে বোঝা যায়। ধরা যাক নিম্নের অংশটুকু:

> দক্ষিণদেশে ধারা নামে পুরী ছিল। সেই নগরের নিকট যজ্ঞদত্ত নামে এক শস্যক্ষেত্র থাকে তাহার কৃষকের নাম যজ্ঞদত্ত। সেই কৃষক শস্যক্ষেত্রের চতুর্দিগে পরিখা করিয়া·········দেবদারু প্রভৃতি নানান জাতীয় বৃক্ষ রোপণ করিয়া এক উদ্যান করিয়া আপনি সেই উদ্যানের মধ্যে থাকেন।

শস্যক্ষেত্রের বেলা 'আছে' অর্থে 'থাকে' প্রয়োগ পরেও ('হিতোপদেশ'-এ) মৃত্যুঞ্জয় ছাড়েননি। তাছাড়া,

> "তৎপর রাজা হৃষ্টচিত্ত হইয়া আপনার রাজধানীতে সিংহাসন আনয়নের ইচ্ছা করিয়া ভৃত্যবর্গদিগকে আজ্ঞা করিলেন। আজ্ঞা পাইয়া ভৃত্যবর্গেরা সিংহাসন চালন কারণ অনেক যত্ন করিল সে সিংহাসন নড়িল না।"

নির্ভুল হলেও এ বাক্য-রীতি নির্দোষ নয়। 'ভৃত্যবর্গদিগকে' প্রভৃতি নির্ভুল প্রয়োগও নয়। কিন্তু সহজভাবে দেখলে মানতেই হবে—বাঙলা

গদ্যের উপর লেখকের দখল জন্মেছে। 'বত্রিশ সিংহাসনে' চলতি ধারার ভাষায় দৃষ্টান্তও আছে, তবে সংস্কৃতানুসারী দৃষ্টান্তই বেশি।

(৭) 'হিতোপদেশ'ও অনুবাদ গ্রন্থ, ছয় বৎসর পরে প্রকাশিত। স্বভাবতঃই গোলোকনাথ শর্মার 'হিতোপদেশের' ভাষার সঙ্গে মৃত্যুঞ্জয়ের ভাষার তুলনা করা হয়। দু'এক স্থলে মনে হয়—মৃত্যুঞ্জয়ই তুলনায় হারছেন; কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই তিনি শ্রেষ্ঠ। যেমন, গোলোকনাথের পূর্বোদ্ধৃত অংশের সঙ্গে তুলনীয় মৃত্যুঞ্জয়ের এই কথামুখের অংশ:

> ভাগীরথী তীরে পাটলিপুত্র নামে নগর আছে সেখানে সকল রাজগুণে যুক্ত সুদর্শন নামে রাজা ছিলেন সেই ভূপতি এক সময়ে কাহারও কর্তৃক পাঠ্যমান শ্লোকদ্বয় শ্রবণ করিলেন তাহার অর্থ এই —অনেক সন্দেহের নাশক এবং অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের জ্ঞাপক যে শাস্ত্র সে সকলের চক্ষু ইহা যাহার নাই সে অন্ধ। আর যৌবন ও ধনসম্পত্তি ও প্রভুত্ব ও অবিবেকতা এই চতুষ্টয় প্রত্যেকেও অনর্থের নিমিত্ত হয় যেখানে এ চতুষ্টয় সেখানে কি হয় কহিতে পারি না।

সংস্কৃতের মাত্রা মৃত্যুঞ্জয় বাড়িয়েছেন, এ ব্যতীত আর বেশি কিছু এটুকু থেকে প্রমাণিত হয় না। কিন্তু বহু স্থলেই দেখব সংস্কৃতের গুণে ভাষায় গাম্ভীর্য এসেছে। মৃত্যুঞ্জয়ের 'হিতোপদেশ' বহু প্রচারিত আদর্শ হয়ে দাঁড়ায়।

(৮) 'রাজাবলি'ও সংস্কৃত রাজাবলি নামক গ্রন্থের অনুবাদ বা অনুসরণ, তা এখন স্বীকৃত (দ্রষ্টব্য: ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার—বঃ সাঃ পঃ পত্রিকা—৬৪ ভাগ)। মৃত্যুঞ্জয় নিজেও তাকে বলেছিলেন 'সংগ্রহ'। আর সম্ভবত গ্রন্থের নাম দিয়েছিলেন রাজতরঙ্গ। কেরি প্রমুখ সাহেবদের নির্দেশেই হোক্‌ বা রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রে'র বা রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের 'মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রস্য চরিত্রং' (খ্রীঃ ১৮০৫)-এর সমাদর (?) দেখেই হোক্‌, মৃত্যুঞ্জয় এরূপে ভারতবর্ষের ইতিহাস সংকলনে প্রথম হাত দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর ঐতিহাসিক চেতনা বিশেষ ছিল না; জনশ্রুতি ও কল্পনা অবাধে মিশিয়ে তিনি যা তৈরী করেছেন তা ইতিহাস নয়। ভারতবর্ষের রাজা ও রাজবংশের সংক্ষিপ্ত একটা ধারাবাহিক বিবরণ—'বর্তমান কলিযুগের আরম্ভ' থেকে একেবারে ১৮০০ 'খ্রিশবীসন' পর্যন্ত কালের কথা। আরম্ভ হয়েছে চন্দ্রবংশের ক্ষেত্রজ সন্তান রাজা বিচিত্রবীর্যের থেকে, শেষ হয়েছে কোম্পানি শাসনের সুস্থির প্রতিষ্ঠায়। ইতিহাসের বিরাট মহত্ব মৃত্যুঞ্জয়ের ধারণায় আসেনি; কিন্তু রীতি বিষয়ের অনুগামী হয়, ভাষা-বিষয়ক এ মূল সত্যের

ধারণা মৃত্যুঞ্জয়ের ছিল। তাই, পণ্ডিতী বাঙলার গুরু বলে গণ্য মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার হিন্দুযুগের বিবরণ যথারীতি সংস্কৃত-প্রধান বাঙলায় লিখে যাচ্ছেন; কিন্তু সুলতান-বাদশাহের আমলে পৌঁছে প্রয়োজন মত 'যাবনী মিশাল' বাঙলা লিখতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা করেননি। তবে সাধারণ ক্ষেত্রে সংস্কৃত-বহুল হলেও এসব বিবরণ সংস্কৃতের প্রস্তর-বন্ধনে বদ্ধ হয় নি। দীর্ঘ শ্বাসরোধী বাক্য রচনার দৃষ্টান্ত না নিয়ে যা তখনকার বাঙলা গদ্যের কৃতিত্বের নিদর্শন বা মৃত্যুঞ্জয়েরও নূতন কৃতিত্বের প্রমাণ তাই স্মরণ করা উচিত:

> এইরূপে সুবে বাঙ্গালাদিতে কম্পনি বাহাদুরের অধিকার সুস্থির হইল। মহারাজ রাজবল্লভ বাহাদুর বাঙ্গালা ১২০৪ সন পর্যন্ত বরাবর কম্পনি বাহাদুরের খেদমত গুজারি করিয়া এই কলিকাতাতে মরিলেন। তাঁহার পুত্র মহারাজ মুকুন্দবল্লভ তাঁহার মৃত্যুর পূর্বেই মরিয়াছিলেন। এইরূপে মহারাজ দুর্লভরাম নিঃসন্তান হইলেন ঐ আপন মুনীব নবাব সিরাজদ্দৌলার সঙ্গে নিমকহারামী বৃক্ষের ফল পাইলেন……ঐ মহারাজ রাজবল্লভের ভাগিনেয়েরা প্রতি পুরুষের ক্রমাগত যে কিছু ধন তাহা অধিকার করিয়া ঐ মহারাজ রাজবল্লভের পুত্রবধূ ঐ মহারাজ মুকুন্দবল্লভের স্ত্রীকে একবস্ত্রে কএক দাসী সমেত কৌশলক্রমে বাটী হইতে বাহির করিয়া দিয়া নীলবর্ণ শৃগালের ন্যায় আপনাকে মহারাজ করিয়া মানিয়া ঐ মহারাজ রাজবল্লভের ঐহিক সম্ভ্রম ও পারমার্থিক সকল কর্ম লোপ করত আছে। ঐ রাজা রাজবল্লভের পুত্রবধূ এক ব্রাহ্মণের বাটীতে দুঃখেতে কালক্ষেপণ করত আছেন।

এই ভাষা ও বিষয় দুই-ই রাজবল্লভ স্ট্রীটবাসী ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতের সাহস ও সদ্‌বুদ্ধির একটা প্রমাণ।

আর একটি নিদর্শন দিই—শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস যাতে 'বঙ্কিমী ভঙ্গীর' যথার্থ সন্ধান পেয়েছেন:

> যে সিংহাসনে কোটি-কোটি লক্ষ স্বর্ণদাতারা বসিতেন সেই সিংহাসনে মুষ্টিমাত্র ভিক্ষার্থী অনায়াসে বসিল। যে সিংহাসনে বিবিধপ্রকার রত্নালঙ্কারধারিরা বসিতেন সে সিংহাসনে ভস্মবিভূষিত সর্বাঙ্গ কুযোগী বসিল। যে সিংহাসনে অমূল্য রত্নময় কিরীটধারি রাজারা বসিতেন সেই সিংহাসনে জটাধারী বসিল।……ইত্যাদি।

বক্তব্য কথা সামান্য। কিন্তু ভাবকল্পনার সঙ্গে ভাষা-সম্পদ তাল রক্ষা করে এগিয়ে চলেছে—সংস্কৃতপ্রধান বাঙলা গদ্যের স্বাভাবিক ছন্দকৌলীন্য এখানে প্রথম দেখা গিয়েছে মনে হয়। অবশ্য সেই ছন্দোরহস্য আবিষ্কারের ও প্রতিষ্ঠার গৌরব বিদ্যাসাগরের।

(১) 'প্রবোধচন্দ্রিকা' দিয়েই মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের পরিচয়। এ গ্রন্থ প্রকাশে অনেক বিলম্ব ঘটলেও অনেকেই অনুমান করেন খ্রীঃ ১৮১৩ অব্দের কাছাকাছি তা অন্ততঃ প্রথম রচিত হয়ে থাকবে। এই বই অনেকদিন পর্যন্ত হিন্দু কলেজ, হুগলী কলেজ, এবং পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের বাঙলার পাঠ্য-পুস্তক ছিল,—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তা (খ্রীঃ ১৮৬২) প্রকাশিতও করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত প্রবোধচন্দ্রিকা বাঙালীর নিকট সুপরিচিত,—এবং বহুদিন পর্যন্ত তাদের দ্বারা নিন্দিত। অথচ 'রাজাবলি'তে মৃত্যুঞ্জয়ের যে কলা-কৌশলের উদ্ভব দেখি, 'প্রবোধচন্দ্রিকা'য় দেখি তারই সুস্পষ্ট প্রকাশ। এ গ্রন্থও সংকলন। সংস্কৃত ব্যাকরণ, অলঙ্কার, নীতিশাস্ত্র, ইতিহাস, পুরাণ প্রভৃতি থেকে পণ্ডিতপ্রবর মৃত্যুঞ্জয় নানা উপাখ্যান ও রচনা-রীতি সংগ্রহ করেছেন। লৌকিক কাহিনীও সে সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন। সবশুদ্ধ এ সংগ্রহ তাই প্রায় মৌলিক রচনা হয়ে দাঁড়িয়েছে—বিষয়বিন্যাসে কতকাংশে, এবং ভাষার বিন্যাসে সর্বাংশে। অন্ততঃ তিনটি বিশিষ্ট গদ্যরীতি এ গ্রন্থে অনুসৃত হয়েছে—কথ্যরীতি, সাধুরীতি এবং সংস্কৃতানুসারী রীতি। সাধারণতঃ এই সংস্কৃত-প্রপীড়িত ভাষাকেই প্রাধান্য দিয়ে পরবর্তীরা 'প্রবোধচন্দ্রিকা'র নিন্দা করেছেন, কিন্তু তাঁরা বিস্মৃত হয়েছেন পণ্ডিতী লক্ষণ এ ভাষার উদ্দিষ্ট ছিল :

"যেমন দুই এক পণ্ডিতাধিষ্ঠিত দেশ হইতে বহুতর পণ্ডিতাধিষ্ঠিত দেশ উত্তম ইত্যানুমানে সকল লৌকিক ভাষার মধ্যে উত্তম গৌড়ীয় ভাষাতে অভিনব যুবক সাহেবজাতের শিক্ষার্থে কোন পণ্ডিত প্রবোধচন্দ্রিকা নামে গ্রন্থ রচিতেছেন"—

এই (নাতিজটিল) সংস্কৃতানুসারী ভাষাই মৃত্যুঞ্জয়ের একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়। বরং সেই ধারাও তাঁর বৈশিষ্ট্য যাতে বিদ্যাসাগরের পরবর্তী রীতি মনে পড়ে—(ডঃ সুশীল কুমার দে—পৃঃ ২২৩) :

দণ্ডকারণ্যে প্রাচীনদীতীরে এক তপস্বী তপস্যা করেন বিবিধ কৃচ্ছ্রসাধ্য তপঃ করিয়াও তপঃ-সিদ্ধিভাগী হন না। দৈবাৎ ঐ তপোধনের তপোবনেতে এক দিবস নারদমুনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঐ তপস্বী বহুমান পুরঃসর পাদ্যার্ঘ্যাসন দান ও স্বাগত প্রশ্ন করিয়া নারদমুনিকে নিবেদন করিলেন।......ইত্যাদি।

কিন্তু, কতিৎ সাধুরীতিতে ; যেমন,

একস্থানে অনেক বক বসিয়াছিল অকস্মাৎ সেই স্থানে মানসসরোবরনিবাসী এক রাজহংস আসিয়া

উপস্থিত হইল। বকেরা ঐ হংসকে দেখিয়া অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়া লোহিত লোচন লম্ব চঞ্চু ধবল শরীর তুমি কে হে। হংস কহিল আমি রাজহংস। বকেরা কহিল ওহো তুমিই রাজহংস বটে ভাল একণে কোথা হইতে আসিলে। মানসসরোবর হইতে। ইত্যাদি—

এবং প্রধান কৃতিত্ব সেই কেরির 'কথোপকথনের' মত কথ্য-ভাষার রীতি আবিষ্কারে :

মোরা চাষ করিব ফসল পাব রাজার রাজষ দিয়া যা থাকে তাহাতেই বছরশুদ্ধ অন্ন করিয়া খাবো ছেলেপিলাগুলি পুষিব। যে বছর শুকা হাজাতে কিছু খন্দ না হয় সে বছর বড় দুঃখে দিন কাটি কেবল উড়ি ধানের মুড়ী ও মটর মসুর শাক-পাত শামুক গুগলি সিজাইয়া খাইয়া বাঁচি খড়কুটা কাটা শুক্না পাতা কর্কী চুঁৰও বিল খুঁটিয়া কুড়াইয়া জ্বালানি করি। কার্পাস তুলি তুলা করি ফুড়ী পিঁজি পাঁইজ করি চরকাতে সুতো কাটি কাপড় বুনাইয়া পরি।......শাকভাত পেট ভরিয়া যেদিন খাই সেদিন তো জন্মতিথি।......ইত্যাদি।

নিশ্চয়ই বিষয়ানুযায়ী ভাষার রীতি হালকা, গম্ভীর বা মধ্যমগতি হতে হয়, কিন্তু সর্বত্রই তার হওয়া প্রয়োজন স্বচ্ছন্দ, গতিবান্। আর, এই খাঁটি ভাষার নিদর্শন মৃত্যুঞ্জয় কিছু না কিছু জুগিয়েছেন,—তাঁর পূর্বে কেউ জোগাননি। বিশেষ করে, এসব কথ্যরীতির ক্ষেত্রেই আমরা পাচ্ছি খাঁটি বাঙলা ভাষাকে—যে ভাষার যোগ মাটির সঙ্গে ও মাটির মানুষের সঙ্গে। এ কথাটা মানতে পারি, "তাঁহার (মৃত্যুঞ্জয়ের) একার সাধনা প্রায় একযুগের সাধনা বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।"—অবশ্য যদি 'যুগ' অর্থে মনে করি এই 'কেরির পর্ব' অর্থাৎ খ্রী: ১৮০০-১৮১৫ এই পনের বৎসর কাল। যদি সে সঙ্গে ধরে নিই কেরির 'কথোপকথনে'ও মৃত্যুঞ্জয়েরই হাত ছিল, যদি মেনে নিই মৌলিক রচনা অপেক্ষা সংকলন বা অনুবাদ কম কথা নয়, এবং পাঠ্য-পুস্তক রচনা ও সাধারণের জন্ত কোনো গ্রন্থ রচনা এ দু'য়ে মূল্যগত প্রভেদ নেই। ঠিক এসব মানতে বাধা হয় যখন মৃত্যুঞ্জয়ের স্বাধীন রচনা 'বেদান্ত চন্দ্রিকা'র আলোচনা করি।

'বেদান্ত চন্দ্রিকা'য় লেখকের নাম ছিল না, কিন্তু লেখকের পরিচয় সমকালীন কারও নিকট অজ্ঞাত ছিল না—পক্ষ-প্রতিপক্ষ সকলেই জানতেন। ইং ১৮১৭ অব্দে ('রামমোহনের পর্বে') তা প্রকাশিত হয়—দু' বৎসর পূর্বে রামমোহন রায় 'বেদান্ত গ্রন্থ' ও 'বেদান্তসার' প্রকাশিত করেন ও ব্রহ্মোপাসনার জন্ত 'আত্মীয়সভা' গঠিত করেন। কলিকাতায় হিন্দু সমাজে

তাতে প্রবল আলোড়ন ওঠে। অবশ্য শহরের শিক্ষিতবর্গের বাইরে কিংবা পল্লীগ্রামে তা কোন তরঙ্গ তুলেছিল কি না সন্দেহ। তা সত্ত্বেও প্রথম কথা —রামমোহন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্রপাঠ্য-গ্রন্থ লেখেননি, আবার তিনি যথার্থ সাহিত্য রচনাও করেননি। তাঁর লক্ষ্য হল সাধারণ পাঠক, তাঁর উদ্দেশ্য তাঁদের যুক্তি ও বোধশক্তির উদ্বোধন। নিশ্চয়ই এ কারণেও তাঁর ১৮১৫-এর প্রয়াস পর্বান্তরের সূচনা করে। দেওয়ান রামমোহনের মত উদ্যোগী, অর্থবান্ ও প্রবল ব্যক্তিত্ববান্ পুরুষ বেদান্তের চর্চাকে যেন পুনরুজ্জীবিত করতে চাইলেন, আর তাতেই পণ্ডিত সমাজেও প্রতিবাদের ঢেউ উঠল। সেদিনের অগ্রগণ্য পণ্ডিত হিসাবে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারই এই প্রতিবাদের মুখপাত্র হলেন। রামমোহনের উত্তর থেকেই আমরা জানি—মৃত্যুঞ্জয়ও ইতিপূর্বেই বেদান্ত-উপনিষদাদি চর্চা করতেন। তাঁর পাণ্ডিত্যও নিতান্ত গতানুগতিক ধরনের ছিল না। তাই ইং ১৮১৭ সনেই যখন সহমরণ বিষয়ে শাস্ত্রীয় নির্দেশ জানাবার জন্য সরকারী তরফ থেকে 'জজপণ্ডিত' মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারকে অনুরোধ করা হয় তখন তিনি এই অভিমত প্রকাশ করেন—

> "চিতারোহণ অপরিহার্য নয়,—ইচ্ছাধীন বিষয়মাত্র। অনুগমন ও ধর্মজীবন যাপন, এই উভয়ের মধ্যে শেষটিই শ্রেয়তর। যে স্ত্রী অনুমৃতা না হয় বা অনুগমনের সংকল্প হইতে বিচ্যুত হয় তাহার কোন দোষ বর্তে না।"

এটি পাদ্রি মুরুব্বিদের বা সরকারের মনস্তুষ্টির ইচ্ছায় প্রণীত বিধান না হলে, উদারতার ও সাহসের পরিচায়ক। রামমোহনের সহমরণ-বিরোধী প্রথম পুস্তিকা প্রকাশিত হয় এর এক বৎসর পরে (১৮১৮)। কিন্তু বেদান্ত দর্শনের মত কঠিন বিষয়ের আলোচনার সূত্রপাত বাঙলায় মৃত্যুঞ্জয় করেননি,—সম্ভবত করতেনও না। কারণ, হিন্দুশাস্ত্র সাধারণ্যে প্রচার করা পণ্ডিত হিসাবে তাঁর কাম্য হত না। দ্বিতীয়তঃ, তা ভাষায় প্রকাশ করতে তাঁর রীতিমত আপত্তি ছিল, তা স্পষ্টভাবেই বলেছেন। 'বেদান্ত চন্দ্রিকা'র বহু-লম্বিত উপসংহার এরূপ :

> "………যেমন রূপালঙ্কারবতী সাধ্বী স্ত্রীর হৃদয়ার্থবোদ্ধা সুচতুর পুরুষেরা দিগম্বরী অসতী নারীর সন্দর্শনে পরাঙ্মুখ হন তেমনি সালঙ্কারা শাস্ত্রার্থবতী সাধুভাষার হৃদয়ার্থবোদ্ধা সৎপুরুষেরা নগ্না উচ্ছৃঙ্খলা লৌকিক ভাষা শ্রবণ মাত্রেই পরাঙ্মুখ হন।"

এটা তর্কস্থলে কুযুক্তি মাত্র, না হলে 'বাঙলা গদ্যের প্রথম শিল্পীকে' বলতে

হত শ্রদ্ধাহীন, সাহেবদের বেতন-পারিতোষিকে লুব্ধ, সুকৌশলী পণ্ডিতমাত্র। 'বেদান্ত চন্দ্রিকা'য় মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার সভ্যই বাঙলা ভাষায় শাস্ত্রীয় বিচারের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, একথা বলাও অত্যুক্তি।

'বেদান্ত চন্দ্রিকা' তিনভাগে বিভক্ত—কর্মকাণ্ড, উপাসনাকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। তার মূল বক্তব্য :—সাংসারিক মানুষ মোক্ষধর্মের জ্ঞানে অনধিকারী। কিন্তু শাস্ত্রীয় বিচার কাম্য হলেও তিনি দার্শনিক যুক্তি-তর্কের সাহায্য বিশেষ গ্রহণ করেননি। বরং তদপেক্ষা লৌকিক যুক্তি-তর্কে লেখকের রুচি কম নয়। রামমোহন রায়ের নাম একবারও না করে তিনি তাঁকে উল্লেখ করেছেন 'তত্ত্বজ্ঞানিমানি', 'বকধূর্ত', 'ধূর্ত অবধূত' প্রভৃতি কটূক্তি দ্বারা। সে তুলনায় রামমোহন বিতর্কেও আশ্চর্য রকমের সংযতভাষী। ভট্টাচার্যের সহিত বিচারে রামমোহন 'বেদান্ত চন্দ্রিকা'র ভাষা তুলেই উত্তর দিয়েছেন :

> "ইহাতে [বেদান্ত চন্দ্রিকায় 'শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত সংক্ষেপে বলা গেল,' এই কথায়] এই সমূহ আশঙ্কা আমাদিগের হইতেছে যে, যে ব্যক্তি বেদান্ত শাস্ত্রের মত পূর্ব হইতে না জানেন এবং ভট্টাচার্যের পাণ্ডিত্যে বিশ্বাস রাখেন তিনি বেদান্তের মত জানিবার নিমিত্ত ঐ গ্রন্থ পাঠ করিতে পারেন তখন সুতরাং দেখিবেন যে বেদান্ত চন্দ্রিকার প্রথম শ্লোক কলিকালীয় তাবৎ ব্রহ্মবাদির উপহাসের দ্বারা ['শিরোদরপরায়ণাঃ' বলে] মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন"—ইত্যাদি।

দু জনেই পুরাতন ভাষ্যকারদের পদ্ধতিতে (schoolmen's method) বিচার-বিতর্ক করেছেন, কিন্তু রামমোহনই বাঙলা গদ্যে যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনা-রীতির পথপ্রদর্শক। দ্বিতীয়তঃ, নিছক বাঙলা গদ্যের লেখক হিসাবেও মৃত্যুঞ্জয়ের 'বেদান্ত চন্দ্রিকা'র ভাষা সংস্কৃতে ভারাক্রান্ত, যুক্তিস্থলেও প্রায়ই জটিল এবং পাঠকের দুষ্পাচ্য। সেদিক থেকে রামমোহনের ভাষা schoolmen-এর ভাষা হলেও কম দুর্বোধ্য, কখনো কখনো সহজগতি। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়ের বিরুদ্ধে রামমোহনকে 'বাঙলা গদ্যের যুগপুরুষ' বলে দাঁড় করাতে যাওয়াও নিরর্থক। সাধারণভাবে বলা যায় গদ্যের যে দুই ধারা,—একটি রসবহনের ধারা, অন্যটি চিন্তাবহনের ধারা—মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার তার প্রথমটিকে বাঙলায় উদ্ঘাটন করতে চেয়েছেন। রামমোহন সেদিকে ভুলেও পা বাড়াননি। কিন্তু চিন্তাশীল ও যুক্তিশীল গদ্যের ভাষায় সন্ধান রামমোহনই প্রথম দিয়েছেন। আর পাঠ্যপুস্তক নয়, লাভের জন্যও নয়, সাধারণের উদ্দেশ্যে বাঙলা রচনায় তিনিই 'পাইওনীয়ার' বা অগ্রণী।

তারিণীচরণ মিত্র (১৭৭২ ?—১৮৩ ?)

তারিণীচরণ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাঙলা বিভাগের পণ্ডিত নন, হিন্দুস্থানী বিভাগে জন গিলক্রাইস্টের অধীনে দ্বিতীয় মুন্সি। সেদিনের কলকাতার তিনি সম্রান্ত পুরুষ, ইংরেজি ফারসী হিন্দুস্থানীতে শিক্ষিত। তারিণীচরণের জন্ম ও মৃত্যু কালের ঠিক নেই, তবে খ্রীঃ ১৮০১ থেকে খ্রীঃ ১৮৩০-এ অবসর গ্রহণ কাল পর্যন্ত তিনি কলেজের হিন্দুস্থানী বিভাগে সসম্মানে কাজ করতেন. খ্রীঃ ১৮১৭-তে দি ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা হলে তিনি প্রথম তার 'নেটিব সেক্রেটারি ছিলেন ; ১৮৩০-এও সোসাইটির সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। এ ছাড়া তারিণীচরণের সামাজিক মর্যাদা ও রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই বোঝা যায় যে সতীদাহ নিবারণ আইনের বিরুদ্ধে ১৮০৩এ যে 'ধর্মসভা' স্থাপিত হয় তিনি সে সভার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, সেই আন্দোলনে অগ্রণী হন।

বাঙলা সাহিত্যে তাঁর পরিচয় গিলক্রাইস্টের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত ইংরেজি (১০) 'ওরিয়েন্টাল ফেবুলিস্ট' (১৮০৩) নামীয় গ্রন্থের বাঙলা অনুবাদের জন্য, এবং রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেনের সঙ্গে স্কুল বুক সোসাইটির প্রকাশিত 'নীতিকথা' (১৮১৮) নামে পাঠশালার অনুবাদ-পুস্তিকা রচনার জন্য। কোনোটাই স্মরণীয় কৃতিত্ব নয়, তবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কমা, সেমিকোলন প্রভৃতি চিহ্নের ব্যবহার, আর তিনি হিন্দী-উর্দুরও একজন প্রথম দিকের লেখক।

রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়

রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় (১১) 'মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং'-এর লেখক। সে গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয় খ্রীঃ ১৮০৫ অব্দে। রাজীবলোচনও খ্রীঃ ১৮০১ অব্দে কেরির অধীনে ৪০৲ টাকা মাহিনায় কলেজের সহকারী পণ্ডিত নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি কৃষ্ণচন্দ্রের বংশোদ্ভূত বলে নিজের পরিচয় দিতেন। এ গ্রন্থ সম্ভবত রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রের অনুকরণেই লেখা হয়। কিন্তু গল্পে কাহিনীতে মিলে যা তৈরী হয়েছে তার ঐতিহাসিক মূল্য সামান্য। তবে 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রে'র মত ফারসী দৌরাত্ম্য তাতে নেই। ভাষা বরং

সংস্কৃতানুসারী। তবে সবসুদ্ধ বিবরণটি পড়ে যেতে বিশেষ বেগ পেতে হয় না; আর একথাই সেদিনের যে কোন গ্রন্থের পক্ষে যথেষ্ট প্রশংসার কথা।

চণ্ডীচরণ মুনশী

চণ্ডীচরণ মুন্‌শীর (১২) 'তোতা ইতিহাস'ও খ্রীঃ ১৮০৫ অব্দেই মুদ্রিত হয়। সে সময়ে তিনি কলেজের পণ্ডিত ছিলেন এবং ১৮০৮এ তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত সে কাজ তিনি করেন। 'তোতা ইতিহাস' ছাড়া তিনি 'ভগবদ্‌গীতার'ও বঙ্গানুবাদ করেন। 'তোতা ইতিহাস' হিন্দুস্থানী থেকে অনূদিত. ৩৫টি কাহিনী তাতে আছে। এ জাতীয় কাহিনী সংস্কৃতেও পাওয়া যায় কিন্তু ফারসী তোতা কাহিনীই সে যুগে বেশী প্রচলিত ছিল। তা-ই হিন্দুস্থানীতে ভাষান্তরিত হয়। যে কোন কারণেই হোক. চণ্ডীচরণের 'তোতা ইতিহাস ('ইতিহাস' অর্থ অবশ্য সেদিনে গল্প) বারে বারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। তার সমাদর যথেষ্ট হয়েছিল বলতে হবে; এবং কোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্রপাঠ্য বহু পুস্তকের এত সৌভাগ্য ঘটেনি, তাও লক্ষণীয়। আরব্য উপন্যাসের শাহেরজাদির গল্পের মত, তোতার এক-একরাত্রির গল্পে এক প্রোষিতভর্তৃকার 'খোজেস্তা' পরপুরুষ সঙ্গের (রাজপুত্রের) বাসনা প্রতি রাত্রেই পিছিয়ে যেতে থাকে; শেষ পর্যন্ত সে রমণীর স্বামী ফিরে এলে আর তোতার গল্প বলার প্রয়োজন রইল না। চণ্ডীচরণের অনুবাদে প্রথম দিকে একটু ফারসী শব্দ থাকলেও ক্রমেই তা ফারসীর প্রভাব কাটিয়ে ওঠে; এবং তাতে সংস্কৃতের প্রভাবই স্পষ্টতর হয়। কিন্তু যা মানতে হয় তা হচ্ছে—'তোতা ইতিহাস' সহজবোধ্য; এমনকি, পুরনো গল্প হলেও তাতে রস জমেছে. ভাষা তা আটকায়নি, বরং সাহায্য করেছে। অবশ্য এ গ্রন্থও মৌলিক রচনা নয়।

হরপ্রসাদ রায়

এ পর্বের শেষ গ্রন্থ (১৩) 'পুরুষ-পরীক্ষা'র অনুবাদ। কবি বিদ্যাপতির 'পুরুষ-পরীক্ষা' সংস্কৃতে লিখিত। তার থেকেই এই বাঙলা অনুবাদ. তা প্রথম প্রকাশিত হয় ইং ১৮১৫ অব্দে; কিন্তু তারপর বহুবার মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে। এ গ্রন্থ বেশ বড় গ্রন্থ। মোট ৪ পরিচ্ছেদে ৫২টি গল্প আছে—পুরুষের বিভিন্ন লক্ষণ-নির্দেশক গল্প ৪৪টি। এসব গল্পে সংস্কৃত প্রভাবই

স্বাভাবিক—সেই স্বাভাবিক মাত্রা ছাড়িয়ে না যাওয়াই হরপ্রসাদ রায়ের কৃতিত্বের প্রমাণ। হরপ্রসাদ রায় এমন কোনো স্মরণীয় কৃতী পুরুষ ছিলেন না। তাই আরও অনুমান করা চলে সকলে মিলে খ্রীঃ ১৮১৫ অব্দের দিকে বাঙলা গদ্যের একটা ভিত্তিভূমি আবিষ্কার করতে পেরেছেন ; তা আশ্রয় করে এবার অনেকেই চলতে পারেন।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের নাম তার পণ্ডিতদের কীর্তিতেই স্মরণীয় হয়ে আছে. অবশ্য পণ্ডিতদের নাম রয়েছে বাঙলা রচনার জন্য। না হলে. তাও ধুয়ে মুছে যেত। সে কীর্তির পরিমাপ করা এখন দুঃসাধ্য—যেখানে কিছুই স্থির ছিল না সেখানে যে একটা স্থির ভিত্তি আবিষ্কার করা গেল, এইটিই তো প্রধান লাভ। সম্ভবত, এসব গদ্যরচনার বিষয়বস্তু ('বত্রিশ সিংহাসন', 'রাজাবলি' প্রভৃতি) তখনো শিক্ষিত লোকের নিকট 'সেকেলে' হয়ে ওঠেনি,—ভাবী 'ছোটগল্পের' স্বাদ তাঁরা জানতেন না, পাশ্চাত্ত্য দেশেও যথার্থ ছোটগল্প তখন পর্যন্ত জন্মগ্রহণ করেনি। কাজেই এসব বই সে পর্বের বাঙালী সমাজে সমাদর লাভ করত না, একথা বলাও কঠিন। তবু তা ছাত্র-পাঠ্য বই, যদিও ইংরেজ ছাত্রদের জন্য লিখিত। নিশ্চয়ই দুর্মূল্যতার জন্যও এসব বই অন্যদের নিকট দুষ্প্রাপ্য ছিল। 'বত্রিশ সিংহাসন' যদি বা 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'কে প্রভাবান্বিত করে থাকে, 'প্রবোধ চন্দ্রিকা'র সঙ্গে 'পদ্মাবলী'র বা 'বোধোদয়ে'র কোন সম্পর্ক নেই। 'রাজাবলি'র ধারা ত্যাগ করে মার্শম্যানের ইতিহাসের ধারাই প্রবাহিত হতে থাকে বিদ্যাসাগরের মধ্য দিয়ে। কিন্তু সর্বাপেক্ষা বড় কথা এই যে. ১৮১৫ পর্যন্ত বাঙলায় সাধারণ-পাঠ্য মৌলিক রচনা প্রায় নেই। আর রামমোহন রায় 'বেদান্তসার' ও 'বেদান্তগ্রন্থ' প্রকাশিত ও বিনামূল্যে বিতরণ করে সেই নূতন পর্বের সূত্রপাত করলেন। রামমোহনের সে রচনা শিক্ষিত-সাধারণের বোধগম্য না হলে তা বাংলার শিক্ষিত-সমাজে আলোড়ন তুলত না। সেদিক থেকেই তিনি বাঙলা গদ্যের ইতিহাসেও এক প্রধান পুরুষ—লিপিকুশলতা অপেক্ষাও তাঁর কীর্তি মহত্তর—তিনি বৃহত্তর বাঙালী সমাজকে বাঙলা ভাষার পাঠক সমাজে পরিণত করলেন, বাঙলা গদ্যকে ধর্ম, দর্শন ও সমাজের নানা প্রশ্ন আলোচনার বাহন করে তুললেন। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই এসে গিয়েছিল স্কুল বুক সোসাইটি (১৮১৭), হিন্দু কলেজ (১৮১৭), কলিকাতা স্কুল সোসাইটি (১৮১৮), আর শেষে বাঙলা সংবাদপত্র

(১৮১৮)। বাঙলা গদ্যের ইতিহাসের সেই দ্বিতীয় স্তরে সে যুগের মিশনারিদের ও অন্যান্য পাঠ্যগ্রন্থ-প্রণেতাদের স্মরণীয় কীর্তি ম্লান না হলেও এক-মাত্র নক্ষত্রের মত আর বিরাজ করতে পারল না। বাঙালীর প্রয়োজনে বাঙালী সমাজের দাবীতে বাঙলা গদ্যের প্রাণস্ফূর্তি তখন থেকে (ইং ১৮১৮) নানাদিকে অনিবার্য হয়ে উঠল।

॥ ২ ॥ রামমোহনের পর্ব (১৮১৫-১৮৩০)

ভারতবর্ষের ইতিহাসে রামমোহন রায় (ইং ১৭৭৪-ইং ১৮৩৩) আধুনিকতার অগ্রদূত। কিন্তু সে পথে তিনি একক যাত্রী নন, এবং কোন দিকে প্রথম যাত্রীও নন, তবে সর্বত্রই তিনি প্রায় প্রধান পুরুষ।' এবং সবসুদ্ধ জড়িয়ে তিনি যে বিরাট কর্মশক্তির ও ব্যাপক যুগধর্মবোধের পরিচয় দেন তাতে তাঁকে শুধু যুগ-প্রধান না বলে ভারতবর্ষের যুগ-পুরুষ বললেও অন্যায় হবে না। ঘটনাচক্রে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের কাছাকাছি তাঁর নামে একটি সম্প্রদায় প্রায় গড়ে ওঠে, আধুনিক বাঙলার ইতিহাসে যাঁদের কীর্তি অসামান্য। সেই অসামান্য শক্তি ও প্রচেষ্টার দ্বারা রামমোহনের সেই অনুবর্তীরা রামমোহনকেও একই কালে ধর্ম-প্রবর্তক ও যুগ-প্রবর্তক বলে প্রতিষ্ঠিত করতে থাকেন, এবং 'বাঙলা গদ্যের জনক' বলেও অভিহিত করেন। বিংশ শতকের দ্বিতীয় পাদে এই বহু প্রচারিত ও সহজ প্রচলিত ধারণার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। 'রামমোহন মিথ্' ধসে যাওয়াই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু রামমোহনের অসামান্য কীর্তি তাতে গুঁড়িয়ে যাবে না। বাঙলা সাহিত্য ক্ষেত্রে তিনি গদ্যের জনক নন নিশ্চয়ই, কিন্তু বাঙলা গদ্যের কোনো কোনো দিকে তিনি পথিকৃৎ—পাঠ্য-পুস্তকের বাইরে বাঙলা গদ্যের পথ তিনি উন্মুক্ত করেন। আর সেই নবাবিষ্কৃত পথে তাঁর পা ক্ষণে ক্ষণে জড়িয়ে গেলেও তাঁর গতি রুদ্ধ হয়নি। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লেখক হিসাবে তাঁকে মান্য করতেন। ১৮৫৪-এর ১৩ই মার্চ-এর 'সংবাদ প্রভাকরে' ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখেছিলেন : "দেওয়ানজী* জলের ন্যায় সহজ ভাষা লিখিতেন, তাহাতে কোন বিচার ও বিবাদ ঘটিত বিষয় লেখায় মনের অভিপ্রায়

* 'রাজা' রামমোহন রায় শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগ পর্যন্ত 'দেওয়ানজী' নামেই পরিচিত ছিলেন ; অবশ্য 'রাজা' উপাধি পান খ্রীঃ ১৮২৮-এ।

ও ভাবসকল অতি সহজে স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইত, এজন্য পাঠকেরা অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম করিতেন, কিন্তু সে লেখায় শব্দের বিশেষ পারিপাট্য ও তাদৃশ মিষ্টতা ছিল না।” রামমোহনের ভাষা কর্মী-পুরুষের ভাষা, ডায়েলেকটিশিয়ান্ বা বিচারদক্ষ তার্কিকের ভাষা। তা ভাবুকের ভাষা নয়, শিল্পরসিকের ভাষা নয়। প্রাঞ্জল হলেও তাঁর বাঙলা সরস নয়। রসবোধ রামমোহনের আদৌ ছিল কি না সন্দেহ। ‘এজ্ অব প্রোজ্’ বা গদ্যের যুগের পথিকদের পক্ষে সে অভাব তত দোষাবহ নয়। তবে সে গুণ না থাকলে সাহিত্যের বিচারে কাউকে যথার্থ স্রষ্টা বলা যায় না, পরিচালক বলা যায় মাত্র।

যে দেশে অতি সহজেই ধর্মগুরুরা অবতার বা পরমপুরুষে পরিণত হন, সেদেশে রামমোহনের নামে যদি নানা কেরামতির গল্প জমে উঠত তাহলেও বিস্ময়ের কারণ থাকত না। তার পরিবর্তে জমেছে শুধু কিছু অপ্রমাণিত বা অতিরঞ্জিত গল্প। তা সামান্য জিনিস। সমস্ত ‘মিথ্’ ছাড়িয়ে নিয়েও যে রামমোহন রায় দাঁড়িয়ে থাকেন (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তথ্যনিষ্ঠ বিচারেও যিনি অসাধারণ পুরুষ), তাঁকে না জানলে আধুনিক ভারতীয় জীবনের চেতনা-উন্মেষের প্রথম রূপটি অগোচর থেকে যায়।

‘রামমোহনের পর্ব’ বলতে অবশ্য শুধু রামমোহন নয়, তাঁর প্রতিপক্ষ হিন্দু রক্ষণশীলরা (মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন, পরে রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন প্রভৃতি) ও খ্রীষ্টান পাদ্রিরা (প্রধানতঃ শ্রীরামপুরের মিশনারিরা) গণ্য হবেন; তাঁর সপক্ষীয় (‘আত্মীয় সভার’ অন্যতম আচার্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, ১৭৯৪-১৮৪৬, এবং হিন্দু কলেজের প্রসন্নকুমার ঠাকুর, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, চন্দ্রশেখর দেব প্রমুখ) নব্যশিক্ষিত প্রধানগণও গণ্য হবেন। এবং ডেভিড্ হেয়ার (১৭৭৫-১৮৪২, ডিরোজিও'র (১৮০৯-১৮৩১) কথা না জানলে এ সময়কার বাঙালীকে জানাই যাবে না, সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু কলেজের ‘ইয়ং-বেঙ্গল-এর’ উৎসক্ষেত্র অ্যাকাডেমিক সোসাইটি বা অ্যাসোসিয়েশন ও ‘পার্থেনন’-এর কথাও মনে রাখা প্রয়োজন। এসব স্পষ্ট বুঝে রাখা প্রয়োজন—১) পর্বটা রামমোহনের সূচনা হলেও এ পর্ব বাঙলা গদ্যে (২) পাঠ্যপুস্তকাদি রচনারও এক প্রধান পর্ব;—স্কুল বুক সোসাইটি এ পর্ব থেকে সে দায়িত্বভার গ্রহণ করে। সেখানে পাদ্রি উইলিয়ম কেরি বাঙালী রাধাকান্ত দেব প্রভৃতি শিক্ষোৎসাহীদের পূর্বাপর সহযোগী

ছিলেন। শ্রীরামপুর মিশন স্বাধীনভাবেও সেদিকে উদ্যোগী ছিল। (৩) কিন্তু এ পর্বের লেখকদের প্রধান কর্মক্ষেত্র হল সাময়িক পত্র ও সংবাদপত্র। এমন কি, ইং ১৮১৮ থেকে ইং ১৮৫৭ পর্যন্ত কালে বাঙলা গদ্যের প্রধান বিকাশ-ক্ষেত্র হচ্ছে বাঙলা সংবাদপত্র। তার আবির্ভাবেই লেখক বা সাহিত্যিক নামক লেখ-জীবী শ্রেণীরও উদ্ভবক্ষেত্র ও জীবিকাক্ষেত্র মিলল। (৪) অবশ্য বাঙলা সাহিত্যের দিক থেকে আর একটি মৌলিক প্রয়াসের প্রারম্ভও এ সময়েই দেখা দেয়—তা ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কলিকাতা কমলালয়' প্রভৃতি বাঙলা গদ্য-রস-সাহিত্য রচনার প্রথম প্রয়াস।—এ সবই রামমোহনের পর্বের স্মরণীয় প্রধান কর্মক্ষেত্র। আরও দু একটি কথা লক্ষণীয়: (৫) প্রচার-মূলক রচনা অবশ্য মিশনারিরা পূর্ব থেকেই সূচনা করেছিল; এখনও তা চলে। কিন্তু এখন রামমোহনের কাল থেকে সেই প্রচার আর একতরফা রইল না। পক্ষ-প্রতিপক্ষে প্রচার, বিতর্ক চলতে লাগল। (৬) প্রাচীন ভারতের নূতন পরিচয় গ্রহণ এখন আরম্ভ হল—অনুবাদ সূত্রে। বাইবেল অনুবাদ দিয়েই অনুবাদের কাজ আরম্ভ করেছিলেন পাদ্রিরা; ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতেরাও পাঠ্যপুস্তক রচনায় অনুবাদই বেশি করেছেন। রামমোহন উপনিষদ্ অনুবাদ করে সংস্কৃত থেকে দর্শন ও ধর্মশাস্ত্র অনুবাদের ধারাকে অনুসরণ করেন; রাজা রাধাকান্ত দেব বিরাটভাবে সংস্কৃত চর্চায় উৎসাহ দান করলেন। বাঙলায় জাগরণের যুগে পরাধীন ভারতবাসী যে ঐতিহ্য থেকে আপনার প্রেরণা আহরণ করতে গেল তা দীর্ঘদিন পরে পুনরাবিষ্কৃত এই প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্য। এ আবিষ্কারে মুসলিম ভারতের ঐতিহ্য অবজ্ঞাত এবং অনেকাংশে বিজাতীয় বলো গণ্য হয়, আর মুসলিম ভারতের সম্বন্ধে এই অবহেলার ফলে বাঙালীর ভাষায়, ভাবে, জীবনে যে জটিলতার সূচনা হতে থাকে বাঙলার জাগরণের যুগেও তা কারো দৃষ্টিতে পড়ল না। (৭) ক্রমেই ভাষার বানান ও অর্থগত স্থিরতা আসতে থাকে ব্যাকরণ-অভিধানের প্রকাশে।

(১) রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩)

বাঙলা সাহিত্যজিজ্ঞাসুর পক্ষে সব বাদ দিয়েও রামমোহন রায়ের সম্বন্ধে এইটুকু জানা প্রয়োজন—হুগলীর রাধানগরের সম্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান

রামমোহন রায় যথানিয়মে আরবী-ফারসী দোরস্ত করেছিলেন, এবং সম্ভবতঃ সেই মুসলমান সংস্কৃতির প্রভাবেই প্রচলিত হিন্দুধর্মে পৌত্তলিকতা ও বহু-দেববাদের বন্যা দেখে তাতে শ্রদ্ধা হারান। হিন্দুধর্মের উচ্চতর দিক সম্বন্ধে তাঁর চেতনা জাগ্রত হয় (সম্ভবতঃ কাশীতে) বেদান্তপাঠে, এবং নিশ্চয়ই তাঁর গুরু হরিহরানন্দ নাথ তীর্থস্বামী (নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার) নামক সুপণ্ডিত তান্ত্রিক যোগীর উপদেশে। হরিহরানন্দই তাঁকে তান্ত্রিক সাধনায় শ্রদ্ধাশীল করে তোলেন। আর, যে বিষয়ে সন্দেহ নেই তা এই—রামমোহন শুধু শাস্ত্র-জিজ্ঞাসায় ও শুধু ধর্ম-জিজ্ঞাসায় দিন কাটান নি, ধর্ম-জিজ্ঞাসার সঙ্গে অর্থ-জিজ্ঞাসা ও জ্ঞান-জিজ্ঞাসারও অসামান্য সামঞ্জস্য সাধন করেন। ব্যক্তিস্বাধীনতার মূলনীতি তিনি অনুসরণ করেন,—পারিবারিক মান ও নামের জন্য নিজের ব্যক্তিগত বৈষয়িক উদ্যোগ ও স্বার্থ খর্ব করেন নি। কলিকাতার সাহেবদের ঋণদান করে ও নানা উদ্যোগে (খ্রীঃ ১৭৯৪-১৮০১) রামমোহন বিত্তশালী পুরুষ হন। ইংরেজদের উপর নানা বিষয়ে নির্ভরশীল হয়েও ব্যক্তিত্ববান্ পুরুষের মত ইংরেজদের নিকট রামমোহন নিজ ব্যক্তি-মর্যাদা কিছুতেই ক্ষুণ্ণ হতে দেননি। ডিগ্‌বী সাহেবের দেওয়ান হয়ে খ্রীঃ ১৮০৫-১৮১৪ পর্যন্ত প্রায় দশ বৎসর কাল রংপুরে কাটিয়ে—খ্রীঃ ১৮১৪ অব্দে রামমোহন সরকারী কর্ম ত্যাগ করে কলকাতায় এলেন। দেওয়ান রামমোহন রায় তখন অগাধ ধনের অধিকারী; ফারসী-আরবী, সংস্কৃত-ইংরেজি প্রভৃতি বহু ভাষায় সুশিক্ষিত, শাস্ত্রজ্ঞানী, প্রচণ্ড যুক্তিবাদী, ব্রহ্মজ্ঞানের মাহাত্ম্যপ্রচারক, অ্যাডাম সাহেবের মত খ্রীষ্ট প্রচারককে 'ইউনিটেরিয়ান্' করে ছেড়েছেন। তাঁর কর্মজীবন দেখে মনে হয়, ইংরেজদের সাহচর্যে ও ইংরেজি বিদ্যার মাধ্যমে আহৃত পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার (বা 'বুর্জোয়া-সভ্যতার) দ্বারা তিনি তখন সম্পূর্ণ প্রবুদ্ধ। সেই নূতন যুগধর্মের প্রেরণায় ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের প্রচেষ্টায় তিনি আত্মনিয়োগে দৃঢ়সংকল্প; এবং ভারতীয় সমাজের জীবনের সর্ববিভাগে আপনার প্রবল ব্যক্তিত্ব, বিষয়বুদ্ধি ও অক্লান্ত উদ্যোগের বলে নেতৃত্ব গ্রহণে অভিলাষী। কলিকাতাবাসী (খ্রীঃ ১৮১৪-১৮৩১) রামমোহনের বহুমুখী জীবনই বাঙলা সাহিত্যের বিশেষ আলোচ্য; কিন্তু ইংলণ্ড-প্রবাসের শেষ দুই বৎসর কালও (খ্রীঃ ১৮৩১-১৮৩৩) তাঁর জীবনের চরম বিকাশের কাল, তা মনে রাখা উচিত। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনস্বীদের সঙ্গলাভে সেখানে

তাঁর প্রতিভা কোনো কোনো দিকে সম্পূর্ণ প্রকাশের সুযোগ পেয়েছিল—পরাধীন দেশে সে সুযোগ কোথায় ?

খ্রীঃ ১৮১৫ থেকে খ্রীঃ ১৮৩১ পর্যন্ত কালের মধ্যে কলিকাতায় এমন একটি বড় অনুষ্ঠান বা বড় আন্দোলন হয় নি রামমোহন যার সঙ্গে সম্পর্কিত নন। হয় তিনি উদ্যোক্তা, নয় তিনি প্রধান সমর্থক, না হয় প্রধান প্রতিপক্ষ,—একভাবে-না-একভাবে তিনি প্রত্যেকটি প্রধান আয়োজনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। অনেক ক্ষেত্রেই তিনি নেতা। কলিকাতায় তখন পদস্থ অভিজাত বিত্তবান্ ও কৃতী বাঙালী আরও ছিলেন ; কিন্তু রামমোহনের পুরুষকার ইংরেজ বাঙালী সকলের কর্তৃত্বাভিমানকে আচ্ছন্ন করে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে ; দিল্লীর বাদশাহ তাঁকে যে রাজা' উপাধি দিয়ে নিজের দূত রূপে মনোনীত করলেন, তাও এ সত্যের প্রমাণ। রামমোহনই তখন সর্বাগ্রগণ্য পুরুষ। বলে লাভ নেই,—নিরাকার ব্রহ্মের বিষয়ে চেতনা তাঁর পূর্বেও রামরাম বসু লাভ করেছিলেন। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার তাঁর পূর্বেই সতীদাহের বিরুদ্ধে শাস্ত্রীয় বিধান প্রকাশ করেছিলেন। কলিকাতায় ইংরেজি শিক্ষার প্রচেষ্টা পূর্বেই আরম্ভ হয়েছিল। তিনি ছাড়া অন্যেরাও অ্যাংলিসিস্ট' দলে ইংরেজি প্রবর্তনে উদ্যোগী হয়েছিলেন ; 'স্ত্রীশিক্ষা-বিষয়ক' ব্যাপারেও তিনি ছাড়াও উদ্যোগী পুরুষ অনেক ছিলেন। মুদ্রাযন্ত্র আইনের প্রতিবাদেও (খ্রীঃ ১৮২৩) তিনি ছাড়া বহু দেশীয় গণ্যমান্য লোক অগ্রণী হন। বেদান্ত-চর্চা তাঁর পূর্বেও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার করেছিলেন ; আর রামমোহনও প্রকৃতপক্ষে অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক নন, বরং দ্বৈতবাদী তান্ত্রিক বা ব্রহ্মোপাসক 'ডীইস্ট' মাত্র। 'হিউম্যানিস্ট' বলতে যথার্থ যা বোঝায়—পরমার্থ-নিরপেক্ষ মানবতাবাদ—তত্ত্বভক্ত, তত্ত্বজ্ঞানী, রামমোহনকে সেরূপ হিউম্যানিস্ট বলাও দুঃসাধ্য। এবং সর্বাপেক্ষা সত্য কথা এই যে, রামমোহন ধর্মপ্রবর্তক ছিলেন না, সাধকভক্তও ছিলেন না, পরবর্তী ব্রাহ্ম-সমাজের 'সুনীতি-দুর্নীতির' কঠোর নিয়ম তিনি পালন করতেন না, একথা সত্য। তা সত্ত্বেও, তিনি যে প্রতিভায় ও পুরুষকারে অতুলনীয়, তার প্রমাণ তাঁর বাঙলা গ্রন্থাবলী (এখন কৌতূহলী পাঠক সহজেই পাঠ করতে পারেন. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ তা প্রকাশ করেছেন)। তাতে সুস্পষ্ট তাঁর যুক্তিবাদ (Rationalism), ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধ (Individualism). দেশের ও বিদেশের সর্ব জাতির

রাজনৈতিক স্বাধীনতার (National Freedom) আকাঙ্ক্ষা, এবং মানবাধিকার-বাদের (Rights of Man) অপেক্ষাও যা এক হিসাবে নূতনতর, রামমোহনের আন্তর্জাতিক মৈত্রীতে (International Amity) বিশ্বাস। 'যুগধর্মের' পুরোধা হয়েও তিনি দেশ-ধর্মের ক্ষেত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চাননি—এমন কি, তাঁর কালের হিন্দু দেওয়ান-মুৎসুদ্দির সমস্ত বৈষয়িক চাতুর্য ও সম্রান্ত-বিলাসে তাঁর কিছুমাত্র সংকোচ ছিল না। এবং সমস্ত বাস্তবদৃষ্টি সত্ত্বেও তিনি শিল্প-বাণিজ্যে ধন নিয়োগ না করে জমিদারী প্রতিষ্ঠাতেই নিজের বৈষয়িক প্রতিষ্ঠা খুঁজেছেন।

রামমোহনের বাঙলা রচনা : বাঙলা রচনায় রামমোহনের প্রধান কাজ (১) 'বেদান্তগ্রন্থ ; (২) 'বেদান্তসার'—খ্রীঃ ১৮১৫ ; (৩) 'ভট্টাচার্যের সহিত বিচার'—('বেদান্ত চন্দ্রিকা র উত্তর)—খ্রীঃ ১৮১৭ ; (৪) 'গোস্বামীর সহিত বিচার'—খ্রীঃ ১৮১৮ ; (৫) 'প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ'—(সহমরণ বিরোধী পুস্তিকা)—খ্রীঃ ১৮১৮ ; (৬) 'পথ্যপ্রদান (কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের 'পাষণ্ড-পীড়নের' উত্তর)—খ্রীঃ ১৮২৩। তা ছাড়া (৭) 'ব্রাহ্মণ সেবধি'—খ্রীঃ ১৮২১ ও (৮) 'সম্বাদ কৌমুদী' খ্রীঃ ১৮২১ - প্রকাশ করে তিনি শ্রীরামপুরের পাদ্রিদের সঙ্গে হিন্দুধর্ম বনাম খ্রীষ্টধর্মের বিতর্ক চালান। অবশ্য এ বিতর্ক প্রধানতঃ ইংরেজি ভাষার মাধ্যমেই চলে। বাঙলা ভাষায় রামমোহনের (৯) কেনোপনিষদ্ ও ঈশোপনিষদের অনুবাদ খ্রীঃ ১৮১৬ অব্দের দিকে প্রকাশিত হয় ; পরে বাজসনেয় সংহিতা ও আরও কয়েকটি উপনিষদের তিনি অনুবাদ করেন। তা ছাড়া (১০) কয়েকটি ব্রহ্মসঙ্গীতও তিনি রচনা করেন। (১১) তাঁর 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' ইংরেজিতে লেখা ব্যাকরণ অবলম্বনে বিলাত যাত্রার পূর্বে তাড়াতাড়ি রচিত। স্কুল বুক সোসাইটি কর্তৃক তা খ্রীঃ ১৮৩৩এ (তাঁর মৃত্যুর পরে) প্রকাশিত হয়। বাঙালী-রচিত এই প্রথম বাঙলা ব্যাকরণ রামমোহনের যুক্তিনিষ্ঠ মনের ও ভাষাবোধের পরিচায়ক। রামমোহনের ইংরেজি পুস্তক-পুস্তিকা, সরকারী ও বেসরকারী স্মারকপত্র ও পত্রাদি এবং হিন্দী রচনা এ প্রসঙ্গে আলোচ্য নয়, কিন্তু সে সব রামমোহনের পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার পরিচায়ক। 'আত্মীয় সভা' (খ্রীঃ ১৮১৫) প্রতিষ্ঠা, 'উপাসনা সভা' (খ্রীঃ ১৮২৮), 'ব্রহ্মমন্দির' স্থাপন—সে কালের যুগান্তকারী কাজ ; 'হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠায় তাঁর উদ্যোগ, নিজের 'অ্যাংলো-হিন্দু অ্যাকাডেমি' পরিচালনা ; ডাফ্ স্কুল প্রতিষ্ঠায়

সহকারিতা; ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনে তৎপরতা,—এসব উদ্যোগের মতোই তাঁর হিন্দী ও ইংরেজি লেখা নিয়েই রামমোহন রামমোহন,—শুধু বাংলা লেখার বিচার করলে ভারতীয় জীবন-গঠনে রামমোহনের যে দান তার যথার্থ পরিমাপ হয় না।

'বেদান্তসার, 'বেদান্তগ্রন্থ' বাঙালী শিক্ষিত সাধারণের জন্ত লিখিত বাঙলা গদ্য-পুস্তক। সেদিনে এরূপ দার্শনিক বিচারে তাঁদের রুচি ছিল। তাই আজকালকার তুলনায় খুব বেশি পরিচ্ছন্ন রচনা না হলেও তখন তা চলত। তবে রামমোহন শব্দ-পারিপাট্য অপেক্ষা সরলার্থের দিকেই বেশি দৃষ্টি দিয়েছেন। রামমোহনের লেখার এক-আধটি উদ্ধৃতি দিলে চলে না; বহু বিষয়ে বহু ধরনের তাঁর লেখা। তাঁর ভাষায় তবু ত্রুটি ঘটেছে—প্রথমতঃ, 'হইবাক' প্রভৃতি পদ তখনো পরিত্যক্ত হয়নি। দ্বিতীয়তঃ, দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলনের অভাবে লেখা পাঠে বাধা হয়। তৃতীয়তঃ, তাঁর সুদীর্ঘ জটিল বাক্যের অন্বয় পরিষ্কার নয়। চতুর্থতঃ, যে পণ্ডিতী বিচার পদ্ধতিতে তিনি পাকা সে পদ্ধতি সংস্কৃতের ঐতিহ্যে গঠিত; বাঙলা ভাষার স্বভাবানুযায়ী রামমোহন তা নিয়ন্ত্রিত করতে পারেননি।

রামমোহনের ভাষার প্রধান গুণ—প্রথমতঃ, বক্তব্যকে সরল করে বলবার জন্তই রামমোহন লেখেন শব্দ বা বাক্যের খেলা দেখাবার ইচ্ছায় নয়। তাই, তাঁর ভাষা প্রায়ই সরল, এমন কি, সময়ে সময়ে প্রাঞ্জল। দ্বিতীয়তঃ, তার্কিক রামমোহন বিপক্ষের বিরুদ্ধে কটূক্তি প্রয়োগ করেননি, এবং অপরের কটূক্তিকে স্থিরভাবে যুক্তির দ্বারা নিরসন করেছেন। এই আশ্চর্য সংযম তাঁর তীক্ষবুদ্ধি ও রুচিবোধের প্রমাণ। তাতে মাঝে-মাঝে স্মিত হাস্যরেখাও দেখা যায়; যেমন 'পাদরী ও শিষ্যসংবাদ', কিংবা 'পথ্য-প্রদান' প্রভৃতি রচনা। রামমোহনের প্রতিপক্ষরা যুক্তি অপেক্ষা শাস্ত্রেরই দোহাই দিতেন। যুক্তিবাদী হলেও এরূপ প্রতিপক্ষের সহিত বিচারে রামমোহন শাস্ত্রীয় যুক্তিকে নিজের অস্ত্ররূপে গ্রহণ করে এঁদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করতে দ্বিধা করেননি। তাঁর এই কৌশল বিদ্যাসাগরও পরবর্তী কালে গ্রহণ করেছেন—এ কৌশলে ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ সুরক্ষিত হয়েছে, নৈয়ায়িক তর্কের শৃঙ্খলোকে এ যুক্তিবাদ মিলিয়ে যায়নি।

রামমোহনের প্রতিপক্ষ :—রামমোহনের প্রতিপক্ষ হিসাবে প্রথমেই

দাঁড়ান 'বেদান্ত চন্দ্রিকা'র (খ্রীঃ ১৮১৭) লেখক মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার; তাঁর কথা পূর্ব প্রসঙ্গে উল্লেখিত হয়েছে। বিদ্যালঙ্কার ছাড়া বাঙলা সাহিত্যে রামমোহনের প্রতিপক্ষ আর দু জনাই মাত্র উল্লেখযোগ্য,—'পাষণ্ড-পীড়নের' লেখক কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন (মৃত্যু ১৮৫১); এবং 'সম্বাদ-কৌমুদী' (খ্রীঃ ১৮২১) ও 'সম্বাদ-চন্দ্রিকা'র (খ্রীঃ ১৮২২) সম্পাদক, 'কলিকাতা কমলালয়', 'নববাবু-বিলাস' প্রভৃতির প্রণেতা ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (খ্রীঃ ১৭৮৭-খ্রীঃ ১৮৪৮)। আসলে গণ্য শুধু একজন - ভবানীচরণ, আর তিনি গণ্য মৌলিক লেখকরূপে। কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন দর্শনের গ্রন্থাদিও (আত্মকৌমুদী, পদার্থ-কৌমুদী) লিখেছিলেন, কিন্তু রামমোহনকে আক্রমণ না করলে তিনি বিস্মৃতির অতলেই তলিয়ে যেতেন।

সহমরণের বিরোধিতা করে রামমোহনের প্রথম বাঙলা পুস্তিকা 'প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ' খ্রীঃ ১৮১৮ সনে প্রকাশিত হয়। এঁড়েদ'-বাসী (?) কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন তখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সহকারী পণ্ডিত; তিনি স্মৃতিশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। তিনি পর বৎসর (খ্রীঃ ১৮১৯) রামমোহনের উত্তরে পুস্তিকা প্রকাশ করলেন বিধায়ক নিষেধকের সম্বাদ'। এর পরে 'ধর্ম-সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী' নামে তিনি 'সমাচার দর্পণে' (৬ এপ্রিল, ১৮২২) রামমোহনকে লক্ষ্য করে পত্রাকারে চারিটি প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করেন। রামমোহন তার উত্তরে প্রকাশ করেন 'চারি প্রশ্নের উত্তর' (১১ই মে, ১৮২২)। প্রত্যুত্তরে 'ধর্ম-সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী' মূল প্রশ্ন ও 'ভক্ততত্ত্বজ্ঞানী'র (রামমোহনের) উত্তরের সারভাগসুদ্ধ প্রকাশ করলেন 'পাষণ্ড-পীড়ন' (১লা ফেব্রুয়ারী, ১৮২৩)। এর উত্তরে রামমোহন রায় লেখেন 'পথ্য প্রদান' (১৮২৩)—ঐ বিতর্কের তা'ই শেষ গ্রন্থ। কাশীনাথ তার পরেও বহু বৎসর জীবিত ছিলেন—খ্রীঃ ১৮২৫ সনে তিনি সংস্কৃত কলেজের স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন; পরে খ্রীঃ ১৮২৭ সনে ২৪ পরগনার 'জজ-পণ্ডিতের পদ লাভ করেন। খ্রীঃ ১৮৫১ সনে তাঁর মৃত্যু হয়। আমাদের নিকট 'পাষণ্ড-পীড়ন' (১৮২৩) দিয়েই তাঁর পরিচয়। যদি আমরা এসব লেখাকে বাঙলা গদ্যের ক্রম-সামর্থ্যের দিক থেকে বিচার না করি, তা হলে শাস্ত্র ও স্মৃতির নানা বিরোধী বাক্য নিয়ে এই সব পণ্ডিতী বিচার ও শাস্ত্রের কচকচি আজ মূল্যহীন। গদ্যের বিচারে দেখি বিশ বৎসরের মধ্যে বাঙলা গদ্যের মান এতটা এগিয়ে এসেছে যে, ফোর্ট

উইলিয়ম কলেজের অধিকাংশ পাঠ্য পুস্তকের থেকে কলেজের এই সহকারী পণ্ডিতের লিখিত বাঙলা সুবোধ্য। শাস্ত্র বিচারের ভাষায় সংস্কৃতবাহুল্য থাকবেই এখানেও তা আছে। কিন্তু ব্যাকরণে, অন্বয়ে এবং বর্ণবিন্যাসে 'পাষণ্ড-পীড়নে'র বাঙলা অনেকটা সুস্থির হয়ে এসেছে। বিপক্ষের প্রতি কটূক্তি প্রয়োগে তর্কপঞ্চানন কুণ্ঠাহীন —'প্রতারক……নগরান্তবাসি, মাংসাশি ইত্যাদি অজস্র বিশেষণ প্রতিপক্ষের প্রতি তিনি বর্ষণ করেছেন। কিন্তু বাঙলা গদ্যের রীতি তাঁর মোটের উপর আয়ত্ত, আর গালিগালাজ সত্ত্বেও ব্যঙ্গবিদ্রূপে তিনি অক্ষম নন। যেমন, 'ভক্তত্বজ্ঞানী' (রামমোহন) বৈষ্ণবদের তিলক-সেবন শুধু সময়ের অপব্যয় বলে পরিহাস করায় 'ধর্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী' উত্তর দিচ্ছেন :

> বৈষ্ণবদের তিলক সেবনে শৈবাদির ত্রিপুণ্ড্র ধারণে কিঞ্চিৎকাল বিলম্বে কি দুরদৃষ্ট এবং ভক্ত-তত্ত্বজ্ঞানীদিগের নূতন ব্রাহ্মবস্ত্র ও চর্মপাদুকা, যাহা যবনদিগের ব্যবহার্য ও যে বস্ত্রসকল যবনেরা ইজের ও কাবা প্রভৃতি কহিয়া থাকে ও যে চর্মপাদুকার যাবনিক নাম মোজা, সেই বস্ত্র পরিধানে ও সেই চর্ম পাদুকা বন্ধনে দণ্ডদ্বয় ও দণ্ডচতুষ্টয় কাল বিলম্বেই কি শুভাদৃষ্ট জন্মে, তাহার শ্রবণের প্রত্যাশায় রহিলাম। অধিকন্তু অদ্য পরমাহ্লাদিত হইলাম, অনেক কালের পরে অনেক অন্বেষণে এক্ষণে ভক্ততত্ত্বজ্ঞানি মহাশয়দিগের নিগূঢ় শাস্ত্র দর্শন করিলাম। যে নিগূঢ় শাস্ত্রে নির্ভর করিয়া তাঁহারা শৈব বিবাহ, যবনাগমন ও সুরাপানাদি অনেক সৎকর্মের অনুষ্ঠান ও ছাগীমুণ্ড, বরাহমুণ্ড, হংসাণ্ড ও কুক্কুটাণ্ড ভোজন করিয়া থাকেন…ভাল, জিজ্ঞাসা করি, যদি এই সকল গর্হিত কর্ম করিলেই লোক ব্রহ্মজ্ঞানী হয়, তবে হাড়ি ডোম চাঁড়াল ও মুচি ইহারা কি অপরাধ করিয়াছে, ইহাদিগকেও কেন ব্রহ্মজ্ঞানী না কহা যায়, তাহারা ভক্ততত্ত্বজ্ঞানি মহাশয় সকল হইতেও এই সকল কর্মে বরং অধিকই হইবেক, ন্যূন কোন মতেই হইবেক না, অধিকন্তু তাহারা রাজপথের মধ্যে কত প্রকার হাস্যকৌতুক নৃত্যগীত অঙ্গভঙ্গ রঙ্গরস করে। কেহ বা পীত্বা, পীত্বা পুনঃ পীত্বা পপাত ধরণীতলে, এই তন্ত্রোক্ত শ্লোকের অযথার্থ যথাশ্রুত অর্থ দর্শন করায়, অর্থাৎ পান করিয়া, পান করিয়া পুনর্বার পান করিয়া রাজপথের প্রান্তে বস্ত্ররহিত, ধূল্যবলুণ্ঠিত, আলুলায়িত কেশ, মৃতবেশ হইয়া পথস্থ সকলকে উপস্থ দর্শন করাইয়া ধ্যানস্থ হয় কেহ বা এই প্রকার পরম ব্রহ্মে লীন হয় যে, কুক্কুরাদিতে স্বগাত্রমাংস ভোজন করিলেও ধ্যান ভঙ্গ হওয়া দূরে থাকুক, ভ্রূভঙ্গ করে না, অতএব তাহাদিগকে পরম ব্রহ্মজ্ঞানী কহিলেও কহা যায়। (দ্বিতীয়োল্লাস)

একে যুক্তি বলবার কোন কারণ নেই: কিন্তু সেদিনের তুলনায় ভালো বাঙলা বলতেই হবে। ঈশ্বর গুপ্তের কথাতেই 'পাষণ্ড-পীড়নে'র সম্বন্ধে বলা চলে—"রামমোহনের ভাষা ত্রুটিহীন নয় কিন্তু 'পাষণ্ড-পীড়নে'র ভাষা সর্বাংশেই

উত্তম অর্থাৎ শব্দের লালিত্য ও মাধুর্য প্রাচুর্য সবদিকেই উত্তম হইয়াছিল, তদ্দৃষ্টে অনেকেই সরস রচনায় শিক্ষিত হইয়াছেন।" (সং প্রঃ ১৩ মার্চ, ১৮৫৪) ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য সেরূপ রচনার পথপ্রদর্শক। 'পাষণ্ড-পীড়নে'র সম্বন্ধে আর একটি কথা জানা প্রয়োজন—শাস্ত্রানুযায়ী 'পাষণ্ড' অর্থে যারা বৈদিক কর্ম ত্যাগ করে অন্য কর্ম করে, তর্কপঞ্চানন তাদের বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ status-এর নিগড় ভেঙে যাঁরা contract-এর স্তরে যান সেই আধুনিক কালের উদ্যোগী মানুষ মাত্রই 'পাষণ্ড'। কিন্তু রামমোহনাদির বিরুদ্ধে হিন্দুদের একটা প্রচার লক্ষণীয় :—"দেশ বিদেশের জাতি বিশেষের ক্ষণিক মনোরক্ষার্থ অনর্থ অম্লানবদনে সজাতীয় ধর্মনিন্দা"। অর্থাৎ, রামমোহন সমসাময়িক হিন্দু-সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছিলেন। এ অবশ্য অপপ্রচার, কারণ কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয়। রামমোহন হিন্দু সমাজ ত্যাগ করে মুসলমানও হতে যাননি, খ্রীষ্টানও হতে চাননি ; হিন্দু বলে, ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় রক্ষা করতেন। ঐহিক আদর্শ (secular) ও সংশয়বাদী (agnostic) জিজ্ঞাসা নিয়ে বরং তাঁরই জীবনের শেষদিকে (খ্রীঃ ১৮২৫ —খ্রীঃ ১৮৩৩) বাঙলা দেশে উত্থিত হচ্ছিল ডিরোজিওর শিষ্যদল নব্যবাঙালী —'ইয়ং বেঙ্গল'।

রামমোহনের প্রধান প্রতিপক্ষ অবশ্য ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মৌলিক রচনাকার হিসাবে তাঁর কথা স্বতন্ত্র আলোচনা করা প্রয়োজন।

(২) স্কুল বুক সোসাইটি ও পাঠ্যপুস্তক

স্কুল কলেজে পাঠ্যপুস্তকরূপে সাহিত্য-গ্রন্থও পঠিত হয়, কিন্তু পাঠ্যপুস্তক সাধারণতঃ সাহিত্যের মানদণ্ডে সাহিত্য বলে গ্রাহ্য হয় না। তবে বিষয়-মাহাত্ম্যে ও লিপিকুশলতায় কোনো কোনো পাঠ্য-পুস্তক সে গৌরব নিশ্চয়ই অর্জন করতে পারে। বাঙলা ভাষায় গদ্য-সাহিত্য যতক্ষণ উদ্ভূত হয়নি ততক্ষণ পর্যন্ত যে কোনো গদ্য রচনা গদ্য-সাহিত্যের সেই জন্মক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে তাকেই আমরা গ্রহণ করেছি। বলাই বাহুল্য, এসব প্রচার-পুস্তিকা, পাঠ্যপুস্তক, অনেক সময়ে মোটেই সাহিত্য-পদবাচ্য নয়—শুধু গদ্যের নমুনা। কিন্তু এই দ্বিতীয় পর্বে এসে আমরা প্রথম স্বতন্ত্র গদ্য-সাহিত্য রচনারও প্রয়াস দেখতে পাই। গদ্যের রূপ এখনও সুস্থির হয়নি বলেই এখনও প্রচার-পুস্তিকা,

পাঠ্যপুস্তক প্রভৃতিকে একেবারে আলোচনা থেকে বাদ দেওয়া যায় না—সাময়িক পত্রকে তো বিংশ শতকেও সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু গদ্য রচনার ইতিহাসেও এখন (ইং ১৮১৫-এর পর) থেকে পাঠ্যপুস্তক বা প্রচারমূলক পুস্তক-পুস্তিকাকে আর নির্বিচারে আলোচ্য বিষয় করার প্রয়োজন কমে এসেছে। এই কারণেই কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির প্রকাশিত সকল পুস্তকের বিশদ আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু সেদিনে শিক্ষার ও সংস্কৃতির ইতিহাসে সোসাইটির এই দান অতি প্রয়োজনীয় ছিল। কোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্য বই সাধারণ দেশীয় ছাত্রদের জন্ত লেখা নয়, তার মূল্যও ছিল অত্যধিক। দেশীয় ছাত্রদের অভাব মেটাবার উদ্দেশ্যেই খ্রীঃ ১৮১৭ অব্দে 'কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি' স্থাপিত হয়। ৪ জন বাঙালী হিন্দু, ৪ জন মুসলমান মৌলবী ও বাকী ১৬ জন ইউরোপীয় নিয়ে পরিচালক সমিতি গঠিত হয়। সকলের শীর্ষভাগে ছিলেন উইলিয়ম কেরি, আর বাঙালীদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন তারিণীচরণ মিত্র, রাজা রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন প্রভৃতি। সাহেবদের মধ্যে ডেভিড্ হেয়ারও অন্যতম সদস্য ছিলেন। সংস্কৃত, ইংরেজি ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় (বাঙলা, হিন্দুস্থানী) সাহিত্য, গণিত, ভূগোল, ইতিহাস প্রভৃতি পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও বিনামূল্যে তা বিতরণ ছিল সমিতির কাজ। বাঙলা দেশের নবোন্মেষিত জিজ্ঞাসা যে তাঁরা পরিতৃপ্ত করেন ও পরিপুষ্ট করেন, এইটাই প্রধান কথা—সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁদের কোনো সাক্ষাৎ দান থাক বা না থাক। এজন্ত প্রথম উল্লেখযোগ্য—'নীতিকথা' (খ্রীঃ ১৮১৮)। সামান্য জিনিস হলেও তিনজন মহারথী এর লেখক—তারিণীচরণ মিত্র, রাজা রাধাকান্ত দেব ও রামকমল সেন। রাজা রাধাকান্ত দেবের (খ্রীঃ ১৭৮৪-খ্রীঃ ১৮৬৭) কীর্তিও (দ্রঃ যোগেশচন্দ্র বাগল—উঃ শঃ বাঙলা) এ প্রসঙ্গেই উল্লেখ করা যেতে পারে।

বিদ্যোৎসাহী রাধাকান্ত দেব (১৭৮৪-১৮৬৭) ক্লাইভের মুন্সি নবকৃষ্ণের পৌত্র, কলিকাতার রাজবাটীর প্রধান কর্তা. এবং সংস্কৃত, ইংরেজি, বাঙলা, ফারসী প্রভৃতি বহু ভাষায় সুপণ্ডিত। এসব কারণে তিনি কলিকাতার ইংরেজ, বাঙালী সকলের নিকট—বাঙালী সমাজের অবিসংবাদিত নায়ক রূপে পরিগণিত হন। স্বভাবতই সমাজপালক হিসাবে তিনি চেয়েছেন ইংরেজি শিক্ষার জোয়ারের জলকে বাঁধ বেঁধে দেশের চিরন্তন খাতে প্রবাহিত করাতে।

তাই, হিন্দু কলেজ থেকে স্কুল বুক সোসাইটি পর্যন্ত শিক্ষাপ্রসারের এমন কোন আয়োজন নেই যাতে রাধাকান্ত দেব ছিলেন না, যাতে আন্তরিকভাবে তিনি সহায়তা দান করেননি। তথাপি রাজা রাধাকান্ত দেবকেই হতে হয় সতী-দাহ নিবারণ আইনের বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ হয় তার একজন নেতা, 'ধর্মসভার' প্রতিষ্ঠাতা, ইংরেজি শিক্ষার বিরুদ্ধে প্রাচ্যশিক্ষার ('ওরিয়েণ্টালিস্ট') যে দাবী তার অন্যতম প্রবক্তা। 'ইয়ং বেঙ্গলে'র বিদ্রোহে তটস্থ যে-সব (নব্যতন্ত্রের পক্ষীয় প্রসন্নকুমার ঠাকুরও ছিলেন) সমাজ-কর্তা ডিরোজিওর হিন্দু কলেজ থেকে বিতাড়নের জন্য দায়ী, রাজা রাধাকান্ত দেবও তাঁদের একজন। হিন্দু কলেজকে চতুর্থ দশকে খ্রীষ্টধর্মের গ্রাস থেকে রক্ষার জন্যও তিনি ছিলেন বদ্ধপরিকর। অর্থাৎ সামাজিক কারণে ও আপন অভিজাত রুচিতে রাধাকান্ত দেব ছিলেন রক্ষণশীল, কিন্তু তাঁকে সম্পূর্ণ প্রতিক্রিয়াশীল বলা অসম্ভব। মনস্বী রাধাকান্ত দেব নূতন কালের জ্ঞানালোককে অস্বীকার করবেন কি করে? শিক্ষাক্ষেত্রে—এমন কি স্ত্রীশিক্ষায়ও—তাঁর যত্ন, দান, উৎসাহ কারও থেকে কম নয়। আর একদিকে তিনি সমস্ত সমসাময়িকদের থেকে শ্রেষ্ঠ—'শব্দকল্পদ্রুম' বা সংস্কৃত ভাষায় এন্‌সাইক্লোপীডিয়া (১৮১৯-১৮৫৮) সংকলন করে প্রাচীন ধারার সমস্ত ভারতীয় বিদ্বজ্জনদের তিনি নূতন জ্ঞানের ক্ষেত্রে সম্মেলিত করবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সংস্কৃতের গৌরব সেদিন তখন অস্তমিত, সংস্কৃত ভাষা আর নূতন জ্ঞানের বাহন হতে পেল না। রাজা রাধাকান্ত দেব নিজে সামান্যই বাঙলায় লিখেছেন; তাই বাঙলা সাহিত্য তাঁর আশ্রয় পেয়েছে, কিন্তু তাঁর মনীষার দান বিশেষ লাভ করে নি।

রামকমল সেন (১৭৮৩-১৮৪৪) রাজা রাধাকান্ত দেবের সহযোগী ও মতাবলম্বী। শুধু বাঙলা 'হিতোপদেশ' ও দু'-একটি বাঙলা নিবন্ধ (যেমন 'বঙ্গদেশের পুরাবৃত্ত', খ্রীঃ ১৮৩০) দিয়ে মনীষী রামকমল সেনেরও কর্মের পরিমাপ হয় না। তাঁর ৫৮ হাজার শব্দের ইংরেজী-বাঙলা অভিধান (খ্রীঃ ১৮৩৪) সেদিনের এক প্রধান কীর্তি। স্কুল বুক সোসাইটি থেকে পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করে তাঁরা বাঙলা ভাষাকে সেবা করেছেন নিঃসন্দেহে। কিন্তু বাঙলা ভাষায় আত্মপ্রকাশ না করে এঁরা নিজেরাও একদিকে বঞ্চিত হয়েছেন। এঁরা অনেক দিকেই ছিলেন রামমোহনের প্রতিপক্ষ; বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই পর্ব রামমোহনের নামেই নামাঙ্কিত হয়; রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন উভয়

থেকে যান। পরবর্তী কালে অবশ্য রামমোহন অপেক্ষা ইয়ং বেঙ্গলের বিদ্রোহ এই রামমোহনের প্রতিপক্ষদেরও যেমন বিচলিত করে, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের (১৮১৭-১৯০৫) মতো রামমোহনের ভাব-শিষ্যকেও তেমনি খ্রীষ্টানী আক্রমণের বিরুদ্ধে সক্রিয় করে। তাই দেবেন্দ্রনাথের উদ্যোগে এই দুই দল হিন্দুই একত্রিত হন, ও ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশনে (১৮৫৪) রাজনৈতিক স্বার্থে সহযাত্রী হন।

স্কুল বুক সোসাইটির এক বৎসর পরেই স্থাপিত হয় স্কুল পরিচালনার জন্য **'কলিকাতা স্কুল সোসাইটি'** (খ্রীঃ ১৮১৮), আর পরে মিশনারিদের শ্রীরামপুর কলেজ। পূর্বেই তাঁরা বহু বাঙলা পাঠশালা পরিচালনা করতেন। স্কুল ও কলেজের জন্য পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নেও উইলিয়ম কেরির সহযোগীরা অগ্রসর হন। শিক্ষা-সাহিত্য প্রকাশে ব্রতী এসব পাদ্রিদের মধ্যে ছিলেন বর্ধমানের স্টুয়ার্ট, মালদহের এলার্টন, চুঁচুড়ার হার্লি, মে ও পিয়ার্স'ন, আর সর্বোপরি শ্রীরামপুরের ফেলিক্স কেরি, জন ক্লার্ক মার্শম্যান, পীয়ার্স প্রভৃতি। তাঁরা 'স্কুল বুক সোসাইটি'র সঙ্গে অনেক সময়েই এক যোগে কাজ করতেন। ইংরেজি পাঠ্য-পুস্তকও তাঁরা প্রণয়ন করেছেন। স্বভাবতঃই বেশির ভাগ বাঙলা পাঠ্য-পুস্তকই অনুবাদ বা অনুবাদমূলক রচনা। এ প্রসঙ্গেই তাই এসব মিশনারিদের কিছু কিছু অনূদিত বা রচিত পাঠ্যপুস্তক জাতীয় গ্রন্থের কথাও সংক্ষেপে উল্লেখ করা যেতে পারে। অবশ্য এ পর্ব ছাড়িয়ে অন্য পর্ব পর্যন্ত (১৮৪৩-'৫৭) তা সমভাবে চলে, তা মনে রাখা উচিত; এবং খ্রীষ্টধর্মের প্রচার-পুস্তক ও অন্যান্য প্রকাশনও সেই সঙ্গে পাদ্রিরা সমভাবে চালিয়েছেন, তাও জানা কথা।

মিশনারিদের লিখিত পুস্তক-সমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য : উইলিয়ম কেরির জ্যেষ্ঠ পুত্র **ফেলিক্স কেরির** (খ্রীঃ ১৮২২) কৃত (১) বিদ্যাহারাবলি (খ্রীঃ ১৮১৯) নামক একখানি ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা বিষয়ক পুস্তক; (২) গোল্ড্স্মিথ্-এর ইংরেজিতে লেখা ইতিহাস অবলম্বনে 'ব্রিটিশ দেশীয় বিবরণ সঞ্চয়' নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থ (১৮১৯-২০); এবং (৩) বানিয়ন-এর 'পিলগ্রিম্স্ প্রোগ্রেস্'-এর অনুবাদ 'যাত্রাগ্রসরণ' (১৮৩৮)—এ গ্রন্থের দ্বিতীয় অনুবাদ করেন সাটন। এ জাতীয় সাহিত্য গ্রন্থের অনুবাদ—যেমন, জনসনের 'রাসেলাস' থেকে একেবারে 'টেলিমেকস ও 'ভ্রান্তিবিলাস' পর্যন্ত—পাঠ্যপুস্তক রূপেই বাঙলা গদ্য সাহিত্যের বিকাশের এই প্রথম পর্বে বাঙলা ভাষার সীমানা কতকটা প্রসারিত করেছে। যাই হোক, ফেলিক্স্ কেরি পিতার উপযুক্ত সন্তান,

আবাল্য বাঙলা দেশে বাস করে বাঙলা ভাষা হয়ত তিনি পিতার অপেক্ষা বেশি জানতেন। কিন্তু শত হলেও মৌলিক রচনায় তিনি হাত দেননি।

জশুয়া মার্শম্যানের পুত্র জন ক্লার্ক মার্শম্যান-এর নাম ইতিহাসের পাঠ্য-পুস্তকের জন্ত এদেশে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। তাঁর ইংরেজিতে লিখিত ভারত-বর্ষের ইতিহাস ও বঙ্গদেশের ইতিহাস উনিশ শতকে স্কুল-কলেজে বরাবর পঠিত হত। এ পর্বের শেষে তাঁর (১) ভারতবর্ষের ইতিহাসের বাঙলা অনুবাদ (খ্রী: ১৮৩১) ও (২) ইংরেজি ও বাঙলা দু ভাষায় 'পুরাবৃত্তের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (খ্রী: ১৮৩৩) প্রকাশিত হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় মার্শম্যানের ইংরেজিতে লিখিত বাঙলার ইতিহাস অবলম্বনেই 'বাঙ্গালার ইতিহাস (দ্বিতীয় ভাগ)' লিখেছিলেন (খ্রী: ১৮৪৭-৪৮)। তাই এদেশের ইতিহাস চর্চার ইতিহাসে জন ক্লার্ক মার্শম্যানের দান স্মরণীয়।

এ কারণেই খ্রী: ১৮৩০ অব্দে কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত 'প্রাচীন ইতিহাস সমুচ্চয়' মূল্যবান্। কারণ বিদ্যাসাগরের পূর্বেও বিশেষ করে মার্শম্যানের গ্রন্থের আদর্শে অনেক বাঙালী ইতিহাস-গ্রন্থ লেখেন—যেমন, রাজেন্দ্রলাল মিত্রের অগ্রজ গোপাললাল মিত্র ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (গোল্ডস্মিথের ইংরেজি থেকে 'গ্রীক দেশের ইতিহাস' খ্রী: ১৮৩৩-এ প্রকাশিত), গোবিন্দচন্দ্র সেন ('সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সমিতি'র দ্বারা অংশতঃ প্রকাশিত অনুবাদ 'বাঙলা ইতিহাস') ইত্যাদি। বিদ্যাসাগরের সমকালে (ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রেরণায়?) প্রকাশিত হয় বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত 'ভারতবর্ষীয়েতিহাস সার সংগ্রহ' (খ্রী: ১৮৪৮)। উল্লেখযোগ্য এই যে এটি হিন্দুপক্ষ থেকে মার্শম্যানের প্রতিবাদে লেখা ইতিহাস। কারণ, মার্শম্যান, 'হিন্দুবালকদিগকে ভুলাইয়া খ্রীষ্টিয়ান করিবার মানসেই' হিন্দুদের সম্বন্ধে মিথ্যা কথা লিখেছেন। ইতিহাসের ক্ষেত্রেও (হিন্দু) জাতীয়তাবাদ ক্রমে প্রবেশ করবে, বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইতিহাস থেকে তা বুঝতে পারি। অবশ্য এ হচ্ছে তত্ত্ববোধিনীর লেখা।

আসলে জাতীয় আত্মমর্যাদাবোধ যে জাগ্রত হচ্ছিল স্বয়ং রামমোহনই তার প্রমাণ। তবে তিনি যুক্তি-বিচারের পথে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান গ্রহণ করে দেশের পুনরুজ্জীবন পরিকল্পনা করছিলেন; আর তাঁর সনাতনী প্রতিপক্ষরা সাধারণভাবে ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক নানা সংঘাতে তটস্থ হয়ে

চাইছিলেন ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করে ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে জাতীয় ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রাখতে। সমস্ত উনবিংশ শতাব্দী ধরেই এ দু'ধারায় ক্রমসংঘাত চলেছে, তাও আমরা যতই অগ্রসর হব ততই প্রত্যেক পর্বে দেখতে পাব। রামমোহন পাদ্রিদের সঙ্গে যুদ্ধে নেমেছিলেন ভারতীয় সভ্যতার সপক্ষে, হিন্দু রক্ষণশীলদের সঙ্গে যুদ্ধে নেমেছিলেন বুর্জোয়া জীবনাদর্শের সপক্ষে—রক্ষণশীলদের শাস্ত্রবচনকে শাস্ত্রবচনেই খণ্ডিত করে। এসব যুদ্ধ চলেছে প্রধানতঃ নানা প্রচার ও বিতর্ক পুস্তিকায়, এবং নবপ্রতিষ্ঠিত নানা সংবাদপত্রে।

(৩) সাময়িকপত্র ও সংবাদপত্রের সূচনা (১৮১৮–১৮৩১)

ইংরেজ-প্রাধান্য স্থাপিত হলে সংবাদপত্রও যে প্রাদুর্ভূত হবে তা জানা কথা। 'ফোর্থ এস্টেট্' রাজনৈতিক চেতনার ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রধানতম বাহন। অষ্টাদশ শতাব্দীতেই ইংলণ্ডে ইংরেজের জীবন-যাত্রার তা অঙ্গ হয়ে গিয়েছে। ভারতবর্ষেও প্রথম ইংরেজি সংবাদপত্র প্রকাশিত হল (খ্রীঃ ১৮৩০) হিকি'স্ 'বেঙ্গল গেজেট'। বাঙলা মুদ্রাযন্ত্র তখনো স্থাপিত হয়নি। শ্রীরামপুরের পাদ্রিরাই যেমন প্রথম মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা (১৮০০) তেমনি প্রথম বাঙলা সংবাদপত্রও তাঁরাই প্রকাশিত করেন। গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের 'বাঙ্গালা গেজেটি' হয়ত শ্রীরামপুরের 'সমাচার দর্পণে'র (মে, ১৮১৮) কিছুদিন পূর্বে প্রকাশিত হয়ে থাকবে। কিন্তু 'বাঙ্গালা গেজেটি' স্থায়ী হয়নি, তার নিদর্শনও কেউ দেখেনি। সকলের পূর্বে প্রকাশিত হয় শ্রীরামপুর মিশনারিদের 'দিগ্‌দর্শন' (এপ্রিল, ১৮১৮)। তবে 'দিগ্‌দর্শন' সাপ্তাহিক-পত্র নয়, মাসিকপত্র ; সংবাদ অপেক্ষা শিক্ষার্থীদের জন্য তথ্যপরিবেষণই ছিল দিগ্‌দর্শনে'র উদ্দেশ্য। সরকারও এ পত্রের প্রতি সদয় ছিলেন। প্রায় ২৬ সংখ্যা পর্যন্ত এ মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়ে বন্ধ হয়ে যায়। পশ্বাবলি কে (১ম পর্যায়, ১৮২২-২৭) এক ধরনের 'গ্রন্থ' বলাই শ্রেয়ঃ, মাসে এক সংখ্যায় এক-একটি পশুর কথা তাতে প্রকাশিত হত। আসলে প্রথম সংবাদপত্র 'সমাচার দর্পণ'। তার অনুসরণে আরও প্রায় ২৮খানি সংবাদপত্র এ সময়ে (ইং ১৮৩১) প্রকাশিত হয়। প্রায়ই তা স্বল্পায়ু, আর প্রায়ই তা বিস্মৃত।

(ক) **সমাচার দর্পণ** (১৮১৮): খ্রীঃ ১৮১৮ সনে, 'দিগ্‌দর্শনে'র একমাস পরেই, 'সমাচার দর্পণ' প্রথম প্রকাশিত হয় (মে, ১৮১৮)। 'সমাচার দর্পণ' খ্রীঃ ১৮৪০ পর্যন্ত চলে। মাঝে দ্বিসাপ্তাহিক পত্রও হয়েছিল। ইংরেজি 'ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া'ও শ্রীরামপুরের মিশনারিদের এ সময়কার এরূপ আর এক উদ্যোগ। খ্রীঃ ১৮১৮র মে মাসেই তা আরম্ভ হয়। প্রস্তুতির পর্বের বাঙলা সাহিত্যের বহু সংবাদ তার পাতা থেকেই সংগ্রহ করতে হয়। আর 'সমাচার দর্পণের যে মূল্য কী, তা ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সংবাদ পত্রে সেকালের কথা' না দেখলে যথার্থ উপলব্ধি করা যায় না। জন ক্লার্ক মার্শম্যান 'সমাচার দর্পণে'র প্রথম সম্পাদক। কিন্তু মার্শম্যান বিশেষ লিখতেন কি না সন্দেহ—তিনি অনন্যসাধারণ কর্মী পুরুষ—পাঠ্যপুস্তকের লেখক হিসাবে আমরা তাঁর পরিচয় পেয়েছি। 'সমাচার দর্পণে'র লেখার ভার বাঙালী পণ্ডিতদের উপর ছিল, এ অনুমান মিথ্যা মনে হয় না। তার মধ্যে জয়গোপাল তর্কালঙ্কার একজন। কিন্তু কেরি ও ম্যার্শম্যানের মত বস্তুনিষ্ঠ ইংরেজ কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণেই এই পণ্ডিতেরা চালিত হতেন। তাই 'সমাচার দর্পণের' ভাষায় যে সারল্য, লেখায় যে তথ্যবোধ ও মাত্রাজ্ঞান দেখা যায়,—তাতে এই ইংরেজ পুরুষদের প্রভাব অনুমান করতে হয়। মিশনারিদের পক্ষে একটি বিশেষ গৌরবের কথা—এমন পত্রিকাকে তাঁরা একেবারে খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারের বা সাম্প্রদায়িক বিতর্কের আসর করেন নি। স্বভাবতই 'সমাচার দর্পণে'র খ্রীষ্টান মতবাদের দিকে পক্ষপাতিত্ব ছিল। সংবাদপত্র হলেও দেশবাসীর মনে স্বাধীনতাবোধের প্রেরণা তা যোগায় নি। কিন্তু আধুনিক কালের ভাষায় 'সমাচার দর্পণ'কে বলা যায় সেদিনের প্রগতিবাদী পত্রিকা (দ্রঃ 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'র উদ্ধৃতিসমূহ)।

(খ) **'সম্বাদ কৌমুদী'** (১৮২১): রামমোহন রায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত 'সম্বাদ কৌমুদী' (ডিসেম্বর, ১৮২১) হয়ত প্রথম জাতীয় জাগরণের আসর হতে পারত। তার প্রকাশক ছিলেন তারাচাঁদ দত্ত ও ভবানী-চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু নূতন শিক্ষা ও আদর্শের ফলে তার পূর্বেই হিন্দু সমাজে সংঘাত বেধেছে—সে সংঘাত নানা পর্বে চলে। সংবাদপত্রের পরিচালনাতেই তা বিশেষ করে দেখা দেবার কথা। অচিরেই তা দেখা দিল। ১৮২১-এর ডিসেম্বর মাসে 'কৌমুদী' প্রথম প্রকাশিত

হয়। রামমোহন তাতে লিখতেন, তাঁর সতীদাহ-বিরোধী মতবাদও প্রকাশ করেন। কিন্তু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় হিন্দু রক্ষণশীলদের প্রবল নেতা। তিনি এ পত্রিকার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করে 'সমাচার চন্দ্রিকা' প্রকাশ করলেন। 'সম্বাদ কৌমুদী' হিন্দু সমাজের সমর্থন হারিয়ে ক্রমে বন্ধ হয়ে যায়। অবশ্য রামমোহনও তৎকালীন নবপ্রবর্তিত মুদ্রাযন্ত্র আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সংবাদ-পত্র প্রকাশ বন্ধ করেন। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার জন্য আবেদনের (১৮২৩) তিনি ছিলেন প্রধান একজন উদ্যোক্তা।

(গ) 'সমাচার চন্দ্রিকা' (খ্রীঃ ১৮২২) গোঁড়া বাঙালী সমাজের মুখপাত্র রূপে 'সমাচার দর্পণে'র প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়ায়। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৭৮৭-১৮৪৮) বাঙালী সম্পাদকদের মধ্যে প্রথম সম্পাদক, এবং সত্যই শক্তিশালী ব্যক্তি ও লেখক। সে সময়কার বাঙলা সংবাদপত্র-জগতের তিনি প্রধান ব্যক্তি, আর গদ্য সাহিত্যের প্রথম সাহিত্য-প্রণেতা। হিন্দুদের সমর্থন লাভ করাতে 'সমাচার চন্দ্রিকা'র প্রচার বাড়ে, ১৮২৯ (এপ্রিল) সনে তা অর্ধসাপ্তাহিক হয়। এই পত্রিকার পাতাতেই হিন্দু কলেজের ছাত্রদের বিষয়ে হিন্দু কর্তাদের সত্যমিথ্যা অভিযোগ প্রকাশিত হয়, 'সমাচার দর্পণে' তার উত্তর প্রকাশিত হত (দ্রঃ—সঃ পঃ সেঃ কথা)। 'ইয়ং বেঙ্গলের বিদ্রোহ যখন ধূমায়িত তখন রক্ষণশীলদের তটস্থ হবারই কথা। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ইংরেজি 'এনকোয়ারার'-এ যাকে 'গুড়ুম সভা' বলেছেন, সেই 'ধর্মসভার' মতবাদই ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্রে প্রকাশিত হবে, তা জানা কথা।

(ঘ) 'বঙ্গদূত' (খ্রীঃ ১৮২৯): নীলমণি হালদারের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। এটি হিন্দু সংস্কারবাদীদের নূতন প্রয়াস। রামমোহন ও তাঁর অনুগামীরা 'বঙ্গদূতে'র পরিচালকমণ্ডলীতে ছিলেন। এ পত্রের বেশ কিছুটা প্রভাব ছিল। এদেশে ইংরেজরা জমির মালিক হয়ে বাস করুক, নীলের চাষ চলুক, ইত্যাদি রামমোহন-দ্বারকানাথ প্রমুখ প্রগতিধর্মী ব্যক্তিদের 'কলোনিজেশন' নামে পরিচিত) মতবাদের প্রধান বাহক ছিল 'বঙ্গদূত'। কিন্তু তখন পর্ব শেষ হচ্ছে, অবশ্য সংবাদপত্রের ক্রেতাও কতকটা স্থির হয়ে এসেছে।

এ পর্বের শেষে খ্রীঃ ১৮৩১এর ফেব্রুয়ারিতে প্রথম প্রকাশিত হয় 'সম্বাদ প্রভাকর'—সাহিত্যের দিক থেকে 'সম্বাদ প্রভাকর আর এক ধারায়

সূচনাকারী সংবাদপত্র। মনে রাখতে পারি—তখন 'ইয়ং বেঙ্গলের' বিদ্রোহে হিন্দু সমাজে 'গেল' 'গেল' রব উঠেছে। সে বিদ্রোহ ইংরেজি ভাষাতেই আত্মঘোষণা করত। তথাপি খ্রীঃ ১৮৩১এ প্রথম প্রকাশিত 'জ্ঞানান্বেষণ'-এ (১৮৩১-১৮৪০) দক্ষিণানন্দ (দক্ষিণারঞ্জন) মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বাঙলা ভাষায় তাঁদের মতবাদের কিছু প্রমাণ দিয়ে গিয়েছিলেন। তা তাঁদের পক্ষেও সৌভাগ্যের কথা না হলে তাঁরা বাঙলা সংবাদপত্রের (১৮৪২-৪৯) স্মরণীয় হতেন না। এ সঙ্গেই স্মরণীয় সে সময়কার সংবাদপত্রের মধ্যে 'জ্ঞানোদয় (খ্রীঃ ১৮৩১) 'বিজ্ঞান সেবধি (খ্রীঃ ১৮৩২), 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় (খ্রীঃ ১৮৩৫)। এসবে জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত হচ্ছিল। এসব বাঙলা পত্রের অগ্রদূত।

বাঙালী সমাজে এসব সংবাদপত্রের দান অনুমান করা যায়। অবশ্য মনে রাখা দরকার—শিক্ষিত ও কলিকাতা হুগলী প্রভৃতি শহুরে লোকেরাই এসবের পাঠক ছিলেন। সেদিনে তাঁদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। এঁদের মধ্যেও অধিকাংশই ছিলেন ইংরেজি জানা; এবং ইংরেজি তাঁরা বেশি লিখতেন, বেশি পড়তেন—ইংরেজি সংবাদপত্রেরও তাই প্রতিষ্ঠা ও সমাদর ছিল বেশি। এসব বাঙলা সংবাদপত্রের অপেক্ষা সামাজিক মতবাদ গঠনে ইংরেজি সংবাদপত্রের দান বরং বেশিই ছিল (যেমন, পাদ্রিদের ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া হরকুরা ইয়ং বেঙ্গলের এনকোয়ারার, বেঙ্গল স্পেকটেটর প্রভৃতি)।

বাংলা সংবাদপত্র প্রধানতঃ দু'টি উদ্দেশ্য সাধন করেছে—এক, শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য। বাঙলা সংবাদপত্র জ্ঞান-বিজ্ঞানের তথ্য বাঙলা ভাষায় জুগিয়ে সমাজের চেতনাকে প্রসারিত করেছে। এ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা বড় দান প্রথম 'সমাচার দর্পণে'র ; পরে 'জ্ঞানান্বেষণে'র, 'জ্ঞানোদয়ে'র (ছাত্রদের উদ্দেশেই এই মাসিক প্রকাশিত হত), শেষে 'তত্ত্ববোধিনী'র (১৮৪৩)। দুই, ভাষা ও সাহিত্য-গঠন। যে আটপৌরে বাঙলা গদ্য গড়ে না উঠলে সামাজিক চেতনা আত্মপ্রকাশের পথ পায় না সে গদ্য গঠনে সংবাদপত্রই সর্বাপেক্ষা বড় ক্ষেত্র হয়ে ওঠে। সংবাদের সঙ্গে শুধু তথ্য জুগিয়েও সংবাদপত্রের চলত না ; সেই সঙ্গে লোকের মনোরঞ্জনেরও চেষ্টা করতে হত। সরস লেখা যোগাবার চেষ্টায় সাহিত্যিক রচনারও তাই প্রয়োজন হয়। 'সমাচার চন্দ্রিকা'র পরেই এক্ষেত্রে 'প্রভাকরে'র উদয় হয়। অবশ্য পরযুগে 'তত্ত্ববোধিনী'র পরে সাময়িক-পত্র সাহিত্যেরই উর্বর ক্ষেত্র হয়ে ওঠে—আর আজও তা আছে।

(৪) সাহিত্য-রচনার প্রয়াস

বাঙলা সংবাদপত্রের আসরেই বাঙলা গদ্য-সাহিত্য রচনার প্রথম প্রয়াস দেখা দেয়। বাঙলা ভাষার জন্ম থেকেই বাঙালী প্রায় সাহিত্য রসের রসিক। গদ্যের জন্ম হতেই গদ্যেও যে রস পরিবেষণের চেষ্টা হবে, তা অনুমান করা যায়। ফোর্ট উইলিয়মের ছাত্রপাঠ্য ভাষা-শিক্ষার পুস্তক বা রামমোহন-মৃত্যুঞ্জয়-কাশীনাথের শাস্ত্রীয় যুক্তির কচকচিতে অবশ্য রস-সৃষ্টির অবকাশ বেশি ছিল না গদ্যভাষা তৈরী হচ্ছিল মাত্র। আর মৃত্যুঞ্জয় যে সচেতন শিল্পী, তা আমরা পূর্বেই বলেছি। অন্যদিকে, তর্কের প্রয়োজনেই মৃত্যুঞ্জয়-রামমোহন প্রভৃতিও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের আশ্রয় নিচ্ছিলেন। অবশ্য 'সমাচার দর্পণে'ও সেরূপ ব্যঙ্গ-রচনা সামান্য কিছু ছিল।

স্বভাবতই নূতন যুগ ও পুরাতন যুগের সংঘাতকালে বিদ্রূপ দু'পক্ষেরই এক প্রধান অস্ত্র হয়ে ওঠে। দু'পক্ষের কৃতী পুরুষেরাই তা দিয়ে পাঠকের তর্ক-শ্রান্ত মনকে জাগিয়ে রাখতে পারেন। তবে একটা সাধারণ কথা আছে—সংস্কারবাদীরা নূতন আদর্শ প্রবর্তন করতে চান বলে প্রায়ই সাধারণের সমর্থন তাঁদের পক্ষে থাকে না, যুক্তি ও সহিষ্ণুতা দিয়ে সর্বাগ্রে তাঁদের তা অর্জন করতে হয়। রুচি, আদর্শ ও যুক্তির নিয়ম লঙ্ঘন করে ব্যঙ্গের শরক্ষেপণ তাই তাঁদের পক্ষে শক্তির অপচয়। অপর পক্ষে, রক্ষণশীলেরা সহজ সমর্থনে সুরক্ষিত, বিপক্ষকে শরাঘাতে তাঁদের শক্তির সার্থকতা, ন্যায়-অন্যায় যে কোন রূপ বিদ্রূপে তাঁদের লক্ষ্যচ্যুতি ঘটবার কারণ নেই। এই কারণে বিদ্রূপ-বিলাসীরা সহজেই প্রধানতঃ রক্ষণশীলদের দলে যোগদান করা সুবুদ্ধির কাজ মনে করেন,—মতামত যাঁর যা-ই হোক। অন্ততঃ আজও পর্যন্ত বাঙলা সাহিত্যে এ কথাটা মোটামুটি সত্য। আমাদের সাহিত্যে সুইফ্‌ট্ জন্মেন নি, বার্নার্ড শ' নেই। যাঁরা জি. বি. এস্-এর ব্যঙ্গের অনুকরণ করেন তাঁরা জি. বি. এস-র মত যুক্তিবাদী, সমাজ-বিপ্লবী নন বরং পরিবর্তনের বিরোধী। ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধের সে-সব বিদ্রূপ-বিশারদদের বিদ্রূপ যে এখন অপাঠ্য ঠেকে, তা কিন্তু তাঁদের দোষ নয়। তখন পর্যন্ত বাঙালী সমাজে সাধারণভাবে নূতন শিক্ষা ও সংস্কৃতি ব্যাপক হয়নি, আধুনিক জীবনাদর্শ সম্মান লাভ করেনি, গতানুগতিক রুচির স্থূলতা আধুনিকভাবে মার্জিত হতে আরম্ভ করেনি। এক কথায়, আধুনিক জীবনাদর্শ ও সাহিত্যাদর্শ স্থাপিত

হয়নি। অথচ সংস্কৃতের ঐতিহ্যের মধ্যে স্বচ্ছ হাস্তরস যথার্থই ছিল। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বা শিবায়নে তা বাঙালী হাস্তরসে পরিণত হয়েছে। মধ্যযুগের অন্ত্যকালীন পচন-ধরা সমাজে তা একদিকে সাহিত্যে পরিণত হয়েছে নারীগণের পতিনিন্দায়, সতীনের কলহ ইত্যাদিতে, অন্তদিকে লৌকিক আমোদে, যাত্রায়, খেউড়ে, গোপাল ভাঁড়ের 'রসিকতায়'। এ ঐতিহ্যেই ঊনবিংশ শতকের রক্ষণশীলদেরও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ রচিত। তথাপি সে সম্বন্ধে প্রধান বড় কথা এই—প্রথমতঃ, তা এই অনুবাদ ও সংকলনের যুগের প্রথম মৌলিক রচনার প্রয়াস। দ্বিতীয়তঃ, তা এই নিছক ও প্রায় নীরস গন্ত-রচনার যুগের একমাত্র সরস রচনার প্রয়াস। আর এ দু'টি কথাতেই আমাদের সে সাহিত্যের দৈন্তের পরিচয় স্পষ্ট।

এ চেষ্টায় একজন লেখকই স্মরণীয়—**ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়** (খ্রীঃ ১৭৮৭-১৮৪৮)। বাঙালী সাংবাদিক ও সম্পাদকরূপেও তিনি প্রকৃতপক্ষে প্রথম গণ্য—'সমাচার চন্দ্রিকা'র (৫ই মার্চ, ১৮২২) তিনিই সম্পাদক ও প্রতিষ্ঠাতা; 'সম্বাদ কৌমুদী'রও (ডিসেম্বর, ১৮২১) তিনিই প্রথম হতে ১৩শ সংখ্যা প্রকাশ করেন। ভবানীচরণের জীবনীকাররা বলেছেন (খ্রীঃ ১৮৪৯), "এ পত্রকে এতদ্দেশীয় ভাষা পরিবর্তনের মূল সূত্র বলিতে হয়।" তা ছাড়া, তিনি যে 'ধর্মসভা'র (১৮২৯) প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক তাও আমরা জানি। এই 'ধর্মসভা'র উদ্যোগে তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর একখানি ক্ষুদ্র জীবনচরিত প্রকাশিত হয় (দ্রঃ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লিখিত 'কলিকাতা কমলালয়ের' ভূমিকা, ও 'নববাবু বিলাসের' ভূমিকা)। তাতে মোটের উপর ভবানীচরণের কর্মজীবনের ও কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। খ্রীঃ ১৮৪৮ সনে তাঁর মৃত্যু হয়—ততক্ষণে যা কিছু তাঁদের বক্তব্য ছিল তা নিঃশেষ হয়েছে, সমস্তার মীমাংসা না হলেও বিচার শেষ হয়ে এসেছে। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' পাঁচ বৎসর চলেছে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' (খ্রীঃ ১৮৪৭) প্রকাশিত হয়েছে—ইউরোপে অবশ্য ইং ১৮৪৮এ বিপ্লবের ঝড়। তথাপি ভবানীচরণের জীবনচরিত দেখলে সন্দেহ থাকে না যে, রামমোহন রায়ের এই প্রতিপক্ষ ও রক্ষণশীল হিন্দুদের অন্ততম নেতা সত্যই সুপণ্ডিত, উদ্যোগী ও অসাধারণ কর্মকুশল পুরুষ ছিলেন। আর, সেই সঙ্গে দেখি—সত্যই বাঙলা ভাষা তিনি লিখতে জানতেন, ভালোবাসতেন; বিদ্রূপ রচনায় তাঁর হাত ছিল,

কিন্তু রুচি তখনো মার্জিত হয় নি। তাঁর রুচি, তাঁর নীতি, তাঁর মতবাদ—কতকটা তাঁর কালের রক্ষণশীলদের, কতকটা যে-কোন কালের প্রতিক্রিয়াশীলদের সহজ গুণ ও সহজ দোষ।

ভবানীচরণের প্রধান পরিচয় 'সমাচার চন্দ্রিকা' (খ্রীঃ ১৮২২?), ছাড়া এই ৪ খানি গ্রন্থ—(১) 'নববাবু বিলাস' (১৮২৩?), 'প্রমথনাথ শর্মা' নামে লিখিত; (২) 'কলিকাতা কমলালয়' (১৮২৩?); (৩) 'দূতীবিলাস' (খ্রীঃ ১৮২৫) পদ্যে রচিত; (৪) 'নববিবি বিলাস' (খ্রীঃ ১৮৩০?)—ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই ছদ্মনামে একটি সংস্করণ চলিত। এ ছাড়া গীতা, ভাগবত, প্রাচীন শাস্ত্র-গ্রন্থও ভবানীচরণ গদ্যে পদ্যে রচনা করেছিলেন।

এই চারখানা পুস্তকের মধ্যে 'নববিবি বিলাস' ও 'দূতীবিলাস' তাঁর গুণগ্রাহীরাও এখন আর পুনর্মুদ্রণে সাহসী হবেন না। একটিতে কুলটা স্ত্রীর গঞ্জনা ব্যপদেশে, অন্যটিতে তৎকালীন ঐতিহ্যে দূতী-কর্ম-বর্ণনে তিনি যে বাড়াবাড়ি করেন তাকে কালের দোহাই দিয়েও কেউ বরদাস্ত করতে পারেন না। বাকী ২ খানার মধ্যে পদ্যাংশ অনেক—লেখকের পদ্যের উপর মায়া আছে।

'কলিকাতা কমলালয়' (দ্বিতীয় গ্রন্থ) বিদেশীর ও নগরবাসীর প্রশ্নোত্তরে কলিকাতার 'বিষয়ি ভদ্রলোকের ধারা', 'যাবনিক ও সাধু ভাষার বিবরণ', কলিকাতার পাঠশালা, স্কুল প্রভৃতিতে বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা প্রভৃতি নানা বিষয় বিবৃত হয়েছে। তথ্য যথেষ্ট আছে, কৌতূহল থাকলে পড়া চলে। তবে ব্যঙ্গবহুল নয়। 'নববাবু বিলাসই' বিদ্রূপাত্মক রচনা—এবং ভবানীচরণের প্রধান রচনা।

নববাবু বিলাস (১৮২৩?):

> "মুনিয়া বুলবুল আখড়াই গান,
> খোষ পোষাকী যশমী দান,
> আড়ি ঘুড়ি কানন ভোজন,
> এই নবধা বাবুর লক্ষণ।"

'অঙ্কুর খণ্ড', 'পল্লব খণ্ড', 'কুসুম খণ্ড', ও 'ফল খণ্ড' এই চার খণ্ডে বাবুর কথা বিবৃত হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙলা ব্যঙ্গ-রচনায় কলিকাতার এই 'বাবু' বিবিধ ব্যঙ্গের বিষয়-বস্তু। আর গদ্য ব্যঙ্গ-রচনায় ইতিহাসে এ গ্রন্থের

সঙ্গে 'আলালের ঘরের দুলালে'র (খ্রীঃ ১৮৫৪-৫৮) যোগাযোগ অনুমিত হয়েছে (দ্রঃ দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা ৭ নং, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা ও 'নববাবু বিলাস'-এর উদ্ধৃতিসমূহ)।

বিষয়বস্তু হিসাবে 'বাবু'র সাক্ষাৎ পাওয়া যায় প্রথম 'বাবুর উপাখ্যানে'। তা 'সমাচার দর্পণের' (খ্রীঃ ১৮২১, ফেব্রুয়ারী ও জুন) দু'সংখ্যায় প্রকাশিত একটি ব্যঙ্গ রচনা। তখনো 'সম্বাদ কৌমুদী' বা 'সমাচার চন্দ্রিকা' প্রকাশিত হয়নি। লেখার তুলনা করলে মনে হয় এটি 'নববাবু বিলাসের' লেখকেরই 'বাবু' আখ্যানের প্রথম খসড়া। অনুরূপ আরও দু'একটি লেখা এ-সময়কার সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। তার পরে নববাবু বিলাসের' আবির্ভাব। মোটের উপর উনিশ শতকের প্রথম পাদে এই অশিক্ষিত বাবুরা চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছিল, ব্যঙ্গের বিষয়ও হয়েছিল। এ অবশ্য হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বেকার চিত্র। 'যে সময়ে তাহা (নববাবু বিলাস) প্রস্তুত হইয়াছিল তৎকালে বর্ণিত বাবুর আদর্শ কলিকাতায় অপ্রাপ্য ছিল না'—শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজেন্দ্রলাল মিত্র একথা বলেছেন। পাদ্রি লঙ সাহেবেরও তাই মত। 'হিন্দু কলেজ' স্থাপিত (১৮১৭) হলে নূতন শিক্ষার ব্যবস্থা হয়, তখন ভবানীচরণের মত সমাজ-কর্তৃপক্ষের ভয়ের কারণ ও বিদ্রূপের বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে প্রথমে রামমোহনের দল, পরে ইয়ং বেঙ্গল। কিন্তু 'বাবুর দল' কি তখন-তখনি বিলুপ্ত হয়েছিল? 'হুতোম পেঁচার নক্সা'য় (খ্রীঃ ১৮৬২) হয়ত পুরনো দিনের বাবুর যুগের চিত্রই অঙ্কিত হয়েছে। 'আলালের ঘরের দুলাল' (ইং ১৮৫৪-৫৮) দেখে মনে হয় শতাব্দীর মধ্যভাগেও 'বাবু'র সম্ভাবনা দূর হয় নি। 'সধবার একাদশী'র অটলের কথা মনে রাখলে বুঝব স্কুল-কলেজের যুগে বাবুদের কতটা রূপান্তর ঘটছিল—ইংরেজি স্কুলে 'বাবু ক্লাশে' তাদের ভরতি হতে হয়। তারপরে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বাবু' নামক রচনা মনে করলে শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে নতুন বাবুরা কি রূপ ধারণ করছিল তাও বুঝি। সাধারণ-ভাবে মনে হয়—'ভোতারাম দত্ত'দের যুগ শেষ হয়েছিল হিন্দু কলেজ ও ইংরেজি শিক্ষার বিস্তারে। সমাজ ও সংস্কৃতিতে তখন 'বাবু'র প্রাধান্য লুপ্ত হতে থাকে। শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে পরাশ্রয়ী নিমচাঁদের তুলনায়ও অটলবিহারীরা নিজেদের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক খর্বতা অনুভব না করে পারেনি। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত তখন শিক্ষাহীন বিত্তবানদের অপেক্ষা অধিক আদৃত।

ব্যঙ্গ রচনার ইতিহাসে 'নববাবুবিলাস প্রথম গ্রন্থ। অনেকদিন পর্যন্ত তা জনপ্রিয় ছিল; তার নাট্যরূপও দেওয়া হয়েছিল; একথা বাঙলা সাহিত্যের আর-এক দৈন্যের প্রমাণ। 'আলালের ঘরের দুলালে'র সঙ্গে তার যোগ ছিল; কিন্তু তা ঘনিষ্ঠ নয়, সামান্য। দু'য়ের উপকরণ বাহ্যত কতকটা এক। 'আলালের ঘরের দুলালে'র ভাববস্তু সুশিক্ষা ও কুশিক্ষা; তার সমাজচিত্র শুধু ব্যঙ্গচিত্র নয়। তা ছাড়া তাতে চরিত্র ফুটেছে। 'উপদেশক' বা 'খলিফা' জাতীয় ব্যক্তির সঙ্গে 'ঠগ্‌চাচা'র মিল কার্যঘটিত, চরিত্রগত নয়—'ঠগ্‌চাচা' চরিত্র হতে পেরেছে। 'নববাবুবিলাস' গতানুগতিক প্রহসন ধরণের রচনা, 'আলালের ঘরের দুলাল' সম্পূর্ণ উপন্যাস না হলেও মোটের উপর উপন্যাস জাতীয় সৃষ্টি।

॥ ৩ ॥ 'ইয়ং বেঙ্গলের' পর্ব (খ্রীঃ ১৮৩১-১৮৪৩)

'ডিরোজিও'র শিষ্যদের নিয়েই ইয়ং বেঙ্গল বা 'নব্য বাঙ্‌লা'। হয়ত আজকালকার ভাষায় এঁদের নাম দিতে পারা যায় 'বিদ্রোহী বাঙ্‌লা'। ডিরোজিও'র নিকট 'ইয়ং বেঙ্গল' শিক্ষা পেয়েছিলেন—আস্তিকতা হোক, নাস্তিকতা হোক্, কোনো জিনিসকে পূর্ব থেকে গ্রহণ না করতে; জিজ্ঞাসা ও বিচার, এই তাঁদের মূলমন্ত্র। এসব কথা পূর্বেই প্রথম পরিচ্ছেদে উল্লেখিত হয়েছে। ডিরোজিও ছাড়া ডেভিড্ হেয়ারের প্রভাবও তাঁদের কারও কারও উপর বেশ গভীর ছিল। ডেভিড্ হেয়ারও বাইবেলে বিশ্বাস করতেন না। খ্রীঃ ১৮২৬-১৮৩১ ডিরোজিও'র শিক্ষকতাকাল, 'ইয়ং বেঙ্গলের'ও উন্মেষকাল। অবশ্য খ্রীঃ ১৮৩১এ 'ইয়ং বেঙ্গল' প্রকাশ্যে আত্মঘোষণা করলেন প্রথম ইংরেজি এন্‌কোয়ারার' পত্রে, পরে বাঙলা 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রে। তাঁদের পরিচয় এ পত্র দু'খানির নামে, লেখায়, ভাষায় দেখা গিয়েছে। শেষদিকে 'বেঙ্গল স্পেকটেটর' তাঁদের মুখপত্র হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে, এঁরা ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাহীন বলে 'ধর্মসভা' এঁদেরই বিরুদ্ধে সমাজ রক্ষার জন্য কোমর বেঁধে দাঁড়ায়, খ্রীষ্টানরাও চমকিত হয়।

বিদ্রোহী বাঙলা

'ইয়ং বেঙ্গলের' নাম কতকটা অন্যায়রূপেই পরবর্তী কালে মসীলিপ্ত করা হয়েছে। কিন্তু বাঙলা দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে তাঁরা ধূমকেতু নন, আশ্চর্য জ্যোতিষ্ক। এঁদের মধ্যে ফরাসী বিপ্লবের প্রেরণা ও ব্রিটিশ র‍্যাডিকেলদের ধারণা একসঙ্গে জ্বলে উঠেছিল। কিন্তু সে অগ্নি-শিখাকে বিপ্লবের মশালে বা সংস্কারের প্রদীপে প্রায় কেউ ধরে রাখতে পারেনি। এঁদের অধিকাংশই অভিজাত গোষ্ঠীর নন, হিন্দু কলেজের শিক্ষায় প্রবুদ্ধ শিক্ষিতশ্রেণী। নিজেদের জীবন-যাত্রায় তাঁরা সমাজে আলোড়ন ও বিক্ষোভ তুললেন, কিন্তু নিজেরা কোন সুচিন্তিত আন্দোলন সংগঠন করলেন না। আত্মগঠন অপেক্ষাও আত্মস্বাতন্ত্র্য ছিল তাঁদের লক্ষ্য। কর্মনীতি সম্বন্ধেও কোনো মতের ঐক্য তাঁরা স্থির করতে চাননি, প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র পথে চলেছেন। অনেকেই পরে জীবিকার্জনে বাধ্য হন; ইং ১৮৩৮ সনে দেশীয় শিক্ষিতদের উচ্চ চাকরির সুযোগও হল,—ক্রমে চাকরির নিয়মে তাঁরা জীবিকা ক্ষেত্রে আবদ্ধ হয়ে পড়েন। কেউ কেউ তা সত্ত্বেও নিজের প্রতিভাকে একভাবে-না-একভাবে কিছুটা প্রকাশিত করেছেন। অনেকেই তা করেন শেষের দিকে,—যখন 'ইয়ং বেঙ্গলের' তেজঃপ্রভা স্তিমিতপ্রায়। অধিকাংশেরই কীর্তি থেকে অবশ্য তাঁদের মাতৃভাষা বঞ্চিত। ঈশ্বর গুপ্ত তাঁদের আহ্বান করেন বাঙলা লেখাতে, তা বিশেষ সফল হয় নি। তাই বাঙলা ভাষার ইতিহাসে 'ইয়ং বেঙ্গলের' তেমন নাম নেই। কিন্তু তাঁদের কর্ম ও সাংস্কৃতিক প্রভাব সেদিনের (ইং ১৮৩১-১৮৫৭) বাঙালী সমাজে কম ব্যাপক ছিল না—আর বাঙলা সংস্কৃতির ইতিহাসে তাঁরা চিরস্মরণীয়।

(১) কবি ডিরোজিও (১৮০৯-১৮৩১): মাত্র ২৩ বৎসর বয়সে অকালে অস্তমিত হন। তাঁর কবিতা ইংরেজিতে হলেও দেশপ্রেমের কবিতা হিসাবে তা আজও স্মরণীয়। চৈতন্যদেব এক অক্ষর বাঙলা না লিখেও বাঙলা সাহিত্যের যুগাবতার; ডিরোজিও বাঙলা না লিখেও বাঙলার একটি পর্বের প্রবর্তক। এই অত্যাশ্চর্য যুবকের মনীষার ও সত্যনিষ্ঠার পরিচয় তাঁর ছাত্ররা। খ্রীঃ ১৮২৬ থেকে খ্রীঃ ১৮৩১ পর্যন্ত তিনি হিন্দু কলেজে শিক্ষাদান করতেন। তাঁর গৃহে ছাত্রদের ছিল অবাধ অধিকার। তর্ক হত, আলোচনা হত, জীবনের সব জিনিসকে বিনা সংকোচে তাঁরা যাচাই করতে শিক্ষা পেতেন। আর

ডিরোজিও'র গৃহে ও অন্যত্র মদ্য ও নিষিদ্ধ মাংস আহারে তাঁরা প্রকাশ্যে যোগ দান করতেন। এরূপই ছিল সেই 'মদ্য ও বই-এর যুগের' বিদ্রোহ ও সত্যনিষ্ঠার পরিচয়। এজন্যই হিন্দু কলেজের কর্তৃপক্ষ ডিরোজিওকে (খ্রীঃ ১৮৩১) বিতাড়িত করেন—'ধর্মসভার' রামকমল সেন এ বিষয়ে উদ্যোগী হন; রামমোহনের সহগামী প্রসন্নকুমার ঠাকুরও শেষ পর্যন্ত এ প্রস্তাবে সম্মত হন। এটিও তত দুর্ভাগ্যের কথা নয়। পরম দুর্ভাগ্য এই—বৎসর শেষ না হতেই ডিরোজিও কলেরায় কালগ্রাসে পতিত হন। আর তাঁর মৃত্যুতে এই শিষ্যদের কেন্দ্রচ্যুতিও সুনিশ্চিত হয়ে ওঠে। এই যূথহারা, প্রায়-পথহারা গোষ্ঠীর সাহিত্যকীর্তি নেই, কিন্তু পরিচয় তবু স্মরণীয়।

(২) **তারাচাঁদ চক্রবর্তী** (১৮০৬-১৮৫৫): 'ইয়ং বেঙ্গল' যে বয়োজ্যেষ্ঠকে আশ্রয় করে ডিরোজিও'র পরে নিজেদের পরিচয় এপর্বে প্রদান করেন, তিনি রামমোহনের 'ব্রহ্মসভার' প্রথম সম্পাদক, হিন্দু কলেজের প্রথম দিককার ছাত্র তারাচাঁদ চক্রবর্তী ('উঃ শতাব্দীর বাংলায়' যোগেশচন্দ্র বাগল তাঁর কথা বিবৃত করেছেন)। সাংবাদিক, কোষকার ও সরকারী কর্মচারী বললে তাঁর কিছুই পরিচয় দেওয়া হয় না। ইং ১৮৩৩-এ কোম্পানির সনদ পরিবর্তনের দিনে রাজনৈতিক দাবী-দাওয়া পেশ করা হয়; সে সময় থেকে বাঙলা দেশের রাজনৈতিক চেতনা যাঁদের প্রয়াসে এগিয়ে চলে তারাচাঁদ তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য। তিনিই হন 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার' স্থায়ী সভাপতি। সে সভাতে জর্জ টমসনের উত্থাপিত প্রথম রাজনৈতিক সংগঠনের জন্য প্রস্তাব তিনিই সমর্থন করেন (খ্রীঃ ১৮৪৩)। আর, সে সভায় হিন্দু কলেজের গৃহে দক্ষিণানন্দ এক দিনের অধিবেশনে প্রিন্সিপাল রিচার্ডসনের উপস্থিতিতে ব্রিটিশ ফৌজদারী শাসন-রীতির কুপ্রথার সমালোচনা করেন (১৮৪৩)। এ তথ্যও উল্লেখিত হয়েছে—কাপ্তেন রিচার্ডসন তাঁর কলেজে সেই 'রাজদ্রোহের' প্রবন্ধপাঠ তখনি বন্ধ করতে চান; সভাপতি তারাচাঁদ চক্রবর্তী তাতে রিচার্ডসনকে বাধা দেন,—যেখানেই হোক্ সভা চলাকালে এরূপ বিঘ্ন উৎপাদন দোষাবহ। প্রিন্সিপাল রিচার্ডসনকে সভার নিকটে তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করতে বাধ্য করেন। মনে হয়, রামমোহন ও 'ইয়ং বেঙ্গলে'র সঙ্গে তারাচাঁদই যোগসূত্র রক্ষা করেছিলেন। হয়ত রামমোহনের অবর্তমানে তিনি 'ইয়ং বেঙ্গল'কেই দেখেছিলেন তাঁদের আদর্শের বাস্তব

উত্তরসাধকরূপে। অন্তত এ সময়ে এই 'নব্য বঙ্গের' নাম হয় চক্রবর্তী ফ্যাক্‌শ্যান' বা 'চক্রবর্তীচক্র'।—তবু তাঁর ৭৫০০ শব্দের ইংরেজী-বাঙলা অভিধান ও মনুসংহিতার ৫ খণ্ডের অনুবাদ ছাড়া আর কোনো পরিচয় এখন নেই।

(৩) **কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়** (১৮১৩-১৮৮৫): তারাচাঁদ চক্রবর্তীর পরেই কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথম অধ্যায়েই তাঁর কথা উল্লেখিত হয়েছে। 'বিদ্যাকল্পদ্রুম' (১৮৪৬) 'ষড়্‌দর্শনসংবাদ' (১৮৬৭) প্রভৃতির জন্য বিশেষভাবে তিনি আলোচ্য বাঙলা সাহিত্যে—তবে তা পরবর্তী পর্বের কথা। দরিদ্র ব্রাহ্মণের ছেলে কৃষ্ণমোহন ডেভিড্ হেয়ারের অবৈতনিক আরপুলি স্কুলের ছাত্র। হিন্দু কলেজে তিনি উচ্চশ্রেণীতে পড়তেন বলে ডিরোজিও'র নিকটে পড়েন নি। কিন্তু লেখায়, বক্তৃতায় তিনি ডিরোজিও'র শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যেও একটি রত্ন। ১৮৩১ অব্দে বন্ধুদের দুষ্কৃতির জন্য (পূর্বাধ্যায়ে উল্লেখিত) তিনি স্বগৃহ থেকে বিতাড়িত হন, কিন্তু মিথ্যা আচার নিয়মের নিকট নতি স্বীকার করলেন না। ১৮৩১এই তিনি ইংরেজি 'এনকোয়ারার' পত্রের সম্পাদকরূপে তা প্রকাশিত করতে থাকেন। সে ভাষায় তেজ ও আগুন ছিল ছত্রে ছত্রে। ক্রমে (১৮৩২) তিনি (ও মহেশচন্দ্র ঘোষ) খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন, তারপর ১৮৩৭এ পাদ্রি হন। বাঙলায় তিনি এন্‌সাইক্লো-পীডিয়া জাতীয় গ্রন্থ 'বিদ্যাকল্পদ্রুম' রচনায় ব্রতী হন (পরে দ্রষ্টব্য)। বাঙলা সাহিত্যে তাঁর দান সেদিন নানা কারণে সম্পূর্ণ স্বীকৃতি পায়নি। কিন্তু পাণ্ডিত্যে, জ্ঞানাহরণে, সাধারণের হিতৈষণায় তিনি অগ্রগণ্য ছিলেন। জীবনের শেষ ১০-১০ বৎসর বাঙালী সমাজেও রেভাঃ কৃষ্ণমোহন সর্বসাধারণের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন।

(৪) **দক্ষিণানন্দ (দক্ষিণারঞ্জন) মুখোপাধ্যায়** ১৮১২-১৮৮৭ :: দক্ষিণানন্দ কলিকাতার অভিজাত বংশের সন্তান। অর্থে, কুলে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, বাকাকৌশলে সর্বদিকে সুপটু। তিনিই 'জ্ঞানান্বেষণের (খ্রীঃ ১৮৩১) প্রথম সম্পাদক। আর 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার' সেই খ্রীঃ ১৮৪৩এর বহু-উল্লেখিত সভায় তিনিই পাঠ করেছিলেন প্রবন্ধ। তাঁরই প্রদত্ত জমিতে সেদিনে বেথুন স্কুল প্রথম স্থাপিত হয়। ধনে মানে এই অগ্রণী পুরুষ পরে কলিকাতা ত্যাগ করেন। তিনি তখন লক্ষ্ণৌর অধিবাসী হন। সেখানে

সিপাহী যুদ্ধে তিনি ইংরেজদের সহায়তা দান করে তালুকদারী ও 'রাজা' খেতাব লাভ করেন। তাঁর দেশত্যাগে বাঙলা দেশের ও বাঙলা সাহিত্যের যে ক্ষতি হয় তা কেউ তখন একবারও ভাবেনি। অবশ্য সমধিক ক্ষতি হয় 'ইয়ং বেঙ্গলে'র। 'জ্ঞানান্বেষণের' সম্পাদক বাঙলা সাহিত্যে আর কিছুই দান করে যান নি।

(৫) **রামগোপাল ঘোষ** (১৮১৫-১৮৬৮): ইংরেজি বক্তৃতার জন্য 'ডিমোস্থীনিস্' বলে খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর বাঙলা রচনাও 'জ্ঞানান্বেষণে' স্থান পেত। কিন্তু বাঙলা লেখায় সম্ভবতঃ তাঁর রুচি বা আগ্রহ ছিল না। আচার-ব্যবহারে অনেকটা তিনি ইংরেজের মত চলতেন, হিন্দু সমাজকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করতেন—অর্থাৎ যথার্থ বুর্জোয়া শিক্ষার এক উগ্র প্রতীক। রামগোপাল ঘোষ ব্যবসায়ীদের মধ্যেও অগ্রণী হন। রাজনৈতিক অধিকার, মরিশাসে কুলিপ্রেরণ বন্ধ করা, মফঃস্বলে ইউরোপীয়দের দেশীয়দের মত বিচারের প্রস্তাব, প্রভৃতি বিষয়ে বাগ্মিতায় তিনি কলিকাতায় ইউরোপীয়দের চমক লাগিয়ে দেন। বাঙালীর প্রথম রাজনৈতিক বাগ্মী রামগোপাল ঘোষ।

(৬) **রসিককৃষ্ণ মল্লিক** (১৮১০-১৮৫৭): ডিরোজিও'র ছাত্র নন, কিন্তু ছাত্রতুল্য শিষ্য। বিদ্যায়, বাগ্মিতায়, সততায় 'ইয়ং বেঙ্গলে'র আদর্শ তিনি উজ্জ্বল করে তোলেন। সেদিনের নিয়মে আদালতে 'গঙ্গাজল' নিয়ে হলপ পড়তে হত; তিনি তা অস্বীকার করলে হিন্দু সমাজে হৈ-চৈ পড়ে যায়। ইংরেজি বাঙলা 'জ্ঞানান্বেষণে'র (১৮৩৩) পরিচালনভার মাধব মল্লিকের সঙ্গে তিনি গ্রহণ করেছিলেন, তার বেশি বাঙলায় তাঁরও দান নেই। (দ্রঃ উঃ শঃ বাংলা—যোগেশচন্দ্র বাগল)

'ইয়ং বেঙ্গলে'র সকলেই যে চিরদিন এ রকম বিচ্ছিন্ন থাকেন তা নয়।

(৭) **প্যারীচাঁদ মিত্র** (১৮১৪-১৮৮৩): 'ইয়ং বেঙ্গলে'র নামকে বাঙলা সাহিত্যেও অমর করে রেখে গেছেন। হিন্দু কলেজে পড়ার সময়েই প্যারী-চাঁদ নিজগৃহে শিক্ষাদানের জন্য স্কুল খোলেন। কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরির (বর্তমান 'ন্যাশনাল লাইব্রেরি'র মূল) সঙ্গে তিনিও ইয়ং বেঙ্গলের অন্যান্যের মত প্রথম থেকে সংযুক্ত থেকে পরে লাইব্রেরির গ্রন্থাধ্যক্ষ ও সম্পাদক পদ লাভ করেন। ইংরেজি প্রবন্ধ ও জীবন-চরিত্রের (ডেভিড হেয়ার, রাম-কমল সেন, রুস্তমজী কওয়াশজী প্রভৃতির) তিনি লেখক—সেদিকে তাঁর

অনুজ কিশোরীচাঁদ মিত্রের দান আরও উল্লেখযোগ্য। কিন্তু বাঙলা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ সুপরিচিত 'আলালের ঘরের দুলালে'র (খ্রীঃ ১৮৫৮-এ প্রকাশিত) লেখক 'টেকচাঁদ ঠাকুর' নামে। বিদ্রোহের প্রথম উদ্দামতা কাটিয়ে তিনি ক্রমেই স্থিরতর সাহিত্য-সাধনায় ব্রতী হন। শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চিন্তার সঙ্গে দেশের সংযোগসাধন তাঁর কাম্য হয়ে ওঠে। ইংরেজি-বাঙলা দু'ক্ষেত্রেই তাঁর দান ১৮৪৭ থেকে আরম্ভ হয়ে ১৮৮৩ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

(৮) রাধানাথ শিকদার (১৮১৩-১৮৭০): প্যারীচাঁদ মিত্রের বন্ধু, এক হিসাবে এদেশের প্রথম বৈজ্ঞানিক। জরীপ বিভাগের কর্মচারীরূপে তিনিই এভারেষ্ট গিরিশৃঙ্গ প্রথম আবিষ্কার (১৮৫২) করেন বলে বলা যায়। দেরাদূন অঞ্চলে দেশীয় লোকেদের দিয়ে সাহেবদের 'বেগার' খাটানোর বিরুদ্ধে তিনি দাঁড়ান প্রতিবাদী হয়ে। একটি সত্য ঘটনায় সত্য উত্তরে তাঁর তেজস্বিতার ও যুগ-দৃষ্টির সাক্ষ্য রয়েছে। মাল বহনের জন্য ম্যাজিস্ট্রেট্ মিঃ ভ্যানসিটার্ট রাধানাথের অধীন এক পিয়াদাকে বেগার খাটাতে চান (১৮৪৩)। রাধানাথ বাধা দেন। কুলি না পেয়ে ইংরেজপুরুষ এসে তম্বি শুরু করেন—"জানো, আমি কে?" রাধানাথ উত্তর দেন, "জানি—মানুষ, আমার মতই।" চাকরিতেও তাঁর মানবাধিকারবোধ খর্ব হয় নি। এ বিষয় উপলক্ষ করে ম্যাজিস্ট্রেট্ অবশ্য মামলা চালান, রাধানাথের দু'শ' টাকা অর্থদণ্ডও হয়। কিন্তু এ উপলক্ষে যে আন্দোলন হয়, তাতেই এরূপ অন্যায়ও দুঃসাধ্য হয়ে উঠে। বহু বৎসর পরে বাঙলা দেশে ফিরে ইংরেজি-ভাবাপন্ন এই বৈজ্ঞানিক বন্ধু প্যারীচাঁদ মিত্রের সঙ্গে ক্ষুদ্র 'মাসিক পত্রিকা' (খ্রীঃ ১৮৫৪) প্রকাশ করেন। আর তার পাতায় ছিল সরল চলতি কথায় স্ত্রী-দিগের শিক্ষাব্যবস্থা। শোনা যায়, বিদেশে রাধানাথ শিকদার বাঙলা প্রায় ভুলে যেতে বসেছিলেন, তবু নিজেও তিনি বাঙলা শিখলেন। কোন্ বাঙলা যে খাঁটি বাঙলা তা তিনি অভ্রান্তরূপে বুঝেছিলেন। 'মাসিক পত্রিকার' প্রতি সংখ্যা প্রকাশিত হতেই তিনি পরদিন প্রভাতে প্যারীচাঁদ মিত্রের বাড়ী আসতেন, "প্যারী, তোমার স্ত্রী পড়ে কি বললেন?" এই বাস্তব চেতনা ও উত্তম 'ইয়ং বেঙ্গলে'র এক অভিনব বৈশিষ্ট্য—ঘরের কথায় ঘরের মেয়েদের চোখ খুলে দিতে হবে।

(৯) রামতনু লাহিড়ী (১৮১৩-১৮৯৮): শিবনাথ শাস্ত্রীর লিখিত 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' থেকে আমাদের নিকট অনেকটা

পরিচিত হয়ে গিয়েছেন। যুক্তিবাদী জিজ্ঞাসায় কখনো তিনি উদ্দামতা দ্বারা চালিত হন নি। ভাবুক, ভক্ত ব্রাহ্মরূপে সকলের প্রীতি ও শ্রদ্ধাভাজন হয়ে রামতনু লাহিড়ী অনাড়ম্বর শিক্ষক-জীবন যাপন করে গিয়েছেন। অথচ দেবেন্দ্র-নাথের বেদ-নির্ভর ব্রাহ্মধর্ম ও খ্রীষ্ট-বিরোধিতার সঙ্গে তাঁর বিরোধিতা ছিল —বেদকে অপৌরুষেয় বলা যুক্তিসিদ্ধ নয় বলে। ১৮৫১ সালেই তিনি এরূপ কারণে উপবীতও ত্যাগ করেন—যে উপবীত রামমোহন ত্যাগ করেন নি, দেবেন্দ্রনাথও যা ত্যাগ করবার জন্য উৎসাহী ছিলেন না, বরং পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথের উপনয়ন করিয়ে তা অনুমোদন করে যান।

রামতনু লাহিড়ী ব্যতীত ইয়ং বেঙ্গলের শিবচন্দ্র দেব (খ্রীঃ ১৮১১-১৮৯০), হরচন্দ্র ঘোষও (১৮১১-১৮৯০) সেকালের ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ হয়ে দাঁড়ান। কোন্নগরে শিবচন্দ্র দেবের কীর্তি সর্বত্র। হরচন্দ্র ঘোষও রাজকর্মে সততা ও নিষ্ঠার জন্য প্রসিদ্ধিলাভ করেন।

নিছক বাঙলা লেখার হিসাব নিলে এই 'নব্য বঙ্গে'র কৃতিত্ব সামান্য, তা দেখেছি। কৃষ্ণমোহন ও প্যারীচাঁদই প্রধান। তা ছাড়া, কোষকার তারাচাঁদ ও 'জ্ঞানান্বেষণের' দক্ষিণানন্দের সঙ্গে রসিককৃষ্ণ, রামগোপাল ঘোষ ও 'মাসিক পত্রিকার রাধানাথের নামই মাত্র করা চলে। প্রায়ই তাঁরা ইংরেজিতে লিখেছেন। তদপেক্ষাও তাঁরা সে যুগে বেশি করেছেন ইংরেজিতে বক্তৃতা। 'পাবলিক লাইফ' বা রাজনৈতিক জীবনের সংগঠন তাঁদের প্রধান কীর্তি। সেই চেতনার উন্মেষ সাহিত্যের ইতিহাসেও সামান্য ঘটনা নয়—তা প্রথম পরিচ্ছেদেই আমরা বলেছি। ইংরেজি-বাঙলা সংবাদপত্র পরিচালনা ছাড়াও প্যারীচাঁদ ও রাধানাথ প্রভৃতি অবৈতনিক বিদ্যালয় বিস্তারে, এবং প্রায় সকলেই স্ত্রীশিক্ষা, বিধবাবিবাহ প্রবর্তন প্রভৃতি সমাজ-সংস্কারের কর্মে প্রথমা-বধি ছিলেন উৎসাহী। তাছাড়া ছিল রাজনৈতিক কাজ। ১৮৩৩-এর সনদ পরিবর্তনকালীন আবেদন-পত্রাদিতে, তারপর (১৮৩৫) প্রেস-স্বাধীনতার পুনরুদ্ধারে ও জুরীপ্রথার বিষয়ে, ভারতীয়দের রাজকর্মে নিয়োগ সম্পর্কে, তাঁদের উদ্যোগ দেখা যায়। ১৮৪৩-এর সময় থেকে 'বেঙ্গল-ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' গঠনে ; ১৮৪৯-এ রামগোপাল ঘোষের ইউরোপীয়দের বিচার বিষয়ের বক্তৃতায়, আর শেষে খ্রীঃ ১৮৫৫-এ পুনরায় সনদ পরিবর্তনকালীন আন্দোলনে—'ইয়ং বেঙ্গলে'র সার্থক রূপ দেখতে পাই। অবশ্য খ্রীঃ ১৮৩৩ বা

১৮৪৩-এর সময় থেকে তাঁদের অপেক্ষাও প্রবল শক্তি দেশে জন্মগ্রহণ করে—১৮৩৯-এ 'তত্ত্ববোধিনী সভা' ও ১৮৪৩-এ 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র আবির্ভাব হয়। বাঙালী সমাজে একটা ঝড়ের মত উঠে 'ইয়ং বেঙ্গলের' বিদ্রোহ ক্রমশঃ এ সময়ে শেষ হতে থাকে। রেখে যায় বিদ্রোহের পরিবর্তে একটা নকল বিদ্রোহের জের। মদ্য ও নিষিদ্ধ মাংস ও ইংরেজি বই দিয়ে 'ইয়ং বেঙ্গল' প্রকাশ্যে নিজেদের বলিষ্ঠ বিশ্বাস ঘোষণা করেছিলেন—মিথ্যাচারকে তাঁরা মনেপ্রাণে ঘৃণা করতেন। '(হিন্দু) কলেজের ছেলেরা মিথ্যা বলতে জানে না' —এটি ছিল সেদিনের প্রবাদবাক্য (তাই কি আজও 'লায়ার' বললে আমরা এত চটে যাই?)। এই সত্য-নিষ্ঠ বিদ্রোহ যখন বিভ্রান্ত হয়ে গেল তখনো মদ্য ও নিষিদ্ধ মাংসের 'কাল্ট্'ই ইংরেজি শিক্ষার লক্ষণ বলে পরিগণিত হচ্ছে। রাজনারায়ণ বসু সেই সময়েরই হিন্দু কলেজের ছাত্র। ইংরেজি শিক্ষা এতটা বৈষয়িক সৌভাগ্য ও সামাজিক সম্মানের বিষয় হয়েছে যে, ধনী ও ভদ্রবংশের অপোগণ্ড মূর্খদের জন্য ইংরেজি স্কুলে তখন 'বাবু-সেক্শন' খুলতে হয়। মাতলামি ও বেলেল্লাবৃত্তির জোরেই তারা প্রমাণ করতে ব্যস্ত হয় যে তারা ইংরেজিওয়ালা—'ইংলিশ এজুকেটেড্'। পরবর্তী কালে মাইকেল এবং দীনবন্ধুও এই নকল 'ইয়ং বেঙ্গলে'র চিত্র এঁকেছেন। অপরদিকে সেই পরবর্তী ইংরেজি শিক্ষিতরা মদ্য-মাংসের ব্যাপারে যতটা অসংযত হোক, সামাজিক নিয়ম-কানুনের ব্যাপারে প্রকাশ্যে পূর্বজদের মত অসংযত হল না—একটা আপোষ রফার পথ তারা গ্রহণ করল। অর্থাৎ যে মিথ্যাচার ছিল 'ইয়ং বেঙ্গলের' নিকট সর্বথা ত্যাজ্য, তাই হল পরবর্তীদের একটা পুঁজি। সম্ভবত এদের এই মিথ্যাচার অসহ্য ঠেকেছিল বলেই 'তত্ত্ববোধিনীর' সুশৃঙ্খল ও সংযত শিক্ষাদর্শকেও মিথ্যাচারের প্রশ্রয়স্বরূপ মনে করে কৃষ্ণমোহন প্রভৃতি 'অর্ধসংস্কারবাদ' বলে ব্যঙ্গ করতেন। বলা প্রয়োজন, 'ইয়ং বেঙ্গলের' মাতলামির কাল্টের বিরুদ্ধে ক্রমশ সুস্থ মত সৃষ্টি করেন প্যারীচরণ সরকার ও প্যারীচাঁদ মিত্র, পরে কেশবচন্দ্রের প্রচারে ব্রাহ্মসমাজ সুরাবর্জনকেও প্রায় একটা গোঁড়ামিতে পরিণত করে, এখনো পর্যন্ত সেই ব্রাহ্ম-বিচারের বশেই বাঙালী ভদ্রসমাজে সুরা স্পর্শও দূষণীয় বলে গণ্য।

অবশ্য বাঙালীর নিজ এলেকার বাইরে এ কালের সর্বাপেক্ষা বড় ঘটনা হল ইংরেজির স্বপক্ষে মেকলের সিদ্ধান্ত ও বেণ্টিঙ্ক কর্তৃক ইংরেজি ভাষা শিক্ষা

প্রবর্তনের নির্দেশ দান (খ্রী: ১৮৩৫)। তাতেই একদিক দিয়ে রক্ষণশীলদের পরাজয় সুস্থির হয়, এবং কতকাংশে 'ইয়ং বেঙ্গলে'র আশা পূরণের পথ হয়। তারপর খ্রী: ১৮৩৮-এ আপিস-আদালতে ফারসির পরিবর্তে বাঙলার আংশিক প্রচলনের সিদ্ধান্ত হয়। ইংরেজি শিক্ষিত ভারতীয়রা ১০০৲ টাকার অধিক বেতনের চাকরিলাভ করতে পারবে না, কর্নওয়ালিসের এরূপ নির্দেশ ছিল। এখন সে বাধা দূর করা হল;—শিক্ষিতদের পক্ষে এখন বেশি বেতনের চাকরিও জুটবে। ১৮৩৮ থেকে ফারসির প্রভাব প্রতিপত্তি আরও কমে, অন্যদিকে যে বাঙলা ইতিমধ্যে ফারসির প্রভাব মুক্ত হয়েছিল আইন-আদালতেও সেই সংস্কৃতাভিমুখিনী ভাষার প্রসার বৃদ্ধি পায়। অন্য দিকে ইংরেজি শিক্ষিতরা ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি বৈষয়িক বৃত্তি ত্যাগ করে এখন সরকারি চাকরিতে বেশি আকৃষ্ট হলেন। তাতে অবশ্য রাজকার্যে সততার ও ন্যায়নিষ্ঠার বিশেষ প্রসার ঘটে। কিন্তু এর ফলে বাঙালী শিক্ষিত শ্রেণী 'চাকুরে শ্রেণীতে' পরিণত হতে লাগল—শিক্ষিতের সাহিত্য চাকুরিজীবীর ভদ্র ও পোষমানা প্রাণের সাহিত্য হয়ে উঠবার সম্ভাবনা দেখা দিল। আমাদের 'ঔপনিবেশিক সাহিত্যের' চরিত্রে অনেকটাই এই চাকরির পরোক্ষ প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়, তা ভুলবার নয়—১৮৩৮-এর ব্যবস্থা তা অবশ্যম্ভাবী করে তোলে।

সাহিত্যের ক্ষেত্র

কাজেই, বাংলা সাহিত্যের দিক থেকে 'ইয়ং বেঙ্গলে'র পূর্বে ইয়ং বেঙ্গলের প্রথম নিজস্ব দান 'জ্ঞানান্বেষণ'। (১) 'জ্ঞানান্বেষণের সম্পাদকীয় ভার ছিল পরবর্তী কালের 'সম্বাদ ভাস্করের' সম্পাদক, প্রসিদ্ধ উদারমতাবলম্বী পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ বা গুড়গুড়ে ভট্টাচার্যের উপর। তিনিই এ পত্রের শিরোভূষণ বা 'মটো'র রচয়িতা :

এহি জ্ঞান মনুষ্যাণামজ্ঞানতিমিরহর।
দয়া সত্যঞ্চ সংস্থাপ্য শঠতামপি সংহর॥

প্রথম সংখ্যায় (১৮ই জুন, ১৮৩১) যে উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন বিবৃত হয়েছিল তা এরূপ :

"এক প্রয়োজন এই যে, এতদ্দেশীয় বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত মহাশয়েরা লোকের

প্রপঞ্চ বাক্যেতে প্রতারিত হইতেছেন তাহাতে তাঁহারদিগের কোনরূপেই ভাল হইবার সম্ভাবনা না দেখিয়া খেদিত হইয়া বিবেচনা করিলাম যে নানা দেশ প্রচলিত বেদবেদান্ত মনুস্মিতাক্ষরা প্রভৃতি গ্রন্থের আলোচনা দ্বারা তাহারদিগের ভ্রান্তি দূর করিতে চেষ্টা করিব।

দ্বিতীয়তঃ এই যে এতদ্দেশনিবাসি অনেকেই আপন ২ জাতিবিহিত ধর্ম্মের প্রতি-জিজ্ঞাসা করিলে যথাশাস্ত্রানুসারে কহিয়া থাকেন কিন্তু সেই মহাশয়েরা এমত কর্ম করেন যে তাহা বিশিষ্ট লোকেরই কর্তব্য নহে ইহার কারণ কি, তাহাও বিবেচনা করিতে হইবেক।

তৃতীয়তঃ এই যে ভূগোল প্রভৃতি গ্রন্থ যদ্যপি এতদ্দেশে দেশান্তরীয় ও বঙ্গদেশীয় ভাষায় নানাপ্রকারে প্রকাশ হইয়াছে তথাপি সে অতিবিস্তারিত রূপ প্রচার হয় নাই অতএব সকলের আশুবোধের নিমিত্তে সেই সকল গ্রন্থ আমরা বঙ্গদেশীয় ভাষায় ক্রমে ২ প্রকাশ করিব। এবং অন্য ২ বিষয় যাহা প্রকাশ করা আবশ্যক তাহাও উপস্থিতানুসারে প্রকাশ করিতে ত্রুটি করিব না ইতি।"

বাঙলা সাময়িক পত্রের পাতাতেই গদ্য চলতে শিখছে—তবে এ গদ্য পা ফেলছে থপ্ থপ্ করে। 'সমাচার দর্পণে' সুদক্ষ বাঙলা লেখকরাই তখন লিখতেন, তার গদ্যের সঙ্গে তুলনা করলেই দেখব 'জ্ঞানান্বেষণের' গদ্যও প্রশংসনীয়। এ সময়কার 'জ্ঞানোদয়ে' (মাসিক) সমাজ-সংস্কার ও জ্ঞান-বিস্তারের বিপুল প্রয়োজনেই ইংরেজিওয়ালারা অনভ্যস্ত হাতে কলম তুলে নিয়েছিলেন। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাবের তুলনায় ইয়ং বেঙ্গলের এই দান সামান্য। 'জ্ঞানোদয়' (খ্রীঃ ১৮৩১-৩২) তরুণ শিক্ষার্থীদের জন্য প্রচারিত মাসিকপত্র হিসাবে উল্লেখযোগ্য।

(২) সে পর্বের প্রধান ঘটনা বরং **'সম্বাদ প্রভাকরের'** (খ্রীঃ ১৮৩১) মারফৎ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের আত্মপ্রকাশ, তাতে বাঙলা পদ্যের নূতন পত্তন হয়। 'প্রভাকরের' প্রথম'প্রকাশ সাপ্তাহিক রূপে ২৮শে জানুয়ারী, ১৮৩১ (১৫ই মাঘ, ১২৩৭ বাং সাল)। পাথুরিয়াঘাটার যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুর ছিলেন তার পৃষ্ঠ-পোষক—এবং 'তৎপ্রকাশক' হিন্দুধর্মনাশেচ্ছুদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পারেন'—প্রথম সংখ্যা দেখে 'চন্দ্রিকা' এরূপ সিদ্ধান্ত করেন। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 'স্বদেশীয়' ভাবে উদ্বুদ্ধ হলেও উন্নতিকামীও ছিলেন,—প্রারম্ভে হয়ত

প্রভাকর 'ইয়ং বেঙ্গলের' বিপক্ষেই ছিল। তার লেখকদের তালিকায় পরবর্তী কালে (১২৫৪, ২রা বৈশাখ) সকল মতের লেখকেরই নাম দেখতে পাই। 'প্রভাকরের' প্রথম পর্ব দেড় বৎসর স্থায়ী হয়। অতএব, ১৮৩২-এর মধ্য ভাগ থেকে ১৮৩৬ পর্যন্ত তার নাম আর নেই। দ্বিতীয় পর্বের 'সম্বাদ প্রভাকর' ১৮৩৬ সনের ১০ই আগষ্ট (২০শে শ্রাবণ, ১২৪৩) বারত্রয়িক রূপে প্রকাশিত হয়। (প্রথম পর্বের 'প্রভাকর' আজ আর পাওয়া যায় না—এমন কি, ১২৪৭-এর পূর্বের 'প্রভাকর'ও প্রায় দুর্লভ)। ১৮৩৯ সনের ১৪ই জুন তা দৈনিক হল —আর বাঙলা ভাষায় 'প্রভাকর' প্রথম দৈনিক পত্র। এ সময় থেকে তার গৌরব অম্লান থাকে—সেকালের গণ্যমান্য লোকেরা তার লেখক ছিলেন। কিন্তু আজকের দিনে 'প্রভাকর' সর্বাধিক স্মরণীয় তার ১৮৫৩ সন থেকে প্রকাশিত মাসিক সংস্করণের জন্য—সেই মাসপয়লা কাগজগুলিতে শুধু সংবাদের সারমর্ম নয়, ঈশ্বর গুপ্ত নীতিকাব্য ও প্রাচীন লেখকদের জীবনী প্রকাশ করেছিলেন। অবশ্য 'সম্বাদ প্রভাকরে'ও 'কলেজীয় কবিতাযুদ্ধের' যুগ আসে এই ১৮৪৩-এর পরে। নিশ্চয়ই গুপ্ত কবি মৌলিক সাহিত্যকার। গদ্যে তিনি ভারতচন্দ্র প্রমুখ যে সব পুরাতন লেখকের জীবনী সংকলন করেন আজও তা আমাদের বিশেষ অবলম্বন—সেই সূত্রে আমরাও তাঁর গদ্য লেখা উদ্ধৃত করেছি। কিন্তু অনুপ্রাস, দীর্ঘ বাক্য ও আলঙ্কারিক শব্দযোজনার দোষে সে গদ্য প্রায়ই প্রাঞ্জল নয়। 'গুপ্তকবির' গদ্য—গদ্য সাহিত্যের গদ্য নয়। অথচ তাঁর সেই কবি-জীবনীসমূহ বিষয় গৌরবে মহামূল্য। অবশ্য **'সম্বাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়'** (খ্রীঃ ১৮৩৫) বাঙলা ভাষায় প্রথম সাহিত্যিক মাসিক পত্র চালনার চেষ্টা। পরে তা সাপ্তাহিক পত্রে রূপান্তরিত হয়। বাঙলা মাসিক পত্র বাঙলা সাহিত্যের আসর হতে থাকে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ' (খ্রীঃ ১৮৫১) ও প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদারের 'মাসিক পত্রে'র (খ্রীঃ ১৮৫৪) সময় থেকে। আসলে 'বঙ্গদর্শনে'রই (খ্রীঃ ১৮৭২) কীর্তি—'সাহিত্যপত্রের ইতিহাস সৃষ্টি।

(৩) প্রসন্নকুমার ঠাকুরের উৎসাহে বাঙলার রঙ্গমঞ্চ গঠনের চেষ্টাও খ্রীঃ ১৮৩১-এ আরম্ভ হয়। কিন্তু পরবর্তী অভিনীত বই প্রায়ই ছিল পদ্য ও গীতবহুল। নাট্যপ্রসঙ্গেই পরবর্তী পরিচ্ছেদে নাটকের গদ্যও আলোচ্য।

(৪) গদ্যগ্রন্থের দিক থেকে অবশ্য মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'প্রবোধ চন্দ্রিকা'

এ সময়েই প্রকাশিত (খ্রীঃ ১৮৩৩-এ প্রকাশিত, লিখিত খ্রীঃ ১৮১৩?) হয় এবং তার প্রভাব অনেককাল অক্ষুণ্ণ থাকে (পূর্বে দ্রষ্টব্য)। তাছাড়া কালী-প্রসন্ন কবিরাজের 'চন্দ্রকান্ত' (খ্রীঃ ১৮২২) গদ্যে পদ্যে রচিত হয়েছিল। কালীকৃষ্ণ দাস রচিত এক জাতীয় এ্যাডভেঞ্চার গল্প 'কামিনীকুমার' খ্রীঃ ১৮৩৬-এ রচিত হয়। সাহিত্যের রুচি গঠনের পূর্বে আদিরস অনেকদিন সাহিত্যরস বলে চলেছে। এ সব গ্রন্থে আধুনিক উপন্যাসের বীজ অন্বেষণ করা অপেক্ষা পূর্বযুগের ফারসি রম্য উপাখ্যানের জের দেখাই সমুচিত পর অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য)।

(৫) এ পর্বেও পাঠ্যপুস্তকই প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে প্রধান। সাহিত্য ও বিজ্ঞানের নানা শাখার গ্রন্থ কখনো সংকলিত কখনো অনূদিত হয়েছে। তার মধ্যে ইতিহাসও ছিল (পূর্বে দ্রষ্টব্য)। অথচ সে পর্বেই প্রিন্‌সেপ্‌ ব্রাহ্মীলিপির পাঠোদ্ধার করেছেন, ইংরেজিতে প্রাচীন ভারতের গৌরব পুনরুদ্ধার আরম্ভ হয়েছে কিন্তু বাঙলায় তার চিহ্ন প্রায় দেখা যায় না।

(৬) পাঠ্যপুস্তক ছাড়া প্রকাশিত হচ্ছিল প্রধানতঃ প্রচার-গ্রন্থ—পাদ্রিরাই তাতে উদ্যোগী। কিন্তু সে যুগের প্রধান পাদ্রি ডাফ্‌-এর প্রভাব প্রধানত বিস্তৃত হয়েছিল ইংরেজির মারফতে ইংরেজি শিক্ষিতের মধ্যেই।

প্রচার-রচনা অপেক্ষা সাহিত্যগঠনে অনুবাদ-রচনার গুরুত্ব বেশি। পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও সাহিত্য অনুবাদ আরম্ভ হয়েছিল—ফেলিক্স কেরির 'পিলগ্রিমস্‌ প্রোগ্রেস'-এর অনুবাদের কথা পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে। তবে এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য টম পেন-এর 'এজ অব রিজন'-এর অনুবাদ (খ্রীঃ ১৮৩৪)। টম পেন বিপ্লবের দূত। তাঁর ইংরেজি লেখা সেদিনের 'ইয়ং বেঙ্গলকে' পাগল করেছিল। বাঙলা অনুবাদে তার কি ফল হয়েছিল আর অনুবাদ কিরূপ হয়েছিল জানবার উপায় নেই। ইংরেজি ছাড়া, সংস্কৃত থেকে ও ফারসি থেকেও অনুবাদের চেষ্টা দেখা যায়।

পর্ব-পরিশিষ্ট

(১) অনুবাদ গ্রন্থ :

অনুবাদের সাহিত্য দিয়েই বাঙলা গদ্যের প্রথম দিক পরিপুষ্ট হয়েছে। এর মধ্যে প্রধানত পাওয়া যায় তিন ধরণের অনুবাদ—(১) প্রচারমূলক অনুবাদ—ইংরেজি বা অন্ত পাশ্চাত্ত্য ভাষা

থেকে, প্রচারমূলক অনুবাদ—সংস্কৃত বা ঐরূপ ভারতীয় ভাষা থেকে। দর্শনের বই-এর অনুবাদও এ শাখায় ধরা যেতে পারে। (২) পাঠ্যপুস্তক জাতীয় অনূদিত সাহিত্য ছাড়াও ভূগোল, ইতিহাস, প্রাকৃত-বিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের বইও অনূদিত হয়েছিল। (৩) সাহিত্য গ্রন্থের অনুবাদ—সংস্কৃত সাহিত্য গ্রন্থের অনুবাদ বা সংকলনই বেশি প্রকাশিত হয়েছে। তবে ইংরেজি সাহিত্য পুস্তকের অনুবাদও ক্রমশ দেখা দেয়। এসব অনুবাদ গদ্যেও হ'ত পদ্যেও হ'ত। উল্লেখযোগ্য সাহিত্যের অনুবাদ বলা যেতে পারে ফেলিক্স কেরির কৃত Bunyan-এর 'Pilgrim's Progress' (১৮২৯), Tom Paine-এর 'Age of Reason'-এর অনুবাদ (১৮৩৪)। Edward Forster কৃত 'Arabian Nights'-এর অনুবাদ, নাম 'আরবীয় উপন্যাস'। Ed. Forster কৃত Lamb রচিত Tales from Shakespeare-এর অনুবাদ এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। পরবর্তী কালে অনূদিত হয় জনসনের Rasselas (তারাশঙ্কর কবিরত্ন)। রাসেলাস প্রথম অনুবাদ করেছিলেন পদ্যে, খ্রীঃ ১৮৩৪এ, রাজা কালীকৃষ্ণ ঠাকুর। রামকমল ভট্টাচার্য কৃত Bacon-এর Essays-এর অনুবাদ 'বেকনের সন্দর্ভ' (খ্রীঃ ১৮৬১), দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ Advancement of Learning-এর অনুবাদ করেন 'সুবুদ্ধিব্যবহার' নামে। রাজকৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায় কৃত (ফরাসী কবি) Fenelon-এর অনুবাদ 'টেলিমেকস্' (১৮৫৮-১৮৬০)। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য কৃত 'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ' (Romance of History অবলম্বনে) ও 'পৌল ও ভর্জিনি' (Paul & Virginia, 1868-69) প্রভৃতি বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে। স্বয়ং বিদ্যাসাগরও সেক্সপীয়রের Comedy of Errors-এর অনুবাদ করেছেন 'ভ্রান্তিবিলাস' নামে। নীলমণি বসাকের 'পারস্য ইতিহাস' (খ্রীঃ ১৮৩৪) ইংরেজি থেকে অনূদিত। বিশ্বেশ্বর দত্ত সাহনামার গদ্যানুবাদ (খ্রীঃ ১৮৪৭) করেছিলেন।

পরবর্তী কালেও বহু অনুবাদ প্রকাশিত হয়। বাঙলায় সাহিত্যসৃষ্টি আরম্ভ হলে অনুবাদের গুরুত্ব আর বেশি থাকে না। অবশ্য খ্রীঃ ১৮৫১ অব্দে 'ভার্নাকিউলার লিটারেচর কমিটি' বা বঙ্গানুবাদক সমাজ গঠিত হয়—তারই আনুকূল্যে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ' নামক মাসিক পত্রিকা খ্রীঃ ১৮৫১ থেকে প্রকাশিত হতে থাকে (দ্রঃ সুকুমার সেন—বাঃ সাঃ গদ্য, পৃঃ ১১৩), ঐ সমিতির আনুকূল্যে প্রকাশিত হয় মেকলের 'লর্ড ক্লাইব' (খ্রীঃ ১৮২৫), 'রবিন্সন্ ক্রুসোর ভ্রমণবৃত্তান্ত', এডবার্ড রোএর (Edward Roe) কৃত ল্যাম্বের সেক্সপীয়রের গল্পের অনুবাদ (খ্রীঃ ১৮৫৩), Anderson-এর শিশুপাঠ্য গল্পের মধুসূদন মুখোপাধ্যায় কৃত অনুবাদ (খ্রীঃ ১৮৫৯) প্রভৃতি।

(২) ভাষারূপ-স্থিরীকরণ

বাঙলা সাহিত্যের মূল ভিত্তি, তার ভাষার অন্বয় প্রভৃতি, রূপ ও বর্ণবিন্যাস পদ্ধতি খ্রীঃ ১৮০০ অব্দের পূর্বে মোটেই সুস্থির ছিল না। এমনকি, 'প্রবোধ চন্দ্রিকা'-য় পর্যন্ত শুধু ভাষা প্রয়োগের ত্রুটিই নয়, সংস্কৃত শব্দেরও বর্ণাশুদ্ধি দেখা যায়। এ বিষয়ে ফোর্ট উইলিয়মের পণ্ডিতেরাও নিরঙ্কুশ ছিলেন। যে সব কারণে ফারসির পরিবর্তে সংস্কৃতের সঙ্গে বাঙলা ভাষার যোগাযোগ পাকাপাকি গ্রাহ্য হল সে সবের মধ্যে প্রধান উল্লেখযোগ্য হচ্ছে অভিধানকার ও বৈয়াকরণদের কাজ, আর নিশ্চয়ই মুদ্রাযন্ত্রের নীতিশৃঙ্খলা। কয়েকটি প্রধান ঘটনা মাত্র উল্লেখ করা হল :

১। হালহেড্-এর বাঙলা ব্যাকরণে (খ্রীঃ ১৭৭৮) বাঙলাকে ফারসির প্রভাবিত বিকৃতি থেকে মুক্ত করবার ইঙ্গিত প্রথম দেখা যায়। ২। ফরস্টার-এর Vocabularyর (খ্রীঃ ১৭৯৯) ভূমিকায় একথা আরও জোর দিয়ে বলা হয়। ৩। কেরি দিনের পর দিন এই সত্যই বোঝেন—সংস্কৃতের সঙ্গেই বাঙলার প্রাণের যোগ।

অর্থ ও বানান নির্ণয়ে সে সময়কার কয়েকটি প্রধান ঘটনা—অভিধান রচনা: (i) Thakur's Bengali-English Vocabulary (খ্রীঃ ১৮০৫) (ii) পীতাম্বর মুখোপাধ্যায়ের শব্দসিন্ধু (খ্রীঃ ১৮০৯) (অমরকোষের অনুবাদ) (iii) কেরির অভিধান—৭৫ হাজার শব্দের ইংরেজি-বাঙলা অভিধান (খ্রীঃ ১৮১৫-১৮২৫)। (iv) মার্শম্যান উক্ত অভিধানের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশ করেন—খ্রীঃ ১৮২৭। (v) রামচন্দ্রের অভিধান (খ্রীঃ ১৮১৮), স্কুল বুক সোসাইটি প্রকাশিত, শব্দসংখ্যা ৬৫০০ মাত্র। এখানা পাদ্রি লঙ্-এর মতে প্রথম বাঙালী-কৃত অভিধান। সম্ভবত এর থেকে আরবী-ফারসি শব্দ পরিত্যক্ত হয়েছিল। (vi) তারাচাঁদ চক্রবর্তীর ইংরেজি-বাঙলা অভিধান (৭৫০০ শব্দ), খ্রীঃ ১৮২৭-এ প্রকাশিত। (vii) মার্শম্যানের বাঙলা-ইংরেজি ও ইংরেজি-বাঙলা ২৫০০০+২৫০০০ শব্দ, খ্রীঃ ১৮২৯ (?)। (viii) মেণ্ডিস্-এর (Mendis-এর) ইংরেজি-বাঙলা অভিধান (জনসন-এর ইংরেজি অভিধানের ভিত্তিতে)—খ্রীঃ ১৮২৮। (ix) Haughton's (হটনের) বাঙলা-ইংরেজি অভিধান, খ্রীঃ ১৮৩৩। রামকমল সেনের (৫৮ হাজার শব্দের) ইংরেজি-বাঙলা অভিধান—খ্রীঃ ১৮৩৪।

ব্যাকরণের মধ্যে প্রধান উল্লেখযোগ্য: (১) হালহেড্ (ইং ১৭৭৮) (২) কেরি (ইং ১৮০১) (৩) কীথ্-এর বাঙলা ব্যাকরণ (স্কুলপাঠ্য, ইং ১৮২০) (৪) রামমোহনের ইংরেজিতে লেখা ব্যাকরণ (ইং ১৮২৬) ও তার বাঙলা রূপ (৫) গৌড়ীয় ভাষার ব্যাকরণ (ইং ১৮৩২ ?)

এ সব ব্যাকরণ অভিধানে বানান ও শব্দার্থ স্থির হতে থাকে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কালে আর সে সব ভ্রমের চিহ্ন বিশেষ থাকে না। অবশ্য ভাষার সারল্য সাধিত করার প্রয়োজন তখনো যথেষ্ট ছিল।

॥ ৪ ॥ বিদ্যাসাগরের পর্ব : বাঙলা গদ্যের প্রতিষ্ঠা :

(খ্রীঃ ১৮৪৩-খ্রীঃ ১৮৫৭)

পর্বের পরিচয়

প্রায় একশত বৎসর পূর্বে খ্রীঃ ১৮৫৬ অব্দের (১৭৭৮ শকাব্দের) 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়' রাজনারায়ণ বসু (খ্রীঃ ১৮২৬-খ্রীঃ ১৮৯০) বাঙলা ভাষা সম্বন্ধে আলোচনাকালে লিখিয়াছেন, "১০।১২ বৎসর পূর্বে বাঙ্গালা ভাষাতে বিবিধ বিষয়ে প্রস্তাব রচনা করা যেরূপ কঠিন বোধ হইত এক্ষণে সেরূপ

কঠিন বোধ হয় না। এই পরমোপকার জন্ত পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নিকট ও শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল মিত্র ইত্যাদি কতকগুলি সবিদ্যাশালী স্বদেশ-হিতৈষী মহাশয়দিগের নিকট এই দেশ কৃতজ্ঞতা-ঋণে বদ্ধ আছে।" এই কথাটি পাঠ করেও প্রথমেই আমরা অনুভব করি—গদ্যের ভাষা কেরির যুগ, রামমোহনের যুগ, এমন কি, 'সম্বাদ প্রভাকরে'র প্রভাব কাটিয়ে অন্য এক যুগে উত্তীর্ণ হয়েছে। তবে বাঙলা গদ্যের যথোচিত বিকাশ এবার সুস্থির এখনো (১৮৫৬তে) তা বলা চলবে না। প্রকৃতপক্ষে একশত বৎসর পরেও (১৯৫৬) বলতে পারি না বাঙলা গদ্যের যথোচিত বিকাশ ঘটেছে। কিন্তু খ্রীষ্টীয় ১৮৫৬ অব্দের এই বাঙলা দেখে বুঝতে পারি—বাঙলা গদ্যের রূপ অনেকটা সুস্থির হয়েছে, তার বিকাশ-পথ এখন অস্পষ্ট নয়। 'দশ বার বৎসরের' মধ্যে যে তখন এদিকে সত্যই বিশেষ উন্নতি ঘটেছে তাতে সন্দেহ নেই। এটি 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার' বা বিদ্যাসাগরের পর্বের ফল।

সমসাময়িক যাঁদের নাম এ প্রসঙ্গে রাজনারায়ণ বসু উল্লেখ করেছেন তাঁদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্রের (খ্রীঃ ১৮২০-খ্রীঃ ১৮৯১) প্রথম গ্রন্থ 'বেতাল পঞ্চবিংশতি প্রকাশিত হয় ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে (১৯০৩ সম্বতে)। অক্ষয়কুমার দত্তের (খ্রীঃ ১৮২০-খ্রীঃ ১৮৮৬) প্রথম গ্রন্থ 'তত্ত্ববোধিনী সভার' (খ্রীঃ ১৮৩৯) প্রকাশিত ছাত্রপাঠ্য ভূগোল প্রকাশিত হয় ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে। দু জনাই 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার' প্রধান দুই লেখক। কিন্তু রাজেন্দ্রলাল মিত্রের (খ্রীঃ ১৮২২-খ্রীঃ ১৮৯১) মাসিক পত্র 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে প্রকাশিত হতে থাকে। রাজনারায়ণ বসু আরও যে দু'একজন সমসাময়িকের নাম করতে পারতেন, তার মধ্যে 'ইয়ং বেঙ্গলের কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (খ্রীঃ ১৮১৩-খ্রীঃ ১৮৮৫) একজন। বাঙলা গদ্যের বিকাশে তাঁকে বাদ দিলেও পরবর্তী কালের হিসাব সম্মুখে থাকলে রাজনারায়ণ বসু নিশ্চয়ই বলতেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (খ্রীঃ ১৮১৭-খ্রীঃ ১৯০৫) শুধু 'তত্ত্ববোধিনীর' প্রতিষ্ঠাতা নন, তাঁর 'আত্মচরিতের' জন্য বাঙলা গদ্যের অসামান্ত লেখক এবং প্যারীচাঁদ মিত্রও ('টেকচাঁদ ঠাকুর', খ্রীঃ ১৮১৪-১৮৮৩) 'আলালের ঘরের দুলালের' লেখক হিসাবে কথা-মূলক বাঙলা স্বচ্ছন্দ গদ্যের প্রথম শিল্পী। অভিনয়ের উদ্দেশ্যে বাঙলা নাটক রচনায়ও তখন তাগিদ পড়েছে—'কুলীনকুল-সর্বস্ব' প্রভৃতির বাক্যালাপে কথিত বাঙলার রূপ লক্ষিত না হয়ে পারে না। অবশ্য

অন্য দিকে বিদ্যাসাগরের অনুগামী, 'সংস্কৃত কলেজের ছাত্ররা' অনেকে তখন বাঙলা লেখায় হাত দিচ্ছেন। এঁদের আদর্শ ছিল বিদ্যাসাগরের রচনা অপেক্ষাও বিদ্যাসাগরের অভিমত, সেই সংস্কৃতপুষ্ট ভাষা। তা ছাড়া, পুরাতন হিন্দু কলেজের নূতন 'ছাত্ররা' (কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, রাধানাথ শিকদার প্রভৃতি 'ইয়ংবেঙ্গল' ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও হিন্দু কলেজেরই পূর্বপর্যায়ের ছাত্র), মধুসূদনের সহপাঠী রাজনারায়ণ বসু (খ্রীঃ ১৮২৬-১৯০০) ও ভূদেব মুখোপাধ্যায় (খ্রীঃ ১৮২৫-১৮৯৪) বাঙলা রচনায় অগ্রসর হয়েছেন। তাঁরা ইংরেজি-পড়া কৃতী যুবক, সংস্কৃত গদ্যসাহিত্য অপেক্ষা ইংরেজি গদ্য-সাহিত্যের গুণাবলীই তাঁদের লক্ষ্য হওয়া স্বাভাবিক, আর তাই হয়েছিল।

(১) জাগরণের যুগের উন্মেষ

আসল কথা, বাঙলা সাহিত্যের 'প্রস্তুতির পর্ব' তখন (১৮৫৮) সম্পূর্ণ হয়ে আসছে। তাই কেউ যদি খ্রীঃ ১৮৪৩ থেকে খ্রীঃ ১৮৫৭ বা ১৮৫৮ কালকে 'বাঙলার রিনাইসেন্সে'র উন্মেষকাল বলেন, তা হলেও ভুল হবে না—অনেকে এরূপ গণনাই অনুমোদন করেন। রাজনারায়ণ বসুর কথিত এই '১০।১২ বৎসরকে' (খ্রীঃ ১৮৪৩-এ) 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রথম প্রকাশকাল থেকে না ধরে (খ্রীঃ ১৮৩৯-এর) 'তত্ত্ববোধিনী সভার' প্রতিষ্ঠাকাল থেকেও ধরা যায়—অবশ্য খ্রীঃ ১৮৩৮ থেকে খ্রীঃ ১৮৪৩-এর মধ্যে 'প্রভাকরের' পুনঃপ্রকাশ ব্যতীত উল্লেখযোগ্য কোনো সাহিত্যিক প্রকাশ নেই। সাহিত্যে তা ঈশ্বর গুপ্তের 'সম্বাদ প্রভাকরের' কাল। সমাজে তা 'ইয়ং বেঙ্গলের' কাল, ভাব-বিপর্যয়ের ঘূর্ণি তখন প্রবল। খ্রীঃ ১৮৩৮-এর সময় থেকে প্রশাসনিক পরিবর্তনও ঘটছিল, তা দেখেছি। খ্রীষ্টধর্মের আক্রমণের বিরুদ্ধে 'তত্ত্ববোধিনী সভা' এবং বাঙলা শিক্ষার প্রয়োজনে 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা' প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল, এ ঘটনাও সামান্য নয়। ১৮৪৩-এ 'ইয়ং বেঙ্গলের' প্রাথমিক উদ্দামতার শেষে এই আত্ম-সংগঠনের প্রয়াসই ক্রমশ 'ইয়ং বেঙ্গলের' ও অন্যান্যের মধ্যে সুস্থির হয়। রাজনৈতিক দৃষ্টির স্পষ্ট প্রমাণও পাওয়া যায় ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে—তা আমরা উল্লেখ করেছি। এ রাজনৈতিক চেতনার আরো পরিচয় আমরা গ্রহণ করছি। রাজনীতি ছাড়া সমাজনীতিতে আসে তত্ত্ববোধিনীর জিজ্ঞাসার ও বিধবা-বিবাহের আন্দোলন।

শিক্ষাতেও আসে নতুন সম্ভাবনার কাল। মোট কথা খ্রীঃ ১৮৪৩ থেকে খ্রীঃ ১৮৫৭-৫৮ (সিপাহী যুদ্ধ) পর্যন্ত প্রায় পনেরো বৎসর কালকে বাঙলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসে আধুনিক যুগের 'উন্মেষ-কালও' বলা যায়। অবশ্য তা বলে পূর্বেকার খ্রীঃ ১৮০০ থেকে খ্রীঃ ১৮৪৩ পর্যন্ত কাল থেকেও এ পর্ব বিচ্ছিন্ন নয়, বরং সামাজিক-রাজনৈতিক অর্থে ১৮৩১-১৮৪৩এর 'ইয়ং বেঙ্গলের' কালের এইটিই হল পরিণত রূপ। আবার পরবর্তী ১৮৫৮-৫৯এর প্রারব্ধ সৃষ্টি-সমারোহের কাল থেকেও এ পর্ব বিচ্ছিন্ন নয়। আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ও খ্রীঃ ১৮৫৬-১৮৬১কেই বলেছেন বাঙালী সমাজের জীবনের 'মাহেন্দ্রক্ষণ'।

এযুগের শিক্ষিত বাঙালী সিপাহী যুদ্ধকে বাঙালী সমাজের যুগ পরিবর্তনে তত গুরুত্ব দেননি,—আমরা তা দিই। কারণ তার পর ভারত শাসনে যে ব্রিটিশ শিল্প-পুঁজির প্রাধান্য স্থাপিত হবে, আধুনিক কালের সামাজিক-অর্থনৈতিক ও ভাবগত বিপর্যয় ঔপনিবেশিক পদ্ধতিতে অগ্রসর হবে, সিপাহী যুদ্ধের পরে (১৮৫৮) তাতে আর কোনো সন্দেহ রইল না। সিপাহী যুদ্ধ বাঙালীর জীবনে গুরুতর ঘটনা নয়। কিন্তু ভারতব্যাপী রাজনৈতিক-প্রশাসনিক পট-পরিবর্তনের তা একটি মূল কারণ। আর বাঙলাই তখন ভারতের প্রাণকেন্দ্র—শুধু শাসনের নয়; শিক্ষায়, সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনায় বাঙলা অগ্রগণ্য। তাই সেই পট-পরিবর্তনের ফলে বাঙলার রাজনৈতিক ক্ষেত্র ছাড়া সামাজিক-মানসিক ক্ষেত্রেও পরিবর্তনের স্রোত অবারিত হয়ে ওঠে—পাশ্চাত্ত্য জীবনধারা ও চিন্তাধারার প্রসার ক্ষিপ্র থেকে ক্ষিপ্রতর হতে থাকে—এই কারণেই আমরা বাঙালীরাও সিপাহী যুদ্ধকে গুরুত্ব দিতে বাধ্য। তাই মোটামুটি খ্রীঃ ১৮৪৩ থেকে খ্রীঃ ১৮৫৭-৫৮ পর্যন্ত কালকে একটি পর্বকাল বলে গ্রহণ করতে পারি। আর সে পর্বের নাম দিতে পারি—'তত্ত্ববোধিনীর পর্ব' বা 'বিদ্যাসাগরের পর্ব'।

তত্ত্ববোধিনী বাঙলা পত্রিকা ও সাহিত্যের জগতে প্রবেশ করে খ্রীঃ ১৮৪৩-এ, এবং খ্রীঃ ১৮৬৫ পর্যন্ত তা নানা সম্পদ জোগায়—তার পরেও তার দান নানা দিকে স্মরণীয়। কিন্তু খ্রীঃ ১৮৫৮-এর পরে যে অদ্ভুত সাড়া সাহিত্যে জাগে এবং দেখতে-না-দেখতে প্রসারিত হয়, তাকে 'তত্ত্ববোধিনী সভার' সৃষ্টি না বলাই শ্রেয়ঃ। বিদ্যাসাগর তো খ্রীঃ ১৮৪৭-এর পূর্বে কিছুই প্রকাশ

করেননি, আর তাঁর প্রধান কিছু কিছু লেখাও খ্রীঃ ১৮৫৮-এর পরে প্রকাশিত হয়। শিক্ষায়-দীক্ষায় জাগরণের যুগেও সেই অদ্ভুতকর্মা মহাপুরুষ আরও ৩০ বৎসরের উর্ধ্বকাল আপন কর্তব্যে অবহিত ও আপন শক্তিতে অপরাজেয় থাকেন। কিন্তু সমাজ ও সাহিত্য বিদ্যাসাগরের প্রধানতম দান গ্রহণ করেছে খ্রীঃ ১৮৫৭ পর্যন্ত। তারপর থেকে একদিকে ধর্ম-সংস্কারে (যেমন, কেশবচন্দ্র-দেবেন্দ্রনাথ) অন্যদিকে সাহিত্য-সৃষ্টিতে (মাইকেল-দীনবন্ধু-বঙ্কিম) অন্য কৃতী বাঙালীরা প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। কিন্তু বাঙলা গদ্য ১৮৪৩-'৫৭এর মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়। কেউ একা সে কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন না; তথাপি বিদ্যা-সাগরকেই বাঙলা গদ্যের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা বলতে হবে। আর কেউ তা নন,—কেরি নন, রামমোহন নন, মৃত্যুঞ্জয়ও নন। বিদ্যাসাগর শিক্ষা-পুস্তক রচনায় ও প্রচার-গ্রন্থ রচনায় জীবনের শ্রেষ্ঠ দান উৎসর্গ করেছেন। কিন্তু তা নীরস পাঠ্যপুস্তক নয়, যুক্তিসমৃদ্ধ পরিচ্ছন্ন গ্রন্থ, রসাভিষিক্ত চমৎকার রচনা—এই কারণেও তিনি এই কালের যুগ-প্রধান হতে পারতেন। তদুপরি যিনি বিধবা বিবাহের প্রধান কেন, প্রায় একমাত্র প্রবর্তক, যিনি প্রতিটি রচনায় ও প্রচেষ্টায় পুরুষার্থ ও মানবীয় মহত্বকেই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন, তিনি এ-যুগের প্রথম 'হিউম্যানিস্ট'। তাই নিশ্চয়ই আধুনিক যুগের 'যুগ-প্রধান' বলে তাঁকেই গণ্য করা কর্তব্য—সমস্ত উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলায়ও আর এমন দ্বিতীয় মানুষ নেই।

আধুনিক যুগধর্ম যে তিনটি বিশিষ্ট পর্যায় অতিক্রম করে ইউরোপে বিকশিত হয়েছিল তাকে রিনাইসেন্স, রিফর্মেশন ও ফরাসী (বা বুর্জোয়া) বিপ্লব বলা চলে। সাধারণভাবে বলা যেতে পারে, রিনাইসেন্সের মূল অর্থ জীবন-জিজ্ঞাসায় আগ্রহ; রিফর্মেশনের অর্থ—ধর্ম ও সমাজ সংস্কারে উৎসাহ; আর ফরাসী বিপ্লবের সার কথা—গণতান্ত্রিক মধ্যবিত্তের রাষ্ট্রক্ষেত্রে ক্ষমতালাভ। এই সুপরিণত যুগধর্মের সঙ্গে বাঙালীর ও ভারতবাসীর একই কালে পরিচয় ঘটে খ্রীঃ ১৮০০ অব্দের সময় থেকে। অবশ্য পরাধীন জাতি বলে স্বাধীনভাবে এই বুর্জোয়া শিক্ষা তারা স্বাঙ্গীকৃত করতে পারেনি, পারবার কথাও নয়;—এ কথা একবারও আমাদের বিস্মৃত হলে চলবে না। তথাপি রামমোহন রায়ও এই জ্ঞানপ্রসার, ধর্ম- ও সমাজ-সংস্কার এবং রাজনৈতিক আন্দোলন—যুগধর্মের এই ত্রিধারা সম্বন্ধে সচেতন ও সক্রিয় হয়েছিলেন। তারপর থেকে রাজনৈতিক

চেতনা আরও দানা বেঁধে ওঠে, জ্ঞানজিজ্ঞাসা, ধর্মসংস্কার ও সমাজ-সংস্কারও আরও অগ্রসর হয়। এই খ্রীঃ ১৮৪৩ থেকে খ্রীঃ ১৮৫৭-এর পর্বে এসে সেই সমস্ত ধারা সংগঠিত রূপ লাভ করে, যুগধর্ম একটা সুস্পষ্ট আকারে অঙ্কুরিত হয়, এ কথা আমরা পূর্বেই বলেছি।

(ক) রাজনৈতিক চেতনার প্রকাশ

যে রাজনৈতিক ও সামাজিক ঘটনাবলীতে এ পর্বে ভারতীয় জীবনধারা চঞ্চল হয়ে ওঠে এখানে তা বিশদ করে বলা অসম্ভব। শুধু এইটুকুই নির্দেশ করা যায় যে—এলেনবরার যুগ ছাড়িয়ে, ভারতীয় শাসনতন্ত্র ডালহৌসির যুগে উত্তীর্ণ হল। ক্ষমতাচ্যুত দেশীয় সামন্ত রাজাদের রাজ্যচ্যুত করে ডালহৌসি ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ শাসনের একচ্ছত্র আধিপত্যে আনয়ন করলেন। সে সমস্ত সামন্ত-প্রধানদের মনে এ কারণে বিদ্রোহের বহ্নি জ্বলতে লাগল। তাঁদের হাতে ছিল—সাধারণ কৃষকের, বঞ্চিত কারুবিদের যুগ-সঞ্চিত ক্ষোভ। কোম্পানির লুণ্ঠনের যুগে যে প্রজাপীড়ন ও কৃষক-শোষণ অব্যাহত চলেছে তাতে বহুদিন ধরেই অগ্ন্যুৎপাতের উপকরণ জমে ছিল। কোম্পানির সনদ পরিবর্তনের সময় (খ্রীঃ ১৮৫৩) থেকে একদিকে নূতন শিক্ষানীতি ও ইংরেজি শিক্ষার প্রসার, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি আধুনিক ভাবধারার কেন্দ্রসমূহ বিস্তারের চেষ্টা চলল, অন্যদিকে টেলিগ্রাফ (খ্রীঃ ১৮৫৩), রেলওয়ে প্রভৃতি প্রবর্তনের দ্বারা ভারতের আর্থিক জীবন ও ব্রিটিশ শিল্প-জীবনের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করা হল। আধুনিক জীবন-যাত্রায় ভারতীয় বণিক, ভারতীয় কারুবিদ্, ভারতীয় কৃষক সকলেই বঞ্চিত থাকবে, অথচ সেরূপ জীবন-যাত্রার বাহন-সমূহের বিস্তার আরম্ভ হল—ঔপনিবেশিকতার অসঙ্গতি এমন অদ্ভুত। সেই ঘটনাধারার সঙ্গে একদিকে যোগ হয়েছিল আক্রমণমুখী খ্রীষ্টধর্মের ঔদ্ধত্য, অন্যদিকে বিদ্যাসাগর প্রমুখ নবজাগ্রত সমাজ-সংস্কারকদের সরকারী সহায়তায় বিধবা-বিবাহের অনুমোদনে আইন প্রণয়ন। সামন্তযুগের ধর্মান্ধতা-গ্রস্ত হিন্দু জনসাধারণের মনে এসবও বিক্ষোভের সঞ্চার করল। মুসলমান জনসাধারণের মনে পূর্বেই বিক্ষোভ ছিল বাদশাহী নবাবী উজীরী-আমীরী হারানোতে। আয়মা-জমি ও রাজকর্মে ফারসির বিদায়ের সঙ্গে তাদের মধ্যে ওহাবী মনোভাব আরও

বিস্তৃত হয়, তা ক্রমে সুদৃঢ় ব্রিটিশ-বৈরিতায় পরিণত হয়েছিল। অতএব, ডালহৌসি বিদ্রোহের মুখেই ভারতবর্ষকে ঠেলে দিলেন।

বোঝবার মত কথা শুধু এই যে, বাঙলা দেশে পরাজিত জীবনের অসন্তোষকে সংস্কারবাদী শিক্ষিত হিন্দুগণ প্রায় ৪০ বৎসর ধরে (রামমোহনের সময় থেকে) একটা আধুনিক চেতনায় প্রবুদ্ধ রাজনৈতিক আন্দোলনে সংগঠিত করতে সচেষ্ট ছিলেন। রামমোহন ও 'ইয়ং বেঙ্গলের' পর্বের শেষে খ্রীঃ ১৮০৩ থেকে রাজনৈতিক চেতনা প্রবলতর হয়ে উঠেছিল—জুরি প্রথার দাবীতে ও মরিসাসে কুলি প্রেরণের বিরুদ্ধে বাঙালী নেতারা আন্দোলন করেন। সরকারী বেগার খাটার বিরুদ্ধে রাধানাথ শিকদারের চেষ্টাও সার্থক হয়। ১৮৪৯-এর সাধারণ বিচার-পদ্ধতিতে ইউরোপীয়দের বিচার-ব্যবস্থার সরকারী প্রস্তাব ("ব্ল্যাক্ বিল্‌স্) ওঠে; তার সমর্থনে রামগোপাল ঘোষের বাগ্মিতা সকলকে প্রবুদ্ধ করে। খ্রীঃ ১৮৫১ অব্দেই নিষ্ক্রিয় জমিদার সভা ও নিষ্ক্রিয় ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি দুই মিলিয়ে তৈরী হয় "ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান্ অ্যাসোসিয়েশন।" দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তার সম্পাদক হন। রাজনৈতিক কর্মে সদস্যদের উদ্যোগী হতে বলে বিভিন্ন প্রদেশের ভারতীয় নেতাদের তিনি আহ্বান করেন। খ্রীঃ ১৮৫৩ সনে সনদ পরিবর্তনের পূর্বে (খ্রীঃ ১৮৫২) হরিশ মুখুজ্জে কোম্পানির নীল চাষের ও সোরার একচেটিয়া অধিকার রহিত করা; সরকারী উচ্চকর্মে ভারতবাসীর নিয়োগ, এমন কি, ভারতীয় সংখ্যাধিক্যে ভারতীয় আইন-সভা স্থাপনের দাবী উত্থাপন করে জনমত গঠন করেন। মনে রাখা প্রয়োজন, ১৮৮৫ থেকে প্রায় ১০।১৫ বৎসর পর্যন্ত ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসও এর থেকে বেশি রাজনৈতিক দাবী উত্থাপন করতে পারে নি। ১৮৫৩-৫৪তে মধ্যবিত্ত বাঙালী শিক্ষিতদের এসব লিবারল (উদারনৈতিক) দাবী শাসক-গোষ্ঠীও একেবারে অবহেলা করতে পারে নি। আরও লক্ষণীয়, খ্রীঃ ১৮৫৬-তে মিশনারিরা জমিদারী-তন্ত্রের অধীনে রায়তদের অবস্থা অনুসন্ধানের জন্য আবেদন করলে ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের জমিদারবর্গও তা সমর্থন করেন—অভিযোগ প্রধানত জমিদারশ্রেণীর বিরুদ্ধে তা জেনেও তাঁরা এ দাবীতে আপত্তি করলেন না। অর্থাৎ বাঙলার ইংরেজ-সৃষ্ট ভূম্যধিকারীরা ইংরেজি-শিক্ষিত মধ্যবিত্তের (হরিশ মুখুজ্জে, রামগোপাল ঘোষের) নৈতিক নেতৃত্ব তখন থেকেই স্বীকার করতে আরম্ভ করেছেন। আর,

সেই ইংরেজি-শিক্ষিত মধ্যবিত্তই বাঙালী উচ্চবিত্তদের নিয়ে আধুনিক দৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ একটা রাজনৈতিক আন্দোলন বাঙলাদেশে গঠন করে তার নেতৃত্ব লাভ করছে। মনে হয়, খ্রীঃ ১৮৫৭ সালে উত্তর ভারতের অন্য প্রদেশের থেকে তাই বাঙালী সমাজ—অভাবে (Negative) ও প্রভাবে (Positive)—দু'দিকেই একটু বিশিষ্ট ছিল। উত্তর ভারতে পুরাতন সামন্তশ্রেণী ক্ষমতাচ্যুত হলেও সে অঞ্চলে তখনো প্রবল সামন্ত মনোভাব ব্যাপক ছিল, এবং সামন্ত নেতৃত্বও তখন পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। বাঙলায় সেরূপ সামন্তশ্রেণীর অভাব ছিল ; আর আধা-সামন্ত (জমিদারী-তন্ত্রের) মনোভাব ব্যাপক হলেও তত বেশী প্রবল নয়। মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণী ক্ষুদ্র হলেও বাঙলায় তখন তাঁরা প্রভাবশালী, আধুনিক দৃষ্টিও সমাজে প্রসারশীল। শিক্ষিত শ্রেণী রাজনৈতিক আন্দোলন ও সংগঠন দুয়েরই পথ আবিষ্কার করেছে ; অন্ধ অগ্র-পশ্চাৎভাবনাহীন বিক্ষোভে আত্মহারা হবে না। ১৮৫৭-এর বিদ্রোহের স্বরূপ যাই হোক, বাঙলার বাঙালী তার বিরাট রূপ প্রায় দেখতেই পায়নি। বিদ্রোহী সিপাহীদের যেটুকু তারা দেখেছে বা শুনেছে তাতে তারা আশ্বস্ত বোধ করতে পারেনি। ভারতের প্রথম ব্যাপক স্বাধীনতা-প্রয়াসেও যে বাঙালী সমাজে প্রায় কোন চাঞ্চল্য এল না তার কারণ বাঙলায় তখন আধুনিক যুগের গোড়াপত্তন হয়েছে ; বিদেশী বুর্জোয়া শক্তির হাত থেকে এভাবে দেশীয় অসংগঠিত সামন্ত শক্তি ও পশ্চাৎপদ জনশক্তি বিদ্রোহ করে স্বাধীনতা লাভ করতে পারে না, এ বিশ্বাসও প্রবল ছিল। স্বাধীনতার নামেও সেই ব্যর্থ অভ্যুত্থানে তাই বাঙালী শিক্ষিত-সমাজ আত্মবিস্মৃত হতে চায়নি। কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের মহৎ দিকটিকে মনে মনে অবজ্ঞা করতেও তারা পারেনি, তার প্রমাণও রয়েছে। অন্তত দশ বৎসরের মধ্যেই সিপাহী বিদ্রোহকে তারা স্বাধীনতার যুদ্ধ হিসাবে মনে মনে গণ্য করতে আরম্ভ করেছিল—তার প্রমাণও বাঙলা সাহিত্যে প্রচুর। (দ্রষ্টব্য : লেখকের *Bengali Literature Before and After 1857.*)

(খ) জ্ঞানবিস্তার

জ্ঞানপিপাসায় ও জ্ঞানবিস্তারেই বাঙালীর এই চেতনা খ্রীঃ ১৮১৭ থেকে প্রথম দেখা দিয়েছিল। ইংরেজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান (খ্রীঃ ১৮৩৫এ) শিক্ষাপথ রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করলে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কেন, রাধাকান্ত দেব,

রামকমল সেন প্রমুখদেরও অন্যতম প্রয়াস হয়—বাঙলা শিক্ষা যাতে অবজ্ঞাত না হয়, দেশীয় ভাষা ও ঐতিহ্যের জ্ঞান থেকে যাতে এই শিক্ষিতবর্গ বঞ্চিত না হয়, যাতে শিক্ষিত যুবকগণ দেশের প্রতি শ্রদ্ধা না হারায়। এ উদ্দেশ্যেই দেবেন্দ্রনাথ 'তত্ত্ববোধিনী সভা' ও 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা' প্রতিষ্ঠা করেন; অক্ষয়কুমার দত্তকে আপনার সহকারী রূপে গ্রহণ করেন। অন্যদিকে, খ্রীঃ ১৮৫৩-এর সনদ পরিবর্তনের পরে খ্রীঃ ১৮৫৪তে বাঙলার ছোটলাট ফ্রেডারিক জে. হ্যালিডের শিক্ষাবিষয়ক মন্তব্যে (মিনিটে) দেশীয় ভাষায় নিম্নতর শিক্ষা-বিস্তারের প্রস্তাব ছিল। এ প্রস্তাবের সঙ্গে সংযুক্ত হয় তখনকার সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের লিখিত একটি খসড়া। তার মর্ম এই—মাতৃভাষায় ভিন্ন সাধারণের শিক্ষা সম্ভব নয়। আর এ খসড়ায় মাতৃভাষা মারফতে শিক্ষণীয় বিষয় সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর যা নির্দেশ করেন কোনো ইংরেজিওয়ালা বৈজ্ঞানিকেরও তাতে আপত্তি করা অসম্ভব। সেই খসড়া হচ্ছে প্রথম ভারতীয় শিক্ষাবৈজ্ঞানিকের মানবধর্মবাদসম্মত (Humanist) শিক্ষা-প্রস্তাব (দ্রঃ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোঃ 'বিদ্যাসাগর', সাঃ সাঃ চরিতমালা)। এর পরে অবশ্য বিদ্যাসাগর 'বঙ্গবিদ্যালয়' স্থাপনের ভার নিয়ে ও স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য 'বালিকা বিদ্যালয়' স্থাপনের কাজ নিয়ে অদ্ভুত উদ্যমের সঙ্গে কার্যক্ষেত্রেও অগ্রসর হন। এই সময়েই (খ্রীঃ ১৮৫৬) তিনি বিধবা-বিবাহের আন্দোলনও আপনার জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেন। অন্যদিকে, 'উডের ডেসপ্যাচের' ফলস্বরূপ আধুনিক ভারতের সরকারী শিক্ষানীতি প্রণীত হয়, জিলা স্কুল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং শিক্ষা বিভাগ সুগঠিত হয়; কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে ভারতের প্রথম তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হয় (খ্রীঃ ১৮৫৭-এর প্রথম দিকেই), অর্থাৎ খ্রীঃ ১৮১৭-এর সেই শিক্ষাদীক্ষা খ্রীঃ ১৮৫৭তে মধ্যবিত্তের শিক্ষায়োজনে রূপায়িত হয়েছে।

(গ) সংস্কার আন্দোলন

রামমোহনের ঐতিহ্য : ধর্ম- ও সমাজ-সংস্কারের তর্ক কোনো সময়েই থামেনি। কিন্তু রামমোহনের অভাবে তাঁর ব্রহ্মোপাসনার মণ্ডলী প্রায় বিলুপ্ত হয়েছিল—আলেকজাণ্ডার ডাফের খ্রীষ্টধর্মের আন্দোলন ও 'ইয়ং বেঙ্গলে'র সংশয়বাদই তখন প্রবল। রামমোহনের ঐতিহ্যকে আশ্রয় করে এ দুয়ের

বিরুদ্ধেই দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথমত 'তত্ত্ববোধিনী সভা' (খ্রীঃ ১৮৩৯) স্থাপন করেন, নানা বিষয় তাতে আলোচিত ও ব্যাখ্যাত হত। তারপরে সভার অনুপস্থিত সদস্যদের প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠিত করেন 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' (খ্রীঃ ১৮৪৩)—অক্ষয়কুমার তার প্রধান লেখক। এ পত্রিকার পাতায় অক্ষয়কুমার বিজ্ঞান, দর্শন ও পুরাবৃত্তের যুক্তিবাদী আলোচনা চালালেন, আর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও যুবক রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি বেদান্তপ্রতিপাদ্য ধর্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা করতে থাকেন। বিদ্যাসাগরও এই পত্রে লিখতেন, এবং খ্রীঃ ১৮৭৫তে তিনি 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদক রূপেও কাজ করেন। প্রধানত দেবেন্দ্রনাথের চেষ্টাতেই রামমোহন রায়ের ব্রহ্ম-আন্দোলন নূতন করে আবার জন্মগ্রহণ করল। প্রথমে তা 'বেদ অপৌরুষেয়' এই মত গ্রহণ করে 'বেদান্তপ্রতিপাদ্য ধর্ম' বলে নিজের পরিচয় দিত। পরে, কতকটা খ্রীষ্টান সমালোচকদের যুক্তির উত্তরে, কতকটা অক্ষয়কুমার প্রমুখদের যুক্তিতে দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখ ধর্ম-জিজ্ঞাসুরা বেদের অপৌরুষেয়তা-বাদ পরিত্যাগ করেন। এভাবে অবশ্য শুধু খ্রীষ্টান প্রচার নয়, 'ইয়ং বেঙ্গলে'র ধর্মহীন যুক্তিবাদও বাধাপ্রাপ্ত হয়। পরে কেশবচন্দ্র সেন এসে সেই ব্রাহ্মসমাজে বিপুল ভাবাবেগ সঞ্চার করলেন—তাই জাগরণের যুগে সেই ধর্ম- ও সমাজ-সংস্কারের আন্দোলন প্রবলতম একটা শক্তিরূপে জাতীয় জীবনে দেখা দিল।

ইয়ং বেঙ্গলের ঐতিহ্য : রামমোহনের এই ধর্ম-সংস্কারের ধারাকে এক হিসাবে প্রায় পাশ কাটিয়েই বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্ত রামমোহনের যুক্তিবাদী জিজ্ঞাসার ধারা ও সমাজ-সংস্কারের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যান—'তত্ত্ববোধিনী সভা ও পত্রিকায়' ও তাঁদের কর্মক্ষেত্রে। ইয়ং বেঙ্গলের বিদ্রোহ, অসংযম ও বিজাতীয় আচার-ব্যবহার এঁরা কেউ এক মুহূর্তও সহ্য করতেন না। এঁরা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসুরও সহকারী। কিন্তু একদিক দিয়ে এঁরাই রামমোহনের সঙ্গে ইয়ং বেঙ্গলের, মধ্যবিত্তদের যুক্তিবাদের ও সংস্কারপ্রেরণার সামঞ্জস্য সাধন করেন, তা অনেকে বিস্মৃত হন। সমাজ-সংস্কারে, বিধবা-বিবাহ বিষয়ে, বহুবিবাহ বিরোধিতায় 'ইয়ং বেঙ্গল' এঁদের পূর্বেই যাত্রাপথে পদার্পণ করেছিলেন—তাঁদের উদ্দামতা নয়, কিন্তু তাঁদের যুক্তিবাদী ঐতিহ্য এঁদের গ্রাহ্য করতে হয়েছে। সর্বদিক দিয়ে দেখলে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে আধুনিক যুগধর্মের মূল সত্য যে মানব-নিষ্ঠ জীবন-

জিজ্ঞাসা ও কর্ম-প্রেরণা, বিদ্যাসাগরের তা'ই ছিল জীবনবেদ—রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তিনি একক এবং সেই বিস্ময়কর যুগেরও বিস্ময়।

বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার ও দেবেন্দ্রনাথ এই তিনজনই সিপাহী যুদ্ধের পরে বহু বৎসর পর্যন্ত নিজ নিজ দানে জাগরণের যুগকে সমুজ্জ্বল করেছেন। কিন্তু তখন অন্যান্য কর্মীও অগ্রসর হয়ে এসেছেন। অথচ খ্রীঃ ১৮৪৩ থেকে খ্রীঃ ১৮৫৭ এই উন্মেষ-ক্ষণের তাঁরাই যুগস্রষ্টা। তাই এই পর্বের আলোচনা কালেই তাঁদের রচনার বিষয়ে সমগ্রভাবে আলোচনাও শেষ করা হল। কিন্তু কাল হিসাবে বা ভাবপ্রবর্তক হিসাবে এই পর্বেই তাঁরা নিঃশেষিত হননি, তা মনে রাখা প্রয়োজন। এই কথা রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি মনস্বীদের সম্বন্ধেও সত্য—যদিও এই পর্বের প্রসঙ্গেই তাঁদের পরিচয়ও আমরা গ্রহণ করেছি। 'হিন্দু কলেজের লেখক-গোষ্ঠী' ও 'সংস্কৃত কলেজের লেখক-গোষ্ঠী'ও অনেকাংশেই এ সময় থেকে লেখা আরম্ভ করেন, তাও মনে রাখা প্রয়োজন।

(২) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

'তত্ত্ববোধিনী সভা' ও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বাঙলা দেশের সাংস্কৃতিক জীবনকে জাতীয় ধারায় সংগঠিত ও বাস্তবস্তর জিজ্ঞাসায় সংহত করে। 'তত্ত্ববোধিনী সভা' স্থাপিত হয় খ্রীঃ ১৮৩৯, ৬ই অক্টোবর। 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা' (The Society for Acquisition of General Knowledge) তার কিছু পূর্বেই কার্যারম্ভ করেছিল (১৮৩৮, ৬ই মে)। তত্ত্ববোধিনী তার অপেক্ষা 'উদারতর অভিপ্রায়ে প্রবর্তিত হইয়াছিল' (ভূদেব মুখোপাধ্যায়)। শীঘ্রই তার সভ্যসংখ্যা পাঁচ শতের বেশি হয়ে যায়। তার আলোচনায় ধর্মতত্ত্ব, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতিই প্রাধান্য লাভ করে। দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজ পুনঃস্থাপিত করলেন (খ্রীঃ ১৮৪১); 'বেদান্তপ্রতিপাদ্য ব্রাহ্মধর্ম' স্বীকার করলেন;' তারপর, ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে (১৭৬৫ শকাব্দ, ১লা ভাদ্র) ব্রাহ্মসমাজের ব্যাখ্যান অনুপস্থিত সদস্যদের নিকট প্রকটিত করবার উদ্দেশ্যে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশিত করলেন। এ পত্রিকায় প্রবন্ধাদি নির্বাচনের দায়িত্ব ছিল 'গ্রন্থাধ্যক্ষদের' হাতে—এ একটি উল্লেখযোগ্য কথা। একালের ভাষায় তাঁদের বলা চলে 'সম্পাদকমণ্ডলী'। তাঁদের মধ্যে ছিলেন অক্ষয়কুমার

দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি খ্যাতনামা মনস্বীরা। দেবেন্দ্রনাথের লেখাও তাঁরা প্রকাশিত করতে সময়ে সময়ে বাধা দিতেন। প্রথম ১২ বৎসর অক্ষয়কুমার দত্ত ছিলেন সম্পাদক। তাঁর বিজ্ঞান ও নীতিবিষয়ক আলোচনাই 'পত্রিকা'কে শীর্ষস্থানীয় করে তোলে। অক্ষয়কুমার অসুস্থতার জন্য অবসর গ্রহণ করলে (খ্রীঃ ১৮৫৫) বিদ্যাসাগর পত্রিকার সম্পাদনভার গ্রহণ করেন। পূর্বাপরই তাতে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যাখ্যান, এবং রাজনারায়ণ বসু ও পরে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের লেখা প্রকাশিত হত। বাঙলা গদ্যের ক্ষেত্রে এঁদের কৃতিত্ব স্মরণে রাখলে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র দানও উপলব্ধি করা যায়—রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' ও 'রহস্য সন্দর্ভে'র সম্মুখে এ আদর্শই ছিল। আর তারপর প্রথম কল্পের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' বন্ধ (খ্রীঃ ১৮৬৫ ?) হলেও, 'বঙ্গদর্শন' আবির্ভূত হল (এপ্রিল, ১৮৭২)।

অক্ষয়কুমার সম্পাদিত 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' সম্বন্ধে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেছেন—" 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' সমস্ত বাঙলায় ইউরোপীয় ভাব-প্রচারের মিশনারি ছিল। বাঙালীর ছেলেদের মধ্যে ইংরেজির ভাব প্রবেশ করান সর্বপ্রথম অক্ষয়কুমার দত্ত দ্বারা সাধিত হয়।" বলা বাহুল্য এ কাজ তত্ত্ব-বোধিনীর প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অভীষ্ট ছিল না। তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় তত্ত্বজ্ঞান ও ভগবৎ-চিন্তা প্রচার দ্বারা য়ুরোপীয় ভাব-বন্যাকে সংযত করা, হয়ত বা প্রতিরোধ করা। অক্ষয়কুমার দত্তের প্রধান কৃতিত্ব সেই তত্ত্ববোধিনীর মারফতেই তিনি যুক্তিবাদে ও বৈজ্ঞানিক চিন্তায় বাঙালীকে দীক্ষিত করেছেন; আধ্যাত্মিক ভাবাদর্শে একেবারে কেন্দ্রচ্যুত হতে দেননি।

অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬)

অক্ষয়কুমার দত্তের জন্ম নবদ্বীপের নিকটস্থ চুপি গ্রামে (খ্রীঃ ১৮২০)। সে বৎসরই বিদ্যাসাগরও জন্মগ্রহণ করেন বীরসিংহ গ্রামে। দু'জনাই অনেকাংশে একই সাধনার সাধক—বাঙলা গদ্যে ও বাঙালীর চিন্তার ক্ষেত্রে তাঁরা পরিচ্ছন্নতা ও শক্তির সঞ্চার করে গিয়েছেন। কিন্তু দু'জনার মনের গঠন পৃথক। তাই অক্ষয়কুমার রেখে গিয়েছেন নিরাবেগ বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির বিশুদ্ধ

ঐতিহ্য—বিদ্যাসাগর সুদৃঢ় জীবননিষ্ঠা ও প্রাণরসে পুষ্ট মানবতা-বাদের মহৎ উত্তরাধিকার। আজ পর্যন্তও বলা চলে না বাঙলা সাহিত্য তাঁদের দান-ফল সম্পূর্ণ ভোগ করতে পেরেছে।

জীবন-কথা : অক্ষয়কুমারের পিতা কলকাতায় খিদিরপুরে কাজ করতেন। তাই অক্ষয়কুমার কলকাতায় শিক্ষালাভের সুযোগ পান। অবশ্য সে সুযোগ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ওরিয়েণ্টাল সেমিনারিতে মাত্র তিন বৎসর তিনি পড়তে পান, তখন তাঁর পিতার মৃত্যু হয়; তিনি বিষয়কর্মের চিন্তায় বিদ্যালয় ত্যাগ করেন। কিন্তু তার বহু পূর্বেই বালক অক্ষয়কুমারের জ্ঞান-পিপাসা জেগেছিল; নানা ভাষা শিক্ষা ছাড়াও তাঁর অধিকতর আগ্রহ জাগে ভূগোলে, গণিতে ও প্রকৃতি-বিজ্ঞানে, নীতি-বিষয়ক নানা প্রশ্নে। বিদ্যালয় ত্যাগ করতে বাধ্য হলেও তিনি অধ্যয়ন-স্পৃহা কিছুমাত্র ত্যাগ করলেন না। এমন কি, সে সুযোগ ছাড়তে হবে এমন কোন বৃত্তিও গ্রহণ করতে চাইলেন না। এরূপ অবস্থায় তাঁর পরিচয় ঘটে 'সম্বাদ-প্রভাকরে'র সম্পাদক ঈশ্বর গুপ্তের সঙ্গে। গুপ্ত কবির অনুসরণে এক-আধটি পদ্য রচনার পরে অক্ষয়কুমার তাঁর পত্রিকায় কিছু কিছু গদ্য রচনা লিখলেন। ঈশ্বর গুপ্তই তাঁকে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দেন। দেবেন্দ্রনাথ নিজ পৈতৃক ভবনে তখন (খ্রীঃ ১৮৩৯) 'তত্ত্ববোধিনী সভা' প্রতিষ্ঠা করে জ্ঞান ও অধ্যাত্মবিদ্যার আলোচনায় অগ্রসর হয়েছেন। অক্ষয়কুমার প্রথম 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালায়' শিক্ষক নিযুক্ত হন। সেই সভার উদ্যোগেই 'পাঠশালার' পাঠ্যরূপে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম গ্রন্থ ভূগোল। তারপর 'বিদ্যাদর্শন' নামক একখানা মাসিক পত্রিকারও কয়েক সংখ্যা অক্ষয়কুমার প্রকাশিত করেন—এ 'বিদ্যাদর্শনে'র নামের রেশ পরবর্তী 'বঙ্গদর্শনে', 'আর্যদর্শনে'ও দেখতে পাওয়া যাবে। কিন্তু অক্ষয়কুমারের মনীষার পথ উন্মুক্ত হল খ্রীঃ ১৮৪৩ সালে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র প্রকাশে। তিনিই তার প্রথম সম্পাদক ও প্রধান লেখক পদে বৃত হন। আর ক্রমাগত ১২ বৎসর (খ্রীঃ ১৮৫৫ পর্যন্ত) তিনি এ কাজ অক্লান্ত যত্নে সম্পাদন করেন। তাঁর অধিকাংশ গ্রন্থের প্রবন্ধাবলীই প্রথম এ পত্রিকার পাতায় প্রকাশিত হয়েছে। তত্ত্ববোধিনীর লেখক রাজনারায়ণ বসু (বাঃ ভাঃ ও সাঃ বিঃ বক্তৃতা, ১৮৭৮) বলেছেন—প্রথম প্রথম তাঁর লেখাতে কাঠিন্য ও ত্রুটি থাকত, তা দেবেন্দ্রনাথ ও বিদ্যাসাগর সংশোধন করে দিতেন। "অক্ষয়বাবু কিন্তু সংশোধনের অতীত

হইয়া অসাধারণ প্রভায় দীপ্তি পাইয়াছিলেন।" কঠিন শিরঃপীড়ার জন্ত যখন অক্ষয়কুমার তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদনা-কর্ম ত্যাগ করতে বাধ্য হন, তখন বিদ্যাসাগর এসে সে ভার গ্রহণ করেন (খ্রীঃ ১৮৫৫)। বিদ্যাসাগরের অনুরোধেই অক্ষয়কুমার নবপ্রতিষ্ঠিত নর্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষকপদ গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু শিরঃপীড়ার জন্ত এক বৎসর পরেই তা ত্যাগ করেন। পীড়া সত্ত্বেও তাঁর জ্ঞানস্পৃহা ব্যাহত হয়নি, এবং রচনাও একেবারে বন্ধ হয়নি। এই সময়েই বরং তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের' প্রধানতম অংশসমূহ রচিত হয়। অবশেষে খ্রীঃ ১৮৮৬ সালে বহুদিন-স্বাস্থ্যহীন অক্ষয়কুমার পরলোক গমন করেন। তাঁর অনেক লেখা তখনো 'তত্ত্ববোধিনীর পাতা'তেই নিবদ্ধ থেকে গিয়েছিল, সব লেখা এখনো প্রকাশিত হয়নি—যেমন, তাঁর (ও বিদ্যাসাগরের ?) জমিদারী প্রথার বিরুদ্ধে সমালোচনা।

'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' অক্ষয়কুমার দত্তের পরিচিত গ্রন্থাদির মধ্যে সর্বাগ্রে প্রকাশিত হয়। প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয় খ্রীঃ ১৮৫২ অব্দে, দ্বিতীয় ভাগ খ্রীঃ ১৮৫৩তে। জর্জ কুম্ব (George Combe) নামক ইংরেজ লেখকের 'মানুষের গঠন' (Constitution of Man) নামক ইংরেজি গ্রন্থ অবলম্বন করে অক্ষয়কুমারের এ গ্রন্থ রচিত। কিন্তু অক্ষয়কুমার তাতে বিবেচনা অনুযায়ী সংযোজন ও পরিবর্তন যথেষ্ট করেছেন। গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য এই যে, ভগবানের নিয়ম লঙ্ঘন করলেই মানুষের দুঃখ, সেই নিয়ম পালনে তার সুখ। বিধাতার যে নিয়মসমূহ বিশ্ববিধানে দেখা যায় তা কী কী, কোন্ নিয়ম পালনে সুখ, কোন্ নিয়ম লঙ্ঘনে কী দুঃখ, তাই লেখকের আলোচ্য। গ্রন্থের প্রথম ভাগে প্রাকৃতিক নিয়ম, মানুষের শারীর বৃত্তি ও মানস বৃত্তির ও জীবনযাত্রার নীতিপদ্ধতি আলোচনা করে অক্ষয়কুমার নিরামিষ ভোজনের সুফল ব্যাখ্যা করেছেন। দ্বিতীয় ভাগে ধর্ম ও সামাজিক নিয়ম, নিয়ম পালনের ফল, নানা প্রাকৃতিক নিয়মের সমবেত কার্য, ব্যক্তির পক্ষে তার ফলাফল, সুরাপানের কুফলতা—এ সব বিষয় আলোচিত হয়েছে। এসব আলোচনা যতই মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় হোক, 'রম্যরচনা'র মত মুখরোচক হতে পারে না। তথাপি অক্ষয়কুমারের প্রধান কৃতিত্ব এই যে এসব প্রয়োজনীয় আলোচনায় তিনি বাঙালীকে উৎসাহিত করেছেন, আর বাঙলা গদ্যের সেযুগে তিনি এরূপ আলোচনা অনুসৃত করতে পেরেছিলেন। সেদিনের

ইংরেজি-জানা লোকেরা এ আলোচনা পাঠ করে এর যুক্তিধারায় বিস্মিত হন, যুবকেরা তার নীতি-ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হন,—সেই সূত্রে 'ইয়ং বেঙ্গলের' যুক্তিবাদ উচ্ছৃঙ্খলতা-মুক্ত হয়ে উঠবার সুযোগ লাভ করে,—তাঁদের লক্ষ্যই শ্রেয়তর পথে সাধিত হতে থাকে।

'ধর্মনীতি' নামে অক্ষয়কুমারের গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয় অক্ষয়কুমারের অসুস্থ অবস্থায়, খ্রীঃ ১৮৫৬ অব্দে। সে গ্রন্থ যেন এই 'বাহ্যবস্তুর তৃতীয় ভাগ স্বরূপ। কর্তব্যাকর্তব্য, ধর্মাধর্ম থেকে দাম্পত্যজীবন, সন্তানপালন, ভ্রাতা-ভগ্নীর আচরণ, দাসদাসীর সহিত ব্যবহার প্রভৃতি গৃহধর্মের বহু প্রশ্নই এতে আলোচিত হয়েছে। এ বইও শিক্ষিত সাধারণের সমাদর লাভ করে। এসব গ্রন্থে অক্ষয়কুমার যে ধর্মনীতি ব্যাখ্যা করেছেন তা অধ্যাত্মধর্ম নয়, প্রধানত মনুষ্যধর্ম। এরূপ নতুন নীতিবোধ বা মূল্যবোধ আধুনিক যুগধর্মই পরিস্ফুট করে। ন্যায়-নীতি এ যুগে ঐহিক (secular) বিচার-বুদ্ধির দ্বারা স্থির হয়। পূর্ব-পূর্ব যুগে তা পারত্রিক ও পারমার্থিক পাপ-পুণ্যের ধারণার দ্বারাই স্থির হত।

অক্ষয়কুমারের প্রকাশিত পুস্তকের মধ্যে সর্বাধিক পরিচিত 'চারুপাঠ' ১ম, ২য় ও ৩য় ভাগ। প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয় খ্রীঃ ১৮৫২ অব্দে (১৭৭৪ শকাব্দে); দ্বিতীয় ভাগ খ্রীঃ ১৮৫৪ অব্দে (১৭৭৬ শকাব্দে); তৃতীয় ভাগ খ্রীঃ ১৮৫৯ অব্দে (১৭৮১ শকাব্দে)—তখন অক্ষয়কুমার কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। এ গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের তথ্য বিস্তার। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে প্রধান পাঠ্য পুস্তক হিসেবে 'চারুপাঠ বাঙালী শিক্ষার্থীদের মনকে তথ্যনিষ্ঠ করতে বিশেষ সহায়তা করেছে—বিংশ শতকেও তথ্যনিষ্ঠ পাঠ্য-পুস্তকের প্রয়োজন শেষ হয়নি—'চারুপাঠ' সে হিসাবে এখনো উল্টিয়ে দেখার মত।

'চারুপাঠে'ও পূর্বাপর সেই বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞান ও নীতিধর্ম প্রচারই অক্ষয়কুমারের উদ্দেশ্য ছিল।, তথাপি তিনি যে একেবারে কল্পনাবিমুখ লোক ছিলেন না তার প্রমাণ তৃতীয় ভাগের 'স্বপ্নদর্শনের' তিনটি প্রবন্ধ। ইংরেজ সুলেখক অ্যাডিসন-এর (Addisou) 'মির্জার স্বপ্ন' (Vision of Mirza) নামক বিখ্যাত কথাটি অবলম্বন করেই তা রচিত। অষ্টাদশ শতকের ইংরেজি সাহিত্য ও বস্তুনিষ্ঠ মনোভাব যদি বাঙলা গদ্যের গঠন-যুগে আরও অধিক প্রভাব বিস্তার করত, তা হলে বাঙলা গদ্য-সাহিত্যের উপকারই হত। সে দৃষ্টি ও

মনোভাব অন্তত অক্ষয়কুমার দত্ত যে আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন তার প্রমাণ শুধু উপরের গ্রন্থ কয়খানি নয়—তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়'।

ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় শুধু অক্ষয়কুমারের শ্রেষ্ঠ রচনাই নয়, এটি বাঙালীর গবেষণা-মূলক সাহিত্যের এক প্রধান ও প্রথম নিদর্শনও। আজও এর সমতুল্য গ্রন্থ এদিকে বাঙলায় রচিত হয়নি। 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' দুই ভাগে সমাপ্ত। প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয় খ্রীঃ ১৮৭০এ, দ্বিতীয় ভাগ খ্রীঃ ১৮৮৩তে—অর্থাৎ বাঙলা সাহিত্যে যখন সৃষ্টির সমারোহ। তৃতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়নি, তার কিছু কিছু প্রবন্ধ একালের মাসিকপত্রে প্রকাশিত হয়েছে (দ্রঃ ব্রজেন্দ্র—সাঃ সাঃ চঃ ১২)। এ গ্রন্থের সূচনা হয় 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার' পাতায়, তবে যথার্থ রচনা সম্পন্ন হয় যখন ভগ্নস্বাস্থ্য লেখক রোগ-যন্ত্রণায় প্রায় অচল। সেদিক থেকেও বাঙালীর জ্ঞাননিষ্ঠা ও অদম্য কর্মশক্তির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়। আর বিষয়গৌরবে ও লিপিকুশলতায় সত্যই তা 'masterpiece' (সুকুমার সেন—বাঃ সাঃ গদ্য, পৃঃ ৭৮)—'গুরু অবদান'।

অক্ষয়কুমারের প্রায় লেখার মূলেই ইংরেজি গ্রন্থ বা প্রবন্ধাদির আদর্শ আছে। সে হিসাবে 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের'ও মূল বা আদর্শ উইলসন (H. H. Wilson) রচিত 'হিন্দু ধর্ম সম্প্রদায় বিষয়ক চিত্রাবলী' ('Sketches on the Religious Sects of the Hindus) নামক ইংরেজি নিবন্ধসমূহ। তিনিও সহায়তা-লাভ করেছিলেন ফারসি ও নাভাজীর 'ভক্তমাল' থেকে, অক্ষয়কুমারের গ্রন্থের 'উপক্রমণিকায়' তা উল্লেখিত হয়েছে। উইলসনের নিবন্ধ প্রথম Asiatic Researches নামক গবেষণা-পত্রে প্রকাশিত হয়, পরে ১৮৬১-১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে রোস্ট (Rost) কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। তখন উইলসনের গ্রন্থাবলীতে 'হিন্দুধর্ম বিষয়ক নিবন্ধ ও বক্তৃতাবলী' (Essays and Lectures on Hindu Religion) নামে দু'খণ্ডে তা প্রকাশিত হয়। কিন্তু কোনো গ্রন্থেরই অক্ষয়কুমার নিছক অনুবাদক নন। উইলসন এক্ষেত্রে পথপ্রদর্শক নিঃসন্দেহে। অক্ষয়কুমার অনুগামী হলেও যোগ্য উত্তরসাধক। একথা জানলেই তা বোঝা যাবে যে, উইলসনের গ্রন্থে মোট ৪৫টি সম্প্রদায়ের কথা ছিল,

অক্ষয়কুমার দত্তের গ্রন্থে আছে মোট ১৮২টি সম্প্রদায়ের বিবরণ। উইলসন ছাড়াও অন্যান্য দেশীয় লেখকদের লেখা থেকে তিনি কিছু কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু অক্ষয়কুমারের নিজের সংগ্রহ প্রচুর, আর উইলসনের মত পূর্ববর্তীদের তথ্যাদিতেও তিনি বহুরূপে সংশোধন ও সংযোজন করেছিলেন। গ্রন্থের দু'ভাগে (মোট প্রায় ৩০০ পৃষ্ঠায়) দু'টি 'উপক্রমণিকাও' অশেষ মূল্যবান্। প্রথম ভাগের উপক্রমণিকায় মূল আর্য (হিন্দ্-ইউরোপীয়), আর্য (হিন্দ্-ইরাণীয়) এবং ভারতীয় আর্য (ছান্দস্ ও সংস্কৃত) ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস আলোচিত হয়েছে। ভাষা-বিজ্ঞানের আলোচনা ভারতবাসী কর্তৃক এই প্রথম (সুঃ সেন—বাঃ সাঃ গদ্য পৃঃ ৭৮)। সর্বসমেত এ গ্রন্থ যখন প্রকাশিত হতে থাকে তখন রাজেন্দ্রলাল মিত্র (এমন কি বঙ্কিমচন্দ্রও) এসব বিষয়ে আলোচনায় অগ্রসর হয়ে এসেছেন। কিন্তু তত্ত্ববোধিনীর লেখক শুধু তাঁদের অগ্রজ নন, অগ্রবর্তীও। অক্ষয়কুমারের আরও দু'একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা আছে, কিন্তু তাঁর অনেক প্রবন্ধ জীবিতকালে প্রকাশিত হয়নি। মৃত্যুর বহু পরে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে সেরূপ কিছু লেখা 'প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্য বিস্তার নাম দিয়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছিলেন। তবু তাঁর সহযোগী রাজনারায়ণ বসুর ('বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা) কথা স্মরণীয়: "অক্ষয়বাবুর প্রণীত 'বাহ্যবস্তু' ও 'ধর্মনীতি' তাঁহার সর্বোত্তম গ্রন্থ নহে, উহা অনেক পরিমাণে ইংরেজির অনুবাদমাত্র (তখনো 'ভারতীয় উপাসক সম্প্রদায়' প্রকাশিত হয়নি, তাই বক্তা তার উল্লেখ করতে পারেননি—লেখক). তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশিত প্রাচীন হিন্দুদিগের বাণিজ্য. পাণ্ডবদিগের অস্ত্রশিক্ষা কলিকাতার বর্তমান দুরবস্থা প্রভৃতি তাঁহার স্বকপোলরচিত প্রস্তাবই তাঁহার সর্বোত্তম রচনা।"

অক্ষয়কুমার দত্ত তাই বাঙলা সাহিত্যে প্রায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অগ্রে ও তাঁর সঙ্গেই স্মরণীয়। তাঁর প্রধান কীর্তি—(ক) তিনি "য়ুরোপীয় ভাব-প্রচারের মিশনারি", তথ্যনিষ্ঠ জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলন ও প্রচার তিনিই বাঙলায় প্রথম আরম্ভ করেন—অনন্যচিত্তে ও সার্থকভাবে। এ প্রসঙ্গেই হয়ত বলা প্রয়োজন—তাঁর যুক্তিবাদে ও আলোচনায় দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখ ব্রাহ্ম সহযোগীরা 'বেদ অপৌরুষেয়' এই মত ত্যাগ করে ব্রাহ্মধর্মকে অনেকটা যুক্তিবাদী করে তোলেন। অক্ষয়কুমার নিজে অবশ্য নিরাকার উপাসনা ত্যাগ করে ক্রমে

অজ্ঞেয়বাদী (agnostic) হয়ে পড়েন—এটি শুধু তাঁর বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির ফল নয়, তাঁর সুদৃঢ় নীতিবোধেরও পরিচায়ক। (খ) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় যথার্থই বলেছেন—"তিনিই বাঙালীর সর্বপ্রথম নীতি-শিক্ষক।" এই বিষয় মাহাত্ম্য, গবেষণা প্রয়াস ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ছাড়াও, অক্ষয়কুমার স্মরণীয়। (গ) বাঙলা গদ্যে বহুবিধ কঠিন তথ্যের ও ভাবের প্রকাশ দক্ষ লেখক রূপে। আজ তা আমরা বুঝতে পারব না; কারণ, বাঙলা গদ্য এখন দাঁড়িয়ে গিয়েছে। তাই অক্ষয়কুমারের বাঙলাকে এখন মনে হয় তৎসম-কণ্টকিত গদ্য; তার গতি ব্যাহত, আর প্রায়ই খণ্ডিত। অবশ্য 'ভারতীয় উপাসক সম্প্রদায়ে' তা অনেকটা বিষয়ানুরূপ ঋজুতা লাভ করেছে (তবে তা গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে বঙ্কিম আবির্ভূত হয়েছেন)। প্রকৃতপক্ষে গদ্যের যা প্রথম উপযোগিতা তা হচ্ছে সাধারণ কাজ চালানো। তারপর, গদ্য হচ্ছে Age of Reason-এর স্বভাষা। সেই 'কাজের কথার গদ্য' ও যুক্তির আশ্রয় গদ্যভাষায় রচনায় প্রথম চেষ্টা করেন অক্ষয়কুমার। কিন্তু এডিসন প্রমুখ এরূপ ইংরেজি গদ্যের স্রষ্টারা এ জাতীয় গদ্যে চমৎকার রসিকতার যোগান দিয়েছেন; অক্ষয়কুমারের গদ্যে তার বিশেষ অভাব। রসিকতা কেন, অক্ষয়কুমারের গদ্যে সরসতাও নেই, তা বিশুদ্ধ যুক্তিবাদের ভাষা। রসিকতা অবশ্য বাঙলা গদ্যের দুর্লভ গুণ, তা বিদ্যাসাগরেও প্রায় নেই। কিন্তু বিদ্যাসাগরের গদ্য নীরস বা নিরাবেগ গদ্য নয়, অথচ তিনিও যুক্তিধর্মী। এইজন্য বিদ্যাসাগরের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার্য।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১)

'তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ'—একথা ঊনবিংশ শতকের কীর্তিমান বাঙালীদের মধ্যে যাঁর সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশি সত্য তিনি বিদ্যাসাগর। তাঁর ব্যক্তিত্ব তাঁর প্রারব্ধ বহু প্রচেষ্টার অপেক্ষাও মহত্তর। এ মানুষের স্বরূপ না বুঝলে সেই শতকের বাঙালী-প্রয়াস বোঝা অসম্পূর্ণ থাকে (বিশদ জীবনচরিত না পেলে সাহিত্য-জিজ্ঞাসুর পক্ষে এজন্য অবশ্যপাঠ্য স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিদ্যাসাগর-বিষয়ক প্রবন্ধ দু'টি, শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের লিখিত নানা বিবরণ, আর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বিদ্যাসাগর-গ্রন্থাবলী')।

জীবনকথা: ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বীরসিংহ গ্রামে ইং ১৮২০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। বীরসিংহ এখন মেদিনীপুরের অন্তর্ভুক্ত, তখন ছিল হুগলী

জেলার মধ্যে। অক্ষয়কুমার দত্ত ও বিদ্যাসাগরের একই বৎসর জন্ম, খ্রীঃ ১৮২০। দু'জনাই চাকরিজীবী ভদ্রঘরের সন্তান। দু জনার দৃষ্টিভঙ্গিতেও কতকাংশে মিল আছে, কিন্তু পার্থক্যও অনেক, সেকথা সাহিত্যবিচারকালে দেখা যাবে। যে কথাটি এখানে লক্ষণীয় তা এই যে, ঈশ্বরচন্দ্র যে পরিবারে জন্মেন সেদিনের গণনায়ও তা দরিদ্র মধ্যবিত্তের পরিবার। যে শিক্ষা তিনি লাভ করেন সেই ইংরেজি বিদ্যার যুগে তা 'সেকেলে শিক্ষা। তথাপি সেদিনের ভারতীয় জীবনের প্রাণকেন্দ্র কলকাতায় বিদ্যাসাগর যে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন তা তাঁর সমসাময়িক কোনো অভিজাত ভাগ্যবানেরও সাধ্য হয়নি। ছাত্র-স্থানীয় শিবনাথ শাস্ত্রীকে তিনি বলেছিলেন—"ভারতবর্ষে এমন কোনো রাজা মহারাজা নেই যার মুখের উপর এই চটিপরা পায়ের ঠোকর দিতে পারি না।" একথা অবশ্য বড়াই নয়, আত্মসচেতন বলিষ্ঠ পুরুষের সত্যকার আত্মবিশ্বাসের পরিচায়ক। বাঙালী মধ্যবিত্ত যে বুর্জোয়া ব্যক্তি-সত্তাবাদের মূল সত্যকে গ্রহণ করতে পেরেছে এবং সমাজ-নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হতে সক্ষম হয়েছে, একথা তারই প্রমাণ।

ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন সামান্য বেতনের চাকুরে। তিনি কলিকাতায় বারো টাকা মাইনের চাকরি করে সংসার চালাতেন। মনে হয়, ঠাকুরদাস সাধারণ নির্বিরোধ প্রকৃতির মানুষ ছিলেন—ঈশ্বরচন্দ্রের বিপরীত প্রকৃতির। কিন্তু বিদ্যাসাগরের পিতামহ পণ্ডিত রামজয় তর্কভূষণ ছিলেন প্রবল-চরিত্র নির্ভীক পুরুষ, আর ঈশ্বরচন্দ্রের মাতা ভগবতী দেবী ছিলেন সেদিনের দয়াবতী মহীয়সী নারী-চরিত্র। বিদ্যাসাগর এঁদের তপস্যারই যোগ্য উত্তরাধিকারী। গ্রামের পাঠশালার পাঠ শেষ করে ঈশ্বরচন্দ্র নয় বৎসর বয়সে পিতার সঙ্গে কলকাতায় পড়তে আসেন—তখন (খ্রীঃ ১৮২৯) হিন্দু কলেজের গৌরবের দিন, ডিরোজিয়ানদের উন্মেষকাল। ব্রাহ্মণপণ্ডিতের বংশের ছেলে তবু সংস্কৃত কলেজেই কুলোচিত বিদ্যালাভের জন্য যোগদান করেন (এ পর্যন্ত কাহিনী তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে অনেকেই পাঠ করেছেন)। সংস্কৃত কলেজে ঈশ্বরচন্দ্র বারো বৎসরে প্রায় সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করে কৃতিত্বের সঙ্গে সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তখন (খ্রীঃ ১৮৪১) তিনি বিদ্যাসাগর উপাধি লাভ করেন। অবশ্য সে কলেজেই তিনি ইংরেজি শিক্ষা লাভ করেছিলেন, এবং এর পূর্বেই 'ল-কমিটির' পরীক্ষায়ও পাস করেছিলেন।

খ্রীঃ ১৮৪১ সালে জীবিকাক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর সসম্মানে প্রবেশ করতে পেলেন—প্রথমে তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান পণ্ডিত ও বাঙলা বিভাগের সেরেস্তাদার পদ প্রাপ্ত হন। ইংরেজ শাসকদের বাঙলা পড়াবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তখন ইংরেজি ও হিন্দী আরও আয়ত্ত করে নেন; পাঁচ বৎসর পরে (খ্রীঃ ১৮৪৬) তিনি সংস্কৃত কলেজের অ্যাসিস্টাণ্ট সেক্রেটারির কার্যে নিযুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু একগুঁয়ে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে সেক্রেটারি রসময় দত্তের মত-বিরোধ হল, বিদ্যাসাগর এক বৎসর পরেই ফিরে আসেন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ট্রেজরের কাজ গ্রহণ করে। এ সময়েই (খ্রীঃ ১৮৪৭) প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম রচনা—ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্যপুস্তক—"বেতাল পঞ্চ-বিংশতি'। কিন্তু সংস্কৃত কলেজেই আবার তাঁর ডাক পড়ল ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে,—এই যুবক-পণ্ডিতের চরিত্র-শক্তি তখন ইংরেজ কর্তৃপক্ষের চোখে পড়েছে। বিদ্যাসাগর সে কলেজে সাহিত্যের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন এই শর্তে যে, কলেজের পরিচালনায় তাঁর সুপারিশ মত সংস্কার সাধন করা হবে। বারো দিনের মধ্যেই তিনি তাঁর সংস্কার প্রস্তাব পেশ করেন। কলেজের পাঠ্যপদ্ধতির সংস্কার ছাড়াও তিনি চাইলেন সংস্কৃত কলেজকে সংস্কৃতের অধ্যয়ন-কেন্দ্র রূপে সুগঠিত করতে,—সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভাষারও সৃজন-ক্ষেত্ররূপে গঠিত করতে। বিদ্যাসাগরের কর্মশক্তিতে কর্তৃপক্ষের আস্থা ছিল, তাই তাঁরা এ প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। পূর্ব প্রতিশ্রুতি মত বিদ্যাসাগরকে এবার তাঁরা সংস্কৃত কলেজের প্রিন্‌সিপাল নিযুক্ত করলেন। বিদ্যাসাগর আপনার মনোমত কর্মক্ষেত্র পেলেন। সংস্কৃত কলেজের নিয়ম-কানুন ও ব্যবস্থাপনার তিনি আমূল পরিবর্তন সাধন করলেন। এ ভাবেই সে কলেজে তাঁর অনুগামী এক বাঙালী লেখক-গোষ্ঠীও গঠনের আয়োজন হল; অপর দিকে 'উপক্রমণিকা', 'ব্যাকরণ কৌমুদী', 'ঋজু-পাঠ' প্রভৃতি প্রণয়ন করে তিনি আধুনিক কালের বাঙালীর পক্ষে সংস্কৃতের ঐশ্বর্য ভাণ্ডারের প্রবেশপথ সুগম করে দিলেন। বাঙলা সাহিত্যের পক্ষেও এসব বই যে কত কল্যাণকর হয়ে ওঠে তা আধুনিক ভারতের অন্যভাষীদের তৎসম শব্দের বানান ও ব্যাকরণ-জ্ঞানের অভাব না দেখলে ঠিক উপলব্ধি করা যায় না। এই কর্মীপুরুষের বাস্তব-বুদ্ধি ও সংগঠন-শক্তি তখন শিক্ষাক্ষেত্রে সুপ্রমাণিত হয়ে গিয়েছে। তাই এর পরে (খ্রীঃ ১৮৫৩-এর সনদ পরিবর্তন-কালীন) শিক্ষা-সংস্কারের প্রত্যেকটি প্রস্তাবে কর্তৃপক্ষ তাঁর অভিমত গ্রহণ

করতে থাকেন। তাঁরই প্রস্তাবিত লোকশিক্ষার (প্রাথমিক-শিক্ষার) প্রস্তাব গ্রাহ্য হল। তাঁকে কর্তৃপক্ষ শিক্ষা-প্রদর্শকের কার্যভারও দেন। তাঁর উপরেই অর্পণ করেন তাঁর পরিচালনায় একশত 'বঙ্গ-বিদ্যালয়', ও স্ত্রীশিক্ষার জন্য 'বালিকা-বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব। সরকারী অর্থ সাহায্যের অপেক্ষা না করেই বিদ্যাসাগর এসব বিদ্যালয় স্থাপন করে যান, কিছুদিন পর্যন্ত তার ব্যয়-ভারও বহন করেন, অথচ তখনো বিদ্যাসাগরের বেতন সর্বসাকুল্যে পাঁচশত টাকা। অবশ্য এর পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর 'শকুন্তলা' (খ্রীঃ ১৮৫৪)। আর সঙ্গে সঙ্গে (খ্রীঃ ১৮৫৪) প্রকাশিত হয় বিধবা-বিবাহ প্রস্তাব বিষয়ক তাঁর দু'খানি বিখ্যাত গ্রন্থ—বাঙলাদেশে যাতে বিরোধের তুমুল তরঙ্গ উঠল।

সে আন্দোলন কথায়, ছড়ায়, এমন কি পরবর্তী কথা-সাহিত্যেও তার জের রেখে গিয়েছে। সাহিত্য-আলোচনায়ও তাই বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের কথা মনে রাখতে হয়। এই আন্দোলনের জন্যই বিদ্যাসাগরের জীবন-নাশের চেষ্টাও হয়, তাঁর তীব্র কর্তব্যবোধ তাতে বরং বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। সেই এক-গুঁয়ে প্রকৃতি খ্রীঃ ১৮৫৬ সালে রাজপুরুষদের সহায়তায় বিধবা-বিবাহ আইন পাস না করিয়ে ছাড়ল না। দেশের লোকের অনুমোদন অপেক্ষা বিজাতীয় সরকারের অনুমোদনের উপর নির্ভর করতে গিয়ে সম্ভবত বিদ্যাসাগর ভুলই করেন। তাঁর পৌরুষ ও মনুষ্যত্ব তার পরেও কিন্তু নিবৃত্ত হল না ; বিধবা-বিবাহ কার্যত প্রবর্তনে তাঁকে ঠেলে নিয়ত এগিয়ে নিয়ে চলল। অসামান্য আন্তরিকতা, উদ্যম ও আপন পরিশ্রম ও অর্থব্যয়ে যা সম্ভব বিদ্যাসাগর পরবর্তী জীবনে (১৮৫৬-১৮৯১) বিধবা-বিবাহ প্রচলনের জন্য অকাতরে তা করেছেন। কিন্তু নানা বিরোধে, বিশেষ করে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের অভাবে, বাঙালী হিন্দু-সমাজে বিধবা-বিবাহ তথাপি তখন গ্রাহ্য হয় নি। তা সহজগ্রাহ্য হল বিংশ শতকের তৃতীয় বা চতুর্থ শতকে—যখন রাজনৈতিক-সামাজিক পরিবর্তনে বিলাত-যাত্রা, আহার, আচার-নিয়ম প্রভৃতি সকল শাস্ত্রীয় সংস্কারই আলগা হয়ে গিয়েছে ; মধ্যবিত্তের পক্ষে ক্রমদারিদ্র্যে গলগ্রহ-স্বরূপ বিধবাকে পালন করা দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে, স্ত্রীশিক্ষা অগ্রসর হয়েছে এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতার নীতিতে যুবক-যুবতী নিজ অভিপ্রায় অনুযায়ী বিবাহ করতে পরাঙ্মুখ নয়। বিধবা-বিবাহ ব্যাপারে এই বহু-বিলম্বিত ভাব-পরিবর্তন মনে রাখলে 'বিষবৃক্ষ' থেকে 'চোখের বালি' পর্যন্ত অনেক উপন্যাসের কোনো

কোনো কাহিনীগত প্রশ্ন ও সমাধান হয়ত সহজবোধ্য হয়। খ্রীঃ ১৮৫৬-১৮৫৭-এর পরবর্তী যুগে বিদ্যাসাগরের স্বাধীন বৃত্তিতে সাফল্য, সর্বস্বীকৃত মহানুভবতা, শিক্ষাবিস্তারে ও সাহিত্য-প্রচারে তাঁর অক্লান্ত প্রয়াস কেন বাঙালী-জীবনে যথোচিত প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি,—এমন কি, কেন বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখদের তা বিরোধিতা লাভ করেছে,—তাও কতকটা বোঝা যায়। অবশ্য বাঙলা সাহিত্য তখন মাইকেল-বঙ্কিমের দানে আর এক নূতন স্তরে উঠে গিয়েছে তাও স্বীকার্য; সেই সৃষ্টি-সমৃদ্ধিতে বিদ্যাসাগরের দান তেমন আর আবশ্যক নেই।

সেই পর্বে (ইং ১৮৫৭-১৮৯১) বিদ্যাসাগরের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনা হল এই : খ্রীঃ ১৮৫৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হল, তিনি তার অন্যতম ফেলো' মনোনীত হলেন। তত্ত্ববোধিনী সভার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক তখন প্রায় দশ বৎসর ধরে চলছে। তিনি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকারও সম্পাদকমণ্ডলীর একজন ছিলেন; ১৮৫৭তে অক্ষয়কুমারের পরে পত্রিকার সম্পাদন-ভার তিনি গ্রহণ করেন। খ্রীঃ ১৮৫৫ সালে তিনি 'তত্ত্ববোধিনী সভার'ও সম্পাদক হলেন। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পরে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা (ভাদ্র ১৮১৩ শকাব্দ, পৃ ৯৫-৯৬) লেখেন, "বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহাতে মহাভারতের অনুবাদ করিতেন, এবং এই পত্রিকায় যে সমস্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত তাহার সংশোধনের ভারও তাঁহার হস্তে ছিল।" খ্রীঃ ১৮৫৯ সালে তিনি সরকারী চাকরিতে পদোন্নতি নেই বলে ও চাকরিতে স্বাধীনতা নেই বলে চাকরি ছেড়ে ব্যবসায়ে নামলেন—যে কালে ইংরেজি শিক্ষিতরাও চাকরিকে করে তুলেছেন 'স্বর্গ'। বিদ্যাসাগর তখন 'সংস্কৃত প্রেস ডিপোজিটরি' ও 'সংস্কৃত বুক ডিপো' স্থাপন করেন, নিয়মনিষ্ঠার সঙ্গে ব্যবসায় পরিচালনা করে তাতে সাফল্য লাভ করেন। 'সর্বদর্শন-সংগ্রহ', 'কুমারসম্ভব', 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্'. 'মেঘদূতম্', প্রভৃতি সংস্কৃত পাঠ্যগ্রন্থ বিচক্ষণভাবে তিনি সম্পাদন করেন; বাঙলা পাঠ্য গ্রন্থ প্রণয়নেও তাঁর শিথিলতা ছিল না।

মাইকেলের মত অমিতব্যয়ী প্রতিভা, দেশের প্রত্যেকটি সৎসাহসী কর্মী, বিপন্ন পীড়িত দুর্দশাগ্রস্ত অসংখ্য নর-নারী, ছোট বড় সকলের পক্ষে তিনি তখন দয়ার সাগর (শিবনাথ শাস্ত্রীর 'আত্মচরিতে' তার প্রমাণ যথেষ্ট)। তা ছাড়া, মেট্রোপলিটান স্কুলের পরিচালন-ভার গ্রহণ করে আপন কর্মদক্ষতার

তিনি তাতে খ্রীঃ ১৮৭২ সালে প্রথম কলেজ বিভাগ খুললেন, খ্রীঃ ১৮৭৯তে তা প্রথম শ্রেণীর কলেজে উন্নীত হল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বাঙালীর প্রথম বে-সরকারী কলেজ এই মেট্রোপলিটান কলেজ, এখনকার বিদ্যাসাগর কলেজ। হিন্দু কলেজ স্থাপন করেছিলেন কলিকাতার দেশীয় ও বিদেশীয় অভিজাতবর্গ একযোগে; মেট্রোপলিটান কলেজ স্থাপনা ও পরিচালনা করেন এই সংস্কৃত-পড়া পণ্ডিত—রাজা, মহারাজা, জমিদার, ব্যবসায়ীরা কেউ নন. শিক্ষিত এক আত্মনির্ভর মধ্যবিত্ত দরিদ্র ব্রাহ্মণের সন্তান বিদ্যাসাগর। পারিবারিক ও সামাজিক আশাভঙ্গে তখন এই মানব-প্রেমিকের হৃদয় ক্ষতবিক্ষত। তিনি অনেক সময়েই তাই আশ্রয় নিতেন কারমাটারে সাঁওতালদের মধ্যে। এর উপরে খ্রীঃ ১৮৮৬ অব্দে গাড়ি উল্টিয়ে পড়ে তাঁর স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে গেল। পাঁচ বৎসর আরও নীরবে অতিবাহিত করে খ্রীঃ ১৮৯১তে ৭০ বৎসর বয়সে তিনি বিদায় নিলেন।

খ্রীঃ ১৮৫৭-এর পরে তাঁর প্রধান বাঙলা রচনা :—খ্রীঃ ১৮৬০ অব্দে প্রকাশিত 'সীতার বনবাস'; খ্রীঃ ১৮৬৪-১৮৬৮ প্রকাশিত 'আখ্যান-মঞ্জরী'র দুই ভাগ, তৃতীয় ভাগ সংযোজিত হয় খ্রীঃ ১৮৮৮তে; খ্রীঃ ১৮৫৯ অব্দে প্রকাশিত সেক্‌স্‌পীয়রের 'কমিডি অব্‌ এররস্‌' (Comedy of Errors) অবলম্বনে রচিত 'ভ্রান্তি-বিলাস' এবং খ্রীঃ ১৮৭১ ও খ্রীঃ ১৮৭৩-এ প্রকাশিত বহুবিবাহের বিরুদ্ধে রচিত দু'খানি পুস্তক। এ ছাড়া, অপ্রকাশিত রচনা যা ছিল তার মধ্যে পাওয়া যায় তাঁর অসম্পূর্ণ আত্মজীবনী (মৃত্যুর পরে খ্রীঃ ১৮৯১ সালে 'সাহিত্যে' প্রকাশিত), অন্তত একটি ব্যক্তিগত নিবন্ধ 'প্রভাবতী সম্ভাষণ' (খ্রীঃ ১৮৯২ অব্দে 'সাহিত্যে' প্রকাশিত)। কয়েকটি বিতর্কমূলক ব্যঙ্গ-বহুল বেনামী রচনাও তাঁর বলে এখন গ্রাহ্য হয়। খ্রীঃ ১৮৭২-এ বঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু বিদ্যাসাগরের পরবর্তী রচনারীতি তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে এরূপ মনে হয় না। আর পূর্ববর্তী রচনা বিষয়বস্তুতে ও ভাষাসম্পদে তার নিজস্ব।

রচনা পরিচয় : অবশ্য বিদ্যাসাগরের (এবং অক্ষয়কুমারের) 'নিজস্বতা' কিছু ছিল কি না, তা একটা প্রশ্ন। বঙ্কিমচন্দ্র 'বেতাল পঞ্চবিংশতি', 'শকুন্তলা', 'সীতার বনবাস', 'ভ্রান্তিবিলাস' প্রভৃতি উপাখ্যান-গ্রন্থের উল্লেখ করে বলেছেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রতিভাশালী লেখক হলেও আখ্যায়িকা-সংগ্রাহক মাত্র।

কথাসাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র আখ্যান-উদ্ভাবনার মৌলিকত্বকেই একমাত্র মৌলিকত্ব মনে করতেন। আসলে এটি যুক্তি নয়, বঙ্কিমের বিদ্যাসাগর-বিরোধিতা। কারণ, বিদ্যাসাগর শুধু উপাখ্যান রচনা করেন নি; শুধু তথ্য-বহুল পাঠ্যপুস্তক রচনা করেও ক্ষান্ত হন নি; তিনি বিতর্কমূলক পুস্তক, সাহিত্য এবং প্রবন্ধও রচনা করেছেন। তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত তাঁর 'আত্মজীবনী', 'প্রভাবতী সম্ভাষণ' ও বেনামা বিদ্রূপ-রচনা সেই মহাপুরুষের অদ্ভুততর শিল্পশক্তির পরিচায়ক। এসব কোনো কোনো রচনা সর্বাংশেই মৌলিক। এবং যদিও বিদ্যাসাগরের অধিকাংশ রচনা সত্যই সংগৃহীত, এবং শিক্ষাব্রতীর উদ্দেশ্যানুরূপ পাঠ্যপুস্তক মাত্র, কিন্তু কোনো ক্ষেত্রেই তা স্বকীয়তা-বর্জিত নয়। আর পুনঃপরিবেশনেও কলা-অভিনবত্ব রয়েছে—যেমন তা আছে কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীদাসের মহাভারতের মত সংগ্রহ-গ্রন্থে, যেমন তা আছে 'বর্ণপরিচয়ের' 'জল পড়ে, পাতা নড়ে' থেকে 'আখ্যান-মঞ্জরী'র মত নিছক পাঠ্যপুস্তকের সুস্থির পরিকল্পনায়, সুঠাম ভাষাসম্পদে। বঙ্কিম নিজেও সাহিত্য-রচনা করতে করতে বারে বারে প্রচারে নেমেছেন, বিদ্যাসাগর জ্ঞানপ্রচার করতে করতে বারে বারে সাহিত্য-রচনা করে বসেছেন। 'বিশুদ্ধ সাহিত্যরস' সেই শতাব্দীর জাতীয় আত্মপ্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ মনস্বীদের কারও বিশেষ অভীষ্ট ছিল না।

বিদ্যাসাগরের প্রথম গ্রন্থ (খ্রীঃ ১৮৪৭) সংগৃহীত উপন্যাস, 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' হিন্দী 'বেতালপচিশী' থেকে তা সংগৃহীত। তা পাঠ্যপুস্তকও। কিন্তু তাতেও বিদ্যাসাগরের বিশিষ্ট প্রতিভার স্বাক্ষর রয়েছে। নিশ্চয়ই এর গদ্যভাষা নির্দোষ নয়; সংস্কৃত শব্দ প্রচুর; 'গমন করিলেন' 'শ্রবণ করিলেন' প্রভৃতি সংযুক্ত ক্রিয়াপদ প্রয়োগ প্রায় তার নিয়ম, আর অসমাপিকা ক্রিয়ার পরিবর্তে 'করতঃ', 'প্রযুক্ত' 'পুরঃসর' প্রভৃতি শব্দ যেন বাক্যকে রজ্জুবদ্ধ করে রাখে। অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দের অঙ্কুশ-পীড়াও আছে। কিন্তু এসব হচ্ছে বিংশ শতকের গদ্য-পাঠকের আপত্তি; তবে এ আপত্তি একেবারে উড়িয়ে দেবার কারণ নেই। কারণ খ্রীঃ ১৮৪৮-এ বিদ্যাসাগর যখন 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' রচনা করেছেন, তখন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'প্রবোধচন্দ্রিকা' তাঁর সম্মুখে ছিল। তার সর্বত্র না হোক, উৎকৃষ্ট অংশে সংস্কৃত-সমৃদ্ধ ভালো গদ্যের নিদর্শন আছে। 'প্রবোধচন্দ্রিকা'র রচনার পরে প্রায় ৩০ বৎসরে বাঙলা গদ্য আরও

পরিণত হয়েছে। তখন 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার'ও তৃতীয় বৎসর সমাপ্ত হয়েছে ; অক্ষয়কুমার, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখদের রচনা-রূপও বিদ্যাসাগরের নিকট সুপরিচিত। কাজেই বিদ্যাসাগরের পক্ষে একেবারে আদর্শের অভাব ছিল না। কিন্তু এসব সত্ত্বেও বিদ্যাসাগর প্রারম্ভেই যা নির্মাণ করলেন তা কি বিশেষত্ব-বর্জিত, না, খ্রীঃ ১৮৪৭-এর পূর্বে প্রকাশিত কোনো রচনার অপেক্ষা নিকৃষ্ট ? এ জাতীয় উপাখ্যান রচনার জন্ত অক্ষয়কুমার-দেবেন্দ্রনাথ অপেক্ষা 'প্রবোধচন্দ্রিকাকারেরই' ভাষা তুলনীয়। মৃত্যুঞ্জয়ের শ্রেষ্ঠ রচনাতেও সংস্কৃত ভাষার সৌন্দর্যকে বাঙলা সাধুভাষায় পরিবেশন করার শিল্প-প্রয়াস ছিল। কিন্তু বিদ্যাসাগর তাঁর ও অন্য সকলের অপেক্ষা সার্থকতা এ গ্রন্থেও আয়ত্ত করলেন যেমন দেখছি—এক, বাঙলা গদ্যের রূপ এতদিনে স্থিরতর হয়েছে, বাক্যে অপরিমিত দীর্ঘতা ত্যক্ত হয়েছে। তাই বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত-বিদগ্ধ রসদৃষ্টি সংস্কৃত ভাষার সৌন্দর্যকে সত্যই বাঙলায় আত্মসাৎ করতে পেরেছে। তা সম্ভব হয়েছে দ্বিতীয় এক বিশেষ কারণে—বিদ্যাসাগরই বাঙলা গদ্যের স্বাভাবিক ছন্দকে সর্বপ্রথম ধরে ফেললেন। এ সত্যটি রবীন্দ্রনাথ প্রথম নির্দেশ করেন, পরে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার সেন প্রমুখ ভাষাতাত্ত্বিকরা বিশ্লেষণ করেও তা দেখান। আর বিদ্যাসাগরের পাঠকমাত্রই এ তত্ত্ব না জেনেও সেই ছন্দোমাধুর্যে বারে বারে বিমুগ্ধ হয়েছেন (এ প্রসঙ্গে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী'তে উদ্ধৃত সীতার বনবাসের প্রথম অধ্যায়ের 'এই সেই জনস্থানমধ্যবর্তী প্রস্রবণ গিরি'র বর্ণনাংশ স্মরণীয়)। ১৮৪৭-এর লেখা বেতাল পঞ্চবিংশতি তেও এই ছন্দোবোধ দেখা যায়, অবশ্য পরবর্তী রচনা—'শকুন্তলায়', 'সীতার বনবাসে', বা 'প্রভাবতী সম্ভাষণে', 'আত্ম-জীবনী'তে তার আরও সুপরিণত দৃষ্টান্ত লাভ করা যায়, তা না বললেও চলে (দ্রঃ সুঃ সেন—বাঃ সাঃ গদ্য)। অবশ্য 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' তা সত্ত্বেও তত সুখপাঠ্য নয়, তার কারণ দোষ-ত্রুটিতে এই প্রথম রচনা মাঝে মাঝে খণ্ডিত।

বাঙলা গদ্যের ছন্দোবোধ ও আবিষ্কার বিদ্যাসাগরের প্রধানতম কীর্তি। তাই বুঝে নেওয়া দরকার যে বাঙলা গদ্যের ছন্দ কি। পদ্যের মতই গদ্যেরও ছন্দ আছে, ড্রাইডেন যাকে বলেছেন the other harmony of prose তা পদ্যের ছন্দ-সুষমা অপেক্ষাও সুস্পষ্টতর ও স্বাভাবিক। মানুষের শ্বাসবায়ু নিজের প্রয়োজনেই কথার মধ্যে ছোট-বড় ছেদ খুঁজে নিয়ে শক্তি সঞ্চয় করে, এবং

বাক্যকে এগিয়ে নিয়ে চলে। বাক্য নিতান্ত ছোট না হলে বাক্যের অভ্যন্তরেও এজন্ত যতি-অর্ধযতির ব্যবস্থা করতে হয়। তাতে স্বাভাবিকভাবেই বাক্যের মধ্যে 'পর্ব' বিভাগ আসে। কিন্তু প্রত্যেক ভাষারই গদ্যের এই পর্ব-বিভাগ বিভিন্ন ধরনের—কারণ প্রত্যেক ভাষারই স্বরাঘাত (accent), সুর (intonation) প্রভৃতি বিষয়ে বৈশিষ্ট্য আছে। বাঙলার যা স্বাভাবিক যতি-নিয়ম তা বিদ্যাসাগরের কানে প্রথম ধরা পড়ে; আর তাই লিখিত ভাষায় balance বা 'সুষম বাক্যগঠন রীতি' সজ্ঞান ভাবে তিনি প্রবর্তন করলেন। নিজের অজ্ঞাতেও তা প্রয়োগ করেছেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার তা আমরা জানি। কিন্তু এই ভাষা-সৌষ্ঠববোধ না থাকাতে তাঁর লেখায় সেই সুষম গতি ও ছন্দঃস্রোত দুর্লভ—অথচ তিনিও সংস্কৃত-সমৃদ্ধ সাধুভাষার রচয়িতা। এবার এবিষয়ে রবীন্দ্রনাথের কথাটি উল্লেখ করছি :—

"গদ্যের পদগুলির মধ্যে একটা ধ্বনি-সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া, তাহার গতির মধ্য দিয়া একটি অনতিলক্ষ্য ছন্দ-স্রোত রক্ষা করিয়া সৌম্য ও সরল শব্দগুলি নির্বাচন করিয়া বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যকে সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতা দান করিয়াছেন। গ্রাম্য পাণ্ডিত্য ও গ্রাম্য বর্বরতা উভয়ের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া তিনি ইহাকে পৃথিবীর ভদ্রসভার উপযোগী আর্যভাষারূপে গঠিত করিয়া গিয়াছেন।"

'বেতাল পঞ্চবিংশতি' অপেক্ষা পরবর্তী রচনায় বিদ্যাসাগরের তৎসম-প্রধান ভাষা আরও পরিণত সুষমালাভ করেছে। বিদ্যাসাগরের দ্বিতীয় গ্রন্থ —'বাঙলার ইতিহাস (খ্রীঃ ১৮৪৯) মার্শম্যানের ইংরেজি বই এর শেষাংশ অবলম্বনে রচিত। তৃতীয় গ্রন্থ—'জীবনচরিত' ও চেম্বার্সের বই (Biography) থেকে সংগৃহীত। এসবও পাঠ্যগ্রন্থ। 'জীবনচরিত' ও 'চরিতাবলী' (খ্রীঃ ১৮৫৬) অবশ্য জীবনীসাহিত্যের সূচনা বলে গণ্য হতে পারে, 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' প্রভৃতির থেকে এ সবের প্রভেদ অনেক। এ ভাষার প্রধান গুণ হল সংস্কৃত-প্রাধান্যযুক্ত প্রাঞ্জলতা। অবশ্য স্বরচিত পাঠ্যপুস্তকেও একেবারে প্রাথমিক সরল ভাষা থেকে এরূপ সংস্কৃতসমৃদ্ধ ভাষাও যথেষ্টই তিনি প্রয়োজন মত যোজনা করেছেন। সে সবের মধ্যে সর্বাধিক পরিচিত 'বর্ণপরিচয়' (খ্রীঃ ১৮৫৪); আজও পর্যন্ত বাঙলার এ জাতীয় শিশুশিক্ষার ও বর্ণশিক্ষার বই-এর আশ্রয় এই 'বর্ণপরিচয়'।—তারপরে পাঠ্য হল 'কথামালা' (খ্রীঃ ১৮৫৬)—সেই গোপাল-রাখালের গল্প। 'বর্ণপরিচয়ে'র 'জল পড়ে পাতা নড়ে' এই সামান্য

কথা দু'টিই রবীন্দ্রনাথের শিশুমনের ছন্দঃ-অনুভূতি ও কল্পনাকে উদ্রিক্ত করেছিল (দ্রঃ 'জীবনস্মৃতি')। কথামালার ভুবনের মাসির কাহিনী শিশুপাঠ্য হলেও সরস কথা-সাহিত্য। 'বর্ণপরিচয়ের' পূর্বেই '.বোধোদয়' রচিত হয় (খ্রীঃ ১৮৫১), আর 'আখ্যান-মঞ্জরী' পরে (খ্রীঃ ১৮৬৩-১৮৬৮)। বিদ্যাসাগরের সাহিত্য-বোধের অপেক্ষাও তাঁর শিক্ষাদর্শের প্রমাণ এসব পাঠ্যপুস্তকে স্পষ্টতর। অবশ্যই, তাঁর স্বাভাবিক রসানুভূতি ও কলা-কুশলতা এসব বইতেও আছে। কিন্তু লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য তার বিষয়-নির্বাচনে ও সেই বিষয়ের প্রাঞ্জল পরিবেশনে। 'বোধোদয়ে' এমন একটি নিবন্ধ নেই যা মানুষের সামাজিক জীবনের পক্ষে অনাবশ্যক, বা ঐহিক জীবনের অতীত কোনো পারমার্থিক আদর্শের উদ্দেশ্যে যা রচিত। সকলেই জানেন পদার্থ' বিষয়ক নিবন্ধ দিয়ে বিদ্যাসাগর এ গ্রন্থ আরম্ভ করেছেন এবং প্রথম সংস্করণে নিরাকার চৈতন্য-স্বরূপ 'ঈশ্বরের' কথাও ছিল না, পরে 'তত্ত্বোধিনী'র সুহৃদদের (সম্ভবত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের) অনুরোধে দেবেন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত এই প্রসিদ্ধ শব্দসমুচ্চয় সংযোজিত হয়। সাগরের জলে যাত্রীসুদ্ধ 'সেণ্ট লরেন্স' ডুবিয়ে দিয়ে ভগবান তাঁর কি মহিমা প্রকাশ করেছেন, বিদ্যাসাগর কোনোদিন তা বুঝতে পারেন নি, অপরকেও বোঝাবার চেষ্টা করেন নি। এদেশে তখনো কেন, এখনো কথায় কথায় বুদ্ধি ও যুক্তিহীন ভগবানের দোহাই, পরলোকের নামে হিতাহিত বোধ বিসর্জন, কর্মফল বা অদৃষ্টের নামে পুরুষকারের অবমাননাই প্রায় আধ্যাত্মিকতা বলে পরিচিত। এমন দেশে ঈশ্বরচন্দ্র পূর্বাপর মানব-কেন্দ্রিক, জীবন-নিষ্ঠ জ্ঞান প্রেম ও নীতিধর্ম প্রচার করতে চেয়েছেন। 'হিউম্যানিজম' বা এই মানব-কেন্দ্রিক নূতন জীবনাদর্শের তিনিই পথিকৃৎ—বিদ্যাসাগর যেন ঊনবিংশ শতকের গৌতম বুদ্ধ। কোনো অলৌকিক বা ধর্ম-সম্পর্কিত ভাব-বাদের বাষ্পকেও তিনি তাঁর কোনো লেখায়, নিবন্ধে, কাহিনীতে প্রশ্রয় দিতে চান নি। এই সত্যের আরও জ্বলন্ত প্রমাণ দেখি 'আখ্যান-মঞ্জরী' ও 'বোধোদয়ের' নিবন্ধে কথায়। 'আখ্যান-মঞ্জরীতে' গল্প দিয়ে বক্তব্য রসোজ্জ্বল করা হয়েছে। অক্ষয়কুমার দত্তের নীতিকথা শুষ্ক তথ্যবহুল বলে বিদ্যাসাগর তা গল্প দিয়ে সরস করেছেন। সভ্য অসভ্য সর্বজাতির মানুষের নানা সত্য ঘটনা ও -হিনী তিনি সংকলন করেছেন। পাশ্চাত্ত্য জাতিদের তুলনায় আরব বা আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার আদিম জাতিদের কোন কোন দিকে উচ্চতর

নীতিবোধের গল্পও তিনি যথার্থ মানব-বন্ধুর মত স্বচ্ছন্দচিত্তে বিবৃত করেছেন। কিন্তু 'আখ্যান-মঞ্জরী'র তিন ভাগে কোথাও নেই একটিও ভগবদ্ভক্তের কাহিনী এবং সম্ভবত সেই কারণেই নেই একটিও ভারতীয় কোন নারী-পুরুষের কাহিনী। অথচ বিদ্যাসাগর 'মহাভারতের' অনুবাদ আরম্ভ করেছিলেন (খ্রীঃ ১৮৪৯-এ তত্ত্ববোধিনীতে); পরে কালীপ্রসন্ন সিংহ সে কার্যভার গ্রহণ করাতে তিনি মহাভারতের উপক্রমণিকা অংশ অনুবাদ করে তা ছেড়ে দেন। আরও পরে, রমেশচন্দ্র দত্তের 'ঋগ্‌বেদ' অনুবাদে তিনি উৎসাহ ও সহায়তা-দান করেছেন। 'মেঘদূত', 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' প্রভৃতি সংস্কৃত কাব্যাদি ছাত্র-দের জন্য সম্পাদনায়ও তিনি যথার্থ বিচার ও গুণগ্রাহিতার পরিচয় দান করেন—তাঁর স্বদেশ-প্রীতিতে সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু এই চটি-চাদর-ধারী পণ্ডিত মানসিক ক্ষেত্রে (মাইকেলের উক্তি স্মরণীয়) ইংরেজের অপেক্ষাও বড় ইংরেজ ছিলেন এজন্য যে, তিনি ইংরেজ-জাতির প্রথম সংলব্ধ বুর্জোয়া (বা নবযুগের) যুগধর্মকে মনেপ্রাণে বরণ করেছিলেন; এবং ভারতীয় মধ্য-যুগের সমাজকে জ্ঞানে, কর্মে, প্রেমে প্রাণপণে সংস্কার করে সেই জীবন নিষ্ঠ সাধনায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। এজন্য 'তত্ত্ববোধিনী'র সদস্য হয়েও বেদান্তপ্রতিপাদ্য ধর্মের বা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ধর্মান্দোলনেও তিনি যোগদান করেন নি। এমন কি, 'জাতীয় মেলা'র জাতীয় উদ্বোধনসংকল্প ও 'ভারত সভার' রাজনৈতিক আন্দোলন থেকেও তিনি দূরে ছিলেন। এটি অবশ্য তাঁর উগ্র আত্মস্বাতন্ত্র্য ও সীমিত ইতিহাস বোধেরও পরিচায়ক—শিক্ষা-প্রচার সমাজ-সংস্কার প্রভৃতি কোনো প্রয়াসকেই জাতীয় আত্মপ্রতিষ্ঠার সর্বাঙ্গীণ প্রয়াস থেকে খণ্ড করে দেখা যায় না। এই রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা বিশেষ করে পরাধীন দেশের মানুষের পক্ষে একটা অস্বাভাবিক আত্ম-সংকোচন। বিদ্যাসাগরের চরিত্রের এইটি প্রধান ত্রুটি; দ্বিতীয় ত্রুটি—তাঁর একগুঁয়েমি, স্বমতপ্রিয়তা।

'আখ্যান-মঞ্জরী'র লেখক বিদ্যাসাগর গল্পের মূল্য জানতেন। উপাখ্যান রচনায়ও তিনি গল্প উদ্ভাবনা করেন নি, কিন্তু সরসভাবে গল্প বলেছেন। কালিদাসের কল্যাণে শকুন্তলা চির-মধুর। বিদ্যাসাগরের 'শকুন্তলা'য় (খ্রীঃ ১৮৫৪) সেই মাধুর্য রক্ষিত হয়েছে। বিদ্যাসাগরের সমকালে আরও কয়েক-খানা শকুন্তলা নানা লেখক রচনা করেছিলেন; সে সবের সঙ্গে তুলনা করলে

বোঝা যায় -বিদ্যাসাগরের শকুন্তলা' শুধু কালিদাসের সার্থক অনুবাদ নয়, অভিনব রূপান্তরও। আধুনিক কালের রুচিবোধের সঙ্গে কালিদাসের কালের রূপ-মোহের সহজ সমন্বয় সাধন করেছে বিদ্যাসাগরের রসবোধ। **'সীতার বনবাস'**ও (খ্রীঃ ১৮৬০) শুধু আহরণ নয়; ভবভূতি ও বাল্মীকির সমন্বিত রূপায়ণ। রাজনারায়ণ বসু সত্যই বলেছেন—"উহা তাঁহার একপ্রকার স্বকপোল-রচিত গ্রন্থ বলিলে হয়।" শকুন্তলার কাব্য-লালিত্য অপেক্ষা 'সীতার বনবাসে' স্বভাবতই এসেছে ভবভূতির বেদনা-গাম্ভীর্য ও বাল্মীকির করুণামাধুর্য'; বিদ্যাসাগরের উদ্বেল অশ্রুধারাও তাই সংস্কৃত শব্দের সংহত যোজনায় গম্ভীর ও সংযত-প্রবাহ। **'ভ্রান্তিবিলাস'** (খ্রীঃ ১৮৬৯) প্রহসন-মূলক আখ্যায়িকা—বিদ্যাসাগরের সার্থক রচনার অন্তর্ভুক্ত নয়। তথাপি বিষয়গুণেই বিদ্যাসাগরের ভাষাও এখানে লঘুগতি। অর্থাৎ আখ্যায়িকার হিসাবেও দেখা যায় 'বিদ্যাসাগরী ভাষা'র ছন্দ কত বিচিত্র।

'বিদ্যাসাগরী ভাষা'র সম্বন্ধে যে ধারণা আমাদের মনে বদ্ধমূল হয়েছে, তা অনেকটা সংশোধন করতে হয় বিদ্যাসাগরের অন্যান্য রচনার কথা স্মরণ করলে। প্রধানত সে সব রচনা প্রচার-মূলক; কিন্তু শিক্ষাকে যাঁরা জীবনের ব্রত করেন, তাঁদের কোন্ রচনা প্রচারমূলক নয়? অবশ্য প্রচার ও শিক্ষায় পার্থক্য আছে, আর প্রচার ও প্রকাশে পার্থক্য আরো বেশি। বিদ্যাসাগরের এসব লেখা (রাজনারায়ণ বসুর ভাষায় তাঁর "স্বকপোল-রচনা"। তার মধ্যে প্রথম প্রকাশিত হয় (খ্রীঃ ১৮৫৩) বেথুন সোসাইটিতে খ্রীঃ ১৮৫১-তে পঠিত 'সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব'। বিদ্যাসাগরের পাণ্ডিত্য ও রসগ্রাহিতায় তা সমুজ্জল। সাহিত্যের সমালোচনা এই প্রথম নয়। বেথুন সভায় ১৮৫২-এর ১৩ই মে তারিখে পঠিত রঙ্গলালের 'বাঙ্গলা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ' নামক ইংরেজি ও বাঙলা সাহিত্যের তুলনামূলক মূল্যবান প্রবন্ধটি মাঝখানে খ্রীঃ ১৮৫২ তে প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনায় বিদ্যাসাগরের লেখাটিই প্রথম সার্থক প্রবন্ধ (ডঃ সুকুমার সেনের এ মর্মের কথা নিশ্চয়ই সত্য)। নানা কারণেই এ প্রবন্ধের অপেক্ষা অনেক বেশি স্মরণীয় বিধবা-বিবাহের স্বপক্ষে রচিত বিদ্যাসাগরের গ্রন্থ দু'খানি—খ্রীঃ ১৮৫৫ এর প্রথম ভাগে রচিত **'বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব'**, এবং সে বৎসরেই এ পুস্তকের প্রতিবাদ-খণ্ডনে লিখিত

ও প্রকাশিত 'বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব, দ্বিতীয় পুস্তক।' এসব গ্রন্থে রামমোহন রায়ের অনুরূপে তিনিও শাস্ত্র-বচন দ্বারা যুক্তি প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি গ্রহণ করেন এবং শাস্ত্রজ্ঞান, যুক্তি-কৌশল, বিনয় ও মর্যাদা-বোধের যে পরিচয় এসব গ্রন্থে পাওয়া যায়, তাতেও রামমোহনের কথা মনে পড়ে। তবে রামমোহন উত্তর-প্রত্যুত্তরে তার্কিক (ডায়েলেক্‌টিশিয়ান্), আর বিদ্যাসাগর যুক্তি-নিপুণ প্রবন্ধকার। বিদ্যাসাগরের ভাষার পরিণতরূপ রামমোহনের কালে আশা করা অন্যায়। রামমোহন বা মৃত্যুঞ্জয় কেন, গম্ভীর যুক্তিসিদ্ধ রচনায় এই প্রাঞ্জলতা অক্ষয়কুমার দত্তের মত সহযোগীর লেখায়ও নেই। বহুবিবাহের বিরুদ্ধে রচিত বিদ্যাসাগরের গ্রন্থ দু'খানি পরবর্তীকালে রচিত; **'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার'** প্রকাশিত হয় অনেক পরে খ্রীঃ ১৮৭১ অব্দে। আর ঐ নামের দ্বিতীয় পুস্তক' প্রকাশিত হয় খ্রীঃ ১৮৭৩ অব্দে। দু'খানিতেই বিদ্যাসাগরের এই বিচার-দক্ষতা ও ভাষারীতি সমভাবে প্রমাণিত হয়। এ দু' বিষয়ের পুস্তক ক'খানা হচ্ছে— 'সারগর্ভ যুক্তিসমেত রচনার নিকষস্থল।'

কিন্তু জীবিতকালে যে বিদ্যাসাগরের সন্ধান পেয়েও পাওয়া যায় নি তাঁর মৃত্যুর পরে সেই বিদ্যাসাগর আমাদের নিকট আরও প্রকাশিত হয়েছেন তাঁর কয়েকটি অপ্রকাশিত রচনা মারফৎ। এর মধ্যে তাঁর অসমাপ্ত 'আত্মজীবনী' শ্রেষ্ঠ ও ইদানীং তা সুপরিচিত। কিন্তু 'প্রভাবতী সম্ভাষণ' তত সুবিদিত ছিল না, বেনামী লেখাও দুষ্প্রাপ্য ছিল। পাঁচটি বেনামী রচনার মধ্যে 'কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য' প্রণীত প্রথম নিবন্ধ 'অতি অল্প হইল' (খ্রীঃ ১৮৭৩) দ্বিতীয় নিবন্ধ 'আবার অতি অল্প হইল' (খ্রীঃ ১৮৭৩) লেখা দুটি বহুবিবাহ বিষয়ে তারানাথ তর্কবাচস্পতির প্রতিবাদের বেনামী উত্তর-প্রত্যুত্তর। তৃতীয় রচনা 'কবিকুলতিলকস্য কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য প্রণীত' 'ব্রজবিলাস' (খ্রীঃ ১৮৮৫), নবদ্বীপের ব্রজনাথ বিদ্যারত্নের বিধবা-বিবাহ বিরোধী সংস্কৃত বক্তৃতার উত্তর। চতুর্থখানা 'কস্যচিৎ তত্ত্বান্বেষিণঃ' প্রণীত 'বিধবা-বিবাহ ও যশোহর হিন্দুধর্মরক্ষিণী সভা' (খ্রীঃ ১৮৮৪) বিদ্যারত্ন ন্যায়রত্ন স্মৃতিরত্ন উপাধিধারী তিনজন পণ্ডিতরত্নের প্রকৃত পরিচয় প্রদান করে বেনামীতে লেখা। পঞ্চম রচনা 'রত্নপরীক্ষা (খ্রীঃ ১৮৮৬) 'কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপো সহচরস্য প্রণীত।' কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য (পুরাতন প্রসঙ্গ' ১ম পর্যায়, পৃ. ২১৩-১৮) ও

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ('বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ') দু'জনারই মতে এসব বিদ্যাসাগর মহাশয়েরই রচনা। এসব রচনায় যে ব্যঙ্গপ্রিয়, রঙ্গমুখর বিদ্যাসাগরকে দেখা যায় তিনি আর-এক মানুষ—এ ভাষাও যেন আর-এক ভাষা। এখনকার কথ্য-ভাষার রূপ তখনো লেখায় স্থির হয়ে ওঠেনি ; কিন্তু এসব রচনায় বিদ্যাসাগরের সাধুভাষা যেন আপনার পোশাক ছেড়ে কথ্যভাষায় নেমে আসতে পারলে খুশী হয়। বিদ্যাসাগরের ভাষা যে কত বিচিত্র তা 'বিদ্যাসাগরী ভাষা' জানলেও জানা যায় না।

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য সত্যই বলেছেন, "এই রসিকতা সে কালের ঈশ্বর গুপ্ত বা গুড়গুড়ে ভট্টাচার্যের মত গ্রাম্যতা দোষে দূষিত নহে ; ইহা ভদ্রলোকের সুসভ্য সমাজের যোগ্য ; এবং পিতাপুত্রে একত্রে উপভোগ্য। এরূপ উচ্চ অঙ্গের রসিকতা বাঙ্গলা ভাষায় অল্পই আছে এবং ইহার গুণগ্রাহী পাঠকও বেশী নাই।" এ কথা তথাপি সত্য—এই বেনামী রচনার ভাষা বিদ্যাসাগরের ভাষার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন নয় ; তবে তার একটি বিশিষ্ট দিক। বিশিষ্ট ও শ্রেষ্ঠ—এই দুই বিশেষণই প্রযোজ্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অন্য দু'টি লেখা—'**প্রভাবতী সম্ভাষণ**' (প্রকাশিত ১৮৯২) ও অসমাপ্ত আত্মচরিত '**বিদ্যাসাগর চরিত**' (প্রকাশিত ১৮৯১)। 'প্রভাবতী সম্ভাষণ' রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আড়াই বৎসরের বালিকা কন্যা স্নেহাস্পদা প্রভাবতীর মৃত্যুতে বিদ্যাসাগরের একটি শোকোচ্ছ্বাস—ব্যক্তিগত শোক, বেদনা ও অশ্রুজলের ধারায় প্রত্যেকটি ছত্র অভিষিক্ত। গদ্যকাব্য জাতীয় এ রচনা একটি পবিত্র রচনা—তাতে সাহিত্যিক মাত্রা ও সংযত কলা-কৌশলের একটু অভাব আছে, বলা যায়। কিন্তু '**বিদ্যাসাগর চরিত**' আর এক ঠাটে বাঁধা—বিবরণের, আখ্যানের, জীবন-চরিতের ও উপন্যাসের মত চরিত্র-চিত্রের সম্পদে তা বিদ্যাসাগরের প্রাঞ্জল, সরস ভাষার অনুপম কীর্তি। রামজয় তর্কভূষণ, রাইমণি প্রভৃতি চরিত্রচিত্রের সঙ্গে যে কৌতুকপ্রদ সরসতার নিদর্শন বিদ্যাসাগর এ অসমাপ্ত গ্রন্থে রেখে গিয়েছেন, তা ঔপন্যাসিক বঙ্কিমেরও কাম্য হত। অন্তত এ সব গ্রন্থ পূর্বে প্রকাশিত হলে বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে বলা সম্ভব হত না—বিদ্যাসাগর সংস্কৃত শব্দ ঢুকিয়ে বাঙলা ভাষার গোড়ার দিকটা মাটি করে দিয়ে গিয়েছেন। এই আত্মজীবনীর ভাষা এখনো বাঙলার আদর্শ গদ্যভাষা। অবশ্য এ গ্রন্থ অনেক পরে রচিত, তার পূর্বে সম্ভবত বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে বাঙলা ভাষা সরলতা ও

স্বাচ্ছন্দ্য দুই-ই লাভ করেছে। খ্রীঃ ১৮৯৫-তে রচিত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের 'আত্মজীবনী'র রসগ্রহণ কালেও একথা বলা যায়। সে 'আত্মজীবনী' আধ্যাত্মিকতায় অনুপ্রাণিত আরেক ধারার লেখা, তা জীবনচিত্র নয়। বিদ্যাসাগরের 'আত্মজীবনী' সম্পূর্ণ হলে সম্ভবত তা শিবনাথ শাস্ত্রীর 'আত্মচরিতের' ধারার প্রথম ও প্রধান গ্রন্থ হয়ে থাকত—উনবিংশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হত।

সাহিত্যকীর্তি দিয়ে বিদ্যাসাগরের পরিমাপ হবে না, তা পূর্বেই বলেছি। তাঁর সাহিত্যকীর্তির যথার্থ পরিমাপ বঙ্কিমচন্দ্র করতে পারেন নি,—তা বঙ্কিমচন্দ্রের সামাজিক সংকীর্ণদৃষ্টির ফল। বঙ্কিমের ব্যক্তিগত দুর্ভাগ্য—তিনি উদার ছিলেন না। বিদ্যাসাগরের কীর্তির যথার্থ পরিমাপ করেছেন বঙ্কিমেরই গুণগ্রাহী রবীন্দ্রনাথ। আর, তিনি এ সত্যও বুঝেছিলেন—এ মানুষ আপন মহিমায় একক। সে মহিমা তাঁর পৌরুষ, তাঁর অখণ্ড মনুষ্যত্ব—এবং আজ যা আমরা বিশেষ করে বুঝি—তাঁর মানবধর্মিতা, যা ছিল তাঁর স্বধর্ম।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫)

সাহিত্যিক পরিচয়ে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিচয়ও সম্পূর্ণ হয় না। প্রসিদ্ধ পিতার পুত্র হয়েও তিনি বাঙলার ইতিহাসে প্রসিদ্ধতর পুরুষ,—আর সাহিত্যের খাতায় অসামান্য পুত্র-কন্যার পিতা হয়েও তিনি অসামান্য। কিন্তু সে সাহিত্য-যশোলাভে তিনি নিস্পৃহ ছিলেন। 'মহর্ষি' খ্যাতির জন্য দেবেন্দ্রনাথের সাহিত্যিক সাফল্যও কতকটা বিস্মৃত। না হলে তত্ত্ববোধিনী সভা ও পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে তিনিই সে পর্বের প্রধান পুরুষ বলে গণ্য হবার অধিকারী। বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার প্রভৃতির অপেক্ষাও তিনি দীর্ঘজীবী হয়েছিলেন। ধর্মান্দোলনে, হিন্দুসমাজের সংস্কারমূলক সংরক্ষণে, শিক্ষাবিস্তারে, এমন কি রাজনৈতিক চেতনা-প্রসারেও তিনি এই 'প্রস্তুতির পর্বে' বাঙালী জীবনের অদ্ভুতকর্মা পুরুষ। তাঁর জীবনের এ পর্বের (১৮ বৎসর থেকে ৪১ বৎসর) কথাই তাঁর 'স্বরচিত জীবনচরিতে'ও তিনি বিবৃত করেছেন। অবশ্য তাঁর মুখ থেকে সে জীবনচরিত ইং ১৮৯৪ অব্দে অনুলিখিত হয় ও প্রকাশিত হয় ইং ১৮৯৮ অব্দে। দেবেন্দ্রনাথের লিখিত গ্রন্থের মধ্যে একমাত্র 'ব্রাহ্মধর্ম' (১৭৭৩ শকাব্দ = ১৮৫১-৫২ ইং) ও 'আত্মতত্ত্ববিদ্যা' (ইং ১৮৫২) কাল

হিসাবে এ পর্বে প্রকাশিত। 'ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা' (ইং ১৮৬২) ও 'ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান' (ইং ১৮৬৯-১৮৭২) পরবর্তীকালে প্রকাশিত হয় ;—তখন বাঙলা সাহিত্যের নবগঙ্গায় বান ডাকছে। কিন্তু তিনি ব্রাহ্মসমাজে উপদেশ ও বক্তৃতা উপলক্ষ্যে নানা উপদেশ ও ব্যাখ্যান পূর্বাপর দিচ্ছিলেন, তা 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়' সে সময়ে প্রকাশিত হত। যেমন (ইং ১৮৬০-এ প্রকাশিত) 'ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস', (ইং ১৮৬১তে প্রকাশিত) দুর্ভিক্ষের সাহায্যে ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা,—ভাবে-ভাষায় তা তাঁর নিজস্ব ভাবুকতায় সমুজ্জ্বল। যাই হোক, তত্ত্ববোধিনীর পর্ব থেকে তত্ত্ববোধিনীর প্রতিষ্ঠাতাকে বাদ দেওয়া যায় না—এ-পর্বেই তিনি আলোচ্য। পরবর্তী পর্বে বহুদিন পর্যন্ত ব্রাহ্মধর্ম-সংগঠনে তিনি তেমনি উৎসাহী ছিলেন, কিন্তু বাইরের দিক থেকে ক্রমে আপনার কর্মভার কমিয়ে আনেন। যেমন, ১৮৫৯-এর পরে তাঁর ধর্মান্দোলনের কর্মে তিনি কেশবচন্দ্র সেনকে সহযোগীরূপে গ্রহণ করে তাঁকে প্রায় নেতৃত্বে অভিষিক্ত করেন। অন্যদিকে ক্রমেই দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ তাঁর পুত্ররাও উদ্যোগে-আয়োজনে ('জাতীয় মেলা', ১৮৬৭) অগ্রসর হয়ে আসতে থাকেন। দেবেন্দ্রনাথ অবশ্য আদি ব্রাহ্মসমাজের দায়িত্বভার ত্যাগ করলেন না, কিন্তু ক্রমেই অধ্যাত্মচিন্তাতে বেশি ব্যাপৃত হয়ে পড়েন। কাজেই, শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের সেই বহু-প্রয়াসে কল্লোলিত পর্ব অপেক্ষা প্রথমার্ধের এই প্রস্তুতির পর্বেই দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যিক দানের কথা আলোচ্য। আত্মজীবনীর ভাষায় বাঙলা গদ্যের যে অপূর্ব রূপ দেখি তা প্রথমাবধিই তাঁর রচনায় লক্ষ্য করা যায়। তবে কতকাংশে বাঙলা ভাষারও মধ্যবর্তীকালের (ইং ১৮৫৭-১৮৯৫ পর্যন্ত) বিকাশেরও একটা প্রমাণ সে গ্রন্থ। কিন্তু সে 'জীবন-চরিতের' গদ্যের অপূর্ব রস দেবেন্দ্রনাথেরই নিজস্ব—পুত্র-কন্যাদের সঙ্গে সেখানে তিনি সমধর্মী, তাঁদের ভাবুকতার মূল উৎস দেবেন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্য প্রয়াস।

দেবেন্দ্রনাথের অন্তর্মুখী জীবনও যে কালধর্মে কত বহুমুখী ধারায় প্রবাহিত হয়েছে, এখানে তা বলা সম্ভব নয়। (সেজন্য সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়ের সম্পাদিত জীবন-চরিত, অজিতকুমার চক্রবর্তীর লিখিত 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর' এবং অন্তত 'সাঃ সাঃ চ'-র ৪৫ সংখ্যক 'চরিত', যোগেশচন্দ্র বাগলের 'দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর' অবশ্য দ্রষ্টব্য।) 'প্রিন্স' দ্বারকানাথ ঠাকুরের তিনি জ্যেষ্ঠ

পুত্র; অপ্রতুল ধনী দ্বারকানাথ ছিলেন রামমোহন রায়ের পক্ষাবলম্বী—সেদিনের উদ্যোগী বাঙালী বণিক। পিতৃ-বন্ধু রামমোহন রায়ের 'অ্যাংলো-হিন্দু স্কুলে' রামমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র রমানাথ রায়ের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের শিক্ষারম্ভ হয়। পরে তিনি হিন্দু স্কুলে ৪ বৎসর কাল পড়েন—তখন ডিরোজিও সে স্কুল থেকে অপসৃত। ইংরেজি ভাব ও নাস্তিকতার বিরুদ্ধে তখন হাওয়া বইতে শুরু করেছে। রামমোহন রায়ের স্কুলের ছাত্ররা বাঙলা ভাষার অনুশীলনেও অনুরাগী ছিল। তাদের (ইং ১৮৩২) প্রতিষ্ঠিত 'সর্বতত্ত্বদীপিকা' সভার সম্পাদক ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রমাপ্রসাদ রায়। বাঙলায় কথোপকথন ছিল এই সভার নিয়ম। হিন্দু স্কুল ত্যাগ করে (ইং ১৮৩৬?) দেবেন্দ্রনাথ পিতার 'কার-টেগোর কোম্পানি' (স্থাপিত ইং ১৮৩৪), 'ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক' (স্থাপিত ১৮২৯) প্রভৃতির তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা তাঁর কাজে যোগ দেন। বাঙলার শেষ কৃতী শ্রেষ্ঠী দ্বারকানাথ; বুর্জোয়া পদ্ধতিতে ব্যাঙ্ক, ইনসিওরেন্স, আমদানী-রপ্তানী সবই তিনি করতেন। কিন্তু ইতিমধ্যেই এরূপ বাণিজ্যক্ষেত্রে দেশীয়দের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠছিল—ব্রিটিশ বণিকশক্তি তখন যন্ত্রযুগের পত্তন করে অপরিমিত বলের অধিকারী, ভারতের ক্ষেত্রে তারা সর্বজয়ী না হয়ে আসবে না। দ্বারকানাথও জমিদারী ক্রয় করে বিলাসে-আড়ম্বরে সকলের চমক লাগিয়ে বিলাতে মারা গেলেন। 'কার-টেগোর কোম্পানি' ১৮৪৭-এর সঙ্গেই শেষ হয়, 'ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক'ও ১৮৪৮-এর ১৫ই জানুয়ারী কাজ বন্ধ করে। এ ব্যাঙ্কের সঙ্গে শুধু বাঙালীর বৈষয়িক উদ্যোগ-আয়োজন নয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভাণ্ডার ('হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয়ের') পর্যন্ত জড়িত ছিল। এসব কারণে, ইং ১৮৩৮-এই চাকরির দিকে যে বাঙালী শিক্ষিতের দৃষ্টি পড়েছিল, ১৮৪৮-এর পরে তা আর ব্যবসায়ের দিকে ফিরে আসবার তেমন কারণ রইল না। হয় জমিদারি, নয় চাকরি বা শিক্ষিত বৃত্তি ('ওকালতী, ডাক্তারী' প্রভৃতি), শিক্ষিতদের জীবিকার এসবই অবলম্বন হয়ে উঠতে থাকে। বাইরের বৈষয়িক উদ্যোগ অপেক্ষা মানসিক চর্চায় তাঁদের আকর্ষণও বাড়ে। ঠাকুর পরিবার ব্যবসায়ী থেকে আবার জমিদারে পরিণত হলেন; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তাঁরা কলকাতার 'বাবু-বিলাসে' মগ্ন হয়ে গেলেন না। সাধুতা ও ভাবুকতা দেবেন্দ্রনাথের প্রকৃতিগত বৈষয়িক ব্যাপারেও দেবেন্দ্রনাথ তাই বলে অপটু ছিলেন না। অবশ্য তৎপূর্বেই তিনি 'তত্ত্ববোধিনী

সভা' (ইং ১৮৩৯) স্থাপন করেছিলেন, ইং ১৮৪৩-এ (বাং ৭ই পৌষ, ১৭৬৫ শকাব্দে) ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষাও গ্রহণ করেন, 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' (ইং ১৮৪৩) ও 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা' (ইং ১৮৪০, ১৩ই জুন) স্থাপন করেন, হিন্দু সমাজের সকলকে একত্রিত করে 'হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয়' (১৮৪৬) প্রতিষ্ঠিত করেন। খ্রীষ্টানদের অভিযানের বিরুদ্ধে দেবেন্দ্রনাথ উদ্যোগী হয়ে ওঠেন। অন্যদিকে, সেদিনের 'জমিদার সভা' ও বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সোসাইটি সংযুক্ত করে 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' যখন রূপ গ্রহণ করে ও রাজনৈতিক জীবন গঠনে সে অ্যাসোসিয়েশন অগ্রসর হয় (১৮৫১), তখন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরই তার সম্পাদক নিযুক্ত হন। আবার তখনো তিনি রামমোহনের ঐতিহ্য অবলম্বন করে ব্রাহ্মধর্মের নেতা, তত্ত্ববোধিনীর তখন স্বর্ণ যুগ। ব্রাহ্মধর্মের তত্ত্বানুসন্ধানে ইং ১৮৪৯-এ 'ব্রাহ্মধর্ম' তিনি সংকলিত করছেন, 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' তাঁর মতের ও উপদেশের বাহন হয়। কিন্তু পত্রিকার 'গ্রন্থাধ্যক্ষ'দের সকলে অত অধ্যাত্মবাদী ছিলেন না— অক্ষয়কুমার ও বিদ্যাসাগরের কথা মনে রাখলেই তা বুঝতে পারি। দেবেন্দ্রনাথের বক্তৃতাদিও তাই সব সময়ে পত্রিকায় প্রকাশিত হত না। ক্ষুব্ধ দেবেন্দ্রনাথ তাই (রাজনারায়ণ বসু মহাশয়কে) পত্রে লেখেন (১৮৫৪, মার্চ) —"কতকগুলান নাস্তিক গ্রন্থাধ্যক্ষ হইয়াছে, ইহারদিগকে এ পদ হইতে বহিষ্কৃত না করিয়া দিলে আর ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের সুবিধা নাই।" নিজ গৃহেও পরিবারের পৌত্তলিক পূজাদি নিয়ম দেবেন্দ্রনাথ একেবারে দূর করতে পারলেন না। তাই ইং ১৮৫৬-এর অক্টোবর মাসে অধ্যাত্ম শান্তির সন্ধানে তিনি হিমালয়ে যাত্রা করেন। এর পরে সংসার-বিমুখ না হলেও তিনি 'ব্রাহ্মধর্ম' ভিন্ন অন্য কর্মে আর তত উদ্যম দেখান নি। ১৮৫৭-এর বিদ্রোহকালে তিনি সিমলা পাহাড়ে ছিলেন; তাঁর 'স্বরচিত জীবন চরিতে' সেখানকার অবস্থার চমৎকার বর্ণনা লিপিবদ্ধ আছে। হিমালয় ভ্রমণ সম্পর্কে দু'খানা চিঠি 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়'ও প্রকাশিত হয়। ইং ১৮৫৮ এর নবেম্বরে দেবেন্দ্রনাথ কলিকাতায় ফিরে আসেন —পর্বত-অধোগামিনী নদীধারাতেই তিনি কর্মক্ষেত্রে অবতরণের সংকেত লাভ করেন। ইং ১৮৫৯-এর মে মাসে তিনি 'তত্ত্ববোধিনী সভা' তুলে দিলেন। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' তারপর (১৭৮১ শকাব্দের জ্যৈষ্ঠ থেকে) ব্রাহ্মসমাজের সম্পত্তিরূপে প্রকাশিত হত—বাঙালী সমাজ ও সংস্কৃতির ইতিহাসে

তার দান তখন গৌণ হয়ে আসে। সাহিত্যে 'তত্ত্ববোধিনীর পর্ব' শেষ হয়ে গেল, বলা যায়। এর পরবর্তী অধ্যায় অবশ্য কেশবচন্দ্র প্রমুখদের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের মিলন-বিরোধে সমাকীর্ণ। ব্রাহ্মসমাজের বিরোধ-বিচ্ছেদের কথা হলেও তা বাঙলার সামাজিক ইতিহাসেরই একটা বড় অংশ। জাতিভেদ প্রথার উচ্ছেদ, বিধবা-বিবাহ, অসবর্ণ-বিবাহ প্রভৃতি বিষয়ে কেশবচন্দ্র আন্তরিক উৎসাহ নিয়ে অগ্রসর হয়ে যেতে চান, দেবেন্দ্রনাথ তাতে সায় দিতে পারলেন না। ১৮৬৪-এর শেষে তাঁদের দু'জনার বিচ্ছেদ হল। দেবেন্দ্রনাথ সেখানে পরিণত প্রৌঢ়ত্বের গাম্ভীর্যে ও আভিজাত্যে অটল হয়ে থাকেন। তাঁর অনুবর্তী সুহৃদ্ রাজনারায়ণ বসু হন তাঁর মতের মুখপাত্র—শতাব্দীর এই দ্বিতীয়ার্ধে রাজনারায়ণ বসু এক প্রবল দেশপ্রেমিক ও বাঙলা ভাষার প্রবল সাধক হিসাবে তাঁর বন্ধুদের সঙ্গেই স্থান গ্রহণ করেছেন। এদিকে ব্রাহ্মগণ ইং ১৮৬৭ অব্দে দেবেন্দ্রনাথকে 'মহর্ষি' উপাধি দান করে আপনাদের ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তখন তাঁর পুত্রেরা 'জাতীয় মেলা'র উদ্যোক্তা। ইং ১৮৮৬-তে 'শান্তিনিকেতন আশ্রম' প্রতিষ্ঠা করে দেবেন্দ্রনাথ তার ট্রাস্টপত্রাদি সুসম্পন্ন করেন। দীর্ঘ অবসরকালে তাঁর 'স্বরচিত জীবন-চরিত' প্রিয়নাথ শাস্ত্রী তাঁর মুখ থেকে শুনে লিপিবদ্ধ করেন, ১৮৯৭-তে (১৮৯৮?) তা প্রথম প্রকাশিত হয়। সুদীর্ঘ বার্ধক্য ভগবদ্‌চিন্তায় যাপন করে দেবেন্দ্রনাথ ১৯০৫-এ ৮৮ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করলেন।

বাঙলা সাহিত্যে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দান দু'তিন রকমের :—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ও তত্ত্ববোধিনী সভার সাংস্কৃতিক দান, রামমোহনের ব্রাহ্মধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও প্রচণ্ড খ্রীষ্টান অভিযানের বিরুদ্ধে হিন্দু সমাজের আত্মরক্ষা-বুদ্ধির উদ্বোধন,—এসব পূর্বেই আমরা বলেছি। তথাপি লক্ষ্য করা উচিত—পরবর্তী 'হিন্দু জাতীয়তাবাদের' একটা ভূমিকা দেবেন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতিও রচনা করেছিলেন। এদিক থেকে তাঁরা শুধু খ্রীষ্টানদের প্রতিপক্ষ নন ; খ্রীষ্টীয় ভক্তিবাদ ও সংস্কারবাদের প্রবক্তা—নিজেদের সহযোগী—কেশবচন্দ্রেরও বিরোধী এবং শুধু যুক্তিবাদী 'ডিরোজিয়ান্' বিদ্রোহীদের প্রতিপক্ষ নন, এমন কি, তত্ত্ববোধিনীরও অক্ষয়কুমার-বিদ্যাসাগরেরও প্রতিপক্ষ। দ্বিতীয়তঃ, তিনিই বাঙলায় ভাবুকতার ধারায় গদ্য (reflective prose) প্রথম রচনা করেন, আর সে ধারায় তাঁর তুলনা নেই। অবশ্য বাঙলা সাহিত্যে দেবেন্দ্রনাথের

শ্রেষ্ঠ দান—তাঁর লেখা নয়, তাঁর পুত্র-কন্যারা—দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, স্বর্ণকুমারী দেবী ও রবীন্দ্রনাথ।

দেবেন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ রচনা তাঁর আত্মজীবনী ('স্বরচিত জীবন-চরিত')—তা যে ১৮৯৪-তে রচিত, তা পূর্বেই বলা হয়েছে। এখানি তাঁর শেষ রচনা। গ্রন্থাকারে প্রথম বাঙলা রচনা 'ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ' (ইং ১৮৫১-৫০), তাকে সাহিত্য বলা চলে না। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় (১৭৭২ শকাব্দ—ইং ১৮৫০) যে সব প্রবন্ধ ও উপদেশ প্রভৃতি প্রকাশিত হয় তা গ্রথিত হয় 'আত্মতত্ত্ব-বিদ্যা'য় (ইং ১৮৫২)। এটিতেও ধর্ম-জিজ্ঞাসা যতটা ততটা সাহিত্য-সম্পদ নেই। কিন্তু এ গদ্য দেখেও বোঝা যায়—কী গুণ তাতে বিকশিত হবে। তিনটি বাক্যের একটি সংক্ষিপ্ততম উদ্ধৃতি নিই—অক্ষয়কুমার দত্তের বাহ্যবস্তুর জিজ্ঞাসার কথা মনে রেখে :

"লোকসকল বাহিরের বস্তুকে দেখে, আপনাকে দেখে না।…হায়! চতুর্দিকে বাহ্যবস্তু দ্বারা বেষ্টিত থাকিয়া, সর্বদাই বাহ্যবস্তুকে প্রত্যক্ষ করিয়া, লোকসকল মুগ্ধ হইয়া গিয়াছে।…এ বিবেচনা নাই যে আমি যদি না থাকিতাম, তবে কোথায় বা সূর্য, কোথায় বা চন্দ্র, কোথায় বা গ্রহনক্ষত্র, কোথায় বা এই জগৎ।"

এ সুর ভারতবর্ষের চিরদিনকার—রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এটি তাই পৈতৃক সম্পদ। দেবেন্দ্রনাথের নিজের রচনায় এটি একটি মূল সুর। তাঁর 'ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান' (দুই প্রকরণ) ইং ১৮৬২ ও ইং ১৮৬৬ অব্দে প্রকাশিত হয়। তার পূর্বেই ব্রাহ্মসমাজের উপদেশসমূহ প্রকাশিত হয়েছিল। তাতেও এ ভাব ও এ ভাষার বিস্তার দেখি। রাজনারায়ণ বসু তাঁর অনুগামী সুহৃদ্। কিন্তু বাঙলা ভাষায় সেই সাধক মিথ্যা বলেন নি—"দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যাখ্যান অতি প্রসিদ্ধ, উহা তড়িতের ন্যায় অন্তরে প্রবেশ করিয়া আত্মাকে চমকিত করিয়া তুলে এবং মনশ্চক্ষুকে অমৃতের সোপান প্রদর্শন করে।" এরূপ ভাবনায় পরিপ্লুত হলেও পশ্চিম প্রদেশের দুর্ভিক্ষ উপশমে সাহায্য সংগ্রহার্থে ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা (১৮৬১) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শুধু ধর্মবোধ নয়, জাতীয় দায়িত্ববোধও যে কতকটা বাঙালীর মনে জাগ্রত হয়েছিল, সে বক্তৃতা তারও একটি প্রমাণ—"আমার দেশ মরুভূমি হচ্ছে তাকে আমার বাঁচাতে হবে।"

দেবেন্দ্রনাথের রচনা সম্বন্ধে দ্বিতীয় কথা—ভ্রমণ-সাহিত্যের তিনি একটি দিক খুলে দেন। হিমালয় থেকে ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত নানা দেশ তিনি পর্যটন করেন।

সে রচনায় অধ্যাত্মবোধই স্থায়ী সুর। কিন্তু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপলব্ধিতে এসব ক্ষেত্রে ভাষা আরও গভীর ও ব্যঞ্জনাময়। 'আত্মজীবনী'তে এর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন অবশ্য অজস্র। কিন্তু ১৭৮০ শকাব্দের ভাদ্র মাসে (১৮৫৮) তত্ত্ববোধিনীর পৃষ্ঠায় ('কোন পর্যটক মিত্র প্রাপ্ত') সিমলা ভ্রমণের যে পত্র আছে, তাতে তার ছাপ রয়েছে। ডঃ সুকুমার সেন এ পত্রের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন —বাঃ সাঃ গদ্য, পৃঃ ১০০)। তবে বারবারই স্বীকার করতে হবে 'আত্মচরিতে'র তুলনা নেই—তা পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উদ্ধৃত করলেও যথেষ্ট হবে না। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের বঙ্কিম, হরপ্রসাদ প্রভৃতি গদ্যগুরুদের ভাষায় ও বানানে অনিশ্চয়তা কিংবা সাধু ও চলতি পদের মিশ্রণ দেখা যায়। সে তুলনায় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের এ রচনা অদ্ভুত রকমের দোষমুক্ত দেখছি। মুদ্রণ ও সম্পাদন কালে (ইং ১৮৯৮) এরূপে পরিমার্জিত না হয়ে থাকলে বলতে হবে তা বিস্ময়কর। এ সম্পর্কেই আর একটি কথা—রচনা-ক্ষেত্রে দেবেন্দ্রনাথের নিকট বিদ্যাসাগর উপকৃত বা বিদ্যাসাগরের নিকট দেবেন্দ্রনাথ উপকৃত, সমালোচকদের এই দু' শ্রেণীর কল্পনাই মূলতঃ আমাদের নিরর্থক মনে হয়। ভাষায় ও ভাবে দুই মনস্বী দুই জগতের মানুষ।

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র দুই প্রধান লেখক রাজনারায়ণ বসু ও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। রাজনারায়ণ বসু মধুসূদন-ভূদেবের সতীর্থ। দ্বিজেন্দ্রনাথ (ইং ১৮৪০-১৯২৬) সাহিত্যে প্রবেশ করেন ইং ১৮৬০-এ। শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধেই তাঁদের প্রতিভা বিকাশ লাভ করে; সে সময়েই তাঁদের দান আলোচ্য।

(গ) **বিদ্যাকল্পদ্রুম (ইং ১৮৪৬-১৮৫১) ও রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (ইং ১৮১৩-১৮৮৫)**ঃ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বেদান্তপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যার কঠিন সমালোচক ছিলেন রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (ইং ১৮১৩-১৮৮৫)। খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ (১৮৩১) করবার পর তিনি খ্রীষ্টধর্ম প্রচারে বিষম উৎসাহী। অপর পক্ষে খ্রীষ্টধর্মের প্রতিরোধ করতে দেবেন্দ্রনাথও বদ্ধপরিকর—পাশ্চাত্ত্য যুক্তিবাদ দিয়েই 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় তাঁরা বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ব্রাহ্মধর্ম প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করতেন। পাদ্রি কৃষ্ণমোহনও তাই দেবেন্দ্রনাথের ধর্মমতকে 'বিলিতী বেদান্তবাদ' বলে বিদ্রূপ করতে ছাড়তেন না। তাই 'তত্ত্ববোধিনী'র এই লেখক-মণ্ডলী থেকে তিনি

দূরে থাকেন। সেই বিরোধিতা ও সমালোচনার ফলে দেবেন্দ্রনাথের বিচার-বুদ্ধি মার্জিত হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু কৃষ্ণমোহন বাঙালী জাগরণে শুধু অ্যান্টিথিসিসের বা বিরোধের ভগ্নাংশ মাত্র, তা নয়। তাঁর সদ্বুদ্ধির দানও দুই পর্বের বাঙালী জীবনে প্রচুর।

কৃষ্ণমোহন হিন্দু কলেজের প্রথম যুগের ছাত্র—ডিরোজিও'র ছাত্র না হলেও তিনি ডিরোজিও'র শিষ্য—এবং 'ইয়ংবেঙ্গলের' মধ্যে সম্ভবতঃ সর্বাধিক কৃতী পণ্ডিত—তাঁদের মুখপত্র 'এন্কোয়ারারের' দৃপ্তভাষী সম্পাদক। দরিদ্র ব্রাহ্মণের ঘরে তাঁর জন্ম (ইং ১৮১৩), 'ইয়ংবেঙ্গল'-এর সম্পর্কে তাঁর কথা বলা হয়েছে। প্রতিভার বলেই তিনি হেয়ার সাহেবের ঠন্ঠনিয়ার পাঠশালা থেকে হিন্দু কলেজে পড়বার সুযোগ পেয়েছিলেন (ইং ১৮২৪)। এই কারণেই হেয়ারের স্নেহদৃষ্টিও লাভ করেন। ইং ১৮২৮-এ তিনি হিন্দু কলেজের শিক্ষা শেষ করে বিশেষ বৃত্তি পান ; ডিরোজিও সে কলেজের শিক্ষক হয়ে আসেন ইং ১৮২৬-এ। বন্ধুদের একদিনকার আকস্মিক হঠকারিতায় কৃষ্ণমোহন গৃহ থেকে বিতাড়িত হলেন (১৮৩১), শেষ পর্যন্ত ডাফ্ সাহেবের প্রভাবে পড়ে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করলেন (১৮৩২). এসবও পূর্বেই উল্লেখ করেছি। তারপর আরম্ভ হল আর এক অকপট উৎসাহ-ভরা জীবন—ইং ১৮৩৭ অব্দে তিনি পাদ্রি হলেন, খ্রীষ্টধর্ম প্রচার তাঁর এক প্রধান ব্রত হয়ে উঠল। ইংরেজ শাসকরা খ্রীষ্টধর্ম প্রচারে এ সময়ে আর বাধা দিত না, বরং খ্রীষ্টান প্রচারকরা নানাভাবেই শাসকদের সহায়তা পেত এ সময়ে। কৃষ্ণমোহনও, যেমন করে হোক, হিন্দু শিক্ষিতদের খ্রীষ্টধর্মে টানতে উদগ্রীব ছিলেন। স্ত্রীকে পিতৃগৃহ থেকে এনে তিনি খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করলেন। পরে কনিষ্ঠ ভ্রাতাও তাঁর সঙ্গে যোগদান করলেন। মধুসূদন দত্ত (ইং ১৮৪৩) ও জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের (ইং ১৮৫১) মত হিন্দু কলেজের ছাত্রদেরও খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণে তিনি কম উৎসাহ দেন নি। ইং ১৮৫০-এর পর থেকে নব-শিক্ষিতদের খ্রীষ্টান হবার প্রায় একটা হিড়িক পড়ে। হিন্দু সমাজও তাই কৃষ্ণমোহনের বিরুদ্ধে সর্বদাই সতর্ক থাকত। ফলে, জ্ঞান-বিজ্ঞানে, সাহিত্যে, প্রাচ্য বিদ্যায়, স্বদেশসেবায় তাঁর প্রবল প্রতিভার দান কৃষ্ণমোহনও তখন প্রসন্ন হস্তে দিতে পারেন নি, বাঙালী সমাজও প্রথম দিকে তা গ্রহণ করতে পারে নি। খ্রীষ্টান কলেজের অধ্যাপনায় (ইং ১৮৬৮ পর্যন্ত) তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় প্রতিষ্ঠা (ইং ১৮৫৭)

থেকেই তিনি তার সিনেটের ফেলো মনোনীত হন ; ক্রমে সিণ্ডিকেটের সদস্য হন, আর্ট বিভাগের 'ডীন হন। সিলেবাস-প্রণয়ন, পরীক্ষা-গ্রহণ প্রভৃতি সর্ববিষয়ে তাঁর সহায়তা ছিল তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরিহার্য। রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতির সঙ্গে তাঁকে 'ডক্টর অব লিটারেচর' উপাধি দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় (ইং ১৮৭৬ অব্দে) সম্মানিত করে। নবগঠিত কলিকাতা কর্পোরেশনের (ইং ১৮৭৬) সদস্য পদে তাঁকে জনসাধারণই বরণ করেন। রাজনৈতিক জীবন গঠনে তাঁকেই আনন্দমোহন-সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনে'র (ইং ১৮৭৬) প্রথম সভাপতিরূপে পুরোভাগে স্থাপন করেন। মুদ্রাযন্ত্র আইন, অস্ত্র আইন প্রভৃতি লর্ড লিটনের প্রতিক্রিয়াশীল আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-সভায় সভাপতি হতেন এই 'পক্বকেশ পাদ্রি'—সেই 'ইয়ং বেঙ্গলের' প্রথম বিদ্রোহী, অকপটতার প্রতীক, সে যুগের র‍্যাডিক্যাল, অকৃত্রিম দেশভক্ত। সুরেন্দ্রনাথের ভাষায়—"Never was there a man more uncompromising to what he beliveed to be truth, and hardly was there such amiability combined with such strength and firmness."

ইং ১৮৮৫ অব্দে যখন রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ৭২ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন, তখন এ বিষয়ে কারও আর সংশয় ছিল না। সাহিত্য-সাধনায়, প্রাচ্যবিদ্যাচর্চায়, পাণ্ডিত্যে, জনসেবায়, আজীবন স্বদেশী আচার-আচরণ অক্ষুণ্ণ রেখে তিনি তখন সকলের হৃদয় জয় করেছেন। হয়ত জনসেবার সেই মহাব্রতে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের উগ্র উৎসাহও নিরর্থক হয়ে উঠেছিল। 'এন্‌কোয়ারার' ও 'দি পারসিকিউটেড' (ইং ১৮৩১, ইংরেজিতে লেখা নাটক) থেকে 'টু এসেস্ অন দি এরিয়ান উইট্‌নেস্' (ইং ১৮৮০) পর্যন্ত, প্রায় ৫০ বৎসর ধরে ইংরেজি, সংস্কৃত ও বাঙলায় নানা বিষয়ে বক্তৃতা, প্রবন্ধ ও পুস্তকাদি কৃষ্ণমোহন রচনা করেন। সে সবের মধ্যে কৃষ্ণমোহনের বাঙলা রচনাই আমাদের আলোচ্য। কিন্তু 'রঘুবংশ' 'কুমারসম্ভব' থেকে 'ঋগ্‌বেদ সংহিতা'র প্রথম অষ্টক ও পুরাণসংগ্রহ, নারদ পঞ্চরাত্র পর্যন্ত সংস্কৃত গ্রন্থের সম্পাদক যে এই পাদ্রি কৃষ্ণমোহন, তা মনে রাখা দরকার। বাঙলায় তিনি 'সংবাদ-সুধাংশু', 'বেঙ্গল গেজেট' প্রভৃতি সংবাদপত্র সম্পাদনা করেছেন। তাঁর 'ষড়্‌দর্শন সংবাদ (খ্রীষ্টাব্দ ১৮৬৭) পাণ্ডিত্যের ও প্রাচ্যবিদ্যানুরাগের

প্রমাণ—বাঙলা ভাষারও সম্পদ। বাঙলা সাহিত্যে তাঁর বিশেষ পরিচয় 'বিদ্যাকল্পদ্রুমের' (ইং ১৮৪৬-১৮৫১) লেখক বলে—বাঙলা গদ্যের 'প্রস্তুতির পর্বে'র তা একটি জ্ঞান-প্রস্রবণ।

'বিদ্যাকল্পদ্রুম' অর্থাৎ বিবিধ বিদ্যা বিষয়ের রচনা, বিশ্বকোষ জাতীয় ক্রমশঃ প্রকাশিত গ্রন্থমালা—তার অন্য নাম 'এন্‌সাইক্লোপীডিয়া বেঙ্গলেন্‌সিস্'। বিশ্বকোষ জাতীয় গ্রন্থ সংকলন তখন আরও হচ্ছিল। 'বিদ্যাকল্পদ্রুমের' এক সংস্করণ ছিল বাঙলায়, অন্য সংস্করণে বাঁ দিকে ইংরেজিতে ও ডান দিকে বাঙলায় লেখা মুদ্রিত হয়েছিল। প্রথম কাণ্ড ('রোমরাজ্যের ইতিবৃত্ত, প্রথম খণ্ড') ইং ১৮৪৬-এ প্রকাশিত হয়, সরকারী শিক্ষা-বিভাগ থেকে 'বিদ্যাকল্পদ্রুম' ৫০০ কপি করে ক্রয় করা স্থির হয়। ইং ১৮৪৬ থেকে ইং ১৮৫১ পর্যন্ত মোট '১৩ কাণ্ডে' 'বিদ্যাকল্পদ্রুমে' কৃষ্ণমোহনের দ্বারা রোম ও ঈজিপ্ত প্রভৃতি দেশের পুরাবৃত্ত, জীবনবৃত্তান্ত, বিবিধ বিষয়ক পাঠ, ভূগোল, ক্ষেত্রতত্ত্ব, নীতি-বোধক ইতিহাস, চিত্তোৎকর্ষ বিষয়ক লেখা প্রভৃতি সংগৃহীত হয়। কৃষ্ণ-মোহনের নিজের ছাড়াও কিছু কিছু লেখা ছিল তাঁর বন্ধু 'ইয়ং বেঙ্গলের' প্যারীচাঁদ মিত্রের, যিনি 'টেকচাঁদ ঠাকুর' নামে বাঙলা সাহিত্যে অমরত্ব লাভ করেছেন। সেকালের সকল মনীষীর মতই কৃষ্ণমোহনের উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষাবিস্তার; জ্ঞান-বিজ্ঞানে জাতিকে প্রস্তুত করা। একটি উল্লেখযোগ্য তথ্য এই—খ্রীষ্টান কৃষ্ণমোহন সাময়িকভাবে ইংরেজি ভাষাকে শিক্ষার বাহনরূপে গ্রহণ করবার পক্ষপাতী হলেও (ইং ১৮৩৪-১৮৩৫-এর বিতর্ককালে তিনি অ্যাংগ্লিসিস্টদের দলেই ছিলেন) তাঁর ধারণা ছিল বাঙলাই একদিন বাঙালীর শিক্ষার বাহন হবে। তাঁর পাণ্ডিত্যে ও উদ্যমে বাঙলা ভাষা উপকৃত হয়েছে। তিনি বিদ্যাসাগরের মত বাঙলা লিখতে পারেন নি, তাঁর ভাষা সরল বা সরস নয়। কিন্তু গদ্যের প্রধান উদ্দেশ্য তাঁর সুবিদিত ছিল: বাঙলা ভাষায়ও তাঁর অধিকার ছিল। যেমন, 'মঙ্গলাচরণে' তিনি লিখেছেন—

"আমার অভিপ্রায় এই যে বঙ্গভূমির সমস্ত জাতিকে আমার শ্রোতা করি অতএব যে কেহ পাঠ করিতে পারে সকলের সুবোধক কথা ব্যবহার করিব তথাচ রচনার মাধুর্য দরশাইয়া মনোরঞ্জক শিক্ষা বিস্তার করিতে সাধ্যক্রমে ত্রুটি করিব না কিন্তু রূপক অলঙ্কারাদি রচনার শোভা স্পষ্টতর বোধক হইলে তাহার অনুরোধে বাক্যের সারল্য নষ্ট করিব না।"

বিষয় সরল না হলে ভাষার সারল্য সাধন আরও কষ্টসাধ্য হয়, তা জানা

কথা। কৃষ্ণমোহনের লেখাও সহজপাঠ্য নয়। তিনি সাহিত্য সৃষ্টি করেন নি; বাঙলা ভাষায় বাঙালীকে নানা জ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে কতকটা প্রস্তুত করে গিয়েছেন।

(ঘ) 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' (ইং ১৮৫১-১৮৬০) ও রাজেন্দ্রলাল মিত্র (ইং ১৮২২-১৮৯১):

প্রাচ্যবিদ্যার প্রথম ভারতীয় দিক্‌পাল রাজেন্দ্রলাল মিত্র। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'তেই তিনি বাঙলা রচনা আরম্ভ করেন; তিনিও সে পত্রিকার অন্যতম 'গ্রন্থাধ্যক্ষ' ছিলেন। অন্যদের মত তাঁরও কীর্তি এই 'প্রস্তুতির পর্বে' সীমাবদ্ধ নয়, পরবর্তী শতার্ধে তা উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে। বাঙলা সাহিত্যে তাঁর প্রধান কীর্তি 'বিবিধার্থ সংগ্রহের' (ইং ১৮৪৬ থেকে) সম্পাদনা ও পরে 'রহস্যসন্দর্ভের' (ইং ১৮৬৩ থেকে) সম্পাদনা। তা ছাড়া, এই মহামনস্বী 'ভার্নাকিউলার লিটারেচর কমিটি'র (বঙ্গভাষা অনুবাদক সমাজ) প্রয়োজনে বা শিক্ষার তাগিদে 'প্রাকৃত ভূগোল' (ইং ১৮৫৪), 'শিল্পিক দর্শন' (ইং ১৮৬০) বা 'শিবাজীর চরিত্র' (ইং ১৮৬০), 'পত্রকৌমুদী' (ইং ১৮৬৩) প্রভৃতি যে সব বাঙলা বই লেখেন তা আজ বিস্মৃত। তবে তা মনস্বী রাজেন্দ্রলালের বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির ও শিক্ষানুরাগের সাক্ষ্য। অবশ্য এ কথা ঠিক, রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলতেই ভারতবাসী এখন জানে তিনি প্রত্নতত্ত্বের অসামান্য পণ্ডিত, আর স্মরণ করে এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত (Bibliotheca Indica-য়) তাঁর সম্পাদিত সংস্কৃত গ্রন্থমালা ইংরেজিতে লিখিত রাজেন্দ্রলালের অসংখ্য গবেষণা প্রবন্ধ প্রভৃতি। সে পরিচয়ও বাঙলা সাহিত্যের পক্ষে অবান্তর নয়। কারণ, অতীতের এই পুনরাবিষ্কারের ফলে বাঙালীর সৃষ্টিশক্তি উদ্‌বুদ্ধ হয়ে উঠেছে। ইং ১৮২৯-এ রামকমল সেন, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রভৃতি দেশীয় প্রধানগণ প্রথমে 'এশিয়াটিক সোসাইটি'র সদস্যপদ লাভ করেন। প্রাচ্যবিদ্যার বিজ্ঞান-সম্মত গবেষণায় তাঁদের আগ্রহ জাগতে থাকে। এদিকে জেম্‌স্ প্রিন্‌সেপ্‌ ব্রাহ্মীলিপির পাঠোদ্ধার করেন (বাঙালী পণ্ডিত কমলাকান্তও তাতে কিছুটা সাহায্য করেছিলেন)। ভারতবর্ষে বুদ্ধ ও অশোকের স্মৃতির পুনরুজ্জীবন এভাবে আরম্ভ হল। ইতিহাসের এরূপ বৈজ্ঞানিক আলোচনা (টডের রাজস্থানও) শিক্ষিতদের মনে অতীত মহিমা জাগিয়ে তোলে—বাঙালীর নব-জাগরণের একটা প্রধান সত্য হল এই 'অতীতের পুনরাবিষ্কার'। রামমোহন,

দেবেন্দ্রনাথ, এমন কি বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি সকলেই এই 'আবিষ্কারের' বাহক, একথা বলা যেতে পারে। কিন্তু রাজেন্দ্রলাল মিত্র হলেন তার বৈজ্ঞানিক পথিকৃৎ। 'এশিয়াটিক সোসাইটি'র আসরে তখন থেকে ভারতীয় গবেষক-দের স্থান স্থায়ী হয়ে যায়। এ ছাড়া, যে জন্য রাজেন্দ্রলাল মিত্র বাঙলা সাহিত্যে স্মরণীয়, তা তাঁর সর্বতোমুখী প্রতিভা—রবীন্দ্রনাথ যে জন্য তাঁকে বলেছেন 'সব্যসাচী'। "এমন অল্প বিষয় ছিল, যে সম্বন্ধে তিনি ভাল করিয়া আলোচনা না করিয়াছিলেন এবং যাহা কিছু তাঁহার আলোচনার বিষয় ছিল, তাহাই তিনি প্রাঞ্জল করিয়া বিবৃত করিতে পারিতেন।" রবীন্দ্রনাথের জন্মের পূর্বেই এরূপ আলোচনা রাজেন্দ্রলাল মিত্র 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' (ইং ১৮৫৬) শুরু করেন। রবীন্দ্রনাথের শৈশবকালে 'রহস্যসন্দর্ভে' (ইং ১৮৬৩) তা চলে। আর 'ভারতী'র জন্যও যুবক রবীন্দ্রনাথ (ইং ১৮৮২) এই প্রবীণ মনস্বীর প্রবন্ধ সংগ্রহ করেছিলেন। সে সময়ে 'সারস্বত সমাজে' ও অন্যত্র তিনি বাঙলা পরিভাষা-সম্বন্ধে যে আলোচনা করেন আজও তা বিজ্ঞান-সম্মত বলে গ্রাহ্য। 'বিবিধার্থ সংগ্রহে'ই মধুসূদন প্রভৃতির নূতন সৃষ্টির ('একেই কি বলে সভ্যতা?' 'তিলো-ত্তমাসম্ভব কাব্য' প্রভৃতির) প্রকাশ ও সমাদর হয়েছিল, তা রাজেন্দ্রলালের সাহিত্য-বোধেরই প্রমাণ। পুস্তকাকারে তাঁর এসব লেখা প্রকাশিত হয় নি, কিন্তু মাসিকপত্রে সাহিত্য-সমালোচনার তা উৎকৃষ্ট নিদর্শন। 'বিবিধার্থ সংগ্রহ'ই বাঙলা প্রথম সচিত্র মাসিক পত্র, 'রহস্যসন্দর্ভ'ও তাই ছিল। 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' প্রাণীবিদ্যা, শিক্ষা-সাহিত্যাদি বিষয়ে লেখা থাকত; চিত্রে তা শোভিত হত; আয়তনে হত ২৪ পৃষ্ঠা পরিমাণ। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের প্রতিভা ও প্রয়াস দুই-ই এত বিরাট যে তা সংক্ষেপে বলা যায় না। রবীন্দ্রনাথ তার মুগ্ধ ও সশ্রদ্ধ বর্ণনা দিয়েছেন। তা থেকে রাজেন্দ্রলালের বৈশিষ্ট্য কিছুটা উপলব্ধি করা যায়।

শুঁড়ার (কলিকাতার) অভিজাত কায়স্থ ঘরের তিনি সন্তান। তাঁর পিতা জন্মেজয় মিত্রও সাহিত্যরসিক ছিলেন, পদাবলীও লিখেছিলেন। ইং ১৮২২-এ রাজেন্দ্রলালের জন্ম হয়। কলেজের শিক্ষা শেষ হয় ইং ১৮৪৪ সালে,—মেডিক্যাল কলেজের প্রধান সাহেবদের সঙ্গে বিরোধ বাধলে রাজেন্দ্রলাল সে কলেজ ত্যাগ করেন। কিন্তু একাগ্রচিত্তে তিনি বিদ্যানুশীলন করতে থাকেন। ইং ১৮৪৬-এ বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটিতে তিনি ১০০.

টাকা বেতনে সহকারী সম্পাদক ও গ্রন্থাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। এ সময়েই (ইং ১৮৫১) 'ভার্নাকিউলার লিটারেচর কমিটি'র সঙ্গে তাঁর সংযোগ ঘটে, আর তিনি 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' প্রকাশ করতে থাকেন। ১০ বৎসর পরে তিনি 'এশিয়াটিক সোসাইটি'র সদস্য (ইং ১৮৫৬) হলেন, ইং ১৮৫৭-তে তিনি সম্পাদক হলেন; আর পরে ইং ১৮৮৫-তে 'এশিয়াটিক সোসাইটি' তাঁকে সভাপতি পদে বরণ করে। জীবিকাক্ষেত্রে অবশ্য ইং ১৮৫৬ থেকে তিনি ওয়ার্ডস্ ইনস্টিটিউশনের ডিরেক্টর ছিলেন; সেখান থেকে ইং ১৮৮০-তে মাসিক ৫০০৲ টাকা পেন্সনে অবসর গ্রহণ করেন। এ ছাড়া, বিশ্ববিদ্যালয়ও তাঁকে ১৮৭৬ সালে এল এল-ডি উপাধি দেয়। পৌরসভায়, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশনে, জনহিতকর নানা কাজে তিনি তখন অগ্রগণ্য। তাঁর বীর্যবান ব্যক্তিত্ব তখন সকলের চক্ষে শ্রদ্ধার জিনিস। কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন (ইং ১৮৮৬) কলিকাতায় বসে, রাজেন্দ্রলাল মিত্র তার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন। ৫ বৎসর পরে ইং ১৮৯১ অব্দে তিনি পরলোকগমন করেন। আবার রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই বলতে হয় "কেবল তিনি মননশীল লেখক ছিলেন ইহাই তাঁহার প্রধান গৌরব নয়। তাঁহার মূর্তিতেই তাঁহার মনুষ্যত্ব যেন প্রত্যক্ষ হইত।"

(৬) **ভার্নাকিউলার লিটারেচর কমিটি** ('বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ') —এ প্রসঙ্গেই 'ভার্নাকিউলার লিটারেচর কমিটি'র (ইং ১৮৫১-১৮৭০) কাজ সংক্ষেপে স্মরণ করতে হয়। রাজেন্দ্রলাল মিত্র 'বিবিধার্থ সংগ্রহের' জন্য এ কমিটির থেকে ৮০৲ টাকা মাসিক সাহায্য পেতেন, তিনি ৬ষ্ঠ পর্ব পর্যন্ত তা সম্পাদনা করেন। ৭ম পর্বের (ইং ১৮৬১) সম্পাদক কালীপ্রসন্ন সিংহ। তা বেশিদিন স্থায়ী হয় নি। রাজেন্দ্রলালের 'রহস্য-সন্দর্ভ'ও (ইং ১৮৬৩) 'ভার্নাকিউলার লিটারেচর কমিটি'র আনুকূল্যে প্রকাশিত হয়েছিল। ৬ খণ্ড পর্যন্ত তা রাজেন্দ্রলাল সম্পাদনা করেন। কিন্তু এ ছাড়াও স্কুল বুক সোসাইটির মত এ কমিটি শিক্ষা বিষয়ে গ্রন্থ প্রকাশে উদ্যোগী হয়। সমিতির বিশেষ কাজ হচ্ছে 'গার্হস্থ্য বাঙলা পুস্তক সংগ্রহ'। প্রায় ১৭-১৮ বৎসর পর্যন্ত তার কাজ চলে। রাজেন্দ্রলাল মিত্র ব্যতীত প্যারীচাঁদ মিত্র, বিদ্যাসাগর, রাধাকান্ত দেব, পাদ্রি জেম্‌স্ লঙ্ সাহেবও এর সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। দু একজন ইংরেজ ও আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ, রাজনারায়ণ বিদ্যারত্ন, মধুসূদন মুখোপাধ্যায় এ

সংগ্রহে লিখেছেন। এঁদের প্রকাশিত পুস্তকের উপযোগিতা তখন যথেষ্ট ছিল; কিন্তু বিবেচনা করলে মানতে হয়—লঙ্-সম্পাদিত সংবাদপত্রের সংকলন 'সংবাদসার' (ইং ১৮৫৩) উল্লেখযোগ্য। বহুবিধ অনুবাদের মধ্যে 'রবিনসন ক্রুশোর ভ্রমণ বৃত্তান্ত' (১৮৫২) ল্যাম্বস্ 'টেলস্ ফ্রম্ সেক্স্‌পীয়র'-এর এক আধটি গল্প (১৮৫৩), পল ও ভার্জিনিয়ার ইতিহাস ('পৌল বর্জিনিয়া' ১৮৫৬), বৃহৎ কথা (১৮৫৭) প্রভৃতি অনুবাদ জাতীয় গ্রন্থ বাঙালী গৃহস্থ ঘরের দৃষ্টিকেও প্রশস্ত করে তুলেছিল, মধুসূদন বঙ্কিমের পাঠকশ্রেণী তৈরী করছিল।

এ প্রসঙ্গ মনে রাখতে পারি, অনুবাদ সাহিত্য দিয়েই এ যুগের সাহিত্যের যাত্রারম্ভ—মিশনারিরা বাইবেলের হুবহু অনুবাদ করেন। সংস্কৃত, ফারসি, ইংরেজি বইয়ের ভাবার্থ বাঙলায় পরিবেশন করা পূর্ব-পূর্ব পর্বের মত এ পর্বের লেখকদের একটা প্রধান কাজ হয়ে ওঠে। জীবন্ত সাহিত্য মাত্রই অনুবাদের দ্বারা আপনার পুষ্টি-সাধন করে নেয়। এসব অনুবাদের কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি (দ্রঃ ১৪০)। এই পর্বাংশেও বিদ্যাসাগর, কৃষ্ণমোহন প্রভৃতিও বহু বিষয় অনুবাদ করেছিলেন। শুধু গদ্যে নয়, কবিরা পদ্য-অনুবাদও করছিলেন; তাও পরে দেখব। ইংরেজি থেকে অনুবাদ করে আমরা পূর্ব থেকেই পাশ্চাত্ত্য জগতের প্রাচীন ও নবীন নানা ভাষা ও সাহিত্যের সম্পদ আহরণ করতে চাইছিলাম। আর ফারসি-আরবি সাহিত্যের যে সম্পদ অষ্টাদশ শতকে আসছিল অনুবাদ দ্বারা তাও অব্যাহত রাখতে চাইছিলাম। এসব অনুবাদের অনেক সময়েই কোনো সাহিত্যিক মূল্য নেই। তবু যাঁরা মনের আকাশকে ব্যাপ্ত ও সমৃদ্ধ করেছেন সেসব অনুবাদক মৌলিক সাহিত্যের আত্মপ্রকাশের পক্ষে কম সহায়তা করেন নি। পূর্বেই দেখেছি—এ পর্বে অনূদিত হল ল্যাম্বের লেখা সেক্স্‌পীয়রের গল্প (১৮৫২)—বাঙালী তখন সেক্স্‌পীয়র অভিনয়েও উৎসুক,—রবিনসন্ ক্রুশোর গল্প (১৮৫৮), জন্‌সনের রাসেলাস' (প্রথম কালী-কৃষ্ণ ঠাকুর অনুবাদ করেন, তারপর তারাশঙ্কর কবিরত্ন ইং ১৮৫৭ অব্দে অনুবাদ করেন), টেলিমেকস প্রভৃতি। বেকনের এসেস্-এর অনুবাদও হয় ১৮৫৮-তে। এমন কি 'ডেকামেরনে'র গল্পও (১৮৫৮) বাদ যায় নি। অবশ্য ইংরেজি থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ইতিহাস ও জীবনী প্রভৃতির অনুবাদের দ্বারা মোটামুটি মূলের মর্ম পরিবেশন করাই ছিল প্রধান লক্ষ্য। কখনো-কখনো ফারসি আরাবির বিষয়বস্তুও ইংরেজি থেকেই বাঙলায় পরিবেশিত হচ্ছিল—

যেমন, নীলমণি বসাক পারস্য কাহিনী (১৮৩৪), আরব্য উপন্যাস (১৮৫০) প্রভৃতি রচনা করেছিলেন (নীলমণি বসাকের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ অবশ্য 'নরনারী'—ভারতীয় মহীয়সী নারীর কথা—এটি যুগ লক্ষণের একটি প্রমাণ)। 'সাহনামা' —অর্থাৎ ফেরদৌছি তুছির কৃত পারস্য ভাষায় পূর্বাগত বাদশাহদিগের বিবরণ, অনূদিত হয়েছিল ইং ১৮৩৭-এ। সংস্কৃতের অনুবাদের কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। কারণ, একদিক থেকে তো গোটা উনবিংশ শতাব্দীই সংস্কৃতের পুনরুজ্জীবনের যুগ—অনুবাদ, সম্পাদন ও বৈজ্ঞানিক গবেষণায় তা বাঙালীকে আত্মস্থ হতে সাহায্য করেছে। রামমোহনের বিরোধীদের মতই বিদ্যাসাগর বা দেবেন্দ্রনাথের বিরোধী 'সনাতনীরা'ও সে কাজ কম করেন নি। 'তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকা'র প্রতিপক্ষ ছিল 'নিত্যধর্মানুরঞ্জিকা'র (ইং ১৮৪৬ অব্দে সূচনা) নন্দকুমার কবিরত্ন প্রভৃতি। শাস্ত্র, দর্শন, মহাভারত (কালীপ্রসন্ন সিংহ ও বর্ধমানের মহারাজার সহায়তায় পর পর্বে অনূদিত) ছাড়া কাব্যের অনুবাদ, অনুসরণ ও মূলাবলম্বনে বাঙলা রচনা পূর্বাপর চলে। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে কেন, বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধেও তা শেষ হয় নি। তবে এসব অনুবাদের নিজস্ব সাহিত্যিক মূল্য না থাকলে এখন তা আর উল্লেখযোগ্য নয়।

(চ) **সংস্কৃত কলেজের লেখক-গোষ্ঠী ও হিন্দু কলেজের লেখক-গোষ্ঠী**—বিদ্যাসাগরের অনুপ্রেরণায় সংস্কৃত কলেজের যে লেখক-গোষ্ঠী বাঙলা রচনার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, তাঁদের অল্প লেখাই এ পর্বে (ইং ১৮৫৭-এর মধ্যে) রচিত হয়, অধিকাংশই পরবর্তী সৃষ্টি-সমৃদ্ধ যুগে রচিত। আর, তাই সে যুগের সাহিত্যের তুলনায় তাঁদের খ্যাতি ম্লান হয়ে গিয়েছে। না হলে, এই লেখক-গোষ্ঠীর কেউ কেউ এখনো বিস্মৃত নন। যেমন, তারাশঙ্কর কবিরত্নের 'কাদম্বরী' (ইং ১৮৫৪) বিখ্যাত হয়েছিল। 'বাণভট্টের' সে কাব্য তিনি অনুবাদ করেন নি, তার ভাবার্থ পরিবেশন করেছেন; কিন্তু তা মোটামুটি উপাদেয়। তাঁর অনূদিত 'রাসেলাস'ও (১৮৫৭) জনপ্রিয় হয়েছিল।

রামগতি ন্যায়রত্ন (ইং ১৮৩১-১৮৯৪)—'বাঙলা ভাষা ও বাঙলা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবের' (১৮৭২-৭৩) লেখক হিসাবে বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসকার। কিন্তু 'রোমাবতী' (১৮৬২ ?) ও 'ইলছোবা' নামে দু'খানি রোমান্সও গদ্যে-পদ্যে তিনি রচনা করেছিলেন। অবশ্য সে জাতীয় রোমান্সের দিন তখন গিয়েছে।

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের (ইং ১৮৪০ ?-১৯৩২) 'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণের' প্রথম সংস্করণ ইং ১৮৫৭-৫৮তেই প্রকাশিত হতে থাকে। ইংরেজি Romance of History অবলম্বনে তা রচিত। তা সার্থক রচনা। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য বেকনের অনুবাদক রামকমলের অনুজ। সুদীর্ঘ জীবন, অসামান্য মনস্বিতা ও দুর্দমনীয় মতবাদের তিনি অধিকারী ছিলেন (বিপিনবিহারী গুপ্তের 'পুরাতন কথায়' তাঁর বক্তব্য পাঠ্য)। তাঁর অনূদিত পৌল ও ভর্জিনী 'অবোধ বন্ধু' পত্রিকায় যখন (ইং ১৮৬৮-৬৯ ?) প্রকাশিত হতে থাকে তখন তা শুধু বালক রবীন্দ্রনাথকে নয়, সমস্ত ঠাকুর-পরিবারকে চঞ্চল করেছিল— (১৩৬৪-এর বৈশাখে 'দেশে' প্রকাশিত সত্যেন্দ্রনাথের পত্রাবলী দ্রষ্টব্য)। তখন বঙ্কিমের রোমান্সের আবহাওয়া দেশে এসেছে—অর্থাৎ সাহিত্যের 'হাওয়া বদল' হয়ে গিয়েছে ; কৃষ্ণকমলের অনূদিত রোমান্স তাতেই জোগান দেয়। নীলমণি বসাকের কথা পূর্বে বলা হয়েছে। অন্যান্য লেখকদের মধ্যে ছিলেন রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরিশ বিদ্যারত্ন প্রভৃতি সংস্কৃত কলেজের লেখক ; দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের 'সোমপ্রকাশ' (প্রথম প্রকাশ ১৮৫৮) পরবর্তী পর্বেই আলোচ্য। এঁরা কেউ বিদ্যাসাগর নন, তবু তাঁদের শিক্ষায় ও উপদেশে তারাশঙ্কর, দ্বারকানাথ, রাজকৃষ্ণ প্রভৃতি ভালো বাঙলা লিখেছেন ; **রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়** বিদ্যাসাগরের স্নেহভাজন লেখক। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য অবশ্য আরও বিশিষ্ট মনস্বী, 'সংস্কৃত কলেজের লেখক' বললে তাঁর পরিচয় সম্পূর্ণ হয় না।

হিন্দু কলেজের লেখক গোষ্ঠীর সম্মুখে বিদ্যাসাগরের মত কেউ আদর্শ স্থানীয় লেখক ছিলেন না। তা শুভদায়কই হয়েছে। গোষ্ঠীবদ্ধ লেখকরূপেও তাঁরা গড়ে ওঠেন নি। ইংরেজি ভাষার আদর্শ বুঝে নিয়ে এই ইংরেজিওয়ালারা বাঙলাকে বাঙলা হিসাবে গঠিত ও পরিপুষ্ট করতে চেয়েছেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্ববোধিনীর প্রাণ ও বাঙলা ভাষার এক অদ্ভুত স্রষ্টা, যদিও তিনি 'ইংরেজিওয়ালা' হতে চান নি। প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার, দুই ইয়ং বেঙ্গল, 'মাসিক পত্রিকা' স্থাপন করেন (ইং ১৮৫৪)। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল এমন সরল বাঙলা লিখবেন যা বাঙালীর ঘরের মেয়েরা পড়েও বোঝেন —পণ্ডিতরা সে বাঙলা না পড়ে না পড়ুন। রাধানাথ শিকদার সামান্য বাঙলা লিখলেও এজন্যই স্মরণীয়। ইয়ং বেঙ্গল সকলেই হিন্দু-কলেজেরই ছাত্র (দ্রঃ

১২৯), মাসিক পত্রেই তাঁদের 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রথম বেরুতে থাকে। পর-পর্বে উপন্যাস প্রসঙ্গে তা আলোচ্য। সে পর্বেই আলোচ্য ভূদেব, মধুসূদন, রাজনারায়ণ—হিন্দু কলেজের উজ্জ্বল নক্ষত্রমালা, আমাদের ললাটে যাঁরা জ্যোতির্লেখা এঁকে দিয়ে গিয়েছেন।

(ছ) **অন্যান্য গদ্য লেখক ও গদ্য রচনা**—সে যুগের বহু লেখক আজ বিস্মৃত,—কাল অন্যায়ও করে নি তাতে। কিন্তু তাঁদেরও উপযোগিতা তখন ছিল। তাঁদের একজন লেখককে একটি গ্রন্থের জন্য স্মরণ করা প্রয়োজন। 'বঙ্গদূতের' প্রথম সম্পাদক নীলরতন হালদার রামমোহনের অনুবর্তী ছিলেন। তখন থেকেই তিনি বাঙলা ভাষার সেবাও করছেন। তাঁর বাঙলা ভাষা অলঙ্কার-কণ্টকিত। 'প্রভাকরী' গদ্যের প্রভাব তাতে বেশি। কিন্তু নীলমণি হালদারের 'বিদ্বোন্মাদ তরঙ্গিণী' স্মরণীয় তার ভাব-মাহাত্ম্যে। গ্রন্থকার বলেন, "ইহাতে হিন্দু, মুসলমান, য়িহুদী, খ্রীষ্টান, এই চারি জাতির স্ব স্ব ধর্ম বিচার-ছলে এক পরমেশ্বরোপাসনা, ইহাই শাস্ত্রোক্তি সদ্‌যুক্তি দ্বারা প্রতিপাদিত হইল। এবং অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত পরস্পর বিবাদ করিলে কোন ফল দর্শে না"—ইত্যাদি। রামমোহনের অনুগামীর উপযুক্ত কথা নিশ্চয়। জয়নারায়ণ ঘোষালের 'করুণানিধানবিলাস'ও (১৮১৩-১৫) এ কারণে স্মরণীয়। কিন্তু এ উদার দৃষ্টিভঙ্গি অন্য জাতির মধ্যে কি এতটা সুলভ? এটিই ভারতবর্ষের দৃষ্টির বিশেষত্ব বাঙালী তা বুঝেছিল,—আধুনিক মানুষের দৃষ্টিও এ জাতীয়ই।

আর দুটি কথাও এই গদ্যের হিসাবনিকাশে ভুলে গেলে চলবে না। যেমন, এ পর্বেও বাঙলা গদ্যের প্রধান আসর ছিল **সংবাদপত্র**—'প্রভাকরের' পরে এল 'তত্ত্ববোধিনী, 'সংবাদ ভাস্কর, 'বিবিধার্থ সংগ্রহ', 'মাসিক পত্র' এবং শেষে 'সোমপ্রকাশ। এ পর্বে এ সবের কথা আর নতুন করে বলা নিষ্প্রয়োজন। লক্ষণীয় সংবাদ পত্র ও সাময়িক পত্র তখন সংখ্যায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। ইং ১৮৫৩-৫৪ অব্দে **'প্রভাকরের'** পৃষ্ঠায় মাসের প্রথম সংখ্যায় ঈশ্বর গুপ্ত কবি, কবিওয়ালা ও গীতকারদের জীবনী ও লেখা প্রকাশ করতেন (পৃ ১৩৯)। আজও নিধুবাবু, রাম বসু প্রভৃতির সম্বন্ধে তা আমাদের প্রধান এক ঐতিহাসিক সম্বল। এই মাসিক সংখ্যাসমূহে আমরা আধুনিক মাসিক পত্রের পূর্বাভাস পাই। গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য (গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য, ইং ১৭৯৯-১৮৫০) **'সম্বাদ-ভাস্করের'** (প্রথম প্রকাশ ১৮৪৮) সম্পাদকরূপে প্রসিদ্ধ। এ পত্রের

খ্যাতি ছিল প্রচুর, গৌরীশঙ্করও ছিলেন অদ্ভুত লোক। তিনি শ্রীহট্টের মানুষ। পনের বৎসর বয়সে কলকাতায় এসে নিজের উদ্যোগে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। লঙ্‌ সাহেবের 'সত্যার্ণব' (প্রথম প্রকাশ ১৮৫০) শুধু খ্রীষ্টধর্মের কাগজ ছিল না, লঙ্‌ যথার্থ সমাজতাত্ত্বিক ও মানবহিতৈষী ছিলেন। ইং ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে 'সোমপ্রকাশ' সাংবাদিকতায় নতুন যুগ আনে।

ভুললে চলবে না বাঙলা গদ্য শেষ দিকে আরও একটি ক্ষেত্রে আপনার আসন পাতছিল ; সে হচ্ছে **বাঙলা নাটক ও রঙ্গমঞ্চ**। সাহিত্যের নতুন প্রকাশের পক্ষে শতাব্দীর মধ্যভাগে বাঙলা নাটকের দান অসামান্য, তা আমরা সকলেই জানি। প্রস্তুতি যখন সম্পূর্ণ, বাঙলা নাটকই তখন বাঙালী প্রতিভাকে আপনার আসরে আত্মপ্রকাশের জন্য আমন্ত্রণ করলে। নাট্যকার রূপেই সাহিত্যে মধুসূদন প্রথম প্রবেশ করেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নাট্য-সাহিত্যের সূত্রপাত

নাট্যশালা ও নাট্য-সাহিত্য এ দুই-এর সংযোগেই নাট্যকলা। অথবা নাট্যকলা হচ্ছে একাধিক কলার সমন্বয়ে সৃষ্ট একটা নতুন শিল্পকলা। অভিনয় ও কাহিনী রচনা তার মধ্যে প্রধান; সে সঙ্গে মঞ্চকারু,দৃশ্যাঙ্কন থেকে রূপসজ্জা, আলোক-শিল্পেরও নানা নতুন কলাকৌশল ক্রমে দিনের পর দিন এসে মিশেছে —আরও হয়ত মিশবে। প্রাধান্য তথাপি অক্ষুণ্ণ রয়েছে দু' শিল্পের—অভিনয়-শিল্পের ও নাট্য-সাহিত্যের। আর, এ দুয়ের সংযোগেরও পিছনে থাকে তৃতীয়ের সহায়তা—দর্শক সাধারণের সহৃদয় আগ্রহ। দর্শক শ্রেণীও আবার বিশেষ সমাজ, তার ঐতিহ্য, তার আদর্শ, তার রুচি, শিক্ষা-দীক্ষা, জীবন-দর্শনের বাহক, তা মনে রাখা দরকার। এসব জটিল কারণের যোগাযোগে নাট্যকলার শ্রীবৃদ্ধি বা শ্রীহীনতা ঘটে। কথাটা এই—কাব্য ও কথা-সাহিত্য অনেকটা একক প্রতিভার দান। কিন্তু নাটক রচনার ক্ষেত্রে ব্যক্তি-প্রতিভা আরও অনেক বেশি মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে অন্য শিল্পীদের, যেমন অভিনেতার, মঞ্চাধ্যক্ষের, বিশেষ করে প্রযোজক শিল্পীর, এবং দর্শক সাধারণের। তাই, যে সমাজের জীবন দর্শনে এই জীবনাগ্রহ ব্যাহত, আর জীবনযাত্রায়ও যারা সুশৃঙ্খল যৌথ কর্মে অনভ্যস্ত, সে সমাজে নাট্যকলার মত জটিলতা সমন্বিত শিল্পকলার বিকাশও সহজসাধ্য হয় না। একশত বৎসরেও বাঙালী সংস্কৃতিতে বাঙলা নাট্যশিল্পের ও নাট্য-সাহিত্যের আশানুরূপ বিকাশ হল না কেন, ওপরের এই কথা মনে রাখলে তার মূল কারণ বুঝতে পারি। অবশ্য আধুনিক যুগের কিছু কিছু ভাবনা আমাদের মানস লোকের একাংশে ঢেউ তুলেছে। কিন্তু আধুনিক যুগের আর্থিক সামাজিক ব্যবস্থা আমরা আয়ত্ত করতে পারি নি। তাই, আধুনিক যুগের নাট্যকলার সম্পূর্ণ রসাস্বাদনে আমরা সমর্থ হই না,—সেরূপ 'থিয়েটর' (নাট্যশালা) ও 'ড্রামা' (নাট্যসাহিত্য) রচনা করতে প্রয়াস করি, কিন্তু সেই বাস্তব জীবন-বিন্যাস ও জীবন-চেতনার অধিকারী আমরা হতে পারি নি, তাই সে প্রয়াসে সম্পূর্ণ সার্থকতা অর্জন করতে পারি না।

॥ ১ ॥ দেশী-বিদেশী ধারা সংযোগ

(ক) 'থিয়েটর'-এর ঝোঁক ও লেবেদেভ্ (১৭৯৫)

বাঙলা নাট্যসাহিত্যের মূলে আছে ইংরেজি নাট্যসাহিত্য ও ইংরেজি নাট্যকলার সঙ্গে বাঙালীর পরিচয়। ইং ১৮০০ অব্দের পর থেকে আমরা ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হতে থাকি। তার পুর্বেই অবশ্য ইংরেজি 'থিয়েটর' ও ইংরেজি 'প্লে'র (অভিনীত নাটকের) সঙ্গে কলিকাতার বাঙালীর পরিচয় হয়েছিল। কলিকাতার ইংরেজ সমাজ নিজেদের তুষ্টির জন্য ঘোড়দৌড় ও জুয়ার মত নাচ ও গান এবং এরূপ রঙ্গমঞ্চ ও 'প্লে' বা খেল-এর আয়োজন করত। 'থিয়েটর' নতুন বলেই হোক, কিম্বা উন্নত পদ্ধতির জন্যই হোক, বাঙালীর চোখে ভাল লেগে থাকবে। না হলে রুশ আগন্তুক গেরাসিম লেবেদেভ্ (Gerasin Lebedev) ইং ১৭৯৫ অব্দে ২৫ নং ডোমতলায় (এখনকার এজরা স্ট্রীটে) বাঙলা থিয়েটর খুলতে সাহস করতেন না। লেবেদেভ্ সম্বন্ধে অবশ্য এখন আমাদের ধারণা বদলেছে—তিনি শুধু বাহাদুর প্রকৃতির (অ্যাড্ভেঞ্চারার) বাজে লোক ছিলেন না। ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' তিনি দেশে নিয়ে গিয়েছিলেন—অনুবাদ করতেও চেয়েছিলেন, আর একখানা পূর্ব ভারতীয় ভাষাসমূহের ব্যাকরণও (হিন্দুস্থানী ব্যাকরণ) লেবেদেভ্ লিখেছিলেন। নিশ্চয়ই 'নবযুগের' যুগধর্ম তাঁকে স্পর্শ করেছিল। না হলে এ উদ্যম, উৎসাহ তাঁর এল কি করে? লেবেদেভের থিয়েটরে যে দু'খানি নাটক অভিনীত হল তার ইংরেজি নাম 'দি ডিস্গাইস' ও 'লভ্ ইজ দি বেস্ট ডক্টর'। বাঙলা অনুবাদে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন গোলকনাথ দাস নামক পণ্ডিত। লেবেদেভের কথা থেকে বোঝা যায় বাঙালীরা তখন হাস্যরস, এমন কি স্থূল ভাঁড়ামি চাইত, তাই নাটক দুখানা ছিল প্রহসনজাতীয় রচনা। তার স্ত্রীভূমিকাও স্ত্রীলোকেই অভিনয় করেছে। টিকিট করেও এ নাটক দেখতে অনেক দর্শক এসেছিল। কারণ, ইং ১৮৯৬-এর মার্চ মাসে দ্বিতীয়বারও এ অভিনয় হয়, টিকিটের দাম আরও তখন বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, স্থান ছিল মাত্র ২০০ দর্শকের। এর পরেই লেবেদেভের অন্তর্ধান। মনে হয় থিয়েটর চললেও বাঙলা থিয়েটরের এই বিদেশী উদ্যোক্তার উপর ইংরেজ কর্তৃপক্ষ প্রসন্ন ছিলেন না।

ধূমকেতুর মত লেবেদেভ্ এলেন ও গেলেন। ব্যাপারটা তত অর্থহীন মনে

হবে না যদি মনে রাখি 'থিয়েটরের' লোভ বাঙালী সমাজে জাগছিল। পরের-কার প্রায় পঁচিশ বৎসর অবশ্য আমরা বাঙলা থিয়েটার ও নাটকের খোঁজ পাই না, তবু মনে রাখা দরকার—(১) বাঙালী পেশাদারী থিয়েটারের রূপ চিনছিল, (২) ইং ১৮১৭-তে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে বাঙালী শিক্ষিত সমাজ ইংরেজি নাট্যসাহিত্যের সঙ্গে সুপরিচিত হল। তারপরেও যদি থিয়েটার নির্মাণে ও নাটক রচনায় তার আকাঙ্ক্ষা না জাগত, তাহলে বুঝতে হত—সেই শিক্ষিত শ্রেণী অন্ধ। আর তাঁদের উপরতলার এই নতুন প্রয়াস যদি নিচের তলার সাধারণ সমাজকে ক্রমে আকৃষ্ট না করত, তাহলে মানতে হত ভারতবর্ষের অন্যান্য জাতিদের মত বাঙালীও নাট্যসম্পদে বঞ্চিত থাকবে। আবার, বাস্তব জীবনের প্রয়োজনীয় বিবর্তন ছাড়াই যদি বাঙালী সাধারণ একটা সবল থিয়েটার-ঐতিহ্য গড়ে তুলতে পারত, তাহলে মানতে হত—থিয়েটার সামাজিক সম্পদ না হয়ে উঠলেও বুঝি সগৌরবে চলতে পারে।

বাঙলার নাট্যসাহিত্য নবযুগের ইউরোপের থিয়েটর ও নাট্যসাহিত্যের সন্তান। এই 'নবযুগ' অবশ্য পাঁচশো বা চারশো বৎসর ধরে চলছে। আধুনিক থিয়েটার না জন্মাতেও কিন্তু অভিনয় ছিল, নাটক রচিত হত। গ্রীসে, পরে রোম সাম্রাজ্যে, ভারতবর্ষে চীনে জাপানে প্রাচীন নাট্যকলার বিশিষ্ট-বিশিষ্ট ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল, তা আমরা জানি। সংস্কৃত নাট্যাভিনয়ের সে ঐতিহ্য ভারতবর্ষের নানা অঞ্চলে কতটা জীবিত ছিল, তা এখন বলা শক্ত। তবু চৈতন্যদেব কৃষ্ণনাট্য অভিনয় করেছিলেন, গৌড়ীয় বৈষ্ণব পণ্ডিতেরা নাট্যাকারে তাঁদের নাট্যকাব্য লিখেছেন। ইংরেজ আমল পর্যন্ত সে জাতীয় জিনিস চলেছে কিনা সন্দেহ। বাঙালীর হাতে ইংরেজ আমলে যা এসে পৌঁছেছিল তা সংস্কৃত নাটক বা তার বংশধররা নয়, তা বাঙলার 'যাত্রা'।

(খ) যাত্রার ঐতিহ্য

'যাত্রা'র উৎপত্তি আর ঐতিহ্য নিয়ে বিশেষ গবেষণা এখন করা নিষ্প্রয়োজন (ডঃ এস কে দে'র ইংরেজিতে লেখা উনিশ শতকের বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে তা দ্রষ্টব্য, পৃঃ ৪৪২-৪৫১। সম্ভবত এ জিনিসের উপরই নিবন্ধ রচনা করে সেকালে ডঃ নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় সেন্টপিটর্সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এচ. ডি উপাধি লাভ করেছিলেন)। কারণ, বাঙলা নাট্যকলার জন্ম যেমন সংস্কৃত নাট্যকলা থেকে নয়, তেমনি বাঙালীর 'যাত্রা' থেকেও নয়। মোটামুটি

একথা জানা দরকার—'যাত্রা' লোকনাট্যের ঐতিহ্য নিয়েই গড়ে উঠেছে। সে তুলনায় সংস্কৃত নাটক দরবারী জিনিস, বিদগ্ধ শ্রেণীর কলা-বোধে তা মার্জিত ও পুষ্ট। অন্যদিকে খুঁটিনাটিতে না গিয়েও বলা যায়—'যাত্রা' যে সমাজের আবিষ্কার, আধুনিক থিয়েটার সে সমাজের আবিষ্কার হতে পারত না। দেশ হিসাবে বা কাল হিসাবেই শুধু যাত্রা ও একালের নাটক পৃথক নয়; পার্থক্যটা মৌলিক—দুই সমাজ-ধর্মের পার্থক্য। থিয়েটার ও আধুনিক নাট্যকলা ইউরোপীয় 'রিনাইসেন্সের' পরবর্তী সমাজে গড়ে উঠেছে, বলেছি। একথার অর্থ এই—সে সমাজের মূল সত্য নূতন জীবন-যাত্রা, নূতন জীবনদর্শন—ঐহিকতা, জীবনানন্দ, বুদ্ধির মুক্তি, ব্যক্তিসত্তার আত্মপ্রতিষ্ঠা, ইত্যাদি। এ নাটককে বলা হয়, 'ড্রামা অব অ্যাকশন'। কর্ম-চঞ্চল-ব্যক্তিচরিত্র হচ্ছে এ নাট্যকলার মূল উপাদান। এর সঙ্গে আমাদের 'যাত্রা'র যে পার্থক্য তাও মৌলিক। প্রথমত আমাদের সে সমাজ তখন পর্যন্ত মধ্যযুগের নিগড়ে বাঁধা, নিবৃত্তিমার্গের শূন্যতায় জীবন তখনো আচ্ছন্ন, কর্ম-চাঞ্চল্য অপেক্ষা কর্ম-সন্ন্যাসই আমাদের নিকট প্রশংসনীয়! মানব-লীলা অপেক্ষা দেবলীলায় আমাদের বেশি রুচি। আর ঐহিকতা অপেক্ষা অলৌকিকতায় আমাদের বেশি আস্থা। এ আবহাওয়াতেই 'যাত্রা'র বিকাশ। বিশেষ করে, গোড়া থেকেই 'যাত্রা' কথাটি বোধহয় বোঝাত দেবপূজার উৎসব, তারপরে, সে সম্পর্কিত দেব-মাহাত্ম্য বর্ণনার নাচগান--কাহিনী বর্ণনা। সন্দেহ নেই, গানই ছিল তার প্রাণ; অভিনয় বা সংলাপ গৌণ বস্তু। উদ্ভটতা ও অলৌকিকতার বাড়াবাড়ি ছিল 'যাত্রা'র স্বাভাবিক। অবশ্য সভার মাঝখানে 'যাত্রা'র আসর রচিত হত, তাতে দর্শকদের সঙ্গে অভিনেতাদের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ থাকত--এটা যাত্রার বড় গুণ। গ্রাম্য সমাজের রুচির তাগিদে হাস্যরসের যোগান দিতে হত। সেই সূত্রে ক্রমে দেবলীলার মধ্যে নারদ, ব্যাস, জটিলা কুটিলা প্রভৃতি মানব চরিত্র থেকে শেষে একেবারে কালুয়া ভুলুয়া, মেথর মেথরানী, ঘেসেড়া ঘেসেড়ানীও 'যাত্রা'য় এসে গিয়েছিল।

এ হেন 'যাত্রা' তবু নাট্যকলার গোষ্ঠীরই কন্যা তাতে ভুল নেই। ইউরোপের মধ্যযুগের 'মিরাক্‌ল্ প্লে' ও 'মিস্ট্রি প্লে'ও তো ধর্ম ও দেবলীলার কথা। তার সঙ্গে আধুনিক নাটকের সম্পর্কও স্বীকৃত। তাহলে আমাদের 'যাত্রা' কেন আমাদের 'নাট্যকলা'য় রূপান্তরিত হল না? এ প্রশ্নের উত্তর

আগেই পেয়েছি:—যেহেতু আমাদের মধ্যযুগীয় সমাজ স্বাভাবিক ভাবে রিনাইসেন্সের ঘাত-প্রতিঘাতে যথার্থ নব-জন্ম লাভ করে নি, ইংরেজের চাপে কতকাংশে সেরূপ চিন্তাভাবনায় জাগরিত হয়েছে। তার ফলে, 'যাত্রা'র জগৎ ভেঙে যেতে লাগল, 'থিয়েটরে'র জগৎ এসেও সমাজের মাটিতে শিকড় গাড়তে পারে নি। এমন কি উনিশ শতকে পৌঁছে থিয়েটার ও আধুনিক নাটকের যখন আমরা রসাস্বাদন করতে পারলাম, আর বাঙলায়ও তদনুরূপ নাট্যকলা-বিকাশে সচেষ্ট হলাম, তখনো 'যাত্রা'র গান, ভাঁড়ামি প্রভৃতি ঐতিহ্য একেবারে কাটিয়ে উঠতে পারলাম না। পুঁথিপড়া সংস্কৃত নাটকের ধাঁচও কাজে লাগাতে কম চেষ্টা করলাম না। বাঙলা থিয়েটারের পক্ষে এই 'প্রস্তুতির পর্ব ছিল যাত্রারও শেষ প্রকাশের কাল। তারপর থেকে 'যাত্রা' থিয়েটারী ঢং-এ নাটক হতে চেষ্টা করেছে, বিংশ শতকে 'থিয়েট্রিক্যাল যাত্রা পার্টি' দেখা দিয়েছে, পুরাণ ছেড়ে ইতিহাসের বিষয় নিয়েও যাত্রা এখন রচিত হয়। অবশ্য পুরাতন ধরনের 'যাত্রা'ও যায় নি। তবে মোটের উপর পুরনো যাত্রা আজ যাবার পথে। নতুন ধরনের যাত্রা কিন্তু এখনো চলিত। আমাদের থিয়েটার, নাটক, ফিল্‌ম্‌, যাই আসুক, 'যাত্রা'র ও-জাতীয় গানের ঐশ্বর্যকে একেবারে অগ্রাহ্য করতে তা সাহস করে না। গানের জন্যই অনেক সময়ে তার জনপ্রিয়তা। নাচও আছে, গীতসম্বলিত নৃত্যনাট্য আছে, আর তা ছাড়া নাচের স্বতন্ত্র প্রকাশও এখন হয়েছে।

'যাত্রা'র পুরাতন পুঁথি নেই, কেউ রাখে নি। লোক-রচনার ও-সব জিনিস রাখতে হত না। গীতগোবিন্দ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন প্রভৃতির কাঠামো দেখে মনে হয় 'কৃষ্ণযাত্রা', বিশেষ করে 'কালীয়-দমন যাত্রা'ই মধ্যযুগে প্রাধান্য লাভ করেছিল। তবে লোক-সমাজে 'চণ্ডীযাত্রা', 'শিবযাত্রা', 'মনসার ভাসান যাত্রা', 'রাম যাত্রা'ও, ছিল, তার উল্লেখ পাই। চৈতন্যদেব যে এরূপ কোনো কৃষ্ণযাত্রার অভিনয়ে যোগদান করেছিলেন, তারও উল্লেখ আছে। নেপাল দরবারে পাওয়া বাঙলা নাটকের মধ্যে আমরা হয়ত এই যাত্রার ধরনের সন্ধান পাই—সে সব রচনা গীতবহুল রচনা, কথা তাতে গৌণ। ব্রিটিশ মিউজিয়ম থেকে (অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের হাতে) নকল-করা এরূপ একটি নাটকের বিষয়বস্তু গোপীচন্দ্র-ময়নামতীর কাহিনী। এটিই বাঙলা যাত্রার প্রাপ্ত প্রাচীনতম আদর্শ, সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের রচনা। ততদিনে

বাঙলা দেশে কৃষ্ণলীলার বিষয়, আর কীর্তনের প্রভাব যাত্রায় বৃদ্ধি পেয়ে গিয়েছে। এই বৈষ্ণবভাবে প্রভাবিত যাত্রা এসে পৌঁছায় উনিশ শতকের দ্বারে। তার পূর্বেকার বা পরেকারও পুঁথিপত্র নেই, যাত্রাওয়ালাদের কিছু কিছু গান বেঁচে আছে। আর অধিকারীদের নাম ও খ্যাতি টিকে আছে। যেমন, বীরভূমের পরমানন্দ অধিকারী সম্ভবত অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে 'কালীয় দমন' যাত্রা গাইতেন ('বঙ্গদর্শনে' তার কথা পরে আলোচিত হয়), সুদাম অধিকারী, লোচন অধিকারীরও নাম জানা যায়। আরও নাম—গোবিন্দ অধিকারী (কৃষ্ণনগর), পীতাম্বর অধিকারী (কাটোয়া), কালাচাঁদ পাল (বিক্রমপুর, ঢাকা) ইত্যাদি। উনিশ শতকের পূর্বেই রুচিবিভ্রাট ঘটেছিল—গ্রাম্য ভাঁড়ামি বাড়ছিল একদিকে, অন্যদিকে বাড়ছিল ভারতচন্দ্রীয় রসিকতা। তখনকার প্রধান একজন যাত্রাওয়ালা গোপাল উড়ে (জন্ম ১৮১৯ ?)। তাঁর 'বিদ্যাসুন্দর' কলিকাতার 'বাবু' মহলে বিশেষ প্রিয় হয়। আর একজন যাত্রাওয়ালা কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য জন্ম ইং ১৮১০ ?)। শতাব্দীর মধ্যভাগে 'কৃষ্ণলীলা'র গানকে কৃষ্ণকমল শেষ বারের মত উঁচু সুরে বাঁধতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তা প্রধানত 'গান'– নাটক নয়। পূর্ববঙ্গে এখনও যাত্রাকে 'যাত্রা-গান'ই বলে। যাত্রাকে এ-যুগের গীতিনাট্য বা 'অপেরা'র দেশী-জননী বলাই বরং শ্রেয়। নাটক তার সতীন-পুত্র, বিদেশী রাজকুমার। আমাদের নাট্যকলা ও নাট্যসাহিত্যের উপর যতই 'যাত্রা' বা সংস্কৃত নাটকের ছাপ পড়ুক, ইউরোপে তার জন্ম। ইংরেজি থিয়েটার ও নাটক, বিশেষ করে শেক্সপীয়র নিয়েই আমাদের এ রাজ্য পত্তনের প্রয়াস। এই প্রস্তুতির পর্বে তার সূত্রপাত মাত্র হয়েছিল।

(গ) **বাঙলা রঙ্গমঞ্চের সূচনা** (১৭৯৫-১৮৫৭): (১) ধূমকেতুর মত লেবেদেভ্ এলেন গেলেন। তার পরে (২) থিয়েটারের কথা শুনি (ইং ১৮৩১-এ, ডিসেম্বর)—প্রসন্নকুমার ঠাকুরের থিয়েটার বা 'হিন্দু থিয়েটার'। বাঙালীর ইউরোপীয় ধরনের নাটক মঞ্চস্থ করবার তা প্রথম প্রয়াস। হিন্দু কলেজের প্রথম দিকের ছাত্র প্রসন্নকুমার 'গৌড়ীয় সমাজে'র প্রতিষ্ঠাতা আর জ্ঞানেন্দ্র-মোহন ঠাকুরের পিতা,—বাঙালীর থিয়েটারের তিনি প্রধান উদ্যোক্তা। কিন্তু সে 'হিন্দু থিয়েটারে' অভিনীত হয় ইংরেজি নাটক– ইংরেজি অনুবাদে 'উত্তর-রামচরিত', 'জুলিয়াস সীজারে'র অংশ বিশেষ, আর পরে (১৮৩২), একখানা

ইংরেজি প্রহসন। বাঙলা নাটক নেই, অথচ দেখছি নাটকের নেশা ও শেক্স-পীয়রের মোহ তখন বাঙালীকে পেয়ে বসেছে। আসলে লেবেদেভের (ইং ১৭৯৫) বাঙলা নাটকের অভিনয়ের পরে (৩) নবীনচন্দ্র বসুর বাড়িতে 'বিদ্যাসুন্দরে'র অভিনয়ই দ্বিতীয় বাঙলা অভিনয় (ইং ১৮৩৫, অক্টোবর)—যদিও বাঙলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে তা তৃতীয় প্রয়াস। এখন যেখানে শ্যাম-বাজার ট্রাম ডিপো সেখানেই নবীন বসুর বাড়িতে এই অভিনয় হয়েছিল। বিদ্যাসুন্দর অবশ্য তখনকার বাঙালীদের পরম উপাদেয় উপাখ্যান। বিদ্যা-সুন্দরে গীত ও স্ত্রী-ভূমিকায় অভিনেত্রীদের প্রশংসায় কেউ কেউ উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন, আর রুচিবাগীশেরা এ কাহিনীর অভিনয়ে বিরক্তও হয়েছিলেন।

শিক্ষিতদের রুচি বিদ্যাসুন্দরের পথে তখন মিটল না। থিয়েটার জন্মাল না বটে, কিন্তু (৪) হিন্দু কলেজের ছাত্ররা ইংরেজিতে শেক্সপীয়রের মার্চেণ্ট অব ভেনিসে'র খানিকটা অভিনয় বা আবৃত্তি করল লাট-সাহেবের বাড়িতে ইং ১৮৩৭-এ। এটি চতুর্থ প্রয়াস। বাঙালীরা অবশ্য নাটক লেখবার জন্যও চেষ্টা করছিল, ইং ১৮৫২তে এসে বাঙলা নাটক 'ভদ্রার্জুনে'র সন্ধানও আমরা পাব। কিন্তু বাঙলা নাটকের অভিনয় তখন হয় নি। ইংরেজি নাটকের অংশ বিশেষের অভিনয় বা আবৃত্তি নিয়েই শিক্ষিত বাঙালীর নাট্যমঞ্চ রচনার প্রয়াস এগুতে থাকে, নাট্যরস আস্বাদনের শখ মেটাতে হয়। (৫) ডেভিড হেয়ার অ্যাকাডেমির ছাত্রদের ইং ১৮৫৩) 'মার্চেণ্ট অব ভেনিসে'র নাট্যরূপ অভিনয়ের পরে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারির ছাত্ররা 'ওরিয়েণ্টাল থিয়েটার' স্থাপন করে। প্রথম তাতে 'ওথেলো' অভিনীত হয় ইং ১৮৫৪তে; পরে ১৮৫৫তে 'হেনরি দি ফোর্থ' ও একখানা প্রহসন (সিবিল সার্বিসের পার্কার সাহেবের রচনা)। তার (৬) দু-এক মাস পরে (ইং ১৮৫৪) ষষ্ঠ প্রয়াস—জোড়া-সাঁকোতে প্যারীমোহন বসুর বাড়িতে 'জুলিয়াস সীজারের' অভিনয়। এদিকে বাঙলা অভিনয় ও রঙ্গমঞ্চের জন্য আকাঙ্ক্ষা বেড়ে উঠছিল—বাঙলা নাটক রচনারও চেষ্টা বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

বাঙলা রঙ্গমঞ্চ ও নাটকের ইতিহাসে ১৮৫৭-৫৮ কালটাকেই নাটকের জন্মকাল বলা যায়। নাটক রচনার চেষ্টা অবশ্য ৫।৬ বৎসর ধরেই চলছিল; আর সেই কথাই সাহিত্যের ইতিহাসে মুখ্যকথা। কিন্তু রঙ্গমঞ্চ ছাড়া, অভিনয় ছাড়া, নাটক ফোটে না। তাই ১৮৫৭-৫৮-এর এই বাঙলা রঙ্গমঞ্চের হিসাবটি

সংক্ষেপে জেনে রাখা প্রয়োজন : (৭) ইং ১৮৫৭-এর জানুয়ারি মাসেই ছাতু-বাবুর বাড়িতে বাঙলায় 'শকুন্তলা' অভিনীত হল— এ অবশ্য সংস্কৃতের অনুবাদ— অনেকে তা দেখে উচ্ছ্বসিত হন ; কিন্তু কিশোরীচাঁদ মিত্র বলেছেন, অভিনয় ব্যর্থ। ঐ মঞ্চেই সে বৎসর (১৮৫৭) 'মহাশ্বেতা' অভিনীত হয়।

(৮) ইং ১৮৫৭ অব্দের মার্চ মাসে কলিকাতা নতুন বাজারে জয়রাম বসাকের বাড়িতে রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন কুল-সর্বস্ব' প্রথম অভিনীত হয়। নাটকটি অবশ্য ১৮৫৪-এর রচনা, আর এইটিই প্রথম মৌলিক বাঙলা নাটক। এ নাটকের দ্বিতীয় অভিনয় হয় ১৮৫৮-তে কলিকাতায় গদাধর শেঠের ভবনে ও তৃতীয় অভিনয় হয় চুঁচুড়ায় শ্রীনাথ পালের বাড়িতে (১৮৫৮)। অর্থাৎ সেই বিদ্যাসাগরী পর্বে ও সিপাহীযুদ্ধের সময়ে সমাজ-সংস্কারের হাতিয়ার হিসাবে বাঙলা নাটক জনপ্রিয় হচ্ছিল। 'কুলীনকুল-সর্বস্বে'র অভিনয়ে বাঙলার নাটক ভূমিষ্ঠ হল বলা হয়। এবং 'নাটুকে রামনারায়ণই' বাঙলার প্রথম নাট্যকার রূপে গণ্য হন। এ প্রসঙ্গেই স্মরণ রাখা যায়—সমাজ-সংস্কারের উদ্দেশ্যে এরূপ আরও নাটক লিখিত ও নানা স্থানে অভিনীত হয়েছিল।

(৯) কালীপ্রসন্ন সিংহের 'বিদ্যোৎসাহিনী থিয়েটার' একটা বড় আয়োজন। তা স্থাপিত হয় ১৮৫৬ সালে। ইং ১৮৫৭-এর ১১ই এপ্রিল সেখানে প্রথম অভিনীত হয় রামনারায়ণ তর্করত্নের 'বেণী সংহার'। অর্থাৎ সংস্কৃত নাটকের আদর্শ তখনো প্রবল। কালীপ্রসন্ন সিংহ নিজেও নাটক লেখায় নেমেছিলেন। তাঁর প্রথম লেখা 'বাবু নাটক' (ইং ১৮৫৪) অভিনীত হয় নি। তাঁর এই জোড়াসাঁকোর বাড়ির থিয়েটারে তাঁর অনূদিত 'বিক্রমোর্বশী' (ইং ১৮.৭-এর শেষ দিকে) অভিনীত হয়,—কালীপ্রসন্ন পুরুরবার ভূমিকা নিয়েছিলেন। তাঁর মৌলিক রচনা 'সাবিত্রী-সত্যবান' ইং ১৮৫৮, আর তাঁর অনূদিত 'মালতী মাধব' ইং ১৮৫৯ অব্দে অভিনীত হয়। নাট্যসাহিত্যেও তাই কালীপ্রসন্নের পরিচয় গ্রহণ করতে হবে।

(১০) এর পরে 'বেলগাছিয়া থিয়েটার'—পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ দু'ভাইয়ের আয়োজন। ১৮৫৮-এর ৩১শে জুলাই, রামনারায়ণ তর্করত্নের 'রত্নাবলী' দিয়ে সাড়ম্বরে এ নাট্যমঞ্চের উদ্বোধন হয়। কলিকাতার ইংরেজ বাঙালী সকল উচ্চবর্গের পুরুষ সেখানে নিমন্ত্রিত হন। এখানে এই উপলক্ষে মাইকেল মধুসূদনের ডাক পড়ল,—সাহেবদের জন্ত

'রত্নাবলী' নাটকটির ইংরেজি অনুবাদ লিখে দিতে হবে। এ অভিনয়ে রাজারা দশ হাজার টাকা খরচ করেছিলেন। সে দিনের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও গায়কদের তাঁরা একত্র করেন। কিন্তু তাঁরা জানতেন না যে, আরও বড় কাজ তাঁরা করলেন—মাইকেলকে বাঙলা নাটক রচনার জন্ম পরোক্ষে প্রণোদিত করে। 'রত্নাবলী'র অভিনয় সূত্রেই এ সম্ভাবনা দেখা দেয়।

এ অবশ্য ইং ১৮৫৮ অব্দের কথা। কলকাতায় থিয়েটার তখন আর এক-আধটা নয়। রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মাইকেলকে এক পত্রে লিখেছিলেন, 'ঠিকই বলেছ ব্যাঙের ছাতার মত থিয়েটর গজাচ্ছে, আর নাটকের নেশা লোককে পেয়েছে।' ইং ১৮৫৭-৫৮-এর পর থেকে 'ন্তাশনাল থিয়েটারে'র প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত (ইং ১৮৭২) সময়ের মধ্যে ধনী ও উৎসাহী থিয়েটার-পোষকের চেষ্টায় অনেক শৌখীন থিয়েটার দেশে গড়ে উঠেছিল; সে সব থিয়েটারের আশ্রয়ে এ পর্বের অব্যবহিত পরে বাঙলার নাট্যকলার লালিত-পালিত হবার মত সৌভাগ্য হয়।—এ সব থিয়েটারের মধ্যে সসম্মানে দু-চারটের কথা উল্লেখ করতে হয়। যেমন, (১১) ইং ১৮৫৯-এর ২৩শে এপ্রিল, সিঁদুরিয়াপটির হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজে (রামগোপাল মল্লিকের বাড়ি) মেট্রোপলিটান থিয়েটার কর্তৃক অভিনীত উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবা বিবাহ নাটক'। সমাজ-সংস্কারের ঝোঁক এ নাটকেও স্পষ্ট। নাটকখানি ইং ১৮৫৬-এর রচনা। এ নাটক ও এ অভিনয় স্মরণীয় একটি বিশেষ কারণে—যুবক কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁর বন্ধুরা এ অভিনয়ের উদ্যোক্তা; কেশবচন্দ্র তাতে সোৎসাহে একটি ভূমিকায় নেমেছিলেন। বাঙালী সমাজের উচ্চতম মনস্বীরা কী দৃষ্টিতে তখন নাটকাভিনয় দেখতেন, এর থেকে তা বোঝা যায়। ব্রাহ্মসমাজের নীতির গোঁড়ামি রঙ্গাগার ও অভিনয়ের বিরুদ্ধে জেগেছিল এর অনেক পরে।

(১২) তারপর 'পাথুরিয়াঘাটার থিয়েটার'—গোপীমোহন ঠাকুরের বাড়িতে ১৮৬০এ এখানে অভিনীত হল 'মালবিকাগ্নিমিত্র'। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর এই রঙ্গাগারের দুই গুণী প্রতিপালক হয়ে দাঁড়ান। ইং ১৮৭৩ পর্যন্ত এখানে অভিনয় চলে। লর্ড নর্থব্রুকের সম্মানে এখানে অভিনীত হয়েছিল—'রুক্মিণী হরণ' ও 'উভয় সঙ্কট'।

(১৩) শোভাবাজার 'প্রাইভেট থিয়েট্রিকাল পার্টি'র উদ্যোগে ইং ১৮ ৫ সালে প্রথম অভিনীত হয় মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'একেই কি বলে সভ্যতা?'

এবং ইং ১৮৬৭ অব্দে 'কৃষ্ণকুমারী নাটক'। অবশ্য ১৮৫৯-৬০ থেকেই মাইকেলের প্রতিভায় বাঙলা সাহিত্য উদ্ভাসিত।

(১৪) শেষে, জোড়াসাঁকোর থিয়েটার—ঠাকুরবাড়ির গুণীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, সারদাপ্রসাদ গাঙ্গুলী ছিলেন এ উদ্যোগের প্রাণ। এখানেও প্রথম অভিনীত হয় মাইকেলের কৃষ্ণকুমারী নাটক', পরে 'একেই কি বলে সভ্যতা?'। আরও পরে রামনারায়ণের 'নব নাটক'। ইং ১৮৬৫ থেকে ইং ১৮৬৭, দু বৎসর এ থিয়েটার চলে।

বউবাজারের 'বঙ্গ নাট্যালয়ে'র স্থান তার পরে—১৮৬৮ থেকে। তাছাড়া বাগবাজার বঙ্গ নাট্যালয়, গরাণহাটা, ভবানীপুর প্রভৃতি বহু স্থানে এরূপ নাট্যমণ্ডলী গড়ে উঠেছিল। বাগবাজারের অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি, গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি খ্যাতনামা অভিনেতারা 'ন্যাশনাল থিয়েটারের' পত্তন করেন। তাতে স্থায়ী রঙ্গমঞ্চের যুগ ১৮৭২এ এসে গেল।

॥ ২ ॥ নাট্য-সাহিত্যের সূচনা

সন তারিখের হিসাবে প্রস্তুতির পর্ব ছাড়িয়ে অনেক দূরে আমরা (১৮৭২) এসে গেলাম। কারণ, ভাবধারা ও কর্মধারা সর্বদাই সন তারিখের কৃত্রিম সীমানা পার হয়ে যায়। আসলে বাঙলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে সেই ইং ১৭৯৫ থেকেই ইং ১৮৭২ পর্যন্ত মোটামুটি একটাই যুগ। তবে সুবিধার জন্য 'কুলীন কুল-সর্বস্ব'র অভিনয়ে বলা যায় 'নাটকের সূত্রপাত'; 'বিদ্যোৎসাহিনী থিয়েটারে'র 'বেণী সংহার', 'সাবিত্রী-সত্যবান' প্রভৃতিকেও এ পর্বেরই অন্তর্গত করতে পারি। বেলগাছিয়া থিয়েটারের রত্নাবলী' (জুলাই ১৮৫৮) থেকে তাতে আর একটা নূতন বেগের সঞ্চার হয়। তাই সেই ১৮৫৮ থেকে ন্যাশনাল থিয়েটারে ১৮৭২-এর ৭ই ডিসেম্বরের 'নীলদর্পণ' অভিনয়ের কালকে বলা যায় 'বাঙলা নাটকের জন্মকাল'। বাঙলা থিয়েটারের ইতিহাসে এটা Age of Patrons, রঙ্গপোষকদের যুগ, বা শখের থিয়েটারের কাল। ইং ১৮৭২ থেকে 'পেশাদারী পর্ব', সাধারণ রঙ্গাগারের আরম্ভ হয়। কৃত্রিম ব্যবধান না সৃষ্টি করে আমরা সুবিধার জন্য ধরে নিতে পারি নাট্য-সাহিত্যের দিক থেকে তারাচরণ শিকদার, হরচন্দ্র ঘোষ, রামনারায়ণ তর্করত্ন, কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রভৃতির নাটক-সমূহ মূলত 'প্রস্তুতির পর্বে'র (ইং ১৮৫৮ পর্যন্ত) মধ্যে গণনীয়।

অবশ্য—রামনারায়ণের শেষ নাটক 'কংসবধ নাটক' রচিত হয় ইং ১৮৭৫ অব্দে। এবং (১৮৫৯-৬০) মাইকেল মধুসূদন, দীনবন্ধু মিত্রের নাট্য রচনা থেকে নাট্য-সাহিত্যের প্রকাশের পর্ব' আরম্ভ হয়। শখের থিয়েটার ও অনিয়মিত অভিনয়ই তখনো তার ভরসা ছিল—ন্যাশনাল থিয়েটারের পত্তন না হওয়া পর্যন্ত। সেরূপ শৌখীন নাটক ও নাটকের দল এখনো বাঙলা নাট্যকলার একটা প্রধান উৎস। আর একটা জিনিসও লক্ষণীয়—সামাজিক ব্যঙ্গ রচনার ধারার সঙ্গে সামাজিক চিত্র-রচনার ধারারও ক্রমে সূত্রপাত হয়। 'কুলীন কুল-সর্বস্বে'ই তার প্রারম্ভ। এরূপে নাট্য-সাহিত্যের উদ্বোধনে সামাজিক সংস্কার আন্দোলন প্রধান প্রেরণা জোগায়। কিন্তু পাশে-পাশেই চলেছিল সংস্কৃত নাটকের ধারারও অনুবর্তন। রামনারায়ণ কেন, মধুসূদনও পৌরাণিক-রোমান্টিক ধারার নাটক রচনা করেছেন। সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ, কখনো কখনো তার অবলম্বন, কখনো পুরাতন ঐতিহ্যে নূতন রচনা। বাস্তব চেতনা অস্পষ্ট থাকাতে সংস্কৃত নাটকের রোমান্টিক ঐতিহ্য ও পরে ইংরেজি রোমান্টিক নাটকের ঐতিহ্যই বাঙলা নাট্যকারদের আশ্রয় হয়। শেক্সপীয়রের দৃষ্টান্তও তার একটা কারণ। এই রোমান্টিক ধারাতেই পুরাণ ছেড়ে ঐতিহাসিক নাটক রচনাও চলে।

কীর্তিবিলাস (ইং ১৮৫২)—ইং ১৮৫২ অব্দে দুখানা বাঙলা নাটক রচনার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়—দুখানাই ইংরেজি নাট্যসাহিত্যের আদর্শে গঠিত। একখানা যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্তের 'কীর্তিবিলাস' আর একখানা তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন'। দুখানার একখানাও অভিনীত হয় নি, তাই সাহিত্য হিসাবেই তাদের পরিচয়; রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে তাদের স্থান নেই। এবং প্রথম দিককার রচনা না হলে বলতে হত সাহিত্য বিচারেও দুখানাই পরিত্যাজ্য। 'কীর্তি-বিলাসে'র প্রধান গুরুত্বই এই যে, কীর্তিবিলাস ট্রাজিডি বা বিয়োগান্ত নাটক। এ দেশের নাটকের ঐতিহ্যে ট্রাজিডি নেই। দীর্ঘ ভূমিকায় লেখক তাই ট্রাজিডির পক্ষে তার যুক্তি দিয়েছেন। এজন্য সে ভূমিকাটি উল্লেখযোগ্য। তাতে দেখতে পাই আরিস্টটল থেকে শেক্সপীয়র পর্যন্ত পাশ্চাত্ত্য মনস্বীদের মতামত তাঁর পরিচিত। বাঙলা নাট্যজগতের তৎকালীন আবহাওয়া বোঝার পক্ষে এ তথ্যটি উল্লেখযোগ্য। 'কীর্তিবিলাসে'র উপর 'হ্যামলেটে'র ছাপ আছে। কিন্তু তা স্মরণ করলে দুঃখই হয়। বরং 'কীর্তিবিলাস'কে এদেশীয়

সেই 'বিজয়বিসন্ত', কাহিনীর নাট্যরূপ বলাই শ্রেয়।—বিমাতার প্রণয় প্রত্যাখ্যান ও তার ফলে বিমাতার চক্রান্তে রাজপুত্রের জীবন-সংকট—এক্ষেত্রে, শেষ পর্যন্ত প্রাণ বিয়োগ,—এ গল্প এদেশে সুপ্রচলিত। 'কীর্তিবিলাস'ও তাই, তার বেশি কিছু নয়। যথার্থ নাটক এটি নয়, চরিত্র অঙ্কিত হয়নি, কর্ম-সংঘাত (অ্যাকশন) যে পাশ্চাত্ত্য নাটকের প্রাণ, লেখকের সে বোধ নেই। গদ্যসংলাপের বা পয়ারে রচিত পদ্যসংলাপের ভাষাও কৃত্রিম। লেখক আরিস্টটলের দোহাই দিয়েছেন আবার সংস্কৃত নাটকের অনুকরণে 'নান্দী', 'প্রস্তাবনা' প্রভৃতিও ছাড়েন নি। তবু সত্যই যিনি ট্রাজিডি লেখার সাহস করেছেন তাঁকে স্বীকার করতে হবে।

ভদ্রার্জুন (১৮৫২)—তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জুনে'ও ইংরেজি আদর্শের নাটকের উপরে সংস্কৃত বা বাঙলা প্রচলিত নাট্যাদর্শের ছাপ পড়েছে। তারাচরণ জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনষ্টিটিউশনের গণিত শিক্ষক ছিলেন। 'ভদ্রার্জুনে'র উল্লেখযোগ্য জিনিস—লেখকের লিখিত ছয় পৃষ্ঠার ভূমিকা। কাহিনী যে মহাভারতের সুভদ্রাহরণ, তা বলবার পরে লেখক জানিয়েছেন, "এই নাটক ক্রিয়াদি ও ঘটনাবস্থানের নির্ণয় বিষয়ে ইউরোপীয় নাটক-প্রায় হইয়াছে।" অর্থাৎ 'অ্যাক্ট', 'সিন' প্রভৃতিতে বিভক্ত; নান্দী, প্রস্তাবনা প্রভৃতি নেই। আসলে মহাভারতের আখ্যানটি কথোপকথনে প্রকাশের চেষ্টা করা হয়েছে, তার বেশি নাট্যগুণ 'ভদ্রার্জুনে' বিশেষ নেই. ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত, চরিত্রের বিকাশ বিবর্তন, নাটকোচিত প্লট নির্মাণ লেখকের পক্ষে সম্ভব হয় নি। তবে ভাষা মোটামুটি সেদিনের পক্ষে প্রাঞ্জল; এবং চরিত্র মাঝে মাঝে সজীব, বিশেষ করে মেয়েলি কথাবার্তার চিত্র স্বাভাবিক। প্রাত্যহিক জীবনের আদর্শের দিক থেকে এসব চরিত্র-চিত্র উপস্থিত করা হয়েছে। (ডঃ সুশীলকুমার দে'র 'নানা নিবন্ধ' দ্রষ্টব্য, পৃ ১৪১)। "মামুলী কাব্যগত গল্পের আদর্শে অভিভূত বাংলা-সাহিত্যে এই সজীবাঙ্কন-ক্ষমতা নূতন বটে!" (ঐ—পৃ ১৫০)—এজন্যই ভদ্রার্জুন অগ্রাহ্য করবার মত নয়।

হরচন্দ্র ঘোষের নাটক

নাট্যসাহিত্যের দিক থেকে হরচন্দ্র ঘোষের 'ভানুমতী-চিত্তবিলাস নাটক' তৃতীয় রচনা রূপে গণ্য। ইং ১৮৫৩ অব্দে তা প্রকাশিত হয়, কিন্তু ইং ১৮৫২-তেই তা রচিত হয়ে থাকবে। এর পরে চতুর্থ রচনা সম্ভবত কালীপ্রসন্ন সিংহের

'বাবু নাটক' এবং পঞ্চম (যা সচরাচর প্রথম বলে উল্লিখিত হয়) অবশ্য রামনারায়ণ তর্করত্নের প্রসিদ্ধ 'কুলীন কুল-সর্বস্ব' (ইং ১৮৫৪)। কিন্তু রচনা ও অভিনয়ে ওরূপ কালানুক্রমিক বর্ণনা ছেড়ে এ প্রসঙ্গেই হরচন্দ্র ঘোষের অন্যান্য নাটকের কথাও আমরা আলোচনা করতে পারি। বলা বাহুল্য; হরচন্দ্র ঘোষ (ইং ১৮১৭-ইং ১৮৮৪) ও রামনারায়ণ তর্করত্ন (ইং ১৮২২ ইং ১৮৮৫) দু'জনাই দীর্ঘদিন পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে নাটক রচনা করে গিয়েছেন। বাঙলা রঙ্গমঞ্চের প্রসারের ও বাঙলা নাট্যসাহিত্যের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের প্রচেষ্টাও অবিশ্রান্ত চলেছে। তাঁদের রচনায় সেই ক্রমবিকাশের চিহ্ন থাকতে পারে, কিন্তু সত্যকারের নাট্যবোধের পরিচয় আছে কিনা সন্দেহ। সাহিত্য বিচারে এঁরা মাইকেল-বঙ্কিমের জগতের মানুষ নন—তৎপুর্ববর্তী প্রস্তুতি পর্বে'র পথচারী। এ কথাটা নাট্যসাহিত্য ধরলে কালীপ্রসন্ন সিংহের সম্বন্ধেও প্রযোজ্য; কিন্তু সাহিত্যে তাঁর স্থান নাটক দিয়ে নয়, আর মনে-প্রাণে তিনি নব-জাগরণের ভাব-প্লাবনের প্রতিভূ। হরচন্দ্র ঘোষ, রামনারায়ণ ও কালীপ্রসন্নের নাট্য-সাহিত্যের কথা এখানেই আলোচনা করছি।

হরচন্দ্র ঘোষ ইং ১৮১৭ অব্দে হুগলীতে জন্মগ্রহণ করেন। হুগলী কলেজে শিক্ষালাভ করে তিনি মালদহে আবগারী বিভাগে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হন। অতএব তিনি পদস্থ চাকুরে বাঙালী, আর শিক্ষিত বাঙালী। ইংরেজি, সংস্কৃত, বাঙলা সব ভাষাতেই অধিকারী। ইং ১৮৮৪ অব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। ইং ১৮৭০ পর্যন্ত তিনি গ্রন্থ লিখেছিলেন। তবে নাটক দিয়েই তাঁর পরিচয়। সে হিসাব এরূপ—

(ক) ভানুমতী চিত্তবিলাস—ইং ১৮৫৩ অব্দ।

(খ) কৌরব বিয়োগ—ইং ১৮৫৮ অব্দ।

(গ) চারুমুখচিত্তহরা—ইং ১৮৬৪ অব্দ।

(ঘ) রজতগিরিনন্দিনী—ইং ১৮৭৬ অব্দ।

প্রথম থেকেই দেখা যাবে শেক্সপীয়র যেমন তাঁর মন জুড়ে বসে আছেন, তেমনি সংস্কৃত ও বাঙলা ঐতিহ্যও তিনি গ্রহণ করছেন। কিন্তু বিপদ এই যে, প্রচেষ্টা থাকলেও নাটক-রচনার মত কিছুমাত্র প্রতিভা তাঁর ছিল না। তথাপি 'ভানুমতী চিত্তবিলাসে'রই গুরুত্ব বেশি, কারণ তা প্রথম রচনা (ইং ১৮৫৩)। অভিনয়ের জন্য নয়, বরং ছাত্রদের পাঠ্যগ্রন্থ রূপেই তা রচিত হয়েছিল। অংচ

সে সৌভাগ্যও নাটকখানার হয় নি, সেজন্য লেখকের ক্ষোভ ছিল। নাটকখানা ঠিক অনুবাদ না হলেও শেক্‌স্‌পীয়রের 'মার্চেণ্ট অব ভেনিসে'র অনুসরণ। শেক্‌স্‌পীয়র বাঙালীকে প্রথম থেকেই মাতিয়েছেন। যদি না মাতাতে পারতেন তা হলে বোঝা যেত বাঙালীর রসবোধ নেই। যদি কোনো দিন আমরা আর শেক্‌স্‌পীয়রকে তেমন আপনার করে না গ্রহণ করতে পারি তা হলে তা আমাদেরই দুর্ভাগ্য। উনবিংশ শতকের প্রথম থেকেই ইংরেজি-পড়া বাঙালী শেক্‌স্‌পীয়রের নাটকের অভিনয় করতে চেষ্টা করতে থাকে, বাঙলা ভাষায় তা নানাভাবে অনুবাদ করতেও চেষ্টা করে,—আমরা তা পূর্বেই দেখেছি। কিন্তু একথাও আমরা বুঝি—আমাদের ভারতীয় ভাষায় শেক্‌স্‌পীয়রের স্বচ্ছন্দে আবির্ভাব দুঃসাধ্য তপস্যারই বিষয়। উনবিংশ শতকে তো আমাদের গদ্য বা পদ্য কোনো ভাষাই সেজন্য তৈরী হয়ে ওঠে নি। হরচন্দ্র ঘোষ তাই নিজের খুশিমত মার্চেণ্ট অব ভেনিস্ পরিবর্তন করেছেন, তাতে ছাঁট-কাট করেছেন, নতুন চরিত্র জুড়েছেন, 'কদা উজ্জয়িনী কদা গুজরাট দেশে' নাট্যাখ্যান স্থাপন করেছেন, শেক্‌স্‌পীয়রের পোর্সিয়াকে ভানুমতী ও বেসানিওকে চিত্তবিলাসে নামান্তরিত ও রূপান্তরিত করেছেন,—যা প্রয়োজন মনে করেছেন সবই জুগিয়েছেন। এর উপরে তাঁর অসুবিধা ছিল এই যে, যে-বাঙলা ভাষা তখন মাত্র গড়ে উঠেছে সে বাঙলা ভাষাও তাঁর আয়ত্ত নয়। নাটকোচিত স্বচ্ছন্দ বাঙলা তো তখনো জন্মায় নি, কৃত্রিম সাধুভাষার কৃত্রিমতাতেই তাঁর রুচি। পদ্য সম্বন্ধেও সেই কথা—পয়ারের চরণ মিলিয়েই তা সার্থক। রেভারেণ্ড লঙ্‌ বাঙলা বই দেখলেই উৎসাহিত হতেন, তাই এ বই পড়েও তিনি খুশি হয়েছেন।

এর পরে ইং ১৮৫৮-তে হরচন্দ্র ঘোষ প্রকাশ করলেন, 'কৌরব বিয়োগ'। কাশীরামদাসের মহাভারত থেকেই কাহিনী গৃহীত, তবে অনুবাদ নয়। এটিও পঞ্চাঙ্ক নাটক, 'অঙ্গে' (বা আধুনিক ভাষায় 'দৃশ্যে') বিভক্ত। ভাষায় তেমনি সংস্কৃতের ঘটা পয়ার ত্রিপদীতে বর্ণনাও আছে। তৃতীয় নাটক 'চারুমুখ-চিত্তহরা' ইং ১৮৬৪ অব্দে প্রকাশিত হয়—তার পূর্বেই মাইকেল অবতীর্ণ হয়েছেন। এটি শেক্‌স্‌পীয়রের 'রোমিও-জুলিয়েটে'র অনুবাদ অর্থাৎ শেক্‌স্‌পীয়রের সঙ্গে আর একবার কসরত। তবে লেখক ভূমিকাতে বলেছেন, এবার তিনি 'সুমার্জিত সাধু ভাষায় না লিখে কথিত কোমল সরল বাক্যে' নাটক

রচনা করছেন। সত্যই এবার ভাষা কতকটা সরল হয়েছে, কিন্তু সর্বত্র হয় নি। "ইহাকে শেকস্‌পীয়রের অনুবাদ বলিয়া ধরাই ধৃষ্টতা।" ইং ১৮৬১-এর পূর্বে বাঙলায় এমন নাটক প্রকাশিত হয়েছে, যাতে নাট্যগুণ দেখা যায়। কিন্তু হরচন্দ্র ঘোষ নাটক বুঝতেন না। জীবনের অভিজ্ঞতার চিত্র, চিত্রাঙ্কন, কাহিনীর সক্রিয় উদ্‌ঘাটন—এসব তাঁর অজ্ঞাত। "রজতগিরিনন্দিনী" ইং ১৮৭৪-এ প্রকাশিত, একটি ব্রহ্মদেশীয় সুন্দর উপাখ্যানকে নাটকাকারে মাটি করা মাত্র। কারণ, কাহিনীটি নাটকীয় নয়, আর লেখকের নাটক-রচনার ধারণা নেই।

কালীপ্রসন্ন সিংহের নাটক

বাঙলা সাহিত্যে কালীপ্রসন্ন সিংহের (ইং ১৮৪০-ইং ১৮[illegible]০) নাম সুপরিচিত —অবশ্য নাট্যকার হিসাবে সে পরিচয় নয়। তবু রঙ্গমঞ্চের পরিপোষক হিসাবে তিনি অগ্রগণ্য; আর সে হিসাবেই কালীপ্রসন্ন নাট্যকার। চারখানা নাটক তিনি লেখেন। ইং ১৮৫৪তে তিনি প্রথম লিখেছিলেন 'বাবু নাটক'। পরে তাঁর জোড়াসাঁকোর ভবনে বিখ্যাত 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'র অধীনস্থ রঙ্গমঞ্চের জন্য তিনি তিনখানি নাটক রচনা করেন 'বিক্রমোর্বশী'—ইং ১৮৫৭তে রচিত, 'সাবিত্রী-সত্যবান' ইং ১৮৫৮তে রচিত, আর 'মালতী মাধব' রচিত হয় ইং ১৮৫৯-এ। 'বিক্রমোর্বশী' ও 'মালতী মাধব' আসলে প্রসিদ্ধ সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ। অবশ্য 'মালতী মাধবে' কালীপ্রসন্ন অনেকটা স্বাধীনতা নিয়ে পরিবর্তন, পরিবর্জন করছেন। 'সাবিত্রী-সত্যবান'ই তাঁর নিজের রচনা। কিন্তু দেখছি কালীপ্রসন্ন সিংহের মত প্রগতিকামী পুরুষও নাটকের বেলায় নূতন নাটকের প্রাণবস্তুকে বিশেষ আয়ত্ত করতে পারেন নি; সংস্কৃতের আঁচল ধরেই তাঁর লিখিত বাঙলা নাটক চলছে। আরও আশ্চর্য কথা, তখনো 'হুতোমে'র স্রষ্টার লেখা বাঙলা ভাষা যথেষ্ট পরিমাণে সংস্কৃত-গন্ধী ও কৃত্রিম ছিল। অবশ্য ক্রমেই যে তিনি সে বাঁধন কাটিয়ে উঠেছেন, তা 'সাবিত্রী-সত্যবান' ও 'মালতী মাধব' থেকে দেখতে পারি। নাটকের সংলাপের ভাষার জন্য কথিত ভাষার দিকে নাট্যকারদের দৃষ্টি পড়েছে, তবু তখনো সে ভাষা কৃত্রিম। তা ছাড়া, যাত্রার ধরন থেকেই গিয়েছে। 'সাবিত্রী-সত্যবানে' অবশ্য নাট্যগুণ আছে, কিন্তু তা "খুব উঁচুদরের রচনা নয়"—সংস্কৃত নাটকের প্রভাবই তাতে বেশি।

ভাষায়ও হালকা চলতি (প্রায় 'হুতোমী') ভাষার সঙ্গে গুরুগম্ভীর সাধুভাষার বেমানান মিশ্রণ দেখা যায়। আর একটি কথা—'সাবিত্রী-সত্যবানে' ও 'মালতী মাধবে' কালীপ্রসন্ন প্রচুর গীত জুগিয়েছেন। যাত্রার ঐতিহ্যে অভ্যস্ত বাঙালী শ্রোতারা যে নাটকে গীত চাইতেন বেশি, এ থেকেও তা বোঝা যায়। বাঙলা নাটককে গীতাশ্রয়ী করতে কালীপ্রসন্নও সাহায্য করেছেন। রবীন্দ্রনাথও তা ছাড়েন নি।

রামনারায়ণ তর্করত্নের নাটক

সাধারণ ভাবে, রামনারায়ণ তর্করত্নকেই আধুনিক বাঙলা নাটকের প্রথম স্রষ্টা বলে ধরা হয়। রামনারায়ণ তর্করত্ন (ইং ১৮২২-১৮৮৫) তাঁর স্বকালেই 'নাটুকে রামনারায়ণ' বলে পরিচিত হয়েছিলেন। তাঁর রচিত মৌলিক নাটকই প্রথম অভিনীত হয়, সে নাটক 'কুলীন কুল-সর্বস্ব'। মধুসূদন-দীনবন্ধুর নাট্য-সাহিত্য এসে, আর ১৮৭২-এ 'ন্যাশনাল থিয়েটার' প্রতিষ্ঠিত হয়ে নাটকের হাওয়া পালটিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত রামনারায়ণ তর্করত্নই ছিলেন বাঙালী সমাজের সর্ব-সমাদৃত নাট্যকার। এ খ্যাতি বজায় রাখতে রামনারায়ণ প্রায় ২০ বৎসর ধরে (ইং ১৮৫৪-১৮৭৫) বহু নাটক রচনা করে গিয়েছেন। সে সব নাটকের নাম আজ প্রায় শোনা যায় না। কিন্তু তাঁর 'কুলীন কুল-সর্বস্ব'কে সচরাচর প্রথম বাঙলা নাটক বলে ধরা হয়, এ কথা স্মরণীয়। বাঙলা সাহিত্যে 'নাটুকে রামনারায়ণে'র স্থানও তাই সুনিশ্চিত। তবে যতকাল ধরেই যত নাটক লিখুন সুনিশ্চিত রূপেই তিনি মধুসূদন-দীনবন্ধুর পূর্বযুগের নাট্যকার, বাঙলা নাটকের পথই প্রস্তুত করেছেন।

ইং ১৮২২ অব্দে চব্বিশ পরগণায় হরিণাভি গ্রামে রামনারায়ণের জন্ম। রামনারায়ণ চতুষ্পাঠীতে নানা শাস্ত্র পড়ে সংস্কৃত কলেজে দশ বৎসর অধ্যয়ন করেন। পরে তখনকার হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজের সংস্কৃতের প্রধান শিক্ষকরূপে কর্মজীবন আরম্ভ করেন। বাঙলা রচনায় তখনই তিনি প্রবৃত্ত হন, তাঁর দক্ষতাও স্বীকৃত হয়। তখন 'তত্ত্ববোধিনীর যুগ', সংস্কৃত কলেজের ছাত্ররা বিদ্যাসাগরের প্রবল সংস্কারাগ্রহের দ্বারাও প্রভাবিত হয়ে থাকবেন। তাই সমাজ-সংস্কারের আন্দোলনে তখনকার সংস্কৃতজ্ঞ অধ্যাপকদের কারও কারও উৎসাহ হিন্দু কলেজের ইংরেজি-পটু কৃতবিদ্যদের অপেক্ষা কম ছিল না

রঙ্গপুরের জমিদার কালীচন্দ্র চৌধুরী কৌলীন্য-প্রথার বিরুদ্ধে সর্বোৎকৃষ্ট নাটক রচনার জন্ত ৫০৲ টাকা পুরস্কার বহু সংবাদপত্রে ঘোষণা করেছিলেন। রামনারায়ণ পূর্বে (ইং ১৮৫২) 'পতিব্রতোপাখ্যান' লিখে অন্ত একটি পুরস্কার পেয়েছিলেন। এই দ্বিতীয় পুরস্কারের বিজ্ঞাপনে আকৃষ্ট হয়ে তিনি 'কুলীন কুল-সর্বস্ব' রচনা করলেন। পুরস্কার তিনিই লাভ করেন। কালীচন্দ্র নিজব্যয়ে নাটকখানি মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন (ইং ১৮৫৪ অব্দে)। ইং ১৮৫৭ সালে যখন বাঙলা নাটকের অভিনয়ের উৎসাহ প্রবল হয় তখন 'কুলীন কুল-সর্বস্ব' প্রথম অভিনীত হল নূতন বাজারের জয়রাম (রামজয়?) বসাকের বাড়িতে। এ অভিনয়ের পর 'কুলীন কুল-সর্বস্বে'র আরও অভিনয় হতে লাগল। এর গুরুত্ব তাই বোঝা দরকার—দর্শকদের তা আকর্ষণ করে—বাঙালী সমাজের তখনকার সংস্কার আন্দোলনে তা নূতন শক্তি জোগায়; বাঙলা নাটকেও তা সমাজ-সংস্কারের ধারায় শক্তি সঞ্চার করে, তাও আমরা বুঝতে পারি। নাট্যমঞ্চের ভিত্তি-স্থাপনের শুভক্ষণে অভিনীত হয়ে তা মঞ্চ-পোষকদের উৎসাহ বাড়িয়ে দেয়;—আর রামনারায়ণকে বাঙলা নাট্য-সাহিত্যের কর্ণধার করে তোলে। কালীপ্রসন্ন সিংহ নিজের রঙ্গমঞ্চের জন্ত রামনারায়ণকে দিয়ে লেখালেন 'বেণী সংহার' (ইং ১৮৫৪)। ইং ১৮৫৮তে বেলগাছিয়ার সুপ্রসিদ্ধ রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের জন্ত 'রত্নাবলী'ও তিনি প্রণয়ন করেন;—সেই নাটকের ইংরেজি অনুবাদের জন্তই মধুসূদন নিযুক্ত হন, আর সেই সূত্রেই বাঙলায় ভাল নাটক রচনা করবেন বলে মধুসূদন প্রতিশ্রুতি দেন। মধুসূদনের প্রথম বাঙলা নাটক 'শর্মিষ্ঠা'ও অভিনয়ের পূর্বে রামনারায়ণ দেখে দিয়েছিলেন; কারণ, বাঙালীর চোখে রামনারায়ণ তখন নাট্য-সাহিত্যের গুরু। মধুসূদন-দীনবন্ধুর আবির্ভাবের পরেও রামনারায়ণের এ প্রতিষ্ঠা খর্ব হয় নি, প্রচেষ্টাও ব্যাহত হয় নি। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-বাড়িতে গুণীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে দিয়েই 'নবনাটক' লেখান (ইং ১৮৬৬); আর তা পুরস্কৃত করেন, অভিনীত করান (ইং ১৮৬৭)। পাথুরিয়াঘাটার রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের জন্ত যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর (পরে 'মহারাজা') তাঁকে দিয়ে 'বিদ্যাসুন্দর' (ইং ১৮৬৫), 'মালতী-মাধব' (ইং ১৮৬৭) প্রভৃতি সংকলিত করান; 'যেমন কর্ম তেমন ফল' (ইং ১৮৬৬?) প্রভৃতি প্রহসন রচনা করান, ও 'রুক্মিণী-হরণ' (ইং ১৮৭১) প্রভৃতি পৌরাণিক নাটক

লেখান। এসব নাটক সেই ইং ১৮৬০—ইং ১৮৭২এর মধ্যে অভিনীতও হয়েছিল। তারপরেও রামনারায়ণ লিখেছিলেন 'কংসবধ' (ইং ১৮৭৫)—মহারাজা যতীন্দ্রমোহনেরই অনুরোধে। তা ছাড়াও রামনারায়ণ 'স্বপ্নধন' (ইং ১৮৭৩-। অভিনীত হয়েছিল) 'ধর্মবিজয়' (হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান নিয়ে রচিত) প্রভৃতি পৌরাণিক নাটক লিখেছিলেন, এবং তাঁর রচিত 'সুনীতি-সন্তাপ-নাটক' (ইং ১৮৬৮) ও 'কেরলী-কুসুম' ('স্বপ্নধন'?) প্রভৃতি নাটকেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। দেখা যাচ্ছে 'নাটুকে রামনারায়ণ' বাঙলা নাটকের প্রধান প্রধান সব ধারাতেই কিছু-না-কিছু প্রস্তুতির কাজ করেছেন। যেমন, অনুবাদের ধারায়, যথাযথ অনুবাদ না হোক, সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ করেছেন; পৌরাণিক নাটকের ধারারও ('ভদ্রার্জুন' থেকে 'শর্মিষ্ঠা-পদ্মাবতী' ছাড়িয়ে আধুনিক কাল পর্যন্ত এ ধারা বিস্তৃত) প্রসারে সহায়তা করেছেন। আর, সামাজিক নাটকের তো তিনি প্রায় প্রথম প্রবর্তক,—উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবা-বিবাহ' প্রভৃতি নাটকের (ইং ১৮৫৬) 'কুলীন কুল-সর্বস্বই' হয় আদর্শ-স্থানীয়। প্রহসন রচনায়ও তিনি অগ্রসর হন আর সমাজ-সংস্কার ও এই প্রহসন-ধারাতেই 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' জন্মেছিল। কিন্তু মধুসূদনের প্রহসন যথার্থই নাটক; আর শুধু নাটক নয়, সাহিত্য; কারণ, তা স্রষ্টার সৃষ্টি। রামনারায়ণের কীর্তি অন্য জাতীয়; তিনি সংস্কৃতে কবি ছিলেন, সুবক্তা ছিলেন, পণ্ডিত ছিলেন, বিদ্যা দান করেছেন। কিন্তু তিনি সাহিত্য-স্রষ্টা নন—একথা মানতে হবে।

রামনারায়ণের সাধারণ পরিচয় 'কুলীন কুল-সর্বস্ব' দিয়ে, কিন্তু তা তাঁর প্রধান কৃতিত্ব নয়। কারণ, তা তাঁর প্রথম লেখা না হলেও প্রথম নাটক। দোষে গুণে মিলে তা এখনো সে হিসাবেই গ্রাহ্য। এ নাটকের দোষ তাঁর পরেকার অন্য নাটকেও রয়েছে; যা গুণ তা পরে কিছু বৃদ্ধি পেয়েছে।

'কুলীনকুল-সর্বস্বে'র উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু নাম থেকেই পরিষ্কার। কথাবস্তু লেখকের নিজের লিখিত 'বিজ্ঞাপনে' সংক্ষেপে এরূপে বর্ণিত হয়েছে:

"এই নাটক ষড়্‌ভাগে বিভক্ত। প্রথমে কুলপালক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যাগণের বিবাহানুষ্ঠান। দ্বিতীয়ে, ঘটকের কপট ব্যবহারসূচক রহস্যজনক নানা প্রস্তাব। তৃতীয়ে, কুলকামিনীগণের আচার ব্যবহার। চতুর্থে, দোষোদ্‌ঘোষণ। পঞ্চমে, নানা রহস্য ও বিরহি পঞ্চাননের বিয়োগ পরিবেদন। ষষ্ঠে, বিবাহ নির্বাহ ও গ্রন্থসমাপ্তি।"

এর থেকে অবশ্য কথাবস্তু বোঝা যায় না, কোন্ ভাগে কী বর্ণনা রামনারায়ণের উদ্দেশ্য, তা বোঝা যায়। নাটক অনুসরণ করলে আমরা দেখি মূল কাহিনীটা এই: কুলপালক বন্দ্যোপাধ্যায় (নামগুলি লক্ষণীয়) পরম কুলীন, চারটি অবিবাহিত কন্যা তাঁর ঘরে। তাদের বয়স ৩২, ২৬, ১৪, ৮ অর্থাৎ বালিকা থেকে প্রায় বিগতযৌবনা চার ভগ্নী। কুলপালকের দুশ্চিন্তার শেষ নেই। ঘটক অনৃতাচার্যের কথায় এক দিনের মধ্যে বিবাহ স্থির করে তিনি চার কন্যাকেই এক বৃদ্ধ, ষাট বৎসর বয়স্ক পাত্রের হাতে সমর্পণ করতে গেলেন। গৃহিণী বিবাহের আয়োজন করতে লাগলেন। বিবাহের কথা বলতে নানা বয়সের এই কন্যাদের মনে এলো নানা ভাবনা;—জ্যেষ্ঠা সবিষাদে বলছেন, 'বৃদ্ধ-বয়সে (৩২ বৎসর) আর এই বিড়ম্বনা কেন?' দ্বিতীয়ার (২৬ বৎসর) কথাটা বিশ্বাসই হয় না, 'আমরা কুলীন কন্যা, আমাদের আবার বিবাহ কি?' যখন প্রস্তাব সত্য মনে হল, তখন তিনি বলছেন, 'হউক না, দেখা যাউক।' তৃতীয়ার মনে কিন্তু কিশোরীর চাঞ্চল্য, এ বয়সে (১৪ বৎসর) কুলীনের মেয়ের এমন সৌভাগ্য! তবু 'না হওয়া পর্যন্ত আর আশা কি?' কনিষ্ঠা (৮ বৎসরের বালিকা), পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে বাইরে খেলছিল; শুনে বুঝতেই পারে না বিয়ে কি। আবার মা যখন তাকে বললেন তাদের চার বোনেরই বিবাহ হচ্ছে, সে তখন স্বাভাবিক ভাবেই বলে, 'ওমা! তবে তোর হবে না?' বর এসেছে শুনে এই তৃতীয়া আর কনিষ্ঠা বর দেখতে ছুটে বেরিয়ে গেল। সেই আশ্চর্য সুপাত্রকে তারা দেখল, অন্য দু বোনও তার কথা শুনল। কিন্তু ইচ্ছা থাকলেও পিতার নিকট আপত্তি জানাতে পারল না। কুলীনের মেয়ের ভাগ্য তো এরূপই। বিবাহসভায় দেখা গেল বর শুধু বৃদ্ধ নয়, কদাকার, কাণা, বধির। তবু বিবাহ হয়ে গেল। এই হল মূল কাহিনী; কিন্তু এ কাহিনীর সঙ্গে সংশ্রব নেই এমন বহু দৃশ্য ও বিষয় এনে রামনারায়ণ কৌলীন্যের কলঙ্ক আরও প্রচার করতে চেয়েছেন। সে সব দৃশ্যে নানা অবান্তর প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন, মতামত জাহির করেছেন, ভাঁড়ামি, বক্তৃতা আর পয়ারে-ত্রিপদীতে বর্ণনা কিছুই বাদ দেন নি। পারেন নি কেবল একটি কাজ—নাটক নির্মাণ করতে। না হলে ওই কুলপালকের কন্যাদানের কাহিনী উপলক্ষ্য করে—আশ্রয় করে নয়—নানা দৃশ্যে একটা কৌলীন্য-কলঙ্ক প্রচারী প্রবন্ধ তৈরী করেছেন, তাতে চার বোনের ভাগ্য ছাড়াও আছে স্বামীর সঙ্গে মিলনবঞ্চিতা ফুলকুমারীর

কথা, আর সত্যই তা মনে দাগ কাটে। মাত্র একটি দিনের ব্যর্থতার কথাই ফুলকুমারী তার ঠানদিদির অনুরোধে তাঁকে বলছেন। ফুলকুমারীর জীবনে এক রাত্রির মত মিলনের সম্ভাবনা এসেছিল পিতৃগৃহে স্বামীর অপ্রত্যাশিত আগমনে। কিন্তু পিতা স্বামীর 'খাই' সম্পূর্ণ পূরণ করতে পারলেন না।—অভাগিনী নিজের শেষ পয়সা দিয়েও এক রাত্রির মতও সেই স্বামীটিকে নিজের ঘরে পেলেন না। পয়সা দিয়ে স্বামী বাইরের ঘরে পিতার টোলের মেঝেয় দরমা পেতে ঘুমিয়ে রাত কাটাল। এ কাহিনী শুনতে শুনতে বিধবা প্রবীণা ঠানদিদি বলছেন,

"নাতনি! আর বলিস্‌নে, বলিস্‌নে, বুক ফেটে যায়। (সজল নয়নে) হারে বল্লাল, তুই কাল হয়ে এসেছিলি। কে তোকে কুলের ছিষ্টি কত্তো বলেছিল? কুল ত নয়—এ কুলের আঁটি বড় কঠিন। যার কুল আছে তার কি দয়া নেই? আহা! আহা! কি দুঃখু. তুই আর কাঁদিস্‌নে।" ইত্যাদি।

ঠানদিদি প্রবোধ দিতে চাইলেন—

তোত্তো আছে, আমার যে নাই, তা কি কর্ব্বো।

ফুল। (চক্ষুর জল মুছিয়া)

ঠানদিদি! এ থাকাচ্চেয়ে না থাকা ভাল। না থাকলে মনকে প্রবোধ দেওয়া যায়, এ থেকে নেই, একি সামান্য দুঃখু! ঐ যে কথায় বলে, দুষ্টু গরু থাকাচ্চেয়ে শূন্যি গো'ল ভাল।

সুমতির প্রসঙ্গও এরূপই। নাটকের পক্ষে এ সব প্রসঙ্গ নিষ্প্রয়োজন হলেও দর্শকের পক্ষে নিরর্থক নয়। কিন্তু তৃতীয় অঙ্কে দেবল ও রসিকার প্রসঙ্গ, চতুর্থ অঙ্কে মহিলা ও মাধুরীর কথোপকথন শুধু অবান্তর নয়, রুচিবিগর্হিত ও অগ্রাহ্য। তবে এ বিষয়ে ভুল নেই যে, রুচিহীন হোক, যাই হোক,—প্লট থাক, না থাক, যথার্থ চরিত্রচিত্র না থাক,—যাই হোক—এ সব রঙ্গ-ব্যঙ্গ, ভাঁড়ামির নানা দৃশ্য সে দিনের নানা শ্রেণীর দর্শককে আমোদ দিয়েছে; আর নাটকের মূলগত সদুদ্দেশ্য সজ্জনদেরও মনঃপূত হয়েছে। কারণ, 'কুলীন কুল-সর্বস্ব' সেদিনে 'সাক্‌সেস' হয়েছিল, সংস্কৃতগন্ধী বক্তৃতাগুলিও সে পক্ষে তখন বাধা হয় নি। এমন কি, রামনারায়ণের জীবিতকালে এ নাটকের পাঁচটি সংস্করণ হয়।

রামনারায়ণ সফল নাট্যকার বলেই তখনকার সকল নাট্য-পোষক তাঁকে দিয়ে অত নাটক লিখিয়েছেন। এ সব নাটকের মধ্যে 'বেণী সংহার' ও 'রত্না-বলী' অনুবাদ—দীনবন্ধু-মধুসূদনের আবির্ভাবের পূর্বে রচিত ও অভিনীত।

তারপরেও যে সব নাটক লিখিত হয় তার মধ্যে 'নব-নাটকে'র, 'রুক্মিণী হরণে'র ও 'যেমন কর্ম তেমন ফল' নামক প্রহসনের নাম করা চলে। কিন্তু 'রুক্মিণী হরণ' প্রভৃতি পৌরাণিক নাটক অপেক্ষা 'নব-নাটক'ই নাট্যকারের পরিচয় বেশী দেয়। 'নব-নাটক' (ইং ১৮৬৬) বহুবিবাহ-বিষয়ক নাটক, কুপ্রথা নিবারণের জন্ম সদুপদেশ সূত্রে নিবদ্ধ। নাটকের কাহিনীটি এই : গ্রাম্য জমিদার গবেশের (এখানেও নামগুলি লক্ষণীয়) স্ত্রী সাবিত্রী জীবিত আছে। তার ষোল বৎসরের পুত্রও আছে—সুবোধ। তবু মোসাহেব পারিষদের কথায় গবেশ দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করলেন। এই দ্বিতীয়া স্ত্রী চন্দ্রলেখার পীড়নে লাঞ্ছনায় গবেশ ভীত-সন্ত্রস্ত ; প্রথমা স্ত্রী সাবিত্রী গৃহ থেকে প্রায় বহিষ্কৃতা। পুত্র সুবোধও গৃহত্যাগ করে গেল। তাতেও চন্দ্রলেখার তৃপ্তি হল না। মিথ্যা করে সে সুবোধের মৃত্যু-সংবাদ সাবিত্রীকে দিলে, সাবিত্রী পুত্রশোকে আত্মহত্যা করলেন। তাই দুর্বলচিত্ত গবেশেরও মৃত্যু ছাড়া পথ রইল না—সুবোধ দেশে ফিরে এসব শুনে মূর্ছিত (ও প্রাণহীন ?) হল। এই মামুলী কাহিনী ছয় প্রস্তাবে, ও সংস্কৃত নাটকের মত বহু 'গর্ভাঙ্কে' বিবৃত হয়েছে। নট-নটী, সূত্রধার, প্রস্তাবনাও আছে। আর, কাহিনীটিকে উপলক্ষ্য করে নানা দৃশ্যের অবতারণায় এ নাটকও ভার-গ্রস্ত, তবে একেবারে দৃশ্য-সমষ্টি মাত্র নয়। এখানে রঙ্গরস আছে, তা ছাড়া কোনো কোনো দৃশ্য বিষয়গুণেও পাঠ্য। তৃতীয় অঙ্কে আলাপ-আলোচনায় ইংরেজি শব্দের প্রয়োগ, বাঙলা ভাষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে নাগরের সঙ্গে গ্রাম্যের যে আলোচনা আছে, সে আলোচনা এই এক শত বৎসর পরেও বাঙলা দেশে একটা জীবন্ত বিষয় (পরে উদ্ধৃতাংশ দ্রষ্টব্য)। এ আলোচনার মূল অবশ্য রামনারায়ণের ইং ১৮৫৩-এ হিন্দু মেট্রোপলিটান বিদ্যালয়ের ছাত্রদের নিকট প্রদত্ত (ও প্রকাশিত) প্রকাণ্ড বক্তৃতা (দ্রষ্টব্য—সাঃ সাঃ চরিতমালা, ১ম, রামনারায়ণ, পৃঃ ১৯ থেকে)। যুক্তি ও কার্যকারিতার দিক থেকে তা এখনো সমান খাটে। এ নাটকে আর একটি সরস গল্প তিনি জুড়েছেন—দীনবন্ধুর 'জামাই বারিকে'র চোরকে স্বামী বলে ধরে দুই স্ত্রীর সমানে প্রহারের গল্প এখানে পাওয়া যায়। কৌতুক ও রসময়ী গোয়ালিনীর রসিকতা আর রসময়ীর বশীকরণের তন্ত্র-মন্ত্র, চন্দ্রলেখার সখীদের সপত্নী-নির্যাতনের কথা প্রভৃতি রঙ্গ-তামাসার বিষয়—দর্শকদের নিকট আকর্ষণীয় ছিল। আর সুধীর ও

দন্তাচার্যদের কলহ কিংবা নাগর ও গ্রাম্যের আলোচনায় সদুপদেশও ছিল। এমন কি, প্রকৃত চরিত্র-চিত্র না থাকলেও পাড়াগেঁয়ে জমিদার, গ্রাম্য-ঘোঁটের দলপতি এ সবের 'বাঁধা-ধরা' বা টাইপ চরিত্র-চিত্রও আছে। অবশ্য দীনবন্ধু-মধুসূদনের আবির্ভাবের পরে এই নাটক লেখা।—তাঁদের দৃষ্টি বা শক্তি রাম-নারায়ণের নেই। তাঁর উন্নতি সামান্যই হয়েছে—ভাষায় ছাড়া। 'কুলীন কুল-সর্বস্বে' দেখা গিয়েছিল ঘরের কথাকে ঘরের ভাষায় তিনি লিখতে পারেন, পূর্বোদ্ধৃত ক্ষুদ্র অংশটুকুও তার প্রমাণ—১৮৫৪তে এরূপ ঘরোয়া বাঙলা গদ্য লেখা প্রশংসার কথা। এমন কি দেখছি slangএও তাঁর দখল আছে—আর নাটকে স্থলবিশেষে slang নিশ্চয়ই প্রয়োজনীয়। নাটক বলেই বোধ হয় রামনারায়ণও কথিত চালের বাঙলা গদ্য লিখেছেন, না হলে সাধু চালেই লিখতেন। ক্রমেই দেখছি নাটকে তাঁর পদ্যপ্রয়োগ কমেছে, কথার ভাষা আরও সরল হয়েছে। সেদিনে এই কথিত ও সাধুচালের মধ্যে মাত্রাবোধ দুর্লভ ছিল। মাইকেল-দীনবন্ধুতেও সেরূপ ত্রুটি পাওয়া যায়। রামনারায়ণের চলিত ভাষাও স্ত্রী-চরিত্রের মুখে মাঝে মাঝে আরও খেলো হয়ে উঠেছে। তবু একথা বলা ঠিক, রামনারায়ণ তর্করত্ন কথ্য বাঙলার ইতিহাসে একজন পথ-প্রদর্শক। নব নাটকের এই আলোচনাটুকুই দৃষ্টান্ত হিসাবে নেওয়া যাক; 'নাগর' বলছেন:

"আমরা তো বহুরূপী হরবোলার জাত, যা দেখি তাই শিখি। দেখ যখন হিন্দু রাজা ছিল, তখন সেই ব্যবহারই করেচি, সংস্কৃত বলতেম, কুশাসনে বসতেম, ধুতি চাদর পরতেম, পরে যবনদের অধিকারে কার্শিতে অনুরক্ত হয়েছিলেম, গদি, তাকিয়ে, মখমল্দ, আলবলা, গুড়গুড়ি এ সকল ব্যবহার, স্ত্রীলোকদের গৃহমধ্যে রুদ্ধ করে রাখা, তদবধিই তো আমাদের চল্যে আসচে, এখন আবার ইংরেজের অধিকার, এখন চ্যার, চুরোট, চামচে কেন না চলবে? ইংরেজী ভাষার প্রতি শ্রদ্ধাই বা কেন না হবে? আরো একটা কথা বলি বিবেচনা করো—ভাষান্তরের সঙ্গে যোগ না হলে ভাষা বৃদ্ধিও পায় না।"

নাট্যকলার দিক হতে দেখলে মনে হবে রামনারায়ণ তর্করত্নের দোষ অশেষ; আর সেদিনের নাট্যজগতের অবস্থা মনে রাখলে দেখব গুণও অনেক। দোষ হিসাবে দেখলে দেখব—রামনারায়ণ নাটক-গ্রন্থনের রহস্য বুঝতেন না। প্লট নয়, কতকগুলি দৃশ্যসমষ্টি জড়ো করে তিনি বক্তব্য বিবৃত করতেন; অনেক দৃশ্য আবার অবান্তর। কোন কোন দৃশ্য ছিল রঙ্গচিত্র—নানা শ্রেণীর

লোকের উপযোগী সাধারণ হাস্যামোদ, তামাসার উপকরণ—লেবেদেভ্ কেন, ভারতচন্দ্রের সময় থেকেই তাতে লোকের রুচি ছিল। দ্বিতীয়ত, চরিত্রসৃষ্টির কৌশলও তাঁর অজ্ঞাত ছিল। বিশেষ টাইপের হাস্যপ্রধান সাধারণ মানুষের চরিত্র তিনি কতকটা সৃষ্টি করতে পারতেন; সাধারণ জীবনের সঙ্গে সে পরিচয় তাঁর ছিল। কিন্তু প্রধান চরিত্র সৃষ্টিতে তিনি আর খেই পেতেন না। বিশেষ করে, ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে মানুষের চরিত্র নানারূপে বিকাশের যে নীতি আধুনিক সাহিত্যে প্রায় একটা স্বতঃস্বীকৃত কথা, তা রামনারায়ণের ধারণায় আসত না। আমাদের দেশের অনেক সাহিত্যস্রষ্টার নিকটও তা তখন পরিষ্কার ছিল না। অনৃতাচার্য, নাগর, গ্রাম্য, দম্ভাচার্য, সবেশ, পাপপুরুষ প্রভৃতি চরিত্রের নামকরণ থেকেই বোঝা যায় এরা মানুষ নয়, বিশেষ দোষগুণের প্রতীকস্বরূপ। এসব নাম থেকেও বুঝতে পারি—লেখকের মাথায় উদ্দেশ্যের ভার চেপে আছে। তাই, রামনারায়ণের নাটকে প্রচার শুধু লক্ষ্যই নয়, প্রচারই প্রধান কথা। বিশেষ করে তা সত্য যেখানে সামাজিক নাটক তিনি রচনা করেছেন। অবশ্য সেদিনের শিক্ষিত নাট্যামোদীরা তাতে সম্ভবত বিরক্ত হতেন না। তাঁরা চাইছিলেন সমাজ-সংস্কার—নাট্যরসের ঘাটতি তাই প্রচার দিয়ে মেটালে তাঁদের আপত্তি হত না। সাহিত্য যে প্রচার নয়—প্রকাশ,—এ সত্য অনেক যুগের লেখক ও পাঠক বা দর্শকই মনে রাখতে পারেন না। কিন্তু এ ত্রুটির সঙ্গে রামনারায়ণের নাটকে এসে জুটেছে দীর্ঘচ্ছন্দী বক্তৃতা, হা-হুতাশ, ভাবাকুলতা; সংস্কৃত নাটকের ও বাঙলা যাত্রার যত মামুলী ত্রুটি ও কৃত্রিমতা। সঙ্গে সঙ্গে ভাষায়ও এসেছে অস্বাভাবিকতা। পয়ার, ত্রিপদীর কৃতিত্বে তখনো লোক-রঞ্জন চলে, ঈশ্বরগুপ্তের পাঠকদলের কানে অনুপ্রাসের অট্টহাস্য এত হাস্যকর ঠেক্‌তো না। রামনারায়ণেরও ভাষায় এ ত্রুটি রয়েছে। বিশেষ করে তাঁর স্থূল ভাঁড়ামি রঙ্গব্যঙ্গের সঙ্গে জুটেছে খেলো অমার্জিত চল্‌তি ভাষা। অথচ নাট্য-গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখবার ঝোঁকে গুরু-গম্ভীর সংস্কৃত কথার উপল বর্ষণেও তাঁর ক্লান্তি নেই। ক্লান্তি পাঠকের। কিন্তু স্বীকার করতে হবে সে ক্লান্তির কারণ—রামনারায়ণ একা নন, তাঁর যুগ, সে যুগের অপরিপুষ্ট সাহিত্য-শক্তি, অপরিণত নাটক-বোধ, অগঠিত বাঙলা ভাষা, বিশেষ করে আবার নাটকের অনিশ্চিত ভাষা। না হলে রামনারায়ণও ইংরেজি নাটকের 'অতুলন রস মাধুরী'তে মুগ্ধ ছিলেন. তবু—শুধু

তিনি কেন,—মাইকেল-দীনবন্ধুও সংস্কৃত নাটকের প্রভাব সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে পারেন নি, নাট্যরসের সৃষ্টিতে নিজেদের আদর্শানুরূপ কীর্তি অর্জনে সমর্থ হন নি। বাঙালী স্বভাবের অন্তর্নিহিত ত্রুটিতে তাঁরাও এক্ষেত্রে খর্বিত। নাটকের ভাষায় ও ভাবেও তাঁরা সেই স্বাভাবিকতা ও স্বচ্ছতা আনয়ন করতে পারেন নি, যা না আনতে পারলে নাটক সার্থক হতে পারে না। মাইকেল-দীনবন্ধুর সঙ্গে রামনারায়ণ তুলনীয় নন, কিন্তু তবু তাঁর গুণের কথা এই—তিনি সেদিনের নানা শ্রেণীর লোককে তৃপ্ত করবার মত নানারূপ দৃশ্য জুগিয়েছিলেন।—শিক্ষিতদের তাতে সমাজ-সংস্কারের ঝোঁক কতকটা মিটেছে। বাবুযুগের 'রসিকেরা' ভারতচন্দ্রের অনুকৃত পদ্য, অলঙ্কারভরা গদ্য ও অসমীচীন দৃশ্য পেয়ে তৃপ্ত হয়েছেন। আর ইতর সাধারণ লেবেদেভের যুগেও চাইত ভাঁড়ামি 'তামাসা', তারাও স্থূল ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ প্রভৃতির দৃশ্যে আমোদ লাভ করেছে। রামনারায়ণের কৃপায় নাটকের অভিনয় তাই সর্বসাধারণের নিকট আকর্ষণীয় হয়। তৃতীয় গুণ এই যে, রামনারায়ণ সত্যই পূর্ববর্তীদের অপেক্ষা বেশি সরল ভাষায় লিখেছেন। অবশ্য তখনো সংলাপের বাঙলা গদ্য তৈরী হয়ে ওঠে নি, ভাষা অপরিপুষ্ট। প্রস্তুতির পর্বে' এতখানি ভাষার উপর অধিকার আর কোন নাট্যকার অর্জন করতে পারেন নি। অবশ্য 'টেকচাঁদ' তখনি প্রকাশিত হচ্ছেন, আর 'হুতোম'ও 'নব-নাটকে'র কালে দেখা দিচ্ছে, তাও স্মরণীয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পদ্যের পথ-পরিবর্তন

আধুনিক কালে গদ্যকে বাঙালী সাহিত্যের এক প্রধান বাহনরূপে প্রস্তুত করছিল। পদ্যও তখন অনেক দুর্বহ দায়িত্ব থেকে মুক্তি লাভ করে ক্রমশঃ কাব্যরসের আধার হয়ে উঠতে লাগল। আজকালকার ভাষায় আমরা বলতে পারি—'পদ্য' তখন থেকে হয়ে উঠতে লাগল 'কবিতা'—আখ্যান হলেও যা সুর করে পড়া হয় না, 'পদ' হলেও যা গীত হবে না; এবং আপনার রস-সম্পদে যা মানব-চেতনার এক বিশিষ্ট প্রকাশ।

পদ্যের এই পথ-পরিবর্তনেরও প্রধানতম কারণ অবশ্য আধুনিক জগতের সঙ্গে বাঙালীর পরিচয়, আধুনিক পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে তার দীক্ষা। ইংরেজি সাহিত্য ও ইংরেজি কবিতার রসাস্বাদন করবার পর উনবিংশ শতকের বাঙালীর পক্ষে আর পূর্ব যুগের ভাব-জগতে আবদ্ধ থাকা স্বাভাবিক নয়, এবং পূর্বদিনের পদ্যসাহিত্যেও নিবদ্ধ থাকা অসম্ভব। উনবিংশ শতক থেকে বাঙলা কবিতার প্রধান উৎসস্থল তাই ইংরেজি কবিতা ও ইংরেজি সাহিত্য, এবং ইংরেজি ভাষার মারফৎ পাওয়া অন্যান্য পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য,—অবশ্য সকল কবিতারই মূল উৎস আসলে জগৎ ও জীবন-বোধ। খ্রীঃ ১৮১৭-এর পরে আধুনিক জগতের সঙ্গে যতই বাঙালীর পরিচয় বৃদ্ধি পেল ততই বাঙলা পদ্যেরও পথ-পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে উঠল। বিশেষ করে তা অনিবার্য হয়ে উঠল এইজন্য যে ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের পরে বাঙলা দেশে পদ্য-রচনার ক্ষেত্রে আর কোনো স্রষ্টার আবির্ভাব হল না। বাঙলা পদ্য পূর্বেই একটা পথের শেষে এসে গিয়েছিল। নতুন পথ না পেতে তার পক্ষে অনুবৃত্তি ও পদচারণা করা ছাড়া আর কিছু করবার ছিল না। ইং ১৮০০-এর পূর্ব পর্যন্ত এভাবেই যায় (দ্রষ্টব্য : বাঃ সাঃ রূপরেখা, পূর্বখণ্ড, ১১শ পরিচ্ছেদ)। তারপরেই যে নতুন পথ খুলে গেল, এমন নয়। ইং ১৮১৭ অব্দে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠায় সে সম্ভাবনা দেখা দিল; কারণ ইংরেজ শাসকদের ছাড়িয়ে ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটল শিক্ষিতদের। কিন্তু হিন্দু কলেজের

প্রথম যুগের ছাত্ররা বাঙলা সাহিত্য সৃষ্টিতে উৎসাহ বোধ করেন নি। সেই নূতন জগতের ভাবৈশ্বর্য বাঙলা পদ্যের জীর্ণ ও সংকীর্ণ খাতে বইয়ে আনবেন, এমন শক্তিমান্ স্রষ্টাও তাঁদের মধ্যে তখন কেউ জন্মান নি। ভারতচন্দ্রের প্রায় সত্তর বৎসর পরে প্রথম কৃতী কবি ঈশ্বর গুপ্ত। মাঝখানকার সুদীর্ঘ কালটা বাঙলা পদ্য-সাহিত্যের নিষ্ফলা ভূমি। গুপ্তকবিও কবিতার পথে পদার্পণ করতে পারেন নি, পদ্যের পুরাতন পথ থেকেই নূতন দিকে যাত্রার পথ খুঁজছিলেন। তবে পদ্য রচনায় তিনি উৎসাহ সৃষ্টি করেন। তারপরে এলেন রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। ঈশ্বর গুপ্তের শিক্ষা ও ইংরেজি কাব্যের দীক্ষা দুইই তাঁর ঘটেছিল; কবিতার পথের সন্ধান তিনি লাভ করলেন। তিনি শিক্ষিত সাহিত্যানুরাগী, কিন্তু প্রতিভা তাঁর ছিল না। কাব্যের নূতন পথে যাত্রা তাঁর সাধ্য হয় নি। তাই বাঙলা কবিতার জন্মান্তর হল ইং ১৮৬০-এর সময়ে মাইকেলের আবির্ভাবের সঙ্গে। তার পূর্ব পর্যন্ত কালটা কবিতারও প্রস্তুতির কাল। প্রশ্ন থেকে যায়—ঈশ্বর গুপ্ত ও রঙ্গলাল সত্যিই কি মাই-কেলের প্রতিভার জন্য পথ-প্রস্তুতি করতে পেরেছিলেন? না, ভারতচন্দ্র থেকে মাইকেল, এই একশত বৎসরের অচল পথের মাঝখানে কাব্যে শুধু একটু উৎসাহ ও আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে সচলতা আনয়ন করেছিলেন?

॥ ১ ॥ পুরাতনের অনুবৃত্তি

অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধের জের টেনে উনিশ শতকের প্রথমার্ধেও বহুল পরিমাণে পুরাতনের অনুবর্তন চলে পদ্যে আখ্যানও তখন রচিত হচ্ছিল; আর পদ, গীত প্রভৃতিও রচিত হচ্ছিল। এসব অনেক লেখা আজ সম্পূর্ণ বিস্মৃত। যা বিস্মৃত নয় তাও সাহিত্য হিসাবে প্রায়ই মূল্যহীন। বিশেষ কোনো গুণে বা ঘটনা-যোগে টিকে আছে।

(ক) **জয়নারায়ণ ঘোষাল:** ভূ-কৈলাশের রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল (ইং ১৭৫১-ইং ১৮২১) একাধিক কারণে স্মরণীয় পুরুষ। নবাবী সরকারে ও কোম্পানির কর্মে, দু'দিকেই তিনি ভাগ্যার্জন করে দিল্লীর বাদশাহের থেকে খেতাব পান 'মহারাজা বাহাদুর'। রামমোহনের পূর্বে তাঁর মধ্যে চিন্তার একটু নতুনত্ব দেখা যায়। শেষ জীবনে তিনি কাশীবাসী হন, আর সেখানে তাঁর

কীর্তিতে বাঙালীর নাম উজ্জ্বল। ইং ১৮১৮ অব্দে তিনি বারাণসীতে এক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তা উত্তরাপথে এ যুগের ভারতবাসী প্রতিষ্ঠিত প্রথম স্কুল; কলিকাতার হিন্দু কলেজের মাত্র এক বৎসর পরে তা স্থাপিত। বাঙলা সাহিত্যে অবশ্য তাঁর নাম দু'খানি গ্রন্থের জন্য (দ্রঃ ১ম খণ্ড)। 'কাশীখণ্ডের' অনুবাদ (ইং ১৭৯২তে আরম্ভ হয়) অনেকের সাহায্যে শেষ হয়। জয়নারায়ণ এ বইয়ের শেষাংশে কাশীর বিবরণ লেখেন—('কাশী পরিক্রমা'; ব. সা. পরিষৎ প্রকাশিত করেছিলেন)। তাতে কবিত্ব কিছু নেই—কাশীর বিবরণ দানে কাশীর সাধু সম্প্রদায়, বিভিন্ন দেশবাসী, মন্দির ও বস্ত্র, অলঙ্কার শিল্প বিষয়ে তিনি স্বাভাবিক ঔৎসুক্যের পরিচয় রেখে গিয়েছেন। বাস্তবজীবনের সাধারণ জিনিসের প্রতি এই কৌতূহলপূর্ণ আগ্রহ, ঐহিকের প্রতি এই মমতা, এটি নবযুগের একটা লক্ষণ; কবি ঈশ্বর গুপ্তের মধ্যে কলা-কৌশলেও তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অবশ্য জয়নারায়ণ ঘোষালের নিজস্ব রূপ দেখা যায় তাঁর 'করুণা-নিধান বিলাসে' (দ্রঃ রূপরেখা, ১ম খণ্ড)। ইং ১৮১৩ থেকে ইং ১৮১৫ অব্দে তা রচিত। কাশীতে তিনি যে বিগ্রহ স্থাপন করেন তাঁরই মাহাত্ম্য-বর্ণনার জন্য তা রচিত। মূলত এখানি কৃষ্ণলীলারই গ্রন্থ। কিন্তু একদিকে কোজাগর, মনসাপূজা, চড়ক প্রভৃতি বাঙলার সব দেব-দেবীর পূজাই তার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অন্যদিকে লামা, নানক, কর্তাভজা, যীশুখ্রীষ্ট থেকে ভূগোল, জ্যোতিষ প্রভৃতির কথা কৃষ্ণের মুখে লেখক জুগিয়েছেন। নিশ্চয়ই সমকালীন অবস্থা ও ঘটনা সম্বন্ধে এ গ্রন্থেও বাঙালীর নবজাগ্রত ঔৎসুক্যের পরিচয় পাই—তার পূর্বেই 'দেবী সিংহের অত্যাচার', 'ছয় আনির গান' প্রভৃতিও রচিত হয়েছিল। কিন্তু 'করুণানিধান বিলাসে'র গুরুত্ব আরও বেশী। রামমোহন রায় নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনার সঙ্গে একটা উদার ধর্মদৃষ্টির পরিচয় দেন বলে আমরা জানি। জয়নারায়ণ ঘোষাল ছিলেন সাকারোপাসক—যেমন ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। কিন্তু জয়নারায়ণ যে উদার ধর্ম-সমন্বয়ের আভাস রেখে গিয়েছেন, তা থেকে মনে হয়, এ সমন্বয়বোধ বাঙালী শিক্ষিত ভদ্র মনের একটা সহজ ধর্ম।

(খ) অনুবাদের ধারা: পৌরাণিক অনুবাদের মধ্যে (দ্রঃ—বাঃ সাঃ রূপরেখা, ১ম খণ্ড, ১১শ অধ্যায়) রঘুনাথ গোস্বামীর উল্লেখ করা হয়। রামায়ণ ও ভাগবত অবলম্বন করে তিনি দু'খানি বড় আখ্যান কাব্য লেখেন, কিন্তু তা আসলে অনুবাদ নয়। গ্রন্থ লেখা হয়েছিল উনবিংশ শতকের দ্বিতীয় পাদে;

যখন ঈশ্বর গুপ্তের যুগ ও নতুন কাব্যাদর্শের ধারণা জন্মলাভ করছে। কবিত্ব না থাক আখ্যান বলার শক্তি এ লেখকের ছিল। কিন্তু সেকালের রীতিতে পদ্যের নানা কৃতিত্ব দেখাতেই তিনি ব্যস্ত।

অনুবাদ বা মূলাশ্রয়ী সংকলন ব্যাপারে বৈষ্ণব লেখকেরা অক্লান্ত ভাবে রচনা করে গিয়েছেন—এই বিংশ শতকের মধ্যভাগেও তাঁদের এ ধরনের চেষ্টা বন্ধ হয় নি। কিন্তু সাহিত্যে নতুন কিছু না জোগালে নবযুগে সে সব অনুবাদের উল্লেখ আর নিষ্প্রয়োজন। কারণ, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে সাহিত্য-বোধের তৃপ্তির জন্ত বাঙালী আর ওরূপ পদ্য অনুবাদ বা মর্ম-পরিবেশনের মুখ চেয়ে থাকে না। তবে ইংরেজি বা অন্য ভাষা থেকে এরূপ অনুবাদ হতে পারে যাতে সাহিত্যবোধ তৃপ্ত হয় না বটে, কিন্তু আধুনিক যুগের সাহিত্য সম্বন্ধে ধারণা জন্মে (যেমন, ল্যাম্বস্ টেল্স ফ্রম শেক্স্পীয়রে, কালিদাসের অনুবাদে); কিংবা জীবন-চেতনা পরিচ্ছন্ন হয় (যেমন, শেক্সপীয়রের নাটক, বা আরব্যরজনী, বা পল অ্যাণ্ড ভার্জিনিয়া প্রভৃতির অনুবাদ), জ্ঞানের (ইতিহাসের, বিজ্ঞানের, দর্শনের অনুবাদ) পরিসর বাড়ে। সাহিত্যের ইতিহাসে প্রস্তুতির পর্বে সে সব অনুবাদ কিছুটা উল্লেখযোগ্য—কিন্তু কাব্য-সাহিত্যে তার গুরুত্ব আরও কম। কারণ, গদ্যই অনুবাদের প্রকৃত বাহন; পদ্যের কাছে কাব্যরস আমরা চাই, শুধু অনুবাদ হলেই হয় না।

(গ) **রোমান্টিক আখ্যানের ধারা** : প্রণয়মূলক আখ্যান-কাব্যের ধারা ভারতচন্দ্রের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেও এক ধরনের রস পরিবেশন করতে চেয়েছে—অদ্ভুত ঘটনা, অপ্রত্যাশিত ব্যাপার (এমন কি, অলৌকিক ব্যাপার) ও দুঃসাহসিক এবং বীরত্বমূলক কর্ম—এসব নিয়ে তা রচিত হত। 'নভেল' বা 'উপন্তাসে'র জন্মের পূর্বে এরূপ আখ্যান-কাব্য বা আখ্যান-গদ্য বহু-পুরাতন গল্প-শোনার নেশার খোরাক জোগাত। উনবিংশ শতকেও সাময়িক প্রয়োজন তা মিটিয়েছে; কিন্তু সে সব বাঙলা আখ্যান-কাব্য আজ কমই বেঁচে আছে। যা খুঁজে নিতে হয় তার মধ্যে সৈয়দ হামজার 'হাতেম তাই'র (ইং ১৮০৪) কথা আমরা জানি। কালীপ্রসাদ কবিরাজের 'চন্দ্রকান্ত' (ইং ১৮২২) গদ্যে-পদ্যে লেখা, এক সময়ে তা বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল। কালীকৃষ্ণ দাসের 'কামিনী-কুমার' (ইং ১৮৩৬) তাকেও ছাড়িয়ে যায়। এসবের প্রধান আকর্ষণ ছিল

আদিরস, আর কাঠামোটা হল পুরনো সওদাগর-রাজকন্তাদের প্রণয়-অভিযান ও প্রণয়-বিলাস। তবে নায়ক-নায়িকারা এখন প্রায়ই বাঙালী-বাঙালিনী। যেমন, 'চন্দ্রকান্তে' বীরভূমের চন্দ্রকান্ত বাণিজ্যে গেলেন গুজরাতে, আর তাঁকে উদ্ধার করতে যাত্রা করলেন তাঁর পত্নী শান্তিপুরের রতন দাসের মেয়ে তিলোত্তমা; নানা অ্যাডভেঞ্চারের শেষে স্বামীকে নিয়ে তিনি দেশে ফিরলেন —এসব কথা শুনলেও এখন কৌতুক বোধ করতে হয়। 'কামিনীকুমারে'র কুমার বাণিজ্যে গেলেন কাশ্মীরে। কামিনী ছদ্মবেশে সেখানে গিয়ে মিলিত হলেন তাঁর সঙ্গে। পূর্ব শপথমত কুমারকে দিয়ে তামাক সাজিয়েও ছাড়লেন— বঙ্কিমচন্দ্রের 'দেবী চৌধুরাণী'র ব্রজেশ্বরের অবস্থা মনে পড়বে নিশ্চয়ই। এসব পড়েছেন তাঁরা যাঁরা জানেন বাঙালী বিদেশে বেরোয় একমাত্র ইংরেজের তল্পী-দার হলে, চাকরি পেলে; আর বাঙালী মেয়ে ঘরের মধ্যেই লজ্জায় ভয়ে জড়সড়। এসব কাহিনীর সবই অলীক, কোনো সাহিত্যিক মূল্যও এসবের নেই।

মদনমোহন তর্কালঙ্কারের 'বাসবদত্তা' (ইং ১৮৩৬) স্বতন্ত্র কারণে এখনো উল্লেখযোগ্য। কারণ, মদনমোহন (চট্টোপাধ্যায়, ইং ১৮১৭-১৮৫৮) নানা কারণে বাঙালী সমাজে স্মরণীয়। মদনমোহন সংস্কৃত কলেজে (ইং ১৮৪২ পর্যন্ত) বিদ্যাসাগরের সহপাঠী ও বন্ধু ছিলেন। পরে সে কলেজের তিনি অধ্যাপক হন (ইং ১৮৪৬-৫০), তারপর জজ পণ্ডিত ও শেষে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট (ইং ১৮৫০) নিযুক্ত হন। ইং ১৮৫৮ সালে অকালে কলেরায় তাঁর মৃত্যু হয়। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁর সহযোগিতা বরাবর থেকে যায়—দু'জনায় একযোগে 'সংস্কৃত যন্ত্র' স্থাপন করেন। স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারে 'সর্বশুভঙ্করী' পত্রিকায় প্রথম লেখনী ধরেন বিদ্যাসাগর, মদনমোহনের প্রবন্ধ 'স্ত্রীশিক্ষা' (সাঃ সাঃ চরিতমালা, ১ম, পৃ. ৭২ দ্রষ্টব্য) দ্বিতীয় সংখ্যায় (ইং ১৮৫০) প্রকাশিত হয়। অবশ্য স্ত্রীশিক্ষার বিষয়ে মদনমোহন আরও গৌরবের অধিকারী। বর্তমান বেথুন স্কুল স্থাপনায় (ইং ১৮৪৯) তিনি শুধু উৎসাহী ছিলেন না, তাঁর দু'কন্তা ভুবনমালা ও কুন্দমালা ঐ স্কুলের (হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়ের) প্রথম দুই ছাত্রী। আর যে 'শিশু শিক্ষা' ও 'পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল' বাঙালী বালক-বালিকার সুপরিচিত, তাও সেই উদ্দেশ্যেই রচিত। শিক্ষাবিস্তারে আত্মনিয়োগ করায় তাঁর কবিত্ব শক্তির যথার্থ পরিচয় তিনি আর দিতে পারেন নি। 'বাসবদত্তা'তে তাঁর

শিল্পচাতুর্যের প্রমাণ স্পষ্ট। সে বই তাঁর ১৯ বৎসর বয়সের ছাত্রজীবনের রচনা—সে বয়সে ভারতচন্দ্রের মত ছন্দোবৈচিত্র্য দেখানোর ঝোঁক থাকাই স্বাভাবিক। পূর্বেই কিছু কিছু উদ্ভট কবিতার তিনি অনুবাদ করেছিলেন। 'বাসবদত্তা অবশ্য সুবন্ধুর গদ্যকাব্য 'বাসবদত্তা'র অবিকল অনুবাদ নয়, বরং বাঙলা পদ্যে নূতন রচনা। সেই সুবন্ধুর কাব্যের 'তাৎপর্য ধার্য সংক্ষেপ করিয়া' মদনমোহন এ কাব্য লেখেন। ভারতচন্দ্রের মতই বাঙলা, সংস্কৃত নানা ছন্দের কৃতিত্ব তাতে দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু 'ললিত দীর্ঘ-ত্রিপদী'র কিংবা দীর্ঘমালঝাঁপ, দীর্ঘমাল 'ককারোটি স্তব' 'একাবলীছন্দে' শুকসারিকার ছন্দ, গজপতি ছন্দ, তোটক ছন্দ, দ্রুতগতি ছন্দ।

"হৃদি বিলসে পটুবসনা। কুচকলসে কৃতবসনা॥

কিংবা পজ্ ঝটিকায় 'সম্ভোগশৃঙ্গার বর্ণনা'

খেলই নাগর নাগরী কোলে।

চুম্বই বিম্বাধর দু'-কপোলে॥

প্রভৃতি, নিতান্তই ভারতচন্দ্রের জগতের পুনরাবৃত্তি। যে নতুন জগতে সমাজ-সংস্কারক মদনমোহন নিজে প্রবেশ করলেন কাব্যে তার প্রমাণ নেই। মদন-মোহনের দোষও নেই—১৮৩৫-এ নবীন বসুর বাড়িতে 'বিদ্যাসুন্দর' নাট্যাকারে অভিনীত হচ্ছিল, গোপাল উড়ের 'বিদ্যাসুন্দর' যাত্রা আরও তার কদর বাড়িয়ে দেয়—ভারতচন্দ্রের অনুকারীদের তখনো সমাদর প্রচুর।

গাথা কাব্যের নামেও 'চন্দ্রমুখীর পুঁথি' বা 'দামিনী চরিত্রের' মত প্রণয়-বিলাসের কবিদের আজ সাহিত্যে আর জীইয়ে রাখা নিষ্প্রয়োজন। অবশ্য ময়মনসিংহ গীতিকার গাথা-সাহিত্যিকরা চিরদিন আদরণীয়।

আখ্যান-কাব্যের ধারায় বরং সমসাময়িক কাহিনীর যে ধারা 'মহারাষ্ট্র-পুরাণ' বা 'দেবীসিংহের অত্যাচারে'র (দ্র, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৪০), থেকে শুরু হয়, উল্লেখযোগ্য। তার মধ্যে একখানা নোয়াখালির 'চৌধুরীর লড়াই' সেদিনও (ইং ১৯২০ পর্যন্ত) পালা হিসাবে গাওয়া হত, আর আসরও জমত (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তা প্রকাশিত হয়েছে)। পশ্চিমবঙ্গের 'দামোদরের বন্যা' ও 'সাঁওতাল হাঙ্গামার ছড়া'ও এই বিষয়গুণেই উল্লেখযোগ্য —বাস্তবজীবনের ঘটনা ও অভিজ্ঞতা এসব কাব্যের বিষয়।

॥ ২ ॥ গীতিকাব্যের শহুরে বিবর্তন

কিন্তু এসব হচ্ছে প্রধানত গান বা ছড়া—মুখে-মুখেই প্রধানত এসব বেঁচে রয়েছে, পুঁথিতে আবদ্ধ হয়েছে সামান্যই। বাঙলা কাব্যের সম্পদ একালে সঞ্চিত হয়েছে নানারূপ সঙ্গীতে—লৌকিক গাথা ও গীতিকাব্যে, যাত্রায়, কবিগানে, পাঁচালীতে, আখড়াই, হাফ আখড়াই, টপ্পা, প্রভৃতি নাগরিক সম্পদে, আর পদাবলী ও নানা আধ্যাত্মিক গীতে (দ্রষ্টব্য ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৩৭)। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত ভাগীরথী-অঞ্চলে এসব গীতিকাব্যের যে অসামান্য প্রভাব ছিল,—বিশেষ করে কলিকাতা কমলালয়ের বাবু-বেনিয়ানের আসরে তার যে শ্রীবৃদ্ধি হয়, তা আলোচনার বিষয়। কারণ, পদ্যের এই নিষ্ফলা শতাব্দীতে দু-এক অঞ্জলি কাব্যরস এসব গীতের মধ্যে পাওয়া যায়। বিশেষ করে নিধুবাবুর মত কবির প্রণয়-কবিতায় যা পাওয়া যায় তা শুধু সে শতাব্দীর সাময়িক ফ্যাশান নয়। তার সঙ্গে গীতিপ্রবণ বাঙালী চিত্তের একটা গভীরতর যোগ আছে। আধুনিক কালের বাঙালী গীতিকাব্যেও এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায়; আর তাই এ সত্য নতুন করে আজ স্বীকৃতও হচ্ছে।

বলা বাহুল্য, যাত্রা, পাঁচালী, কবিগান, তরজা, আখড়াই, হাফ্-আখড়াই প্রভৃতি এসব গান যথার্থ লোক-গীতি নয়, মুখে মুখে চললেও সমাজের সামগ্রিক (communal) সৃষ্টি নয়। এসব ব্যক্তিবিশেষের রচনা—বিশেষ করে আবার নবোদ্ভূত শহুরে সমাজের জন্য রচনা। অবশ্য সমাজের লোক-সাধারণের প্রচলিত ধ্যান-ধারণার উপরই এসব গানের ভিত্তি; আর লোক-রঞ্জনের জন্যই তা রচিত,—কবি-যশঃপ্রার্থীদের মার্জিত লেখা নয়, মুখে-মুখেই সাধারণত এসব গান রচিত ও গীত। এসব কারণে লোক-সাহিত্যের কিছু লক্ষণ তাতে আছে—যে জন্য রবীন্দ্রনাথ লোক-সাহিত্যের মধ্যে এসবকে গণ্য করেছেন।* যাত্রা পাঁচালীর ও কবিওয়ালার জগৎ ক্রমে দূরে সরে গেলেও জানা দরকার, আধুনিক বাঙলা কাব্য সেই যুগের গীতিকাব্যধারার সঙ্গে

* উনবিংশ শতকেই 'সংবাদ প্রভাকরে' গুপ্ত কবির আমল থেকে (ইং ১৮৫৪) এসব কবিতার সংগ্রহ ও সঞ্চয়ের প্রয়াস দেখা দেয়। উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ-গ্রন্থ হচ্ছে—গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'প্রাচীন কবি-সংগ্রহ' বাং ১২৮০ সাল, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গুপ্ত রত্নোদ্ধার', অনাথনাথ দেবের 'বঙ্গের কবিতা', 'সঙ্গীতসার-সংগ্রহ'। তা ছাড়া নানা সাময়িক পত্রে এসব বহু গীত সংগৃহীত

আপনার অজ্ঞাতসারে একটা সম্বন্ধ রেখেই পাশ্চাত্ত্য কাব্যাদর্শকে আপনার করে নিতে পেরেছে। তাই সেদিনের পুরাতনের অনুবৃত্তিকার পাঁচালী-আখ্যান-প্রণেতা কবিদের থেকে এসব গীতিকারদের গুরুত্ব বেশী—যদিও যাত্রা পাঁচালী, কবিগীতি, প্রভৃতিরও শিকড় রয়েছে অতীতেই,—তা সমাজের আমোদ ও উৎসবের গান। ইংরেজ আমলের শহুরে পরিবেশে তাদের যে বিকৃতি ও বিবর্তন ঘট্‌ছিল, তা'ই মাত্র লক্ষণীয়।

কবিওয়ালা

কবিওয়ালাদের প্রভাব-প্রতিপত্তির কাল ছিল ইং ১৭৬০ থেকে প্রায় ইং ১৮৩০ পর্যন্ত। (দ্রষ্টব্য: ডঃ সুশীল দে'র ইংরেজিতে বেঃ লিঃ ১৯শঃ, ১০ম পরিচ্ছেদ)। তার আগে ও পরেও কবিওয়ালারা ছিলেন, তা বলাই বাহুল্য।

গোজলা গুঁইর (ইং ১৭৬০ ?) নামই প্রথম পাওয়া যায়।¹ এঁরই রচনা—

এস এস চাঁদ বদনি।
এ রসে নিরসো কোরো না ধনি॥ ইত্যাদি

এঁর তিন শিষ্য হলেন লালু নন্দলাল, রঘুনাথ দাস, রামজী দাস। এঁদেরই শিষ্য রাসু-নৃসিংহ দু'ভাই, তাছাড়া হরু ঠাকুর, নিতাই বৈরাগী প্রভৃতি (দ্রঃ ডঃ সুশীলকুমার দে'র ঐ ১৯শঃ পৃ. ৩৪৪)। তার পূর্বে কবিগান 'লড়াই' হয়ে ওঠে নি—হরু ঠাকুর প্রভৃতির আমলে দল বেঁধে, গানের লড়াই চলে। যেমন, নিতাই বৈরাগী ও ভবানী বণিকে, হরু ঠাকুরে আর কেষ্টা মুচিতে, কিংবা পরে হারু ঠাকুর ও রাম বসুতে। লড়াই হয়ে উঠতেই তরজা-পাচালী-প্রিয় শহুরে আসরে কবিগানের সমাদর বাড়ে। এঁদের পরে ভোলা ময়রা, অ্যাণ্টনি ফিরিঙ্গি, ঠাকুর সিংহরা আসর জমায় (দ্রঃ দে, পৃঃ ৩৮৪)। তাঁদের শ্লীল-অশ্লীল উত্তর-প্রত্যুত্তর এখনো বাঙলা দেশে মুখে মুখে চলে। যা ছাপা হতে পারে এমন মুখরোচক জিনিসও অবশ্য আছে ('সম্বাদ প্রভাকর' ও পরবর্তী সংগ্রহে তা পাওয়া যায়)। যেমন, অ্যাণ্টনির কাছে ঠাকুর সিংহের প্রশ্ন—

এসে এদেশে এবেশে কেন তোমার কুর্তি নেই

ও প্রকাশিত হয়েছে। ডঃ সুশীলকুমার দে ইংরাজিতে লেখা উনবিংশ শতকের বাঙলা সাহিত্যে কবিওয়ালাদের সম্বন্ধে বিচক্ষণতার সঙ্গে আলোচনা করেছেন; তা দ্রষ্টব্য।

এ প্রশ্নে আণ্টনির উত্তর—

"এই বাঙ্গালায় বাঙ্গালীর বেশে আনন্দে আছি।
হয়ে ঠাকুরে সিংহের বাপের জামাই কুর্তি টুপি ছেড়েছি।

কিন্তু কবিগান আসলে গান, কবিতা নয়। আর গীত হিসাবে তার গঠন ও বিভাগ বিশিষ্ট। প্রধানতঃ বিভাগ এরূপ—চিতান, পরচিতান, ফুকা মেলতা, মহড়া (কখন কখন তারপর, 'সওয়ার'), খাদ, তারপরে আবার ফুকা, মেলতা এবং শেষে অন্তরা। এর ব্যতিক্রমও ঘটত। তবে পদ্য হিসাবে মিল আছে। কিন্তু কবিওয়ালারা পয়ার, ত্রিপদীর ধার ধারত না; গানের গতিতে নানা ছন্দ মেলাত। গীতের বিষয় পৌরাণিক বা ঐরূপ নানা জিনিস হত। রাধাকৃষ্ণ কথা দিয়ে আরম্ভ করে কবিরা দু'দলে উত্তর প্রত্যুত্তরে বিষয়োক্ত পক্ষ-প্রতিপক্ষের কথা বলত। প্রথম যুগে অবশ্য দু'দল কবি আলোচনা করে গান বাঁধত, 'সখী-সম্বাদ' দিয়ে গান আরম্ভ করত; আর একেবারে শেষভাগে তারা যা গাইত তার নাম ছিল 'খেউড়'। বৈষ্ণব গীত ও রাধাকৃষ্ণের কথা তখন বাঙালীকে এত পেয়ে বসেছে যে, যে বিষয়েই গীত হোক, কবি-ওয়ালাদের আরম্ভ ও গীতধারায় থাকত বৈষ্ণব গীতাবলীরই বাহ্য ঠাট। কিন্তু বৈকুণ্ঠের জন্য ত দূরের কথা, কবিগান ছিল সর্বাংশেই কলিকাতা-চন্দননগর-চুঁচুড়ার শহরে মানুষের জন্য—তাদের শহরে আমোদ ও উপভোগের জন্য। এই নূতন 'শহরে মানুষ' কি ধরনের?—তার একপ্রান্তে ছিল অলঙ্কার-অনুপ্রাস-রসিক ভদ্রলোকরা, আর অন্য প্রান্তে ফূর্তিবাজ বাবুরা ও খিস্তি-খেউড় প্রিয় ইতরজন। কবিগানে কৃষ্ণলীলা তাই ক্রমে এক ধরনের নাগরলীলাই হয়ে উঠল। তখন রাধা বা কৃষ্ণ কারও প্রেম-মহিমার চিহ্ন খোঁজা তাতে নিরর্থক। এদিকে তখন তাতে এল কৃত্রিমতা, আর সেই উত্তর প্রত্যুত্তরের যুদ্ধ যা থেকে তা' গালিগালাজ। তখন কবিগানের নাম হল 'কবির লড়াই'। আর ইতরতার সেই বাড়াবাড়িতেই আগেকার 'খেউড়' কথাটি পেল নতুন অর্থ, যে অর্থ এখনো প্রচলিত। উপস্থিত মত আসরে দাঁড়িয়ে গানে উত্তর-প্রত্যুত্তর দেওয়াই তখন নিয়ম হয়, সেসব কবিদেরই বলত 'দাঁড়া কবি'। তাঁদের গানে তাই সযত্ন রচনার অবকাশ নেই। তাঁদের কৃতিত্ব হ'ল কথায়, গানে, শ্লীল-অশ্লীল যা হোক উপস্থিত মত উত্তর-প্রত্যুত্তর দানে। অবশ্য সেসব গীত সেদিনেও ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করা চলত না—ঈশ্বর গুপ্ত তাই (ইং ১৮৫৪)

ভেবে পান নি কি করে সেদিনের "নবকৃষ্ণ প্রমুখ মহামহিমান্বিত উচ্চলোকেরা জ্ঞাতি কুটুম্ব স্বজন সজ্জন পরিজনে পরিবেষ্টিত হয়ে গদগদ চিত্তে এসব 'শকার বকার' শ্রবণ করতেন।" ঈশ্বর গুপ্ত কবিওয়ালাদের গুণগ্রাহী ছিলেন, তাঁরই যদি একথা মনে হয় তা হলে তখনকার 'ইয়ং বেঙ্গলের' মনে কি হতে পারত ?

কিন্তু কয়েকটা কথা কবিওয়ালাদের সপক্ষে বলা চলে, আর তা সাহিত্যের দিক থেকে স্মরণীয়। শব্দের মার-প্যাঁচ আর ভাবের তুচ্ছতা সত্ত্বেও কবিওয়ালারা প্রায়ই চলতি কথায় স্বচ্ছন্দ চলতি ভাব, চলতি বিষয়, সাধারণের কথা, তাদের অগভীর ও সহজ ধর্মশিক্ষা—এসব সাধারণের মত করেই সহজভাবে উপস্থিত করেছেন। আধুনিক কালে পৌঁছে কবিতায় আমরা কিন্তু তা আর করতে পারি না। বিশিষ্ট হতে গিয়ে কাব্য অনেকটা এখন শিষ্ট-রুচিসম্মত হয়ে পড়েছে, সাধারণের সঙ্গে আত্মীয়তা খুইয়েছে। আধুনিক কালে (বিংশ শতাব্দীর মধ্যকালে) শিষ্টশ্রেণী ছাড়িয়ে সে হতে চাইছে আত্মীয়গোষ্ঠীর 'সন্ধ্যাভাষা'।

পদ্যের সেই নিষ্ফলাভূমিতে তবু এসব কবিওয়ালারাই দ্রুমতুল্য, তা একেবারে মিথ্যা নয়। নানা গীত-সংগ্রহ শুদ্ধ তাঁদের নাম এখনো স্মরণ করা সম্ভব। যেমন, রাসু (মৃত্যু ১৮০৭) ও নৃসিংহ (মৃত্যু ১৮০৯ ?) চন্দননগরে দুই 'কায়স্থ ভাই'র 'সখী সম্বাদ' ও 'বিরহের' ৬টি গীত, তাতে একটি সহজ সংযম আছে।

হরুঠাকুর (১৭৩৮-১৮১২) বা হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাঙ্গী, কলিকাতা সিমলের ব্রাহ্মণ। রাজা নবকৃষ্ণের বাড়িতে গেয়ে তিনি নাম করেন। নানা বিষয়ে তাঁর ক্ষমতা ছিল—তাঁর গীতও বেশী পাওয়া যায়। যথা, 'কদম্ব তলে কে গো বাঁশী বাজায়', 'আগে যদি প্রাণ সখি জানিতাম', 'একি অকস্মাৎ ব্রজে বজ্রাঘাত কে আনিল রথ গোকুলে। অক্রুর সহিতে তুমি কেন রথে বুঝি মথুরাতে চলিলে।'

কিম্বা—

> আমারে সখি ধর ধর।
> ব্যথার ব্যথিত কে আছে আমার।

এসব সুপরিচিত গানে, বিশেষ করে 'সখী-সম্বাদে',—তাঁর নাম হয়েছে।

নিতাই বৈরাগীও (ইং ১৭৫৪-১৮২১) চন্দননগরের লোক। কথার অত কারুকার্য না জানলেও সহজ কথায় ভাব বেশ প্রকাশ করেছেন। কথার চাতুর্যে ও অলঙ্কারে রাম বসুই প্রসিদ্ধ। তাঁর গীতও পাওয়া যায় অনেক। রাম বসু (ইং ১৭৮৬-ইং ১৮২৮) হাওড়া-সালকের লোক. নিতাই বৈরাগীর কাছে তাঁর শিক্ষা। জ্ঞানেশ্বরী কবিওয়ালীর প্রতি তিনি আসক্ত ছিলেন, এরূপ শোনা যায়। কবিওয়ালাদের মধ্যে তাঁর খ্যাতিই সমধিক, ভালো মন্দ শুদ্ধ তাঁকেই বলা যায় কবিগানের যুগের খাঁটি প্রতিনিধি। যেগুলি ভালো গান সেগুলি সত্যই ভালো—(দ্রঃ বঃ সাঃ পরিচয়, ১৫৫৯)

যৌবন জনমের মত যায়।
আশা পথ নাহি চায়॥
কি দিয়ে গো প্রাণ-সখি রাখিব ইহার॥
বালিকা ছিলাম, ভালো ছিলাম
সই ছিল না সুখ অভিলাষ।
পতি চিনতাম না ও রস জানতাম না,
হৃদ্‌পদ্ম ছিল অপ্রকাশ।
এখন সই শতদল মুদিত কমল কাল পেয়ে ফুটিল॥

কিম্বা,—

দাঁড়াও দাঁড়াও প্রাণনাথ বদন ঢেকে যেও না।
তোমারে ভালবাসি তাই চোখের দেখা দেখতে চাই
কিছুকাল থাক থাক বলে ধরে রাখব না। ইত্যাদি—

কিন্তু এরূপ সারল্য বা সংযম দীর্ঘ গীতে বেশিক্ষণ থাকে না।

তবে 'আগমনী' গানে প্রণয়-বিলাসের স্থান নেই, আর সেই গীত দীর্ঘ হলেও রাম বসুর হাতে ভাব-সম্পদ লাভ করেছে।

গত নিশিযোগে আমি দেখেছি হে সুস্বপন।
এলো সেই আমার তারাধন।
দাঁড়ায়ে দুয়ারে বলে মা কই, মা কই, মা কই আমার
দেখা দাও দুখিনীরে।
অমনি দু'বাহু পসারি উমা কোলে করি
আনন্দেতে আমি আমি নয়।

এই স্বপ্ন-ছলনা বিষয়টি অবশ্য মৌলিক নয়। কিন্তু ভাবে, ভাষায়, সুরে সব মিলিয়ে এটি বাঙালী মনের গভীরতম দেশ থেকে জাত।

ইং ১৮৩০-এর পরেও অবশ্য কবিওয়ালারা লুপ্ত হয় নি। আণ্টুনির একটি গীত অন্তত স্মরণীয়:

> খৃষ্ট আর কৃষ্ণে কিছু প্রভেদ নাইরে ভাই।
> শুধু নামের ফেরে মানুষ ফেরে এও কোথা শুনি নাই।
> আমার খোদা সে হিন্দুর হরি সে
> এই দেখ শ্যাম দাঁড়িয়ে রয়েছে—

এ অবশ্য বাঙলার মাটির কথা, ভারতবর্ষেরও চিরদিনের কথা—আউল-বাউলের ধারার গান। কিন্তু 'ইয়ং বেঙ্গলে'র পরে দেশের রুচি পরিবর্তিত হল, আধুনিক যুগের ভিত্তিও স্থাপিত হয়ে গেল। কবিওয়ালারাও ক্রমেই পিছনে হটতে বাধ্য হল। নীলু, রামপ্রসাদ ঠাকুর, আণ্টুনি, ভোলাময়রা, ঠাকুরদাস সিংহ—এ সব বহু কবিওয়ালা তখনো শহরে সমাজে আসর জমাত। (দ্রঃ ডঃ দে, ১৯শ শতক, পৃঃ ৩৮৩ থেকে)

যাত্রাওয়ালা

যাত্রার কথা নাটকের সূচনা খুঁজতে গিয়ে আলোচিত হয়েছে। গীতপ্রধান এসব যাত্রার গীতিকাব্য কিছু কিছু মাত্র সংগৃহীত আছে। অধিকাংশই নেই।

কালীয়-দমন-যাত্রার ধারার যে যাত্রাওয়ালার নাম প্রথম পাওয়া যায় তিনি বীরভূমের পরমানন্দ অধিকারী—কাল গণনায় বোধহয় পূর্বযুগের (১৮শ শতকের) লোক। তার পরে যাঁদের নাম পাওয়া যায় তার মধ্যে গোবিন্দ অধিকারীই প্রধান। (বঃ সাঃ, পরিচয় ২য় খণ্ডে তার গীত আছে, দ্রষ্টব্য)। 'রাম-লীলা, চণ্ডীলীলা'র কথা ছাড়িয়ে ক্রমে যাত্রায় নল-দময়ন্তী ও বিদ্যাসুন্দর প্রভৃতি মাধুর্যলীলার কথাও দেখা দিল। তাতে প্রাধান্য পেল যুগের রুচি অনুযায়ী কালুয়া-ভুলুয়ার মত ভাঁড়ামির বিষয় (লেবেদেভ্-ও তা উল্লেখ করেছেন), আর বিদ্যাসুন্দরের মত প্রণয়-বিলাসের বিষয়। গোপাল উড়ের (জন্ম, ১৮১৯?) বিদ্যাসুন্দর কলকাতার বাবুদের বিশেষ করে যে মাতিয়েছিল, তা নাট্যপ্রসঙ্গেই বুঝেছি। প্রায় এ সময়েরই মানুষ কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য গোস্বামী (জন্ম ইং ১৮১০)। বাঙলা দেশের মানুষের সর্বত্র যে রুচি-বিকার ঘটে নি, কৃষ্ণকমলের কৃষ্ণলীলা ও চৈতন্যলীলার গীত তার প্রমাণ (দ্রষ্টব্য, বঃ সাঃ

পরিচয় ২য়) গীতকার হিসাবেই এঁর পরিচয়, কাব্যরস যা আছে তা সুর ও তালের সাহায্যেই ফোটে, স্মরণে রাখবার মত কিছু নয়।

পাঁচালীকার—দাশরথি রায় (ইং ১৮১০—ইং ১৮৫৭)

'শ্রীরাম পাঁচালী', 'ভারত পাঁচালী' প্রভৃতি পুরাতন পাঁচালী এ শতকে আর নেই। পাঁচালীও কালের গুণে হয়ে উঠেছে হালকা, হাস্যরসপ্রধান নানা বিষয়ের পালা (দ্রষ্টব্য—ডঃ সুশীল দে, ১৯শ শতক, পৃঃ ৪৩৮ থেকে)। দাশু রায় বা দাশরথি রায় পাঁচালীকার হিসাবে সর্বাধিক খ্যাতিলাভ করেছেন। বর্ধমানের কাটোয়ার বাদমুড়া গ্রামে তাঁর জন্ম বাং ১২১৮ সালে, মৃত্যু ইং ১৮৫৭-তে;—তিনি ঈশ্বর গুপ্তের সমকালীন। প্রথমে তিনি নীলকুঠিতে কেরানী হয়েছিলেন। শোনা যায় এক কবিওয়ালীর সঙ্গে তাঁর প্রণয় হয়; তার দলের তিনি গান বেঁধে দিতেন। এজন্য প্রতিপক্ষের গানে বিশেষ গঞ্জনা-বিদ্রূপ লাভ করে তিনি কবির দল পরিত্যাগ করেন। গৃহে ফিরে নিজের 'পাঁচালীর দল' গঠন করেন. তাতেই তাঁর খ্যাতিলাভ হল। সমসাময়িক বিষয়েও তাঁর পালা আছে। বিধবাবিবাহ বিষয়ে বিদ্যাসাগরকে তিনি ব্যাজস্তুতি করেছেন। তাঁর পালাও গীতসংখ্যায় ভারী। বঙ্কিমচন্দ্র সত্যই বলেছেন. "দাশরথি রায়ের কবিত্ব ছিল না এমত নহে। কিন্তু অনুপ্রাসযমকের দৌরাত্ম্যে তাহা একেবারে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে. পাঁচালীওয়ালা ছাড়িয়া তিনি কবির শ্রেণীতে উঠিতে পারেন নাই।"

অধ্যাত্ম গীতিকার

পদাবলীর ধারা অনুসরণ করে যে সব গীত রচিত হচ্ছিল, তার মধ্যে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পিতা জন্মেজয় মিত্রের ('সঙ্কর্ষণ') পদাবলীর নাম করা হয়। কিন্তু বৃন্দাবন-লীলা একদিকে যেমন কবিওয়ালা যাত্রাওয়ালা প্রভৃতি সকলের সাধারণ সম্পত্তি হয়ে ওঠে, অন্যদিকে তার মূল প্রাণসম্পদ তখন নিঃশেষিত হয়ে যায়। তার অপেক্ষা বরং রামপ্রসাদের অনুবর্তীদের শাক্তলীলার গানে সহজ কবিত্বের ও আন্তরিক অধ্যাত্মানুরাগের পরিচয় বেশি পাওয়া যায়। বৈষ্ণব পদাবলীতে নানা রসের, বিশেষ করে উজ্জ্বল রসের, প্রকাশের যে সুযোগ আছে শাক্ত গানে তা নেই। অষ্টাদশ শতক হচ্ছে

জটিল ও কুটিল কালের শতাব্দী। বিভ্রান্ত অসহায় মানবাত্মা তখন স্বভাবতই জগন্মাতার নিকটে আশ্রয় চেয়েছে। মধুর রসের আস্বাদন তখন সহজ নয়; মানুষ ত্রাতা ও তারিণীর উপর নির্ভর করা ছাড়া পথ দেখে না। যশোদা-গোপালের লীলানন্দও এর সগোত্র, কিন্তু মন তখন আনন্দের সুরে বাঁধা নয়, আশ্রয়ের স্থল খোঁজে। অবশ্য জগন্মাতার নিকট সেই আত্মনিবেদনের সূত্রে সাধনার স্তরে স্তরে যে গভীর আত্মপ্রত্যয় ভক্ত লাভ করে, তা কম উজ্জ্বল নয়। এই ভক্তি-আদর-স্নেহ-প্রত্যয়ের বশে রচিত সরল গীত সশঙ্ক সরল মানুষের অন্তর স্পর্শ করে—বিশেষ করে সুর ও তালের সহায়তা পেয়ে। কবির কাব্য না হোক, সাধকের কাব্য হিসাবে তার কিছু কিছু গ্রাহ্য। অবশ্য কৃষ্ণ ও কালীতে রামপ্রসাদ প্রমুখ সাধকরা বিভেদ করতেন না। রামপ্রসাদের এই গীতধারা সত্যই এই উনিশ শতকের প্রথম দিকে প্রবল হয়, এবং যদি শ্রীরামকৃষ্ণকে মনে রাখি তা হলে বুঝতে পারি এ ধারার সাধনা কি করে সৃষ্টির সমৃদ্ধিতে রূপান্তরিত হয়েছে, এবং কিরূপে বিংশ শতকের বাঙালী চেতনাকেও রূপান্তরিত করেছে।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্র রাজা শিবচন্দ্র ও কুমার শম্ভুচন্দ্র, সে বংশের কুমার নরচন্দ্র, বর্ধমানের মহারাজার দেওয়ান নন্দকিশোর ও তাঁর ভ্রাতা দেওয়ান রঘুনাথ রায় (ইং ১৭৫০-ইং ১৮৩৬) প্রমুখ নদীয়া-বর্ধমানের সামন্ত-অভিজাত-গণ শাক্ত পদাবলীর ধারায় ভালো মন্দ বহু গীত রচনা করে গিয়েছেন। কিন্তু রামপ্রসাদের পরে সাধনায় ও সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য কমলাকান্ত। কালনা-অম্বিকাপুরে কমলাকান্ত ভট্টাচার্যের বাড়ি। বর্ধমানের মহারাজ তেজশ্চন্দ্র তাঁর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন আর মহারাজ মহতাবচন্দ্র ইং ১৮৫৭ সালে কমলা-কান্তের ২০০ শত গীত-সংগ্রহ প্রকাশ করেন। এসব গান আন্তরিকতা ও অনুভূতির দ্যুতিতে উজ্জ্বল। কবির সরল সাধারণ মানবিকতা তাতে আরও হৃদয়স্পর্শী হয়ে ওঠে। অধ্যাত্ম সঙ্গীতের ধারায় অবশ্য রামমোহন ও তাঁর সহযোগীরাও গণ্য হতে পারেন। কিন্তু রাজা কাব্যরসে বঞ্চিত ছিলেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের হাফেজানুরক্তি তাঁর সমকালীন কোনো ভক্তকে কবি করে তোলে নি। তাঁর প্রভাবে পরের যুগে ব্রহ্মসঙ্গীতের নতুন রহস্যবাদের উৎস হয় উপনিষদ্।

আসলে যে অধ্যাত্ম-গীতকাররা তখনো আপনাদের সাধনায় অব্যাহত

ছিলেন, তাঁরা ছিলেন শহরে কলকাতার বাবু বেনিয়ন বা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের থেকে বহুদূরে—চিরদিনের মত গ্রামে। সে সব আউল-বাউলের গান, বায়-ফতি-মুর্শেদি গানের সংকলন তাই সেদিনের গীত-সংগ্রহসমূহেও স্থান পায় নি। শতাব্দীর শেষ দিকে এ বিষয়ে বাঙালী শিক্ষিত-সমাজ আবার সচেতন হন, আর বিংশ শতকে লালন ফকির, গগন হরকরা, বিশা ভূঁইমালীরা আবার আবিষ্কৃত হলেন। একদিকে 'ময়মনসিংহ গীতিকা', রূপকথা ও উপকথা, ও অন্যদিকে এই অধ্যাত্ম-গীতের অলিখিত ধারা —এ দু' জিনিস এই শতাব্দীতে বাঙালী সাহিত্যিককে তার লোক-সাহিত্যের অফুরন্ত ভাণ্ডার সম্বন্ধে সচেতন করে। লোক-সাহিত্য অবশ্য নানাবিধ কারণে স্বতন্ত্র আলোচনার যোগ্য। কিন্তু 'ময়মনসিংহ গীতিকা'র মত কিংবা রাগাত্মিকা পদাবলীর মত, কিছু কিছু বাউলগীতিও সাহিত্যের হিসাবে প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য বলে স্বীকার্য ও এখানে স্মরণীয়। সেরূপ উঁচুদরের উদাহরণ অনেক আছে, কিন্তু কোনোটিকে নিঃসংশয়ে বলতে পারি না ইং ১৮০০-১৮৫৭-এর।

প্রণয়-সঙ্গীত

নিঃসংশয়ে যে গীত-কাব্য যুগমানসের বাহন হয়, সে যুগ ছাড়িয়ে যে গীতি-কবিতা আগামী যুগের কতকটা ইঙ্গিত উত্থাপন করেছিল,—তা কবি-গানও নয়, অধ্যাত্মসঙ্গীতও নয়; সে হচ্ছে প্রণয়-সঙ্গীত। আর যিনি নতুন করে তার পথ রচনা করলেন সেই 'নিধুবাবু'কে বাঙালী মনের এক দিকের একজন শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিও বলা যায়।

ভারতচন্দ্রের অনুসরণে প্রণয় বর্ণনাই ছিল তখন কাব্যের আদর্শ—কিন্তু তা গীত নয়, অলঙ্কার-প্রধান কৃত্রিম কাব্য। রাধা-কৃষ্ণের নামের আড়ালেই প্রণয়-গীতি বাঙলাদেশে রচিত হয়েছে। কবিওয়ালারা রাধা-কৃষ্ণের নামকে প্রণয়-নামেই পর্যবসিত করেছিলেন। নাম ছাড়িয়ে, প্রণয়-উপাখ্যানের মত প্রণয়-গীতিও হয়ত পরিষ্কার প্রণয়-গীতিরূপেই আবির্ভূত হচ্ছিল, কিন্তু তার প্রমাণ নেই। প্রমাণ পাওয়া গেল, যখন ভাব ও রসের ছাড়পত্র আদায় করে রামনিধি গুপ্ত বাঙলায় 'টপ্পা' রচনা করতে লাগলেন। আলঙ্কারিক রূপবর্ণনা, দেহ-বিলাস ও অধ্যাত্মবিলাস ছাড়াও দেহমন-ধর্মী যে মানব প্রণয় আছে, পৃথিবীর একটা সহজ ও শাশ্বত সত্য রূপে বাঙালীর মন তাকে সহজভাবেই

স্বীকার করে কিন্তু বাঙলা কাব্যে তা এ পর্যন্ত বারে বারেই অধ্যাত্ম-উচ্ছ্বাসে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। উনিশ শতকে আধুনিক মানবীয়তার বোধ সম্ভাবিত হতেই সেই বৈকুণ্ঠ-ছায়া লঘুতর হয়ে উঠল—অবশ্য পরে উনিশ শতকের শেষার্ধে গীতিকাব্যে আবার *subjective* বা বিষয়ী-গত অন্তর্মুখিতা প্রবল হয়ে ওঠে। বিহারীলালের পর থেকে ক্রমে গীতিকবিতা নূতন এক অধ্যাত্ম ভাবতন্ময়তায় প্রভাবিত হতে থাকে। ভারতচন্দ্র ও বিহারীলাল, এই দুই সীমার মধ্যে নিধুবাবু ও তাঁর অনুসরণকারী শ্রীধর কথক ও কালী মির্জা প্রভৃতি গীতকাররা একবারের মত বাঙালীর প্রণয়-চেতনাকে স্বাভাবিক রূপ দিতে পেরেছেন,—আপন প্রাণের অনুভূতি, ভালোবাসা, প্রণয়জাত নানা স্বাভাবিক ভাবকে তাঁরা প্রকাশ করেছেন—এ জন্ত বাঙলা সাহিত্যে নিধুবাবু বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী, বাঙলা-সাহিত্যও এই প্রকাশ-সম্পদের জন্ত বাঙলা সঙ্গীত-শিল্পীদের নিকট কৃতজ্ঞ।

নিধুবাবুর জীবনবৃত্তান্তও 'প্রভাকরে' ঈশ্বর গুপ্ত সংকলন করে গিয়েছিলেন (১লা শ্রাবণ, ১২৬১ বাং)। এখন পর্যন্ত তাই আমাদের প্রধান অবলম্বন (আর তা ইদানীং পূরণ করেছেন ডঃ সুশীলকুমার দে 'নানা নিবন্ধে'র প্রবন্ধে)। নিধুবাবুর আসল নাম রামনিধি গুপ্ত। তাঁদের পৈতৃক ভিটা ছিল কুমারটুলিতে। কিন্তু ত্রিবেণীর নিকট চাঁপতা গ্রামে (হুগলী জেলায়) তিনি জন্মেন বাং ১১৪৮ সালে (ইং ১৭৪১;—তখনো বর্গীর হাঙ্গামার দিন; পলাশীও ঘটেনি। তাঁরা কলিকাতায় ফিরে আসেন বাং ১১৫৪;—এখানেই নিধুবাবুর বিদ্যারম্ভ। সংস্কৃত ও ফারসি ছাড়া কিছু কিছু ইংরেজিও নিধুবাবু শিক্ষা করেন। প্রায় ৩৫ বৎসর বয়সে নিধুবাবু ছাপরা (বিহার) কালেক্টরিতে কেরানীর কাজে নিযুক্ত হন। এখানেই এক মুসলমান ওস্তাদের নিকট নিধুবাবুর হিন্দুস্থানী সঙ্গীতবিদ্যা শিক্ষার সুযোগ ঘটে। কিন্তু ওস্তাদের মনে ক্রমে এই গুণী শিষ্যের উপর ঈর্ষা জাগে। তাই নিধুবাবু তাঁর সহায়তা থেকে বঞ্চিত হন।' তখন নিজেই তিনি হিন্দুস্থানী গীতের আদর্শে বাঙলা ভাষায় গীত রচনায় লাগলেন। তাঁরই কথা—

> নানান দেশে নানান ভাষা।
> বিনে স্বদেশী ভাষা পুরে কি আশা॥
> কত নদী সরোবর কিবা ফল চাতকীর।
> ধারা-জল বিনে কভু ঘুচে কি তৃষা॥

এভাবেই বাঙলা 'টপ্পা'র জন্ম হয়। সরকারী কর্মে অসদুপায়ে বিত্তার্জন তখন সমাজে অন্যায় বলে গণ্য হত না। কিন্তু নিধুবাবুর তাতে আপত্তি হল। আর এই কারণেই তিনি ছাপরার সরকারী কর্ম ত্যাগ করে কলকাতায় ফিরলেন। তাঁর জীবনে এর পরে শোকের আঘাত আসে—স্ত্রী ও পুত্রের মৃত্যু হয়। সেই শোকাকুল মনেই লেখা হল 'মনঃপুর হতে মোর হারায়েছে মন' প্রভৃতি গান। দ্বিতীয় স্ত্রীও বিবাহের পরেই গত হলেন। তৃতীয় দার তিনি গ্রহণ করলেন বাং ১২০১-২ সালে অর্থাৎ পঞ্চাশোর্ধ্বে এবং এ বিবাহে ছ'টি পুত্রকন্যা তিনি লাভ করেছিলেন।

নিধুবাবু সঙ্গীত-শিল্পী। শোভাবাজারের এক বড় আটচালায় প্রথম দিকে তাঁর গানের বৈঠক বসত। ধনী ও গুণী লোকেরা সেখানেই নিধুবাবুর 'টপ্পা' শুনতে এসে জুটতেন। তাঁদের নিকটও নিধুবাবুর সম্মান ছিল প্রচুর। 'পক্ষীর দলের'ও বৈঠক বসত এ আটচালায়—তাঁরা শৌখীন 'বাবু' সমাজেরই এক অংশ। নিধুবাবুকে তাঁরাও মান্য করতেন। এ আড্ডা ভেঙে গেলে নিধুবাবুর উদ্যোগে (বাং ১২১২-১৩ সালে) নতুন আখড়াই গাইবার মত দুটি দলের সৃষ্টি হয়। সাবেক আখড়াই পদ্ধতি ভেঙে প্রথমতঃ 'দাঁড়া কবি' ও পরে 'হাফ্-আখড়াই' গাহনার সৃষ্টি করেন বাগবাজারের মোহনচাঁদ বসু। আখড়াই গাহনা মোহনচাঁদ নিধুবাবুর নিকট শিখেছিলেন। তাই সঙ্গীত-জগতে শুধু বাঙলা টপ্পা নয়, মূলত 'হাফ্-আখড়াই'র সৃষ্টিকর্তাও নিধুবাবু।

পরের যুগে টপ্পার সম্বন্ধে শিক্ষিত সমাজের মনে বিরূপতা জন্মে—অনেকটা তাঁদের অজ্ঞানতার জন্য। আর নিধুবাবুর নাম 'টপ্পা'র সঙ্গে সংযুক্ত বলেই, নিধুবাবুর সম্বন্ধেও একটা ভ্রমপূর্ণ লঘু ধারণাও গড়ে ওঠে। এজন্যই জানা দরকার—নিধুবাবু ইয়ার-সমাজের লোক ছিলেন না। "তিনি কখনো লোকের তোষামোদ করেন নাই, নিজের মান রাখিয়া চলিতেন। তাঁহার প্রকৃতি স্বভাবতঃ এত গম্ভীর ছিল যে—কেহ তাঁহাকে একটি গান গাইতে অনুরোধ করিতে সাহসী হইত না।" অথচ তিনি যে "সদানন্দ, সন্তোষপরায়ণ' পুরুষ ছিলেন, তাঁর গীতই তার প্রমাণ।

শ্রীমতী নাম্নী এক রূপবতী, গুণবতী বারাঙ্গনার সঙ্গে তাঁর মেলামেশা নিয়ে নানা কথা শোনা যায়। এরূপ সৌহার্দ্য সেদিনে মোটেই বিস্ময়কর নয়। বিশেষ করে নিধুবাবু গীতবাদ্যের জগতের কৃতীপুরুষ। বরং উল্লেখযোগ্য

এ বিষয়ে 'প্রভাকরে'র এই বিচার, "তিনি লম্পট ছিলেন না ; কেবল স্তুতি বিনয় স্নেহ ও নির্মল প্রণয়ের বশ্য ছিলেন।" এ তথ্যটুকু উল্লেখযোগ্য—এই শ্রীমতীর গৃহে গানবাজনা হাস্যালাপ চলত এবং এখানে বসেই যখন যেমন ভাবের উদয় হত, নিধুবাবু তখনই তাঁর এক এক গীত রচনা করতেন। (নিধুবাবুর চরিত্রচিত্র ও কাব্য-বিচারে ডঃ সুশীল দে'র প্রবন্ধটি বিশেষ মূল্যবান—দ্রষ্টব্য: 'নানা নিবন্ধ'—'রামনিধি গুপ্ত')। দীর্ঘ জীবন স্বাস্থ্য ও প্রতিপত্তি ভোগ করে নিধুবাবু ৯৭ বৎসরে যখন প্রাণত্যাগ করেন (২১শে চৈত্র বাং ১২৪৫ সাল—ইং ১৮৩৭ অব্দে) তখনো তাঁর বুদ্ধি, দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি অক্ষুণ্ণ ছিল। পলাশীর পূর্বে জন্মে তিনি একটা দীর্ঘ যুগাবর্তন প্রায় প্রত্যক্ষ করেন, কলিকাতার 'বাবু' সমাজের উদ্ভব ও প্রভাব তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁদের রসবোধের শ্রেষ্ঠ দিকের প্রমাণ নিধুবাবুর গান। তাঁর নিজের জীবনও কম বিচিত্র নয়—যোগ্য কথাশিল্পী বা চলচ্চিত্রশিল্পীর হাতে তা শিল্পবস্তু হতে পারে।

নিধুবাবুর গানের সম্পূর্ণ ও প্রামাণিক সংগ্রহ নেই। তবু বিচার-বিশ্লেষণ করে মোটামুটি স্থির করা যায় কোন্‌টি নিধুবাবুর, কোন্‌টি তাঁর অনুকারী অন্য কোন গীতকারের। সেদিকে নিধুবাবুর মৃত্যুর এক বৎসর পূর্বে মুদ্রিত (বাং ১২৪৪) "গীতরত্ন গ্রন্থ"ই প্রধান আশ্রয়—তা সম্ভবত অসম্পূর্ণ, আর সম্ভবত তাতে অন্যেরও দু'একটি রচনা গৃহীত হয়েছে। পরবর্তী সংগ্রহ-গ্রন্থসমূহ থেকে নিধুবাবুর আরও কিছু আখড়াই, ব্রহ্মসঙ্গীত, শ্যামাবিষয়ক সঙ্গীত প্রভৃতি পাওয়া যায়। অন্যের রচিত অনেক আদিরসাত্মক গানও নিধুবাবুর বলে সে সব সংগ্রহে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। (এ সব সংগ্রহ-গ্রন্থ ও তাদের বিচার ডঃ দে'র পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধে করা হয়েছে।) দু'একটি প্রসিদ্ধ গান যা নিধুবাবুর নামে চলে, মনে হয়, তা তাঁর নয়। যেমন,

> ভালবাসিবে বলে ভালবাসিনে।
> আমার স্বভাব এই তোমা বই আর জানিনে॥
> বিধুমুখে মধুর হাসি দেখিলে সুখেতে ভাসি
> সে জন্যে দেখিতে আসি দেখা দিতে আসিনে॥

এটি শ্রীধর কথকের রচনা হবারই সম্ভাবনা। এরূপ শ্রীধর কথকেরই হয়ত গান—

তবে প্রেমে কি সুখ হত।
আমি যারে ভালবাসি সে যদি ভালবাসিত॥

আরও কিছু টপ্পাও নিধুবাবুর রচিত কিনা বলা যায় না। যথা

নয়নেরে দোষ কেন—

এবং

তোমারি তুলনা তুমি প্রাণ এ মহীমণ্ডলে।—ইত্যাদি।

আসলে নিধুবাবু টপ্পা রচনার প্রায় একটা 'স্কুল' তৈরী করে যান। এসব যদি নিধবাবুর গান না হয় তবে 'নিধুবাবুর স্কুলের গান' বললে ভুল হবে না। এদেশের নৈর্ব্যক্তিক আবহাওয়ার গুণে ব্যক্তি নিধুবাবু ব্যক্তি চণ্ডীদাসের মত, পরম্পরার রচনায় হারিয়ে যেতে পারতেন—যদি ঈশ্বর গুপ্ত প্রভৃতি তাঁর পরিচয় না রেখে যেতেন, আর মুদ্রাযন্ত্র সেই পরিচয়কে আরও পাকা করে না ফেলত। তথাপি শ্রীধর কথক, কালী মির্জা, ছাতুবাবু প্রভৃতির স্বতন্ত্র পরিচয় ও গান থাকলেও তাঁদের অনেক গান সংগ্রহ-গ্রন্থে নিধুবাবুর গানের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। নিধুবাবুর মৃত্যুর মাত্র ষোল বৎসর পরে ঈশ্বর গুপ্ত লিখেছেন, "অনেকেই 'নিধু' 'নিধু' কহেন, কিন্তু নিধু শব্দটি কি, অর্থাৎ এই নিধু কি গীতের নাম, কি সুরের নাম, কি রাগের নাম, কি মানুষের নাম, কি, কি? তাহা জ্ঞাত নহেন।" এই নৈর্ব্যক্তিকতার আবহাওয়ায় পরবর্তী কালে নানা কুরুচিপূর্ণ ও অসার্থক গানও 'নিধুর টপ্পা' বলেই চলেছে। অবশ্য একথা স্বীকার্য নিধুবাবুর আমলে বাঙালীর মনে নূতন কালের রুচিবোধ সম্পূর্ণ স্থির হয়ে ওঠেনি—শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধেই তা বঙ্কিমের যুগে স্থির হয়। আর নূতন কাব্যসংস্কারও নিধুবাবুর আমলে স্থির হয়নি···মধুসূদন না আসতে তাও ছিল অস্পষ্ট। অতএব, নিধুবাবুর গানে এখানে-ওখানে একালের বিবেচনায় রুচির দোষ দেখা যায়। আর, কাব্যগুণেরও অভাব প্রচুর চোখে পড়ে। দু'চারটি চমৎকার চরণ অতিক্রম করতে না-করতে একই গানে এসে অচল-চরণে ঠেকে যেতে হয়। এই সাধারণ এবং প্রধান ত্রুটি মনে রেখেই বলতে পারি—যে চরণগুলি চমৎকার তা নূতন শহুরে কালচারের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ, বাবু-বিলাসের আওতায় রচিত শুভ্র প্রণয়-মালা, আর কথায়, সুরে, সুন্দরসবোধে বাঙলার প্রণয়-সঙ্গীতের ধারায় নূতন সংযোজন।

বৈষ্ণবপদাবলীতে ও পল্লীগীতিতেই শুধু বাঙালীর প্রণয় কবিতা শেষ হয়ে

গেল না। "প্রেমের বিষয় যাহা কিছু বলিবার আছে নিধুবাবু তাহার অনেক কথাই বলিয়াছেন।" আর প্রেমের কথা সাহিত্যের শাশ্বত উপাদান। নিধুবাবুর গীতিসাহিত্যের বৈশিষ্ট্যই এবার উল্লেখ করছি।

বৈষ্ণব-পদকারদের মতই নিধুবাবু পীরিতির প্রশস্তিকার :

পিরীতি না জানে সখী সে জন সুখী বল কেমনে।
যেমন তিমিরালায় দেখ দীপ বিহনে॥

অবশ্য এ বৈকুণ্ঠের গান নয়, সে পিরীতিও নয়। "যতদিন দেহ আছে, প্রেম দেহসম্পর্কশূন্য থাকিতে পারে না," এই সহজ সত্য নিধুবাবুর গানে স্বীকৃত। কলকাতার শহরে সমাজেরও এ বাস্তব বোধ ছিল মজ্জাগত, কবিওয়ালা-যাত্রাওয়ালারা তা নিয়ে রঙ লাগাতেও ছাড়ত না। কিন্তু নিধুবাবুরই শ্রেষ্ঠ চরণে দেখি এই প্রণয়ের সহজ ও পরিচ্ছন্ন প্রকাশ। ডাক্তার সুশীলকুমার দে নিধুবাবুর গানগুলি থেকে প্রেমের এই বিচিত্র প্রকাশের সাক্ষ্য নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করেছেন—('নানা নিবন্ধ', পৃঃ ১২১-২৯) : "মিলনাকাঙ্ক্ষা, মিলনের আনন্দ, অভিমান, সাধনা, সোহাগ, আত্মনিবেদন, বিচ্ছেদের দুঃখ, অপূর্ণ প্রেমের নৈরাশ্য, উদ্বেগ, সন্দেহ, অবিশ্বাস, প্রেমে শঠতা ও নিষ্ঠুর অনুযোগ প্রভৃতি বহুরূপী প্রেমের বিভিন্ন রূপের বর্ণনা তাঁহার সঙ্গীতে অপ্রতুল নহে।"

আগে কি জানি সই এমন হবে।
নয়নে নয়ন মিলে মনেরে মজাবে।

—শুধু দেহই শেষ নয়, দেহ ছাড়িয়ে যায়, 'মনেরেও মজায়'। অথচ—

নয়ন-অন্তরে, অন্তরে তোরে নিরখি মন-নয়নে।
চাক্ষুষে যতেক সুখ, তত কি হয় মননে॥

তথাপি দেখারও শেষ নেই—

নয়নে নয়ন রাখি (প্রাণ) অনিমিখ হয় আঁখি বাসনা মনেতে।

কিন্তু—

বিচ্ছেদে যা ক্ষতি তাহা অধিক মিলনে।
আঁখির কি আশা পুরে ক্ষণ দরশনে।

এই রহস্য জেনেও শেষ নেই—

তুমি কি জানিবে আমার মন।
মন আপনারে আপনি জানে না।

তাই একথা আরও সত্য—

নয়ন রূপেতে ভুলে মন ভুলে গুণে।

কিংবা সেই গানটি যেটির রচয়িতা অন্যেও হতে পারে, নিধুবাবুও হওয়া সম্ভব :

. নয়নের দোষ কেন।
মনেরে বুঝায়ে বল নয়নের দোষ কেন।
আঁখি কি মজাতে পারে না হলে মন মিলন।
আঁখি যে যত হেরে সকলই কি মনে ধরে,
যেই যাকে মনে করে সেই তার মনোরঞ্জন॥

'মনের মিলনে'র শেষ কথা সেই একাত্মতায়, আধুনিক মনোবিজ্ঞান যাকে বলে identification :

এতদিন পরে নিখিল আমার মনের অনল সখী।
দেখ যতদিন ছিল দুই জ্ঞান, সতত ঝুরিত আঁখি॥

এখন—

আমি লো তাহার তাহার মনে, সে আমার মোর মনে,
দেখ দেখি কত সুখ উভয় প্রেম দু'জনে॥

তাই শুনি—

আমি কি দিব তোমারে সঁপিয়াছি মন।
মনের অধিক আর কি আছে রতন॥

এই আত্মসমর্পণের সার্থকতাতেই বলা যায়—

ভালবাসিবে বলে ভালবাসিনে।
আমার স্বভাব এই তোমা বই আর জানিনে॥ —ইত্যাদি

তাই "ভোগ অপেক্ষা ত্যাগ, সুখ অপেক্ষা দুঃখ, তৃপ্তি অপেক্ষা অতৃপ্তির কথা" তাঁর গানে বেশি—

তবে প্রেমে কি সুখ হতো।
আমি যারে ভালবাসি সে যদি ভালবাসিতো॥ —ইত্যাদি

তা হলেও—

'প্রেম মোর অতি প্রিয় হে তুমি আমারে ভেজো না।'
'দুঃখ হলো বলে কি প্রেম ত্যজিব।
দুঃখে সুখ বোধ করে যতনে তায় তুষিব।' —ইত্যাদি

একথাটা আবার স্মরণ করা দরকার—কবিতাকার হিসাবে নিধুবাবুর দোষ অনেক। ঈশ্বর গুপ্তের কালেও তা বোঝা গিয়েছিল—তাই তিনি জানিয়েছেন "তখন লোকে কিছু মোটা কাজ ভালবাসিত; এখন সরুর উপরে লোকের অনুরাগ।" এ ত্রুটির কথা পূর্বেই বলেছি।—দেহ-মন-প্রণয় এ সবকে একে-

বারে ধোঁয়া করে না ফেলে আত্মপ্রকাশের চেষ্টা তখনকার গীতিকার, কবিতা-কারেরা করেছেন—ঈশ্বর গুপ্তও তার এক ধরনের দৃষ্টান্ত।—নিধুবাবু একটা মূল পার্থিব ভাবকে এই সহজ পার্থিব অর্থেই গ্রহণ করেছেন—এ হিসাবে তা বাঙলা কাব্যের দুর্লভ বস্তু—বাস্তবের স্বীকৃতি (দ্রষ্টব্য—ডঃ দে, ইংরেজিতো বঃ সাঃ ইঃ, পৃঃ ৩৩৮)। তাছাড়া যিনি হিন্দুস্তানী ভাষা ছেড়ে বাঙলায় টপ্প রচনায় নামলেন তিনি একটা 'যুগপ্রবর্তক', নতুন যুগের এই বোধটা তাঁর জন্মেছে—

নানান দেশে নানান ভাষা
বিনে স্বদেশী ভাষা পুরে কি আশা॥

—'ইয়ং বেঙ্গলের' যা তখনো জন্মেনি, অথচ তাঁদের স্বদেশপ্রীতি ছিল প্রবল। নিধুবাবুর জীবন থেকে দেখতে পাই—স্বদেশপ্রীতি ও মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ, দুইই এক হয়ে বাঙালী গুণীদের মনে সঞ্চারিত হয়েছে। ঈশ্বর গুপ্ত সেদিনের প্রধান নেতা। নিধুবাবু নিজে সে যুগের নন, বরং পূর্বযুগের। তাঁর গুণিসমাজেও সম্ভবত ইংরেজি জানা পাঠকেরা ছিলেন না—ছিলেন কলিকাতার বাবুসমাজের গুণী প্রতিনিধিরা। নিধুবাবুর চিত্তেও এই নতুন কালের চেতনার আভাস দেখা দিয়েছিল, এইটুকু লক্ষণীয় বিষয়:

"বিনে স্বদেশী ভাষা পূরে কি আশা?"

॥ ৩ ॥ পদ্যের নূতন অনুভাবন।

নবযুগের সভ্যতার সঙ্গে সাক্ষাতের ফলে জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে নূতন বোধ বাঙালী-জীবনে আসত। ইংরাজি সাহিত্যের রসাস্বাদনে তা বাঙলা সাহিত্যে কল্পনাতীত নতুন অনুভাবনার সঞ্চার করল। সে অনুভাবনা যেমন তীব্র ও প্রবল, বাঙলা সাহিত্যের পরিচিত পথ ছিল সেই পক্ষে তেমনি দুর্গম। নাটকের বেলা শেকস্‌পীয়রকে বাঙলায় ঢালবার দুঃসাধ্য চেষ্টায় আমরা তা দেখেছি। বাঙলা পদ্যের অভ্যস্ত পথ ছিল তার অপেক্ষাও সংকীর্ণ; নতুন দৃষ্টিতে প্রায় অচল। অনভ্যস্ত রাজ্যে যাত্রার জন্য চাই নতুন পথ নির্মাণ করা—সে সাধ্য কার আছে? যাঁরা ইংরেজি কাব্য-সাহিত্যের রসাস্বাদন করলেন তাঁরা তাই সরাসরি ইংরেজিতেই কাব্য-রচনার প্রয়াসে উৎসাহী হয়েছিলেন। এ চেষ্টা যে আরও দুঃসাধ্য তাঁদের তা বোঝা উচিত ছিল। কারণ যত্নায়ত্ত পরভাষায়

মানুষ আপনার যুক্তি-বদ্ধ চিন্তা-ভাবনা প্রকাশ করতে পারে। এমন কি, এক ধরনের গল্প-উপন্যাস-নাটকও হয়ত তাতে রচনা করা যায়। কিন্তু কাব্য?— মাতৃভাষায় ছাড়া পরভাষায় যথার্থ কাব্য-রচনা অসম্ভব। মনোমোহন ঘোষ, শ্রীঅরবিন্দ বা সরোজিনী নাইডুও এর ব্যতিক্রম নন—তাঁদের পক্ষে ইংরেজিই ছিল প্রকৃত মাতৃভাষা। মাতৃভাষা যদি বাঙলা হয় তা হলেও কারও হতাশ হবার কারণ নেই. একথা উনবিংশ শতকের কবিযশঃপ্রার্থী ইংরেজি-শিক্ষিতদের বুঝতে শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদও অতিবাহিত হয়। সেই পাদেই স্বদেশ ও স্বভাষার প্রতি মমতা ও শ্রদ্ধা জেগেছিল, তাতে দৃষ্টি-পরিবর্তনের স্পষ্টাভাস পাওয়া যায়—স্বভাষার অনুশীলনের মধ্য দিয়েই পদ্যের এই নতুন অনুভাবনা ক্রমে আপনার পথ বাঙলাতে আবিষ্কার করবে।

বাঙালীর ইংরেজি কবিতা : যে বাঙালী শিক্ষিতরা ইংরেজির গৃহে আশ্রয় খুঁজেছিলেন তাঁরাও কিন্তু বাঙলা সাহিত্যের পক্ষে একবারের মত স্মরণীয়—শিক্ষিত বাঙালী মন নবযুগের চেতনাকে কিভাবে আত্মসাৎ করতে চাইছে, তাঁরা তার সাক্ষ্য দেন। তাঁদের সেই সাক্ষ্যও তাঁদের সহযোগী ও অনুগামী শিক্ষিত বাঙালীদের ভাবলোককে পরোক্ষে প্রভাবিত করেছে, এবং পরবর্তী বাঙালী কবিরা সবাই সেই ভাবলোকের সন্তান।—ইংরেজিতে লেখা বাঙালীর কবিকর্মও বাঙালীর কবিতা, আর সে বিপরীত প্রয়াস বাঙালী কবিদের সতর্কও করেছে; অন্যদিকে সেই কাব্যানুভাবনা সমসাময়িকদের কাব্য-চেতনাকে কিছু-না-কিছু পুষ্ট করেছে।

এই ইংরেজিওয়ালা বাঙালী কবিদের মধ্যে প্রথম গণ্য কবি ডিরোজিও, যদিও তিনি বংশে পর্তুগীস ফিরিঙ্গি, ধর্মে নবযুগের জিজ্ঞাসু মানুষ আর কর্মে 'ইয়ং বেঙ্গলের' বা নবযুগের বাঙালীর মন্ত্রগুরু। ভারতবর্ষকে 'মাই কাণ্ট্রি' বা 'স্বদেশ আমার' বলে তিনিই প্রথম অনুভব ও সম্বোধন করেছেন,—আর এই দেশাত্মবোধ যুগধর্মের প্রধান এক মন্ত্র। 'ডিরোজিও'র প্রেরণা অবশ্য বাঙলার পথে তাঁর শিষ্যদের না চালিয়ে ইংরেজি কাব্য-পথেই প্রথম দিকে (ইং ১৮৩০) থেকে চালিয়েছে—কাশীপ্রসাদ ঘোষ (ইং ১৮০৯—ইং ১৮৭৩), রাজনারায়ণ দত্ত (ইং ১৮২০—ইং ১৮৮০) আর সে পথ ত্যাগ করতে পারেন নি। 'দত্ত ফ্যামিলি অ্যালবামের' দত্ত-কবিরাও সেখানে আবদ্ধ থাকেন। তরু দত্ত-অরু দত্ত দু'বোনের খ্যাতি এখনো লুপ্ত হয় নি, না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু

ততক্ষণে বাঙলার কাব্যপথ আবিষ্কৃত হয়েছে। ইং ১৮৩৯-এও মাইকেল 'ক্যাপটিব্ লেডি' লিখেছিলেন, সংযুক্তার উপাখ্যান অবলম্বন করে,—কিন্তু বিশ বৎসর পরে বঙ্গ-ভাণ্ডারের বিবিধ রতনে তাঁর উৎসাহ জাগ্‌ল।

লক্ষ্য করবার মত এই যে, এসব কবিদের প্রেরণা প্রায়ই রোমান্টিক। ইংরেজির মারফতে তাঁরা গ্রীক-লাতিন থেকে প্রায় সমস্ত নূতন পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের সঙ্গেই পরিচিত হয়েছিলেন। ইংরেজি সাহিত্যেরও তিনটি প্রধান যুগের তাঁরা রসাস্বাদন করছিলেন—প্রথম, রোমান্টিক যুগের শেক্‌স্‌পীয়র-মিলটন ছিলেন তাঁদের চোখে প্রায় দেবতা। দ্বিতীয়, 'ক্লাসিক' যুগের (বা ইংরেজি অষ্টাদশ শতকের) ড্রাইডেন পোপ প্রভৃতির সঙ্গেও তাঁদের কারও কারও পরিচয় কম ছিল না। তৃতীয়, ইংরেজি সাহিত্যের 'রোমান্টিক পুনরাবির্ভাবের' যুগ (ইং ১৭৯৮—ইং ১৮৩২) তাঁদের নিজেদের নিকটবর্তী কাল—ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, কোলেরিজ, বায়রন, শেলি, কীট্‌সকে আমরা এখন দূর থেকে বিস্ময়ের দৃষ্টি মেলে যেভাবে দেখি তখনকার যুগে তাঁদের পক্ষে তা সুসম্ভব ছিল না। বাঙালী যতই ইংরেজিওয়ালা হোক্, দেশ-কালগত একটা দূরত্ব থেকেই গিয়েছিল—বিংশ শতকের প্রথম পাদ পর্যন্তও সে দূরত্ব লোপ হয় নি। তাই ইং ১৮৫৭-৫৮ পর্যন্ত বাঙালীর দৃষ্টিতে দীপ্ত মহিমায় ফুটে উঠেছিলেন বায়রন,—অবশ্য 'ডন জুয়ান' অপেক্ষা 'চাইল্‌ড হ্যারল্ড' প্রভৃতির কবিরূপেই বায়রন পরিচিত ছিলেন। তারপরেই বাঙালীর পরিচিত ছিলেন স্কট্, মূর, ক্যাম্পবেল প্রভৃতি আখ্যান-রচয়িতা কবিরা; আর কতকটা ওয়ার্ডসওয়ার্থ—হয়ত সেদিনের রাজকবি বলে, এবং একটু পরে টেনিসন। মধুসূদনের মত অত ব্যাপক পরিচয় আর কারও নিশ্চয়ই ছিল না। ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙালীদের কাব্যানুভাবনা তখনো প্রধানত শেক্‌সপীয়র-মিলটন ও বায়রন-স্কট্-মূর প্রভৃতির দ্বারাই বেশি প্রভাবিত ছিল—এই কথাটা তবু মনে রাখা দরকার। মধুসূদনের বিপ্লবী প্রয়াস (ইং ১৮৬০—১৮৭২-এর মধ্যে) বাঙলা কাব্যকে একেবারে হোমার-ভার্জিল-দান্তে-তাসো-মিলটন-ওবিদ-পেত্রার্কা এবং কৃত্তিবাস-কাশীদাস-কবিকঙ্কণ-জয়দেব-কালিদাস-ব্যাস-বাল্মীকি পর্যন্ত স্বচ্ছন্দগামী করে দিয়ে গেল। কিন্তু বায়রন-স্কটের শাসন তার পরেও বহুদিন পর্যন্ত বাঙালীর মনে ছিল—অবশ্য সেই শতাব্দীর শেষ পাদে শেলি, টেনিসন, সুইনবার্ণও একটু-একটু করে দেখা দিয়েছিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

ইংরেজি সাহিত্যের কাব্যানুভাবনায় প্রবুদ্ধ হয়ে যখন বাঙালী শিক্ষিতরা ইংরেজি কাব্য-রচনার কথা ভাবতেন তখন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বাঙলা পদ্য-রচনায় নূতন করে উৎসাহ সঞ্চার করেন। নূতন কাব্যানুভাবনায় তিনি প্রবুদ্ধ হন নি; তবু নবযুগের বাস্তব উদ্যোগ আয়োজনের ফলে কতকটা বাস্তব-বোধ তাঁর চিন্তায়-দেখা দেয়; কতকটা নিজের প্রবণতায়ও তিনি বাঙলা পদ্যে অভিনবত্ব দান ক'রন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর গুণগ্রাহী শিষ্য হয়েও দুঃখ করেছেন—বাঙলার উন্নতি আরও ত্রিশ বৎসর অগ্রসর হত যদি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বাল্য-কালে সম্পূর্ণ শিক্ষালাভ করতেন। ইংরেজি শিক্ষা দূরের কথা, তিনি প্রায় কোনো শিক্ষালাভেরই সুযোগ পান নি।

কাঁচরাপাড়ায় ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্রের জন্ম,—দরিদ্র বৈদ্য বংশেই জন্ম। বাল্য থেকেই ঈশ্বরচন্দ্র অসাধারণ মেধাবী ও স্মৃতিধর ছিলেন। মুখে মুখে তিনি ছড়া কাটতে পারতেন, পরে হাফ-আখড়াইয়ের দলে গান বেঁধে দিতেন। ওইখানেই তাঁর শিক্ষা। ভাগ্যক্রমে পাথুরিয়াঘাটার যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হল, তাঁর সাহায্যে (ইং ১৮৩১ সালের ২৮শে জানুয়ারি) ঈশ্বরচন্দ্র নিজের সম্পাদনায় প্রথম 'সংবাদ প্রভাকর' প্রকাশিত করলেন। বাঙলা সাহিত্যের সেটি শুভদিন—'সংবাদ প্রভাকর' সংবাদপত্রের ইতিহাসে একটা কীর্তি স্থাপন করল। তাঁর গদ্যরীতি আদর্শ না হলেও তখন বহুল অনুকৃত হয়। 'প্রভাকর' ছাড়া অন্য সংবাদপত্রও তিনি পরিচালনা করেছিলেন; কিন্তু নানা ভাগ্যবিপর্যয় সত্ত্বেও 'প্রভাকর' বাঙলার প্রথম দৈনিকে পরিণত হয় (ইং ১৮৩৯-এর ১৪ই জুন)—তাঁর প্রধান কীর্তি বাঙলা সাহিত্যক্ষেত্রে—'প্রভাকরে'র মাসপয়লার কাগজে বাঙলার প্রাচীন কবিদের জীবনী ঈশ্বরচন্দ্র সযত্নে সংগ্রহ করে মুদ্রিত করেন (ইং ১৮৫৩ থেকে)—আমরা তা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। 'প্রভাকরে' ঈশ্বর গুপ্ত কবিতা রচনার আসর প্রস্তুত করেন; আর একদল নূতন যুবককে কাব্য-রচনায় উৎসাহিত করেন—তাঁদের মধ্যে ছিলেন রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র। এজন্যও ঈশ্বর গুপ্ত ও 'প্রভাকর' অমর হয়ে থাকবেন। ইং ১৮৫৯ সালে (২৩শে জানুয়ারি) মাত্র ৪৭ বৎসর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেন। তখন মাইকেলও প্রায় উদিত হচ্ছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সম্বন্ধে বলেছেন, "সে কাল আর এ কালের সন্ধিস্থলে ঈশ্বর গুপ্তের আবির্ভাব।" হাফ-আখড়াইয়ের দলে তিনি কবিতা বাঁধতেন; দেশীভাবে ছড়া কাটা, ব্যঙ্গপ্রবণতা ছিল তাঁর স্বভাব। সাধারণ বাঙালীর প্রতিদিনকার জীবনযাত্রার জিনিসে তাঁর অনুরাগ ছিল, আর সেই অভ্যস্ত জীবনকে নূতন কালের দাপাদাপি থেকে ব্যঙ্গবিদ্রূপে তিনি রক্ষা করতে চাইতেন। এসব তাঁর একদিক। অন্যদিকে দেখি তিনি 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র সভ্য, ব্রাহ্মসভার একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী, নানা রকম সভা সমিতি উৎসবে উৎসাহী।—এসব অন্যদিক, নবযুগের প্রাণধর্ম। তথাপি ঈশ্বর গুপ্তের ঝোঁকটা রক্ষণশীলতার দিকেই বেশি, নতুনকে আক্রমণেই তাঁর ব্যঙ্গের তীব্রতা। যেমন আগে মেয়েগুলো ছিল ভালো, 'বেথুন' এসে শেষ করেছে—

> যত ছুঁড়ীগুলো তুড়ী মেরে,
> কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে।
> তখন "এ, বি", শিখে বিবি সেজে,
> বিলাতী বোল কবেই কবে।
> ও ভাই! আর কিছু দিন বেঁচে থাকলে
> পাবেই পাবে দেখতে পাবে।
> এরা আপন হাতে হাঁকিয়ে বগী,
> গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে।...
> ঘোর পাপে ভরা হোলো ধরা
> রাঁড়ের বিয়ের হুকুম যবে।...

ঐতিহ্যের এমনি জোর, নারীর অধিকার জিনিসটা বহু যুক্তিবাদীও স্বাভাবিক মন নিয়ে বিচার করতে পারেন না। সে আমলে তখন একদিকে ছিল 'ইয়ং বেঙ্গলে'র উৎকট বিদ্রোহ, অন্যদিকে ছিল ডাফ প্রমুখ পাদ্রিদের 'উৎপাত'। দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখদেরও তা শঙ্কিত করে তুলেছিল। ঈশ্বর গুপ্তের এ বিদ্রূপে তাঁদেরও আপত্তি হত না—

> হোটেল মন্দিরে ঢুকে দেখিয়া বাহার।
> ইচ্ছা হয় হিন্দুয়ানী রাখিব না আর।
> জেতে আর কাজ নাই নাশগুণ গাই।
> খানা সহ নানা রূপে বিবি যদি পাই।...

যা থাকে কপালে ভাই, টেবিলেতে খাব।
ডুবিয়া ভবের টবে চ্যাপেলেতে যাব॥…

কিন্তু নিজেদের নিয়ে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করতেও ঈশ্বরগুপ্তের কিছুমাত্র বাধত না। কারণ, তাঁর ব্যঙ্গে কোথাও বিদ্বেষ ছিল না। তিনি তাই বলতে পারতেন—

কসাই অনেক ভাল গোঁসাইয়ের চেয়ে।

ঈশ্বরকে বলতেও তাঁর বাধেনি—

তুমি হে আমার বাবা 'হাবা আত্মারাম।'

কিংবা পাঁঠার মাংসের সুখ্যাতি করে স্বচ্ছন্দে রায় দিতেন—

এমন পাঁঠার নাম যে রেখেছে বোকা।
নিজে সেই বোকা নয়, ঝাড়ে বংশে বোকা॥

আসলে তাঁর অন্তরে একটা রঙ্গের ফোয়ারা ছিল—আর এটি শুধু তাঁর বৈশিষ্ট্য নয়। সাধারণ বাঙালীরও তখনকার দিনে কতকটা অমার্জিত হলেও সহজ রঙ্গপ্রিয়তা ছিল। তাঁর একথাটা সেই 'ইয়ং বেঙ্গল' ও 'বাবু-বিলাসে'র দিনেও সত্য ছিল—এবং এখনো একেবারে মিথ্যা হয় নি—

এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গে ভরা!

কিন্তু ঈশ্বরগুপ্তের অভিনবত্ব কিসে?—শুধু এই রঙ্গপ্রিয়তায় ও ধর্মমতের উদারতায় নয়। তাছাড়া, প্রথম অভিনবত্ব তাঁর দেশপ্রীতিতে। 'ইয়ং বেঙ্গলে'র দেশপ্রেম বাঙলায় রাজনৈতিক-বোধ জাগায়। তার পূর্বেই ঈশ্বর-গুপ্তের দেশপ্রেম—দেশের প্রতি স্বাভাবিক মমতা—আপনা থেকেই আত্ম-প্রকাশ করেছে—

জান না কি জীব তুমি জননী জনমভূমি
যে তোমায় হৃদয়ে রেখেছে—…

এবং

কতরূপ স্নেহ করি দেশের কুকুর ধরি
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।

তারপর

বৃদ্ধি কর মাতৃভাষা পুরাও তাহার আশা
দেশে কর বিদ্যা বিতরণ।

স্বদেশপ্রীতি স্বাভাবিক হলে স্বভাষাপ্রীতিও তার অঙ্গ হতে বাধ্য—'ইয়ং

বেঙ্গল' সে সত্য উপলব্ধি করতে পারেন নি বলে তাঁদের এত বিড়ম্বনা—দেবেন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ বসুর মত এ সত্য ঈশ্বরগুপ্ত অনুভব করেছেন—'মাতৃসম মাতৃভাষা'।

দ্বিতীয়ত, ঈশ্বরগুপ্ত বাস্তব বস্তু ও দৈনন্দিন জীবনযাত্রার কবি—পূজা অর্চা, প্রথা নিয়ম, পৌষ-পার্বণ', 'পাঁঠা', 'গ্রীষ্ম', 'শীত',—সব জিনিসে একটা সহজ সরস আনন্দ তাঁর আছে। সাময়িক বিষয়ে পদ্য রচনায় তাই তাঁর চমৎকার হাত দেখা যায়। ঈশ্বরগুপ্তের ভাষাও ছিল এই খাঁটি বাংলা কথার ছাদ। এই যে জাগতিক ব্যাপারে আগ্রহ, ঐহিকতায় আগ্রহ, এইটি সহজ জীবন-প্রীতির লক্ষণ; এইটি নবযুগের চেতনার একটি অঙ্গ, তা বারবার বলা নিষ্প্রয়োজন। এ সহজ বাস্তববোধ কিন্তু বাঙলা কবিতায় যথানুরূপ বিকাশ লাভ করে নি—পরে রোমান্টিকতা ও ভাবতন্ময়তা এসে তাকে ডুবিয়ে দিয়েছে। নবযুগের আরও লক্ষণ ঈশ্বরগুপ্তের কাব্যে দেখা যায়—যেমন প্রকৃতি-বর্ণনা। তা অবশ্য ওয়ার্ডসওয়ার্থীয় ধারার প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতার কথা নয়, শুধু বাস্তব বর্ণনা। আর একটি জিনিস নীতিমূলক কবিতা, -এও নতুন কালের নীতিবোধের চিহ্ন। কিন্তু একথা স্বীকার্য—ঈশ্বরগুপ্তের কাব্যবস্তু জীবনের গভীরতলা থেকে আহৃত নয়, উপরতলার বস্তু। তাঁর কাব্যরীতি সম্পূর্ণ গতানুগতিক—তাঁর কৃতিত্ব কবিওয়ালাদের মত খাঁটি বাঙলা প্রয়োগে। বঙ্কিমের কথাতেই তাঁর শেষ পরিমাপ করা যায়—"কবির প্রধান গুণ, সৃষ্টি-কৌশল। ঈশ্বরগুপ্তের এ ক্ষমতা ছিল না।" অথচ তিনি বঙ্কিম-দীনবন্ধুর মত সাহিত্য-স্রষ্টাদের সৃষ্টিতে প্রবুদ্ধ করেছেন, খাঁটি বাঙলার কবি বলে বঙ্কিমের দ্বারা প্রশংসিত হয়েছেন। "আপনার অধিকারের ভিতর তিনি রাজা। ...তিনি বাঙলা সমাজের কবি। তিনি কলিকাতা শহরের কবি। তিনি বাঙলার গ্রাম্য দেশের কবি।"

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ও ঈশ্বরগুপ্তের দ্বারাই কবিতা রচনায় উদ্বুদ্ধ হন—স্রষ্টা হিসাবে তিনি অকিঞ্চিৎকর। ইং ১৮২৭ সালে রঙ্গলাল বর্ধমান জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ পেয়েছিলেন, হুগলী কলেজেও কিছুদিন পড়েন। 'প্রভাকরে'র পাতায় তাঁর সাহিত্যিক জীবন শুরু

হয়—ঈশ্বরগুপ্তের নেতৃত্বে। নিজেও নানা সংবাদপত্র পরিচালনা করেন. 'এডু-কেশন গেজেট'-এর তিনি সহকারী সম্পাদক ছিলেন ইং ১৮৬২ পর্যন্ত। তারপর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হয়ে ইং ১৮৮২ পর্যন্ত নানা স্থানে সে কাজ করেন। ইং ১৮৮৭ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

কবি রঙ্গলাল প্রথমাবধিই রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি মনস্বীদের দ্বারা অভিনন্দিত হয়েছিলেন। দীর্ঘদিন পর্যন্ত কাব্য রচনাও তিনি করেছেন। তাঁর 'ভেক-মূষিকের যুদ্ধ' ও 'পদ্মিনী উপাখ্যান' প্রকাশিত হয় ইং ১৮৫৮ সালে, আর শেষ দিককার 'কাঞ্চীকাবেরী' কাব্য ইং ১৮৭৯ সালে—মধুসূদন কেন, হেম-নবীনও তখন সুপরিচিত। কিন্তু যে কারণেই হোক, নাট্যজগতে রাম-নারায়ণ আদির মত, কবিতার জগতে রঙ্গলাল পরবর্তী মহাপ্রকাশের যুগে কিছুতেই আত্ম প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন নি। তার নাড়ীর যোগ প্রস্তুতির পর্বের সঙ্গেই, তিনিও যুগসন্ধিস্থলেরই কবি। তিনি লিখতে চাইছেন মুর, স্কট, বায়রনের মত আখ্যান কাব্য, কিন্তু তা লিখছেন বাঙলা পদ্যের পুরাতন ধারায়। 'পদ্মিনী উপাখ্যান' তাঁর সর্বাধিক পঠিত কাব্য। 'কর্মদেবী'ও (ইং ১৮৬২) রাজস্থানের সতী-বিশেষের চরিত্র নিয়ে লিখিত; আর 'শূরসুন্দরী'ও (ইং ১৮৬৮) রাজস্থানীয় বীরবালা-বিশেষের চরিত্র। কেবল 'কাঞ্চিকাবেরী', (১৮৭৯) ওড়িষ্যার বীরাঙ্গনা চরিত্র, না হলে সবই রাজস্থানীয়। টডের রাজ-স্থান প্রকাশিত হয়ে পরাধীন বাঙালী হিন্দুর মানসক্ষেত্রে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল রঙ্গলালের 'পদ্মিনী উপাখ্যানে' তার প্রথম পরিচয় পাই।—মাইকেলের 'ক্যাপটিব লেডি'তে (১৮৪৯) টডের ছায়া নেই. কিন্তু পরে 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে' মধুসূদনও টডের রাজস্থান থেকে আখ্যান-বস্তু গ্রহণ করেছেন। শুধু টড নয়, রঙ্গলাল সংস্কৃত ও ইংরেজি থেকে নানা কুসুম চয়নেই উৎসুক ছিলেন—হোমার কালিদাস কেউ বাদ যায় নি। গোল্ডস্মিথ, মুর প্রভৃতি ছিল তাঁর প্রিয় কবি। 'বাঙলা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ'-এ (১৮৫২তে) তিনি বাঙলা কবিতার প্রতি তাঁর মমতার প্রমাণও দিয়েছেন। কিন্তু কাব্য-রচনায় তাঁর সার্থকতা সামান্য। মাত্র একটি মহৎ ভাবের ও যুগ-সত্যের বাণীর জন্যই তিনি বাঙলা সাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে আছেন—

'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,
কে বাঁচিতে চায়।'

কাব্যানুভাবনা সম্ভবত তাঁর ছিল, কাব্যশক্তিও কিছু ছিল,—মাঝে মাঝে পুরনো রীতিতে ছন্দকৌশলও দেখিয়েছেন—

ঠুকে তাল, আঁখি লাল, কি করাল মূর্তি।
মহাকায়, হরি-প্রায়, যেন পায় স্ফূর্তি॥

রঙ্গলালের প্রধান আকর্ষণ এই যে, সিপাহী যুদ্ধের বিপর্যয়ের মধ্যে তিনি যুগের অন্তর্নিহিত এই সুরটি ধরতে পেরেছিলেন—স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে। এ শুধু ঈশ্বরগুপ্তের স্বদেশপ্রীতির জের নয়, স্বাধীনতা মন্ত্রেরও প্রথম উচ্চারণ হেমচন্দ্রের 'ভারত-সঙ্গীত'-এরও প্রথম আভাস।

পর্বাবশেষ

ইং ১৮৫৮ সালের ১লা নভেম্বর কোম্পানির হাত থেকে মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারতের শাসনভার গ্রহণ করেন। সমস্ত ভারতবর্ষ সিপাহী যুদ্ধের শেষে অনুভব করল—পুরনো সামন্ত-ব্যবস্থা ও ভাবধারার আর প্রভাব থাকবে না; তার জের যা থাকবে, তা থাকবে ব্রিটিশ ('কলোনিয়াল') শাসন ও শিল্পাধিপত্যেরই প্রয়োজনে। বিজয়ী নবযুগের সভ্যতার উদ্যোগ-আয়োজনে যোগ না দিয়ে আর ভারতবাসীর পথ নেই। এই সত্যটা বাঙালী অনুভব করছিল প্রায় চল্লিশ বৎসর ধরে (অন্তত ১৮১৭তে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা থেকে)। বাঙালীর আত্মপ্রকাশের চেতনারও তখন থেকেই উন্মেষ হয়—ব্যক্তিগত আত্মপ্রকাশের ও জাতীয় আত্মপ্রকাশের, সামাজিক-রাজনৈতিক আত্মপ্রকাশের ও সাংস্কৃতিক আত্মপ্রকাশের। শহরের বণিক শ্রেণী অপেক্ষাও শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণীই 'শিক্ষিত শ্রেণী'রূপে এ প্রেরণার বাহন হয়ে উঠতে থাকেন। বাঙালীর মহাসৌভাগ্য, যুগসত্যকে অনিবার্য ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে জীবনে গ্রহণ করবার মত মহামনস্বীও এই প্রস্তুতিপর্বে 'শিক্ষিত শ্রেণী'র মধ্যে জন্মেছিলেন—রামমোহন, ইয়ং বেঙ্গল, বিদ্যাসাগর, এই তিন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে তাঁদের তপস্যা অগ্রসর হয়ে এল। পর্বান্তে সেই প্রস্তুতি সমাজে ধর্মে বিশেষ সক্রিয়, কেশবচন্দ্রের অভ্যুদয়ে তার বিরাট প্রকাশ আরম্ভ হবে। রাষ্ট্রে তা প্রতিবাদ থেকে প্রতিরোধে এসে উত্তীর্ণ হতে প্রস্তুত, নীলবিদ্রোহে তা প্রমাণিত হবে। আর সাহিত্যে-সংস্কৃতিতে তা মহোৎসবের সংকল্পে অপেক্ষ-

মান—জ্ঞানগর্ভ ও ভাবগর্ভ গদ্যের ভাষা আবিষ্কৃত ও অধিকৃত হয়েছে, নাটকের সামাজিক-ক্ষেত্র প্রস্তুত, আর কাব্যের অনুভাবনায় পদ্য মুক্তি-ব্যাকুল। ইং ১৮৫৮-এর শেষে প্রয়োজন ছিল প্রতিভার—মধুসূদনের ও বঙ্কিমের,—নবযুগের জীবনাদর্শ ও সাহিত্যাদর্শকে ইংরেজির মোড়ক ছাড়িয়ে যাঁরা জাতীয় জীবনাদর্শ ও সাহিত্যাদর্শে পরিণত করতে পারবেন—স্বাধীনতার সাধনায় ও সাহিত্যের সাধনায় সমস্ত শতাব্দী তাতে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

অবশ্য মূলগত অসঙ্গতিও রইল, তা ভুলবার নয়—ঔপনিবেশিকতার পরিবেশে বাঙালীর নবপ্রণীত সাধনা বাস্তব জীবনে খর্বিত থেকে গেল; সাংস্কৃতিক আয়োজনেও বাঙালী শিক্ষিত শ্রেণী দেশের জনসমাজ থেকে কতকাংশে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। বিশেষ করে দেখি, বিক্ষুব্ধ মুসলমান সমাজকে নবযুগের এই জাগরণ-চাঞ্চল্য প্রায় স্পর্শও করতে পারে নি। অপরদিকে, খ্রীষ্টীয় প্রভাব প্রতিহত করবার জন্য দেবেন্দ্রনাথ-রাজনারায়ণ বসু প্রমুখ মনীষীরা প্রাচীন হিন্দু ঐতিহ্যের সঙ্গে এই সাধনাকে সংযুক্ত করলেন। তাতে তখন থেকেই হিন্দু জাগরণ ও হিন্দু জাতীয়তাবাদ ক্রমেই আমাদের জাতীয় জাগরণের প্রধান রূপ হয়ে উঠতে লাগল।